

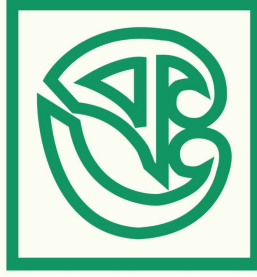
আর্যশ্রাবক বনভন্তের
ধর্মদেশনা সম্ভার-১



সংকলক

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, কাটাছড়ি ।



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

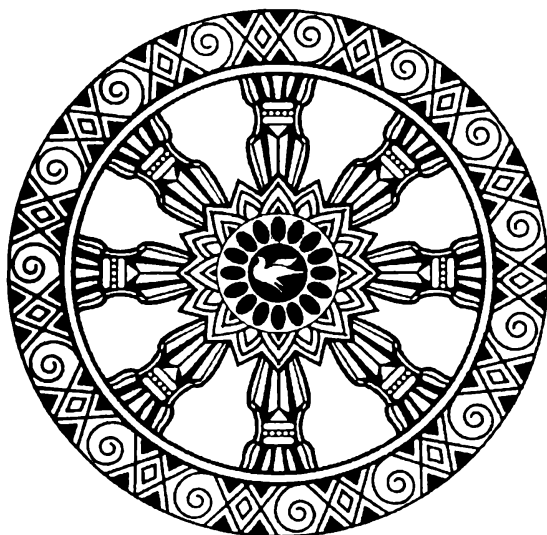
কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবৈজ্ঞানিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ড্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাঞ্ছিত মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

আৰ্যশ্ৰাবক বনভন্তের ধৰ্মদেশনা সম্ভাৰ-১



সংকলক

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

ৰাজবন ভাবনা কেন্দ্ৰ, কাটাছড়ি

(২)

আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা সস্তার-১

প্রকাশকাল

২৫৫৭ বুদ্ধবর্ষ

১৫ মে ২০১৪ বৈশাখী পূর্ণিমা

১ জৈষ্ঠ্য ১৪২১

প্রকাশনায়

“বনভন্তে প্রকাশনী”

কম্পিউটার কম্পোজ

ভদন্ত জ্ঞানদীপ ভিক্ষু

ভদন্ত করুণাময় ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

সহযোগিতায়

ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু

ভদন্ত জ্ঞানলংকার ভিক্ষু

ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু

ভদন্ত বিদ্যানন্দ ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

মুদ্রণে:

রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

অলাপন-০১৭৫০০২৯৪১৪-১৫-১৬

স্বত্বাধিকারী

গ্রন্থকার

প্রকাশনী হতে পুনঃমুদ্রণ করার জন্য

শ্রদ্ধাদান- ৩০০ (তিনশত টাকা)

উৎসর্গ

মদীয়
পারমার্থিক গুরু,
পরম কল্যাণমিত্র, বুদ্ধশাসনের
ধ্বজাধারী, এদেশের মৌলিক বৌদ্ধধর্ম
জাগরণের প্রবর্তক ও প্রাণপুরুষ, জগৎ-দুর্লভ অর্হৎ
শ্রাবকবুদ্ধ, দেব-মানবের পূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভস্মে) মহোদয়ের
পাদপদ্মে আমাদের আসবক্ষয় জ্ঞান লাভের কামনায় উৎসর্গিত হলো ।

ঐচ্ছিক

প্রকাশনীর দপ্তর থেকে

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মহান বুদ্ধপুত্র বনভন্তের আবির্ভাবে এদেশে সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সুমহান জ্ঞান, ত্যাগমহনীয়তা ও যুগোপযোগী চিন্তা চেতনার ফলে বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ ফিরে এসেছে। আর পরম পূজ্য বনভন্তে মহোদয়ও তাঁর আজীবন আবাসস্থল রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারকে ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর সেই মহৎ স্বপ্ন, ইচ্ছার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভক্ত মহোদয় বলেন যে, মহান ত্রিপিটক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ধ্যানময় জ্ঞানের সমৃদ্ধ বেশ কয়েক হাজার ভিক্ষুর এক শক্তিশালী সঙ্ঘ তাঁর প্রয়োজন হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি রাজবন বিহারে পালি ও ত্রিপিটক শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক উদ্যোগে ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ ও বাংলা ভাষায় অনুবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ইদানীং তিনি প্রায়ই বলেন- ত্রিপিটক শাস্ত্র না থাকলে বুদ্ধের শাসন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ একমাত্র ত্রিপিটক শাস্ত্রেই সংরক্ষিত রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বুদ্ধের শিক্ষা এবং উপদেশ শিক্ষার ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ নেই। বর্তমানে আমি রাজবন বিহারে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছি। কিন্তু এগুলো সব রোমান হরফে পালি ভাষায়। এগুলো বুঝতে হলে প্রয়োজন পালি ভাষায় দক্ষ, অভিজ্ঞ হওয়া। তাই আমি ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে সামর্থবান শিষ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতছি। যাতে করে ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকা সকলে ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে পারে। আর তজ্জন্য চাই পালি কলেজ। এখানকার দায়ক-দায়িকারা যদি ধনী হতো, তাহলে আমি ভিক্ষু-শ্রামণ এবং দায়ক-দায়িকাদের পালি শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনটি পালি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করতাম। আর শ্রীলঙ্কা হতে পালি এবং ত্রিপিটক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভিক্ষু এনে সেই পালি কলেজগুলোতে (এখানকার) ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকাদেরকে পালি, ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে গড়ে তুলতাম। ত্রিপিটক শাস্ত্রে সমৃদ্ধ সেই ভিক্ষু-শ্রামণ এবং দায়ক-দায়িকা কর্তৃক সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতঃ জনসাধারণের সমক্ষে বিতরণ করে এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধধর্মকে সুউজ্জ্বল করতাম, ধর্মের আলোকছটা ছড়িয়ে দিতাম সর্বত্র; ইত্যাদি আরো কত স্বপ্ন বনভন্তের মুখে নিত্য প্রতিধ্বনি হতো। বৌদ্ধপ্রধান দেশ হলে বুদ্ধবাণীর অকৃত্রিম প্রেমী, সদ্ধর্ম হিতৈষী পূজ্য বনভন্তের মতো দুর্লভ মহাপুরুষের এই স্বপ্ন, আশা, পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়াটা ছিল মাত্র কয়েক বছরের ব্যাপার। কিন্তু, আজ এই দেশে এমহাপুরুষের

স্বপ্ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার মতো প্রাজ্ঞ-দূরদর্শী লোকজন আছে কই! তারপরও “বনভস্মে প্রকাশনী” তার স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে অনেকটা মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায় জগতদুর্লভ মহাপুরুষ বনভস্মে মহোদয়ের সেই মহাস্বপ্ন, মহান পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সাহস সঞ্চার করেছে। ‘আর্যশ্রাবক বনভস্মের ধর্মদেশনা সম্ভার-১’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশনার মাধ্যমে রাজবন বিহারে পালি কলেজ প্রতিষ্ঠা, চালু করার জন্য একটি স্থায়ী ফান্ড গঠনে ব্রতী হয়। আর এব্যাপারে বনভস্মে প্রকাশনী সকলের নিকট সার্বিক সহযোগিতার প্রত্যাশা কামনা করে। এবং আমাদের পরম কল্যাণমিত্র পূজ্য বনভস্মের উপরোক্ত মহাস্বপ্ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

নিবেদক

ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি ভিন্দু

“বনভস্মে প্রকাশনী”

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

ফোন-০১৭৫০০২৯৪১৪

০১৭৫০০২৯৪১৫

০১৭৫০০২৯৪১৬

পটভূমি ও গ্রন্থকারের কথা

তাঁকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সাধন জগতে ইদানিংকালের বিশ্ব বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, চির গৌরবের প্রতীক, নির্বাণে অধিষ্ঠিত, নন্দিত ও বন্দিত মহাপুরুষ; এবং বাংলাদেশে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জাগরণের জনক, সুউচ্চ হিমালয়ের সূর্যকরোজ্জ্বল শুভ্রশিখার মতো পারমার্থিক জ্ঞানজগতের প্রবাদ-পুরুষ।

যিনি ভগবান বুদ্ধের জীবন-অঙ্গ ত্যাগ করার আজ্ঞাকে শিরোধার্যরূপে মেনে নিয়ে একাকী গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে দুঃখমুক্তির সাধনা চালিয়ে যান একটানা বহু বছর। সেই সাধনায় রোদ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ, মশার দংশনসহ দুর্ব্বিহ প্রকোপ উপেক্ষা করে মারের সাথে সংগ্রাম করত লোভ, দ্বেষ, মোহপাশ হতে চিত্তকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। আর বুদ্ধের আবিষ্কৃত চারি আর্থসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, আসবক্ষয় জ্ঞানসমূহের এক মহিমাময় বলয়ে সোনালী রঙের সম্মিলন ঘটিয়েছেন স্বীয় জীবনে।

আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কাঁর সম্বন্ধে এই কথা, তিনি হলেন সত্যিকারের বুদ্ধপুত্র, জগদ্দুর্লভ অর্হৎ পূজ্য বনভন্তে। তাঁর আচার-আচরণ, রুচি, মেজাজ, চিন্তা-ভাবনা ও দেশনে এক আশ্চর্য লোকোত্তর জ্ঞানের মেলবন্ধন সুপ্রকটিত হয়, যা দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যেতে হয় জ্ঞান পিপাসুগণকে। তবে একথা তো স্বীকার করতে হয়-লোকোত্তর জ্ঞানে যাঁর চিন্তা উদ্ভাসিত এবং লোকোত্তর জ্ঞান সমুদ্রে যিনি নিমজ্জিত, তাঁর দেহ-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এমন লোকোত্তর জ্ঞানের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হওয়া অনিবার্য। লোকোত্তর জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকশিখায় দীপ্তমান শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে বর্তমানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে পরম পূজনীয়, নমস্য ও প্রাতঃস্মরণীয় এক কিংবদন্তি মহাপুরুষ। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও তাঁর একই স্বীকৃতি।

বিশ্বখ্যাত এই মহাপুরুষ প্রায় চার দশক ধরে স্বীয় অভিজ্ঞান্নাত আলোকে সত্যধর্মের সুধা বিতরণ করে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন নিরলসভাবে। তাঁর এই সুধা বা ধর্মদেশনা মহামূল্যবান। সারাবিশ্বে এক অমূল্য সম্পদ। পূজ্য বনভন্তের এই দেশনাসমূহের কোনো কোনোতে গৃহীরা খুঁজে পায় আলোর দিশা,

নিজেদের মনের খোরাক; কোনো কোনো দেশনাতে ভিক্ষু-শ্রামণেরা খুঁজে পায় আলোক দিশা, নিজেদের মনের খোরাক। একইভাবে কোনো কোনো দেশনাতে সমাজ চিন্তাবিদেদেরা খুঁজে পায় আলোর দিশা, নিজেদের মনের খোরাক; কোন কোন দেশনাতে অর্থনীতিবিদেদেরা খুঁজে পায় আলোক দিশা, নিজেদের মনের খোরাক; আবার কোনো কোনো দেশনাতে রাজনীতিবিদেদেরা খুঁজে পায় আলোর দিশা, নিজেদের মনের খোরাক। স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী ঝর্ণাধারার অবিরাম গতিতে বয়ে চলার মতো পূজ্য বনভন্তের মুখে উচ্চারিত অমৃতময় ধর্মদেশনাসমূহ সযতনে রক্ষা, বহুল প্রচার ও অনাগতকালের সত্য অনুসন্ধিসুদের জন্য চিরায়ত করে রাখার জন্য আমি বিগত কয়েকবছর যাবৎ “আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা (সিরিজ ১-৯) নামে নয়টি গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছি। তাই আরো “বনভন্তে প্রকাশনী” পক্ষ হতে “আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা সম্ভার” নামে তিন খণ্ডে ছাপানো ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারে ১-৩ সিরিজ তিনটি “আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা সম্ভার-১” নামে ছাপানো হলো।

দেশনাসমূহে উপস্থাপনায় যথাসাধ্য অকৃত্রিমতা ফুটে তুলতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফলকাম হয়েছে সেটা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করবেন। এই গ্রন্থের যা কিছু সুন্দর, ভালো, আকর্ষণীয় দিক রয়েছে তা সমস্তই পূজ্য বনভন্তের কৃতিত্ব। কারণ, গ্রন্থের বিষয়বস্তু থেকে গুরু করে সবকিছুই তো বনভন্তের। তাই গ্রন্থের সমস্ত সম্পদ, রত্ন ভন্তেরই। বিপরীতে যা কিছু মন্দ, অসুন্দর তা আমারই সৃষ্ট। আমার সীমাবদ্ধ লেখনিশক্তি, অগভীর জ্ঞান এর জন্য দায়ী। তজ্জন্য গ্রন্থের কোনো পৃষ্ঠা যদি ভুল, প্রমাদ ও অসাদৃশ্য দেশনা পরিবেশনের দোষে দূষিত হয়, তা আমার অক্ষমতার দরুন হয়ে থাকবে। সে অনিচ্ছাকৃত ভুল, প্রমাদের জন্য আমি পূজ্য ভন্তের শ্রীপদে ক্ষমাপ্রার্থী।

এ গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন রাজবন বিহারে “বনভন্তে প্রকাশনী” পক্ষ হতে। এবং সে প্রকাশনীর সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ।

গ্রন্থটি ছাপানোর উপযোগী তথা মুদ্রণের মতো কঠিন শ্রমসাধ্য কাজটি আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেছেন আমার প্রিয় অনুজ প্রীতিভাজন জ্ঞানলংকার ভিক্ষু, শোভিত ভিক্ষু, সম্বোধি ভিক্ষু ও সুজুতি ভিক্ষু। তাদের নিকট এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা না পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এ সংকলনের কাজে যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের যথাযোগ্য বিনম্র প্রণাম, আশীর্বাদ,

সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাদের সকলের আশু দুঃখমুক্তির নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

জগদ্বর্লভ অর্হৎ পূজ্য বনভক্তের অমৃতোপম দেশনা বহুজনের হিত-সুখ-মঙ্গলার্থে, অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে, সর্বোপরি দিকে দিকে প্রচার প্রসার করতে প্রয়াসী হলাম। এ গ্রন্থ পাঠ করে কেউ যদি সম্যক্ জ্ঞান লাভে যথাযথভাবে অনুপ্রাণিত হয়, সঙ্কর্ম আচরণ করত স্বীয় জীবনে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হয় তাহলে আমার এ প্রয়াস সার্থক হলো বলে জানব।

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

আর্যশ্রাবক বনভ্রমের ধর্মদেশনা (সিরিজ-১)

প্রথম অধ্যায়

ক্রঃ নং	বিষয়.....	পৃষ্ঠা নং
০১)	অবিদ্যা হতে যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি.....	০১
০২)	নোঙ্গররূপ মিথ্যাভাব ও আসক্তি ত্যাগ কর.....	০৭
০৩)	মার জয় ও মাররাজ্য অতিক্রম করে নির্বাণ যেতে হয়.....	১০
০৪)	তোমরা উচ্চতর সাধনা কর হীন সাধনা করবে না.....	১৫
০৫)	হীনচিন্তাসমূহ ত্যাগ করে সুখী হও.....	১৯
০৬)	মূর্খের অদর্শনই সুখ তোমরা জ্ঞানী হও.....	২৬
০৭)	নির্বাণরাজ্যের জন্য ভিসা প্রস্তুত কর.....	৩১
০৮)	প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যুদ্ধ জয় করে নির্বাণ যেতে হয়.....	৩৫
০৯)	তোমরা এম এ পাশ রূপ অরহত লাভ করতে চেষ্টাশীল হও.....	৪০
১০)	টেকী শাকের ব্যবসা ত্যাগ করে ঘড়ি ব্যবসা শুরু কর.....	৪৪
১১)	নির্বাণ গমন পথে মার বিবিধ অন্তরায় বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেয়.....	৪৯
১২)	অসাধারণ জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টাশীল হও.....	৫২
১৩)	পঞ্চকক্ষে আসক্ত হয়ে অবস্থান করো না.....	৫৭
১৪)	অবিদ্যা তৃষ্ণা উপাদান ক্রেশ কঙ্ক আয়তন ধাতুই দুঃখের কারণ.....	৬১
১৫)	মানব জন্ম বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সদ্ধর্ম লাভ বড়োই দুর্লভ.....	৬৭
১৬)	আমি মানুষ সে পুরুষ সে মহিলা এ ধারণা ত্যাগ কর.....	৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৭)	অজ্ঞানী না হয়ে জ্ঞান ও সত্যের সহিত অবস্থান কর.....	৭৭
১৮)	কর্মই সত্ত্বগণের পরম বন্ধু এবং ঘোরতর শত্রু.....	৮২
১৯)	সদ্ধর্ম আচরণে প্রকৃত সুখ লাভ হয়.....	৮৭
২০)	ভোগের দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ হয় না.....	৯২
২১)	মানুষের সুখ দুঃখ ভোগের প্রকৃত কারণ তার মন.....	৯৬
২২)	অজ্ঞতা থেকে মানুষ পাপকর্ম সম্পাদন করে.....	১০২
২৩)	অকুশলকর্ম করলে মার খুব খুশী হয়.....	১০৬
২৪)	যে জাতিতে একজন সংপুরুষ উৎপন্ন হয় সে জাতির শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী.....	১১১

ক্রঃ নং	বিষয়.....	পৃষ্ঠা নং
২৫)	মারের পক্ষাবলম্বী না হয়ে বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী হও	১১৭
২৬)	কৃপণ ব্যক্তির কখনো স্বর্গ লাভ হয় না.....	১২৩
২৭)	জ্ঞান বুদ্ধি কৌশলের সহিত চললে শ্রীবৃদ্ধি হবে	১২৮

আর্যশ্রাবক বনভ্রমের ধর্মদেশনা (সিরিজ - ২)

প্রথম অধ্যায়

২৮)	সংযম আচরণ ও আত্মজয়ে নির্বাণ লাভ হয়	১৩৫
২৯)	বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সহজ হয়	১৪১
৩০)	মিথ্যাদৃষ্টি যত দোষ ও অকুশলের মূল.....	১৪৭
৩১)	দেহই সর্ববিধ দুঃখ ও ভয়ের কারণ.....	১৫৩
৩২)	কিছুতেই মারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হবে না	১৬১
৩৩)	জ্ঞান লাভ সত্য লাভই প্রব্রজিতদের প্রকৃত লাভ	১৬৯
৩৪)	ষড় ইন্দ্রিয়কে দমন করতে অসমর্থ হলে দুঃখ পেতে হয়.....	১৭৭
৩৫)	কোম্পানীর বোতল ফেরৎ দিতে হবে	১৮৩
৩৬)	তোমরা বুদ্ধের শাসনের ভিতরে অবস্থান কর.....	১৮৯
৩৭)	জগতে তিন প্রকার ধর্মগুরু বিদ্যমান	১৯৫
৩৮)	সাধারণের নিন্দা প্রশংসার কোন মূল্য নেই.....	২০০
৩৯)	যিনি নিজকে জয় করতে পেরেছেন তিনিই সংগ্রাম জয়ী	২০৫
৪০)	নির্বাণের মন নির্বাণের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর	২১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪১)	মহাজ্ঞানীদের পদাঙ্ক যত অনুসরণ করা যায় তত সুখ	২১৭
৪২)	প্রকৃত বৌদ্ধ হতে হলে চিন্তে জ্ঞান থাকতে হবে.....	২২৬
৪৩)	অতীতের পাপ এবং বর্তমান পাপে বিন্দুমাাত্রও সুখ হয় না	২৩৫
৪৪)	প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বলে কোথাও কেহ নেই	২৪৩
৪৫)	শীলবানের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ লাভ সুনিশ্চিত.....	২৫০
৪৬)	আজকাল প্রায় মানুষই দুষ্কৃতিকর্মে জড়িত.....	২৫৭
৪৭)	বুদ্ধের সান্নাৎ ও সঙ্কর্ম লাভে সচেষ্টি থাক	২৬৫
৪৮)	জ্ঞানই সকল প্রকার সুখের মূল.....	২৭২
৪৯)	অপরিস্কার চিন্তা পাপেতে রমিত হয়.....	২৭৯
৫০)	মনকে গুহক করতে না পারলে বাইরের আচরণে কিবা ফল হবে.....	২৮৫

ক্রঃ নং বিষয়..... পৃষ্ঠা নং

৫১) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে শীলবান প্রজ্ঞাবান হতে হবে	২৯২
৫২) তোমাদেরকে নিম্নগামী ও পরিহানির হাত থেকে রক্ষা করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য	২৯৮
৫৩) জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে সুখ লাভ হবেই	৩০৬
৫৪) বিচারপতি হওয়া সহজ নয়	৩১১
৫৫) ধর্মজ্ঞান ধর্মচক্ষু ধর্মবোধ হলে তবেই পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব	৩১৮
৫৬) তোমরা আমারভুবনে অবস্থান কর	৩২৬

আর্যশ্রাবক বনভক্তের ধর্মদেশনা (সিরিজ-৩)

প্রথম অধ্যায়

৫৭) বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর	৩৩১
৫৮) তোমরা সর্বদা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন কর	৩৩৭
৫৯) প্রত্যেকে নিজ নিজ চিত্তকে পরীক্ষা করে দেখ	৩৪২
৬০) প্রব্রজিতদের শিক্ষা হল রমণীদেরকে বিশ্বাস না করা	৩৪৯
৬১) কামিনী কাঞ্চন সদা সন্ন্যাসীর পরম বাধা	৩৫৬
৬২) তোমরা সোনা হয়ে যাও লৌহ হয়ে পড়ে থাকবে না	৩৬৩
৬৩) প্রব্রজিতদের পক্ষে কাম্য সুখের প্রত্যাশা করা মহা অন্যায়	৩৭০
৬৪) ভিক্ষুদের প্রকৃত আবাসস্থল গভীর অরণ্যের গাছতলা বাঁশতলা	৩৭৯
৬৫) আচ্ছা, ব্যাঙ পাল্লায় তোলে মাপা যায় কি	৩৮৫
৬৬) অপরজনেরা মূর্খ হলেও তোমরা পণ্ডিত হবে	৩৯০
৬৭) বৌদ্ধধর্মের দয়ায় কোন শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ থাকতে পারে না	৩৯৬
৬৮) নিজের কতটুকু জ্ঞান উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষক হয়ে অবস্থান কর	৪০১

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬৯) তোমরা পোকায় খাওয়া টক আম খাবে না	৪০৯
৭০) শীল পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়	৪১৫
৭১) জ্ঞানী ব্যক্তির কখনো অন্যায় অপরাধ ভুল গলদ করে না	৪২০
৭২) কুশল চিত্ত কিভাবে উদয় হয়	৪২৮
৭৩) কেহ কাউকে নির্বাণ সুখ প্রদান করতে পারে না	৪৩৩
৭৪) যেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রজ্ঞাবান শীলবান তাদের সংসারে ঋগড়াঝাটি থাকে না	৪৩৬
৭৫) জ্ঞান সত্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সুখ অর্জিত হয় না	৪৪৩

ক্রঃ নং	বিষয়.....	পৃষ্ঠা নং
৭৬)	লৌকিক সুখের মধ্যে সুখও থাকে দুঃখও থাকে	৪৪৯
৭৭)	যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হয় সেই ভাগ্যবান	৪৫৪
৭৮)	তোমরা প্রত্যেকে ভুলপথ পরিহার করে ঠিক পথে চলো	৪৬০
৭৯)	দুঃখরিত্র দুঃশীল খল ব্যক্তিদেরকে সভয়ে বিচরণ করবে	৪৬৭
৮০)	জ্ঞানের বল কুশলের বল থাকলে সুখ লাভ হয়	৪৭২
৮১)	তোমাদের মনচিন্ত কি দুঃখ পাচ্ছে সেটা জানতে সচেতন থাক	৪৭৯
৮২)	যার মনচিন্তে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞানী আর যার মনচিন্তে জ্ঞান থাকে না সে অজ্ঞান	৪৮৬
৮৩)	শক্তি ছাড়া কোন কাজে সফলকাম হওয়া যায় না	৪৯৩
৮৪)	তোমরা দুঃখ পেলে অপরের অনিষ্ট কামনা করবে না	৪৯৭
৮৫)	জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকলে পঞ্চশীল পালন করা সম্ভব	৫০২
৮৬)	তোমরা সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল হয়ে অবস্থান কর	৫০৭

সেই ভগবান অরহত সম্যক সমুদ্রকে নমস্কার ।
জীবন্ত অরহত পূজ্য বনভন্তেকে নমস্কার ।

আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা (সিরিজ-১)

প্রথম অধ্যায়

অবিদ্যা হতে যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি

এক সময় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসমাজকে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—এ'দেহ অসার, মূল্যহীন; দেহে কোন সার নেই, কোন মূল্য নেই শুধু অশুচি পদার্থে ভরা। তাই জ্ঞানীজনেরা দেহের প্রতি সর্বদা অনাসক্ত থাকেন। তোমরা দেহের প্রতি মমতা ত্যাগ কর, দেহকে নিয়ে নানাবিধ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিও না। সারহীন, মূল্যহীন দেহে কিসের ভোগ? কিসের আসক্তি? দেহকে অশুচি জ্ঞানে দর্শন করলে দেহের প্রতি আসক্তিভাব উৎপত্তি হয় না। দেহ হতেই নানাবিধ দুঃখ, ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়; দেহকে যত ত্যাগ করা যায় ততই সুখ। যেইজন দেহকে যত ত্যাগ করতে পারছে সেইজন তত বেশি সুখে অবস্থান করতেছে বলে জানবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে ধর্মের প্রতি সন্দিহান ভাব দূর হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞান হলে ধর্মের প্রতি সন্দেহ উৎপন্ন হয়, অবিশ্বাস ভাব জন্মে। চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে জগতে সুখ খোঁজে বেড়াতে হয়। স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন, ভোগ-ঐশ্বর্য নিয়ে সংসারী হয়ে সুখাকাঙ্ক্ষী হয়। কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এই ত্রিলোকে ঘুরে ঘুরে সুখ অন্বেষণ করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে ত্রিলোকের মধ্যে কোন প্রকার সুখ অন্বেষণ করে না স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন দ্বারা সংসারী হয়ে সংসারে সুখ দেখে না এবং কোথাও সুখ অন্বেষণ করে না। এককথায় সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান হলে সন্ধর্মের সন্দেহ উদয় হয় না, সংস্কাররাশি উৎপন্ন হয় না। মনচিন্তা কুশল সংস্কার,

অকুশল সংস্কার, আনেন্জা সংস্কার কোন প্রকার সংস্কারে লিপ্ত থাকে না। সংস্কারের অপর নাম হল কর্ম। যেই ভিক্ষুর বিদ্যা উৎপত্তি হয়েছে সেই ভিক্ষু কুশল সংস্কারও উৎপন্ন করে না, অকুশল সংস্কারও উৎপন্ন করে না এবং আনেন্জা সংস্কারও উৎপন্ন করে না; তাতেই তিনি পরম সুখে থাকেন। অবিদ্যাকে বিদ্যা উৎপত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলে সংস্কাররাশি উৎপন্ন হয় না। সংস্কাররাশি উৎপন্ন না হলে দুঃখরাশিও উৎপন্ন হয় না। এভাবে দুঃখরাশি নিরোধ হলে নির্বাণ সুখ লাভ হয়।

অবিদ্যা হতে যাবতীয় দুঃখরাশির উৎপত্তি, অবিদ্যা না থাকলে দুঃখরাশিও নেই। তাই বলা যায়, দুঃখ কোথা হতে আসতেছে? অবিদ্যা থেকে। দুঃখ কেন ধ্বংস হচ্ছে না? অবিদ্যার কারণে বা হেতুতে। এসব থেকে প্রমাণ মিলে যে, অবিদ্যা হতেই দুঃখ উদয় হয়, দুঃখ স্থিতভাবে থাকে মনচিন্তে। আর অবিদ্যার হেতুতে নানা দুঃখে পতিত হতে হচ্ছে সত্ত্বগণকে। বিদ্যা বা জ্ঞান উদয় হলে দুঃখ উৎপত্তি হতে পারে না। বর্তমান সময়ে খুব সমাদৃত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত বি এ, এম এ, ডক্টর ডিগ্রীসমূহ দ্বারা দুঃখরাশি ধ্বংস হবে না। তাই সেসব ডিগ্রীসমূহ প্রকৃত বিদ্যা বা জ্ঞান নয়, সেগুলোও অবিদ্যা বলে জানবে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন—স্কুল কলেজ হতে অর্জিত ডিগ্রীসমূহ উপাধি মাত্র, প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। বৌদ্ধধর্ম মতে যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখরাশিকে নিরোধ করা যায় তাই হল বিদ্যা। এবং যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ হতে চিরতরে মুক্ত হওয়া যায় সে বিদ্যা শিক্ষা করাই হল বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে অনেকে স্কলারশীপ নিয়ে লন্ডন, আমেরিকায় বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করতে চলে যায়। কিন্তু সেসব ডিগ্রীতে দুঃখ মোচন হয় না। চারি আর্যসত্য জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, যা দ্বারা দুঃখরাশিকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা যায়। তাই তোমরা চারি আর্যসত্য জ্ঞান শিক্ষা কর। সেই চারি আর্যসত্য জ্ঞান কি? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান। দুঃখ জ্ঞানে দুঃখকে বুঝে, দুঃখের মধ্যে অবস্থান করতে বিরাগ উৎপন্ন করে। দুঃখ সমুদয় জ্ঞানে দুঃখের উৎপত্তি জ্ঞাত হয়ে তা পরিত্যাগ করে। দুঃখ নিরোধ জ্ঞানে দুঃখ নিঃশেষে কি সুখ তা' প্রত্যক্ষ করে এবং দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা জ্ঞানে কিভাবে দুঃখ নিরোধ হয় সেপথ নির্দেশ করে দেয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান লাভের দ্বারা নানা যোনি অবলম্বনে ভবচক্রে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়।

'আমি মানুষ' এই ধারণা মিথ্যা, 'সে পুরুষ' এই ধারণা মিথ্যা, 'সে স্ত্রী' এই ধারণা মিথ্যা। কাজেই মানুষ, পুরুষ, স্ত্রী এই সকল মিথ্যা ধারণা নিয়ে সুখভোগ করা ইচ্ছা পোষণ করো না। কারণ যা সত্য নয় মিথ্যা তা' নিয়ে মশগুল না হওয়া এবং তাতে সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা না করায় উত্তম। অজ্ঞ,

মিথ্যা বা ভ্রান্তদৃষ্টি সম্পন্নরা সুখ ভোগে রত থাকতে চায়। তারা আমি পুরুষ, সে স্ত্রী বলে একে অপরকে লাভ করতে ইচ্ছুক হয়। অর্থাৎ সেই স্ত্রী এবং আমি পুরুষ এই ধারণা করে করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি পুরুষ, সে স্ত্রী উভয় ধারণা মিথ্যা। এ জগতে ‘আমি আছি’ এ ধারণা মিথ্যা, ‘আমার আছে’ এ ধারণাও মিথ্যা। বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত জগতই মিথ্যা, ভ্রান্ত, স্বপ্ন সদৃশ। একমাত্র চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞানই সত্য এবং আসল।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-কেহ যদি বলে আমি বৌদ্ধধর্ম বুঝতে চাই, তাহলে তাকে চারি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বি এ, এম এ পাশ তথা বড় বড় ডিগ্রী অর্জনের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বুঝা যায় না। চারি আর্যসত্য জ্ঞান লাভ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান লাভ হয়ে বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করেই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে হবে, অন্যথায় নয়। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান হল বুদ্ধ জ্ঞান। চারি আর্যসত্য জ্ঞান অর্জন হলে পুনঃ জন্মধারণ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা সংসারে জন্মগ্রহণ করে যে বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয় সে দুঃখসমূহ জ্ঞাত হয়ে আর পুনঃ জন্ম গ্রহণের বাসনা, তৃষ্ণা থাকে না। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান লাভের দ্বারা এক ভব হতে অন্য ভবে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তির ভবচক্রে ঘুরে ঘুরে মুক্তির পথ খোঁজে পাচ্ছে না। ভগবান বুদ্ধ বোধিমূলে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান লাভ করতঃ সংসারচক্রে পুনঃ জন্ম বন্ধ হলে প্রফুল্ল চিত্তে আবেগপূর্ণ এই উদান গাথা উচ্চারণ করেছিলেন -

না পেয়ে যথার্থ চারিসত্যের দর্শন,
দীর্ঘকাল বহুযোনি করেছি ভ্রমণ।
এবার পেয়েছি সেই সত্যের দর্শন,
ভবনেত্রী, তৃষ্ণা এবে হয়েছে নিধন।
উৎপাটিত দুঃখ মূল তৃষ্ণার কারণ,
পুনর্ভব পুনর্জন্ম নাহিরে এখন।

সংসার বা ভবচক্রে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করা যে দুঃখ, মিথ্যাদৃষ্টি পরিবর্ধক ও পরিপোষক তা’ প্রকাশ করতে বুদ্ধ বক ব্রহ্মকে বলেছিলেন-

ভবে আমি দেখি ভব খুঁজিনু বিভব,
বিভব খুঁজিতে গিয়ে দেখিলাম ভব।
ভব অন্বেষণ তাই করি নাই আর,
ভব তৃষ্ণা ভবাসক্তি করি পরিহার।

স্রোতাপত্তি, স্কন্দাগামী মার্গলাভীর মিথ্যাদৃষ্টি আসব সমূলে ধ্বংস হয়ে

যায়। তবে কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অনাগামী মার্গলাভীর কামাসব, মিথ্যাদৃষ্টি আসব ধ্বংস হয়ে যায়; তবে তারাও ভবাসব, অবিদ্যাসব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। অরহত মার্গলাভীরা কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি আসব, অবিদ্যাসব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা চতুর্বিধ আসবকে সমূলে ক্ষয়, ধ্বংস সাধন করে থাকেন।

মার্গফল লাভেচ্ছুক প্রব্রজিতগণ হীনদৃষ্টি, পাপদৃষ্টি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে। পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হলে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে একজন সুন্দরী রমণীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতঃ সংসারী বা সাধারণ গৃহী অবস্থায় জীবন-যাপন করাকে সুখ বলে মনে হবে। আর হীনদৃষ্টি উৎপন্ন হলে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোন পেশা অবলম্বে ধর্ম পুণ্যকর্ম করতঃ একদিকে লৌকিক সুখ অন্যদিকে ধীরে ধীরে লোকোত্তর সুখে উন্নীত হবো এরূপ ইচ্ছা জন্মাবে। পাপদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি ত্যাগ না করলে কেহ প্রব্রজিত অবস্থায় সুখে থাকতে পারে না। তোমরা পাপদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি হতে সজাগ থাক এবং এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, ‘আমরা পাপদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি উৎপন্ন হতে দেবো না। পাপদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তে কিছুতেই অবস্থান করবো না।’

অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ত্যাগ কর। প্রব্রজিত হয়ে যদি অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের সহিত অবস্থান কর তাহলে বাংলাদেশে তৈরি রেডিও লেবেলে মেড ইন জাপান লেখা সদৃশ হবে। তোমরা যে কাষায় বস্ত্র পরিধান করেছ তা বাইরের লেবেলে মেইড ইন জাপান লেখেছ। অর্থাৎ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের সহিত অবস্থান করব না এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। এখন যদি মনচিন্ত হতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান মূলোচ্ছেদ কর তাহলে প্রকৃত জাপানের তৈরি রেডিও হবে। মেড ইন জাপান রেডিও অর্থ প্রকৃত ভিক্ষু। বাংলাদেশে তৈরি কিন্তু লেবেলে মেড ইন জাপান লেখা অর্থ মিথ্যা ভিক্ষু, ছদ্মবেশী ভিক্ষু। বর্তমানে অধিকাংশ ভিক্ষুই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ত্যাগ করতে পারছে না। তারা বাংলাদেশের তৈরি রেডিও কিন্তু লেবেলে মেইড ইন জাপান লেখে অবস্থান করতেছে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ত্যাগ করতে না পারলে দুঃখ পেতে হবে, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না, এমন কি নিরয়গামীও হতে পারে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান প্রহীন হলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান প্রহীন করতে তোমাদেরকে শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, ডংশ, মশক সহ নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে গভীর অরণ্যে ধ্যান সাধনা করতে হবে। ভগবান বুদ্ধ রাজার পুত্র হয়েও যদি ছয় বৎসর শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, ডংশ, মশকের উপদ্রব সহ নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন তাহলে তোমরা কেন পারবে না? আমি যখন জঙ্গলে ছিলাম তখন বেশি দুঃখ অনুভব হলে বুদ্ধ, শারীপুত্র,

মৌদাল্যায়ন, আনন্দ, মহাকাশ্যপ প্রমুখ মহাত্ম্যগীদের কথা স্মরণ করতাম। তাঁরা রাজার ছেলে, বড় বড় ধনী ছেলে হয়ে যদি কষ্ট সহ্য করতে পারেন আমি সাধারণ পরিবারের ছেলে হয়ে কেন পারব না? এরূপ ভেবে পুনঃ মনের মধ্যে বীর্য উৎপন্ন করতাম। আরো স্মরণ করতাম মহাজ্ঞানী শারীপুত্রের উপদেশসমূহ। শারীপুত্র বলেছিলেন—

চংক্রমণে, দাঁড়ানেতে হয়ে উপবিষ্টা,
বনে শোভা পায় ভিক্ষু, বন হয় প্রসংশিতা।
আপনার চিন্তা তুমি একাকী দমিবে,
বনান্তে সেরূপ আনন্দ পাইবে।

সে সকল উপদেশসমূহ বার বার স্মরণ করে আমি জঙ্গলের মধ্যে খুশী মনে অবস্থান করতে সক্ষম হতাম, উৎসাহিত হতাম। জঙ্গলের মধ্যে একাকী অবস্থানের জন্য দৃঢ় বীর্য উৎপাদন করতাম। তোমরাও মনচিন্তা থেকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ত্যাগ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। চিন্তা দমনের অনুকূল পরিবেশ জঙ্গলে প্রবেশ করে নিজের চিন্তা নিজে দমন করো। তাতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান নিরোধ হওত বিমুক্ত সুখের অধিকারী হবে। তবে তোমরা যদি লাভ তৃষ্ণায় বশীভূত হয়ে থাক তাহলে বন জঙ্গলে অবস্থান করতে সমর্থ হবে না। বুদ্ধ বলেছেন—লাভ, তৃষ্ণায় বশীভূত হলে বন জঙ্গলে বাস করতে কষ্টকর মনে হয়। লাভ-তৃষ্ণা বশীভূত মনে বন জঙ্গলে অবস্থান করলে মন দুঃখে পতিত হয়, কষ্ট পায়। তখন দুঃখ-কষ্টে দুর্বিসহ জীবন-যাপন করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ দুঃখ কে ভয় কর, অকুশলে লজ্জা জ্ঞান উদয় কর। বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত দুঃখকে ভয় করে সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে হয়। এ সংসার দুঃখে ভরা, এখানে সুখ বিন্দুমাত্র নেই এই ভেবে দুঃখ জ্ঞান উদয় করতে হবে। প্রব্রজিত হয়ে যদি সংসার সুখ বলে দৃষ্ট হয় তাহলে প্রব্রজিত জীবনে কখনো শান্তি, সুখ লাভ হবে না। এবং তাদের নির্বাণ লাভের আশা হবে গুড়েবালি সদৃশ। বুদ্ধ বলেছেন জগতে যত প্রকার দুঃখ পেতে হয় তৎ সমস্ত এ' দেহধারণের দরুন। এই দুঃখদায়ক দেহধারণ না করলে দুঃখ কোথা হতে উৎপন্ন হবে। তাই জন্ম হলে দুঃখ পেতে হয়, দেহধারণে দুঃখ পেতেই হয়। তোমরা পুনর্জন্ম রোধ কর, দেহধারণ করা বন্ধ কর তাহলে নির্বাণ সুখ লাভ হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা সম্যক সমাধি দ্বারা চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষ্য জ্ঞান অর্জন কর; তাতে তোমাদের প্রকৃত সুখ লাভ হবে। চারি আর্যসত্য জ্ঞানে দুঃখসমূহ যেমন দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি দুঃখ নিরোধের উপায়ও প্রদর্শিত হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান দ্বারা

জন্মগ্রহণ তথা দুঃখের কার্য-কারণের হেতু নিরোধ হয়। আসবক্ষয় জ্ঞান দ্বারা ভাবী সংসার স্রাবের পথ রুদ্ধ হয়। আমি অভিজ্ঞ দ্বারা জানতে পারছি যে, বৌদ্ধধর্মে লোকোত্তরই একমাত্র সুখ। লৌকিক সুখ স্বপ্ন সদৃশ, প্রকৃতপক্ষে তা দুঃখই বলতে হয়। মারভুবন হল লৌকিক আর অমারভুবন হল লোকোত্তর। তোমরা মারভুবন ত্যাগ করে অমারভুবনে চলে যাও। মারভুবন অধীন, ভয়ঙ্কর, মুক্ত নেই, নিরাপত্তা নেই। পক্ষান্তরে অমারভুবন মুক্ত, সুখ, স্বাধীন, নির্ভয় ও নিরাপদ। স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অর্হত মার্গস্থ-ফলস্থ আর নির্বাণ এই নব লোকোত্তরধর্ম লাভ প্রকৃত সুখ ও নিরাপদ অবস্থা, যাকে অমারভুবন বলা হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তির কিছু মারভুবন অমারভুবন কিছুই চিনে না। যেমন একটা গরু বনরূপাতে অবস্থান করলেও কি বনরূপা চিনে? বা বলতে পারে কি সে বনরূপায় আছে? ঠিক তদ্রূপ অজ্ঞানীর মনচিত্ত মারভুবনে অবস্থান করলেও তারা তা জানে না। এবং সে দুঃখ পাচ্ছে তাও সঠিকভাবে জানে না। কিন্তু জ্ঞানীরা এটা মারভুবন, এখানে দুঃখ আমি দুঃখের মধ্যে অবস্থান করবো না, বরং অমারভুবনে চলে যাবো এসবই তার জ্ঞানদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আবার, মারভুবনকে মৃত্যুরাজ্য, অমারভুবনকে অমৃত্যুরাজ্য বলে। তোমরা মারভুবন ত্যাগ করে অমারভুবনে চলে যাও, এবং মারভুবন, অমারভুবন, মৃত্যুরাজ্য, অমৃত্যুরাজ্য, ইহলোক, পরলোক, চিত্ত সংযম ও শমখ বিদর্শন সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন কর। এসব সম্বন্ধে দক্ষতা লাভ হলে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয়। দক্ষতা লাভ করার অর্থ জ্ঞানী পণ্ডিত হওয়া; তোমরা জ্ঞানী, পণ্ডিত হও; দিনে দিনে পাণ্ডিত্য অর্জন কর। পণ্ডিতেরা মারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে জগতের কোন বিষয়ের প্রতি রমিত হন না।

তোমরা নির্বাণের মন, নির্বাণের চিত্ত হয়ে অবস্থান কর। নির্বাণের মন, নির্বাণের চিত্ত হলে নির্বাণ লাভ হয়। প্রব্রজ্যা ত্যাগ করার মন, বিয়ে করার মন, চাকুরি করার মন হলে নির্বাণ হতে শত সহস্র মাইলের দূরে থাকতে হবে। কোন মতে আর নির্বাণের কাছে পৌঁছতে সম্ভব হবে না। নির্বাণ যেতে হলে নির্বাণের মন, নির্বাণের চিত্ত হয়ে অবস্থান করতে হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

নোঙ্গররূপ মিথ্যাভাব ও আসক্তি ত্যাগ কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজের আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—জগতের সবকিছুই নামরূপ। দৃশ্যমান সকল সত্ত্ব, জীব, মানুষ, পুরুষ, মহিলা অর্থাৎ প্রাণীজগতের সকল জীবকেই নামরূপ বুঝায়। এখানে জীব, সত্ত্ব, আমি, আমার, আমিভূ বলে কিছু নেই। আমি, আমার, আমিভূ, মানুষ, পুরুষ, মহিলা, সত্ত্ব, জীব বলে দর্শন করলে মিথ্যাকে দর্শন করা হয়। আর আমি, তুমি, অমুক, সমুক ইত্যাদিরূপে দর্শন করলে দুঃখই বেড়ে যাবে সার। তোমরা নামরূপকে সত্ত্ব, জীব মানুষ, পুরুষ, মহিলা, আমি, আমার বলে বিচার করলে বা ধরে নিলে পরিণামে দুঃখই পাবে, লজ্জিত হবে, ঠকামি কাজ করবে মাত্র। তবে অজ্ঞানীরা নামরূপকে যথাযথভাবে দর্শন করতে অক্ষম, তারা নামরূপ না দেখে সত্ত্ব, পুঙ্গলরূপেই দর্শন করে। নামরূপের প্রকৃত স্বভাব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। নামরূপে সেই প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না হলে কখনো দুঃখ হতে মুক্তি নেই। যা অনিত্য, দুঃখ, আপনার নয় তা নিয়ে প্রমত্তভাবে থেকো না। মানুষ বা পুরুষ, মহিলা এগুলো অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। কাজেই ‘আমি পুরুষ’, ‘সেই মহিলা’ এই ধারণা বশে স্বামী, স্ত্রী হয় স্ত্রী সংসারী হয় তা মিথ্যা এবং দুঃখই। কারণ একদিন স্বামী মরে গেলে স্ত্রীকে ফেলে যাবে, স্ত্রী মরে গেলে স্বামীকে ফেলে যাবে। অন্যদিকে সম্ভ্রান সম্ভ্রতিরীও মা-বাবাকে অশ্রদ্ধাড়া নয়নে ও শোকাবুল বদনে ফেলে যেতে পারে। কাজেই জগতের সবকিছু বাচ্চা ছেলের লুকোচুরি খেলা সদৃশ। দেখতে সত্য মনে হলেও আসলে মিথ্যা, অবাস্তব; সবই অনিত্য, আপনার নয়।

তোমাদের সচরাচর যা দৃষ্ট হয়, যেমন—সত্ত্ব, জীব তথা মানুষ, পুরুষ, মহিলা, চাকমা, বড়ুয়া, মারমা, বাঙালী, জাপানী, আমেরিকা সবই মিথ্যা বলে জানবে। কেহ কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে মৃত্যুর পর সে আবার চাকমা হবে, মারমা হবে, জাপানী হবে, বাঙালী হবে? কিছুতেই বলতে পারবে না কারণ বর্তমানে চাকমা মৃত্যুর পর আবার কি চাকমা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সত্ত্ব, জীব এ ধারণা যেমন মিথ্যা তেমনি জাতি, বংশ, এই সব ধারণাও মিথ্যা।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন—তোমরা মিথ্যাকে আশ্রয় করে অবস্থান করো না। মিথ্যাকে আশ্রয় করে অবস্থান করলে বা মিথ্যাকে নিয়ে থাকলে দুঃখ পাবে এবং অনুতপ্ত হতে হবে। তাই বলি, সত্যকে খোঁজে বের করা হচ্ছে তোমাদের প্রকৃত কাজ। সত্যকে খোঁজ করে তোমরা সত্যতেই অবস্থান কর। সত্যকে যথাযথ না জেনে তোমরা যত মঙ্গলময় কাজ কর না কেন কিছুই হবে না। তোমরা নোঙ্গর

করা নৌকা দেখেছ? সে নোঙ্গরকরা নৌকায় যদি দিনভর খুব জোরে জোরে বৈঠা চালানো হয় নৌকা কতদূর যাবে? ঘাটও অতিক্রম করতে পারবে না। কেন? নোঙ্গর করা বিধায়। ঠিক তদ্রূপ সত্যকে না জেনে মিথ্যায় অবস্থান করলে যত পথ বা পস্থা অবলম্বন করা হোক না কেন কিছুতেই নির্বাণ লাভ হয় না। সেই মিথ্যা কি? ‘আমি মানুষ’ এ ধারণা মিথ্যা, ‘সে পুরুষ’ এ ধারণা মিথ্যা, ‘সে মহিলা’ এ ধারণা মিথ্যা, জগত মিথ্যা, সুখ ভোগের ইচ্ছা মিথ্যা, সুখ হবে বা সুখ পাচ্ছি এই ধারণাসমূহ মিথ্যা। পক্ষান্তরে নোঙ্গর তুলে বৈঠা চালালে নৌকা চলবে কি? অবশ্যই চলবে। তদ্রূপ মানুষ, সত্ত্ব, জীব, পুরুষ, মহিলা, সুখভোগ, জগত এই সব ধারণাসমূহ মিথ্যা জেনে সেগুলো ত্যাগ করলে নির্বাণ লাভ হয়।

মনচিন্ত যদি ভব সংসারের প্রতি আসক্ত থাকে, সুখ ভোগ করতে চায় তাহলে জানবে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সংসারের প্রতি অনাসক্ত হও, তাতে অবিদ্যা বিদূরীত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হওত সুখে অবস্থান করতে পারবে।

অনাসক্ত ঘেষহীন হইয়াছে আসবহীন, অবিদ্যা হবে বিদূরীত,

এহেন অর্হতগণের দান দেন যেইজনে মহাফল লভে সে নিশ্চিত।

তোমরা আসবক্ষয় কর, সকল বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হও, অবিদ্যা বিদূরীত কর। কাহকে হিংসা করবে না। আমার বহু বৎসরের সাধনা, মার তোমাদের মনচিন্তে আশ্রয় খোঁজতে থাকবে। তোমরা কিছুতেই মনচিন্তের মধ্যে মারকে স্থান করে দিও না। আবার অজ্ঞানও মনচিন্তে স্থান খোঁজে, অজ্ঞানকেও স্থান দিবে না। মারকে মনচিন্তে স্থান দিলে সে মনচিন্তকে বিপথে চালিত করবে। অজ্ঞানকে স্থান দিলে মনচিন্তে আর জ্ঞান থাকতে পারে না। ‘আমি পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এই ধারণা পোষণ করে কাহকে দর্শন করবে না। উপরন্তু ‘আমি পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এরূপ ধারণা মনচিন্তে স্থানও দিবে না। মনচিন্তের মধ্যে ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এই ধারণাসমূহ থাকলে মার সহজেই মনচিন্তে স্থান করে নিবে এবং দুঃখ হতে মুক্ত হতে দেবে না। এই জগত অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বা অজ্ঞানচ্ছন্ন তাই কেহ জ্ঞানচক্ষু খুলতে পারছে না। অজ্ঞান প্রায় সবাইকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই বলি—

এই যে সব গোলক ধাঁধা,

যে দিকেতে দেখতে যাবে সে দিকেতে বাধা।

পরিশেষে তিনি বলেন—সুখ-দুঃখ উভয় ত্যাগ কর। কারণ সুখ সেটাও বন্ধন, দুঃখ সেটাও বন্ধন; সুখ, দুঃখ উভয় বন্ধন হতে মুক্তই নির্বাণ। সুখ, দুঃখের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলে সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তোমরা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, আমরা সুখের মধ্যেও থাকবো না, দুঃখের মধ্যেও থাকবো না। সত্ত্বগণ সুখ পেলে আনন্দে আত্মহারা হয় আর দুঃখ পেলে

ব্যথিত মনে ভেঙ্গে পড়ে। বস্ত্রতপক্ষে এ সংসারে সুখ ও দুঃখ দুটো ধর্ম রয়েছে। সংসারে যে দুঃখ ভোগ করতে হয় তা দুঃখ বন্ধন। এবং যা সুখ ভোগ হয় তা সুখ বন্ধন—এ উভয়ই বন্ধন। এই উভয় বন্ধন হতে বিমুক্তিই নির্বাণ, যা সর্ববন্ধন মুক্ত, সর্বদুঃখগত চরম এবং পরম উপশম অবস্থা। কাজেই সুখের মধ্যে থাকতে চাইলে সংসারে আবদ্ধ থাকতে হবে; দুঃখের মধ্যে থাকলেও সংসারে আবদ্ধ থাকতে হবে। গৃহীরা যে স্বামী-স্ত্রী হয়ে বসবাস করে থাকে সেখানেও সুখ-দুঃখ দুটো ধর্ম বিদ্যমান। সবসময় সুখ যেমন হয় না অন্যদিকে সবসময় দুঃখও হয় না। তারা সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ। ক্ষণিক সুখ উপভোগের পরিণামে তাদের দুঃখই বেড়ে যায় মাত্র। তোমরা সেই ক্ষণিক সুখের ইচ্ছা ত্যাগ কর। তাতে সংসার বন্ধন হতে মুক্তি লাভের সক্ষম হবে। মনে রাখবে সংসারের ক্ষণিক সুখ-দুঃখের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ না করলে নির্বাণ লাভ হয়। তাই তোমরা সংসারের সুখ ভোগের ইচ্ছা কখনো মনের মধ্যে স্থান দিবে না। তোমরা নিজের মুক্তি নিজেই আয়ত্ত কর, নিজের মুক্তি নিজে চেষ্টা না করলে কেহ তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না।

আত্মদমন, আত্মজয় এবং নিজেকে উদ্ধার করা তোমাদের আসল কাজ। অপরকে দমন করা নয় বরং নিজেকে দমন, জয় করা হোক তোমাদের প্রব্রজ্যা জীবনের আসল কর্তব্য। স্বয়ং নিজে দমন না হলে অপরকে দমন করা সম্ভব নয় এবং নিজে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার না হলে অপরকে উদ্ধার করা অসম্ভব।

তুমি যে কেথা চিনলে না,
এ সংসারে আপনাকে ধরতে পারলে না।
কে নেবে তোর রক্ষার ভার,
তুই সামনে চলনা নইলে যাবে যমের দ্বার।
কেবা যাবে কেবা রবে এই তত্ত্ব পায় না ভেবে,
বাস্ত ঘুঘু বাস হবে জীবের কল্লনা।
ঘুরছে ঐ মরণের চাকা ধরবে কেথা বল,
ভাঙলে কপাল জ্বলবে আগুন সত্যমিথ্যা সবই জল।
খেলছে পাশা ধর্ম থেকে আটক দিলে কর্ম থেকে,
তোমরা ফাঁকা গুটি পড়ল ফাঁকে,
ধর্মের কাছে হবে তোমার সুবিচার।

সাধু, সাধু, সাধু।

মার জয় ও মাররাজ্য অতিক্রম করে নির্বাণ যেতে হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিকভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমরা মারের সাথে যুদ্ধ কর, মারের সাথে যুদ্ধ করে তবেই নির্বাণ লাভ হবে। যুদ্ধ ব্যতীত নির্বাণ লাভ হবে না। তবে নির্বাণ গমনের পথে মার তোমাদেরকে প্রলোভনের জালে আটকে রাখতে চেষ্টা করবে, কঠোর স্বরে হুমকি প্রদান করবে এবং নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেবে। তোমরা মারের সৃষ্ট সেইসব প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করতে পারবে কি? শ্রদ্ধেয় ভন্তে বার বার সে একই প্রশ্ন করতে লাগলে আমরা একস্বরে বললাম-নির্বাণ যেতে যখন প্রস্তুত হয়েছি আমাদেরকে অবশ্যই তা করতে হবে। ভন্তে বললেন, নির্বাণ লাভের জন্য মারের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন বিকল্প নেই। তোমাদেরকে বীর হতে হবে, বীর বিক্রমের সহিত মারের সকল প্রলোভন, হুমকি, বাধা-বিপত্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন, পদদলিত করে নির্বাণের পথ অতিক্রম করতে হবে। তোমরা সেই যুদ্ধ পঞ্চমারকে জয় কর। সেই পঞ্চমার কি? ক্রেশ মার, স্কন্ধ মার, অভিসংস্কার মার, বশবর্তী দেবপুত্র মার, মৃত্যু মার। এই পঞ্চমার বিজয়ীকে অর্হত বলা হয়। প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্দেশ্যে বলেন-ভন্তে, বশবর্তী দেবপুত্র কেমন মার একটু বুঝিয়ে বলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন, বশবর্তী দেবপুত্র মার পুণ্যকর্মকে সুখ বলে মনে করে। সে পুণ্যকর্ম করতঃ ভব ভবান্তরে সুখ ভোগ করে থাকে; নির্বাণ যেতে চাই না। তবে যখন সুখ পাচ্ছে কেন নির্বাণ যাব? নির্বাণ লাভ করলে তো ভব ভবান্তরে ঘুরে ঘুরে সুখ ভোগ করতে পারব না-এসব বশবর্তী দেবপুত্র মারের কথা। ভব সুখে অভিরমিত হয়ে দিব্য ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকা বশবর্তী দেবপুত্র মারের কাজ। সে সত্ত্বগণকে সুখ ভোগে উৎসাহিত করে নির্বাণ লাভের অন্তরায় ঘটায়। বশবর্তী দেবপুত্র মারই তো ভগবান বুদ্ধকে পরিনির্বাণ লাভের জন্য ফাং করেছিল। কারণ বুদ্ধ ভব ভবান্তরে সুখ ভোগ করতে নিষেধ করেন, কাজেই বুদ্ধ জীবিত থাকলে তার সুখ ভোগ করা হবে না; উপরন্তু সুখ ভোগ করার সঙ্গী জুটবে না। বশবর্তী দেবপুত্র মার পূর্বজন্মের কুশল পুণ্যের প্রভাবে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে অধিপতি হয়েছে। বর্তমান বশবর্তী দেবপুত্র মারের চ্যুতি ঘটলে অন্য আর একজন বশবর্তী দেবপুত্র মার আবির্ভাব হবে। এ মারের কাজ হল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সুখ ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা। নির্বাণ লাভ করা বশবর্তী দেবপুত্র মারের অন্যতম অপ্রিয় একটি কাজ। সে মনুষ্য সুখ, দিব্য সুখ দেখিয়ে সত্ত্বগণকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে। চ্যুতি হওয়া, ধ্বংস হওয়া বা সত্ত্বগণকে ৷৳৷ মুখে পতিত করাকে মৃত্যুমার বলে। যদি শোনা যায় যে, আজকে অমুক

ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে জানবে মৃত্যু মারই মরছে। আত্মহত্যা করা এবং মৃত্যু কামনা করা মৃত্যু মারের কাজ। মৃত্যুমার মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করে থাকে। অনেকে বলে থাকে মৃত্যুবরণ করলে সবশেষ। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ মৃত্যুর পর সে যদি আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাহলে থাকে আবার-তো দুঃখ পেতে হবে। কোথায় দুঃখের পরিসমাপ্তি হল? একমাত্র পঞ্চমার জয় করতে পারলেই দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়। তোমরা পঞ্চমার জয় করো। যারা দুরাগামী, একাচারী, অশরীরী, গুহা আশ্রিত চিন্তকে সংযত করবে তারাই মারের বন্ধন হতে মুক্ত হবে। নানাবিধ পাপ চিন্তা থেকে চিন্তকে মুক্ত রাখ, চিন্তকে উপশান্ত কর, তৃষ্ণাক্ষয় কর তাহলে অমৃতময় নির্বাণ সুখ মিলবে। বুদ্ধ বলেছেন—

চিন্ত যার উপশান্ত, তৃষ্ণা যার হয়েছে ছেদন,
ক্ষীণ তার জন্ম-ভব মুক্ত তিনি মারের বন্ধন।

তিনি বলেন—তোমরা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে উদয়-ব্যয় ভাবনা কর। উদয় অর্থ উৎপত্তি, ব্যয় অর্থ ধ্বংস। এ' পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে উদয়-ব্যয় ভাবনা করলে উদয়-ব্যয় জ্ঞান লাভ হয়। উদয় ভাবনা করলে উদয় জ্ঞান, ব্যয় ভাবনা করলে ব্যয় জ্ঞান। উদয়-ব্যয় জ্ঞান লাভ হলে আসবক্ষয় হয়। বুদ্ধের সময়কালীন অনেক ভিক্ষুই উদয়-ব্যয় ভাবনা করে মার্গফল লাভ করেছিলেন। আবার, শাস্ত্রে দেখা যায় একজন ভিক্ষু পুকুর পাড়ে উদয় ব্যয় ভাবনা করতেন। ভাবনা করতে করতে হঠাৎ মাছ অন্তেষণ রত একটা বক তার দৃষ্টি গোচরে ধরা পড়ল। তখন সে উদয় ব্যয় ভাবনা ভুলে গিয়ে 'উদক বক, উদক বক' বলতে শুরু করল। অন্য একজন ভিক্ষুর সে দৃশ্য পরিদৃষ্ট হলে ভগবান বুদ্ধকে সে ভিক্ষুর কথা নিবেদন করল। তখন বুদ্ধ বললেন, সেই ভিক্ষু মূর্খ; যথাযথ অর্থ না বুঝে শুধু তোতা পাখির মত অনুকরণ করতে গিয়ে আপন মূর্খতারই পরিচয় দিচ্ছে। তাই তোমাদেরকে বলি অক্ষর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। উদয় ব্যয়ের প্রকৃত অর্থ, এ জগতের সমস্ত কিছু উৎপত্তি হচ্ছে ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে; এভাবে উদয় ব্যয়ে যথার্থ অর্থ করে ভাবনা করতে হবে। শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে প্রশ্ন করে বলেন, তোমরাও সে রকম করবে নাকি? সবাই মুখে না সূচক উত্তর ভেসে উঠল। ভঙ্কে এবার বললেন, সে ভিক্ষুর মনচিত্ত বকের নিমিত্তে আকৃষ্ট হয়েছিল বিধান এরূপ অবস্থায় পড়েছিল। তোমরাও ভাবনা করতে গিয়ে কোন নিমিত্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। আকৃষ্ট হলে ঐ ভিক্ষুর অবস্থায় পড়তে হবে। আর কোন সুন্দরী রমণীর নিমিত্তে আকৃষ্ট হলে তো প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতেও বাধ্য হবে।

সাধারণ মানুষ, সাধারণ ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করতে হলে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বি এ,

এম এ, ডক্টর ডিগ্রী দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বুঝা সম্ভব নয়; এগুলো হীনজ্ঞান বলে জানবে। তাই তোমরা চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টাশীল হও। এই অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হলে বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করা সম্ভব। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন, চর্চা করতে চেষ্টা করলে দুঃখই পাবে সার, কষ্টসাধ্য বলে মনে হবে। যেমন আতুর ব্যক্তির পক্ষে দৌড়ে চলাফেরা করা বা পর্বত লঙ্ঘন করা অসম্ভব। ঠিক তদ্রূপ সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ, ভিক্ষুর পক্ষে বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করা সম্ভবপর নহে। তারা ইচ্ছা করলেও বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন, আচরণ, চর্চা করতে পারবে না। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন না হলে ইচ্ছা করলেও নির্বাণ যেতে পারে না। তোমরা সেই জ্ঞান অর্জন করে নির্বাণ লাভ করতঃ স্বাধীনভাবে বিচরণ কর। বুদ্ধ বলেছেন-

সকল প্রকারের পর স্বীয় স্বাধীনতা সুখ,

সকল প্রকারের পর অধীনতা দুঃখ।

সাধারণে দুঃখ ভোগ করে বহুতর,

চারি যোগ অতিক্রম বড়ই দুষ্কর।

সাধারণ মানুষ, সাধারণ ভিক্ষু অবস্থায় থাকলে অর্থাৎ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে না পারলে নির্বাণ যেতে পারবে না। অবিদ্যার অধীন, তৃষ্ণার অধীন হয়ে থাকতে হবে; তাতে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করবে। যোগ অর্থ সম্বন্ধ বা যুক্ত করা। এ যোগ একজন্মের সহিত অন্যজন্মের যোগ করে দেয়। আবার, যেমন মহিলা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের আসক্তি উৎপন্ন হয়, পুরুষ দর্শনে মহিলারও আসক্তি উৎপন্ন হয়। এখানে পুরুষ মহিলা পরস্পর পরস্পরের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব স্মৃতি বা পূর্বজন্মের আসক্তি জাহ্নত হয়ে বর্তমানের আসক্তি উদয় করতঃ একে অপরকে আসক্তি করতেছে। এভাবে পুনর্জন্মের আসক্তিকে জাহ্নত করায় বর্তমানের আসক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া বা পূর্ব আসক্তির সাথে বর্তমানের আসক্তিকে যোগ করায় কাম যোগের কাজ। খরস্রোতা নদীতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডকে নদীর স্রোত যেমন একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যায়, ভবযোগও তেমনি সত্ত্বদিগকে এক ভব হতে অন্য ভবে বা বারবার ভব ভবান্তরে যোগ করে থাকে। কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা ভেদে যোগ চার প্রকার।

মারভুবন হল অধীন, আর অমারভুবন হল স্বাধীন। মারভুবন অর্থ মাররাজ্য, অমারভুবন অর্থ নির্বাণরাজ্য। তোমরা নির্বাণরাজ্যে থাকবে নাকি মাররাজ্যে থাকবে? নির্বাণরাজ্যে থাকলে স্বাধীন, অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে। আমি বনভঙ্কে যেমন তোমাদেরকে মাররাজ্য ত্যাগ করে

নির্বাণরাজ্যে যেতে আহ্বান করতেছি, তেমনি মারও তোমাদেরকে মাররাজ্যে থাকতে বলতেছে। মার আরও কি বলে জান? মার বলে তাকে কাকেও মুক্তি দেব না; আমাররাজ্যে থাক; সুখ ভোগ কর; পঞ্চকামগুণে মত্ত হয়ে থাক; দুঃখমুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা মনে রাখবে যুবতী মেয়েগুলো মারের কন্যা। তোমাদেরকে মোহিত করার জন্য মার তার কন্যাদিগকে সাজ-সজ্জা, স্বর্ণ-অলঙ্কারে বিভূষিতা করে বিহারে পাঠিয়ে দেয়। তোমরা মারের সেসব প্রলোভনে প্রলুব্ধ হলে প্রব্রজ্যা ছেড়ে চলে যাবে; অনেকে চলে যাচ্ছে। মারের কন্যাগুলো কিভাবে তোমাদেরকে প্রলুব্ধ করে জান? তারা নানাবিধ প্রসাধনীয় দ্রব্য স্নো, পাউডার, আলতা ইত্যাদি ব্যবহার করে অঙ্গসজ্জা, কেশ বিন্যাস, বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে বিহারে আসে। তার অর্থ কি জান? আমাকে সুন্দর দেখতেছ তো? মনোপুত হচ্ছে তো? প্রব্রজিত হয়ে থাকতে ইচ্ছা করতেছে না তো? যদি ইচ্ছা না হয় আমি প্রস্তুত আছি। আমাকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে যাও। তোমাদের জ্ঞানের পরিধি কম হলে তাদের প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে সাত রাজার ধন প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে সংসারী হবে (কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখে হাসি ঝড়তে লাগল)।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে বলেন-দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের জন্যই প্রব্রজিত হওয়া। তাই তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ এখন নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্টি হও। আত্মদমন, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন করতে পারলেই সহজেই নির্বাণ লাভ হয়। তোমরা কি সত্যিই নির্বাণ লাভ করতে চাও? যারা সত্যিকার অর্থে ভিক্ষু হয়েছে তাদের নির্বাণ ছাড়া অন্য লক্ষ্য হতে পারে না। জীবনের বিনিময়ে হলেও তারা নির্বাণ লক্ষ্য চ্যুত হয়ে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করবে না। তোমরা সত্য-মিথ্যা যাচাই কর, ভালো-মন্দ বিচার কর, দোষ-নির্দোষ কর, তাতে প্রকৃত সার বিষয় লাভ করতে পারবে। যারা অজ্ঞান তারা সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারে না, ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না এবং দোষ-নির্দোষ বিচার করতে অক্ষম হয়। বুদ্ধ বলেছেন আমার উপদেশসমূহে জ্ঞানীগণ সত্য-মিথ্যা যাচাই কর। সত্য হলে গ্রহণ কর আর মিথ্যা হলে বর্জন কর। ঠিক তদ্রূপ আমার (বনভক্তে) উপদেশসমূহও যাচাই কর। শুধু বনভক্তের নয় যে কেহ বজ্রতা বা ধর্মোপদেশ প্রদান করলে তা সত্য-মিথ্যা যাচাই করবে, ভালো-মন্দ বিচার করবে, দোষ-নির্দোষ পরীক্ষা করবে। তবে অজ্ঞানীরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য; ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো; ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায়; দোষকে নির্দোষ, নির্দোষকে দোষ বলে থাকে। এভাবে মূর্খের ছয়টি দোষ বিদ্যমান থাকে। তারা উল্টোপাল্টা বলে থাকে। অর্থাৎ গাছকে বাঁশ এবং বাঁশকে গাছ বলে থাকে। তোমরা গাছকে গাছ, বাঁশকে বাঁশই বলবে অর্থাৎ সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা,

ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ, ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে অন্যায় বলবে-উল্টোপাল্টা করবে না, যথার্থরূপেই বলবে। উল্টোপাল্টা করলে জ্ঞান লাভ হয় না। যেমন-গাছকে বাঁশ, বাঁশকে গাছ বললে কখনো সত্যের মীমাংসা হয় না। অন্যদিকে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পুন্ডালেরা উল্টোপাল্টারূপে জগতকে দেখতে চায়। তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী না হয়ে থাকতে পারে না। তারা বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্রে সংসারী হওয়াকে সুখ বলে মনে করে। তারা ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরি বা যে কোন পেশা অবলম্বন করে বসবাস করাকে সুখ বলে থাকে। কখনো বিয়ে না করে থাকতে পারে না। নির্বাণ সুখকে তারা দুঃখরূপেই ভাবে। তাদের সেসব ধারণাগুলো গাছকে বাঁশ এবং বাঁশকে গাছ বলা সদৃশ। তোমরা নির্বাণকে সুখ বল স্ত্রী-পুত্রে সংসারী হওয়াকে দুঃখ বল; এবং সংসারে সুখ ভোগ করাও, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পঞ্চকামগুণে মুগ্ধ হওয়াকে দুঃখ বলে দর্শন কর। তাহলে সম্যক দর্শন হবে, জ্ঞান লাভ হবে, এই সম্যক দর্শনের দ্বারা নির্বাণ যেতে পারবে।

লোভই পরম রোগ, সংস্কার নিদারুণ দুঃখ ইহা যথার্থরূপে জেনে পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ পরম সুখে থাকেন। লোভচিহ্নে কোনকিছু করাকে রোগ বলে জানবে। কেহ যদি কোন রমণীর প্রতি লোভ উৎপন্ন করে তাহলে জানবে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে। সে রোগের দরুন তাকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতে হবে। আবার, কেহ যদি অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয় আমি তাকে রক্ষা করতে পারবো না। তবে বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভগবান বুদ্ধ পারতেন। যেমন শাস্ত্রে দেখা যায়-জনৈক ভিক্ষু প্রব্রজ্যা ত্যাগ করার তাগিদে বুদ্ধের সকাশে উপস্থিত হয়ে বলল প্রভু আমি আর প্রব্রজিত জীবনাচারণ করতে পারব না। আমি একজন রমণীকে বিয়ে করব বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখনই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করব। তখন বুদ্ধ সে ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে বললেন-

ভুবিলে নারীর মায়ার আবর্তে,
ব্রহ্মচর্য পায় অচিরে বিনাশ।
তাই সুধীজন তুমি অতি সাবধানে,
দূর হতে ত্যজ তুমি রমণীর পাছ।
নারীর গমন সদা অধঃপথে,
মরণের পর নরকে নিবাস।
তাই সুধীজন তুমি অতি সাবধানে,
দূর হতে ত্যজ তুমি রমণীর পাছ।

এভাবে কথাস্ত্রে যখন বুদ্ধ চারি আর্থসত্য ব্যাখ্যা করেন উৎকণ্ঠিত সেই ভিক্ষু অহরতৃ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধ জ্ঞানের কী মহিমা! কিছুক্ষণ আগে যে ভিক্ষু প্রব্রজ্যা

ত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল সে এখন অরহত। বুদ্ধ চারি আর্যসত্য ব্যাখ্যা করার ফলে সে ভিক্ষু প্রকৃত সত্যকে জানতে, বুঝতে পেরেছিলেন। তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, সংসারী হওয়া মিথ্যা, দুঃখ অনিবার্য।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা চারি আর্যসত্যকে একমাত্র সত্য এবং অপর সকলকে মিথ্যা বলে জান তাহলে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। যেমন একজন রমণী তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে তুমি তাকে সত্য বলবে নাকি মিথ্যা বলবে? মিথ্যাই বলতে হবে। চারি আর্যসত্য, নির্বাণই সত্য অপর সকল মিথ্যা। এভাবে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, নির্বাণ লাভ করাকে সত্য, সুখ, উত্তম, শ্রেষ্ঠ মনে কর। এবং চারি আর্যসত্য জ্ঞান, নির্বাণ লাভ চেষ্টাশীল হও; তাদের প্রকৃত শান্তি তথা নির্বাণ সুখ মিলবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা উচ্চতর সাধনা কর হীন সাধনা করবে না

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন-যে কোন ভবের প্রতি তৃষ্ণা উৎপন্ন করবে না, হঠাৎ তৃষ্ণা উৎপন্ন হলেও তৎক্ষণাৎ তা' পরিত্যাগ করবে। কারণ পৃথিবী, স্বর্গ, ব্রহ্ম এ'ভবসমূহ সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতে কোন সুখও নেই। আবার সেসব ভব থেকে একদিন চ্যুত হতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন একত্রিশ প্রকার লোকভূমি সবই দুঃখ, মিথ্যা। কোন ভবই নিরাপদ আশ্রয় নয়। নির্বাণ একমাত্র প্রকৃত সুখ, সত্য, মুক্ত, অচ্যুত এবং নিরাপদ আশ্রয়। তোমরা অবিদ্যার গাঢ় অন্ধকার বিধ্বংস কর। অবিদ্যাতে বিদ্যা উদয় কর, মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হও, মারসৈন্যকে জয় কর। তাহলে নির্বাণ লাভ করতে সমর্থ হবে। মারসৈন্য থাকলে পাপকে নিয়ে ভবের মধ্যে সুখ ভোগ করতে ইচ্ছা জাগবে। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্নগণ পাপ করলেও পাপ নেই মনে করে। অবিদ্যা সত্য-মিথ্যা, আসল-নকল কিছুই বুঝতে পারে না। বুদ্ধ অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপত্তি করতঃ মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত করে সম্যকদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা এবং মারসৈন্যকে জয় করে নির্বাণ আবিষ্কার করেছিলেন। আলস্য, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ভীকৃত্য, কাম, আরতি, তৃষ্ণা, বিচিকিৎসা, কুহনা, জড়তা, লাভ-সৎকার, মিথ্যালব্ধ যশ খ্যাতি, পরগুণ মর্দনানিলাষ বা আত্মপ্রসংশা রত হয়ে অপরকে তুচ্ছ, ঘৃণা করা এসবই মারসৈন্য। মারসৈন্য তোমাদেরকে আক্রমণ করলে তোমরা নির্বাণ মার্গ ভুলে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথে ধাবিত হয়ে থাক। কামলোক, রূপলোক, অপরূপলোক এ ত্রিলোকের মধ্যে মনচিন্ত থাকলে মারসৈন্যরা আক্রমণ করে। যাদের মনচিন্ত একত্রিশ প্রকার লোকভূমির উর্ধ্বে তারা মারসৈন্যগণের সম্পূর্ণ অতীত। তাই তারা প্রকৃত সুখী, দুঃখ হতে মুক্ত।

সবনিম্নে কামলোক তার উপর রূপলোক তার উপর অরূপলোক এবং সবলোকের উর্ধ্বেই নির্বাণ। কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক দুঃখ, মিথ্যা, সেখানে দুঃখমুক্তির স্থান নেই। তোমাদের মনচিন্তা নির্বাণের দিকে ধাবিত কর, নির্বাণকে লক্ষ্য করে অবস্থান কর।

তিনি বলেন-তোমরা উচ্চতর সাধনা কর। লৌকিক বিষয়ে মন না রেখে শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত লাভ করার সাধনা কর। এসব লাভ করার জন্য যে সাধনা তা' উচ্চতর সাধনা। প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহী হতে, বিবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতে, সংসারী হয়ে ভোগ সুখ করতে, পুনঃ জন্ম গ্রহণ করতে লজ্জাশীল হলে তাও উচ্চতর সাধনা বলে জানবে। স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসারী জীবন-যাপন করব একরূপ চিন্তা মনে স্থান দিবে না। সংসারে সুখ ভোগ করতে বা লৌকিক পঞ্চকামগুণে মুগ্ধ হতে লজ্জী হও। কখনো সাংসারিক চিন্তা করবে না। নর-নারী তথা বাজে চিন্তা ভুলেও মনের মধ্যে স্থান দিবে না। এমন কি তোমাদেরকে কিছু দান দিলে তা পরিভোগ করতেও লজ্জাশীল হবে। বাস্তবিক দানীয় বস্তুকে সর্বদা ভয় জ্ঞানে দেখা উচিত। কারণ দানীয় বস্তুর প্রতি লোভ করলে ভিক্ষুকে দুঃখ পেতে হয়, উপরন্তু নিরয়গামীও হতে হয়। পাপে লজ্জাশীল, ভয়শীল হলে মার্গফল লাভ করা সম্ভব। সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত ও দুঃখ রেখে থেকে মুক্ত সর্বদা সংযম রক্ষা কর, তাতে উচ্চতর সাধনার চরম শিহরে পৌঁছে নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

তোমরা চারি প্রত্যয়ের প্রতি তৃষ্ণা করবে না। চীবর, পিণ্ডপাতের জন্য জীবন ধ্বংস হলেও কারো নিকট যাচঞাশীল হবে না। ভোজনের মাত্রাজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম, জাগ্রত ভাব উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কর। সকল বিষয়ে সংযম অবলম্বন করলে অকুশল উৎপন্ন হতে পারে না। তোমরা কায় সংযম, বাক সংযম, মন সংযম তথা সর্বত্র সংযম রক্ষা কর। বুদ্ধ বলেছেন-

সর্বত্র সংযম যিনি লজ্জী সুরক্ষিত,

সকলের নিত্য তিনি হন প্রসংশিত।

তোমরা যদি সংযমতা রক্ষা না কর তবে আমি বলছি, তোমরা দুঃখ পাবে। যার কায় সংযম, বাক সংযম, মন সংযম সেই প্রকৃত সুখী। সত্ত্বের নির্বাণ লাভের সচেষ্ট হও, হীন বিষয় নিয়ে আর থেকো না। হীনত্ব অগ্রত্ব হয় না, অগ্রত্বেই অরহত্ব লাভ হয়। সেই হীন কি? মানুষ হীন, তৃষ্ণা হীন, সংস্কার হীন। মনচিন্তার মধ্যে হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কারকে স্থান দিবে না। মনচিন্তে হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার না থাকলে সুখ লাভ হয়। তোমরা সবসময় জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিন্তে অবস্থান করবে। সীমাহীন নীল আকাশ যেমন পৃথিবী হতে বহুদূরে ঠিক তেমনি তোমরাও জ্ঞানের দ্বারা হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার

হতে বহুদূরে চিন্তকে ধারণা করে অবস্থান করবে। সেই জ্ঞান কি? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান। এইসব জ্ঞানের দ্বারা মারভুবনে না থেকে অমারভুবনে অবস্থান করা বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য। কারণ মারভুবন পাপ, দুঃখ, বিপদ সংকুল ও ভয়বাহ। তোমরা মারভুবন ত্যাগ করে অমারভুবনে চলে যাও। তোমাদের মনচিন্তকে মারভুবন হতে কোটিশত সহস্র মাইল দূরত্বে অবস্থান কর। তোমাদের মনচিন্ত মাররাজ্যে না থাকলে আর দুঃখ নেই, পাপের আশংকা নেই, শুধু অনাবিল সুখ অনুভব হবে। তাহলে তোমাদের কর্তব্য কি? মনচিন্তকে মাররাজ্যে না রেখে নির্বাণরাজ্যে নিয়ে যাওয়া এবং নির্বাণের মন, নির্বাণের চিন্ত হয়ে অবস্থান কর। মাররাজ্যে থাকলে পাপকর্মে নিযুক্ত থাকতে হয়, কারণ মার সর্বদা পাপকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত সাহায্য করে, এমনকি বাধ্যও করায়। মার কি বলে জান? আমার পুণ্যের কোন প্রয়োজন নেই, কেহ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে উদ্যত হলে আমি ব্যর্থ করে দিব। অমাররাজ্য ত্যাগ করে কেহ নির্বাণ যেতে পারবে না, যে নির্বাণ যেতে ইচ্ছুক হয় তাকে আমি শ্রেষ্ঠার করব।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বুদ্ধ থাকাকালীন মার তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। বুদ্ধের অসীম জ্ঞান এবং কুশলের প্রভাবে মার সর্বদা হীনপ্রভ অবস্থায় ছিল। তাই বর্তমানে তোমরাও জ্ঞান, কুশলকে আশ্রয় করে থাকো; তাহলে মার পরাজিত হবে। অজ্ঞান, অকুশল ত্যাগ করে কুশলে বলীয়ান হও। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন করে এবং চারি আর্যসত্য কুশলে বলীয়ান হওত অপ্রমাদের সহিত অবস্থান কর। অজ্ঞান, অকুশলের প্রতি লজ্জাশীল, ভয়শীল হলে মাররাজ্য অতিক্রম করতে সহজ হবে। তোমরা যদি মাররাজ্যে থাক তাহলে পিয়নের চাকুরিতে রত আছ বলে জানবে। সত্ত্বর পিয়নের চাকুরি ত্যাগ করে কমিশনাররূপ অমারভুবনে চলে যাও। স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলে কমিশনার আর পৃথকজন অবস্থায় থাকলে পিয়ন বলে জানবে। আবার পৃথক অবস্থায় সংসারী হয়ে বসবাস করাকে আমি টেকিশাকের দোকানদার বলি। পক্ষান্তরে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত প্রব্রজিত জীবনকে উন্নত ঘড়ি ব্যবসায়ী বলে থাকি। টেকিশাকের ব্যবসা না ঘড়ি ব্যবসা কোনটা উন্নত এবং দেখতে ভদ্র লাগে? (শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রশ্নের উত্তরে) সবাই একবাক্যে ঘড়ি ব্যবসা বলে উত্তর প্রদান করলাম। বনভন্তে বললেন তাহলে টেকিশাকের ব্যবসা ত্যাগ করে ঘড়ি ব্যবসা শুরু করে দাও। তবে সবাই ঘড়ি ব্যবসা করতে পারে না। কারণ ঘড়ি ব্যবসা করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। টেকিশাকের ব্যবসাকারীর কি সেই অর্থ থাকবে? নিশ্চয় থাকবে না। অন্যদিকে ঘড়ি ব্যবসা করতে লেখাপড়ায় শিক্ষিত

হতে হয়। কোন ঘড়ির কত মূল্য তা' জেনে রাখতে হয়, ক্রেতাদেরকে ক্যাশমেমো দিতে হয়। কিন্তু টেকিশাকের ব্যবসায় তো এসব কিছুই প্রয়োজন নেই। ঠিক তদ্রূপ মার্গফল লাভ করতে গেলে অসীম জ্ঞান এবং কুশলের প্রয়োজন। যাদের জ্ঞান, কুশলের পরিমাণ কম তারা মার্গফল লাভ করতে পারে না।

উচ্চতর সাধনা, উচ্চতর জ্ঞান, চিন্তের নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা হলে নির্বাণ যেতে পারবে। হীন জ্ঞান, নিম্নস্তরের সাধনা, নিম্নাকাঙ্ক্ষা, চিত্ত কলুষিত, নীচমনা হলে নির্বাণ যেতে পারে না। তোমরা উচ্চতর সাধনা, উচ্চতর জ্ঞান, চিন্তের নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা হয়ে নির্বাণে চলে যাও। তা না হলে দুঃখ পাবে, আমি তোমাদেরকে যে দেশনা দিচ্ছি তাও অনর্থ বলে জানব। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগুলোকে উচ্চতর সাধনা, উচ্চতর জ্ঞানের পরিপূরক? কখনো না। উপরন্তু সেসব শিক্ষা হীনজ্ঞান, নিম্নস্তরের সাধনা, নিম্নাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই গণ্য। সেসব শিক্ষা দ্বারা চিন্তের নির্মলতা হবার কোন সুযোগ নেই। আমি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, প্রিন্সিপালের জ্ঞানকে তুচ্ছ করি; এমনকি তাদেরকে অজ্ঞানরূপেই দেখি। বর্তমানে কিছু ভিক্ষু কেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেছে? তাদের সেই কাজ আপন মূর্খতারই পরিচয় দিচ্ছে মাত্র। তার সাথে আরো অনেক বিনয় লঙ্ঘনমূলক কর্মেও তারা যুক্ত রয়েছে। তাই তাদেরকে বিপথগামী ভিক্ষু বলা যায়। তারা লোকোত্তর সুখকে ত্যাগ করে লৌকিক সুখের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে লৌকিক সুখকে ভগবান বুদ্ধ হীন, অনার্য, ঘৃণিত বলে তুচ্ছ করেছিলেন তারা কিনা সেই লৌকিক সুখকে প্রথমে পরিত্যক্ত থুথু আবার তুলে এনে গলধঃকরণে ন্যায় পরিভোগ করতেছে। আমি বর্তমানের সেই হীন আচরণ সম্পন্ন ভিক্ষুদেরকে দেখলেও লজ্জাবোধ করি। যেমন পাগল উলঙ্গ ব্যক্তি দর্শনে ভদ্রলোকেরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে সে স্থান ত্যাগ করে।

পরিশেষে তিনি বলেন তোমরা চারি আর্যসত্য জ্ঞান, চারি আর্যসত্যের কুশল দ্বারা অলঙ্কৃত হও। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে জ্ঞাত হও; অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমুদয় আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে পরিহার কর; নির্বাণ নিরোধ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ কর; শমথ বিদর্শন মার্গসত্য উচ্চতর জ্ঞানে গঠন কর। এ সকল উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা লোকোত্তর সুখ উপলব্ধি হয়। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুধাবন করতে সহজ হয়। উচ্চতর জ্ঞানের অভাব হলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুধাবন করতে দুঃখ-কষ্টকর, কঠিন বলে মনে হয়। আর যা দুঃখ-কষ্টকর কঠিন তা কি লাভ করা সম্ভব? তা তোমরা উচ্চতর জ্ঞানে সাধনা কর হীনজ্ঞানের সাধনা করবে না। আবার অরণ্যে ভাবনাকারী ভিক্ষুর যদি

নিম্নস্তরের সাধনায় রত থাকে তাহলে থাকে জঙ্গলের ভিতর রোদন করা ছাড়া কিছুই থাকবে না। জঙ্গলে অবস্থান করে যদি নির্বাণের সচেষ্ট না হয়ে গৃহীকালীন নানা হীনচিন্তা উদয় করে দিন যাপন করে; লোভ-ভ্রম, যশ খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে সেটাও নিম্নস্তরের সাধনা বলে জানবে। তজ্জন্য আবারও বলছি তোমরা উচ্চতর সাধনা কর। উচ্চতর সাধনা দ্বারা উচ্চতর জ্ঞান লাভ হলে পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের রসাস্বাদন হয়ে যায়।

সাধু, সাধু, সাধু।

হীনচিন্তাসমূহ ত্যাগ করে সুখী হও

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মুখে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—“আমি কি করব, আমি কোথায় যাব, আমি কোথায় থাকব” এসব হীনচিন্তা করে মনুষ্যগণ দুঃখ পাচ্ছে। মানুষ হীনচিন্তার দ্বারা দুঃখকে পতিত হয় বিপদগ্রস্ত হয় এবং সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই হীনচিন্তা দুঃখ উৎপন্নকারী, অকুশল উৎপন্নকারী, মুক্তিমার্গের বাধা সৃষ্টিকারী। হীনচিন্তা না থাকলে দুঃখ উৎপন্ন হয় না, বিপদ আসতে পারে না এবং সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভের সম্ভব হয়। শাস্ত্রে দেখা যায়—জনৈক হীনচিন্তাকারী ভিক্ষুকে বুদ্ধ বলেছিলেন তুমি আস থেকে আর কোন চিন্তা করবে না, এরূপ উপদেশ প্রদান করলে ভিক্ষুটি অরহত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ সেই ভিক্ষু উপদেশ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার অকুশল চিন্তা ও ত্রিমুক্ত হয়েছিল। মনে মনে চিন্তা করলে দুঃখ উৎপন্ন হয়, পাপ উৎপন্ন হয় অজ্ঞান থাকে। তাই তোমরা কোন কিছু চিন্তা করবে না। সকল প্রকার চিন্তামুক্ত হলে অরহত্ব লাভ হয় বলে জানবে। যা কিছু চিন্তা করা হয় তাই চিন্ত। কি চিন্তা করে? বিষয় বা আলম্বন। অভিধর্মে বলা হয়েছে এখানে চিন্তা করা শব্দের অর্থ আলম্বন গ্রহণ করা। চিন্তা সর্বদা আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বনে পড়ে থাকে। আলম্বন ছাড়া চিন্তা থাকতে পারে না। তিনি টেলিভিশনের একটি কলমকে উদাহরণ দিয়ে বলেন, টেলিভিশনের উপরে এই কলমটি একটি আলম্বন তা চক্ষুর দ্বারা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা গ্রহণ করল। এইভাবে আলম্বনের মাধ্যমে চিন্তা উদয় হয়। আবার, স্ত্রী আলম্বন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তা পুরুষের চিন্তা গ্রহণ করে; পুরুষের আলম্বন দর্শনেও স্ত্রীর চিন্তা তা গ্রহণ করে থাকে। তোমরা আলম্বনকে নিয়ে থেকো না। চিন্তা যদি আলম্বনে ঝুলে থাকে নির্বাণ লাভ হবে না, নির্বাণ পৌছার পথে আলম্বন পথরুদ্ধ করে রাখে। আলম্বন ভেদ করতে না পারলে চিন্তা নির্বাণে পৌছে না। তিনি উপমা দিয়ে বলেন—ধরু এই বইটি আলম্বন, তারপরে

নির্বাণ। এখন চিন্ত যদি নির্বাণের যেতে চায় আলম্বন (বইটি) মাঝখানে পথরুদ্ধ করে রাখে এবং চিন্তকে ধরে রেখে আলম্বনের রসাবোধে নিযুক্ত করে চিন্তকে নির্বাণে যেতে দেয় না। আলম্বনে রমিত হয়ে আলম্বনের প্রকৃত স্বভাব যে অনিত্য তা' জানতে দেয় না। কাজেই জ্ঞানযোগে যদি আলম্বন ভেদ করে তার যথার্থ স্বভাব অনিত্য জানা যায় তাহলে চিন্ত আলম্বনে থাকে না। আর চিন্ত আলম্বনে ঝুলে না থাকলে নির্বাণে পৌছতে সক্ষম হয়। তবে অনেকেরই এই আলম্বন চিন্ত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তারা চিন্ত কখন কি আলম্বন গ্রহণ করতেছে তা কিছু জানে না; চিন্ত কোনদিকে যাচ্ছে, কি করতেছে সেসবও কিছুই জানে না। কারণ তারা ঘোর অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় নিমজ্জিত। কাল বৈশাখী ঝড় বাতাসের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি উপরন্তু অমাবস্যা রাতে যেমন কিছুই দেখা যায় না তাদের অবস্থা ঠিক সে রকমই। চিন্ত যদি কোন আলম্বনে ঝুলে ঝুলে থাকে তাহলে দুঃখ পেতে হয় চিন্ত বিপথগামী হয়, মুক্তির পথ লাভ করতে পারে না।

তিনি বলেন অবিদ্যা কি রকম জান? দুঃখ কি না বুঝা অবিদ্যা, কোন বিষয় না জানা অবিদ্যা, ধর্মের আশ্বাদ না পাওয়া অবিদ্যা। এসব বুঝার জন্য আমাকে লঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড যেতে হবে না। বরং লঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড থেকে কোন জ্ঞানী পণ্ডিত ভিক্ষু আসলে তাকেও এই বলে সায় দিতে হবে যে, হ্যাঁ ঠিক ঠিক বনভন্তে তুমি প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের রাসাশ্বাদন পেয়েছ, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম বুঝে ফেলেছ। আমি থাকতে তোমাদেরকে লঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড কোথাও যেতে হবে না। বিষ্টি নির্মাণ করতে যেমন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন ঠিক তেমনি বৌদ্ধধর্ম করতে গেলে বনভন্তের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। অন্যান্য বিষয়ে নয়, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ার। অবিদ্যা বিদ্যমান থাকলে নির্বাণ লাভ হয় না, অবিদ্যা নির্বাণ লাভের প্রধান অন্তরায়। তাই তোমরা অবিদ্যা ত্যাগ করে চিন্তকে (বিদ্যা উদয়ের পথে) সত্যপথে নিয়োজিত কর। চিন্ত মিথ্যাপথের দিকে ধাবিত হলে দুঃখ বলে জানবে। বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছিলেন—নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু, হিংস্র জন্তু যতখানি অনিষ্ট করে চিন্ত আকৃষ্ট চিন্ত তদপেক্ষা ক্ষতিসাধন করে। আবার মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতীবর্গ, আত্মীয়-স্বজন যে উপকার সাধন করে সত্য নিবিস্ট (সম্যকপথে প্রতিষ্ঠিত) চিন্ত তদপেক্ষা উপকার, মঙ্গল করে থাকে। তাই মনচিন্ত শত্রুও হতে পারে বন্ধুও হতে পারে। তোমাদের মনচিন্ত যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে বন্ধু; অন্যদিকে তোমাদের মনচিন্ত মিথ্যাপথে ধাবিত হলে পরম শত্রু বলে জানবে। তোমাদের চিন্ত তোমার নিরীক্ষণ করে দেখ চিন্ত সত্যপথে চালিত হচ্ছে নাকি মিথ্যাপথে চালিত হচ্ছে? সত্যপথে চালিত হলে পরম সুখ, শান্তি লাভ হবে আর মিথ্যাপথে চালিত হলে সীমাহীন দুঃখে পতিত হতে হবে। দুর্দমনীয়, অসংযত চিন্ত মনুষ্যগণের পরম শত্রু। অসংযত চিন্ত দ্বারা যে কাজ

করা হোক না কেন তাতে দুঃখ, অমঙ্গল, ভীষণ অনর্থ হওয়া ছাড়া সুখের, মঙ্গলদায়ক কিছুই হয় না। তাই স্বীয় চিন্তকে সংযত করা তোমাদের পরম কর্তব্য। চিন্তা শাস্ত, স্থির, সংযত হলে মার্গফলের অধিকারী হয়ে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির নিজের চিন্তকে সংযম (দমন) করতে পারে না, বরং তারা নিজের চিন্ত বশীভূত হয়ে ইহ-পরকালের জন্য অমঙ্গল সৃষ্টি করে অসহ্য দুঃখ ভোগ করেই থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তির স্বীয় চিন্তকে দমন করতে সমর্থ হন। মহাজ্ঞানী অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র বলেছেন—

আপনার চিন্তা তুমি একাকী দমাবে,

বনাস্তে সেইরূপ আনন্দ পাইবে।

আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমনই প্রকৃত সুখ। অদমিত আত্ম (আমি, আমার ইত্যাদি ভাব) অদমিত চিন্তা, অদমিত ইন্দ্রিয় দুঃখদায়ক, অশান্তি সৃষ্টিকারক। তাই বর্তমানে পৃথিবীতে দেখা যায় এত অশান্তি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রেষা-রেষি। নিজেকে দমন না করে সবাই যেন অপরকে দমনের ব্যস্ত। মূর্খরা নিজের দোষ নিজে দেখে না, তারা সর্বদা নিজের দোষসমূহ গোপন করে রাখতে আগ্রহী। কিন্তু অপরের দোষ বিন্দুমাত্র হলেও বড় করে দেখে। নিজেকে আগে দমন না করে অপরকে দমন করতে চাই। কিন্তু নিজেকে দমন না করে অপরকে দমন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অপরকে দমনের মধ্যে কোন আনন্দ নেই; নিজেকে দমন করতে পারলেই পরম আনন্দ লাভ করা যায়।

তোমাদের চিন্তকে প্রকৃত স্বাধীন অমারভুবনে নিয়ে যাও। কারণ মারভুবনে তোমাদের চিন্তা থাকলে অধীন দুঃখ ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে—যা মুক্ত নয়। এবং পরিমাণে বিপদের সম্ভাবনা একশত ভাগ থাকে। অমারভুবন স্বাধীন, সুখ, মুক্ত, নিরাপদ এবং নির্ভয়। মারভুবন হল মাররাজ্য, অমারভুবন হল নির্বাণরাজ্য। মারভুবন কাকে বলে জান? যে সমস্ত ধর্মকর্ম দ্বারা কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এই ত্রিলোকের মধ্যে সন্তুগণকে অধীন করে রাখে তা' মারভুবন। মারভুবনে ধর্মেরও অধীন কর্মেরও অধীন করে থাকতে হয়। অমারভুবন ধর্ম থেকেও মুক্ত কর্ম থেকেও মুক্ত। তিনি প্রশ্ন করে বলেন তোমরা কি সত্যি সত্যিই অমারভুবনে যেতে চাও? (আমরা একবাক্যে উত্তর প্রদান করলাম) হ্যাঁ ভগ্নে, আমরা অবশ্যই অমারভুবনে যেতে ইচ্ছুক। তাহলে তোমরা দিবারাত্রি স্মৃতি প্রজ্ঞার সহিত অবস্থান কর। স্মৃতি প্রজ্ঞার সহিত অবস্থান করলে মারভুবন ত্যাগ করতঃ নির্বাণরাজ্যে যেতে সক্ষম হবে।

আর্যমার্গ পথে কর স্মৃতি বিদর্শন,

দুঃখের মূল হেতু তৃষ্ণা হইবে ছেদন।

তৃষ্ণা জয় করে যেই সাধক যখন,
দুঃখের নিরোধ তার নির্বাণ দর্শন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-আমি এখন প্রায় ফাং-এ গেলে দেখি, মারের পক্ষ অবলম্বী এবং বুদ্ধের পক্ষ অবলম্বী হয়ে মানুষ দুইভাগে ভাগ হয়। যারা বুদ্ধের পক্ষ অবলম্বী তারা ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে দান, শীল সহ শ্রদ্ধার সহিত ধর্মদেশনা শ্রবণ করে কুশল পুণ্য অর্জন করে থাকে। আর যারা মারের পক্ষ অবলম্বী তারা দান, শীল বা কোন ধর্ম কর্মের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখে না। বুদ্ধের পক্ষ অবলম্বীগণ বুদ্ধের উপদেশকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলে, বুদ্ধের আদর্শে আদর্শবান হয়ে জীবন-যাপন করে। পক্ষান্তরে মারের পক্ষ অবলম্বীগণ নানা অনাচার-অত্যাচারমূলক কর্মে নিজেকে যুক্ত রেখে নিজে যেমন দুঃখ পায়, অপরকেও দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত করে, তারা সেসব দুঃকর্মে অন্যজনকেও বিশেষভাবে উৎসাহিত করে অনুপ্রেরণা যোগায়। যারা মারকে সুখ মনে করে, মারের কাজসমূহে সুখ হবে বলে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং মারের কথা শুনে তারা মারের পক্ষ অবলম্বী। অন্যদিকে যারা বুদ্ধকে বিশ্বাস করে, বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলাকে সুখ বলে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করতঃ তা যথাযথ আচরণে চেষ্টাশীল হয় তারা বুদ্ধের পক্ষ অবলম্বী। এখন তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ বুদ্ধের উপদেশ মত শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা অনুশীলন করে সংযত জীবন-যাপন কর। তবে মার তোমাদেরকে কিন্তু বিপথের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। তোমাদেরকে বলবে বনভন্তের উপদেশ শ্রবণ করবে না, প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতঃ বিয়ে করে সংসারী হয়ে যাও। মারের এসব প্রলোভনে প্রলুব্ধ হলে তোমরা বিপথের দিকে পা দিচ্ছো বলে জানবে। তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আমি বলছি, মারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ো না, প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে বা অসংযমী প্রব্রজিত জীবন-যাপন করে নিরয়গামী হয়ো না। মারের উদ্দেশ্য কি জান? মারের উদ্দেশ্য কুশলকর্মে বাধা দেওয়া, জ্ঞান লাভ করতে বাধা দেওয়া, সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হতে বাধা দেওয়া, নির্বাণ যেতে বাধা দেওয়া। মারের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বুদ্ধের উপদেশ মত প্রব্রজিত জীবন-যাপন করা সত্যিই দুর্লভ। কারণ দুর্দমনীয় শক্তির মধ্যে মারের শক্তি অত্যধিক। সহজে মারকে পরাজিত করা সম্ভবপর নয়। তবুও সবসময় সংযম রক্ষা করলে মার পরাজিত হতে বাধ্য। যারা নির্বাণ যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে অতিশীঘ্র জ্ঞান লাভ করে দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা উচিত। বুদ্ধ বলেছেন-

চিন্তা যার উপশান্ত, তৃষ্ণা যার হয়েছে ছেদন,

ক্ষীণ তার জন্মভব, মুক্ত তিনি মারের বন্ধন।

গাগ চিন্তা উপশম হয়েছে এবং তৃষ্ণা থেকে মুক্ত সে মারের সকল বাধা-

বিপত্তি হতে সম্পূর্ণ অতীত। তাই বুদ্ধ আরো বলেছেন-

অভিজ্ঞায় সর্বলোক সম্যক জানিয়া,

সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছে আমি মারের জিনিয়া।

গয়ার বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধ মারকে জয় করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই যারা নির্বাণ যেতে ইচ্ছুক তাদের সকলকে মারকে জয় করতেই হবে। মারকে পরাজিত না করে নির্বাণ লাভ করা যায় না। তোমরা সত্ত্ব মারকে পরাজিত করে নির্বাণ লাভ করতে সচেষ্ট হও। আবার, দায়ক-দায়িকাগণ যে ফাং করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নানা ধরনের খাদ্য-ভোজ্য দেয় সেটাও মারের কাজ। ভিক্ষু যদি লোভ করে সেসব খাদ্য খায় তাহলে সে মারের ফাঁদে পড়ল বলে জানবে। অতীতকালে অনেক হরিণ শিকারী ব্যাধ নাকি নেশা মিশ্রিত মিষ্টি জাতীয় তরল ঘাসের উপর সিঁড়ন করে দিত। হরিণ মিষ্টি ঘাসের লোভে খেতে আসলে নেশাশস্ত হয়ে পড়ে থাকত; ইত্যবসরে ব্যাধ এসে নেশাশস্ত সকল হরিণকে ধরে ফেলত। এখানেও নানা ধরনের সুস্বাদু খাদ্য-ভোজ্য সে নেশা মিশ্রিত মিষ্টি ঘাস সদৃশ। তোমরা যদি গৃহীকুলের সে খাদ্যের লোভে ফাং অশ্বেষণ করে দিনাতিপাত করে থাক তাহলে পাপিষ্ঠ মারের অধীন হয়ে আছ বলে জানবে। কোথায় তোমাদের নির্বাণ লাভ? কোথায় তোমাদের দুঃখমুক্তির প্রচেষ্টা? তাই লোভের বশীভূত না হয়ে শুধুমাত্র ঔষধ সেবনের ন্যায় মাত্রাজ্ঞ হয়ে ভোজন করবে। আবার একেবারে ভোজন ত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধন করলে সেখানেও মার থাকে। মারের উদ্দেশ্য হল খেলে খুব বেশি করে খাব, না খেলে একেবারে খাব না। অল্প খাবারে আমার কিছুই হয় না, অল্প খাবাবের চেয়ে আমি না খেয়ে মরব। তাই ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়ে অল্প আহার করলে মার থাকতে পারে না। তোমরা অল্প করেই ভোজন করবে অর্থাৎ গুরুপাক না খেয়ে লঘুপাক খাবে। জীবিতেন্দ্রিয় রক্ষা করে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা অনুশীলন করে নির্বাণ লাভ করতে হয়। আর তাই জীবিতেন্দ্রিয় রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত সামান্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। খাদ্য একদিকে ধ্যান-সমাধির সহায়ক অন্যদিকে মুক্তির অন্তরায়ও বটে। তৃষ্ণায়ুক্ত করে খাদ্য গ্রহণ করলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ হয়, আর তৃষ্ণায়ুক্ত করে খাদ্য গ্রহণ করলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ দূরের কথা সীমাহীন দুঃখে পতিত হতে হয়। হীন-উৎকর্ষ, সুস্বাদু-স্বাদ বিহীন যে খাদ্য হোক না কেন তৃষ্ণায়ুক্ত করে গ্রহণ করতে পারলে সুখ লাভ হয়। তৃষ্ণায়ুক্ত করে খাদ্য গ্রহণ করলে কোন তৃপ্তি হয় না, বরং তৃষ্ণা বর্ধিত হয়। খাদ্যের প্রতি তৃষ্ণা থাকলে সারাক্ষণ খাদ্যের অশ্বেষণে রত থাকতে হবে। মাত্রাজ্ঞ এবং তৃষ্ণায়ুক্ত করে খাদ্য গ্রহণ করলে তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আমি এক সময় চট্টগ্রামের রঞ্জন কুমার বড়ুয়াদের বাড়ীতে

ফাং-এ গিয়েছিলাম। সেখানে আমাকে নানা ধরনের মাছ মাংস সহ স্বাদু, রসালো খাদ্য পরিবেশন করে তা খেতে তাগিদ দিয়েছিল। আমি সামান্য খেয়েছিলাম মাত্র। তাদেরকে বলেছিলাম বনভ্রমকে নানাধরনের খাদ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করতে পারবে না, আমি ভোগী ভিক্ষু নই। ভোগ করার উদ্দেশ্যে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেনি। ভিক্ষু হয়ে অতিরিক্ত ভোজনে রত হলে তা' লজ্জার বিষয়ও বটে। নানাধরনের সুস্বাদু, রসালো খাদ্য পরিবেশন করলেও তোমরা সামান্য ভোজন করবে। সর্বদা ভোজনে মাত্রাজ্ঞান ও জাহ্নত ভাব মনের মধ্যে রাখবে। ঔষধ যেমন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে লিখিত ডোজ অনুসারে খেতে হয়, একসাথে সবটুকু খাওয়া যায় না ঠিক তদ্রূপ ভোজনে মাত্রাজ্ঞান হয়ে সামান্যই গ্রহণ করতে হয়। অল্প ভোজনে তৃষ্ণা থাকে না, দুঃখোৎপত্তি হেতু হয় না। ডোজ অনুসারে ঔষধ না খেলে যেমন বিপদের সম্ভাবনা থাকে সে রকম অতিরিক্ত ভোজনেও নিরয়গামী হতে হয়। ভোজনকে ঔষধ জ্ঞান করে অল্পই গ্রহণ কর, তাতে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভ্রম বলে-ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভের সচেষ্টিত হও। তোমরা সর্বদা জাহ্নতভাব তথা সকল বিষয়ে সংযম রক্ষা কর। জাহ্নত অর্থ জ্ঞান, ঘুমন্ত অবস্থা অর্থ অজ্ঞান। তোমরা অজ্ঞান হয়ে থাকলে ঘুমন্ত আস বলে জানবে। জগতের সত্ত্বগণ অজ্ঞানের ঘোর ঘুমে ঘুমন্ত। মানুষ, দেবতা, ব্রহ্ম সবাই অজ্ঞানের ঘোর ঘুমে ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। আমি তোমাদেরকে অজ্ঞানের ঘুম থেকে জাহ্নত করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমরা সামান্য হাত পা নাড়াচাড়া করে আবার ঘুমিয়ে পড়। অজ্ঞানের ঘুম ত্যাগ করে তোমরা জ্ঞানের চর্চা কর, জ্ঞান উৎপাদক সাধনায় নিয়োজিত থাক। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা জাহ্নত থেকে ধ্যান চর্চা কর, কিছুতেই চার ঘণ্টার অধিক ঘুমাতে না। বেশি ঘুমালে দেহ আলস্য হয়ে পড়ে আর সে অকর্মণ্য শরীরে ধ্যান হয় না। যত ঘুম বেশি হবে তত দেহ আলস্য হয়ে পড়ে। কারণ ঘুম আর আলস্য একবন্ধু, ঘুম থাকলে আলস্য থাকবে, আলস্য থাকলে ঘুমও থাকবে। আমি তো বর্তমানে ঘুমাতেই পারি না। যেহেতু আমার আলস্য, ঘুম বহু আগে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। তোমরাও আলস্য, তন্দ্রাকে পরাজিত কর। ভগবান বুদ্ধ আলস্য, তন্দ্রাকে কারাগার বলে তুলনা করেছেন। তোমরা সেই কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়ে যাও। তাতে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে।

চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষ্য জ্ঞান লাভ সাধনায় সফলকাম হতে পারলে প্রকৃত সুখ লাভ হয়। যারা এ সকল জ্ঞান লাভ করতে অসমর্থ তাদেরকে দুঃখের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন-

আসবের ক্ষয় কারণ না হয় যতদিন,
এসব বিশ্বাস ভিক্ষু করিও না ততদিন।

তাই কমপক্ষে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ না হয় পর্যন্ত কেহকে বিশ্বাস করতে নেই। হোক সে শ্রদ্ধাবান দায়ক, শ্রদ্ধাবতী দায়িকা, দেবতা, ব্রহ্ম, ভিক্ষু, শ্রামণ। তারা আজকে ভালো, সাধু, ধার্মিক হলেও আগামীকাল বা তিন/চার বৎসর পর অথবা যে কোন সময় মন্দ, অসাধু, পাপিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। তবে যারা মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত তার জীবনের বিনিময়েও মন্দ, অসাধু, পাপিষ্ঠ হতে পারে না। অর্থাৎ জীবন ধ্বংস হোক তবু তারা খারাপ কাজ করবে না। আবার, স্রোতাপত্তি-সক্‌দাগামী-অনাগামী পুঙ্খলোকা মুক্তির স্তর পেয়েছেন বটে, কিন্তু ইহজন্মে তারা মুক্ত নন। স্রোতাপত্তি মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ সাতজন্য, সক্‌দাগামী মনুষ্যালোকে একবার, অনাগামী শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্ম নেয়ার পর মুক্ত হন। স্রোতাপত্তি লাভীর চারভাগের একবার জ্ঞান, তিনভাগ ভাগ অজ্ঞান; সক্‌দাগামীর চারভাগের দুইভাগ জ্ঞান, দুইভাগ অজ্ঞান; অনাগামীর চারভাগের তিনভাগ জ্ঞান, একভাগ অজ্ঞান থাকে; অরহত সম্পূর্ণ অজ্ঞান থেকে মুক্ত অর্থাৎ চারভাগই জ্ঞান। যারা মার্গফল লাভী নয় তারা চারভাগের পুরোতাই অজ্ঞান। অরহত ইহলোকে নির্বাণ উপলব্ধি করেন বলে তাদের সুখ বেশি। তাই তো শাস্ত্রেও দেখা যায়, বুদ্ধ আনন্দকে বারবার বলতেন আনন্দ অরহত লাভের চেষ্টা কর।

পরিশেষে তিনি সময় উপযোগী উপমা সহকারে বলেন-অরহত লাভ করা হল এম এ পাশ, অনাগামী হল বি এ পাশ, সক্‌দাগামী হল আই এ পাশ, স্রোতাপত্তি হয় এস এস সি পাশ। এস এস সি..... হতে এম এ পাশ যেমন উত্তম, উচ্চতর ডিগ্রী ঠিক তদ্রূপ স্রোতাপত্তি থেকে অরহত লাভ করা উত্তম, শ্রেষ্ঠ। তোমরা এম এ পাশ রূপ অরহত লাভের সচেষ্ট হও। অরহত লাভ করতঃ সর্ববিধ তৃষ্ণা, অবিদ্যা ক্ষয় করে পরম সুখ নির্বাণ উপলব্ধি কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

মূর্খের অদর্শনই সুখ তোমরা জ্ঞানী হও

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-মূর্খের সহচার্যে থাকা খুব দুঃখজনক। মূর্খের সংসর্গ ত্যাগ ও মূর্খের অদর্শনই সুখকর। মূর্খের সাথে যত অদর্শন করে থাকা যায় ততই মঙ্গলজনক বলে জানবে। যে ব্যক্তি মূর্খের সহচার্যে থাকে তাকে দীর্ঘকাল অনুশোচনা করতে হয়। শত্রুগণের সহিত বাস কি দুঃখজনক মূর্খগণের সহচার্য তদপেক্ষা দুঃখপ্রদ ও বিপদজনক। মূর্খ ব্যক্তি শুধু নিজে কুপথে বিচরণ করে ক্ষান্ত হয় না, অন্যদেরকেও কুপথে চলার পরামর্শ, উৎসাহ দান করে বিপথগামী করায়। উপরন্তু মূর্খ বর্তমানে কোন ক্ষতিসাধন না করলেও তাদের দ্বারা মঙ্গলজনক কিছু সম্পাদিত হয় না। মূর্খ ব্যক্তি যাবতীয় অমঙ্গল সৃষ্টিকারী, দুঃখ সৃষ্টিকারী, অনর্থকারী এবং অহিতকারী। অহিত, বিপদ আনয়নকারীদের মধ্যে মূর্খ অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়। তাই মূর্খের সাথে দৈবৎ দর্শন হয়ে গেলেও তাদেরকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। বাংলাদেশের প্রায় মানুষ অজ্ঞান এবং মূর্খ। কি চাকমা বল, কি বড়ুয়া বল, কি মারমা বল আর অন্যদের কথাই বা কী বলব। যদিও তারা বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেয় তথাপি তারা অজ্ঞান। প্রকৃত বৌদ্ধরা কখনো অজ্ঞানী হতে পারে না; বৌদ্ধ হতে হলে জ্ঞানী হবার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের হিন্দুরা নাকি (বর্তমানে) প্রায় বলে বৌদ্ধরা এদিকে ত্যাগ আবার অন্যদিকে ভোগে আসক্ত হয়; তাদের সেটা তো বুঝা যায় না। যেমন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সংসারের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়, আবার ভোগ সুখে রত থাকে; এমনকি অনেকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে পুনঃ সংসারী হয়ে যায়। কিন্তু তাদের ধর্মে তো বলা হয়েছে ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই মহিমা, ভোগই দুঃখের মূল, ভোগই দোষপূর্ণ। কিন্তু কেন তারা ভোগে রত হয়? আবার বৌদ্ধদের মধ্যে আজকাল অনেক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন কর্ম করতে দেখা যায়। তাদের ধর্মে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হবার উপদেশ রয়েছে। এবং নির্বাণ মার্গের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হিসেবে সম্যকদৃষ্টিকে বলা হয়েছে। তারা বুদ্ধের প্রকৃত আদর্শে আদর্শবান হতে যথেষ্ট বেগ পাচ্ছে। প্রকৃত বৌদ্ধেরা তো ভোগে আসক্ত না হয়ে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন আচরণ পরিত্যাগ করে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হন। তাদের সেই অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে বৈকি! তবে যারা জ্ঞানী তারা সেই অভিযোগের উর্ধ্বে।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন-আচ্ছা ধর, বর্তমানে যারা প্রত্যহ দিন বিহারে আসতেছে তারা সবাই ধনী হয়ে গেল। ভোর সকালে পঞ্চাশ/ষাট জনে একদল উত্তম খাদ্য নিয়ে বিহারে এসে হাজির হয়ে খাদ্য পরিবেশন করল। সে

খাদ্য খাবার শেষ হতে না হতে আরো সত্ত্বর/আশি জনের একটি দল আগের চেয়ে উত্তম খাদ্য নিয়ে ভোজনালয়ে উপস্থিত হল। এর কিছুক্ষণ পর আরো নব্বই একশত জনের একটি দল আগের চেয়ে বেশি উত্তম খাদ্য নিয়ে আসল। এভাবে পাঁচ/ছয় দল পরস্পর পরস্পরে চেয়ে উত্তম উত্তম খাদ্য নিয়ে আসে এবং তাদের আনিত সেই খাদ্য খাবার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে তাহলে কি করবে? সবগুলো খাদ্য খাবে নাকি? সবগুলো খেলে তো মরে যেতেই হবে। তখন তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার কি না। তিনি বেশি আহারের দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষণীয় সুন্দর একটি ঘটনার আলোকপাত করেন। আমি দাদুর কাছে শুনেছি, নিকুঞ্জ বাপ নামে এক বৃদ্ধ লোক কোন একদিন নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। যথারীতি নিমন্ত্রণের কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে অতিথি আপ্যায়ন শুরু করা হয়। ঘটনাক্রমে ভোজনকালীন অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে খুব সুস্বাদু দইও পরিবেশন করা হয়। এদিকে বৃদ্ধ নিকুঞ্জবাপ দধি স্বাদের লোভ সামলাতে না পেরে খুব বেশি খেতে শুরু করে ফেলল। শেষমেশ এমনভাবে উদরপূর্ণ করলো যে, আসন ত্যাগ করতে অক্ষম হল এবং উদর যন্ত্রণায় ছটপট ও গড়াগড়ি দিতে লাগল। তার সে বেহাল অবস্থা দেখে লোকজন একজন বৈদ্য দেখে নিয়ে আসল। বৈদ্য তার শরীর পরীক্ষা করে দেখে কোন রোগের হদিশ ফেল না; তবে এটা নিশ্চিত হল যে বেশি ভোজন করার জন্য তার এ' অবস্থা হয়েছে। বৈদ্য নিকুঞ্জবাপকে বমন করার ব্যবস্থা করালে নিকুঞ্জবাপ নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে নিকুঞ্জবাপ আস্তে আস্তে স্থান করল (এ কাহিনী বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাসি শুরু করে দিল)।

বনভঙ্কে বললেন-তোমরা ভোজনের মাত্রাজ্ঞান উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কর। ভোজনের মাত্রাজ্ঞান হয়ে অল্পই ভোজন করবে।

বৃদ্ধ নির্জনে বাস করাকে সর্বদা প্রশংসা করতেন এবং ভিক্ষুদেরকে নির্জনে অবস্থান করে সাধনারত হতে উপদেশ দিতেন। কারণ নির্জন স্থানে খুব সহজে চিন্তকে সাধনায় নিমগ্ন করতে পারে, তুষ্ণীভাব অনুশীলন সহজ হয়। তোমরা মাঝে মাঝে বেশি কথা বল, তৎদ্বারা প্রমাণ হয় তোমাদের মধ্যে অনেকেরই তুষ্ণীভাব শিক্ষা হয়নি। তুষ্ণীভাব শিক্ষা হলে বেশি কথা বলাকে দুঃখ, অজ্ঞান বলে জানবে। যারা বেশি কথা বলে তারা অনেক মিথ্যাবাক্যও বলে থাকে। তোমরা সাধারণ ভিক্ষু, সাধারণ মানুষ হলে বেশি কথা বলবে। তাই তো বলি তোমরা অসাধারণ, স্বাধীন হয়ে সুখে শান্তিতে অবস্থান কর। সাধারণ হলে দুঃখ পাবে, অতিরিক্ত দুঃখ ফেলে মনচিন্তা পাপের দিকে ধাবিত হবে। মারের প্রলোভনে পড়ে অকুশলকর্মে নিয়োজিত থাকলে অসাধারণ হওয়া যায় না।

মারের প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই অসাধারণ, স্বাধীন হওয়া যায়। অসাধারণ অর্থ নির্বাণরাজ্য, সাধারণ অর্থ মাররাজ্য। যারা সাধারণ বা মাররাজ্যে অবস্থান করতেছে মার তাদেরকে লোভ, ঘেঁষ, মোহ আচ্ছন্ন করে ভব সংসারে গ্রেপ্তার করে রেখেছে। আমি তো দেখতেছি, কী ভিক্ষু, কী শ্রমণ, কী দায়ক, কী দায়িকা সবাইকে মার গ্রেপ্তার করে ফেলেছে। তাই কেহ মাররাজ্য ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্যে যেতে পারতেছে না। নির্বাণ লাভের জন্য তোমরা সবাই নির্বাণের ট্রেনিং নিয়ে ফেল। সে ট্রেনিং কি রকম জান? আত্মদমন, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন। আত্মদমন, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন হলে নির্বাণের ট্রেনিং পূরণ হয়, তাতে পরম সুখ লাভ করা যায়। অদমিত আত্ম, অদমিত চিত্ত, অদমিত ইন্দ্রিয় মনুষ্যগণের পরম শত্রু। কারণ আত্ম-চিত্ত-ইন্দ্রিয় অদমিত হলে মনচিত্ত সর্বদা বিবিধ অকুশলকর্মে নিয়োজিত হয়। সেই মনচিত্ত দ্বারা কুশল, মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদিত হবে এমন আশা করা নিষ্ফল। নির্বাণের ট্রেনিং শেষ হলে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা পূরণ করতঃ নির্বাণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা শিক্ষা দ্বারা কায় সংযম, বাক্ সংযম, মন সংযম করতে পারলে নির্বাণের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। যারা অসংযম তাদের দ্বারা সুচরিত্র গঠন করার আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে যারা সংযমী তারা কখনো দুঃশীল হতে পারে না। আবার সংযমশীল ব্যক্তির জ্ঞান, পুণ্য সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা নির্বাণ গমন মার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম। নির্বাণের শিক্ষা (সংযমতা) শেষ হলে নির্বাণের উপদেশ স্বীয় চিত্তে গঠন করতে হবে। সেই উপদেশ কি? সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ হল নির্বাণের উপদেশ। যথা-চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোদ্ধাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই সাইত্রিশ প্রকার ধর্মসমূহ পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে নির্বাণের উপদেশ সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ নৈর্বাকিকধর্ম সমূহ তার অবগত হয়ে থাকে। নির্বাণের উপদেশের পর নির্বাণের জ্ঞান লাভ করতে হবে। সেই জ্ঞান কি? আসবক্ষ্য জ্ঞান। এ জ্ঞান লাভ হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ চিত্ত থেকে সকল প্রকার আসবসমূহ সমূলে ধ্বংস হয়ে ইহলোকে নির্বাণ উপলব্ধি হয়। তাই তো তোমাদেরকে বলছি, নির্বাণের ট্রেনিং, নির্বাণের শিক্ষা, নির্বাণের উপদেশ, নির্বাণের জ্ঞান অর্জন করতঃ নির্বাণোলব্ধি পরম সুখে অবস্থান কর। তখন আর কোন কিছু করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে না। কারণ চিত্ত তখন সর্বদা অনাবিল সুখের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। এভাবে তোমরা মারের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন, পদদলিত করে মারকে পরাজিত কর।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়ে অতীতের কিছু কিছু অন্ধকার কুসংস্কার সমাজ থেকে খসে পড়েছে সত্যি। তবে মানুষের

জীবনে আকাঙ্ক্ষিত মনের শান্তি বা উৎকর্ষ সাধন এখনো হয়নি। বরঞ্চ বস্তুবিজ্ঞান ভোগের দিকে আকৃষ্ট করাচ্ছে মানুষের মনকে। কিন্তু প্রকৃত সুখ বস্তুর মধ্যে নয়, মনেই। ভোগ বিলাসী ও পরনিপীড়ন শীল হলে মন কখনো পবিত্র থাকে না। আর অপবিত্র চেতী মানবের কি সুখ লাভ হয়? তাই ভোগ্য বস্তুর দিকে প্রাধান্য না দিয়ে মনের শান্তির দিকে প্রাধান্য দেওয়া পণ্ডিত ব্যক্তির আদি কর্তব্য। আবার, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিহারে এসব ফ্যান, এয়ার কন্ডিশন, টেপ রেকর্ডার, মাইক, কম্পিউটার আমাকে দান দিয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতি না হলে এসব দান করা সম্ভব হতো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসবের মধ্যে তো কোন সুখ নেই। উপরন্তু এ সকল দানীয় বস্তু লোভ চিন্তে গ্রহণ করলে এবং তাতে আকৃষ্ট হলে মৃত্যুর পর নিরয়গামী হতে হবে। আমি দাতাদের সুখের জন্য এ সকল দানীয় বস্তু নির্লোভ চিন্তে গ্রহণ করে থাকি মাত্র। তোমাদেরকেও বলতেছি সাবধান দানীয় বস্তুর প্রতি নির্লোভ হয়ে অবস্থান করবে, নতুবা লোভ চিন্তে মৃত্যুবরণ করে নিরয়গামী হলে আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না। আমি তো তোমাদেরকে লোভের কুফল সম্পর্কে বারবার উপদেশ দিচ্ছি তোমরা যদি আমার কথা অবাধ্য কর তাতে আমার দোষ হবে না। কারণ শত্রুর আক্রমণ দ্বারা বিপদের পড়ার মুহূর্তে পালাবার রাস্তা বিদ্যমান অবস্থায় পলায়ন না করলে রাস্তার কোন দোষ থাকে না। ঠিক তদ্রূপ আমি দুঃখ হতে মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করে দেওয়ার পরও যদি তোমরা সেই নির্দেশ অনুসরণ না কর তাহলে কি আমার দোষ হবে?

তোমরা চীবর, পিণ্ডপাতের জন্য জীবন ধ্বংস হলেও কারোর নিকট যাচঞাশীল হও না। আমি জঙ্গলে অবস্থান করাকালে ছেড়া, পুরাতন চীবর পরিধান করেছিলাম তবুও কারোর কাছে থেকে চেয়ে নিইনি। কারণ বুদ্ধের উপদেশ মত, কোন কিছু চেয়ে নেওয়া হীনতার লক্ষণ। নিজের পারমী থাকলে আপনা-আপনি যে কেহ জন এসে দান করবে। সেরূপ দায়কের স্বতস্কৃতভাবে দেওয়া দানীয় সামগ্রীতে সন্তুষ্ট থেকে অবস্থান করলে ভিক্ষুর সম্যক জীবিকা রক্ষা হয়। তোমরা প্রব্রজিত হয়ে যদি বুদ্ধের উপদেশসমূহ অনুশীলন না কর তাহলে দুঃখের মধ্যে থাকতে হবে। এবং বুদ্ধের উপদেশসমূহ বিশ্বাস না কর তাহলে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। যেহেতু একমাত্র বুদ্ধের উপদেশেই নির্বাণ যেতে পারেই, অন্য কোন গুরুর উপদেশে নির্বাণ যাওয়া সম্ভব নয়। আবার নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে সুখ-দুঃখের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন যতক্ষণ নির্বাণের জ্ঞান না জন্মাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচিকিৎসা বা সন্দেহ কারোর দূরীভূত হয় না। নির্বাণের জ্ঞান বা আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ হলে কোন সন্দেহ আর থাকে না। অন্যদিকে এ' দেহ থেকে যাবতীয় সন্দেহের উৎপত্তি

হয়। তাই দেহকে ত্যাগ করতে চেষ্টাশীল হও। অবিদ্যা বিদ্যমান থাকলে দেহধারণ করতে হয়। এবং এ দেহকে ত্যাগ করা যায় না। অবিদ্যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন সুখ নেই তবু সুখে অস্তিত্ব খোঁজে বেড়ায়। এই দেহ যে প্রকৃতপক্ষে আপন নয় তা' বুঝে না। বরং এ দেহকে আপন বলে মনে করে এবং দেহ আপন বলে দৃঢ়ভাবে ধরে নেয়। তাই বারবার পুনঃজন্ম হয়ে দেহধারণ করতেই থাকে। অন্যদিকে তৃষ্ণা বিদ্যামানে এ' দেহে সুখ ভোগ করতে ইচ্ছা জাগে। এক কথায় অবিদ্যা, তৃষ্ণার কারণে সত্ত্বগণ পুনঃপুন দেহধারণ করে থাকে। অবিদ্যার কাজ হল দেহধারণ করা, আর তৃষ্ণার কাজ হল দেহে সুখ ভোগ করা। তবে বিদ্যা উৎপত্তি হলে দেহধারণ নেই, সুখ ভোগ করার তৃষ্ণা থাকে না। তাই অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপত্তি করে সুখ ভোগ করা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে সংসারচক্রে অনবরত ঘূর্ণিমান দেহধারণ করা হতে উদ্ধার হওয়া সম্ভব। সংসারচক্রে বারবার দেহধারণ করা নিতান্ত দুঃখের ব্যাপার। এই দেহধারণ হতে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, বিলাপ, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, ঈষ্পিত বস্ত্র অলাভ দুঃখ সহ কত প্রকার দুঃখ যে ভোগ করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। পুনঃ জন্মগ্রহণ না করলে এসব দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তদ্ব্যতীত বুদ্ধ বলেছেন যে জন্ম গ্রহণের দরুন চক্রবর্তী সুখ, দেবেন্দ্র সুখ লাভ করেও পুনঃ দরিদ্র কুলে জন্ম নিতে হয়; কেবল তা' নয় তির্যককুল, প্রেতকুল, অসুরকুল এবং ঘোরতর দুঃখপূর্ণ নরকে উৎপন্ন হতে হয়; সে জন্মগ্রহণ হতে মুক্তি লাভের জন্য নির্বাণের অনুসন্ধান করা উচিত নহে কি? হ্যাঁ অবশ্যই তাই। আমি বুদ্ধের এ কথা বিশ্বাস করি। কারণ চক্রবর্তী রাজা, ইন্দ্ররাজা সুখ ভোগ করার পর যদি নরকে পতিত হয়ে দুঃখ পেতে হয় তাহলে চক্রবর্তী রাজা, ইন্দ্ররাজা সুখের কী প্রয়োজন। কিছুকাল সুখ ভোগ করে যদি অনন্তকালের জন্য দুঃখ পেতে হয় সেই সুখের মূল্যই বা কোথায়! তাই তোমরা পুনঃজন্মগ্রহণ করে দুঃখের দিকে পা বাড়াতো না। সত্ত্বের পুনঃজন্ম নিরোধ কর, তৃষ্ণা ধ্বংস কর, তাতে প্রকৃত সুখ মিলবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-এ'দেহকে শত্রুরূপে দর্শন কর, পূর্ণজন্ম গ্রহণ করাকেও শত্রু জ্ঞান কর। যেমন ধর, অনেকে বলে থাকে অমুক হিংসা করে। বৌদ্ধ মতে হিংসানলে পতিত হবার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দেহধারণ করা হয় বলে অন্যের রোষানলে পড়তে হয়। দেহধারণ না করলে কিভাবে অন্যের রোষানলে পড়বে? সুতরাং এ' দেহই মানবের প্রকৃত শত্রু। অন্যদিকে পুনঃজন্ম নিরোধ না হলে দেহধারণ করতে হয় তাই পুনঃজন্মও মানবের প্রকৃত শত্রু বলে জানবে। দেহধারণ না করলে যেমন শত্রু নেই পূর্ণজন্ম গ্রহণ না করলেও শত্রু নেই। তাই তোমরা দেহ ত্যাগ কর, পুনঃজন্ম নিরোধ

কর। আমি ধনপাতায় সাধনাকালে দেহের মমতা ত্যাগ করে অবস্থান করতাম। একাহারী, শয্যাবিহীন, অনিদ্রাই কেটে যেত আমার দিনকাল। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার ঝড়ো বাতাস-রৌদ্র-শীতের কিরণকে বরণ করে নিতাম স্ব ইচ্ছায়। এভাবে দেহের মমতা ত্যাগ করে কঠোর সাধনা দ্বারা আমি লোকোত্তর জ্ঞান স্তরে উন্নীত হতে পেরেছি। দেহের মমতা ত্যাগ করতে না পারলে জঙ্গলে অবস্থান করে সাধনা করা যায় না। জঙ্গলে অবস্থান করতে হলে দেহের মমতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হয়। দেহের প্রতি মমতা থাকলে জঙ্গলে অবস্থান করাকে কষ্টকর, দুঃখ, কঠিন বলে মনে হয়। তখন মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় আমার দেহ কৃশ হয়েছে, আমি মরব কিনা? দেহ দুর্বল হয়ে গেলে কিভাবে সমাধি করব? ইত্যাদি ভাবে মনে দুর্বলতা ভাব আসে। যার ফলে জঙ্গলে অবস্থান করতে আর মন রমিত হয় না। তাই আবারো বলছি, তোমরা দেহের মমতা ত্যাগ করে নির্বাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

নির্বাণরাজ্যের জন্য ভিসা প্রস্তুত কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মেলনের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন-তোমরা সত্য-মিথ্যা যাচাই কর, জ্ঞান-অজ্ঞান পরীক্ষা কর। হুজুগ বশত আন্দাজ করে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। তোমরা সত্য হলে গ্রহণ কর, জ্ঞান হলে গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে মিথ্যা, অজ্ঞান হলে তা' পরিত্যাগ কর। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাচাই, পরীক্ষা করেই গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে যাচাই, পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। অজ্ঞানী ব্যক্তির ছয়টি দোষ বিদ্যমান থাকে। তারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য; জ্ঞানকে অজ্ঞান, অজ্ঞানকে জ্ঞান; ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বলে। তারা গাছকে বাঁশ, বাঁশকে গাছ বলা তুল্য করে থাকে। তোমরা জ্ঞানী হয়ে যা সত্য, ন্যায়, জ্ঞান, তা গ্রহণ কর। যদি সে কাজে সফলতা লাভ কর তাহলে সুখের অধিকারী হতে পারবে। তোমরা কি সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় যাচাই করতে পারবে? যদি জ্ঞানী হয়ে থাক তাহলে অবশ্যই পারবে আর অজ্ঞানী হলে পারবে না। কারণ অজ্ঞানীরা সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় এ বোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ এখন অজ্ঞান ত্যাগ করে জ্ঞানী হও, মিথ্যা ত্যাগ করে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাক, এবং নির্বাণ লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাক। আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন করা প্রব্রজিতদের অন্যতম আসল কর্তব্য।

দমন অর্থ পাপ হতে বিরত হওয়া। এ পাপ বিরত থেকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা পূরণ হয়। তাতে শীল কি, কিভাবে শীল রক্ষা করতে হয় সে সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মায়। সমাধি কি, কিভাবে সমাধি অনুশীলন করতে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মায়। এবং প্রজ্ঞা কি, কিভাবে প্রজ্ঞা বর্জিত, বহুলীকৃত করতে হয় সে সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মায়। আমি আমার স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ থেকে এসব উপদেশসমূহ তোমাদেরকে বলে থাকি, এগুলো কোন পুস্তক থেকে নয় বা কারোর বাণী শুনেও নয়। তোমাদেরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা কি তা আগে জানতে হবে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা কি তা আগে যথাযথভাবে জেনে তবেই শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা পূরণ করতে হয়। যেমন কমলা খেতে হলে আগে কমলা চিনতে হবে। কমলা চিনতে না পারলে কমলা খাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক তদ্রূপ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা আগে যথার্থরূপে চিনতে, জানতে হবে নচেৎ তা আচরণ করা যাবে না। অন্যদিকে আত্মদমন, চিত্তদমন ইন্দ্রিয়দমন হলে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা চেনা যায়, জানা যায়, অনুশীলন বা পূর্ণ করা সহজ হয়। তাই বুদ্ধ উদানে বলেছেন-

প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর আদি কর্ম ইন্দ্রিয়দমন,
সন্তোষ, প্রাতিমোক্ষ শীল আচরণ।
শুদ্ধজীবী অনলস কল্যাণ আকাজক্ষী,
মিত্রের সংসর্গ তরে হবে অভিলাষী।

বৌদ্ধধর্মের মূল মর্ম পরধর্ম অনুশীলন না করা, পরকর্মে নিয়োজিত না থাকা; সদ্ধর্ম অনুশীলন করা, নিজের কাজ করা। লোভ, দ্বেষ, মোহের সহিত ধর্ম করলে তা পরধর্ম হয়। বর্তমানে প্রায় সবাই পরধর্ম, পরকাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। সবাই লোভ, দ্বেষ, মোহাচ্ছন্ন। পরধর্মে ভোগ করার আকাজক্ষা থাকে, কিন্তু সদ্ধর্ম সম্পূর্ণ ভোগ বিরোধী। লোভ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত হয়ে ধর্ম করলে সদ্ধর্ম হয়। যারা সদ্ধর্ম অনুশীলন করে তারা কখনো ভোগ সুখের আকাজক্ষা করে না। কারণ ভোগের পরিমাণ খুব দুঃখদায়ক, এবং সুখের ইচ্ছা করলে দুঃখের মধ্যে পতিত হতে হয়। সুখ ভোগে কখনো চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না। অন্যদিকে, বুদ্ধ বলেছেন সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ, সদ্ধর্ম লাভ করা দুষ্কর। সহজে সদ্ধর্ম শ্রবণ করা যায় না এবং সহজে সদ্ধর্ম লাভও হয় না। তবে একমাত্র সদ্ধর্ম শ্রবণে ও সদ্ধর্ম লাভে সুখ হয়, জ্ঞান উদয় হয়।

এ জগতে মনুষ্য লাভ করা দুর্লভ, বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্ম লাভ করা তদপেক্ষা দুর্লভ। তোমরা মানুষ বলে গ্রন্থজ্ঞা গ্রহণ করতে পেরেছ, বুদ্ধের শাসনে সদ্ধর্ম চর্চা করতে পারছ। এটা তোমাদের পরম সৌভাগ্যে লক্ষণ। মনুষ্য না হয়ে অন্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করলে এসব করা সম্ভব হতো না। তোমরা

মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে একটা দুর্লভ বিষয় লাভ করেছে এখন তোমাদের কর্তব্য হল আরো দুর্লভ বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্ম লাভের অধিকারী হওয়া। তোমরা পারবে তো? উপস্থিত সকলে বলে উঠলেন ‘হ্যাঁ ভগ্নে পারবো।’ শ্রদ্ধেয় বনভগ্নে বলতে লাগলেন—বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্ম লাভে প্রকৃত সুখ লাভ হয়। এই সুখ অনবদ্য সুখ, এখানে কোন দুঃখ মিশ্রিত নেই। বুদ্ধের সাক্ষাৎ (শব্দের) অর্থ জ্ঞানকে দর্শন করা; সদ্ধর্ম লাভ অর্থ সদ্ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম করা, যথাযথরূপে জানা, বুঝা, অধিগত করা। এখন প্রশ্ন করতে পার কিভাবে বুদ্ধের সাক্ষাৎ, ধর্মলাভ হয়? বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জগতের সবকিছুতে অনাসক্ত থাকতে পারলে, সকল প্রকার তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্ম লাভ করা সম্ভব।

বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
রূপরূপ দেখ ঘৃণ্য অশুভ লক্ষণ।
বেদনার অনুভূতি দুঃখ হাহাকার,
ক্ষণেতে ভোজবাজি অনিত্য অসার।
সংজ্ঞা, চেতনা চিন্তের বিজ্ঞান,
বিদর্শনে তৃষ্ণা দৃষ্টি হবে অন্তর্ধান।
অশুভ লক্ষণ যবে দেখ বারংবার,
নিত্য নয় শুচিরূপ সকলি অসার।
স্মৃতি জ্ঞানে চারি সত্য করহ উদ্ধার,
দুঃখের স্বরূপ সত্য দেখ পুনর্বার।
দুঃখের মূল হেতু তৃষ্ণা সমুদয়,
হেতুর নিরোধে রুদ্ধ দুঃখ উপচয়।
দৃঢ়চিত্তে বিধিমত স্মৃতি বিদর্শনে,
তৃষ্ণা দৃষ্টি চ্যুতি হবে জ্ঞান বৃদ্ধি সনে।
ভাবনা প্রণালী যথা হইল বর্ণন,
শান্তির সন্ধানে প্রজ্ঞার দর্শন।

তোমরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এই দেহকে অশুচি, ঘৃণ্যরূপে দর্শন কর; দেহ কখনো ভোগের যোগ্য নয়। বরঞ্চ দেহ ত্যাগেরই যোগ্য। পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বর্ণালঙ্কার, নানা ধরনের প্রসাধনী বস্ত্র দ্বারা সাজ-সজ্জা করলেও দেহ অশুচি পদার্থে ভরা। নিত্য পায়খানা-প্রস্রাব, কফ, খুথু, সিকনি, ক্রেন্দ এসব ঘৃণিত পদার্থ দেহ হতে নির্গমন হয়। আবার, বেদনাসমূহও দুঃখই বলে জানবে। বেদনা প্রধানত তিন প্রকার, যথা—সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা। সুখ বেদনা বর্তমানে দুঃখ নয় বটে, কিন্তু ভাবী দুঃখ। অর্থাৎ এই সুখ বেদনা একদিন দুঃখে পরিণত হয়, তাই সুখ বেদনাও দুঃখ আর্যসত্য বলে পরিগণিত। অন্যদিকে সুখ বেদনা

সুখের বন্ধন, দুঃখ বেদনা দুঃখের বন্ধন; এ' সুখ-দুঃখ উভয় বন্ধন হতে মুক্তকেই নির্বাণ বলা হয়। স্বর্গ, ব্রহ্ম সুখের বন্ধন, চারি অপায় দুঃখের বন্ধন, মনুষ্যালোক সুখ ও দুঃখের বন্ধন—এই সর্ববিধ বন্ধন হতে মুক্ত হলে নির্বাণ লাভ হয়। অর্থাৎ একত্রিশ প্রকার লোকভূমিতে চিন্তকে আবর্তন করতে না দিলে সুখ, দুঃখ উভয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করা যায়। তোমরা সুখকে অতিক্রম কর, সুখের মধ্যে অবস্থান করবে না আর দুঃখকে অতিক্রম করে দুঃখের মধ্যেও অবস্থান করবে না। এভাবে সুখ, দুঃখ অতিক্রম করতে পারলে নির্বাণ লাভ হয় বলে জানবে। তোমরা যে প্রব্রজিত হয়েছ তার মূল উদ্দেশ্য কি জান? সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে যে কোন অবস্থায় অনাসক্তভাবে থাকতে। সকল প্রকার বেদনায় তৃষ্ণা উৎপন্ন না করে থাকতে পারলে প্রব্রজিত জীবনে সার্থকতা হয়, অন্যথায় নয়।

তোমরা আমি, আমার, আমিত্ব ভাব ত্যাগ কর। আমি, আমার, আমিত্ব বলে সুখ ভোগ করবে না, বরঞ্চ সুখ ভোগকে ত্যাগ কর। মাররাজ্য ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করতে চেষ্টাশীল হবে। তবে মাররাজ্য ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্যে পৌছা খুব কঠিন, কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মাররাজ্য অতিক্রম করতে গেলে মার বিবিধ প্রকারে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে দেয়, প্রলোভন দেখায়। এবং তার রাজ্য অতিক্রম করতে দেয় না। উপরন্তু অকুশলকর্ম সম্পাদন করায়ে, সুখ ভোগের মধ্যে সত্ত্বগণকে ভবচক্রে বেঁধে রাখা মারের কাজ। তোমাদের মনচিন্তে যদি রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি এই পাঁচটি বিদ্যমান থাকে তাহলে মার তোমাদেরকে ভবচক্রে বেঁধে রাখবে। রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা মার সত্ত্বগণকে ভবচক্রে আবদ্ধ রেখে নির্বাণ লাভ করতে দেয় না। যদি তোমাদের মনচিন্তে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি বিদ্যমান থাকে তাহলে জানবে তোমরা মারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছ। তখন কিছুতেই মাররাজ্য ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্যে পৌছতে পারবে না। আর তোমাদের মনচিন্তে মধ্যে যদি সেই পাঁচটি বিদ্যমান না থাকে তাহলে তোমরা মার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণরাজ্যে পৌছতে সমর্থ হবে। তা তোমাদেরকে বলছি, তোমরা স্বীয় মনচিন্ত থেকে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি ভাব দূরীভূত কর। তাতে মারের বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এবং মাররাজ্য অতিক্রম করে নির্বাণরাজ্যে পৌছতে সমর্থ হওত অনাবিল সুখের অধিকারী হতে পারবে।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা যদি সত্যিই নির্বাণরাজ্যে যেতে ইচ্ছুক হও তাহলে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন কর। এসব জ্ঞান হল নির্বাণরাজ্যে যাবার ডিসা। তোমরা তো বর্তমানে

মাররাজ্যে অবস্থান করতেছ। কাজেই নির্বাণরাজ্যেই যেতে হলে নির্বাণের ভিসা প্রয়োজন হবে। যেমন বাংলাদেশের নাগরিক যদি ভারতে যেতে চায় তার ভিসা প্রয়োজন হয়। ভিসা ব্যতিরেকে কিছুতেই বৈধভাবে যেতে পারবে না। কারণ এক দেশের নাগরিক অন্যদেশে যেতে হলে সেই দেশের ভিসার প্রয়োজন হয়- এটাই নিয়ম। আইন অমান্য করে কেহ নিজের দেশের বাইরে অন্যদেশে প্রবেশ করলে তা অবৈধ বলে পরিগণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার হয়ে জেল হাজতে যেতে হবে। এখানেও ঠিক তদ্রূপ মাররাজ্য থেকে নির্বাণরাজ্যে যেতে হলে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এসব জ্ঞান ব্যতিরেকে নির্বাণরাজ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি হল নির্বাণ যাবার পাসপোর্ট, চারি আর্যসত্য জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান হল নির্বাণরাজ্যের ভিসা। নির্বাণরাজ্যে একবার পৌঁছলে আর ফিরে আসতে হবে না। তাই ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হয় না বা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। কারণ নির্বাণরাজ্যে পৌঁছে গেলে সেখান থেকে আর ফেরত আসা যায় না। এক দেশ থেকে অন্যদেশে তো চুরি করে যাওয়া যায়, কিন্তু নির্বাণরাজ্যে ভিসা ব্যতীত চুরি করে যাওয়া যায় না। তাই নির্বাণরাজ্যে যেতে হলে অবশ্যই ভিসা তৈরি করে যেতে হয়; অন্য উপায়ে নয়। তোমরা নির্বাণরাজ্যের ভিসা প্রস্তুত কর, নচেৎ নির্বাণরাজ্যে যেতে পারবে না। নির্বাণরাজ্যের ভিসা স্বরূপ চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন করে নির্বাণরাজ্যে পৌঁছে প্রকৃত শান্তিতে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যুদ্ধ জয় করে নির্বাণ যেতে হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-অরহতগণের আলস্য, তন্দ্রা, চঞ্চলতা সম্পূর্ণ বিধ্বংস হয়। যারা মার্গফললাভী নয় তাদের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে বলে আলস্য, তন্দ্রা ধ্বংস হয় না। বলা যায়, পৃথকজন পুদালেরা অজ্ঞানের অধীন বিধায় আলস্য, তন্দ্রা, চঞ্চলতাকে সুখ মনে করে। তাই তারা মনের মধ্যে আলস্য, তন্দ্রা, চঞ্চলতা ভাবকে অবস্থান করার জন্য স্থান করে দেয়। আলস্য, তন্দ্রা, চঞ্চলতা থাকলে ভাবনাদি কুশলকর্ম ছেড়ে অকুশলকর্মাদি সম্পাদনের দিকে মন ধাবিত হয়। কারণ আলস্য, তন্দ্রা ধ্যান-ভাবনায় অকর্মণ্যতা ভাব এনে দিয়ে সেই কর্মাদি সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে দেয়। আর চঞ্চলতা মনকে একান্তাভাব উৎপাদনে বিরত রাখে। যার ফলে ধ্যান-সমাধি, কুশলকর্ম

সম্পাদনে আর মন বসে না। আবার আলস্য, তন্দ্রাকে পরস্পর পরস্পরের পরম সখা বলা যায়। আলস্য, তন্দ্রা একে অপরের আশ্রয়েই থাকে। তাই আলস্য থাকলে তন্দ্রা থাকে, তন্দ্রা থাকলে আলস্যও থাকে। তন্দ্রা আসার পূর্বে আলস্য এসে প্রথমে শরীরকে অকর্মণ্য করে দেয়। শরীর যখন অকর্মণ্য হয় তখন তন্দ্রা এসে গভীর নিদ্রা রাজ্যে নিয়ে যায়। তাই বুদ্ধ আলস্য, তন্দ্রাকে কারাগার বলে অভিহিত করেছেন। কারাগারের কয়েদি যেমন মনের ইচ্ছামত কোন কিছু করতে পারে না ঠিক তদ্রূপ আলস্য, তন্দ্রা থাকলে কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে ধ্যান-সমাধি করা যায় না। ধ্যান-সমাধিতে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। ধ্যান-সমাধি করতে গেলে যে উৎসাহের প্রয়োজন হয় তন্দ্রা সেই উৎসাহকে গ্রাস করে দিয়ে নিরুৎসাহ ভাব এনে দেয়।

কারাগার তুল্য জান আলস্য তন্দ্রায়,
ধ্যানেতে জন্মায় বাধা কার্যে অন্তরায়।

আলস্য, তন্দ্রার কাজ কি জান? ধ্যান করতে বাধা সৃষ্টি করা, জ্ঞান লাভ করতে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া। তাই আলস্য, তন্দ্রাকে অন্যতম মারসেনা বলে জানবে। তোমাদের মনের মধ্যে আলস্য, তন্দ্রা ভাব উদয় হলে তা' সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে ফেলবে। কখনো মনচিণ্ডে স্থান করে দিবে না। সবসময় মনের মধ্যে উৎসাহ ও বীর্যভাব জাহ্নত করে রাখতে পারলে আলস্য, তন্দ্রা উৎপন্ন হতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-এ' বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত। অবিদ্যা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ঢেকে রেখেছে। তাই এ' ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম দেখতে পাওয়া যায় না। ঘন মেঘ যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকে আড়াল করে রেখে কিরণ প্রকাশ করতে বাধা দেয়। তবে জ্ঞান উদয় হলে অবিদ্যার সব আচ্ছাদন খুলে যায়। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানতে কোন অসুবিধা হয় না। কবির ভাষায়-

লুকিয়ে থাকে মেঘের গায়ে ক'দিন বল পূর্ণশশী,
যেদিন উঠে ভীষণ ঝড়, যেদিন মেঘে দেয়রে রর;
তখন পূর্বের মতন চাঁদের কিরণ উঠে প্রেমের হাসি।

অর্থাৎ মেঘ কখনো পূর্ণিমার চন্দ্রকে সারাক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না। এক সময় যখন মেঘ সরে যায় তখন চন্দ্রের কিরণ প্রকাশিত হয়ে পৃথিবী আবার আলোকিত হয়। ঠিক তদ্রূপ তোমরাও কতদিন অবিদ্যা অন্ধকারে থাকবে? যদি তোমরা বুদ্ধের উপদেশ মত শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা নিরলসভাবে অনুশীলন করতে থাক তাহলে অবিদ্যার অন্ধকারে বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। তোমাদের জ্ঞান উদয় হবেই। তখন আর অবিদ্যা অন্ধকারে কিছুতে নিমজ্জিত

থাকতে হবে না। জ্ঞানের দ্বারা মারের সকল প্রকার অন্তত শক্তি অতিক্রম করে অবিদ্যা ভেদ করতঃ তোমরা অসীম জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে। তাই তোমরা সবাই আমার সঙ্গে কঠ মিলিয়ে বল, আমরা আর অবিদ্যা অন্ধকারে থাকব না জ্ঞান উদয় করব। সে জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত করে অসীম জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবো। এতে আমাদের নির্বাণ লাভ হবে।

তোমাদেরকে নির্বাণ যেতে হলে যুদ্ধ করতে হবে। সেই যুদ্ধ কি রকম জান? সর্ব প্রথমে স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আমি স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারী হবো না। স্ত্রীলোক শত সহস্রভাবে প্রলুদ্ধ করলেও প্রলোভনে মুগ্ধ হবো না। স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসারী জীবন-যাপন করাকে বা তাদের সাথে অবস্থান করাকে সুখ বলে মনে করব না। স্ত্রীলোকের সাথে কোন সম্পর্ক রাখব না, এবং তাদের কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, অঙ্গ-ভঙ্গিমায় কোন প্রকার আসক্তি উৎপাদন করব না। এভাবে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে জাত সকল বিষয় ত্যাগ করে থাকতে পারলে প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ হলে বলে জানবে। যদি স্ত্রীলোকের প্রলোভনে ফাঁদে পড়ে তাদেরকে বিয়ে কর তাহলে তোমরা প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলে বলে জানবে। তবে স্ত্রীলোকেরা তাদেরকে বিয়ে করার জন্য বাধ্য করাতে চেষ্টা করবে। স্ত্রীলোকেরা কি বলবে জান? তোমার বাবা বিয়ে করেছে তুমি কেন করবে না, অবশ্যই করতে হবে (একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসির সরগোল পড়ে যায়)। তবে তোমাদেরকে আপন সংকল্পে সতর্ক থাকতে হবে। এমন কি স্ত্রীলোকেরা তোমাদেরকে বিয়ে করার জন্য নানাভাবে উত্থাপন করলেও তোমরা দৃঢ় চিন্তে অবস্থান করবে। আমি বলছি তোমাদের কর্তব্য হল স্ত্রীলোকের প্রলোভনে প্রলুদ্ধ না হয়ে তাদেরকে ত্যাগ করতঃ প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করা। স্ত্রীলোকের সাথে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করে করতে হয়। সেই যুদ্ধ কার সাথে? মারের সাথে। কারণ মার জ্ঞান লাভ করতে বাধা দেয়, সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হতে বাধা দেয় কুশলকর্ম সম্পাদনে বাধা দেয় এবং নির্বাণ যেতে বাধা দেয়। মারের কাজ হল অকুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করা, অকুশল বা অজ্ঞানমূলক কর্ম করাতে বাধ্য করা। তোমরা নির্বাণ যেতে চাইলে মার কি বলবে জান? নির্বাণ যেতে পারবে না। তোমরা অকুশল, অজ্ঞানমূলক কাজ করে সুখ ভোগ করতে থাক। এ' জগতে কতোই না ভোগ্য বিষয় রয়েছে। এসব বিষয় ভোগ কর, পরিভোগ কর। নির্বাণ লাভ করলে এগুলো কিছুই পরিভোগ করা হবে না। মারের সেসব বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে অকুশল হতে নিজেকে উদ্ধার করে সর্বোপরি জ্ঞান লাভ করে মারের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করতে হয়। অজ্ঞান অকুশলকে সুখ মনে না করলে, সংসারের প্রতি সকল আসক্তি ছিন্ন করলে মার যুদ্ধে পরাজিত হয়।

মারের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ আত্ম-এর সঙ্গে তৃতীয় যুদ্ধ করতে হবে। আত্ম বা আমি এ ধারণা থাকলে নির্বাণ লাভ হয় না। কারণ আত্ম এ ধারণা বিদ্যামানে অহংকার উৎপন্ন হয়। আত্ম বা আমি সর্বদা একের সঙ্গে অন্যের তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা অহংকারের কাজ। আমি এই ধারণাটুকু মনচিন্তে বিদ্যমান থাকলে অহংকার ত্যাগ করা যায় না। তাই আত্মকে পরাজিত করে মনচিন্তার মধ্যে অহংকার (আত্মকে) নিরোধ করতে হবে। আত্ম এ' ধারণাটুকু যখন মনের মধ্যে বিদ্যমান নেই তখন আমি বা অহংকার করার প্রশ্ন উঠে না। এভাবে মনচিন্তা থেকে আমি এ' ধারণাটুকু নিরোধ করে আত্মজয় করতে হয়। তাই প্রথম যুদ্ধে জ্বীলোক জয়, দ্বিতীয় যুদ্ধে মারজয়, তৃতীয় যুদ্ধে আত্মজয় করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ লাভ হয়। তাই আবারো বলছি, নির্বাণ লাভের জন্য তোমরা জ্বীলোক, মার, আত্মজয় কর। এগুলো জয় করতে না পারলে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। আর তখন জ্বীলোককে বিয়ে করে সংসারী হয়ে, মারের অধীন হয়ে অকুশল, অজ্ঞানমূলক কর্মে রত হয়ে এবং অহংকারের বশীভূত হয়ে বিবিধ দুঃখের সহিত অবস্থান করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তোমরা নির্বাণ লাভের জন্য সত্বর যুদ্ধ শুরু করে দাও। এবং একে একে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় যুদ্ধে জয়ী হয়ে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করে অবস্থান কর।

তিনি আরো বলেন-নানাদেশ, নানাজনপদ পরিক্রমায় কোন লাভ নেই। তোমরা নানাদেশ, নানাজনপদ পরিভ্রমণ করবে না। নানাজায়গা পরিভ্রমণ করে ঘুরে বেড়ানোকে দুঃখ বলে জানবে। এতে একদিকে যেমন ধ্যান-সমাধি করার সময় অপব্যয় হয়ে যায়, অন্যদিকে নানাবন্ধনেও জড়িত হতে হয়। চক্ষাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অসংযম হয়ে উঠে, সহজে ধ্যান-সমাধিতে মনে একাত্মতা ভাব লাভ হয় না। তাই তো নানাদেশ, নানাজনপদ ঘুরে এসে বহুভিক্ষু প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহী হয়ে যায়। কারণ খুব বেশি ঘুরাফেরা করলে চিন্তা চঞ্চল হয়ে উঠে। আর সে চঞ্চল চিন্তে সমাধি দুর্লভ হয়। জ্ঞানার্জন বহুকষ্ট সাধ্য এবং খুব সময় সাপেক্ষ হয়ে যায়। তোমরা একস্থানে বসেই ভাবনা কর, তাতে সহজে মনচিন্তে সমাধি লাভ হবে। একাত্ম চিন্তে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভাবনায় নিমগ্ন থেকে ধ্যান সুখে অবস্থান করতে সমর্থ হবে। বুদ্ধ বলেছেন নানাদেশ, নানাজনপদ ঘুরে বেড়ালে কোন ফল নেই। এবং নানাজনের নানা রুচিপূর্ণ করা দুঃখজনক। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী না হয়ে দিন রাত শুধুমাত্র ভাবনায় নিয়োজিত থাক। বেশি কথা ভাষণ করবে না, বেশি কথা ভাষণে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। সর্বদা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে নিজেকে পরিচালিত কর। তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব থাকবে না। অন্য কোন মার্গ অনুশীলন না করে সোজা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে পরিচালিত হলে সহজে নির্বাণ লাভ হয়। বহুপথ বহুমতের সৃষ্টি

হলে মানুষের মনে সন্দিহান ভাব এসে যায়, এবং কোন পথ অনুশীলন করা উচিত তা বুঝতে কষ্ট হয়ে পড়ে। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মার্গের বা রাস্তা মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র এই মার্গ দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়-অন্য কোন মার্গ দ্বারা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

তোমরা সর্বদা স্মৃতি বিদর্শনের মধ্যে অবস্থান কর। এটা বুদ্ধের অনুশাসন। যেখানে স্মৃতি, বিদর্শন নেই সেখানে বুদ্ধের অনুশাসনও নেই। সারাঙ্কণ স্মৃতি সহকারে অবস্থান করতে পারলে অতিসহজে চিত্ত দমিত হয়ে নির্বাণ লাভ হয়। স্মৃতি দ্বারা মনচিন্তকে অকুশল মুক্ত রাখা সম্ভব। অকুশল উৎপন্ন বন্ধ করে কুশল উৎপন্ন করা স্মৃতির কাজ। তাই একমাত্র স্মৃতিই পাপ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতে পারে। নিজেকে সমস্ত অকুশল হতে উদ্ধার করতেঃ অপরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বলা যায় এই স্মৃতি দ্বারাই জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। স্মৃতিতে অবস্থান না করলে ষড়ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বদা পাপ প্রবেশ করতে থাকে। স্মৃতি বিহীন চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-কায়-মন যে কোন মুহূর্তে অকুশলের দিকে ধাবিত হতে পারে। তোমরা ষড়ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা' কিছু আলম্বন গ্রহণ কর স্মৃতির মাধ্যমে সেসব আলম্বনসমূহ ত্যাগ কর। আলম্বন গ্রহণ করলে দুঃখ উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে, ষড়ইন্দ্রিয়ের আলম্বনসমূহ ত্যাগ করলে আলম্বনের প্রতি কোন আসক্তি উৎপন্ন হয় না। তোমাদেরকে কেহ যদি প্রশ্ন করে তোমরা প্রব্রজিত হয়ে কি সুখ লাভ করেছ? উত্তরে তোমরা বলবে আমরা ত্যাগ, নিরোধ, নিবৃত্তি, অনাসক্তভাবে অবস্থান করে অনাবিল সুখ লাভ করি। সকল প্রকার অকুশল বা অবিদ্যা, তৃষ্ণাসমূহ ত্যাগ করি। মনচিন্ত থেকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা নিরোধ করি। দশ প্রকার ক্লেশসমূহ নিবৃত্তি করি। এবং পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপের প্রতি অনাসক্তভাবে অবস্থান করি। এতে আমাদের পরম সুখ অনুভব হয়। ত্যাগ, নিরোধ, নিবৃত্তি, অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করাকে আমরা সুখ বলে থাকি। অবিদ্যা, তৃষ্ণা ত্যাগ, অবিদ্যা, তৃষ্ণা নিরোধ, দশক্লেশ নিবৃত্তি এবং নামরূপের প্রতি অনাসক্তভাবে থাকলে তবেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। সত্ত্বগণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা ত্যাগ, অবিদ্যা, তৃষ্ণা নিরোধ, ক্লেশ নিবৃত্তি, পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারে না বলে এত দুঃখে পতিত হয়। সে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, পঞ্চস্কন্ধ তাদেরকে নিত্য দুঃখ প্রদান করতেছে।

তিনি পরিশেষে বলেন-পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে জ্ঞাত হও; অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমুদয় আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে পরিহার কর; নির্বাণ নিরোধ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ কর; শমথ বিদর্শন মার্গসত্য উচ্চতর জ্ঞানে গঠন কর। অর্থাৎ দুঃখ সত্য জ্ঞাত হবে, সমুদয় সত্য ত্যাগ করবে, নিরোধ সত্য প্রত্যক্ষ করবে, মার্গসত্য ভাবনা করবে। তাহলে সঠিকভাবে বৌদ্ধধর্ম আচারণ

করা সহজ হবে। তোমরা সঠিকভাবেই বৌদ্ধধর্ম আচরণ কর, মিথ্যাভাবে আচরণ করবে না। তবে সঠিকভাবে বৌদ্ধধর্ম আচরণকারীর সংখ্যা বর্তমানে খুব কম। অধিকাংশই ভুলভাবে, মিথ্যাপথে আচরণ করতেছে। তাই দুঃখকে লাঘব করতে পারছে না, এবং আচরণ করতে গিয়েও কষ্টের শিকার হচ্ছে বা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। চারি আর্যসত্যকে যথাযথরূপে জেনে, বুঝে, হৃদয়ে ধারণ করে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা হয়। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে গেলে কোন প্রকার দুঃখের শিকার হতে হয় না। আর সঠিকভাবে আচরিত বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সকল প্রকার দুঃখ লাঘব হওত নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণ লাভ হলে কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। তখন সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত, স্বাধীন লাভ হয় বলে জানবে।

তোমরা বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হতে চেষ্টাশীল হও। বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হতে পারলে দেবতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হওত নির্বাণ লাভ করতে পেরেছেন তিনি দেবতা, ব্রহ্ম হতে উৎকৃষ্ট পুদগল বলে জানবে। কিভাবে বিদ্যাচরণ সম্পন্নতা লাভ হয়? জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ, আবাহ-বিবাহ ত্যাগ করতে পারলে বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হওয়া যায়। বিদ্যাচরণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা, মার কেহ পরাজিত করতে পারে না। তারা নিজের যেমন উন্নিত সাধন করতে সক্ষম, তেমনি অপরকের উন্নিত সাধন করায় দিতে সমর্থ হন।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা এম. এ. পাশ রূপ অরহত লাভ করতে চেষ্টাশীল হও

একসময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিকভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—তোমরা কেন বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হয়েছ? প্রব্রজিত হবার আসল উদ্দেশ্য কি জ্ঞান? জ্ঞান লাভের জন্য, কুশল অর্জন করার জন্য। প্রব্রজিত হবার আগে তোমাদের জ্ঞান ও কুশলের ঘাটতি ছিল। তাই জ্ঞান, কুশলের বলীয়ান হতেই প্রব্রজিত হয়েছ। সেই জ্ঞান কি? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান। আর কুশল কি? চারি আর্যসত্য, অপ্রমাদে কুশল। জগতে যত প্রকার কুশলধর্ম আছে তন্মধ্যে চারি আর্যসত্য, অপ্রমাদে কুশল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান এবং কুশলেই বলীয়ান হতে পারলে প্রব্রজিত জীবন সার্থক হয়। প্রব্রজিত হয়ে যদি জ্ঞান, কুশল অর্জন করতে সমর্থ না হয় তাহলে প্রব্রজিত হওয়া মূল্যই থাকে না। কারণ প্রব্রজিত অবস্থায় চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন করা এবং চারি আর্যসত্য, অপ্রমাদ কুশলের বলীয়ান হওয়া এমন কোন আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রব্রজ্যা

সেসব জ্ঞান ও কুশল অর্জন করা অনুকূল পরিবেশ। প্রব্রজিতগণ সহজেই সেসব জ্ঞানের চর্চা ও কুশল অর্জন করতে পারে। জ্ঞান চর্চা, কুশল সম্পাদন করতে প্রব্রজিতগণের তেমন কোন বাধা-বিপত্তি নেই। কারণ তারা মুক্ত আকাশের বিহঙ্গ সদৃশ। ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ মহাজ্ঞানীগণ প্রব্রজিত জীবনকে প্রশংসা করে থাকেন। আর জ্ঞানার্জন ও কুশল লাভের জন্য প্রব্রজ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে অভিহিত করেন। তোমরা 'আমি মানুষ' এধারণা, 'সে পুরুষ' এধারণা, 'সে মহিলা' এধারণা এবং আমি, আমার, আমিভূ বললে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান উদয় হবে না। এবং তোমাদের সংসারী হয়ে সুখ ভোগ করার ইচ্ছা থাকলে কুশল অর্জন হবে না। তাই জ্ঞান লাভ করতে হলে মনচিন্ত থেকে মানুষ, পুরুষ, মহিলা, আমি, আমার, আমিভূ এধারণা সমুদয় ত্যাগ করতে হবে। আর কুশল অর্জনের জন্য মনচিন্ত থেকে সংসারী ভোগ সুখের ইচ্ছাকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। মানুষ, পুরুষ, মহিলা, আমি, আমার, আমিভূ এ ধারণা সমুদয় ত্যাগ, নিরোধ হলে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ হয়। সংসারী সুখ ভোগ নিরোধ হয়ে গেলে কুশল অর্জন হয় আর তখন অনাবিল সুখের অধিকারী হওত প্রব্রজ্য জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়। এবং প্রব্রজিত হবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে যদি চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ না হয়; চারি আর্যসত্য অপ্রমাদ কুশল অর্জিত না হয় তাহলে প্রব্রজিত হবার মূল উদ্দেশ্য কিভাবে সার্থকতা হবে? তাই তোমরা প্রব্রজিত জীবনকে সার্থক করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, বিফলে যেতে দিও না।

তোমরা অজ্ঞান, অকুশল ত্যাগ করে প্রব্রজিত জীবনের বিপ্লব সুখের অধিকারী হও। অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত না থাকা এবং অকুশলকর্মে নিয়োজিত না থাকা প্রব্রজিতগণের আদি কর্তব্য। অজ্ঞান ত্যাগ করে কতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে? অকুশল ত্যাগ করে কতটুকু কুশল অর্জন করেছে? তা' তোমরা পরীক্ষা করে দেখ। যদি দেখ যে, অজ্ঞান ত্যাগ করে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে এবং অকুশল ত্যাগ করে কুশল অর্জন করতে পেরেছে তাহলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানবে। অন্যজনের কাছে পরীক্ষা দেওয়া তোমাদের কাজ নয়। বুদ্ধ বলেছেন-হে ভিক্ষুগণ! আপনাকে আপনি পরীক্ষা করবে। তাই তোমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে নিজেই নিজের সকাছে। আমার কতটুকু জ্ঞান অর্জন হলো? কতটুকু কুশল অর্জিত হলো? তা জ্ঞানের দ্বারা যাচাই করা তোমাদের কাজ। জ্ঞান, কুশল অর্জিত হলে পরীক্ষায় কৃতকার্য আর অজ্ঞান অকুশল বিদ্যমান থাকলে অকৃতকার্য হয়েছে বলে জানবে। আবার, জ্ঞান ত্যাগ করে অজ্ঞানের অনাগত হলে, কুশল ত্যাগ করে অকুশল কর্ম সম্পাদন করলে তোমরা পরীক্ষায়

ফেল করবে। যাতে পরীক্ষায় পাশ করতে পার তজ্জন্য চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান এবং চারি আর্যসত্য অপ্রমাদ কুশলে বলীয়ান হও।

নির্বাণ লাভের চারি সোপানকে তিনি বর্তমান স্কুল, কলেজ, বিশ্ব বিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত ডিগ্রীর সহিত তুলনা করে বলেন—স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ হল এস, সি, পাশ; সঙ্কদাগামী মার্গফল লাভ হল এইচ, এস, সি পাশ; অনাগামী মার্গফল লাভ হল বি, এ, পাশ; অরহত মার্গফল লাভ হল এম, এ পাশ। তোমাদের যদি স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ হয় তাহলে এস, এস, সি পাশ; সঙ্কদাগামী মার্গফল লাভ হলে এইচ, এস, সি পাশ; অনাগামী মার্গফল লাভ হলে বি, এ, পাশ; অরহত মার্গফল লাভ হলে এম, এ পাশ ডিগ্রী প্রাপ্ত হলে বলে জানবে। তোমরা যে প্রব্রজিত হয়েছ তা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সাথে তুলনা করা চলে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে কখনো এম, এ পাশ ডিগ্রী লাভ হয় না। প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বিতীয়.....বি, এ পাশ করার পর এম, এ পাশ করতে হয়। ঠিক তদ্রূপ এখানেও (প্রব্রজ্যা জীবনে) চিন্তের ক্রমিক গতি, ক্রমিক আচরণ, ক্রমিক শিক্ষা অভ্যাস হতে না হতে হঠাৎ অরহত লাভ করা যায় না। শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা আচরণ, ধারণ, পূরণ, বৃদ্ধি, বহুলীকৃত হলে তবেই অরহত মার্গফল লাভ হয়। বর্তমানে তোমরা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা, আচরণ, ধারণ, পূরণ করতে চেষ্টাশীল হয়েছ মাত্র। বৃদ্ধি, বহুলীকৃত এখনো অনেক দূরে রয়েছে। তিনি রসিকতা স্বরে বলেন—কে কোন শ্রেণীতে পড়াশুনা করতেছ বলতে পারবে? প্রশ্ন শেষে তিনি নিজেই বলেন এখনো কেহ সবেমাত্র স্কুলজীবন শুরু করেছে, কেহ বা কিছু শ্রেণী অতিক্রম করেছে। কেহ তো স্কুল জীবন শেষ করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখতে সক্ষম হতে পার নি। তোমরা সত্ত্বর অধ্যবসায়ী হয়ে মেধাবী হওত একের পর এক শ্রেণী অতিক্রম করে এম, এ পাশ করতে চেষ্টাশীল হও। এম, এ পাশ স্বরূপ অরহত লাভ করা বৌদ্ধধর্মের চরমও পরম লক্ষ্য।

তিনি আরো বলেন—তোমরা সুখ, দুঃখ উভয় ত্যাগ কর। মারভুবনে সুখ অনুভব করেও অবস্থান করবে না, দুঃখ অনুভব করেও অবস্থান করবে না। মূর্খগণ মারভুবনে আনন্দের সহিত আত্মহারা হয়ে সুখ অনুভব করে আর বিষাদের সহিত দুঃখের পীড়নে কাতর হয়ে অবস্থান করে থাকে। কিন্তু জ্ঞানীগণ সুখ-দুঃখ উভয়কে বন্ধনরূপে দর্শন করে সুখে যেমন আনন্দিত হন না, তেমনি দুঃখেও হতাশাগ্রস্ত কিছুই হন না। কারণ বর্তমানে যা সুখরূপে অনুভূত হয় সে সুখ একদিন থাকে না; অন্যদিকে বর্তমানে দুঃখরূপে হয়েও যা অনুভূত হয়, সে দুঃখও একদিন শেষ হয়ে যায়। কাজেই সুখ, দুঃখ উভয় অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী,

বিপরিমাণশীল। এভাবে সুখ, দুঃখ উভয়কে ত্যাগ করতঃ সুখের বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত এবং দুঃখের বন্ধন হতেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে নির্বাণ লাভ হয়। সুখ, দুঃখ উভয়ই মারভুবন। মারভুবনে অবস্থান করলে সুখ অনুভব করে যেমন থাকতে হয়, তেমনি দুঃখ অনুভব করেও থাকতে হয়। কিন্তু অমারভুবনে সুখও নেই, দুঃখও নেই। তোমরা মারভুবনে অবস্থান না করে অমারভুবনে চলে যাও। সেখানে অবস্থান করলে সুখ-দুঃখ উভয় ত্যাগ করতে সক্ষম হবে। মারভুবনে থাকলে সুখের অধীন, দুঃখের অধীন হয়ে অবস্থান করতে হয়। কাজেই সুখ, দুঃখকে ত্যাগ করা যায় না।

তোমরা নির্বাণ লাভের জন্য আত্মদমন, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন কর। আত্মদমন করা অর্থ আত্মকে জয় করা; চিত্তদমন অর্থ সকল প্রকার পাপ হতে চিত্ত মুক্ত রাখা; ইন্দ্রিয়দমন অর্থ ষড়্‌ইন্দ্রিয়ার দ্বারা কোন অকুশল উৎপন্ন না করা। আত্মজয়, চিত্তজয়, ইন্দ্রিয়জয় করতে পারলে পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। তাই তোমাদের কাজ হল নিজেকে নিজে দমন বা জয় করা; অপরকে দমন করা নয়। আত্মকে জয় করতে পারায় প্রকৃত জয়। বুদ্ধ বলেছেন, সংগ্রামে শত সহস্র মানুষ জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেষ্ঠ। কারণ আত্মজয় করতে পারলে নিজেকে সকল প্রকার পাপ হতে মুক্ত রেখে সুখ লাভ করা যায়। কিন্তু অপরকে জয় করলে নিজে কোন প্রকার পাপ হতে মুক্ত হতে পারে না, প্রকৃত সুখ লাভও হয় না। তোমরা আত্মদমন বা আত্মজয় করতে সক্ষম হলে দেবতা, ব্রহ্মা, মার কেহই আর তোমাদেরকে পরাজয় করতে পারবে না।

বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! তোমরা সর্বদা জাগ্রত হয়ে অবস্থান কর। প্রমত্ত হয়ো না, ভোজনে সংযম রক্ষা কর। তাহলে স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গফল লাভ করতে সমর্থ হবে। জাগ্রত থাকা অর্থ জ্ঞানের সহিত অবস্থান করা। প্রমত্ত না হওয়া অর্থ ভোগ বিলাসে মত্ত না হয়ে অবস্থান করা। আর ভোজনে সংযম রক্ষা অর্থ অতিরিক্ত ভোজন করা হতে বিরত থাকা। যারা অতিরিক্ত ভোজনপ্রিয় বা ভোগী তারা নির্বাণ লাভ করতে পারে না। আবার, যারা বেশি ভোগী তাদেরকে কেহ দান করে না। পক্ষান্তরে যারা অল্প ভোজনে সন্তুষ্ট হয়ে ভোগ ত্যাগ করে তাদেরকে সবাই দান দেয়। কারণ ভোগীকে দান করলে গ্রহীতার পক্ষ থেকে দানের পরিশুদ্ধতা অন্তরায় হয়ে সে দান দাতাকে মহৎ ফল প্রদান করতে পারে না। তোমরা সর্বদা ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়ে অল্পই ভোজন করবে। যেহেতু বুদ্ধ বলেছেন নির্বাণ যেতে হলে কোন দিকে বাড়াবাড়ি চলবে না। শরীরে উপবাস জনিত নানারূপ কষ্ট দেওয়া যেমন অন্যায, তেমনি বেশি ভোজনের রত হলেও নির্বাণ লাভ হয় না। ভোজন করাকে ঔষধের সঙ্গে তুলনা করবে। ঔষধ একেবারে না খেলে যেমন রোগীর মৃত্যু ঘটে, আবার মাত্রা

পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত সেবন করলেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়ে মহাবিপদ ঘটে যায়। ঠিক তদ্রূপ একেবারে ভোজন করা বন্ধ করে উপবাস থাকলেও যেমন জ্ঞান লাভ হয় না, আবার অতিরিক্ত ভোজন করলেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই ভোজনে মাত্রাঙ্ক হয়ে ভোজন করলে জীবিতেন্দ্রিয় রক্ষা হয়ে সুষ্ঠুভাবে ধ্যান-সমাধি করে চিন্তকে সমাধিস্থ করতঃ জ্ঞান লাভের চেষ্টাশীল হও।

তিনি পরিশেষে বলেন-তোমরা গুরুপক্ষের চন্দ্রের মতন ভোজনে মাত্রাজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সংযমে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর। আর অনুমোদন প্রশ্ন করে বলেন, গুরুপক্ষের চন্দ্রকে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখেছ-তো? নিশ্চয় দেখেছ। ঠিক সেভাবে তোমরা ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযমকে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত, বহুলীকৃত কর। ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ণতা লাভ হলে নির্বাণ সুখ প্রাপ্ত হয়। তোমরা কখনো কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতন হও না। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতন হলে তোমাদের জ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম দিন দিন হ্রাস পাবে। আর জ্ঞানবিহীন, ইন্দ্রিয় অসংযম হলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হবে না। যদি নির্বাণ লাভ করতে না পার তাহলে প্রব্রজিত হয়েও দুঃখের মধ্যে কালাতিপাত করতে হবে। কারণ শুধু কাষায় বস্ত্র পরিধান করে, মস্তক মুণ্ডন করে সুখ নেই বা সুখ লাভ হয় না। মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারলে তবেই সুখ লাভ হয়। এবং প্রব্রজিত জীবন সার্থক হয়-অন্যাথায় নয়। তোমরা অতিসত্বর নির্বাণ লাভ করতে চেষ্টাশীল হও। নির্বাণ লাভ করে পরম সুখে অবস্থান কর, এবং প্রব্রজিত জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

টেকী শাকের ব্যবসা ত্যাগ করে ঘড়ি ব্যবসা শুরু কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভক্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মুখে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা অজ্ঞান, তৃষ্ণার সহিত কোন কর্ম, কোন বাক্য, কোন চিন্তা করবে না। অজ্ঞান, তৃষ্ণার সহিত কর্ম, বাক্য, চিন্তা করলে দুঃখ পেতে হয়, পাপ সৃষ্টি হয় এবং নরকে পতিত হতে হয়। তাই তোমাদেরকে অজ্ঞান, তৃষ্ণার সহিত কোন কিছু করা ত্যাগ করে জ্ঞানের সহিত ও তৃষ্ণামুক্ত হয়ে কর্ম, বাক্য, চিন্তা করতে হবে। জ্ঞানের সহিত তৃষ্ণামুক্ত হয়ে কর্ম, বাক্য, চিন্তা করতে সক্ষম হলে সুখ, কুশল, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য অজ্ঞান, তৃষ্ণার সহিত কর্ম, বাক্য, চিন্তা করা হতে বিরত হয়ে তৃষ্ণামুক্ত হওত জ্ঞানের সহিত কর্ম, বাক্য, চিন্তা করা উচিত। তাতে নির্বাণ লাভ করতেও সহজ হবে। তোমরা যদি নির্বাণ লাভ করতে চাও তাহলে অজ্ঞান, তৃষ্ণা, অকুশল পরিত্যাগ করে জ্ঞান, কুশল, তৃষ্ণামুক্ত হতে চেষ্টাশীল হও। বনভক্তের উপদেশ কি জ্ঞান? যা

দ্বারা জ্ঞান উদয় হয়, কুশল অর্জিত হয় এবং তৃষ্ণা হতে মুক্ত হওয়া যায় তা' কর। আর যা দ্বারা অজ্ঞান বাড়ে, অকুশল উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা উদয় হয় তা' পরিত্যাগ কর। এক কথায় অজ্ঞান, অকুশল, তৃষ্ণা উৎপত্তি বন্ধ করে তৃষ্ণামুক্ত হয়ে জ্ঞান, কুশল উদয় করা। অজ্ঞান, অকুশল, তৃষ্ণার মধ্যে যদি মনচিহ্ন আসক্ত হয়ে থাকে তবে দুঃখ হতে মুক্তি নেই বলে জানবে। কারণ অজ্ঞান, অকুশল, তৃষ্ণা এগুলো মারভুবন। মারভুবনে অবস্থান করলে কিছুতেই সংসার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। তোমরা উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনা, উচ্চমনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে চিন্তের নিমলতা রক্ষা করে অবস্থান কর। তাহলে মনচিহ্ন হতে অজ্ঞান, অকুশল, তৃষ্ণা বিদূরীত হয়ে সহজে নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-যারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারী হওত কাম্য সুখ ভোগে রত তারা কি করতেছে জ্ঞান? টেকী শাকের দোকান দিচ্ছে। রাস্তার ধারে বসে কলাগাছের পাতার উপর টেকীশাকের পুটলি খুলে বেচাকেনা করতেছে। তাদের সে ব্যবসা দেখতে যেমন অভদ্র, সাধারণ দেখায়, মুনাফাও খুবই কম। খুব বেশি কেনাবেচা করলে ঘাট কি সস্তুর টাকার মত পাওয়া যাবে। উপরন্তু সে ব্যবস্যা অনেক কষ্টসাধ্যের তথা বহু পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা প্রব্রজিতগণ ঘড়ির দোকান খুলে ঘড়ি ব্যবস্যা কর। সুন্দরভাবে দোকান তৈরি করতঃ মূল্যবান উন্নত প্রযুক্তির, সুন্দর ডিজাইনের ঘড়ি আমদানী করে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার ঘড়ি বিক্রি কর। ঘড়ি ব্যবস্যা একদিকে যেমন ভদ্র, মার্জিত ভাব সম্পন্ন অন্যদিকে তেমনি অনেক বেশি মুনাফা অর্জিত হয়। পরিশ্রমও নেই বললে চলে। তবে সকলের পক্ষে ঘড়ির ব্যবস্যা করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। কারণ ঘড়ি ব্যবস্যা করতে হলে মোটা অঙ্কের পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমে কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে দোকান প্রস্তুত করে নিতে হবে। তারপর উন্নত প্রযুক্তি, সুন্দর ডিজাইনের ঘড়ি ক্রয়ের জন্য কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। আবার, ঘড়ি বিক্রি করতেও বিক্রেতাকে শিক্ষিত হতে হয়। যেহেতু ঘড়ি বিক্রেতাকে ঘড়ির উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজাইন অনুসারে মূল্য নির্ধারণ করতে হয় এবং ক্রেতাদিগকে ক্যাশমেমো প্রদান করতে হয়। শিক্ষিত না হলে এসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এবং ঘড়ির ব্যবস্যায়ও উন্নতি, মুনাফা অর্জিত হবে না। তাই টেকী শাকের ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করলেও ঘড়ি ব্যবস্যা করতে পারবে না। তাদের ঘড়ি ব্যবস্যা করার মত মোটা অঙ্কের পুঁজি যেমন নেই, তেমনি তারা শিক্ষিতও নয়। লোকোত্তরধর্ম অনুশীলন করাকেই ঘড়ি ব্যবস্যা করা বুঝায়। আর লৌকিকধর্ম করাকে টেকী শাকের ব্যবস্যা করা বুঝায়। লোকোত্তরধর্মে কোন প্রকার দুঃখ নেই, তৃষ্ণা মুক্ত, স্বাধীন, অনাবিল সুখ

লাভ হয়। কিন্তু লৌকিকধর্ম তৃষ্ণায়ুক্ত, পরাধীন, দুঃখদায়ক ও দুঃখ উৎপাদক। লৌকিকধর্ম করলে দুঃখের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়, দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায় না। অন্যদিকে মারভুবনে অবস্থান করাকেও টেকী শাকের ব্যবসয়ার সহিত তুলনা করা চলে। আর অমারভুবনে অবস্থান করাকে ঘড়ি ব্যবসয়া সদৃশ বলে জানবে। তোমরা মারভুবনে অবস্থান না করে অমারভুবনে অবস্থান কর। তাহলে টেকী শাকের ব্যবসয়া ত্যাগ করতঃ ঘড়ি ব্যবসয়া করতে সমর্থ হবে বা লোকোত্তরধর্মে উন্নীত হতে পারবে।

লোকোত্তরধর্ম গ্রহণ করা অর্থ সুপথ অনুশীলন করা। আর লৌকিকধর্ম গ্রহণ করা অর্থ কুপথ অনুসরণ করা। ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বদেরকে কুপথ থেকে সুপথে চালিত করেন। তাই বুদ্ধের নির্দেশিত পথকে ন্যায় পথ, সোজা পথ, ঠিক পথ বলা হয়। বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সত্ত্বদেরকে সুপথে পরিচালিত করতে সক্ষম। সারথি যেমন অশ্বদেরকে সঠিক পথে চালিত করে নিয়ে যায়। তাই বুদ্ধের শিক্ষা কোনটা সুপথ, কোনটা কুপথ তা চিহ্নিত করে দিয়ে কুপথ ত্যাগ করে সুপথে পরিচালিত হওয়ার উপদেশ দেন। আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা বুদ্ধের নির্দেশিত সুপথ অবলম্বন করে কুপথ পরিত্যাগ কর। কামের প্রতি লোভ, কামের আসক্তি, কামের প্রতি অজ্ঞানতা হয়ে হীন মনুষ্যগণ কুপথে পরিচালিত হওত অনন্ত দুঃখ ভোগ থাকে। তোমরা কামকে লোভ, আসক্তি করবে না। এবং কামের প্রতি অজ্ঞানতা হবে না তাহলে সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সমর্থ হবে। মনে রাখবে, একমাত্র বুদ্ধের এ সকল উপদেশেই সুপথে পরিচালিত হতে পারা যায়। বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে জগতে নতুন করে সুখের অধ্যায় আরম্ভ হয়। তাই বলা হয়েছে—

জগতের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইল,
জগতে শিক্ষা দিতে জগত গুরু এল।
হিংসাহিংসি, দলা-দলি সবি ভুলে যাবে,
সমগ্র বসুধা এবার প্রেমেতে ভাসিবে।

ভগবান বুদ্ধ বিশ্বের সকল জীবের প্রতি মৈত্রী, শান্তি ও কল্যাণের জন্যে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন। এবং ত্যাগের মাধ্যমে অনাবিল সুখ অশ্বেষণের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই বুদ্ধের শিক্ষা সত্ত্বদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং প্রকৃত সুখ অর্জন করতে এক মহৌষধ স্বরূপ। আমি খাগড়াছড়িতে ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ দূরকরণার্থে বলেছিলাম—

ভাইয়ে ভাইয়ে জড়িয়ে গলা, মুছে ফেল তোমরা মনের ময়লা,

হর্ষ তেজে দাঁড়াও তোরা, হোক তবে সুখের স্থান।

তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে উৎপন্ন হিংসা ময়লাকে বিদূরীত কর।

কারণ সে হিংসা ময়লা দ্বারা কখনো শান্তি লাভ হয় না, সুখ বয়ে আসে না। কলুষিত মনচিন্ত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করাও যায় না। তাই তোমরা সেসব ময়লা ধুয়ে মুছে ফেল। সে ময়লা কি? লোভ, ঘেব, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, আলস্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা এ দশবিধ ক্রেশই মনের ময়লা। ক্রেশ কাকে বলে? যা দ্বারা মনচিন্ত কলুষিত, পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত, মলিন ও নীচ হয় তাকে ক্রেশ বলে। বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন, লৌহ হতে উৎপন্ন ময়লা যেমন লৌহকে নষ্ট করে ঠিক তেমনি আপনার চিন্তে উৎপন্ন ময়লা আপনাকেই বিনষ্ট করবে। তাই তোমরা স্থায়ী চিন্তের ময়লাকে বিদৌত করে পরিষ্কার হয়ে যাও। কলুষিত চিন্তকে নির্মল করে ফেল। তাহলে চিন্তের কলুষিত ভাব দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। বুদ্ধ আরো বলেছেন, অনাবৃত্তি মস্তকের ময়লা, অসংস্কার ঘরের ময়লা, দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের ময়লা, আলস্য দেহের ময়লা, ইহ-পর কালের ময়লা পাপকর্ম, অবিদ্যাই সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট ময়লা। হে ভিক্ষুগণ! এই ময়লা বর্জন করে তোমরা সকলে নির্মল হও। কর্মকার যেমন রজতের ময়লা একটু একটু বিদূরীত করে, ঠিক মেধাবী ব্যক্তিও আপনার ময়লা ক্ষণে ক্ষণে বিদূরীত করবেন। অর্থাৎ আপনার চিন্তকে নিজের বসে আনবেন। আমি আবারো তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অবিদ্যা ময়লাকে বিদূরীত করতঃ চিন্তকে নির্মল কর। নির্মল চিন্তই সকল সুখের আকর।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, তোমরা ক্রেশ ত্যাগ কর, স্কন্ধ ত্যাগ কর। ক্রেশ তোমাদের নিত্য দুঃখদায়ক। ক্রেশের কাজ সন্তুদিগকে সর্বদা দুঃখ প্রদান করতে থাকা। তাই এ দুঃখদায়ক ক্রেশকে পরিত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। আবার পঞ্চস্কন্ধও নিত্য দুঃখ প্রদান করতে থাকে। সেহেতু পঞ্চস্কন্ধকে ত্যাগ করা আবশ্যক নহে কি? হ্যাঁ অবশ্যই। বুদ্ধ বলেছেন—রূপ আমি নই, আমার নয়, আমার আত্ম নয়; বেদনা আমি নই, আমার নয়, আমার আত্ম নয়; সংজ্ঞা আমি নই, আমার নয়, আমার আত্ম নয়; সংস্কার আমি নই, আমার নয়, আমার আত্ম নয়; বিজ্ঞান আমি নই, আমার নয়, আমার আত্ম নয়। যা নিজস্ব নয় তা' ত্যাগ কর। পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হবে। ক্রেশ ও স্কন্ধকে ত্যাগ করতে না পারলে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়। তাদেরকে ক্রেশ উন্মাদ ও স্কন্ধ উন্মাদ বলা যায়। ক্রেশ উন্মাদগণ ক্রেশ চেতনা পাপ চেতনা করতঃ নানা অনাচার, অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। বর্তমানে যে সব চুরি, ডাকাতি, মারামারি, বন্দুক যুদ্ধ, ভাংচুরের খবর সেসবই ক্রেশ উন্মাদের কাজ। আর স্কন্ধ উন্মাদের সব কিছুতেই আমি আমার ধারণা করে সেগুলো নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টায় ব্যাপ্ত থাকে। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার ধনজন, আমার জায়গা-জমি বলে বলে এসবের মালিকানা দাবি করাই স্কন্ধ উন্মাদের কাজ।

তোমরা অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টি, নরাধমের সংস্পর্শ ত্যাগ কর। কারণ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মহাপাপী। কষ্টকময় স্থানে বাস করা কি দুঃখজনক তদপেক্ষা অকৃতজ্ঞ লোকের সহিত বাস করা দুঃখজনক। তারা কখনো উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। বুদ্ধ বলেছেন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কখনো সুখ লাভ হয় না। তোমরা কৃজ্ঞতা স্বীকার করবে, অকৃজ্ঞত হয়ো না। মিথ্যাদৃষ্টি বিপরীত মার্গে পরিচালিত করে। এ মিথ্যাদৃষ্টিই সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য; ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বলে দিক নির্দেশনা করে। তাই মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পুন্ডালের সত্য, ন্যায়, সার লাভ হয় না। মিথ্যাদৃষ্টি বিদ্যমান থাকলে কখনো নির্বাণ লাভ হবে না। নরাধম ব্যক্তি উই ইদুরের মতন ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার সাধন করতে পারে না। বুদ্ধ বলেছেন—

ধরাতলে নরাধম, খল আছে যত,

ঠিক তারা উই আর ইদুরে মতন।

বর্তমানে মানুষগুলো উই ইদুরের মতন হয়ে গেছে। তারা একে অপরের ক্ষতিসাধন ছাড়া উপকার, মঙ্গল কিছুই করতে পারছে না। তাদের সেসব হীন মানসিকতা সম্পন্ন কাজের দ্বারা দেশের দিন দিন ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—উন্নতি কিছু হচ্ছে না।

পরিশেষে তিনি বলেন—মার হল পাপী লোকের রাজা। মার মানুষের মনে বিতর্ক উৎপন্ন করে দিয়ে অকুশলকর্মের দিকে ধাবিত করায়। বুদ্ধ যখন বোধিমূলে ধ্যানরত ছিলেন মার তখন ভেবেছিল—এই শাক্যরাজ পুত্র যদি জ্ঞান লাভ করতে পারে; লোকেদের উপদেশ দেয় তাহলে আমাররাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই আমি বুদ্ধকে জ্ঞান লাভ করতে দেবো না। এই ভেবে মার বুদ্ধকে নানাভাবে আক্রমণ করে ধ্যান হতে চ্যুত করতে আশ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিল। কিন্তু বুদ্ধকে ধ্যান হতে চ্যুত করতে পারে নি। বরং নিজেই পরাজিত হয়েছিল। বর্তমানেও যারা কুশলকর্ম করতে, জ্ঞান লাভ করতে, নির্বাণ যেতে ইচ্ছুক হয় তাদেরকে মার নানাভাবে প্রলোভন দেখায়ে আক্রমণ করবে। মার কুশলকর্ম, জ্ঞান লাভ ও নির্বাণ লাভ করতে শত সহস্র প্রকারে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়। কারণ এগুলো মারের কর্তব্য। তাই তোমাদেরকে দৃঢ় বীর্যের সহিত নানাবিধ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। বীর সৈনিকের ন্যায় পিছু না হটে মারের সঙ্গে যুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে এবং মারের সকল প্রকার অশুভ শক্তি পরাহত করে নির্বাণ লাভে সচেষ্ট থাকতে হবে। এভাবে মারের বাধা-বিপত্তি, ছিন্ন-ভিন্ন করতঃ নির্বাণ লাভ করে পরম সুখের অধিকারী হও।

সাধু, সাধু, সাধু।

নির্বাণ গমন পথে মার বিবিধ অন্তরায় বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-মার তোমাদেরকে নির্বাণ গমনের পথে নানা বাধা-বিপত্তি, বিবিধ প্রকার হুমকি প্রদান করবে। মার নির্বাণ যেতে দেয় না। মানুষ ('আমি মানুষ' এ ধারণা) নির্বাণ যেতে চায় না। নির্বাণ গমনের পথে মার নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে, বিবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে এবং মৃত্যু হুমকি প্রদান করে সত্ত্বগণকে নির্বাণ যেতে দেয় না। বলা যায়, মার নির্বাণ যেতে অন্তরায় সৃষ্টিকারী আর মানুষ নির্বাণ গমনে নিরুৎসাহ দানকারী। আমি স্বীয় লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা এসব তত্ত্ব জেনে তোমাদেরকে বলতেছি।

তোমরা যদি 'আমি মানুষ' এ ধারণা নিয়ে অবস্থান কর, তবে সে ধারণা পোষণ করাকে সুখ বলে বিশ্বাস করবে। আর তাহলে নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে না। পক্ষান্তরে 'আমি মানুষ' এ ধারণা ত্যাগ করতঃ সে ধারণা পোষণ করাকে দুঃখ, মিথ্যা বলে জানবে তাহলে নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে। আবার, সম্পত্তি, জাতীভগ্ন, যশ সন্মান, ভোগ সুখ ত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করা দুষ্কর। এমন কি বেশি ধন-সম্পত্তি র মালিক হলে প্রব্রজ্যা লাভ করতেও খুব কঠিন হয়ে যায়। তিনি একজনকে লক্ষ্য করে বলেন-যেমন ধর তুমি যদি লণ্ডন থেকে এম এ, পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভী হতে, তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন তারাও কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ প্রফেসর ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষিত হতো। উপরন্তু এয়ার কন্ডিশন বিশিষ্ট ছয়তলা বিল্ডিং, গাড়ী, কোটি কোটি টাকা মালিকের ছেলে হতে তাহলে কি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারতে? পারতে না। কারণ তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন কেহ তোমাকে প্রব্রজিত হওয়া জন্য অনুমতি দিত না। তাই বলি, বর্তমানে যখন প্রব্রজ্যা লাভ করেছে সে সুযোগে নির্বাণ লাভ করতে চেষ্টাশীল হও। নির্বাণ লাভ না করে যদি পরবর্তী জন্মে ধনীর ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ কর প্রব্রজ্যা নিতে সমস্যায় পড়ে যাবে। অন্যদিকে মার কি বলে জান? যারা অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বিকালঙ্গ প্রভৃতি অপরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং অতিবৃদ্ধ, অতি নীচকুলের সন্তান প্রব্রজিত হও। যাদের চেহারা সুন্দর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ, বয়সে তরুন এবং উচ্চকুলে সন্তান তারা প্রব্রজিত হও না। যাতে বুদ্ধের শাসনের উন্নতি কাজে সহায়তা করতে না পারে। বুদ্ধ শাসন হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। বুদ্ধের শাসন নষ্ট হয়ে জগতে অধর্ম বিরাজ করে। কিন্তু বুদ্ধ অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বামন, মূক, কুণী, বিকালঙ্গ, কুখ্যাত চোর ডাকাত, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, রাজভৃত্য এবং পঞ্চ আন্তরিককর্মীদেরকে প্রব্রজ্যা দিতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে অপরজনেরা প্রব্রজিতদেরকে হয় প্রতিপন্ন করতে না পারে। নীচ বলে অবজ্ঞা, তুচ্ছ, ঘৃণা

করতে না পারে। তাই বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন প্রব্রজ্যা লাভ করা দুর্লভ। বুদ্ধের সময়কালীন ডাকাতদের কিছু সদস্য রাজা কর্তৃক ধৃত হবার ভয়ে প্রব্রজিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের যে সমন জারী হয়েছিল সে কথা ভিক্ষুগণের নিকট প্রকাশ করেনি। ইত্যবসরের প্রব্রজ্যা লাভের পর উপসম্পদাও লাভ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হলে তারা একদিন পরস্পরের মধ্যে আলাপ করতে লাগল আমরা প্রব্রজিত হয়ে খুব ভালো করেছি। নচেৎ আমাদের দলের অন্যান্যদের মত আমাদেরকেও রাজা কর্তৃক খেঁড়ার হতে হতো। তাদের সে আলাপ শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ ভগবানের সকাশে সে কথা নিবেদন করলে বুদ্ধ তাদের প্রব্রজ্যা জীবন ত্যাগ করে গৃহী হবার নির্দেশ দেন। যাতে করে অপরজনেরা শাক্য কুলপুত্রদেরকে ডাকাত বলে অবজ্ঞা করতে না পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভ্রম্তে আরো বলেন-বন্ধু দু'প্রকার। যথা-সৎবন্ধু ও অসৎবন্ধু। সৎবন্ধু সৎপথে পরিচালিত করে। কিন্তু অসৎবন্ধুর সংস্পর্শে ভালো মানুষও অসৎ হয়ে যায়। তাই অসৎ বন্ধুকে সর্বদা এড়িয়ে চলা উত্তম। কথায় বলে, সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ। আবার, অনেক সময় সৎবন্ধুর সংস্পর্শে এসে অসৎ মানুষও সৎ হয়ে যায়। বর্তমানের অধিকাংশ মানুষকেই অসৎ বন্ধুর সনে তুলনা করা চলে। অসৎ বন্ধুরা নিজেরা যেমন দুঃশীলতা আচরণ করে অন্যদেরকেও তেমনি দুঃশীল আচরণে উৎসাহিত করে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন, নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৎ বন্ধু কিংবা নিজের সমতুল্য না জুটলে শক্তমনে একাই চলা উত্তম। কখনো অসৎ বন্ধুর সংসঙ্গ করিও না।

একাকী বিহারী শ্রেয় আপনি আপনি

মূর্খ হতে সহায়তা নাহি প্রয়োজন।

না করিও পাপ ভুমি কর একা বিচরণ।

অসৎ বন্ধু বা পাপীমিত্র, হীন ব্যক্তির সাথে সংসর্গ করবে না। হঠাৎ যদি হীন ব্যক্তি বন্ধুও হতে চায় তাহলে তার কাছ থেকে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখতে হবে। তাই বন্ধু নির্বাচন করা সত্যিই সুকঠিন একটি কাজ। সৎ বন্ধু সন্ধান পাওয়া না গেলে পরাজিত রাজার ন্যায় কিংবা বনরাজ সিংহের মত নির্ভীকচিত্তে একাকী বিচরণ করবে। তবুও অসৎ বন্ধুর সংসর্গ করবে না। তাতে পাপ, অকুশল সম্পাদিত হবে না। মনচিন্তাও বিপদের দিকে ধাবিত হবার সুযোগ থাকবে না।

মার তোমাদেরকে কি বলে জান? তোমরা বনভ্রমের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অবস্থান করো না। তাঁর কথা শুনবে না, বিশ্বাস করবে না এবং প্রতিপালন করবে না। তাঁর কথা মত চললে তোমরা দুঃখ পাবে, সুখ ভোগ করা হতে বঞ্চিত থাকবে আজীবন। কাজেই তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলে যাও। আর

আমাকে কি বলে জান? ভন্তে আপনার শিষ্যগণ তো ঠিক মত আপনার কথা পালন করতেছে না। আপনি তাদেরকে প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা প্রদান করে এবং উপদেশ দিয়ে শুধু দুঃখ ভোগ করতেছেন সার। সুতরাং আপনার শিষ্যদেরকে বিদায় করে দিন। মার বুদ্ধের শাসন ধ্বংস করার জন্য এভাবে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করে থাকে। বুদ্ধের সময়কালীনও বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিতে চেষ্টা করেছিল। আবার দায়ক-দায়িকাদের মনচিন্তে মার চুকে পড়ে তাদেরকে কি বলে জান? তোমরা বনভন্তের কথা শুনবে না, তাঁর কথা মত ধর্ম আচরণ করবে না। ধর্ম আচরণের ফলে অপরের কাছ থেকে শুধু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হয়। এবং ধর্ম আচরণে অর্থ ব্যয় হতে হতে তোমরা গরিব হয়ে যাবে। বনভন্তেকে ফাং করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসবে না। এভাবে মার কুশলকর্ম সম্পাদন করতে বিবিধ বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে দেয়। মারের কাজ হল অকুশলকর্ম সম্পাদনে সাহায্য, সহযোগিতা, উৎসাহ দান করা। কুশলকর্ম সম্পাদন, জ্ঞান লাভ করণ, নির্বাণ লাভ করণ, সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া এ চারিটি কাজে মার জীবন মরণ পণ রেখে বাধা দেয়। অন্তরায় সৃষ্টি করে দিতে সচেষ্ট থাকে।

তোমরা সংসারী হতে ইচ্ছা পোষণ করবে না। মানুষ, মারকে সুখ বলে বিশ্বাস করবে না। মনচিন্তের মধ্যে যদি সংসারী হবার ইচ্ছা না থাকে, সুখ ভোগের রত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন না হয়, মানুষ মারকে সুখ বলে বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি বলছি তোমাদের অবশ্যই বুদ্ধজ্ঞান উদয় হবে। আর সে জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণ লাভ করতে কোন প্রকার কষ্ট বা কঠিন হবে না। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসারী হওত জগতে কাম্য সুখে মোহিত হলে বুদ্ধ জ্ঞান উদয় হয় না। সেই বুদ্ধ জ্ঞান কি? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান। সেসব জ্ঞান লাভের অভাবে সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায় না। এবং অতীব দুঃখ কষ্টের সহিত দিন অতিবাহিত করতে হয়। তাতে কেবল অকুশল, পাপ, অজ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকে। তখন ইহ জীবন হয়ে টাট্ঠে দুর্বিষহ দুঃখে ভরা আর ভবিষ্যৎ হয়ে যায় অন্ধকারে ভরা। তোমরা সংসারী জীবন-যাপন করাকে হীন, পাপ, মহাদুঃখজনক বলে জানবে। সংসারী জীবন-যাপন করার ইচ্ছা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাক। সংসারী হবার ইচ্ছা কখনো মনের মধ্যে উদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা ধ্বংস করে ফেলবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-প্রব্রজিত হয়ে যদি মনচিন্তের মধ্যে সুখভোগে রত হবার ইচ্ছা না থাকে, গৃহী হয়ে বিয়ে করতঃ সংসারী জীবন-যাপন করার ইচ্ছা লোপ পায় তাহলে প্রব্রজিত জীবন অনাবিল সুখের, শান্তির ও পরিতৃপ্তিময় হয়। কিন্তু তার বিপরীতে প্রব্রজিত জীবন সুখের পরিবর্তে মহাদুঃখের হয়ে থাকে।

প্রব্রজিত জীবনের প্রকৃত সুখ লাভ হয় সুদূর পরাহত। তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ তাই অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি বশীভূত চিত্তে অবস্থান কর না। অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি সহিত অবস্থান করলে তোমাদের প্রব্রজিত জীবন হবে ঠকাবাজি এবং প্রব্রজ্যা লাভ করা নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হবে। তোমরা নিম্পাপরূপে প্রব্রজ্যা জীবন আচরণ কর তাহলে অনন্ত সুখের অধিকারী হবে। অন্যদিকে ঠকাবাজি প্রব্রজ্যা জীবন আচরণ করলে সুফলের পরিবর্তে কুফলই প্রদান করবে। তোমরা জ্ঞান, সত্যকে অবলম্বন করতঃ জগতে সকল প্রকার কাম্য সুখ, ভোগ-আসক্তি ত্যাগ কর। কাম্য সুখ, ভোগ-আসক্তি ত্যাগ করতে সক্ষম হলে সহজে নির্বাণ লাভ হয়। তাতে প্রব্রজিত হবার উদ্দেশ্য সার্থক হয়, প্রব্রজিত জীবন যথাযথরূপে সুফল প্রদান করে। বৌদ্ধধর্মে প্রকৃত রসাস্বাদ নির্বাণ পরম সুখ লাভ করা যায়।

সাধু, সাধু, সাধু।

অসাধারণ জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টাশীল হও

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদান করছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন-ভিক্ষুদের যতদিন চারি আর্যসত্য জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন তারা আপত্তিগ্রস্ত হবে। আপত্তি ভেদে নানাবিধ বিনয়কর্মও করতে হয় তাদেরকে। মনে রাখবে, পাপকর্মের মধ্যে মনচিন্তা থাকলে এবং পাপকে সুখ বলে মনে করলে আপত্তিগ্রস্ত হতে হয়। মনচিন্তে যদি অকুশল, পাপ চেতনা না থাকে তাহলে আপত্তিমুক্ত হওয়া যায়। আবার, নিত্য আপত্তিগ্রস্ত হলে তার প্রতিকার স্বরূপ বিনয় করতে করতেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই তোমরা চারি আর্যসত্য জ্ঞান জানতে, হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টাশীল হও। তাহলে আপত্তিগ্রস্ত হবে না এবং তার প্রতিকার স্বরূপ নিত্য বিনয় কর্মও করতে হবে না। এটাই যথাযথ নিরাপদ ব্যবস্থা। আর এভাবে প্রকৃত সুখ লাভ হয়। আপত্তিগ্রস্ত হওয়াকে দুঃখ বলে জানবে। অতিসত্বর সে দুঃখ ত্যাগ করতে চেষ্টাশীল হও। বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে কামসুখ ও আত্মপীড়ন অনুশীলন না করে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা বা মধ্যম পথ অবলম্বন করে অবস্থান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। কামসুখ, আত্মপীড়ন হীন, দুঃখ, অনার্য, পাপজনক এবং সত্য জ্ঞান লাভের প্রতিকূল অবস্থা। তাই বলা হয়েছে কামসুখ, আত্মপীড়নের দ্বারা পাপই উৎপন্ন হয়, দুঃখ সৃষ্টি হয়, এবং অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়। কামসুখ, আত্মপীড়ন ত্যাগ করতে না পারলে দিন দিন অবিদ্যা, তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাবে। আর সে অবিদ্যা, তৃষ্ণার কারণে অজ্ঞান, অকুশলমূলক কর্মের দিকে মনচিন্তা ধাবিত হয়। তাই কামসুখ, আত্মপীড়ন দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রধান অন্তরায়। পক্ষান্তরে সে দুই অন্ত অনুশীলন না

করলে পুণ্য-সুখ বৃদ্ধি পায়, শ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে জ্ঞান ভাবিত, বর্জিত, বহলীকৃত হয় এবং দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়।

তোমরা কামসুখ ত্যাগ করতঃ নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ কর। নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ দ্বারা অনবদ্য সুখ লাভ হয়ে থাকে। কখনো শিথিলভাবে ব্রহ্মচার্য আচরণ করবে না। শিথিলভাবে ব্রহ্মচার্য আচরণ করলে সুফলের পরিবর্তে কুফলই প্রদান করবে। দুঃখীত কুশত্ণ যেমন হস্তকে কর্তন করে তেমনি শিথিলভাবে আচরিত ব্রহ্মচার্য জীবনকে অধিকতর কলঙ্কিত করে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পৃথিবীতে কোন কলুষিত ব্রতই মহৎ ফলপ্রসূ হয় না। তাই শিথিলভাবে আচরিত ব্রহ্মচার্য আসক্তি প্রবৃত্তির দিকে বেশি আকর্ষণ করে থাকে।

‘আমি মানুষ’ এ ধারণা, ‘সে পুরুষ’ এ ধারণা, ‘সে মহিলা’ এ ধারণা পোষণ করে অবস্থান করো না। এ ধারণাসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা, শ্রান্ত দর্শন মাত্র। পঞ্চস্কন্ধকে (শরীর) যদি বিভেদ করে দর্শন করা হয়, তাহলে সেখানে কোন ‘মানুষ-পুরুষ-মহিলা’ বা কোন সত্ত্বের অস্তিত্ব মিলে না। তাই ‘মানুষ-পুরুষ-মহিলা’ এ ধারণাসমূহের অস্তিত্ব খোঁজাকে অজ্ঞানতা বশতঃ মিথ্যা ধারণা বলা যায়। এতে শুধুমাত্র অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি উদয় হয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি। তোমাদের মনচিন্তে যদি অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি উদয় হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদেরকে দুঃখই পেতে হবে। তোমরা ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ ত্যাগ করতঃ অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি বিদূরীত করে প্রকৃত সদ্ধর্ম অনুশীলন কর।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-সদ্ধর্ম আচরণ করতঃ পরধর্ম ত্যাগ কর। এবং পরকাজ ত্যাগ করে নিজকাজে প্রতিষ্ঠিত থাক। সেই সদ্ধর্ম কি? মার্গফল নির্বাণ সাক্ষাৎ করাকে সদ্ধর্ম বলে। আর স্বর্গ, ব্রহ্ম লাভ করার তাগিদে যে সমস্ত পুণ্যকাজ করা হয় তা’ পরধর্ম বলে জানবে। মার্গফল নির্বাণ ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম পুণ্য করাকে পরধর্মের মধ্যে অন্তর্গত করা যায়। জ্ঞানের সহিত অবস্থান করাকে নিজকাজ, অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে অবস্থান করাকে পরকাজ বলে। অজ্ঞানীরা সব সময় পরধর্ম, পরকাজসমূহ করে থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সদ্ধর্ম অনুশীলন ও নিজকাজ সম্পাদন করে থাকে। আমি তো দেখতেছি যে, বর্তমানে প্রায় সবাই পরধর্ম, পরকাজ করতেই ব্যস্ত। পরকাজ, পরধর্মের মধ্যে তারা সুখ, আনন্দ, উল্লাসের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। কিন্তু তাদের সে সুখ, আনন্দ, উল্লাস একদিন মিথ্যা হয়ে যাবে। তাদেরকে পরকাজ, পরধর্ম করার মাশুল দিতে হবে-দুঃখ, কষ্টেভরা হাহাকার হৃদয়ে। পরধর্ম, পরকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকৃত লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদিও মরুভূমিতে স্ট্র মরীচিকা জালের ন্যায় সুখ ভ্রম দৃষ্ট হয় যায়। তোমরা সাধারণ জ্ঞান বাদ দিয়ে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন

করতে চেষ্টাশীল হও। সে অসাধারণ জ্ঞান হল চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান। এসব জ্ঞানের দ্বারা পরধর্ম, পরকাজ করা বন্ধ হয়ে যায়, প্রকৃত সুখ লাভ হয়।

বৌদ্ধধর্ম মতে বি, এ পাশ, এম, এ পাশ, ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদেরকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা চলে না। যারা সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান লাভ করেছেন একমাত্র তারাই প্রকৃত শিক্ষিত। সে বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ সকল বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ জানতে, বুঝতে সক্ষম হলে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন হয়। এসব ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে অজ্ঞান বিদ্যমান থাকতে পারে না। অজ্ঞান বিদ্যমান না থাকলে প্রব্রজিত জীবন সুখে, শান্তিতে অতিবাহিত করা যায়। কিন্তু বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞান হলে প্রব্রজিত জীবন দুর্বিসহ দুঃখে ভবে উঠে। এমন কি প্রব্রজিত জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। আমি অনেক ভিক্ষুকে বলতে শুনেছি-‘খুব কষ্ট পাচ্ছি, মরে যেতে পারতাম ভালো হতো।’ এটা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, বর্তমানে অনেক ভিক্ষু বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেমন, বৃক্ষজিৎ, অক্ষরানন্দ তারাও বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল বিধায় বর্তমানে সংসারী হয়েছে। বর্তমান ভিক্ষুদিগের আচার-আচরণ অনুসারে আমি তিনভাগে ভাগ করে থাকি। যথা-১) কেহ প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে বিয়ে করতঃ সাধারণ সংসারী হয়ে যায়। ২) কেহ প্রব্রজিত অবস্থায় নারীর সাথে প্রেম করতঃ সে নারীকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। আর শেষে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে। ৩) কেহ প্রব্রজিত জীবন ত্যাগ করে না, কিন্তু নারীর সহিত ব্যভিচারে রত হয়ে কলঙ্কিত, কলুষিত জীবন-যাপন করে। যারা সোজা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহী হয়ে সংসারী হয় তাদেরকে অন্য দু’ধরনের চেয়ে একটু ভালো বলা চলে। কারণ প্রব্রজিত করে থাকার জ্ঞানটুকু যখন তাদের নেই সে জীবন ত্যাগ করাই উত্তম কাজ। কিন্তু জ্ঞান বিহীন অবস্থায় প্রব্রজিত হয়ে অবস্থান করতঃ পাপকর্মে রত হওয়া মহা অন্যায়। সেরূপ কলঙ্কিত প্রব্রজিত জীবন নিরয়গামী করে দেবে মাত্র। এতে নিজের প্রব্রজিত জীবন যেমন বিনষ্ট হয়ে যায় তেমনি ধর্মের উপরও মিথ্যা কলঙ্কের দাগ পড়ে। তারা পবিত্র বুদ্ধ শাসনে বিষাক্ত কীট সদৃশ। ভিক্ষুদের এরূপ অবস্থা দেখে আমি তোমাদেরকে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়ে থাকি। তোমরা যদি তাদের সংস্পর্শে থাক তাহলে তোমাদেরকেও সে তিন প্রকার কাজ করতে হবে। পঁচা আর ভালো বেগুন এক ঝুড়িতে রাখলে যেমন ভালো বেগুনগুলোও পঁচে যায় বা পঁচা দরে বিক্রি হয় তেমনি দুঃশীল ভিক্ষুদের সাথে থাকলে শীলবানও মর্যাদা পায় না।

তোমরা বুদ্ধ প্রমুখ শারীপুত্র, মৌদাল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, আনন্দ প্রমুখ

মহাজ্ঞানীগণের আচরিত রীতি-নীতি, পথ অনুসরণ কর। বর্তমান প্রায় ভিক্ষুদের আচরিত রীতি-নীতি সঠিক নয়, তারা ভুল পথের পথিক। তাই আবারো বলছি বুদ্ধ প্রমুখ শারীপুত্র, মৌদাল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, আনন্দ প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের আচরিত পথেই একমাত্র নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। তাই বলি-

মহাজ্ঞানী আর্যগণ, যে পথে করেছে গমন,

লভিয়াছে সম্যক দর্শন।

সেই পথ লক্ষ্য করে, আচরিবে ধৈর্য ধরে,

সার্থক কর এই মানব জীবন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য স্বর্গ, ব্রহ্মলোক লাভ নয়। বরঞ্চ এ ধর্মে স্বর্গ, ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণ করাকেও দুঃখ বলা হয়। সকল প্রকার লোভ, তৃষ্ণা ক্ষয়সাধন করে নির্বাণ সুখ করাই বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য। তাই একমাত্র বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ সুখ লাভ করা সম্ভব। অন্যান্য ধর্মের নীতি বা পথ অনুশীলনে স্বর্গ, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লাভ করা যায়। নির্বাণ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত অবৌদ্ধদের আচরিত নীতি দ্বারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারব বলে বিশ্বাস করাকে শীলব্রত পরামর্শ বলে। এ শীলব্রত পরামর্শ মহাপাপ। দুঃখ আনয়নকারী, সত্যের বিপরীত মিথ্যার বদ্ধমূল ধারণা। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ হলে শীলব্রত পরামর্শ ধ্বংস হয়। আবার, স্রোতাপত্তি লাভীগণের সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তারা সংপুরুষের সহচর্য, সদ্ধর্ম শ্রবণ, জ্ঞানযোগে চিন্তা, সত্যধর্মের অনুশীলন করে থাকে। স্রোতাপত্তি এ চারি অঙ্গ সর্বদা রক্ষা করে সযত্নে। জীবনের বিনিময়েও তারা অসংপুরুষের সহচর্য গ্রহণ করে না, পরধর্ম শ্রবণ করে না, অজ্ঞানের সহিত মনন করে না, পরধর্ম অনুশীলন করে না। চিত্তের নির্মলতা এবং উচ্চাভ্যাসই শ্রদ্ধার লক্ষণ। তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধার দ্বারা স্রোতাপত্তি মার্গ ফল লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধেরকালীন মহাউপাসিকা বিশাখাও তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধার দ্বারা স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করেছিলেন।

সম্মতি সঙ্ঘ ও পরমার্থ সংঘ ভেদে সংঘকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। মার্গফললাভী অর্থাৎ স্রোতাপত্তি, স্কদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গফললাভী সংঘদিগকে পরমার্থ সংঘ বলে। যারা মার্গফললাভী নয়, পৃথকজন অবস্থায় শুধুমাত্র উপসম্পদা লাভ করে সংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত তাদেরকে সম্মতি সংঘ বলে। থের তিন প্রকার, যথা-জাতি থের, ধর্ম (পরমার্থ) থের, সম্মতি থের। যারা বয়োবৃদ্ধ তাদেরকে জাতি থের; মার্গফল লাভীদেরকে পরমার্থ থের; যারা ভিক্ষু বয়সে দশ বৎসর হয়ে সংঘ কর্তৃক থের বলে স্বীকৃতি লাভ করে তাদেরকে সম্মতি থের বলে। থের শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, বুড়ো হওয়া। কেহ বয়সে বুড়ো, কেহ

পরমার্থ জ্ঞান লাভে বুড়ো, কেহ ভিক্ষু বয়সে বুড়ো এ তিন প্রকার বুড়োকে বৌদ্ধধর্মের পরে ভাষায় থের বলা হয়। জাতি থের আর সম্মতি থের, অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্রয়সাধন করে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারেনি। তাই তারা সুখ, দুঃখের অধীন। পরমার্থ থের অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সকল প্রকার দুঃখ ক্রয়সাধন করে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান করে থাকেন। তাহলে দেখা যায় যে, ভিক্ষু বা থের অন্যজনের কাছ হতে স্বীকৃতি লাভ করা যায়। কিন্তু নির্বাণ লাভ করতে হলে নিজেকে উদ্যোগ নিতে হয়। অর্থাৎ আপন দুঃখমুক্তি নির্বাণ আপনাকে লাভ করতে হয়—কেহ নির্বাণ লাভ করায় দিতে পারে না। বুদ্ধ বলেছেন—আমি কেবল উপদেষ্টা মাত্র, উদ্যম তোমাদেরকে করতে হবে। বুদ্ধ নির্বাণ গমনের রাস্তা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপদেশ, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মাত্র। যারা নির্বাণ গমনের ইচ্ছুক তাদেরকে সে রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে হবে। হেঁটে না গেলে আপন অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হবে না। যেমন ধর, আমি তোমাদেরকে প্রবজ্যা, উপসম্পদা প্রদান করেছি। কিন্তু দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ তোমাদেরকে অর্জন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রদান করতে পারব না। একজন যদি অন্যজনকে নির্বাণ প্রদান করতে সক্ষম হতো তাহলে বুদ্ধ সবাইকে নির্বাণ প্রদান করতেন। কেহকে সংসার দুঃখে পতিত হতে হতো না। আবার, গুরু নির্বাণ লাভ করলে শিষ্য সেই নির্বাণ সুখের ভাগীদের হতে পারে না। এবং শিষ্য নির্বাণ লাভ করলে গুরুও নির্বাণ সুখের অধিকারী হতে পারে না। মনে রাখবে, একজন নির্বাণ সুখ লাভ করলে অন্য অপরজন কিছুতেই সে নির্বাণ সুখের অংশিদারী হতে পারে না। নির্বাণ সজ্জাটি, পাত্র, চীবরের ন্যায় কেহকে প্রদান করার মতন বস্তু নয়। তাই দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা স্বীয় প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। যদি দৃঢ় বীর্যের সহিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সঠিকভাবে অনুশীলন করে জ্ঞানার্জন করা যায়, তবেই নির্বাণ লাভ হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন—ত্রিপিটক শাস্ত্রে আমরা বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে লাভ করি। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর সকাশে এই শিক্ষা উপদেশসমূহ গ্রহণ করা যেত। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপিটক শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও হতে বুদ্ধের শিক্ষা উপদেশসমূহ লাভ হয় না। তাই আমি এখন ত্রিপিটকের খণ্ডসমূহ সংরক্ষণে একটু বেশি মূল্য দিই। তবে ত্রিপিটকের সে শিক্ষা, উপদেশসমূহ যথাযথভাবে আচরণ না করলে জ্ঞান লাভ হবে না। জ্ঞান লাভের জন্য চায় ত্রিপিটকে সংরক্ষিত বুদ্ধের সে উপদেশ শিক্ষাসমূহ যথাযথ অনুশীলন করা। চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, চারি আর্যসত্যকে যথাযথরূপে জানা, বুঝাই ত্রিপিটকে উল্লেখিত সে শিক্ষা উপদেশ সমূহের মূল

উদ্দেশ্য। কারণ চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে, চারি আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হয়। আর দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করাই-তো বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য। সেই চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কি? পঞ্চকক্ষ দুঃখ আর্যসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া; অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমুদয় আর্যসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা পরিহার করা; নির্বাণ নিরোধ আর্যসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা; শমথ বিদর্শন মার্গসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা গঠন বা ভাবনা করা। এসব জ্ঞান লাভ হলে বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বাণ সুখ লাভ হয়। এবং তখনই ত্রিপিটক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কৃত বুদ্ধের শিক্ষা উপদেশসমূহ অধ্যয়ন করার সার্থকতা অর্জিত হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

পঞ্চকক্ষে আসক্ত হয়ে অবস্থান করো না

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা যদি অজ্ঞান অবস্থায় ‘আমি মানুষ’ এ ধারণা পোষণ কর ও মারের সহিত অবস্থান কর তাহলে প্রব্রজিত জীবনে কি সুখ লাভ হয় তা’ বুঝতে পারবে না। চারি আর্যসত্য জ্ঞান উদয়, স্থিতি এবং চারি আর্যসত্যকে যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করলে প্রকৃত সুখ লাভ হয়। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করতে অপারগ হলে প্রব্রজিত জীবন দুর্বিষহ দুঃখের হয়। আর সূচুভাবে প্রব্রজিত জীবন-যাপন করা সুকঠিন হয়ে উঠে। তবে প্রব্রজিত হয়ে যদি সুখ ভোগ হতে বিরত থাকা যায়, ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ ত্যাগ এবং আমি, আমার, আমিভূ পরিত্যাগ করা যায় তাহলে প্রব্রজিত জীবন সুখের হয়। আবার, চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ হলে প্রব্রজিত জীবন সার্থক করতঃ নির্বাণ লাভ করা সহজ হয়। সেই জ্ঞানসমূহ কি রকম? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান-এই চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান। অবিদ্যা কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জাতি, জাতির কারণে জরা-মরণাদি এই দ্বাদশ নিদান তত্ত্ব বা ভবচক্র সম্বন্ধে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে জ্ঞান। কামাসব, ভবাসব, মিথ্যাদৃষ্টি আসব, অবিদ্যা আসব এই চতুর্বিধ আসব সম্বন্ধে জ্ঞান। অন্যদিকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের সহিত

বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে দুঃখ পেতে হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান থাকলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুশীলন প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃত বৌদ্ধধর্মে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধধর্ম সকল প্রকার অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান হতে মুক্ত।

পঞ্চস্কন্ধ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১) যারা মার্গফললাভী তারা পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করে থাকে। তারা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কোন প্রকার প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা ভাব উদয় করেন না। এবং পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত হয়ে অবস্থান করেন না। তাই তারা পরম সুখে অবস্থান করতে সমর্থ হন। ২) যারা মার্গফললাভী নয় পৃথকজন, তারা পঞ্চস্কন্ধকে নিত্য, সুখ, আত্মরূপে দর্শন করে থাকে। তারা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা ভাব উদয় করতঃ পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত হয়ে অবস্থান করে। তাদের সেই মিথ্যা, বিপরীত দর্শনের হেতুতে তারা দুঃখ পেতেই থাকে। তাই বলছি তোমরা পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন কর। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি কোন প্রকার প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা ভাব উদয় করবে না। এতে তোমরা পরম সুখে অবস্থান করতে পারবে। অন্যদিকে, তোমরা যদি পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করতে সমর্থ হও তাহলে কোন রমণীর রূপের মোহে মোহিত হবে না। এবং রমণী দর্শনে সুন্দর, গুটি এরূপ ভাবও উদয় হবে না। অর্থাৎ সাধারণত রমণীরূপে পুরুষের এবং পুরুষের রূপে রমণীর যে একটা দুর্বলতা ভাব থাকে; একে অপরের রূপে মোহিত হয়; আকর্ষণ ভাব উৎপন্ন করে থাকে তা' কিছুতে উদয় হবে না। তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ এখন তোমাদেরকে সত্ত্বের নির্বাণ লাভের চেষ্টায় তৎপর হতে হবে। তোমরা সর্বদা পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করবে। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম জ্ঞান করে পঞ্চস্কন্ধকে পরিত্যাগ করবে। পঞ্চস্কন্ধকে পরিত্যাগ করতে পারলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হবে। পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত হলে মহাদুঃখ উৎপন্ন হওত অশেষ প্রকারে দুঃখ প্রদান করতে থাকে। তাই বুদ্ধ বলেছেন-

যে পঞ্চস্কন্ধ ভালোবাসে দুঃখকে সে বাসে ভালো,

দুঃখকে যে ভালোবাসে দুঃখ হতে চিরকাল।

মুক্তি কভু নাহি লভে কহে বুদ্ধ ভগবান,

সে কারণে পঞ্চস্কন্ধে প্রেম নাহি করহ ধীমান।

পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, অশ্চিরূপে দর্শন করতঃ সেখানে প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা ভাব উৎপন্ন করবে না। বরঞ্চ পঞ্চস্কন্ধে বীততৃষ্ণা উৎপন্ন করে নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হও। পঞ্চস্কন্ধকে ত্যাগ করতে পারলে নির্বাণ লাভ করা যায়। কিন্তু পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত থাকলে কিছুতেই নির্বাণ লাভ হয় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা যদি মারভুবনে অবস্থান করতে চাও তাহলে নির্বাণ সুখ লাভ হবে না। অমারভুবনে অবস্থান করতে পারলে তবেই নির্বাণ সুখ লাভ হয়। এক সময় জনৈক তালুকাদার বাবু অগ্রবংশ ভন্তের সমীপে জিজ্ঞাসা করেছিল ভন্তে নির্বাণ সুখ কোথায় অনুভব হয়? সেদিন ভিক্ষুসঙ্ঘ হতে কেহ উত্তর প্রদান করতে সমর্থ হয়নি। নির্বাণ সুখ কোথায় অনুভব হয় তার উত্তরে বলতে হবে মনচিন্ত্র যদি অমারভুবনে অবস্থান করে তাহলে নির্বাণ সুখ অনুভব হয়। একমাত্র অমারভুবনেই নির্বাণ সুখ অনুভব করা সম্ভব। অর্থাৎ মারভুবনে মনচিন্ত্র থাকলে কিছুতেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভবপর নয়। মনচিন্ত্রকে মারভুবন থেকে অমারভুবনে নিয়ে যেতে পারলে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করা যায়। তাই ভগবান বুদ্ধ মনচিন্ত্রকে অমারভুবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদর্শন ভাবনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। মনচিন্ত্রকে মারভুবন হতে অমারভুবনে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হল এ বিদর্শন ভাবনা। বিদর্শন ভাবনা করা অর্থ জ্ঞানের সহিত আপন কাজ করা। মনচিন্ত্র যদি মারভুবনে অবস্থান করে তাহলে খুব দুঃখ পেতে হয়। মারভুবনে যে সব ধর্ম, কর্ম সম্পাদন করা হয় তা' সবই পাপ, অকুশল। তোমরা ধর্ম, কর্ম উভয় ত্যাগ করে নির্বাণ লাভে সচেষ্ট থাক। কারণ নির্বাণ লাভ বা অমারভুবনে ধর্ম সম্পাদনেরও প্রয়োজন নেই, কর্ম সম্পাদনেরও প্রয়োজন নেই। মারভুবনে যে সমস্ত ধর্ম, কর্ম করা হয় তা সবই পরধর্ম, পরকাজ। পরধর্ম, পরকাজ সম্পাদন করলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তোমরা পরধর্ম, পরকাজ ত্যাগ করে সদ্ধর্ম অনুশীলন কর। সদ্ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ হয়। সদ্ধর্ম অর্থ আপন কাজ, আপন ধর্মকে করা বুঝায়। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করাকে আপন কাজ বলে। এক কথায়, সদ্ধর্ম জ্ঞান লাভ করার প্রচেষ্টাই আপন কাজ। নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে সদ্ধর্ম লাভ করাকে আপন ধর্ম বলে। পরধর্ম, পরকাজ সর্বদা পরিত্যাজ্য। কারণ সেসবই মারভুবন। তোমাদের মনচিন্ত্র মারভুবনে অবস্থান করলে যে কাজ করো না কেন দুঃখই পাবে সার। যেহেতু মারভুবনে মার্গফল নির্বাণ সুখ কিছুতে লাভ হয় না। উপরন্তু প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করাও সম্ভব হয় না। তখন বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে সুখও অনুভব হয় না। বলা যায়, মারভুবন বৌদ্ধধর্ম আচরণের অনুকূল অবস্থা নয়।

'আমি মানুষ' এ ধারণা, 'সে পুরুষ' এ ধারণা, 'সে মহিলা' এ ধারণা নিয়ে সুখ ভোগে রত থাকলে, পাপধর্ম আচরণের মাধ্যমে সুখ আকাজক্ষা করলে মাররাজ্যের মধ্যে অধীন হয়ে থাকতে হয়। তাই তোমরা 'আমি মানুষ', 'সে পুরুষ', 'সে মহিলা' এ ধারণাসমূহ ত্যাগ কর। তাহলে মাররাজ্য ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। নির্বাণরাজ্যে 'আমি মানুষ', 'সে পুরুষ', 'সে

মহিলা' এ ধারণাসমূহ নেই। আর সে সব ধারণাসমূহ মনচিহ্ন হতে বিদূরিত হলে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের রসাস্বাদন বা নির্বাণ লাভ হয়। তোমরা বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত রসাস্বাদন করতঃ নির্বাণ লাভের চেষ্টাশীল হও।

তিনি বলেন-অবিদ্যাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়ে অবস্থান করো না। অজ্ঞান হয়ে অবস্থান করলে সংসারের প্রতি তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়ে দুঃখ পেতে হবে। তখন জীবন দুর্বিষহ দুঃখে হাহাকার হয়ে উঠবে। তোমরা সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। বুদ্ধের উপদেশ হল চক্ষু থাকতে অন্ধের ন্যায়, কর্ণ থাকতে বধিরের ন্যায়, জ্ঞান থাকতে বোবার ন্যায়, শক্তি থাকতে দুর্বলের ন্যায়, প্রাণ থাকতে মৃতের ন্যায় হয়ে অবস্থান করা। এক্ষেপে অবস্থান করতে সক্ষম হলে নির্বাণ লাভ হয়। যে কোন দৃশ্যমান আলম্বন চক্ষু ইন্দ্রিয়ে দৃষ্টিগোচর হলেও অন্ধের ন্যায় তা' দর্শন হতে বিরত থাকতে পারাই জ্ঞান। অনুরূপভাবে কোন শব্দ কর্ণগোচরে প্রবিষ্ট হবার আগে তা ত্যাগ করণ; শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্যন্ত হবার পূর্বে তা প্রশোমন করণ এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায় সর্ববিধ কার্যাদিতে বিরত থাকাই জ্ঞান। তোমরা এভাবে অন্ধ, বধির, বোবা, দুর্বল, মৃতের ন্যায় হয়ে অবস্থান কর। অবস্থান করতে পারবে তো? যদি পার তাহলে তোমরা জ্ঞানী বলে জানবে। তেমন জ্ঞানীদের পক্ষে সব সময় সংযমতা ভাব রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু অজ্ঞানীরা সংযম রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। বুদ্ধ বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বল্প সুখ পরিত্যাগ হেতু যদি বিপুল সুখে সম্ভাবনা দেখে তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই স্বল্প সুখ ত্যাগ করে থাকে। লৌকিক সুখ হল স্বল্প সুখ আর লোকোত্তর সুখ হল বিপুল সুখ। জ্ঞানী ব্যক্তির স্বল্প সুখের প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হয়ে বিপুল সুখকে হাতছাড়া করে না। তারা স্বল্প সুখকে থুথুবৎ ত্যাগ করে বিপুল সুখের অধিকারী হয়। কিন্তু অজ্ঞানীরা স্বল্প সুখকে ত্যাগ করতে অক্ষম। তাই তারা বিপুল সুখ কখনো লাভ করতে পারে না। তবে ইহা ঠিক যে, স্বল্প সুখ সহজে লাভ হয়, পক্ষান্তরে বিপুল সুখের জন্য প্রয়োজন দৃঢ় পরাক্রম। কাজেই তোমরা লৌকিক সুখ ত্যাগ করে লোকোত্তর সুখ লাভের জন্য দৃঢ় পরাক্রম উৎপন্ন কর। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ধন-সম্পদ, মানযশাদি দ্বারা সংসারিক জীবনের সুখকে লৌকিক সুখ বলে। এবিধ লৌকিক সুখের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই ভাগই দুঃখ থাকে, বাকি একভাগ মাত্র সুখ। মার্গফল লাভের ফলে অনুভূত অনবদ্য সুখকে লোকোত্তর সুখ বলে। লোকোত্তর সুখে শতভাগ পুরোই সুখ থাকে। সেখানে কোনো দুঃখ সংমিশ্রিত থাকতে পারে না। লৌকিক সুখ কলুষিত, কলঙ্কিত; কিন্তু লোকোত্তর সুখ পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক এবং বিশুদ্ধ।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সুখ ভোগ ত্যাগ কর। সুখ ভোগে রত থাকলে দুঃখের মধ্যে পতিত হতে হয়। মনে মনে সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করলে

চিন্তা ভোগ্য বিষয় অনুসন্ধানে রত হয়ে সীমাহীন দুঃখ পেতে থাকে। তোমরা বুদ্ধের উপদেশ মত ভোগই দুঃখ, ত্যাগেই সুখ এই নীতি অনুসরণ করে অবস্থান করে। মনে রাখবে বুদ্ধের উপদেশেই নির্বাণ লাভ হয়। সংসারে কাম্য সুখের আশা আকাঙ্ক্ষায় তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়-তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে না। বুদ্ধের উপদেশ, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের জ্ঞান লাভ ব্যতীত নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধগুরুর উপদেশ, শিক্ষা ব্যতীত অন্য কারো উপদেশের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ হয় না। নির্বাণ লাভের জন্য বুদ্ধের শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। নির্বাণ লাভেচ্ছুকদেরকে অবশ্যই বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ মত পরিচালিত হতে হবে। তোমরা বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ মত পরিচালিত হয়ে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

অবিদ্যা তৃষ্ণা উপাদান ক্লেশ স্বাক্ষর আয়তন খাতুই দুঃখের কারণ

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দেশনায় বলেন-নির্বাণ যেতে হলে তোমরা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারিক জীবন-যাপন করতে পারবে না। তোমাদের কাজ হল, পুনঃ গৃহী জীবনে ফিরে না যাওয়া এবং যে কোনো রমণীকে স্ত্রী রূপে দর্শন না করা। আবার আমি, আমার, আমিভূ এধারণা সমুদয়ও ত্যাগ করতে হবে। বৌদ্ধধর্ম মতে আমি বা আত্মবাদ দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। আমি বললে মিথ্যাদৃষ্টি উদয় হয়। মিথ্যাদৃষ্টি উদয়ে নির্বাণ সুখকে বিশ্বাস করা যায় না। মনচিন্তা মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি ভাব বিদ্যমান থাকলে মার থাকে। আর মার নির্বাণ গমনের পথে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে দেয়, অন্তরায় ঘটায়। সর্বোপরি যে কোন উপায় অবলম্বন করেই হোক নির্বাণ লাভ করতে দেয় না। দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভে বাঁধা প্রদান করা, অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া মারের কাজ। মার কি বলে জান? কেন নির্বাণ লাভ করবে, সংসারে কত প্রকারই-না ভোগ্য বিষয়ে রয়েছে, সংসারের সেসব ভোগ্য বিষয় পরিভোগ কর। জীবনকে উপভোগ কর। আমোদ প্রমোদে রত হয়ে সুখ ভোগ না করলে জীবনের মূল্যই বা কোথায়? স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ভোগ ঐশ্বর্য, মান সম্মানাদির সহিত সংসারিক জীবন-যাপনে সুখের কোন তুলনাই হয় না। নির্বাণ লাভের এখনও অনেক সময় রয়েছে, সুতরাং আগে ভোগ সুখে রত থাক। ভোগ সুখ করার শেষে না হয় নির্বাণ লাভের চেষ্টা করবে। এখন নির্বাণ লাভ করলে তো সেসব সুখ ভোগ করা হতে বঞ্চিত হবে। তোমরা মারের সেসব প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হওনা। কারণ মারের সেসব সুখের আশ্বাসসমূহ মরুভূমিতে সৃষ্ট মায়া মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা আপাতঃ সুখ বলে দৃষ্ট হলেও সে গুলোর পরিনামে সীমাহীন দুঃখ

লাভ হয়। তোমাদের মনের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশ, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু বিদ্যমান আছে বলে তোমরা দুঃখ পাচ্ছে। সেসব বিদ্যমান না থাকলে কিছুতে দুঃখ পেতে হতো না। দুঃখ কি, দুঃখ সমুদয় কি, দুঃখ নিরোধ কি, দুঃখ নিরোধের উপায় কি তা' না জানাই অবিদ্যা। সন্ধর্মের আশ্বাদ না পাওয়া, কোন বিষয় না জানাই অবিদ্যা। আলম্বনকে ঢেকে রেখে তার যথার্থ স্বভাবকে জানতে, দেখতে, বুঝতে না দেয়া অবিদ্যার কাজ। অবিদ্যা ঠিক চক্ষুছানির মত কালো আবরণ টেনে দিয়ে আলম্বনকে ঢেকে রাখে। অবিদ্যা অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অনাত্মে আত্মা বিশ্বাস জন্মায়। তাই অবিদ্যা জ্ঞানচক্ষুর আবরণ সদৃশ। তবে অকুশল, পাপমূলক কর্ম সম্পাদনে নানা উপায় অবলম্বনে অবিদ্যার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। অবিদ্যাই সর্ব অকুশলের মূল। যেখানে পাপ অকুশল সেখানেই অবিদ্যা। লাভের ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলে। তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পুনঃপুন তৃষিত করে। সেই আকাঙ্ক্ষিত তৃষ্ণার কোন শেষ নেই, একটি শেষ হতে না হতে অন্য একটি তৃষ্ণার জন্ম হয়। জল পিপাসা নিবারণ করতে কেহ যদি লবণার্থ জল পান করে তার তৃষ্ণা যেমন আরো বর্ধিত হয় তৃষ্ণাও ঠিক সেইরূপ। তৃষ্ণা তিন প্রকার, যথা-কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা। পঞ্চকামগুণ (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ) বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে কামনা লিপ্তাবস্থায় সংসারে সুখ ভোগের ইচ্ছাই কাম তৃষ্ণা। পুনঃপুন উন্মত্ত জন্মধারণ করে ভব ভবান্তরে ভোগ সুখে লালায়িত হওয়ার ইচ্ছাকে বিভব তৃষ্ণা বলে। উচ্ছেদবাদী ভোগ তৃষ্ণা অর্থাৎ উচ্ছেদ জনিত বীততৃষ্ণাকে বিভব তৃষ্ণা বলে। বর্তমান দুঃখযন্ত অবস্থা হতে ত্রাণ লাভের জন্য আত্মহনন ইচ্ছা বা আত্মহত্যাও বিভব তৃষ্ণার অন্তর্গত। আসক্তি, দৃঢ় গ্রহণ করাকে উপাদান বলে। তৃষিত বিষয়কে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে ধরে রাখা উপাদানের কাজ। সাপ যেমন ভেদ অনুসন্ধান করে ধৃত ভেদকে দৃঢ়ভাবে মুখে ধারণ করে রাখে। উপাদান চতুর্বিধ, যথা-কামোপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রতোপাদান, আত্মবাদোপাদান। রূপাদি পঞ্চকামগুণ হতে যে সুখ ভোগের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় সেই তৃষ্ণাকে রক্ষা করতঃ দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা কামোপাদান। তৃষ্ণা বিষয়কে নিত্য, সুখ, শুভ মনে করা এবং সেই অভিমতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাই দৃষ্টি উপাদান। তৃষ্ণার বিষয় বস্তুকে ভঙ্গুর মনে করে তা' স্থায়ীত্বের জন্য ব্রতোপসনাদি পালন করাকে শীলব্রত উপাদান বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে শ্বশত ধারণা বা আমি, আমার, আমিহু এরূপ ধারণাতে একগুয়ে ভাবে দেহ মনের প্রতি দৃঢ় আচ্ছন্ন থাকা অবস্থাকে আত্মবাদোপাদান বলা হয়। যা দ্বারা চিত্ত কলুষিত, পীড়িত, ব্যাধিযন্ত, নীচ, হীন ও মলিন হয় তাকে ক্রেশ বলে। ক্রেশ দশ প্রকার, যথা-লোভ, ঘেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, আলস্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা। এ ক্রেশসমূহ জন্ম

জন্মান্তরের পরিভ্রমণে সত্ত্বগুণকে বিবিধ প্রকারে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করে আসতেছে। অন্যদিকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা তথা কুশলকর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান, কষ্ট দেওয়া ক্রেশসমূহের কাজ। স্কন্ধ বলতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধকে বুঝায়। কাণ্ড, শিকড়, ডাল-পালা, পল্লবাদি সংযোগে স্থিত আকার বিশেষকে বৃক্ষ বলে অভিহিত করা হয়। ঠিক তদ্রূপ রূপের (চতুর্মহাভূত, যথা-পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু) রাশি, বেদনার (অনুভূতি) রাশি, সংজ্ঞার (হঁশ বা প্রাথমিক ধারণা) রাশি, সংস্কারের (জানা, যা দ্বারা অমুক হতে সমুককে পৃথক করে জানা যায়) রাশি, বিজ্ঞানের (চিন্তা, মানসিক বৃত্তি নিচয়ের আধার) রাশির সমবায়ে যে জীব বা ব্যক্তি প্রকাশ পায় তাই পঞ্চস্কন্ধ। চক্ষুদ্বারা দি ও রূপাদি আলম্বনের সংযোগে যা সর্বত্র প্রসারিত হয় তাই আয়তন। আয়তন অর্থ উৎপত্তি স্থান, উৎপত্তি ভূমি। যেমন-চক্ষু রূপের সমবায়ে চক্ষু বিজ্ঞানের উৎপত্তি। ঠিক তদ্রূপ শ্রোত্র ও শব্দের সমবায়ে শ্রোত্র বিজ্ঞান; ঘ্রাণ ও গন্ধের সমবায়ে ঘ্রাণ বিজ্ঞান; কায় ও স্পৃষ্টব্যের সমবায়ে কায় বিজ্ঞান; মন ও ধর্মের সমবায়ে মন বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। এভাবে আয়তনের সাহায্যে চক্ষু ইন্দ্রিয়াদির ও রূপ আলম্বনাদি সংযোগের বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন আধ্যাত্মিক আয়তন ও রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, বাহ্যিক আয়তন ভেদে আয়তন দ্বাদশ প্রকার। স্ব স্ব স্থানে প্রবর্তিত হয় বলেই ধাতু। অর্থাৎ যা স্বীয় স্বীয় স্বভাব বহন, ধারণ করে তা'ধাতু। ধাতু অষ্টাদশ প্রকার, যথা-চক্ষু ধাতু, শ্রোত্র ধাতু, ঘ্রাণ ধাতু, জিহ্বা ধাতু, কায় ধাতু, মন ধাতু, রূপ ধাতু, শব্দ ধাতু, গন্ধ ধাতু, রস ধাতু, স্পর্শ ধাতু, মন ধাতু ও চক্ষু-বিজ্ঞান ধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান ধাতু, কায়-বিজ্ঞান ধাতু, মন-বিজ্ঞান ধাতু। এই অষ্টাদশ প্রকার ধাতুর ধর্মে সংসারে দুঃখ ফল ধারণ করে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশ, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু হতে মুক্ত হলে অরহত্ব লাভ হয়। তাতে প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-সংসারে সবাই সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত। তোমরা সুখ ভোগ করা হতে বিরত থাক। সুখ ভোগের ইচ্ছা করলে বিবিধ দুঃখে পতিত হবে। অজ্ঞজনেরা দেখতে পায় না যে, সুখ ভোগের পিছনে ছুটে গিয়ে তারা অশেষ প্রকার দুঃখ-কষ্ট ডেকে আনে মাত্র। তাদের সে সুখ ভোগের আশা আকাঙ্ক্ষা কখনো মঙ্গল বয়ে আনে না। কারণ সুখ ভোগে মত্ত ব্যক্তি অকুশল, পাপমূলক কর্ম সম্পাদন করতেও পিছ পা হয় না। উপরন্তু সুখ ভোগে প্রকৃত সুখ লাভ হয় না, এবং ভোগ্য বিষয় প্রকৃত সার, সত্য বস্তুও নয়। বরং ভোগ্য বস্তু সুখ ভোগের আশা কল্যাণকর পথ রুদ্ধ করে দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, সুখ ভোগের দ্বারা কখনো তৃপ্তি লাভ হয় না। বরঞ্চ ভোগের আকাঙ্ক্ষা শেষ হবার

আগেই সত্ত্বদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন থেকে সত্ত্বগণ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায় না। তবে মৃত্যু যথা সময়ে হাজির হয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে কোন ভুল করে না। তাই তোমরা সুখ ভোগ করাকে লজ্জা, ভয় জ্ঞান করে দর্শন করতঃ সুখ ভোগ ত্যাগ কর। সুখ ভোগ ত্যাগ করতে পারলে অকুশলকর্ম সম্পাদন করা হতে নিজকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। সুখ ভোগ করা হতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে পারলে নির্বাণ সুখও লাভ হয়। যে সুখ লাভ হলে আর কোন কিছু সুখের প্রয়োজন হয় না। বিমুক্তি সুখের রসে তখন মন-প্রাণ মহা পরিভূক্তির অবগাহনে সিক্ত হয়ে যায়। তাই প্রকৃত সুখ লাভ করতে হলে নির্বাণ সুখ লাভের কোন বিকল্প নেই।

তোমরা আত্ম বা নিজকে জয় কর। ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এধারণাসমূহকে জয় কর। মারকে অর্থাৎ সুখ ভোগে আসক্ত হয়ে থাকা মনকে জয় কর। কারণ মনচিন্তের মধ্যে আমি বা আত্মবাদ থাকলে অহংকার উৎপন্ন হয়। আমি ‘মানুষ-পুরুষ-মহিলা’ এধারণাসমূহ বিদ্যমান থাকলে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর মার বা সুখ ভোগে আকাঙ্ক্ষিত মন সর্বদা বিবিধ কর্মে নিয়োজিত হয়ে সুখ-দুঃখের আবর্তে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সুখ ভোগের বাসনা দ্বারা সত্ত্বগণ সুখ-দুঃখের খোলস ছেড়ে সার, সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। বলা যায়, মারের প্রভাবে সত্ত্বগণকে বিবিধ প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তাই আত্মজয়, মানুষ জয়, মার জয় করে নির্বাণ যেতে হয়। তোমরাও সকল প্রকার দুঃখ কষ্টের শিকার হওয়ার হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য আত্ম-মানুষ-মার জয় করে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বিপুল ধন ঐশ্বর্য (যেমন এয়ার কন্ডিশনের বহুতলা ভবন, উন্নত মানের গাড়ী, কোটি কোটি অর্থবিশ্বের ছড়াছড়ি), যশ সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করাকে লৌকিক হীন সুখই বলা যায়। কারণ এসকল সুখের মধ্যে কখনো পরিভূক্তি নেই, প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। ভোগ বিলাস সুখ ভ্রমে দুঃখই আনয়ন করে থাকে সার। ঐশ্বর্য সুলভ ভোগ বিলাসে প্রকৃত সুখের লেস মাত্র নেই। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে। তাই-তো বলি, তোমরা ভোগের পিছনে ছুটে হীন সুখের প্রত্যাশা করবে না। লৌকিক হীন সুখের প্রত্যাশী হলে উৎকৃষ্ট লোকোত্তর সুখ লাভে সমর্থ হবে না। কারণ হীন পছা অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ কিছু লাভ হয় না, শ্রেষ্ঠ অবলম্বনেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়। অর্থাৎ হীনত্বই অগ্রত্ব হয় না, অগ্রত্ব দ্বারাই অরহত্ব লাভ হয়। বুদ্ধ বলেছেন ভোগ লাভের পথ এক, আর নির্বাণের পথ অন্য। দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নির্বাণ পথের পথিককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, ভোগের দিকে যেন তার মন ধাবিত

না হয়। ভোগ বিলাসের পারিপার্শ্বিক প্রলোভনের ফাঁদ হতে দূরে থাকার জন্য তাকে চক্ষু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্ধ তুল্য, মুক ও বধির না হয়েও মুক, বধির তুল্য এবং শক্তি, প্রাণ (জীবন) বিদ্যামানেও দুর্বল, মৃতবৎ হয়ে থাকতে হয়। তোমরা নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করার জন্যে; যে মহৎ লাভের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে তা'সফল ও শ্রীবৃদ্ধি করণে অবশ্যই হীন সুখ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার সর্বতোভাবে পরিহার কর। এবং অপ্রমত্তভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে চেষ্টা শীল হও। মানুষ (অর্থাৎ 'আমি মানুষ' এধারণা) হীন, তৃষ্ণা (সুখ ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা) হীন, সংস্কার (সর্বদা নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত থাকা) হীন। তাই তোমরা হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার পরিত্যাগ কর। তাহলে মহৎ সদর্থ পরিপূর্ণ হবে।

বনভক্তে বলেন-স্বামী-স্ত্রী হয়ে হীন গৃহী জীবন-যাপন করা বৌদ্ধধর্মের আদর্শ নয়। প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের মত কি জান? সাধারণতঃ পুরুষ মহিলাগণ যে পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে সংসারী জীবনাচারন করে তা' পাপজনক, অকুশলমূলক কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী হবার অর্থ দাঁড়ায় অকুশলকর্ম সম্পাদনের সঙ্গী জুটা। বলা যায়, অধিক পরিমাণে পাপ, অকুশল সম্পাদনে বাধ্য করার জন্য মার তাদেরকে একে অপরকে সঙ্গী সংগ্রহ করে দেয়। কারণ একজনে বা একাই যতটুকু পাপ, অকুশলকর্ম সম্পাদন করা যায় দুইজনে মিলেমিশে করলে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপকর্ম সম্পাদিত হয়। বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হওয়াকে আমি নির্লজ্জতার কাজই বলে থাকি। যাদের পাপের প্রতি লজ্জা নেই এবং যারা দুঃখকে ভয় করে না তারা একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে বরণ করে নেয়। যারা পাপের প্রতি লজ্জাশীল ও সংসার দুঃখের প্রতি ভয়শীল তারা কিছুতেই বিয়ে করতে পারে না। তদুপরি আজকে যাকে নব বররূপে প্রাণসম প্রিয় মনে করে বা নব বধূরূপে গ্রহণ করতেছে আগামীকাল সে বধূ মৃত্যুবরণ করতে পারে। অথবা তার উল্টো নব বরও মারা যেতে পারে। তাহলে কোথায় স্বামীরূপে থাকল? কোথায় বা স্ত্রী? সবই মিথ্যায় পরিনত হয়ে গেল নয় কি। অশ্রবণা নয়নে তখন শুধু দুঃখ রয়ে যাবে সার। কাজেই বিয়ে করে একে অপরকে আমার স্বামী, আমার স্ত্রী মনে করা কখনো যুক্তিযুক্ত নয়। এবিধি চিন্তা করেই তো আমি সংসারী জীবন পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ নির্বাণ লাভের চেষ্টাশীল হয়েছিলাম। তোমাদেরকেও বলছি-সংসারী হবার দূরের কথা, তোমরা কোন রমণী কত মনোজ্ঞ, সুশ্রী কিনা সেরূপেও দর্শন করার চেষ্টা করবে না। কারণ মনোজ্ঞ, সুশ্রী নিমিত্ত দর্শনে তা লাভের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। সে তৃষ্ণা ক্রমান্বয়ে সমস্ত চিন্তকে অধিকার করে বসে। চোর যেমন সুযোগ পেলে গৃহস্থের সব সম্পত্তি চুরি করে

নিয়ে যায়, তেমনি কাম তৃষ্ণাও তোমাদের সমস্ত পুণ্য, জ্ঞানসমূহ অপহরণ করে নিয়ে যাবে। তখন তোমাদের সর্বস্বান্ত হয়ে অতীব দুঃখময় জীবন-যাপন করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ইন্দ্রিয়াসক্তি বা কাম তৃষ্ণা যাকে একবার অধিকার করে বসে তার জীবনে দুঃখ অনিবার্য। কাম তৃষ্ণায় নিপীড়িত ব্যক্তির চিত্ত সর্বদা দুঃখের মধ্যে অবস্থান করে।

মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পুদ্গলেরা পরকাল, কর্মফল, কুশলাকুশল ও চারি আর্যসত্য বুঝতে পারে না। এবং সে সকল সত্যকে বুঝতে, জানতেও আগ্রহী নয় তারা। তারা নিজের অভিমতকে আঁকড়ে রেখে অন্য সব কিছুকে মিথ্যা বলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। বুদ্ধ বলেছেন, মিথ্যাদৃষ্টির ন্যায় দূষণীয় জগতে দ্বিতীয় আর নেই। যত প্রকার দোষের হেতু একমাত্র মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি সত্ত্বগণকে দিক ভ্রান্ত পুরুষের ন্যায় বিপরীত মার্গে ধাবিত করায়। তাই মিথ্যাদৃষ্টি অতিশয় দূষণীয়। মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণের কোন কথায় কর্ণপাত না করা ও বিশ্বাস না করাই উত্তম। মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তি মহা পাপী, তারা শুধু অকুশলকর্মই সম্পাদন করে থাকে। মিথ্যাদৃষ্টির বশীভূত না হয়ে তোমরা সকলে সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন হও। সম্যক্‌দৃষ্টি অর্থ যথার্থ সত্য, সঠিকভাবে দর্শন। এক কথায়, যে যেমন তাকে তেমনভাবে দর্শন করাই সম্যক্‌দৃষ্টি। অর্থাৎ গাছকে গাছ এবং বাঁশকে বাঁশরূপেই দেখা। সম্যক্‌দৃষ্টি দুই প্রকার, যথা-লৌকিক সম্যক্‌দৃষ্টি ও লোকোত্তর সম্যক্‌দৃষ্টি। পরকাল, কর্মফলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে লৌকিক সম্যক্‌দৃষ্টি বলে। চারি আর্যসত্য, যথা-দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় এ'চারি প্রকার মহা সত্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করাকে লোকোত্তর সম্যক্‌দৃষ্টি বলে। লৌকিক সম্যক্‌দৃষ্টি পুদ্গলেরা মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করে দিব্য সুখের অধিকারী হয়। লোকোত্তর সম্যক্‌দৃষ্টি পুদ্গলেরা আসবক্ষ্য করে ইহজন্মে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করে থাকে। যারা বর্তমানে মনুষ্য জীবন লাভ করেও প্রাণী হত্যা, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, মারামারি, কাটাকাটি, ব্যভিচারে রত, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য প্রয়োগ, মদ, গাজা, আফিং, হেরোইন গ্রহণ করতঃ নানা অকুশলমূলক, অশান্তিমূলক কর্মাদি সম্পাদনে রত হয় তারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন। দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে নিরয়গামী হতে হবে। তারা যদি ন্যূনতম লৌকিক সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন হতো তাহলে সে সকল অকুশল, পাপ উৎপাদক কর্ম সম্পাদনে বিরত থাকত। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে প্রায় সবাই মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পুদ্গল। তারা পরকাল কি? কর্মফল কি? কুশলাকুশল কি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এবং দুঃখ কি, দুঃখ সমুদয় কি, দুঃখ নিরোধ কি, দুঃখ নিরোধের উপায় কি? সে সম্বন্ধেও অজ্ঞ। ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হয়ে তারা অসত্য বিষয়ে সত্যাস্থেয়ী, অসার বিষয়ে সারাস্থেয়ী হয়ে পরে থাকে।

ফলে মিথ্যার বেড়াজালে হাবুডুবু খেয়ে সার, সত্য ধর্মসমূহ উপলব্ধি করতে পারছে না। আবার কুশলধর্ম ত্যাগ করে অকুশল, পাপধর্মই সম্পাদন করতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জ্ঞান যোগে দেখতে পায় যে, বর্তমানের মনুষ্যগণ দেহ ত্যাগের পর শতকরা সাতানব্বই/আটানব্বই জনই নিরয়গামী হয়। বাকী দুই কি তিনজন মাত্র সদগতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা কায় ভাবনা, চিন্তা ভাবনা কর। ভাবনা অর্থ মনের কাজ, জ্ঞান উৎপাদক চিন্তা। স্থায়ী চিন্তকে পরিশুদ্ধ করার্থে নিষ্পাপ, পবিত্র বিষয় স্মরণ করে পাপ চেতনা হতে বিরত রেখে প্রজ্ঞা সংরক্ষণ, প্রবৃদ্ধি করণ করাই ভাবনা। দশ অশুভ ও বত্রিশ প্রকার কায়গতানুস্মৃতি অনুযায়ী কায়াকে অশুচি, ঘৃণ্য, দুর্গন্ধ রূপে ভাবনা করতঃ দেহের প্রতি লোভ, আসক্তি পরিত্যাগ করাই কায় ভাবনা। কায় ভাবনা দ্বারা লোভ, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, সৌন্দর্য্য স্পৃহা ধ্বংস হয়ে যায়। কায় ভাবনা না করলে সেসব দিন দিন বেড়েই চলে। চিন্তা উৎপন্ন মাত্রেই নিরোধ শীল। কোন চিন্তা আমি নয়, আমার নয় এভাবে সর্ববিধ চিন্তে অনাসক্ত থাকাই চিন্তা ভাবনা।

তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ এখন তোমাদের আসল কাজ হচ্ছে অজ্ঞানতামূলক কর্মসমূহ পরিত্যাগ করে জ্ঞান উৎপাদক কর্ম সম্পাদন করা। অজ্ঞান বা অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলে সুখের অধিকারী হতে পারবে। অবিদ্যাকে নিরোধ করতঃ বিদ্যা উৎপন্ন করেই নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

মানব জন্ম বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সদ্ধর্ম লাভ বড়োই দুর্লভ

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—তোমরা অতিসত্বর বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সদ্ধর্ম লাভের চেষ্টা কর। বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ অর্থ কি জান? বুদ্ধের আবিষ্কৃত চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান দর্শন লাভ করা, সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া। এবং সে সকল জ্ঞান অনুসরণ করে সকল প্রকার সন্দেহভাব তিরোধান হওয়াকে বুঝায়। সদ্ধর্ম লাভ বলতে বুঝায় মার্গফলে প্রতিষ্ঠ হয়ে অবিদ্যা তৃষ্ণা ধ্বংস করতঃ লোকোত্তর নৈর্বাণিক সুখ উপলব্ধি করা। বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভ হলে নিজকে ভাগ্যবান বলে জানবে। কারণ বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভ হলে আর কোন প্রকার দুঃখে পতিত হতে হয় না। বুদ্ধ বলেছেন, মনুষ্য জীবন লাভ করা দুর্লভ, বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সদ্ধর্ম লাভ তদপেক্ষা দুর্লভ। তোমরা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে একটা দুর্লভ বিষয় লাভ করেছে। সুতরাং পরবর্তী দুর্লভ বিষয় গুলোও লাভের

চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করা যেমন সার্থক হবে, তেমনি সকল দুর্লভ বিষয় লাভের গৌরবময় অর্জনের অধিকারী সমর্থ হবে। পক্ষান্তরে দুর্লভ মনুষ্য জনম লাভ করে যদি পরবর্তী দুর্লভ বিষয়ের সন্ধান না করে শুধুমাত্র ভোগ বিলাসের ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে জীবনের দিনগুলো ক্ষয় কর, তাহলে দুর্লভ মানব জনম বিফলে রূপান্তরিত হবে। যেহেতু একমাত্র মানব জনম লাভ হলেই বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সদ্ধর্ম লাভ কার সহজ হয়। কাজেই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করার পরও বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভ করা সুযোগকে হেলায় ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়। বরঞ্চ দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করতে বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং সদ্ধর্ম লাভের চেষ্টা করা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত কর্তব্য।

তোমরা পঞ্চরস্কন্ধের সাথে প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা করবে না। এবং আমি অহংকার ত্যাগ কর। তাহলে অবশ্যই নৈর্বানিক সুখের অধিকারী হবে। পঞ্চরস্কন্ধ বা কোন ব্যক্তির প্রতি প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা ভাব পোষণ করলে তাকে অবশ্যই দুঃখ পেতে হয়। প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা পোষণ হতে মন সর্বদা প্রিয়, মনোজ্ঞ বিষয় অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত থাকে। তার মন সংসারাসক্তের দিকে ধাবিত হয়ে অনুরাগানলে দম্ভ-বিদম্ভ হয়। সে অবস্থায় অনুরাগবৃত্তি মনকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে শত সহস্র পাকে জড়ায়। আর সে বন্ধন ছড়াতে গেলে হৃদয়ে ব্যথা বাজে। ঐ ব্যথা সামান্য নয়, হৃদয়কে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে অতিষ্ঠ, অস্থির করে তোলে। অথচ সে স্বপ্ন সদৃশ মিথ্যা প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা পোষণ হতে মুক্ত থাকলে কোনো দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না। বৃদ্ধকালে প্রব্রজিত জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে বনভন্তে প্রশ্ন করেন-তোমরা মনে এখনো কি আগের প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা পোষণভাব রয়েছে? সত্ত্বর মনচিন্তকে প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা পোষণের উর্ধ্বে নিয়ে যাও। অতীতের দিকে পিছনে ফিরে না তাকিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চল। গৃহীকালীন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারোর কথা স্মরণ করবে না। মনচিন্ত থেকে অতীতের সমস্ত ঘটনা মুছে ফেলে দাও। সংসারী জীবনকে দুঃখ দেখে তাতে ভয় দর্শন করে প্রব্রজিত হয়েছে, কেন সেসব কথা আবার স্মরণ করবে? তাহলে তো নিক্ষিপ্ত থুথু গলাধঃকরণ করার ন্যায় হয়ে যাবে। সেই ঘৃণিত কাজ কখনো করতে যাবে না। অতীতের ঘটনা বা কথা স্মরণ করাকে সমুদয় সত্য বলে জানবে। সমুদয় হতে যাবতীয় দুঃখের উৎপত্তি হয়। কাজেই সেই সমুদয় হতে মুক্ত হবার চেষ্টাশীল হও।

অতীতের যা কিছু ফেলে দাও অতীতে,

কদাপি দিওনা তারে পুনঃ আবির্ভাব হতে।

প্রদ্যেয় বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা নির্বাণ লাভ করাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম

কর্তব্য ও প্রকৃত সুখ অর্জন বলে মনে কর। তাহলে নির্বাণ লাভ করতে বীর্যবান, উদ্যোগী হতে পারবে। তোমাদের মন সংসার সাগর উত্তোরণের অভিলাষী হবে। নির্বাণ গমন মার্গে পর্বত প্রমাণ বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হলেও তা লঙ্ঘন করে নির্বাণরাজ্যে পৌছতে সক্ষম হবে। সর্বদা নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থাপন করলে ভোগ বিলাস ও সংসারের প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান জন্মে। মন প্রতিনিয়ত পরমার্থ জ্ঞান লাভ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর ক্রমশঃ পরমার্থ জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে এমন এক বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয় যাকে বলা হয় বিমুক্তি। তাই তোমরা নির্বাণ লাভকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, উত্তম কর্তব্য এবং পরম সুখ অর্জন বলে মনে মধ্যে সর্বদা জাগ্রত রাখ। আবার, বিষয় বাসনায় অনুরক্ত হয়ে যদি ভোগের চিন্তায় মনকে নিয়োজিত রাখ তাহলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। কারণ মনচিত্ত তখন ভোমরের মতন এক ভোগ্য বিষয় হতে অন্য ভোগ্য বিষয়ে ঘুরে বেড়াতেই আয়ু নিঃশেষ করে ফেলবে। নির্বাণ লাভের অভিলাষী হওয়ার সময় কোথায়? কাজেই নির্বাণ লাভ করাকে সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং পরম সুখ প্রাপ্তি জ্ঞান করতঃ ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ, অনার্থ, হয়ে বলে ধরে নিলে নির্বাণ লাভের উদ্যোগী হতে সহজ হয়। তথা সহজে নির্বাণের দিকে মন ধাবিত হয়।

তোমরা সবাই জ্ঞানী হয়ে যাও; মূর্খতাভাব সর্বোতভাবে পরিহার কর। যদি জ্ঞানী হতে পার তাহলে কোন প্রকার অজ্ঞান, অকুশলমূলক কর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো দুঃশীলতা আচরণ করতে পারে না। তারা সর্বদা পাপ কালিমা স্পর্শ হতে বিরত থাকেন। বুদ্ধ দীর্ঘ নিকালে বলেছেন, যথায় প্রজ্ঞা তথায় শীল, যথায় শীল তথায় প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাবানই শীলবান, শীলবানই প্রজ্ঞাবান। শীল এবং প্রজ্ঞা দ্বারাই জগতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্মকে অধিপতি করে, ধর্মকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করতঃ ধর্মত জীবন-যাপন করে থাকে। অসুস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তি যেমন অঙ্গ, জীবন রক্ষার জন্য দুঃখার্জিত ধন ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না, ঠিক তেমনি জ্ঞানীরা শীল রক্ষার জন্য জীবন বলি দিতেও প্রস্তুত থাকে। তারা জীবনের বিনিময়ে হলেও দুঃশীলতা আচরণ করে না। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পাপ কালিমা দ্বারা কলুষিত, কলঙ্কিত জীবন-যাপন করতে লজ্জাশীল ও ভয়শীল হয়ে থাকে। দুঃশীলতা আচরণ করাকে তারা বিষবৎ ত্যাগ করে পবিত্র, শীল সম্পন্ন জীবন রচনা করতে সচেষ্ট হয়।

অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখসৃষ্টিকারী। জগতে যত প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয় একমাত্র মূর্খতার দরুন। শূকর যেমন পৃথিবীর স্থানে বিচরণ ও মল ভক্ষণে কোন প্রকার ঘৃণাভাব উদ্বেক করে না, লজ্জিত হয়

না, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিও অকুশল, পাপমূলক কর্ম সম্পাদনে সর্বদা ভয়হীন। অধিকন্তু তারা আনন্দের সহিত একের পর এক অকুশল সম্পাদন করে থাকে। অকুশলকর্ম সম্পাদনে এবং অকুশলকে প্রশংসা করতে তারা সিদ্ধ হস্ত। আবার, মূর্খ শুধু নিজেই অকুশলকর্মে নিয়োজিত থাকে না, অন্যদেরকেও সে কর্মে উৎসাহিত করায় অকুশল সম্পাদনে বাধ্য করায়। মূর্খ যতদিন অকুশলের করুণ পরিণতির মুখোমুখি না হয় ততদিন মধুময় বলে অকুশল সম্পাদন করতেই থাকে। কিন্তু অকুশল যখন ফল প্রদান করতে শুরু করে তখন মূর্খকে দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করতে হয়। অকুশলকর্ম সম্পাদন করে মূর্খ ব্যক্তি নিজেকে নিজের শত্রুতে পরিণত করায়। মূর্খ ব্যক্তি জীবন-সায়াকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় যখন সে অকুশল কর্মসমূহ ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ডিং করা দৃশ্যাবলীর ন্যায় একের পর এক কর্মনিমিত্তসমূহ স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়ে থাকে, তখন সে অহোঃ আমি কতই না অপকর্ম করেছি, আমার আর রক্ষা নাই এই ভেবে অনুতপ্ত, অনুশোচনা করতে করতে নিরয়গামী হয়। তাই মূর্খের কৃত অকুশল কর্মসমূহ ইহ-পর উভয় লোকেই দুঃখ প্রদান করে থাকে। সে অকুশলকর্মের জন্য তাকে উভয়লোকে অনুশোচনায় দক্ষ-বিদগ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়।

আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা মূর্খ না হয়ে জ্ঞানী, পণ্ডিত হয়ে যাও। বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানী, পণ্ডিতের ধর্ম-মূর্খের ধর্ম নহে। মূর্খেরা বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। তারা এ'ধর্ম বুঝতে, জানতে অক্ষম। বলা যায় মূর্খের দ্বার কোন ভালো, মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদিত হয় না। আবার মূর্খ ব্যক্তির মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। কিছু সংখ্যক মূর্খদেরকে বুঝানো সম্ভব বা সংপথে ফিরে আনা যায়। কিন্তু যারা অতি মূর্খ তাদেরকে বুঝানো যায় না। যেমন চোরাবালিতে পতিত হলে হাঁটু, কোমর, বাহু পর্যন্ত ডুবে গেলে তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিন্তু একেবারে মাথাটুকুও দেখা যায় না এ'রকম নীচে তলিয়ে গেলে তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ঠিক তদ্রূপ অতিরিক্ত মূর্খ লোকদেরকে সংপথে ফিরে আনা সম্ভব নহে। আমি জ্ঞানযোগে তোমাদেরকে নিরীক্ষণ করতেছি, কে কতটুকু অজ্ঞানের চোরাবালিতে পতিত হয়েছে। খুব বেশি অজ্ঞানের চোরাবালিতে তলিয়ে গেলে আমিও কিছু করতে পারবো না। তাই তোমরা দিনে দিনে পাণ্ডিত্য অর্জন কর। বৌদ্ধধর্মের মতে পণ্ডিত কি রকম জান? অতি বাক্য ভাষণ করলে, কথায়-বার্তায় দক্ষ হলে, কথায় কথায় শ্লোক আবৃত্তি করলে পণ্ডিত বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না বা পণ্ডিত বলে পরিগণিত করা যায় না। পক্ষান্তরে সহনশীলতা, জীবের দয়ালু, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমা, মৈত্রী, সর্বদা অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখার মত সদৃশ্যের অধিকারীকে পণ্ডিত বলা হয়।

বনভক্তে বলেন-অজ্ঞানীরা পঞ্চস্কন্ধ বা সংসারকে সুখ বলে থাকে। তাই

তারা সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে সুখ ভোগের তৃষ্ণা উৎপন্ন করে। জেনে রাখবে, মনচিন্তে তৃষ্ণা থাকলে সুখভোগের ইচ্ছা জন্মাবেই। কারণ লাভের ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছা-তো তৃষ্ণা। ইহকালে সুখভোগের আশা এবং পরকালে সুখভোগের আশা করা তৃষ্ণার কাজ। অজ্ঞান তৃষ্ণা সে বিষয়সমূহ পুনঃপুন চিন্তা করে তৃষ্ণাকে ইন্দন যোগায়। তাই নির্বাণ লাভেচ্ছুকদেরকে ইহ-পরকালের আশা করা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হয়। এবং সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করাকে অতীব দুঃখ বলে জানতে হয়।

এ'সংসার বা জগৎ সবই কল্পনা; এখানে সত্য, বাস্তব বলে কিছুই নেই। সবই স্বপ্নের মতন অলীক, মরুভূমিতে সৃষ্ট মায়া মরীচিকা তুল্য মিথ্যা।

মিছে এ'ভুবন, মিছে এ'কায়া,
মিছে শুধু রূপ, মিছে আয়তন;
মরীচিকা সম মায়া।

অনিল প্রবাহ প্রায় জীবন বহিয়া যায়,
রেখে যায় হায়! শুধু স্মৃতির ছায়া।

উত্তপ্ত জল বৃষ্ণদ যেমনি ফুটে না ফুটেই ভেঙ্গে যায়, তৃষিত মৃগ পানি পানের জন্য যতই মরীচিকার দিকে অগ্রসর হয় ততই তা' দূরে সরে যায়, তদ্রূপ এ সংসারও মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত মাত্র। এখানে সার, সত্য, সুখ বলে কিছুই নেই; সবই অন্তঃসার শূন্য। কিন্তু অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা জগতের সে আসল, সত্য স্বরূপ গোপন করে রাখে। সত্ত্বগণকে সে প্রকৃত, সত্য দর্শন করতে দেয় না। বরঞ্চ মিথ্যা সুখের জাল মেলে ধরে তাতে উদ্ধীষ্ট করায় তাদেরকে সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। সে শৃঙ্খলে বাধা পড়ে সত্ত্বদেরকে বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হতে হয়। কিন্তু যখনি জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় এ'সংসার নিতান্তই দুঃখপূর্ণ, সংসারে সব কিছু অনিত্য এবং মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়, তখনি সংসারে সব বিষয় বাসনাকে অতিক্রম করে লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তখনই প্রকৃত সার, প্রকৃত সত্য, প্রকৃত সুখের সন্ধান লাভ হয়।

তিনি বলেন-তোমরা জগতের প্রতিটি বিষয়কে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করে বিদর্শন ভাবনা ভাবিত, বর্জিত, বহলীকৃত কর। একমাত্র এ ত্রিলক্ষণ জ্ঞানের মাধ্যমে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। সে ত্রিলক্ষণ জ্ঞান কি? ক্ষয় লয় হচ্ছে বলে অনিত্য, অহরহ নিষ্পেষিত হচ্ছে বলে দুঃখ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংগঠিত হচ্ছে বলে, কেহকে ইচ্ছামত পরিচালিত করতে পারে না বলে অর্থাৎ আপনার নহে বলে অনাত্ম। এই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম কোন অনুমান কথা নয়, বাস্তব সত্য, প্রত্যক্ষভূত জ্ঞান বা দর্শন। জগতের

যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হোক না কেন সেদিকেই অনিত্যের ছোঁয়া পরিদৃষ্ট হয়। জীবন যেমন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে তদ্রূপ উৎপন্ন সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বও সাময়িক। উৎপত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস তার পিছু নেয়। তাই অনিত্যতার প্রতি নিত্য ধারণা করা মূর্খতার পরিচায়ক ছাড়া কিছুই নয়। যা চ্যুত বা হারিয়ে যায় তা পীড়ার কারণ হয়ে থাকে, সুতরাং দুঃখ। উপরন্তু জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, ঈর্ষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখসমূহ উত্তাল তরঙ্গমালার তুল্য একটার পর একটা দুঃখ সত্ত্বগণকে আক্রমণ করতেই থাকে। সে দুঃখের আক্রমণে সত্ত্বগণকে সর্বদা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয়। বলা যায় এ সংসারে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দুঃখ ভোগ করতে হয়। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ চমকানোর মত যে ক্ষণিক সুখ দৃষ্ট হয়, তা দুঃখেরই পূর্বাভাস মাত্র। আবার, যেখানে সতত পরিবর্তনের ইঙ্গিত, ক্ষয়শীলতা এবং সর্বদা দুঃখাবহ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, সেখানে কি কোনক্রমে আমি, আমার এরূপ অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব? কখনো না। কাজেই অনাত্ম। এভাবে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মের মাধ্যমে জগতের ক্ষণভঙ্গুরতা, দুঃখময়তা, অসারতা বা রিক্ততা পরিষ্কারভাবে স্মৃতির মানসপটে ধরা পড়ে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সব সময় স্মৃতি বিদর্শন অভ্যাস করে মনের মধ্যে জাহ্নতভাব বজায় রাখ। তাহলে জগতের প্রতি আর কোন প্রকার আসক্তি উৎপন্ন হবে না। অজ্ঞানতা ভাব দূরীভূত হয়ে মনচিন্ত জ্ঞানের দিকে ধাবিত হবে। এবং বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভ করতে কোন বাধা-বিপত্তি থাকবে না। সকল প্রকার দুঃখ হতে ত্রাণ লাভ হওত নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। এটাই বৌদ্ধধর্মের আসল লক্ষ্য এবং পরম লাভ।

সাধু, সাধু, সাধু।

আমি মানুষ সে পুরুষ সে মহিলা এ ধারণা ত্যাগ কর

একসময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য হল ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহের বশবর্তী না হয়ে মারভুবনে অবস্থান না করা। কারণ সে সকল ধারণাগুলো মনের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে মারভুবন অতিক্রম করা যায় না। এবং মারভুবনে অবস্থান করা হেতু বিবিধ দুঃখ পেতে হয়। ‘আমি মানুষ’ এ ধারণা, ‘সে পুরুষ’ এ ধারণা, ‘সে মহিলা’ এ ধারণা পোষণ করতঃ অবস্থান করাকে পতঙ্গের জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করা তুল্যই জানবে। উক্ত ধারণাসমূহ পোষণ করে সত্ত্বগণ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গার গর্ত তুল্য মারভুবনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের দুঃখ নিজে আনয়ন করতেছে। তোমরা পতঙ্গদিগকে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে দেখেছ কি? রাত্রিকালে জ্বলন্ত আগুন দর্শনে পতঙ্গগুলি যেন কিসের আনন্দে একটার পর একটা ঝাঁপ দিতে থাকে। আর নিমিষেই তাদের নগণ্য দেহ লেলিহান অগ্নিশিখায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উদাহরণে বলা যায়, এখানে সে জ্বলন্ত অগ্নি হল মারভুবন, এবং ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ পোষণ করে সত্ত্বগণের সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করা হল অজ্ঞ পতঙ্গের ন্যায় মারভুবনে ঝাঁপ দেওয়া। ‘আমি মানুষ’ এ ধারণা, ‘সে পুরুষ’ এ ধারণা, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ কিছুতেই সত্য, সঠিক নয়-মিথ্যা ধারণা মাত্র। সে ধারণাসমূহের বশীভূত হয়ে মারভুবনে অবস্থান করলে দুঃখ পেতে হয়। তোমরা মনচিন্ত হতে উক্ত ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ধ্বংস করে মারভুবন ত্যাগ করতঃ অমারভুবনে অবস্থান কর। এবং অতিসত্ত্বের এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও ‘আমরা আর মারভুবনে অবস্থান করব না, অমারভুবনেই বিচরণ করব’। অমারভুবনে বিচরণ করতে সক্ষম হলে কোন প্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থা করতে হয় না। কিভাবে অমারভুবনে বিচরণ করবে? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসব ক্ষয় জ্ঞান অর্জন করে অমারভুবনে বিচরণ করতে হয়। অন্য কোন বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন দ্বারা অমারভুবনে বিচরণ করা সম্ভব নয়। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গফলাদি সহ নির্বাণ এই নব লোকোত্তরধর্মের দ্বারা অমারভুবনে সুখ লাভ হয়। মনে রাখবে, মারভুবনে বিচরণকারীর চিন্তে কিছুতে সুখ লাভ হয় না। প্রকৃত সুখ লাভ করতে হলে মনচিন্তকে অমারভুবনে নিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। কাজেই দাঁড়ানে, গমনে, শয়নে, উপবেশনে সর্বাবস্থাতে মনচিন্তকে অমারভুবনের দিকে ধাবিত হতে যত্নশীল হবে।

প্রব্রজিত হয়ে তোমরা যদি মারভুবনে অবস্থান কর তাহলে লোভ, তৃষ্ণার অধীন হয়ে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বেই করবে সার। কখনো রূপের, কখনো শব্দের,

কখনো গন্ধের, কখনো রসের, কখনো স্পর্শের সংঘাতে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। সেরূপ অস্থির চিত্তে কি শান্তি লাভ করা যায়? কখনো না। বরং কামনা বাসনা বেড়ে অশেষ দুঃখ ডেকে আনে মাত্র। ইন্দ্রিয়ের তাড়নার পিছনে ছুটলে কিছুতেই শান্তি লাভ হয় না। একমাত্র ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি লাভ করে।

ভিক্ষু শ্রামণদেরকে বাহ্যিক প্রিয়তা হতে নেই। অষ্ট পরিক্খার সহ যে কোন চতুর্প্রত্যয়ে সম্ভব থাকাই উত্তম। কোন ভিক্ষু শ্রামণ যদি চতুর্প্রত্যয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন করে তা' খুব অন্যায়। প্রব্রজিতকে কখনো ভোজন প্রিয়, শয়নাশয়ন আয়াসী, ঔষধ-পথ্য প্রত্যাশী ও সাজ-সজ্জায় বিলাসী জীবন যাপনকারী হওয়া উচিত নয়। আমি অনেক ভোজনপ্রিয়, আলস্য-তন্দ্রাভিভূত ভিক্ষু দেখেছি। তোমরা সেরূপ হীন আচরণকারী ভিক্ষু হবে না। প্রব্রজিত হয়ে যদি কেহ সর্বদা চতুর্প্রত্যয়ে তৃষ্ণা আসক্ত হয়ে অবস্থান করে তাহলে সে-দেহান্তে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। চতুর্প্রত্যয় একদিকে নিরুপদ্রবে ধ্যান-সমাধি করার সহায়ক বটে, কিন্তু অন্যদিকে অত্যাধিক চতুর্প্রত্যয় লাভ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন স্বরূপ। কারণ অধিক চতুর্প্রত্যয় লাভ অনেক ভিক্ষুকে অন্ধ বানিয়ে ফেলে। তারা দায়ক-দায়িকা কর্তৃক পূজিত হয়ে নিজেকে প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞানী, পূজ্য মনে করে বিপথগামী হয়ে যায়। যেহেতু মন হঠাৎ একবারও যদি লাভ-তৃষ্ণার দিকে ধাবিত হয়, তাকে ফিরে আনা সত্যিই সুকঠিন। আর সে মন ক্রমেই মারের পেতে রাখা ঐহিক লাভোৎপত্তির ফাঁদে পড়ে পারমার্থিক লাভের পথ ত্যাগ করতঃ অনিবার্য পতন ঘটায়।

অন্যদিকে দায়কের শ্রদ্ধা প্রদত্ত চতুর্প্রত্যয়কে উৎকৃষ্ট-হীন, ভালো-মন্দ রূপে বিচার করে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ দায়কেরা নিজের শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতামূলক দান করে থাকে। তদুপরি ভিক্ষুর পূর্বজনমের দান পারমী অনুসারে বর্তমানে চতুর্প্রত্যয় লাভ হয়। চতুর্প্রত্যয়ে বাদ-বিচার করলে ভিক্ষুর ধ্যান-সমাধি সঠিকভাবে আচরিত হয় না। ভৌতিক দেহকে কার্যক্ষম করে রাখার জন্য ভিক্ষুকে চতুর্প্রত্যয় গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় চতুর্প্রত্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট জাতীয় চতুর্প্রত্যয় লাভ কোন রূপেই কাম্য হতে পারে না। পরিধেয় চীবর, আহাৰ্য, আবাস স্থান, ঔষধ পথ্য এ চতুর্প্রত্যয় অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে ভিক্ষুর প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীলও বিসৃত থাকে না।

শ্রদ্ধেয় বনভস্তে আরও বলেন-টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-রত্ন, মান-সম্মান, যশ-কীর্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ পরিবার সম্পন্ন এসব লৌকিক সুখের চেয়ে মার্গফল নির্বাণ সুখ লাভ বহুগুণে বেশি সুখ ও শ্রেষ্ঠ। তোমরা সমস্ত সংসারের প্রতি ভয়শীল ও পাপের প্রতি লজ্জী সম্পন্ন হলে প্রব্রজিত জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করতে পারবে। সংসারের প্রতি ভয়শূন্য, পাপ, অকুশলে লজ্জাহীন হলে প্রব্রজিত জীবন অতীব দুঃখের হয়ে উঠে। তোমাদের মনচিন্তে

যদি জ্ঞান উদয় হয় তাহলে তোমরা সংসারের প্রতি ভয়শীল ও পাপের প্রতি লজ্জাশীল হবে। কারণ চিন্তের মধ্যে জ্ঞান উদয় হলে সংসারের অনিবার্য দুঃখসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় এবং পাপকর্মে নিয়োজিত থাকতে লজ্জার সম্ভার হয়। কিন্তু যাদের জ্ঞান নেই বা অজ্ঞানী তারা পাপে লজ্জাশূন্য, সংসার দুঃখে ভয়হীন।

‘আমি মানুষ’ এ ধারণা, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ মনে স্থান করে দিতে লজ্জাশীল হবে। যেহেতু সেসব ধারণাসমূহ ভ্রান্ত, অমূলক, সত্য-সার বিহীন ছাড়া কিছুই নয়। উপরন্তু বেদনা দায়ক, দুঃখ, পাপ আনয়নকারী। তাই সে সকল ধারণাগুলো মনের মধ্যে স্থান না দিয়ে সর্বদা জ্ঞানের সহিত জায়গা থেকে অবস্থান কর। তাহলে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। অজ্ঞানান্ধ সত্ত্বগণ উক্ত ধারণাসমূহ মনের মধ্যে আঁকড়ে রেখে বিবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকে। তারা প্রথমে মনচিন্তে ‘আমি মানুষ’ এ ধারণা স্থান করে দেয়। তারপর একে অপরকে ‘আমি পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ ধারণা নিয়ে দর্শন করে। আর সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি উৎপন্ন করতঃ পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে অনন্ত দুঃখ সাগরে ঝাঁপ দেয়। প্রকৃতপক্ষে ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ মিথ্যা। এ’দেহও মিথ্যা, আমার নয়। তোমরা মিথ্যাকে সত্যরূপে দর্শন করবে না এবং যা মিথ্যা, যেখানে সুখ বলতে কিছুই নেই সেখানে সুখের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করবে না। তাহলে দুঃখে পতিত হবে না, সত্য ভ্রমে মিথ্যাকে গ্রহণ করে ভ্রান্তের ভিতর অবস্থান করতে হবে না।

তোমরা নিজে থেকে নিজে পরীক্ষা কর। চিত্ত মারভুবনে অবস্থান করতেছে নাকি অমারভুবনে অবস্থান করতেছে তা নিরীক্ষণ কর। মারভুবনে অবস্থান করলে দুঃখ পেতে হবে, লজ্জিত হতে হবে। চিত্ত কখনো স্থির, শান্ত থাকবে না। সর্বদা অতৃপ্তির জ্বালায় পুড়ে যেতে হবে। জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলবে না। অপরদিকে মনচিন্ত অমারভুবনে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরম সুখ লাভ হয়। কোন দুঃখ, অতৃপ্তির অবকাশ নেই।

যে কোন আলম্বনকে গ্রহণ করা, উপভোগ করা অবিদ্যা, তৃষ্ণার কাজ। আসক্তি উৎপাদন ও তা লাভে সুখের ইচ্ছাপোষণ করার নাম অবিদ্যা। পুনঃপুন গ্রহণ, উপভোগের ইচ্ছাই তৃষ্ণা। অবিদ্যা, তৃষ্ণা না থাকলে আসক্তিও নেই, সুখ ভোগের ইচ্ছাও নেই। তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের প্রকৃত কাজ কি হওয়া উচিত জান? চিন্তের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থানরত অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে মূলোচ্ছেদ করে দেওয়া। নচেৎ চিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা বিদ্যমানে সংসারে পুনঃপুন জন্মধারণ করে বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হবে। দুঃখমুক্তির নির্বাণ লাভ কখনো হবে না। কারণ তৃষিত বিষয় উপভোগে কিছুতেই তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে না, বরং বেড়েই চলে। যেমন লবনাক্ত পানি পানে পানির পিপাসা মেটানো দূরের

কথা, ক্রমে বেড়েই যায়। তোমরা মনচিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে স্থান না দিয়ে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞানকে স্থান করে দাও। মনচিন্তের মধ্যে চারি আর্যসত্য জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান উদয় হলে অবিদ্যা, তৃষ্ণা দূরীভূত হয়ে যাবে। যেহেতু মনচিন্তের মধ্যে জ্ঞান উদয় হলে আর অজ্ঞান থাকতে পারে না। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? গৃহীরা অবিদ্যা, তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ নিয়ে সংসারী হয়ে কী না বর্ণনাভীত দুঃখ পাচ্ছে। তাদের সে অসহ্য দুঃখ-কষ্টসমূহ দেখেও জ্ঞান উদয় করা যায়। এভাবে তোমরা সর্বদা জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করে অবস্থান কর। তাহলে অবিদ্যা, তৃষ্ণা মনচিন্তের মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে না।

পরিশেষে তিনি বলেন—‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণাসমূহ অজ্ঞানীরা পোষণ করে থাকে। সে সকল ধারণাসমূহ যে মিথ্যা, ভ্রান্ত তারা তা’দেখতে পায় না। এবং মিথ্যা ধারণা পিছনে ঘুরে ঘুরে কী দুর্বিষহ দুঃখই-না ভোগ করতে হচ্ছে, তাও বুঝতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সেসব মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে সচেতন। তাই সে ধারণা পোষণ করে সুখের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে না। আমি, আমার, আমিত্ব ভাবও পোষণ করে না। শরীরকে নিয়ে সুখ ভোগের ইচ্ছা করলে অবিদ্যা, তৃষ্ণাই বৃদ্ধি পায়। তাই (তোমাদেরকে) বলি, তোমরা দেহকে পরিত্যাগ কর। দেহকে পরিত্যাগ করতে পারলে নির্বাণ লাভ হবে। কিভাবে দেহকে ত্যাগ করবে জান? এ দেহ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, অশুচি, দোষপূর্ণ, মুক্তির বিঘ্নকারক এভাবে দর্শন করলে দেহ ত্যাগ করা সহজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি, আমার, আমিত্ব ভাবও দূরীভূত হয়। তোমরা এভাবেই অবস্থান কর।

আমি যে, আমার বাড়ি, আমার ধন, আমিত্ব ধারণা,
মোহ অজ্ঞানতা সব, বিজ্ঞপ্তি কল্পনা।
বিদর্শন প্রজ্জালোক হয়ে যবে যথা,
অবিদ্যার মোহ ভাঙ্গে ঘুচে অজ্ঞানতা।
চলাফেরা, উঠা বসা প্রতি সম্মালনে,
নাম রূপ জন্মে পুনঃ ক্ষয় প্রতিক্ষণে।

এজগতে সব কিছু নামরূপ। এখানে নামরূপ ছাড়া অন্য কিছু নেই। বলা বাহুল্য, বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জগতের সমস্ত কিছুকে নামরূপরূপে দর্শন করতে পারলে নির্বাণ পরম সুখ লাভ হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অজ্ঞানী না হয়ে জ্ঞান ও সত্যের সহিত অবস্থান কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে রাজবন বিহারের দেশনালায়ে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন-মানুষ পৃথিবীতে সুখের আশায় অজ্ঞান হয়ে একে অপরের প্রতি শত্রুতা আচরণ, হিংসাহিংসি, রেষা-রেষি, হানাহানি, অন্যায়, অবিচার করতেছে। মনুষ্যগণ জ্ঞানী, পণ্ডিত হলে এতো শত্রুতা, হানাহানি, অন্যায়, অপরাধ, দুঃখের সৃষ্টি হতো না। মানুষ বর্তমানে লোভ, দ্বেষ, মোহ জাত জ্ঞানচর্চা দ্বারা গূঢ় মূর্খ, অজ্ঞানী হয়েছে বলে দিন দিন দুঃখ, অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সবাইকে অতিকষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। বুদ্ধ বলেছেন, মূর্খ অনর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখ সৃষ্টিকারী। জগতে যা' কিছু দুঃখ সৃষ্টি হয় তা' একমাত্র মূর্খতার দরশন। তাহলে প্রমাণ পাওয়া গেল মানুষ যদি মূর্খ হয় তাহলে অশেষ প্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। এবং নিজের সৃষ্ট দুঃখে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তার সঙ্গে অন্যদেরকেও দুঃখে পতিত করায়। তজ্জন্য বলছি, তোমরা সবাই জ্ঞানী, পণ্ডিত হয়ে যাও। সে পণ্ডিত কি রকম? যিনি সহনশীলতা, সকল জীবের প্রতি দয়ালু, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমাশীল, মৈত্রীপরায়ণ ও অক্ষুণ্ণভাব রক্ষাকারী, তিনিই পণ্ডিত। তোমরা সহনশীল হয়ে সহ্য করতে চেষ্টা কর। দুঃশীল জনসাধারণের প্রতি হিংসামূলক দুর্বাক্য, দুর্ব্যবহার সহিষ্ণুতা সহকারে সহ্য করা উত্তম। পরে শত অনিষ্টসাধন করলেও তা' নিজের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফল মনে করে সহ্য করা উচিত। কারণ যিনি ত্রিংশ পারমিতা পরিপূর্ণ করতে সমুদ্র জলের অধিক রক্ত দান করেছেন, নক্ষত্র রাজির চেয়ে চক্ষু দান করেছেন, পর্বত হতেও বেশি মুকুট শোভিত শির দান করেছেন এইরূপ অনন্ত পুণ্যের আধার ভগবান বুদ্ধকে পর্যন্ত পূর্বকৃত পাপে দুঃখ দিয়েছিল; আর আমাদের মত সাধারণ লোকের কথাই বা কী? কাজেই দুর্জ্ঞানের কটুবাক্য, কটুব্যবহারের শিকার হলেও সবকিছুকে স্বীয় পূর্বজন্মের কর্ম মনে করতঃ মৈত্রী চিন্তে সহ্য করতে হবে। আবার, অনেকে বলে থাকে আমি তো কারোর ক্ষতি, অনিষ্টসাধন করেনি, তবুও আমাকে কেন অপরের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হচ্ছে? হ্যাঁ, বর্তমানে সে ভালো, কুশলকর্মে রত আছে বটে, কিন্তু পূর্বজন্মে যে অকুশল, পাপে রত ছিল না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সুতরাং যেভাবে হোক দুঃখ কষ্টের শিকার হতে থাকলে তা' সহ্য করতেই হবে। কারণ

সহ্য করতে না পারলে দুঃখের পরিমাণটুকু খুব বেশি বলে মনে হয়। তাই সর্বাবস্থাতে সহনশীলতা গুণে সহ্য করা পণ্ডিত, বুদ্ধিমানের কাজ। মশা মাছি হতে শুরু করে পশু-পক্ষী, ভূত প্রেত, যক্ষ, নাগ, মানুষ প্রভৃতি সকল প্রাণীর প্রতি আপন প্রাণসম দয়া লু হও। দান শীলাদি কুশলকর্ম সম্পাদনে পিছ পা হবে না। দোষী-নির্দোষী সকলের প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি রাখ। শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান না করে সকলের প্রতি মঙ্গল, সুখ ও উন্নতির কামনা কর। নিন্দা-প্রশংসা সর্বাবস্থাতে সম্ভষ্ট মনে অবস্থান কর, তাহলে পণ্ডিত হতে পারবে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের সর্বদা সুখ লাভ হয়, তারা পরম সুখে জীবন-যাপন করতে সক্ষম। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিদেরকে সবসময় দুঃখের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয়। সুখ তাদের কাছে সর্বদা পরাহত। অন্যদিকে মূর্খরা দুচিন্তাকারী, দুর্বাক্য ভাষণকারী, দুষ্কর্মকারী। তারা অকুশলকর্ম সম্পাদন করে নিজেকে যেমন দুঃখের ভাগী করায়, তেমনি অন্যদেরকেও দুঃখের মধ্যে পতিত করে। তাই মূর্খব্যক্তি শুধু নিজের শত্রু নয়, পরিবারের, সমাজের, সকলের শত্রু। তারা শুধু নিজেকে ধ্বংস করে ক্ষান্ত হয় না, পরিবার-সমাজ সবই ধ্বংস করে থাকে। বুদ্ধ (আমাদের মতন) ভিক্ষুদেরকে বলেছেন, ভিক্ষুগণ! তোমরা মূর্খকে পণ্ডিত, অসাধুকে সাধুতে পরিণত কর। পণ্ডিত, সাধু হলে তাদের ইহ-পরকালে পরম সুখ লাভ হয়। পণ্ডিত, সাধু মানুষ মৃত্যুর পর দিব্যসুখের অধিকারী হতে পারে। পণ্ডিতগণ ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝতে পারে। তাই তারা মন্দকে বাদ দিয়ে ভালো, অন্যায়কে বাদ ন্যায়, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্য গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু মূর্খগণ সম্পূর্ণ তার বিপরীত, তাদের ইষ্টানিষ্ট বোধের অভাব। তোমরা মূর্খতা পরিহার করে পণ্ডিত হতে চেষ্টা কর। ভালো, সত্য, ন্যায় কর্ম সম্পাদন করলে সুখ আর মিথ্যা-মন্দ-অন্যায় কর্ম সম্পাদনে দুঃখ পেতে হয় বলে জানবে।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভালো মন্দ বিচার করে থাকে। বিচারের পর তারা মন্দকে ত্যাগ করতঃ ভালোকে গ্রহণ করে। তোমরাও যদি জ্ঞানী হতে পার তাহলে মন্দকে ত্যাগ করে ভালো কাজসমূহ সম্পাদন করবে। আর অজ্ঞানী হলে ভালো কাজের পরিবর্তে মন্দ কাজসমূহ করে থাকবে। তাই কৃতকর্মের দ্বারা জ্ঞানী, অজ্ঞানী পরিচয় হয়। অজ্ঞানীরা অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ করতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানীরা ন্যায়, নির্দোষমূলক, সঠিক কাজসমূহ সম্পাদন করতঃ ভুল গলদের অতীত হয়। আবার, অজ্ঞানীরা অন্যায় করলে তা' অন্যায় বলে স্বীকার করে না, অপরাধমূলক কাজ করলে তা' অপরাধ বলে স্বীকার করে না। যেমন গরু বেড়া ভেদ করে ধান্যক্ষেত্র নষ্ট করলেও তা' অপরাধ বলে স্বীকার করে না। আমার খাদ্য আমি খেয়েছি এতে অপরাধ বা দোষের আর কী? ঠিক তেমনি অজ্ঞানীরা

কোন অপরাধ করলেও অপরাধের দোষ স্বীকার করে না। আচ্ছা ধর, কিছু সংখ্যক গরুকে তুমি হাত বুলায়ে বুলায়ে বুঝাও যে, ‘ধান্যক্ষেত্র নষ্ট না করে তোরা শুধু ঘাস খাবে কেমন? এবং ছেড়ে দাও’। তাহলে গুরুগুলো কি তোমার কথা বুঝতে পারবে? ধান বাদ দিয়ে শুধু ঘাসসমূহ খাবে কি? কখনো না, তা কিছুতে হবে না। ঠিক তদ্রূপ অজ্ঞানী ব্যক্তিদেরকেও কোনক্রমে, কোন রকমে বুঝানো যায় না। তাদেরকে অনাগয়, অপরাধ, ভুল, গলদের কর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত রাখা সম্ভব নয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা খাড়া জায়গায় বিচরণ না করে সমতল স্থানে চলে এসো। আমি দেখতেছি, তোমরা দেড়শত/দুইশত হাত সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর খাড়া স্থানে লাফালাফি করে আনন্দ স্ফূর্তি করতেছ। একটু পদঞ্চলন হলেই একেবারে নীচে পড়ে গিয়ে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুর বিহীনে তা’তোমরা দেখতেছ না। কারণ বর্তমানে আমি ব্যতীত চক্ষুস্মান ব্যক্তি এখানে আর কেহ নেই। কাজেই আমি যদি তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করতঃ বারণ করে না দিই, তাহলে তোমরা সবাই নীচে পড়ে গিয়ে মরতেই থাকবে। আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে তো নাকি অবিশ্বাস্য বলে উড়ে দিবে? আমি বলছি, বর্তমানে তোমরা যেখানে অবস্থান করতেছ সেটা সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের (মাথার উপর) খাড়া জায়গা। সেখান থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসো। ঠিক তদ্রূপ মারভুবন হল সুউচ্চের পর্বতশৃঙ্গের খাড়া জায়গা, আর আমারভুবন হল পঞ্চাশ/ষাট মাইল বিস্তৃত বিশাল সমতল জায়গা। যারা একে অপরের সহিত মারামারি, কাটাকাটি এবং যুদ্ধ বিগ্রহ করে মরে যাচ্ছে, তারা সেই সুউচ্চ শৃঙ্গের উপর খাড়া স্থান হতে নীচে পতিত হচ্ছে বলে জানবে। আর তাদের বিবিধ অকুশল, অজ্ঞানমূলক কর্মে নিয়োজিত থাকাকে সে খাড়া স্থানের উপরিভাগে লাফালাফি করার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে কোন মুহূর্তে তাদের পদঞ্চলন হতে পারে, এবং পদঞ্চলন হলে মৃত্যু সেখানেই অবশ্যম্ভাবী। তাই তোমাদেরকে দয়া, করুণা পরবশে আমি খাড়া জায়গা হতে সমতল ভূমিতে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেছি। তোমরা আমার ধর, শুন, এবং আমার কথামত অকুশলকর্ম ত্যাগ করে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর। তাহলে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের খাড়া থেকে পদঞ্চলন হয়ে মরে যেতে হবে না। অর্থাৎ মারভুবন অতিক্রম করে আমারভুবনে যেতে সক্ষম হবে। সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান করতে পারবে। তোমাদেরকে মারভুবন অতিক্রম করিয়ে দিয়ে আমারভুবনে পৌঁছে দেয়াই হল আমার উদ্দেশ্য। তোমরা যদি পণ্ডিত হও তবে আর কখনো সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গের খাড়া স্থানে বিচরণ করবে না। সমতল ভূমিতে নেমে আসবে। অন্যদিকে জ্ঞান ও সত্যের সহিত অবস্থান করা, এবং সত্য

ধর্মকে আশ্রয় করে থাকা, জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে রাখাকে সমতল ভূমি বলে জানবে। অজ্ঞান, মিথ্যার সহিত অবস্থান করাকে খাড়া জায়গা বলে।

বর্তমানে অনেকেই (স্বামী-স্ত্রী) আমার কাছে এসে তাদের দাম্পত্য জীবনের কলহ, অশান্তির কথা প্রকাশ করতেছে। স্বামী বলে থাকে তার স্ত্রী খারাপ, স্ত্রীর জন্যই সে দুঃখ পাচ্ছে। আবার স্ত্রী বলে তার স্বামীই খারাপ, স্বামীর জন্যই সে দুঃখ পাচ্ছে। তাদের কথা মতে তারা নিজেরা খুব ভালো, অন্য জন খারাপ। কিন্তু যারা অজ্ঞানী, যাদের জ্ঞান নেই তারাই প্রকৃত খারাপ। বিবাহ করে একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়া এসব অজ্ঞানীর কাজ। কাজেই স্বামী যেমন খারাপ, স্ত্রীও তেমনি খারাপ। আমি তাদেরকে বলি, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করলে তোমরা শান্তি পাবে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে জ্ঞান থাকা চাই, উভয়ের কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকা চাই, তবেই সাংসারিক জীবনে সুখ শান্তি বয়ে আসে। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে শীলবান, প্রজ্ঞাবান হতে হবে, একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বপ্রেম, ভগ্নিপ্রেম থাকতে হবে, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে আপন ভগ্নির মতন দর্শন করে সুখে দুঃখে সমভাগী হবে। অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীকে আপন ভ্রাতার মতন দর্শন করে সুখে দুঃখে সমভাগী হবে। তাহলে দুঃখময় এ সাংসারিক জীবনের কিছু পরিমাণে হলেও সুখ, শান্তি মিলবে। সংসারী হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সাধু হতে হবে। সে সাধু কি রকম? যার পঞ্চশীল পালন করে, কোন প্রাণীকে হিংসা করে না তারা সাধু। আর যার পঞ্চশীল পালন করে না, প্রাণীর প্রতি হিংসা ভাব পোষণ করে তারা অসাধু। সাধু মানষ মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লাভ করে, অসাধু মানুষ মৃত্যুর পর নিরয়গামী হয়। তোমরা সংসারী জীবনে সুখী হতে চাইলে পুজ্ঞানুপুজ্ঞভাবে পঞ্চশীল পালন কর। সে পঞ্চশীল কি? প্রাণী হত্যা হতে বিরত, চুরি করা হতে বিরত, পরপুরুষ ও পরস্ত্রী হরণ করা বা ব্যভিচার করা হতে বিরত, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য প্রয়োগ হতে বিরত, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা। তোমরা সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করে অবস্থান কর। বুদ্ধ বলেছেন, জীবনের বিনিময়ে হলেও শীল ভঙ্গ করবে না। উঠ, অলস হয়ে থাকিও না, ধর্ম আচরণ কর। ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ কর, অন্যায়ভাবে আচরণ করবে না। ধর্মচারী লোক ইহলোকে পরলোকে পরম সুখে আনন্দের সহিত অবস্থান করে। ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে থাকে। তোমরা যদি পঞ্চশীল পালন করতঃ ধর্মাচরণ করতে পার, তাহলে বিপদের সময় সংদেবতাগণ তোমাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু দুঃশীল হলে সংদেবতাগণ কোন সময়, কিছুতেই সাহায্য করবে না। বর্তমানের মানুষ প্রায় সবাই দুঃশীল পাপী, তাই দেবতাগণ তাদেরকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা হতে বিরত

আছে।

পরিশেষে তিনি বলেন-মূর্খ, অজ্ঞান, অসাধু হবে না। তোমরা পণ্ডিত, জ্ঞানী, সাধু হয়ে যাও। যারা পণ্ডিত, জ্ঞানী, সাধু তারা অকুশলমূলক, পাপজনক কর্ম সম্পাদনে লজ্জাশীল ও ভয়শীল হয়ে থাকে। পণ্ডিত, জ্ঞানী সাধুগণ অকুশল, পাপ, অধর্মের প্রতি লজ্জাশীল এবং দুঃখ উৎপাদনমূলক অজ্ঞান কর্মে ভয়শীল হয়ে পরম সুখে অবস্থান হয়ে থাকে। তাই আবারো বলছি, তোমরা পণ্ডিত, জ্ঞানী হবে। এবং মূর্খ, অজ্ঞান, অসাধুর সংসর্গ সর্বোত্তমভাবে ত্যাগ করে চলবে। মূর্খ, অজ্ঞানী, অসাধু ব্যক্তি শুধু নিজে দুঃখের মধ্যে থাকে না অন্যদেরকেও দুঃখের মধ্যে পতিত করতে চেষ্টা করে। অজ্ঞান, অকুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করতে মূর্খ ব্যক্তি সিদ্ধহস্ত। তাই বুদ্ধ বলেছেন, মূর্খের অদর্শনই সুখ, মূর্খ ব্যক্তি সর্বদা পরিত্যাজ্য। তোমরা সবাই পণ্ডিত সাধু হও, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুখ লাভ হবে। তোমরা আমার সাথে কণ্ঠ মিলায়ে বল 'কারোর প্রতি শত্রুতা আচরণ করবো না, কারোর ক্ষতিসাধন করবো না, কারোর অন্যায় করবো না। কোন প্রাণী হিংসা করব না'। একথা গুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলব তোমাদের সুখ লাভ হবেই, শান্তি সমৃদ্ধি বয়ে আসবে। সংসারী হয়ে জ্ঞান ও সত্যের সহিত অবস্থান করতে পারলে ধনী হতে পারবে, পরিবারে উন্নতি আসবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু অজ্ঞান, মিথ্যার বশীভূত হলে পরিবার দিন দিন অধঃপতনের দিকে যাবে। তোমাদের জ্ঞান, সত্য উদয় হবার জন্য আমি দেশনা দিতেছি। তোমাদের জ্ঞান, সত্য উদয় হলে সর্ব বিষয়ে জয়ী হতে পারবে; সুখ, শান্তি লাভ হবে। আর ইহকালে যেমন সুখ মিলবে তেমনই পরকালেও মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

কর্মই সত্ত্বগণের পরম বন্ধু এবং ঘোরতর শত্রু

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে খাগড়াছড়িস্থ মিলনপুর নিবাসী মিসেস সাগরাণী চাকমার বাড়িতে আয়োজিত দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনায় বলেন-অকুশলকর্ম সত্ত্বদিগকে ইহকালে যেমন দুঃখ দেয়, পরকালেও তদপেক্ষা দুঃখ প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে কুশলকর্মের দ্বারা ইহ-পর উভয়কালে সুখ লাভ হয়। কিছুতেই পরিহানি হবার অবকাশ থাকে না। আজকের এ দানানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত জান? কুশলকর্ম সম্পাদন করে ইহ-পরকালে সুখ লাভের তাগিদে। তাই বলি, তোমরা সর্বদা কুশলকর্মে নিয়োজিত থেকে অকুশলকর্ম হতে নিজকে বিরত রাখবে। তাতে তোমাদের স্বর্গ লাভ হবে। আবার কুশলকর্ম হতে নিজকে বিরত রেখে অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে নিরয়গামী হবেই। বলা বাহুল্য আমার এই উপদেশসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করে যথাযথ পালন না করলে তোমরা সবাই নিরয়গামী হবে বলে জানবে। বুদ্ধের সময়ের গোপাল নামক এক উপাসকের কথা উল্লেখ করে তিনি একটি উপখ্যান বলেন, বুদ্ধের সময় গোপাল নামক এক উপাসক একদা ভগবান বুদ্ধকে পায়সান্ন দান করতঃ ধর্মদেশনা শ্রবণ করে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছার আগে পথের মধ্যে একদল দস্যুর কবলে পরে প্রাণ হারায়। ভিক্ষুগণ সে কথা অবগত হলে বুদ্ধের সমীপে গোপালের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণের কথা নিবেদন করলেন। বুদ্ধ বলেন-হে ভিক্ষুগণ! গোপালের মৃত্যুবরণ হলেও তার সে পায়সান্ন দান, ধর্মদেশনা শ্রবণ করার ফল ব্যর্থ হয়ে যায়নি। পায়সান্ন দান, ধর্মদেশনা শ্রবণের পুণ্যফলে সে স্বর্গবাসী হয়েছে। তার কৃত পুণ্যকর্মের ফল কখনো বৃথায় যায়নি। আবার, অকুশল পাপকর্ম সর্বদা ভয়ঙ্কর, দুঃখপূর্ণ ফল প্রদান করে। তোমরা যদি অতীত জন্মে অকুশলকর্ম সম্পাদন কর তাহলে ইহজন্মে দুঃখ পেতেই হবে। তাই বর্তমানে দুঃখ ভোগ করলে অমুকের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছি বলে অন্যজনকে দোষারোপ করা কখনো উচিত নয়। সুখ, দুঃখ স্বীয় কর্মফলের উপরই নির্ভর করে থাকে। দায়ক-দায়িকাদেরকে কুশলাকুশল সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়ে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করা ও অকুশলকর্ম সম্পাদন বারণ করা আমাদের ভিক্ষুর কর্তব্য। সাথে সাথে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা করা এবং ভয়াবহদেরকে অভয় দান করা একজন ভিক্ষুর করণীয় ব্রত।

সত্ত্বগণের সুখ লাভ ও দুঃখ ভোগ করা সবই স্বীয় কর্মের উপর নির্ভর করে থাকে। কেহ কারোর সুখ-দুঃখদায়ক কর্তা হতে পারে না। পূর্বজন্মের কৃত অকুশলকর্ম থাকলে বর্তমানে যত বড় মহাপুরুষ হোক না কেন তাকে দুঃখ পেতে হবেই। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ, অর্থশ্রাবক মৌদ্গল্যায়ন সহ অন্যান্য মহাপুণ্যবান

জ্ঞানীদেরকেও পূর্বজন্মের অকুশলের ফলে কায়িক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। আর সাধারণ লোকের কথাই বা কী! তারা তো ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ পেলেও আর্চয্য হবার কিছু নেই।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-দেশ, কাল, পাত্র বিচার করে জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল অবলম্বনে চলবে। নতুবা প্রাণ হারাবার সম্ভবনাকেও কিছুতে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমি কিরূপ স্থানে অবস্থান করছি, এখানে নিয়ম চালু রয়েছে, কিরূপ আচরণ করলে এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে খাপ খায়ানো যাবে? বর্তমানের সময়টা কি রকম, এই সময়ে কি আচরণ গ্রহণ যোগ্য হতে পারে, কোন আচরণ এসময়ে ফলপ্রসূ হবে? এই স্থানের লোকজন কোন পর্যায়ের, তাদের অভিপ্রায় কি, তাদের সঙ্গে কি আচরণ শোভনীয় হতে পারে? এ সকল বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান রাখা উচিত। তাহলে নিরাপদে নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করা যায়। আবার, তাই বলে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে অকুশল, পাপজনক কর্ম সম্পাদন করতে হবে, তা কিন্তু নয়। এখানে দেশ-কাল-পাত্র বিচার কার অর্থ কেবল বিশেষ কৌশল করা মাত্র। যেমন, অজ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্তি তর্কে না গিয়ে নীরব থাকা উত্তম। যারা হিতৌপদেশকে অহিতকর মনে করে তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা সমতুল্য ভালো লোকের সন্ধান না পেলে একাই চলা উত্তম। তবুও অজ্ঞানীদেরকে সঙ্গী হিসাবে বেচে নিতে নেই। অজ্ঞানীর বৃথা কথায় কর্ণপাত না করে নিজকে সংকর্মে নিয়োজিত রাখা। মিথ্যার প্রলোভনে প্রলুদ্ধ না হওয়া। মূর্খজনকে উপদেশ দিলে, পাপীর সঙ্গে সংসর্গ করলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও দুর্নাম রটে, পরিহানি হয়; তাই তাদেরকে এড়িয়ে চলা। সংপথে বিচরণ করতে গিয়ে যত বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন তা'কৌশলে মোকাবেলা করে সংপথে প্রতিষ্ঠিত থাকা। এভাবে দেশ-কাল-পাত্র বিচার করে জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করা মাত্র।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন-তোমরা চিন্তা চৈতসিকের দ্বারা যে কর্ম সম্পাদন করতেছ সে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান আছে কি? জ্ঞান রাখা অবশ্যই দরকার। যেহেতু বর্তমানে যেকোন কর্ম সম্পাদন করবে মৃত্যুর পর সে কর্মানুসারে জন্মগ্রহণ করবে। সত্ত্বগুণের কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়, কর্মই গতি, কর্মই আশ্রয়, কর্মই প্রকৃত সম্পদ, পাপজনক বা কল্যাণকর যেকোন কর্ম সম্পাদিত হয় সে কর্মই তাদের ভবিষ্যতে পুনঃ জন্ম ধারণের হেতু হয়। কর্মের হাত থেকে কারোর ফাঁকি দেবার সুযোগ নেই। তাই সত্ত্বগুণের সবচেয়ে বড় বন্ধু যেমন কর্ম আর সবচেয়ে বড় শত্রুও তেমনই কর্মই। স্বীয় কৃত কুশলকর্ম পরম বন্ধুর ন্যায় শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে অকুশলকর্ম ঘোরতর শত্রুর ন্যায় নীচের দিকে নামিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে।

একসময় ভগবান নখাত্মের উপর বালি রেখে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করতঃ বললেন—হে ভিক্ষুগণ! আমার এ নখাত্মের বালি বেশি নাকি মহাপৃথিবীর বালি বেশি? ভিক্ষুগণ বললেন, ভগবানের বালি কখনো মহাপৃথিবী বালির সহিত তুলনা হতে পারে না। কারণ মহাপৃথিবী বালির চেয়ে নখাত্মের বালি অতি সামান্য। ভগবান বললেন ঠিক সেরকমই ভিক্ষুগণ! মনুষ্যগণ অতি নগণ্য সংখ্যক উর্ধ্বলোকে গমন করে। বাক্সিরা সবাই চারি অপায়ে পতিত হয়। তারা একবার মাত্র মনুষ্য কূলে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পর অপায়ে গমন করতঃ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বর্ণনাভীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকে। তাই কর্ম নিয়ন্ত্রণে অতীব সতর্কতার প্রয়োজন। খামখেয়ালী বশে বা অসতর্কতা সহিত কোন কর্ম সম্পাদন করবে না। কারণ কুশলকর্ম সম্পাদিত হলে তো ভালো, কিন্তু অকুশলকর্ম সম্পাদন করা গেলে মহা বিপদ ঘটে যাবে। বলতে হয় কর্মের তারতম্য অনুসারে সত্ত্বগুণের সুখ ও অর্জিত হয়, দুঃখের কারণও হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে অকুশল বারণকারীর সংখ্যা নেই বললে চলে। শুধু গৃহী কেন প্রব্রজিতরাও অকুশলকর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছে। যদিও বা দায়বদ্ধতার খাতিরে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যককে অকুশল বারণ করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ছাড়া কেহ মনে-প্রাণে অকুশল বরনকারী নয় বললেও মন্দ বলা হবে না। সবাই যেন অকুশলকর্মে উৎসাহিত করতে আহ্বাহী। তারা সুযোগ পেলে নিজে যেমন অকুশলে রত হয় অন্যদেরকেও অকুশলকর্মে দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। অকুশলকর্ম কেন সম্পাদন করে জান? একমাত্র মারের অন্তঃ শক্তির প্রভাবের জন্য। মারে তাদেরকে অকুশলকর্ম করাতে বাধ্য করায়। কারণ তাদের মনচিন্তা মারের দ্বারা বশীভূত, মারের কাছে পরাজিত। সুতরাং মার তার ইচ্ছামত অকুশল সম্পাদনে বাধ্য করাচ্ছে-তাদের মনচিন্তাকে। তবে তারা যদি একটু মনযোগী হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে মার কিছুতেই তাদের মনচিন্তাকে বশীভূত করতে সক্ষম হতো না। তোমাদের মনচিন্তা মারের দ্বারা আক্রান্ত তোমাদেরকেও অকুশলকর্মে রত হতে হবে। তোমরা সর্বদা সতর্কতা ভাব রক্ষা করে অবস্থান কর। তাহলে তোমাদের মনচিন্তার মধ্যে মার স্থান পাবে না। মনচিন্তা একবার যদি মারের বশীভূত হয়, অকুশলের দাবিত হতে থাকে, তবে তাকে ফিরায়ে আনা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সেদিকে অজস্র বিপদের হাতছানি, বিবিধ প্রলোভনের সাথে শক্তভাবে যুদ্ধ করতে হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভ্রম্বে বলেন—পূর্বজন্মের কৃত পাপকর্ম বর্তমানে দুঃখ প্রদান করে আর পূর্বজন্মের কুশলকর্ম বর্তমানে সুখ দেয়। তোমরা বর্তমানে কুশলকর্ম সম্পাদন কর, যাতে ভবিষ্যত জন্মে কোন প্রকার দুঃখ পেতে না হয়। সে কুশলকর্ম দুই প্রকার, যথা—(১) লৌকিক কুশলকর্ম (২) লোকোত্তর কুশলকর্ম।

কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রেখে দান-শীল-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থাকাই লৌকিক কুশল। এ কুশলের দ্বারা চারি অপায়ে পতিত হতে হয় না। ধনীকুল, উচ্চকুলে জন্মধারণ হয়ে সুখ লাভ হয় এবং স্বর্গলাভী হয়ে দিব্য সুখে অধিকারীও হওয়া যায়। পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ দুঃখ আর্যসত্য; অবিদ্যা, তৃষ্ণা দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য; নির্বাণ দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য; আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিরোধ গামিনী আর্যসত্য সমূহকে সম্যকভাবে দর্শন করা এবং সেসকল সত্যে জ্ঞান লাভই লোকোত্তর কুশল। লোকোত্তর কুশলের দ্বার মার্গফল লাভ হয়ে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হয়। আবার কুশলের মধ্যে লোকোত্তর কুশলই উত্তম, শ্রেষ্ঠ। তাই লোকোত্তরধর্মই প্রকৃত সুখ, স্বাধীন, অসাধারণ। সেখানে দুঃখের কোন অস্তিত্ব নেই। সর্বদা অনাবিল সুখই অনুভূত হয়। তবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ ভিক্ষু-শ্রামণের পক্ষে লোকোত্তরধর্মের উল্লীত হওয়া সম্ভব নয়।

তোমরা সবাই পণ্ডিত হয়ে যাও, মূর্খ হয়ে থেকো না। মূর্খের কিছুতেই সুখ মিলে না। সুখ লাভ করতে হলে পাণ্ডিত্য অর্জন করা ছাড়া কোন পথ নেই। কিভাবে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে? সহনশীলতা, জীবের দয়া, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমাশীল, মৈত্রীপরায়ণ, নিজকে অক্ষুণ্ণভাবে রাখার সদৃশগণসমূহ অর্জন করেই। যাদের এই সদৃশগণসমূহ বিদ্যমান আছে তারাই পণ্ডিত বলে জানবে। তোমরা পঞ্চশীল পালন কর। প্রাণী হত্যা করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচারে রত হবে না, মিথ্যা-পিস্তন-ভেদ-বৃথা বাক্য প্রয়োগ করবে না, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সহ যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করবে না। পাপকর্ম বা পশুবলি যজ্ঞ করা হতে বিরত থেকে দানযজ্ঞ, ত্রিশরণযজ্ঞ, পঞ্চশীলের যজ্ঞ সম্পাদন কর। এই সমস্ত দান-ত্রিশরণ-পঞ্চশীলের যজ্ঞ দ্বারা মহৎ লাভের অধিকারী হতে পারবে।

মনুষ্য জন্ম লাভ করে যদি তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসাহিংসি, মারামারি, কাটাকাটি, বধ, বন্ধন, প্রহারে রত থাক, তাহলে তোমাদের মনুষ্যত্ব বোধ পশুত্বে লোপ পেয়েছে বলতে হবে। তোমরা পশুদের চেয়ে নীচের স্তরে চলে গিয়েছ। বন্য পশুরা এতো অত্যাচার অনাচারে রত নেই। তারা তোমাদের মতন শীল ভক্ত দোষেও দোষী নয়। মানুষ জ্ঞানের অভাবে নানা অনাচার অত্যাচারের রত থাকে। তবে তাদের মনচিন্তে জ্ঞান, সত্যের উদয় হলে সব অনাচার অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। তাই তোমরা জ্ঞানী হয়ে যাও, সর্বদা জ্ঞান অর্জন করতে যত্নশীল হও। কখনো অজ্ঞানতা আচরণ করতে যাবে না। জ্ঞানী হতে পারলে প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে। সকল জীবের প্রতি ক্ষমাশীল, মৈত্রীপরায়ণ হয়ে অবস্থান কর, তাহলে আমি বলছি অবশ্যই তোমাদের শান্তি, সুখ লাভ হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা যদি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পার তবে

কিছুতেই আর পাপ সম্পাদন করবে না। কারণ তখন পাপের প্রতি লজ্জা, ভয় জ্ঞান উদয় হবে। যেমন এস, এস, সি পাস করার ছাত্র কি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়? কখনো না। বর্তমানে আমি উপমা দিয়ে বলি, স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ হল এস, এস, সি পাস; সর্কদাগামী মার্গফল লাভ হল এইচ, এস, সি পাস; অনাগামী মার্গফল লাভ হল বি, এ পাস; অরহত মার্গফল লাভ হল এম, এ পাস। তোমরা-তো এখনো প্রাইমারী স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তেছ মাত্র। কবে এস, এস, সি এম, এ পাস করবে? তবে ভালোভাবে মনযোগের সহিত লেখাপড়া করলে অবশ্যই একদিন এম, এ পাস করা যায়। ঠিক তদ্রূপ তোমরাও দৃঢ় বীর্যের সহিত সঙ্কর্ম আচরণ করে যাও। সঠিকভাবে সঙ্কর্ম আচরণ করতে পারলে স্রোতাপত্তি, সর্কদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গফল অবশ্যই সম্ভব হয়। আবার মনযোগের সহিত লেখাপড়া না করে স্কুল ছেড়ে দিলে যেমন কখনো এম, এ পাস করা যায় না। এখানেও মার্গফল না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ় বীর্যের সহিত সঙ্কর্ম আচরণ করে যেতেই হবে। সঙ্কর্ম আচরণ ছেড়ে দিলে চলবে না। আমি বলছি, তোমরা সঙ্কর্ম আচরণের যে কাজে যোগ দিয়েছ তা'শেষ না হওয়া পর্যন্ত করে যাও। মাঝপথে গিয়ে কাজ ত্যাগ করবে না। তাহলে কাজে সফলকাম হয়ে ফল লাভ করতে বঞ্চিত হবে। মনচিন্তকে সর্বদা সঙ্কর্ম আচরণের দিকে দৃঢ় পরাক্রমশালী করো। তোমাদের মনচিন্ত কুশলকর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকুক, জ্ঞানের পরিহানি না হয়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, পরিশেষে সকলের নির্বাণ লাভ হোক।

সাধু, সাধু, সাধু।

সদ্ধর্ম আচরণে প্রকৃত সুখ লাভ হয়

একসময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনালায়ে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের মাঝে ধর্মদেশনা প্রদান করছিলেন। তিনি প্রথমে বলেন-সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ। সহজে সদ্ধর্ম শ্রবণ করা যায় না, পরধর্মই শুনতে হয়। কারণ জগতে সদ্ধর্মলাভীর সংখ্যা অতি স্বল্প। সে স্বল্প সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তির গুণ সদ্ধর্ম প্রচার করে থাকেন। আবার যারা জ্ঞানী গুণ তারা সদ্ধর্ম কি তা বুঝতে সমর্থ; সদ্ধর্মের উপদেশ শ্রবণে আগ্রহী এবং সদ্ধর্ম আচরণ করে থাকে। অজ্ঞানীরা সদ্ধর্ম কি তা বুঝতে অক্ষম, তাই তারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। তারা সদ্ধর্ম আচরণে অভ্যস্ত যেমন নয় তেমনি সদ্ধর্ম আচরণে প্রচেষ্টা ও সদ্ধর্মের উপদেশ শ্রবণও করে না। সদ্ধর্ম অর্থ ভোগ বিরতি, সুখ ভোগে রত হলে সেটা সদ্ধর্ম নয়। যে ধর্মে তৃষ্ণা নেই এবং যে ধর্ম তৃষ্ণামুক্ত হতে শিক্ষা দেয় তা সদ্ধর্ম। আর তৃষ্ণামুক্ত ভোগ বিলাসের কথাবার্তাসমূহ পরধর্মের নামান্তর। বলা যায় লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা বশত যা করা যায় বা শুনা যায় তা সবই পরধর্ম। সদ্ধর্মে লোভ, হিংসা, অজ্ঞানের লেশ মাত্র নেই। তাই সদ্ধর্ম শ্রবণ যেমন দুর্লভ, তেমনি সদ্ধর্ম আচরণ করার জন্য অতি উচ্চতর জ্ঞানের প্রয়োজন। নচেৎ সদ্ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে পরধর্মে রত হতে হয়। আবার, মনচিন্তা মারভুবনে অবস্থান করে যে ধর্ম অনুসরণ করা হয় সেগুলি পরধর্ম। পরধর্ম অনুসরণের পরিণামে পাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে, দুঃখের উদয় হয়। জ্ঞান, কুশল কিছুতেই উদয় হয় না। মনচিন্তা অমারভুবনে বিচরণ করে যে ধর্ম অনুসরণ করা হয়, এবং যে ধর্ম শ্রবণ করা হয় তা সদ্ধর্ম। সদ্ধর্মের দ্বারা পাপ উৎপন্ন বন্ধ হয়ে যায় এবং পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়।

বর্তমানে অনেকে নিজকে সদ্ধর্ম পালনকারী বলে দাবি করলেও তারা কিন্তু আসলেই পরধর্মে লিপ্ত। সদ্ধর্মের প্রকৃত রস না পেয়ে তারা পরধর্মের বিষম দুঃখময় যাতনাকে সদ্ধর্মের পরিচয়ে গ্রহণ করছে মাত্র। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেকের হয়তঃ সদ্ধর্মের অমৃত রস লাভের ইচ্ছা জাগে, তবে জগতের বিষয়-বাসনার লোভ সামলাতে না পেরে ভোগে নিমজ্জিত হয়ে সদ্ধর্মের প্রকৃত সুখ লাভের বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বুদ্ধ বলেছেন, ভোগ বিলাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সদ্ধর্ম থেকে চ্যুত হতে হয়। কেহ যদি অতিরিক্ত ভোগ বিলাসী হয়ে উঠে সে কিছুতেই আর সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। কারণ সদ্ধর্ম ভোগ বিলাসে হতে বারণ করে। অন্যদিকে পরধর্ম ভোগ বিলাসে আকৃষ্ট করতে থাকে। কাজেই ভোগ বিলাসীদের পক্ষে কোন মতে সদ্ধর্মের স্থিতি থাকা সম্ভব নয়। এটা কোন অনুমান কথা নয়, আবেগে আপ্তত বাক্যও নয়। চোখের সামনে এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সারা বিশ্বে বহু বৌদ্ধ কেহ অর্থ-বিশ্বের প্রলোভনে, কেহ

খাও দাও ফুটি কর এ'নীতিতে, কেহ প্রেম, ভালোবাসার জন্য বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছে। গৃহীদের কথা কী বলব, বর্তমানে ভিক্ষুরা পর্যন্ত পরধর্ম আচরণের পথে পা বাড়াতে কুণ্ঠিতবোধ করে না। প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম বা ভোগ বিলাসের পথে কোন শাস্তি নেই, তৃপ্তি নেই, এবং আসল সুখ কিছুতেই লাভ হয় না। পরধর্মে কেবল ভোগাসক্তি, স্বার্থপরতা, অজ্ঞানতা দিন দিন বেড়েই চলে। পরিণামে দুঃখের আর সীমা থাকে না, অশান্তির সীমা থাকে না। হতাশায় হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। ভোগ বিলাসের জন্য, কাম্য লাভের আশায় অনেক উচ্চ শিক্ষিত, ধনী, কোটিপতি, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, জগত বিখ্যাত ব্যক্তির পর্যন্ত প্রতিনিয়ত অশান্তি, দুঃখ, অসম্মান, অধঃপতনের শিকার হচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে আরো বলেন-ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন মনুষ্যগণের স্মৃতি প্রখর ছিল। তারা বুদ্ধের উপদেশসমূহ শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করে নিতে পারত-টেপ রেকর্ডারে রেকর্ডিং করে রাখার মতন। তারা বুদ্ধের উপদেশের আদি-মধ্য-অন্ত সবটুকু ক্রমান্বয়ে নির্ভুলভাবে হৃদয়ে ধারণ করে রাখত। এখন তো আমি উপদেশ দিতে দিতেই তোমরা ভুলে যেতে বস। অবশ্য বুদ্ধও আনন্দকে বলেছিলেন-হে আনন্দ! ভবিষ্যতে সত্ত্বগণের স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। অজ্ঞান-মূঢ়্যভাব বিদ্যমান থাকলে স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আবার, অমনোযোগী ভাব নিয়ে দেশনা শ্রবণ করলেও তা' হৃদয়ে ধারণ করে নিতে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। পুনঃপুন আবৃত্তিতে স্মৃতি জ্ঞান জন্মে। আমি যে তোমাদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছি তা' অসময়ে ঘুম ত্যাগ করে কাজে যোগ দিতে বলার মত হচ্ছে না কি? সে রকম হলে তো কোন লাভই হবে না। আমি দেখতেছি প্রায় ক্ষেত্রে সে রকম হচ্ছে বৈ কি। আমি যখন দেশনা করতে থাকি শুধুমাত্র তখনই কিছুটা সচেতনতা ভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দেশনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে সেই আগের অবস্থায় ফিরে যেতে দেখা যায়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন-যেমন ধর, কোন ব্যক্তি যদি রাত দেড়টা সময়ের মধ্যে 'সকাল হয়েছে, স্বীয় কাজে যোগ দাও' বলে সুসুপ্ত গ্রামবাসীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। গ্রামবাসীও সকাল হয়েছে রব শুনে বিছানা ছেড়ে কাজের যাবার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু বাইরে এসে দেখল সকাল হবার কোন লক্ষণ নেই, বরং এখনো চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সুতরাং রাত্রি এখনো অনেক বাকি রয়েছে। সকাল হয় নি বুঝে গ্রামবাসী আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক তদ্রূপ আমি তোমাদেরকে দান-শীল-ভাবনা করার উপদেশ দিলে রাত দেড়টায় কাজে যোগদান করতে বলার সামিল হয়। (ভক্তের এ কথা বলার শেষে উপস্থিত সবার মুখে হাসির রোল পড়ে গেল) কারণ এখনো তোমাদের জ্ঞান অর্জিত হয়নি। অজ্ঞানতা কাটিয়ে উঠে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পার নি। আর জ্ঞান না

থাকলে কিভাবে দান-শীল-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সদ্ধর্ম আচরণে অগ্রসর হবে? তাই আমার দেশনা শ্রবণকালে সদ্ধর্ম আচরণের জন্য কিছুটা উৎসাহ, উদ্দীপনার সম্ভার হলেও দেশনা সমাপ্ত হতেই সেই উৎসাহ উদ্দীপনার সেখানে অপমৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে যদি তোমাদের জ্ঞান উদয় হয় তাহলে মধ্যরাত্তির পরিবর্তে খুব ভোরে কাজে যোগ দিতে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ার মতন হবে। আর তখন ঘুমিয়ে পড়ার কোন অবকাশ থাকবে না, সোজা কাজে নেমে যেতে পারবে। কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, শুধু দেশনা শ্রবণ করে সদ্ধর্ম জ্ঞান অর্জিত না হলে সদ্ধর্ম আচরণ করা সম্ভব নহে। বর্তমানে তোমাদের সদ্ধর্ম জ্ঞান লাভ করা দূরের কথা, বহু উপাসক-উপাসিকা সঠিকভাবে উচ্চারণ করে বুদ্ধ বন্দনা পর্বাদিও সেরে নিতে পারে না। জৈনক উপাসক বলেছিল-ভন্তে, ভিক্ষুগণ আমাদেরকে ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়ে পঞ্চশীল প্রদান করে থাকেন। কিন্তু আমরা তো সে সবেবের অর্থ কিছুই বুঝি না। তোতা পাখির মত শুধুমাত্র ভিক্ষুর মুখে উচ্চারিত শব্দই অনুসরণ করে থাকি। অনেকে আবার সঠিকভাবে অনুসরণ করতেও সমর্থ হই না। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা কি রকম জানেন? খঞ্জন পাখির সাথে কাকের নাচানাচি করার ন্যায় হয়। খঞ্জন পাখির শরীর পাতলা হওয়ার সে খুব দ্রুত অনায়াসে ইচ্ছা মত নাচতে পারে। কিন্তু কাকের শরীর তো আর পাতলা নয় বরং অনেক বেশি ভারী। তাই খঞ্জনকে অনুসরণ করতে গিয়ে কাকের অবস্থা বারটা বেজে যায়। তবুও কিছুতেই খঞ্জনের নাচের মত হয় না। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুরা বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সিক্ষাপদং সমাদিয়ামি বললেও আমরা কি বুঝতে পারি? পারি না।

এবার বনভন্তে বলেন-ত্রিশরণ বলতে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ, ধর্মের শরণ গ্রহণ ও সংঘের শরণ গ্রহণ করাকে বুঝাই। বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞান, ধর্ম শব্দের অর্থ সদ্ধর্ম, সংঘ শব্দের অর্থ আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণকারী বিমুক্তি ব্যক্তিগণ। তবে ত্রিশরণ কিসের জন্য গ্রহণ করতে হয় সে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান থাকা চাই। স্বীয় জীবনকে বিমুক্তি লাভের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতেই ত্রিশরণ গ্রহণ করা হয়। মনে রাখবে ত্রিশরণ গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্বীয় জীবনকে বিমুক্তি লাভের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যাবতীয় দুঃখের অবসান করা যায় না। শীল শব্দের অর্থ স্বভাবের পরিবর্তন, সংযম শিক্ষা। শীল যাবতীয় দুষ্কিরিত্ত বারণ করে সুচরিত্রের অধিকারী করায়। শীল পালন না করলে মনচিন্ত পাপ, অকুশল দিকে ধাবিত হয়ে বিবিধ দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হয়। কিন্তু শীল পালনের ফলে সেরূপ দুঃখ যাতনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। শীল পালনের দ্বারা ভগবান বুদ্ধের প্রকাশিত অনাবিল সুখ উপলব্ধ হয়, পরিস্কীত হয়। আবার, বুদ্ধের প্রকাশিত ধর্ম কারোর নিকট করুণা ভিক্ষার দ্বারা বিমুক্তি লাভের ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের বিমুক্তি

লাভ কোন সৃষ্টিকর্তা, দেবতা বিশেষের উপর নির্ভর করে না। এই ধর্মের অনুশীলন ইহকালে যেমন ফলপ্রদ, পরকালেও তেমনি মঙ্গলদায়ক।

তিনি আরো বলেন—আমি দীঘিনালা অবস্থানকালীন একদিন অষ্টশীলধারী কয়েকজন উপাসিকা আমাকে বলল; ভগ্নে, রাঙাচান আমাদিগকে প্রায় প্রশ্ন করে তোমরা বুদ্ধকে দেখেছ কি? আমরা কিছুতেই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। আপনার সকাশে সেই সমাধান প্রার্থনা করতেছি। আমি তাদেরকে বললাম—তোমরা রাঙাচানকে পাঁচটা একটা প্রশ্ন করবে, ‘আচ্ছা তুমি তোমার নানার নানাকে দেখেছ কি’? যদি দেখে না থাক তাহলে তোমার নানার নানা ছিল না? অবশ্যই তো ছিল। যেহেতু তাদের বংশধর তুমি বর্তমানে রয়েছ। নানার নানা না থাকলে তাদের বংশধর হিসাবে বর্তমানে তোমার পরিচয় হতো না। ঠিক তদ্রূপ আমরা বুদ্ধকে চাক্ষুস না দেখলেও ভগবান বুদ্ধ ছিলেন। যারা বুদ্ধের সময়কালীন জন্মগ্রহণ করেছিল তারা বুদ্ধকে চাক্ষুস দেখেছিল। আমাদের অনেক পূর্বে ভগবান বুদ্ধ জগতে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশ গ্রহণ করে অনেকে নির্বাণগামী হয়েছেন, বর্তমানে এখনো হচ্ছেন, আগামীতেও হবেন। কাজেই এখানে বুদ্ধকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে কোন অবিশ্বাসের বা অন্ধভাবে বিশ্বাস করার অবকাশ নেই। উপাসিকারা আমার সেই সমাধান শুনে খুব খুশী মনে অনুমোদন করতঃ রাঙাচানকে যথাযথ উত্তর প্রদান করতে পেরেছিল। শুধু রাঙাচান নয়, বর্তমানে অনেকে এরূপ উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে থাকে। এসব প্রশ্ন করে তারা নিজেকে খুব পণ্ডিত বলে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়। আসলে সে কাজের জন্য তারা নিজের মূর্খতা নিজেই প্রকাশ করে মাত্র। কারণ প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির কখনো সারহীন, মূল্যহীন কথা বলে না। মূর্খরা সারহীন, মূল্যহীন, অমূলক কথা বলে থাকে। তারা উল্টোপাল্টা কথা দ্বারা অন্যকে হটিয়ে দিতে, নিজের বাহাদুরী দেখাতে অনর্থক বহু বাক্য ব্যয় করে দিন রাত অতিবাহিত করে। বুদ্ধ বলেছেন অসার, অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটি অর্থপূর্ণ বাক্যই শ্রেয়। যা শুনে লোকের সুখ হয়, পরম শান্তি লাভ হয়। যেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজের মধ্যে নিহিত থাকে সুবিশাল বৃক্ষ জন্মানোর শক্তি। তাই যা দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, সেই পীড়াদায়ক বাক্য কারোর কাম্য নয়। বরঞ্চ অহিতকর শত সহস্র বাক্য চেয়ে একটি মাত্র সত্য, সার বাক্যও অপরিমেয় তাৎপর্য বহন করে। সাধন করতে পারে মানুষের অশেষ কল্যাণ। সেরূপ বাক্যকে সবাই সানন্দে অনুমোদন করে থাকে। বলা বাহুল্য যে কথার মূল্য তার পরিমাণে নয়, অর্থবহে বা ফলপ্রসূ রূপদানে। তজ্জন্য তোমাদেরকে বলছি, অসার বাক্য পরিত্যাগ করে সার, মূল্যবান অর্থপূর্ণ বাক্যই বলবে। মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য পরিহার করতঃ সকলের প্রিয়, মনোজ্ঞ, শ্রুতিমধুর বাক্য বলাই

উত্তম। মনে রাখবে, তুমি অপরকে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলে অপরজনও তোমাকে সেরূপ বাক্যে প্রতি উত্তর প্রদান করবে।

পূর্বজন্মের কুশল পুণ্য প্রভাবে বর্তমানে ধনীকূলে জন্ম হয়ে থাকে। আর পূর্বজন্মের অকুশলকর্ম ফলে গরিবকূলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এটা কারোর উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাই বলা হয়েছে, ভবিষ্যত জন্মকে উচ্চকূলে, উচ্চবংশে এবং দেবকূলে নিয়ে যাবার জন্য সকলে কুশলকর্ম সম্পাদন করা উচিত। তোমরা কায়িক, বাচনিক, মানসিক প্রত্যেক কর্মে সদাচারণ রক্ষা কর। নম্র, ভদ্র, সদাচারী ব্যক্তি জীবনে সকল কার্যে কৃতকার্য হতে পারে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছে সবাই একপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও যে, ‘আমরা আর পাপকর্ম সম্পাদন করব না, অজ্ঞানতা বশতঃ আগে পাপ করেছি কিন্তু আজ হতে কিছুতেই পাপ করব না, শুধু পুণ্যই সম্পাদন করব।’ এভাবে তোমরা যদি জ্ঞানী হতে পার তাহলে বাদ-বিবাদ, কলহ, ঝগড়া কিছুই থাকবে না। কারণ তখন তোমরা জানবে যে, অচিরেই আমাদের এই দেহ প্রাণশূন্য হয়ে তুচ্ছ কাষ্ঠখণ্ডবৎ মাটিতে পড়ে থাকবে। সুতরাং কেন একে অপরের সহিত বাদ-বিবাদ, ঝগড়া, কলহে লিপ্ত হবো? অজ্ঞানী ব্যক্তির কিন্তু মৃত্যুর দিকে কোন প্রকার খেলায় থাকে না। মান অভিমানের অভিভূত হয়ে তারা সর্বদা অন্যের সঙ্গে বিবাদ, কলহে লিপ্ত থাকে। সেই পাপের পরিণামে তারা মৃত্যুর পর নিরয়গামী হতে বাধ্য। আজকে তোমরা যে কুশলকর্ম সম্পাদন করেছ তা’ তোমাদের ভবিষ্যত জন্মে অশেষ পুণ্যফল প্রদান করবে। এই পুণ্যের প্রভাবে তোমরা গরিব, হীনকূলে জন্মগ্রহণ না করে ধনী, উচ্চকূল, উচ্চবংশ, রাজকূলে এবং স্বর্গ লাভ করতে সমর্থ হবে। কখনো এ’ দানের পরিহানি হবে না। তোমরা সর্বদা এরূপ চিন্তা কর, ‘মানুষের জীবন গরম পানির ফেণা তুল্য। কখন মৃত্যু এসে মহাকালের গহ্বরে গ্রাস করে নিয়ে যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই।’ তাই সর্বদা দিবারাত্রি কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকাই উত্তম। মনে রাখবে, কুশলকর্মের মাধ্যমে সদ্ধর্ম আচরণ না করলে ভবিষ্যত জন্মকে ভীষণ অন্ধকারের দিকে টেলে দেয়া সামিল হবে। তোমরা কখনো অকুশলকর্মের দিকে ধাবিত হবে না। তাহলে তোমাদের পরিহানি না হয়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে, পরিশেষে নির্বাণও লাভ হবে এতে সন্দেহ নেই।

সাধু, সাধু, সাধু।

ভোগের দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ হয় না

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে দেশনালায়ে অনুষ্ঠিতব্য দানানুষ্ঠানে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-ধর্মদেশনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলে তা' হৃদয়ে ধারণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু অমনোযোগের সহিত শ্রবণ করলে কিছুতে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তা' যথাযথরূপে হৃদয়ে ধারণ করতঃ সেই অনুসারে স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করতে পারলে তবেই তো দেশনা শ্রবণের সার্থকতা শত ভাগ অর্জিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ত্যাগের ধর্ম, ভোগের ধর্ম নয়। শাস্ত্রে দেখা যায়-বুদ্ধের সময়কালীন প্রায় ভিক্ষুই রাজা, রাজার ছেলে, ধনী, ধনীর ছেলে ছিলেন। তারা তাদের সেসব রাজ্য-ধন ত্যাগ করে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে নির্বাণগামী হয়েছিলেন। বর্তমানে তোমরা আমাকে (বনভঙ্কে) হয়ত প্রশ্ন করতে পার, ভঙ্কে আপনি কি ত্যাগ করেছেন? তার উত্তরে আমি বলল-‘আমাররাজ্য, ধন কিছুই ছিল না, সেসব ত্যাগ করে প্রব্রজিত হতে পারিনি। তবে প্রব্রজিত হয়ে জীবন, অঙ্গ ত্যাগ করেছি।’ ধনপাতার অরণ্যে অবস্থানকালীন আমি সব সময় এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতাম যে, “আমি ভোগ করব না, মনচিন্তকে কখনো ভোগের চিন্তা করতে দেবো না।” আবার, ভগবান বুদ্ধ, শারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকপ্পিন প্রমুখ রাজা, ধনীদেব রাজ্য-ধন ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা চিন্তা করতাম। তাদের সেই মহান ত্যাগময় চেতনাকে আদর্শরূপে বেচে নিয়ে স্বীয় জীবন, অঙ্গ ত্যাগ করতে প্রয়াসী হতাম, অনুপ্রেরণা যোগাতাম। অনেক ভিক্ষু আমাকে বলেছিল জীবন, অঙ্গ ত্যাগ করলে তো মরে যেতে হবে। কাজেই আমরা তোমার মতন পারব না। এখন উপস্থিত তোমরাও আমাকে হয়ত বলতে পার, আপনি ত্যাগ করেছেন এটা ঠিক, কিন্তু আমরা ত্যাগ করতে পারব না। তাহলে আমি কিরূপে তোমাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান করি। ভগবান বুদ্ধ প্রতিটি দেশনায় ভোগে কি দোষ, ভোগের পরিণাম যে দুঃখ তা' প্রকাশ করতঃ ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শান্তি বলে প্রকাশ করতেন। ত্যাগের কি মহিমা, ত্যাগের দ্বারা কি আনন্দ লাভ হয় সেই সমুদয় ব্যাখ্যা করতেন। কাজেই এখন তোমাদেরকে বলতে হবে ‘আমরা ভোগ করব না, ত্যাগই করব। ভোগই দুঃখ, ত্যাগই সুখ, ত্যাগেই শান্তি।’

এ জগতে যত প্রকার ভোগ্য বিষয় দৃষ্ট হয় তা' সবই অনিত্য। সুতরাং অনিত্য বিষয়কে নিয়ে ভোগে রত হতে চাইলে শুধু দুঃখই প্রদান করে। তাই ভোগীজনের মনে কখনো শান্তি লাভ হয় না। একটি ভোগ্য বিষয় লাভ হতে না হতে আরো দশটি লাভের আশা আকাঙ্ক্ষায় তার মন সর্বদা অতৃপ্তির অনলে

দক্ষ-বিদক্ষ হতেই থাকে। ভোগে কোন তৃপ্তি নেই, ভোগের দ্বারা কিছুতেই পরম তৃপ্তি বা সুখ লাভ হতে পারে না। বলা যায়, জগতে যা সুখ বলে অনুমেয় হয় আসলে তা' দুঃখের পূর্বাভাস ছাড়া কিছুই নয়। ভগবান বুদ্ধ রাজা বিধিসারকে বলেছিলেন ভোগের দ্বারা প্রকৃত শান্তি, সুখ লাভ হয় না। বরঞ্চ ভোগ দুঃখ ডেকে আনে, জীবনকে দুর্বিষহ যন্ত্রণার দিকে টেলে দেয়। ভোগী মানুষ প্রচুর ভোগ সম্পদের অধিকারী হলেও কৃপণ, গরিব হয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এ ধর্ম সকল প্রকার ভোগ্য বিষয়, সম্পদ থেকে গুরু করে জীবন, অঙ্গ পর্যন্ত ত্যাগ করতে শিক্ষা দেয়। তাই এসর্বস্ব ত্যাগ সাধারণ দৃষ্টিতে সর্বশূন্যের মতন দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সর্বশূন্য নয়, বরং উৎকৃষ্ট উত্তমটুকু প্রকাশ করে থাকে। কারণ সর্বজন কাম্য পার্থিব বিষয়ের সবকিছুকে ত্যাগ করে সন্তুষ্টচিত্তে থাকলে যেই অনাবিল শান্তি লাভ করাটা যে কতটুকু জ্ঞানের বিষয় তা' সত্যি অচিন্তনীয়। তাই তো বুদ্ধের সেই ত্যাগময় আদর্শ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজও খুব সমাদৃত। তার প্রমাণ স্বরূপ রাঙ্গামাটি রাজ্যবন বিহারে অনেক উচ্চপদস্থ দেশী-বিদেশী লোকজন এসে আমাকে কাছে ধর্মদেশনা শুনতে প্রত্যাশা করে থাকে। তারা আমার মুখে বুদ্ধের জ্ঞানময় ও ত্যাগময় উপদেশ শ্রবণে খুশী মনে আশীর্বাদ নিয়ে চলে যায়। খাগড়াছড়ি, বাঘাইছড়ি, জুড়াছড়ি থেকে এ রাঙ্গামাটি স্থানটি আমার কাছে একটু সুবিধার বলে মনে হয়। কারণ রাঙ্গামাটিতে অবস্থান করলে অনেক দেশী-বিদেশী উচ্চপদস্থ লোকজন প্রায়ই আমার কাছে আসতে থাকে। যেহেতু রাঙ্গামাটিতে আসতে তাদের সুবিধা হয়। তদুপরি এই স্থানটি সকলের মধ্যস্থলে পড়ে। আর এখানকার লোকজন, পরিবেশ পরিস্থিতি সবই আমার পূর্ব পরিচিত।

প্রকৃত সুখ কি? বৌদ্ধধর্মের মতে কিভাবে সুখ লাভ হয়? ত্যাগে সুখ, নিরোধে সুখ, নিবৃত্তিতে সুখ, অনাসক্তে সুখ। এবং এ সকল সুখই বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সুখ বা নির্বাণ। ত্যাগ, নিরোধ, নিবৃত্তি, অনাসক্তিতেই নির্বাণ সুখ লাভ হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে ত্যাগ; অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে নিরোধ; দশবিধ ক্লেশসমূহ নিবৃত্তি এবং পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপের প্রতি অনাসক্তভাবে থাকতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ উপলব্ধি হয়। এটাই বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শন ও প্রকৃত সুখ। আবার বুদ্ধ বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের বা পরের জন্য ধন কামনা, পুত্র কামনা, রাষ্ট্র কামনা এমনকি আপন সমৃদ্ধিও ইচ্ছা পোষণ করে না। আর তিনি প্রকৃত সুখী। কারণ পার্থিব সুখ ভোগের উপকরণাদিতে কিছুতেই সুখ পাওয়া যায় না। ধন, বিত্ত, সম্মান এগুলি মানুষকে কোন তৃপ্তি দিতে পারে না। বস্ত্তপক্ষে সম্পদ, লাভ-সংকার, প্রেম ভালোবাসায় কোন সুখ নেই। পার্থিব ভোগের পথে মানুষের কল্যাণও লাভ হয় না। বরঞ্চ এই ভোগ জ্ঞান ও মুক্তি লাভের অন্তরায়।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে আরো বলেন-মূর্খের সংস্পর্শে না থেকে জ্ঞানীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা উত্তম কাজ। বলা যায় মূর্খ লোকের সঙ্গে যত অদর্শন করে থাকা যায় ততই সুখ। শত্রু সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করা কি দুঃখজনক তদপেক্ষা মূর্খের সংসর্গ দুঃখজনক বলে জানবে। কারণ মূর্খ ব্যক্তির অকল্যাণকর কর্ম ছাড়া কল্যাণকর কিছুই করতে পারে না। তারা সর্বদা নিজের ও অপরের মহা ক্ষতিসাধন করে থাকে। তারা কর্তব্যাকর্তব্যে জ্ঞানহীন, লোভ-দ্বेष-মোহপরায়াণ, অহংকারী, নির্দয় অধার্মিক, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ পরায়াণ, মন্দকর্মে উৎসাহী এবং মন্দকর্মে নির্ভীক। জগতে যত প্রকার অকল্যাণ, অমঙ্গল সৃষ্টি হয় তৎসমস্ত মূর্খেরই সৃষ্ট। মূর্খের অকরণীয়, অকথনীয় বলে কিছুই নেই। তাই মূর্খ ব্যক্তি বিষয়র সর্প হতেও ভয়ঙ্কর। মূর্খ ব্যক্তি তোমাকে বর্তমানে কোন ক্ষতি না করুক তবুও তাদের দর্শন দুঃখ বলে জানবে। তজ্জন্য মূর্খ ব্যক্তি সব সময় পরিত্যাজ্য। তাদেরকে এড়িয়ে চলা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির আদি কর্তব্য। পক্ষান্তরে জ্ঞানী, পণ্ডিত, আর্যগণের দর্শন, সুখ, মঙ্গল বয়ে আনে। তজ্জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা খুবই উত্তম কাজ। জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন জনের পরম সহায়, তারা সঠিক পথ প্রদর্শক, সৎ পরামর্শক। তাদের সংস্পর্শে থাকলে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল সাধিত হয় না। আবার, জ্ঞান দর্শন ও সত্য দর্শন করতে পারলে পরম সুখ, পরম শান্তি অনুভূত হয় হৃদয়ে।

তিনি উপস্থিত দায়ক দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করে বলেন-তোমরা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারী হয়ে সুখে অবস্থান করতেছ কি? আমি তো দেখছি তোমরা ভীষণ দুঃখে জীবন-যাপন করতেছ। পরিবারে দুশ্চিন্তা, অশান্তির কোন শেষ নেই। যেমন, স্বামীর কথা স্ত্রী শুনতে চায় না, স্ত্রীর কথা স্বামী শুনতে চায় না; বাপের কথা পুত্র শুনতে চায় না, মায়ের কথা কন্যা শুনতে চায় না। স্বামীর দুঃখ স্ত্রী বুঝে না, স্ত্রীর দুঃখ স্বামী বুঝে না; পুত্রের দুঃখ বাপ বুঝে না, বাপের দুঃখ পুত্র বুঝে না; মায়ের দুঃখ কন্যা বুঝে না, কন্যার দুঃখ মায়ে বুঝে না। এভাবে স্বামী-স্ত্রী, বাপে-পুত্র, মায়ে-কন্যায় কথা কাটাকাটি, মনোমালিন্য মান অভিমান কতো প্রকার দুঃখের মধ্যে আছ তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। তার উপর, পুত্র-কন্যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, পরিবারের সহিত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যা, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে কলহ-বিবাদ, জায়গা-জমি, ধনসম্পদ, অর্থ-চাকুরি ব্যবসা নিয়ে টানাটানি ইত্যাদি হাজার হাজার সমস্যা ও সংঘাতের মধ্যে এক মুহূর্তও তোমাদের মতে শান্তি, সুখ নেই। জীবন চলছে উত্তাল তরঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত লঞ্চের মতন। যে কোন মুহূর্তে বড় বিপর্যয় ঘটিয়ে সব ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তাহলে দেখুন সংসারী জীবন কিরূপ দুঃখ, অশান্তি, যন্ত্রণাদায়ক ও সংঘাতে ভরা প্রতিটি মুহূর্ত। তবুও তোমরা এ সংসারী জীবন ত্যাগ করে মুক্ত

বিহ্বলের মতন উন্মুক্ত জীবন-যাপনের প্রয়াসী হও না। অমৃতময় নির্বাণ সুখ লাভের চেষ্টাশীল হও না। অথচ কত দুঃখের মধ্যেই না রয়েছ, তবুও জ্ঞান উদয় হচ্ছে না। তার কারণ কি জ্ঞান? অজ্ঞানতা। তোমাদের মন এতো অজ্ঞানাচ্ছন্ন যে, তা' ভেদ করে দুঃখকে দুঃখরূপে দেখে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করা দুঃসাধ্যের ব্যাপার হয়েছে। যে সংসারী জীবন তোমাদের সর্ব দুঃখ জ্বালার জন্মদায়িনী তাকে তোমরা অত্যন্ত আদরের রত্নতুল্য লাভের প্রত্যাশী হয়ে থাক।

অজ্ঞানতা ভেদ করে জ্ঞানচক্ষু উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও অপেক্ষা করতে হয় না। কারণ এ ধর্ম যখনই সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় তখন তার ফল পাওয়া যায়। লোকান্তরধর্ম অবগত হওয়া মাঝেই তার ফল প্রদান করে থাকে। বুদ্ধের সমকালীন সেরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, জনৈক এক ভিক্ষু উপসম্পদা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই অরহত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আবার, একদিন রাজা প্রসেনজিতের বড় বোন কোন রকম লাঠির উপর ভর দিয়ে ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হয়। তখন বুদ্ধ তাকে উপদেশচ্ছলে বলেন-‘বৃদ্ধা তুমি বিশ্রাম কর।’ এই কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই অরহত লাভ করে রাজা প্রসেনজিতের বড় বোন। অন্যদিকে, দশ সন্তানের জননী জনৈক এক গৃহকর্তীও প্রব্রজিত হয়েই অরহত লাভ করেছিলেন। তারা কেন এত সহজে অরহত লাভ করেছিলেন জ্ঞান? তারা অবিদ্যাচ্ছন্ন চিন্তকে অতি তাড়াতাড়ি বিদূরীত করে জ্ঞান উদয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর তাই সঙ্গে সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করার আগেই তারা মার্গফল লাভ করেছিলেন।

এ সংসার দুঃখে ভরা, এখানে প্রকৃত সুখ বলতে কিছু নেই। যদিও অবিদ্যাচ্ছন্নগণ সংসারে সুখ বলে কিছু লাভের কল্পনা করে থাকে। কিন্তু তাদের সেই কল্পনার স্বপ্নকে যখন বাস্তবে রূপ দান করতে চায় তখন আর কিছুতে সুখ থাকে না। সবই দুঃখে-কষ্টে, জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই তোমরা সংসারী হয়ে ভীষণ ভুল করেছ। সে ভুলের মাশুল স্বরূপ এখন বিবিধ দুঃখ-কষ্ট, লাজ্জনা-গঞ্জনা, অপমান, আপদ-বিপদে পতিত হচ্ছে। বলা যায় প্রতিনিয়ত অধঃপতনের দিকে তোমাদের মনচিন্তা ধাবিত হতে চলেছে সবেগে।

পরিশেষে তিনি বলেন-পাপ, অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে কিছুতেই তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে না। কারণ পাপীরা সর্বদা নীচের দিকে পতিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে তোমরা যদি কুশলকর্ম সম্পাদন কর, তাহলে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি লাভ হবে, উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হবে। পুণ্য লাভ, জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলে আর পতনের কোন আশঙ্কা থাকে না। কেহ যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, বনভক্তের উপদেশ কি রকম? তাহলে বলবে

বনভক্তের উপদেশ হল, নিরয়গামী হতে হয় এমন কোন কাজ সম্পাদন না করা। যে কর্মের দ্বারা ইহ-পরকালে ক্ষতিসাধন হয় সে কর্মসমূহ না করা। বলা যায়, অকুশল সম্পাদন না করা, কুশল সম্পাদন করা এবং অজ্ঞানের সহিত অবস্থান না করে জ্ঞানের সহিত অবস্থান করাই বনভক্তে উপদেশ। কিসের জন্য নিরয়গামী হতে হয় জান? পঞ্চশীলাদি লঙ্ঘন সহ অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে নিরয়গামী হতে হয়। অজ্ঞানতামূলক কোন কর্ম-বাক্য-চিন্তা করলে সর্বোপরি মনচিন্তের মধ্যে অজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে ক্ষতিসাধন হয়। তাই শীলাদি পালন ও কুশলকর্ম সম্পাদন করে চারি অপায় বন্ধ কর। জ্ঞান অর্জন করতঃ ক্ষতিসাধনের পরিবর্তে জীবনকে (চিন্ত) উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করতে বনভক্তে উপদেশ প্রদান করে থাকেন।

সর্বদা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তে অবস্থান কর। অজ্ঞানকে মনচিন্তের মধ্যে স্থান না দিয়ে জ্ঞানকে স্থান করে দাও। তাহলে দান-শীল-ভাবনাদি সহ কুশলকর্ম সম্পাদন করতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। দানের দ্বারা লোভ, শীল পালনের দ্বারা হিংসা, ভাবনার দ্বারা অজ্ঞান বিদূরীত করতে চেষ্টাশীল হও। তাহলে আমার দেশনা শ্রবণ করা সার্থক হবে। আমি যে তোমাদের জন্য অমৃতময় নির্বাণ সুখের কথা উল্লেখ করে দেশনা করলাম তাও যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আর লোকোত্তরধর্মের অধিকারী হয়ে নির্বাণ সুখে রস আন্বাদিত হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

মানুষের সুখ দুঃখ ভোগের প্রকৃত কারণ তার মন

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভক্তে আর্যবন বিহারে খাগড়াছড়ি হু ‘ছাত্র ছাত্রী আর্য ঐক্য পরিষদ’ কর্তৃক আয়োজিত দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-ধর্মদেশনা দেওয়া বা প্রদান করা অর্থ চারি আর্যসত্যকে ব্যাখ্যা করা। যেমন-দুঃখ আর্যসত্যের কখন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, প্রকাশন; সমদুয় আর্য সত্যে সত্যের কখন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, প্রকাশন; নিরোধ আর্য সত্যের সত্যের কখন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, প্রকাশন; মার্গ আর্যসত্যের সত্যের কখন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, প্রকাশন অতি সহজ, সরলভাবে ব্যাখ্যা করা। কখন অর্থ চারি আর্যসত্যের কথা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কথা না বলা। শুধুমাত্র দুঃখ কি, কোথা হতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিসে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে, দুঃখ পরিসমাপ্তির উপায় কি? সেসব কথা বলা। দেশনা বলতে চারি আর্যসত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের সমক্ষে চারি আর্যসত্যকে তুলে ধরা। প্রজ্ঞাপন অর্থ ঘোষণা করা। অর্থাৎ বহুজনের হিতসুখ ও জ্ঞানচক্ষু উদয় করানোর

তাগিদে চারি আর্যসত্যকে দিকে দিকে ঘোষণা করে দেওয়া। স্থাপন অর্থ প্রতিষ্ঠা করা। যেমন কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলে তারিখ ও স্থানের নাম উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঠিক তদ্রূপ দেশনা প্রদান কাল হতে সেইরূপে মনচিন্তের মধ্যে চারি আর্যসত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। প্রজ্ঞাপন অর্থ প্রকাশ করা। অর্থাৎ চারি আর্যসত্যকে সঠিক ধারণা দিয়ে যথাযথ উপমা সহকারে সুপ্রকাশিত করা। এই চারি আর্যসত্য ব্যতীত দুঃখমুক্তি লাভের কোন উপায় নেই, কেবল এ সত্যের দ্বারাই নির্বাণ লাভ করা যায় তা' প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য যে, ভগবান বুদ্ধ এভাবে চারি আর্যসত্যের কথন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন ও প্রকাশন অতি সহজ, সরলভাবে ব্যাখ্যা করতেন। বুদ্ধ শিষ্যের মধ্যে অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র মহোদয়ও চারি আর্যসত্যের কথন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন ও প্রকাশনকে অতি সহজ, সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ভগবান বুদ্ধ তথা শারীপুত্র মহোদয় কেহ নেই। আমি তো কিছুতেই তাদের মতন করে চারি আর্যসত্যকে ব্যাখ্যা করতে পারব না। আমার যতদূর সম্ভব শুধু তাই বলে যাব। চারি আর্যসত্য সম্পর্কে বললে বলতে হয়, জগতে দুঃখ আছে ইহা প্রথম সত্য। দুঃখ যখন বিদ্যমান আছে তাহলে দুঃখোৎপত্তি কারণ অবশ্যই আছে, ইহা দ্বিতীয় সত্য। যেহেতু দুঃখ আছে সুতরাং দুঃখের শেষ বা নিরোধও আছে ইহা তৃতীয় সত্য। রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য যেমন ঔষধ সেবন করতে হয়। তেমনি দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা মার্গও রয়েছে ইহা চতুর্থ সত্য। পঞ্চক্কল দুঃখ আর্যসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হতে হবে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমুদয় আর্যসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা পরিহার করতে হবে। নির্বাণ নিরোধ আর্যসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে হবে। শমথ বিদর্শন মার্গসত্য অভিজ্ঞা দ্বারা গঠন করতে হবে। অভিজ্ঞা বা উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা চারি আর্যসত্যকে যথার্থভাবে জানতে না দেওয়া পাপিষ্ঠ মারের কাজ। কারণ চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে সত্ত্বগণকে অজ্ঞ করে রাখতে পারলে ইচ্ছামত এদিকে সেদিকে পরিচালিত করতে তার সহজ হয়। বলা বাহুল্য চারি আর্যসত্যের জ্ঞান অর্জন হলে মার আর কিছুতেই সত্ত্বগণকে অজ্ঞ করতে রাখতে পারে না। দুঃখ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন হলে দুঃখকে দেখতে পেলে, দুঃখকে বুঝতে পারলে কেহ কি আর দুঃখের মধ্যে থাকতে চাইবে? কেহই তো জেনে শুনে দুঃখে পতিত হতে চাই না। অন্যদিকে দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন হলেও অনাকাঙ্ক্ষিত সেই দুঃখের উৎপত্তিকে সবাই বন্ধ করতে প্রত্যাশী হয়। এমনিতে পূর্বে উৎপত্তি হওয়া দুঃখের পীড়নে সবাই কাতর, তার উপর আরো দুঃখের উৎপত্তি? কেহই সমর্থন করতে পারে না। দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে দুঃখ নিরোধে কি সুখ তা' প্রত্যক্ষ হয়। আর সুখকে সবাই সানন্দে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কাজেই দুঃখ নিরোধের উপায় নির্বাণ

সুখের অবস্থান করে। দুঃখ নিরোধগামিনী জ্ঞান অর্জন হলে সবাই সে মার্গ অবলম্বনে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাবে থাকে। তোমরা যদি জ্ঞানে দুর্বল হয়ে যাও তাহলে মার তোমাদেরকে ইচ্ছা মত চালাতে থাকবে। বারবার দুঃখের মধ্যে পতিত হওত দুঃখেই অবস্থান করতে হবে তোমাদেরকে। সেই দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তজ্জন্য তোমরা জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টাশীল হও। জ্ঞান অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হলে সেই পথে যে রকম বাঁধা উপস্থিত হোক না কেন বীর বিক্রমে তা অতিক্রম করতঃ জ্ঞানের চরম শিখরে পৌছতে সক্ষম হবে। তাই ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বদিগকে চারি আর্যসত্য জ্ঞান দান করে মারকে পরাভূত করতে সাহায্য করতেন। যার ফলে সেই সময় সত্ত্বগণ দুঃখকে চিরতরে ধ্বংস করে নির্বাণ পরম সুখ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিল। তজ্জন্য বুদ্ধের সময়কালীন মার তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—বুদ্ধ যখন গয়ার বোধিমূলে ধ্যান রত ছিলেন মার তখন চিন্তা করতে লাগল। “এ’শাক্য রাজপুত্র যদি জ্ঞান লাভ করে, বুদ্ধ হয়ে যায়, লোকদের যদি উপদেশ দেয় তাহলে আমাররাজ্য তো ধ্বংস হয়ে যাবে”। কাজেই যে কোন উপায়ে হোক তাঁকে ধ্যান চ্যুত করাতে হবে। অমনি মার সৈন্য সামন্ত নিয়ে বুদ্ধকে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধকে ধ্যান চ্যুত করা দূরে থাক, এক চুলও নাড়াতে সক্ষম হল না। বরং বুদ্ধ মারকে পরাজিত করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আর দুঃখে পীড়িত সত্ত্বগণকে দুঃখ হতে মুক্তি লাভের পথ দেখাতে গুরু করেন। এদিকে বর্তমানে মার আমাদেরও ভালো চোখে দেখতেছে না। কারণ আমি সদ্ধর্ম প্রচার করার দরুন তার শক্তি খর্ব হয়ে যাচ্ছে। তবে এটা বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে শুধু আমাদেরই মার একটু সমীহের চোখে দেখছে মাত্র।

শ্রদ্ধেয় বনভ্রম্বে আরও বলেন—মার চারটি বিষয় লাভে বাঁধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে দেয়। সে চারটি কি? কুশলকর্ম সম্পাদন, জ্ঞান লাভ করা, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করণ, সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করণ, এই চারটি বিষয় লাভে বাঁধা দেয়। মার কি বলে জ্ঞান? যারা এ’চারটি বিষয় লাভ করতে চাই, আমি তাদেরকে ব্যর্থ করে দিব। ঐ বিষয়সমূহ অর্জন করাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। আর কিভাবেই বা সহ্য করব। ঐ গুলো অর্জন হলে তো তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলবে। আমাকে তাদের কাছে পদানত হয়ে যেতে হবে। তাদেরকে আমার কথামত পরিচালনা করতে পারব না। সত্ত্বগণ লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা দ্বারা নানা প্রকার অনাচার, অত্যাচারে নিয়োজিত থাকলে অকুশল, পাপমূলক কর্মে রত দেখলে মার খুব খুশী হয়। সত্ত্বগণ যত অকুশল, পাপকর্মে নিয়োজিত থাকে মার তত বেশি আনন্দিত হয়। সেই পাগীদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে মার সিদ্ধহস্ত। মার হল পাগী লোকদের রাজা। দুর্দমনীদের

মধ্যে মারের শক্তি অতীব শক্তিশালী। এমন কোন খারাপ কর্ম বা বাক্য নেই যা মারের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। যত অকুশল, পাপ ঝগড়া-বিবাদ, কাটাকাটি, মারমারি, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী, মস্তানী, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অরাজকতা সৃষ্টিকর্তা হল মার। সকল প্রকার খারাপ কাজে মার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মার জড়িত থাকে। বর্তমানে তোমরাও যে সকল অকুশলকর্মে জড়িত রয়েছ সে সকল অকুশলকর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখ। বিরত রাখতে পারলে নিশ্চিত নিরয়গামী হওয়া হতে রক্ষা পাবে। অন্যদিকে, তোমাদেরকে অকুশল কর্ম হতে বারণ করলেও আমার কথায় কর্ণপাত কর না। তাই মাঝে মাঝে চিন্তা হয় তোমাদেরকে বারণ করব কি না? একটা উপমার কথা বলি-আচ্ছা ধর, কয়েক জন লোক একটা পথ ধরে এগিয়ে চলতে পথের ধারে বিশ্রামরত অন্য এক জনের সাথে সাক্ষাৎ হল। তারা বিশ্রাম রত ব্যক্তির সাথে কিছু আলাপ করে আবার এগিয়ে চলতে লাগল। এদিকে বিশ্রামরত ব্যক্তির পূর্ব হতে জানা ছিল যে, সে পথে একটা ভীমরুলের বাসা রয়েছে। সুতরাং পথিকগণ কিছু অগ্রসর হলে ভীমরুলের কবলে পড়বে। সে ব্যক্তি যদি পথিকগণের হিতকামী হয়, তাহলে তাদেরকে সে পথে যেতে বারণ করবে। আর যদি ভীমরুলের কামড় খাওয়াতে ইচ্ছুক হয় তবে বারণ করবে না। আমার অবস্থাও অনেকটা সে রকম নয় কি? তবে আমি তোমাদেরকে অকুশল সম্পাদন করা হতে বারণ করতে চাই। কিন্তু তোমরা তো আমার কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নও। তবু আমি তোমাদেরকে ভবিষ্যতে যেন দুঃখে পতিত হতে না হয় তার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি। আমার কথা কর্ণপাত না করলে আমাকে কিন্তু দোষারোপ করতে পারবে না। একদিন জনৈক চাকমা উপাসক আমাকে বলেছিল, ভক্তে আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনাকে অবশ্যই বারণ করতে হবে। আমাদেরকে অনুশাসন করতে হবে, বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। আপনার সেই অনুশাসনের কথা শুনে আমরা কিছুটা হলেও সতর্ক হবো। কারণ যেখানে পণ্ডরা পর্যন্ত অনুশাসন মেনে চলে, সেখানে আমরা মানুষ হয়ে কেন মানবো না? অবশ্যই মানবো। আপনি যদি অনুশাসন, বিধি নিষেধ আরোপ না করেন, কে করবে? কাজেই ভক্তে, আপনি চেষ্টা করে দেখেন। আর তাই আমিও বিবিধ প্রকারে যুক্তি, উপমা উত্থাপন করে তোমাদেরকে পাপ হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিই। এবং পাপ বিরতির অনুশাসন করে থাকি। অনেকে নাকি আমার কাছে আসতে ভয় পায়। তার প্রকৃত কারণ কি জান? মারই তাদেরকে বাঁধা প্রদান করে থাকে। হুমকি দেয় যে, বনভক্তের কাছে যাবে না, তিনি তোমাকে বকা দিবেন। আর মারের সেই হুমকির ফলে তারা ভয় পেয়ে আমার কাছে আসতে চায় না। আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি-তোমরা মারের সকল প্রকার বাঁধা-বিপত্তি, প্রলোভন অতিক্রম করে

পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে থাক। পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে হলে মারের প্রভাবে সৃষ্ট সব বাঁধা-বিপত্তি বীর বিক্রমে অতিক্রম করা চাই। মারের বাঁধা-বিপত্তিকে অতিক্রম না করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা যায় না। তাই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে বীর হয়ে যাও। হীন কাপুরুষ হলে চলবে না। যারা বীর তারা মারের হুমকি, বাঁধা বিপত্তিকে নির্ভীক চিন্তে জয় কর। যাতে পুণ্যকর্ম করতে কোন প্রকার কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে বলেন-বৌদ্ধধর্ম আচরণে ইহলোকে যেমন প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে পরলোকেও অধিকতর মঙ্গল সাধিত হয়। আবার, এই ধর্মে ফল প্রাপ্তির জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বাঁধা নেই। ইহার ফলোৎপাদনে কোন প্রকার বিলম্ব হয় না। যখনই সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় তখনই তার ফল পাওয়া যায়। ইহা শুধু কথার কথা নয়, কেবল উপদেশ বাক্যও নয়। বৌদ্ধধর্ম কখনো কাল্পনিক ধর্ম নহে। এ ধর্মের মাধ্যমে প্রকৃত বিমুক্তি সুখ লাভ হয়। তাই এখানে 'এসো দেখো,' বলে বিচার বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আমিও তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের মত শিক্ষিত ছেলেরা সদ্ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আমার কাছে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে এগিয়ে আসো। সত্যিই কি বৌদ্ধধর্মে সুখ অর্জিত হয়? নির্বাণ সুখ কি? এ গুলো গবেষণা কর। দশবল বুদ্ধের শাসন রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী, ভালো শিষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আমার পক্ষে একাই সেসব কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে না। দশবল বুদ্ধের শাসন রক্ষা করলে আমার আরো বি এ, এম এ, ডক্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার ডিগ্রীধারী শিষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। দশবল বুদ্ধের শাসন রক্ষা করতে পারলে দেব-মনুষ্য সকলের অশেষ হিতসুখ, মঙ্গল সাধিত হয়। বর্তমানে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও স্থিতি রাখার জন্য সকলের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তোমরা সব সময় বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি প্রসন্ন মনে অবস্থান করবে। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হলে মনচিন্ত কখনো বিপথগামী হতে পারে না। কায়-বাক্য-মন এই ত্রিবিধ কর্মসমূহকে প্রসন্ন বা নির্মল চিন্তে সম্পাদন করতে সক্ষম হলে মহৎ ফলের অধিকারী হবে। কেহ যদি প্রসন্ন চিন্তে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে অথবা মনন করে সুখ তাকে সততই ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। তাই তোমরা প্রসন্ন মনে কাজ করবে, প্রসন্ন মনে বাক্য প্রয়োগ করবে। তবেই তোমাদের দীর্ঘকাল হিতসুখ, মঙ্গল সাধিত হবে। এবং বহুবিধ পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে। দেহের ছায়া সর্বদা দেহকে আশ্রয় করে তাকে, দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তেমনি পুণ্যার্থীর পুণ্য ছায়াও সব সময় থাকে অনুসরণ করতে থাকে। পক্ষান্তরে দূষিত মনে কাজ করলে, দূষিত মনে কথা বললে পদে পদে দুঃখ

পেতে হয়। শকটবাহী বলদের পদানুগামী ঘূর্ণমান চক্রে ন্যায় দুঃখ তাকে অনুসরণ করে। বলা যায়, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রকৃত কারণ হল তার মন। মনই জীবনকে গড়ে তোলে সুখী কিংবা দুঃখী করে। মন যদি প্রসন্ন বা নিষ্পাপের দিকে চলে তবে সুখ আর মন যদি দূষিত পথে বিচরণশীল হয় তাহলে দুঃখের সীমা থাকে না। কাজেই তোমরা আজ হতে সবাই সাবধান হয়ে যাও। স্বীয় মনচিন্তের দিকে লক্ষ্য রাখ, যাতে দূষিত পথের দিকে ধাবিত হতে না পারে। সর্বদা যেন নিষ্পাপ মার্গে বিচরণশীল হয়। এই কাজে যদি সফল হতে পার তবে কোন দুঃখ তোমাদের কাছে আসতে পারবে না।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা আমার দেশনা বুঝতে পারছ কি? নাকি অনাবাদী জমিতে, ঘন ভূণের ওপর বীজ বপন করলাম এতোক্ষণ। অনাবাদী জমিতে বীজ বপন করলে তো বহু ফলন লাভের আশা দূরের কথা, বীজগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুই লাভ হবে না। যারা জ্ঞানী তারা আমার দেশনা বুঝতে পারে, হৃদয়ে ধারণ করতে পারে এবং সে অনুসারে আচরণ করে মহাসুখের অধিকারী হয়। কিন্তু অজ্ঞানীরা এ সমস্ত জ্ঞানের বিষয় কোনমতে বুঝতে পারে না, হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। আর আচরণ করা তো তাদের কাছে আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। তোমরা যারা জ্ঞানী তারা আমার এ দেশনার মমার্থ বুঝতে চেষ্টাশীল হও। এবং স্বীয় জীবনকে সেই আলোকে পরিচালিত কর। একদিন দেখবে এর সুফল অবশ্যই লাভ করতে পারবে। আজকের আমার এ দেশনার প্রভাবে তোমাদের যদি জ্ঞান উদয় হয়ে অজ্ঞানতা বিদূরীত হয়, মিথ্যাভাব বিদূরীত হয়ে সত্যভাব উদয় হয় তাহলে তোমাদের পরম সুখ লাভ হবে। তোমার আর অধোগতি হবে না, সকল প্রকার দুঃখ, দুর্দশা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই আবারো বলছি, তোমাদের যদি সত্যভাব উদয় হয়, জ্ঞান উদয় হয় তোমরা সুখী হতে পারবে। তোমাদের ভবিষ্যত চিরসুখ, শান্তিতে সমৃদ্ধিময় হয়ে উঠবে। আর অজ্ঞান, মিথ্যাভাব উদয় হয় তাহলে ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকার বলে জানবে। তোমরা সকলে জ্ঞান, সত্যভাব উদয় করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। সে কাজে শত বাধা-বিপত্তি আসলেও পিছ পা হবে না। বরং সুপ্রোথিত ইন্দ্রখীলের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে বীর্যকে আকঁড়ে রেখে উন্নতি দিকে অগ্রসর হবে। এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারলে একদিন না একদিন জ্ঞান, সত্যভাব লাভ হবেই। আর সত্যভাব, জ্ঞান লাভ হলে সমস্ত দুঃখ-যাতনা, অজ্ঞান বিদূরীত হয়ে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হবে। সর্বদা মনে রাখবে-

সত্যভাব যতদিনে না উদিকে তব মনে,

ভব দুঃখ হবে না মোচন।

সাধু, সাধু, সাধু।

অজ্ঞতা থেকে মানুষ পাপকার্য সম্পাদন করে

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে দেশনালায়ে অনুষ্ঠিতব্য দানানুষ্ঠানে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান করছিলেন। তিনি বলেন-বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানীর ধর্ম, অজ্ঞানীর ধর্ম নয়। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তির এ ধর্ম বুঝতে, অনুধাবন করতে ও যথাযথভাবে আচরণে সমর্থ হয়। তাদেরকে খুব বেশি উপদেশ প্রদান তথা জানা উপমার সহিত দেশনা করতে হয় না। জিহ্বার ন্যায় তারা অল্পতেই রসান্বাদন পেয়ে থাকে। একবার চট্টগ্রাম বিভাগের জনৈক বিভাগীয় কমিশনার আমাকে বলেছিল, 'ভস্তুে বস্তুতা দিয়ে হবে না, আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করতে হবে।' গালে মিষ্টি লাগালে মিষ্টির স্বাদ বুঝা যায় না, জিহ্বায় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাদ অনুভব হয়। ঠিক তদ্রূপ বস্তুতা হল গালে মিষ্টি লাগানো, আর জ্ঞান প্রদান করা হল জিহ্বায় মিষ্টি ফেলা। কাজেই বস্তুতা নয় আমাদেরকে জ্ঞানই প্রদান করতে হবে। তবে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তে যদি ধর্মদেশনা শ্রবণ করা যায় তাহলে অবশ্যই শ্রোতাদের জ্ঞান উদয় হবার কথা। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন চিন্তে অলসতার সহিত ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে জ্ঞান উদয় হবার কোন সুযোগ নেই। বুদ্ধের সময়ে অনেকে ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে করতে অরহত লাভ করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তে ধর্মদেশনা করেছিলেন বলেই তারা জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমাকে দূরের কোথাও ফাং করলে আমি যেতে চাই না। তার কারণ জান কি? আমি সঙ্কোচ বোধ করি বলে। কারণ তারা যদি আমাকে প্রশ্ন করে আপনি যেখানে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী অবস্থান করতেছেন সেখানে কতজন লোককে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তখন আমার বলা কিছুই থাকবে না। আমাকে নিরুত্তর, চুপ করে থাকতে হবে। সে রকম প্রশ্ন করলে যদি জোড় গলায় উত্তর দিতে পারতাম হাজার লোককে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। উত্তর শুনে তারাও আশ্বস্ত হতো এবং আশাবাদের সহিত বলত তাহলে আমাদেরকে বুঝান। আমাদেরকে বুঝাতে আপনার কোন জুড়ি নেই। এই বুঝতে পারা না সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি। আচ্ছা তোমাদের অভিমত কি? বনভঙ্কে ভালোভাবে বুঝাতে সক্ষম কিন্তু তোমাদের অদক্ষতার দরুন বুঝতে পারতেছ না। নাকি বনভঙ্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন না, অথচ ভালোভাবে বুঝাতে পারলে তোমরা বুঝতে সক্ষম হতে। সত্যি করে বলতো দেখি কোনটা ঠিক? সবাই একস্বরে বলে উঠল, ভস্তুে আপনি ভালোভাবে বুঝাতে সক্ষম কিন্তু আমরা অজ্ঞ বলে বুঝতে পারি না। (এবার বনভঙ্কে বললেন) তাহলে তোমরা অজ্ঞানতা বশত আমার বুঝিয়ে বলা কথাসমূহ বুঝতে পারতেছ না। বুদ্ধ বলেছেন, যদি কোন কার্যে

সফলতা লাভ না হয় তাহলে জানবে তার ভিতর নিশ্চয় ভুল, গলদ, অজ্ঞানতা বিদ্যমান রয়েছে। কোথায় সেসব ভুল, গলদ লুকিয়ে আছে তা বাহির করতে চেষ্টা কর। সে ভুল, গলদ, অজ্ঞানতা যথাযথভাবে সূচিকিৎসা করতঃ সফলতা লাভ কর। আবার, মানুষ মাঝেই ভুলের অধীন বলে জানবে। একমাত্র সম্যক সমুদ্ররাই নির্ভুল। তারা সর্বজ্ঞ জ্ঞানের প্রভাবে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন, তাই তাদের কোন প্রকার ভুল থাকতে পারে না। তারা সমস্ত ভুলের উর্ধ্বে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—অর্থশ্রাবক শারীপুত্র, মৌদাল্যায়ন মহোদয়ের দুই/এক কথা ভগবান বুদ্ধ সংশোধন করে দিতেন। কাজেই সাধারণ মানুষের কথাবার্তা, আচার ব্যবহার, কাজকর্মে তো কথাই নেই, প্রতিটি পদে পদে ভুল হতেই পারে। তবে স্মৃতি সহকারে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারলে ভুল করার পরিমাণ কমানো সম্ভব। কারণ নিত্য সতর্কতার সহিত অবস্থান করলে ভুল সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়, এবং তা সংশোধন করতে তেমন অসুবিধার কিছুই নেই।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন—ভুল বা অজ্ঞানতা থেকে মানুষ পাপকার্য সম্পাদন করে থাকে। আর ঐ পাপকর্মের প্রতি অজ্ঞ মানুষের একটা আকর্ষণও রয়েছে। কারণ পাপকর্ম যতদিন তার ফল প্রদান না করে ততদিন আপাত মধুরই দেখায়। কিন্তু পাপের বিপাক ফলপ্রসূ হয় তখন ইহ-পরলোকে অশেষ প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই পাপকর্মী পাপের ভয়ানক পরিণতি দেখে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। বলা যায় অজ্ঞ ব্যক্তির পাপকর্ম সম্পাদন করে নিজেকে নিজে ঘোর শত্রু বানিয়ে ফেলে। শত্রু যেমন শত্রুর অপকার, অনিষ্টসাধন করে, পাপকর্মও তেমনি মানুষকে বর্ণনাভীত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করায় চরম অনিষ্টসাধন করে থাকে। পাপ করলে সর্বদা বিবিধ কষ্টের সহিত তার ফল ভোগ করতে হয়। পাপের পরিণামে দুঃখ, দুর্গতি অবশ্যজ্ঞাবী। দুঃখ-যাতনা ও দুর্গতি পাপী লোকের ভূষণ। তাই বলা হয়েছে পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার। পুণ্যের নিকট পাপ পরাভূত হয়। পুণ্যবান ব্যক্তি ইহলোক পরলোক উভয়লোকে আনন্দ লাভ করে থাকে। আমি পুণ্যকর্ম করেছি এই সং সাহসে বা চিন্তায় তার ইহলোকে যেমন আনন্দ লাভ হয়, তেমনি মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে আরো আনন্দ পান। যিনি কৃতপুণ্য ব্যক্তি তিনি ইহ ও পর উভয়লোকে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। কারণ ধর্মচারীকে ধর্মই রক্ষা করে। তাই বলি, সকলের সুখের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন বা সদ্ধর্ম আচরণ করা অবশ্যই উচিত। তোমরা অধোগামী না হয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করার জন্য অহোরাত্রি পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। কখনো পাপকর্ম সম্পাদন করবে না।

বুদ্ধ করণীয় সূত্রে বলেছেন, এমন কোন ক্ষুদ্র পাপকার্যও সম্পাদন করবে না যাতে অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারে। বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের লোকজনেরাও

বৌদ্ধধর্মের উপদেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। কাজেই তোমরা পাপকার্য সম্পাদন করলে তারা অবশ্য তোমাদেরকে নিন্দা, তিরস্কার করবে। তাই তোমরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অকুশল ত্যাগ করে কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকো। যদি অকুশলকর্মে জড়িত থাক তাহলে অন্যজন কর্তৃক নিন্দিত, অগ্রাহ্যের পাত্র হবে। কারণ দুঃশীল, পাপী ও অধর্মতঃ জীবন যাপনকারীকে কেহ মনে-প্রাণে ভালো চোখে দেখে না। মান সম্মানাদিও দেখায় না। বরঞ্চ প্রত্যেক্ষে বা পরোক্ষে সবাই তাদেরকে নিন্দা, অবজ্ঞা, তিরস্কার, দুর্নাম করে। এভাবে সকলের কাছে তারা সন্দেহ ও সমালোচনার পাত্র হিসেবে পরিচিত হয়। তাই তোমরা বুদ্ধের উপদেশসমূহ মনোযোগের সহিত যথাযথভাবে আচরণ কর। এতে কোন প্রকার অধঃপতন, অনর্থের শিকার হবে না। জীবনের সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি, সংকীর্ণতা মনোভাব ধূঁয়ে মুছে উৎকৃষ্ট মানবরূপে জীবন-যাপন করতে পারবে।

কারোর প্রতি অন্যায়ভাব পোষণ না করা, শত্রুতা আচরণ না করা, কারোর ক্ষতিসাধন না করা এবং কোন প্রাণী হিংসা না করা ইহল বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের মতে, কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা না করে সমস্ত প্রাণীর প্রতি অহিংসক হলে সুখ লাভ হয়। কারোর ক্ষতিসাধন না করে উপকার পরম মঙ্গল। পরকে উপকার করা বড়ই আনন্দদায়ক। খুব বেশি সামর্থ্য না থাকলে সুচাত্ত্বের পরিমাণ ন্যায্য হলেও অপরকে উপকার করতে চেষ্টা করবে। তাহলেও মনের মধ্যে প্রভূত আনন্দ লাভ হয়। আবার, উপকার করার শক্তি না থাকলে কিছুতেই অপকার করবে না। এমন কি অপরের ক্ষতিসাধন চিন্তাও মনের মধ্যে স্থান দিবে না। বরঞ্চ অন্যজনের দ্বারা কৃত উপকারমূলক কর্মকে সাধুবাদের সহিত উৎসাহিত হয়ে অনুমোদন করবে। তাতেও পুণ্য সম্পাদিত হবেই। যিনি শত্রু-মিত্রে সমান দয়াবান, হিংসাকে অহিংসার দ্বারা এবং শত্রুকে মিত্র দ্বারা আপন করে গ্রহণ করতে পারেন তিনি জগতে পরম সুখী।

তিনি আরো বলেন-মূর্খজনেরা ছয়টি দোষমূলক কর্মে দূষিত। তারা ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো; ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায়; দোষকে নির্দোষ, নির্দোষকে দোষ বলে মনে করে থাকে। এক কথায় তারা গাছকে বাঁশ, বাঁশকে গাছ জ্ঞানে বিচার করে। মেঘখণ্ড যেমন মহাপ্রভা সম্পন্ন পূর্ণিমার চন্দ্রকে ঢেকে রেখে তার উজ্জ্বল জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হতে দেয় না। তেমনি মূর্খজনেরা তাদের অজ্ঞতার কারণে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, দোষ-নির্দোষ, পাপ-পুণ্য, হীন-উত্তম, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিছুই বুঝতে পারে না। তাই মূর্খের দ্বারা কোন উত্তম, শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলজনক কাজ আশা করা যায় না। তাদের কখনো হিতাহিত বিবেক বুদ্ধি জাহ্নত হয় না। বুদ্ধ বলেছেন এ জগতে যত প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয় একমাত্র মূর্খতার দরুন। মূর্খজনের চিন্তা কুপথে পরিচালিত হয়ে

বিবিধ পাপকার্যে লিপ্ত থাকে। পাপকর্মে আসক্ত হয়ে সে ইহজন্মে যেমন নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুর পর তেমনি চারি অপায়ে পতিত হয়ে অসীম নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করে। কারণ অকুশলকর্মের ফল কখনো সুখের, শান্তির, স্বস্তির হয় না। উপরন্তু বড়ো কষ্টের সহিত অনুতাপের নলে দন্ধ-বিদন্ধ হতে হতে তার বিষময় ফল ভোগ করতে হয়। তাই অকুশলকর্মের বিপাক ইহজন্মে ভীষণ জ্বালাময়ী দুঃখ প্রদান করে। আর পরকালে তদপেক্ষা ভীষণতর দুর্বিষহ দুঃখ যাতনা প্রদান করে থাকে। তাই তোমরা মূর্খতা ত্যাগ করে জ্ঞানী হয়ে যাও। জ্ঞানী হতে পারলে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, দোষ-নির্দোষ বিচার করতে পারবে। সেই বিচারের প্রেক্ষিতে মন্দ, অন্যায়, দোষমূলক বিষয়সমূহ ত্যাগ করে ভালো, ন্যায় নির্দোষকে গ্রহণ করতে সহজ হবে। বৌদ্ধধর্মের উপদেশ হল তোমরা পরের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের জ্ঞান দ্বারা বিচার বিবেচনা মাধ্যমে যা সত্য ন্যায়, ভালো সেগুলো গ্রহণ কর। তাই আমি বনভক্তে বলছি বলেও গ্রহণ করতে নেই। তোমরা আমার কথিত উপদেশও যাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পার। জ্ঞানীগণ কখনো যাছাই ব্যতীত নির্বিচারে গ্রহণ করে না। আমি অনেক জনকে বলতে শুনেছি, আজকে অমুক কর্তৃক যে কথাগুলি ভাষণ করা হল, আমরা সে সবার কিছু বিচার করতে পারি না। তার কথাগুলো সত্য নাকি মিথ্যা, সঠিক না ভুল? বলা বাহুল্য যে, যে কোন ব্যক্তির উপদেশ বা কথা গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই বিচার করা উচিত। কখনো নির্বিচারে গ্রহণ করতে নেই। কারণ বিচার ব্যতীত, যাছাই না করে গ্রহণ না করলে সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে গ্রহণ করার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাই জ্ঞানীরা অপরের কোন কথা বা উপদেশ নির্বিচারে গ্রহণ করে না। তারা স্বয়ং নিজে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, দোষ-নির্দোষ, সার-অসার যাছাই করে বিচার করার পর গ্রহণ করে থাকে। আর এটাই প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। মনে রাখবে বৌদ্ধধর্ম পরমুখাপেক্ষী ও বাইরের অনুভূতি থেকে বিশ্বাস, গ্রহণ করার ধর্ম নয়। এ' ধর্ম স্বয়ং নিজে প্রত্যক্ষীভূত, উপলব্ধিভূত গবেষণাপ্রসূত দ্বারা অবগত হবার ধর্ম। জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিজে নিজেই জানবার, বুঝবার ধর্ম। এখানে অন্ধভাবে, জোরপূর্বক গ্রহণ করানোর কোন অবকাশ নেই।

পরিশেষে তিনি বলেন-অকুশলকর্ম ত্যাগ করে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর। সর্বদা মনচিস্ত কুশলকর্মের দিকে ধাবিত করবে। কিছুতেই মনে মনে অকুশল চিন্তা করবে না। হঠাৎ মনের মধ্যে অকুশল চিন্তার উদয় হলেও সঙ্গে সঙ্গে মনচিস্ত হতে সেই চিন্তাকে সরিয়ে দিবে। জীবনের বিনিময়ে হলেও পঞ্চাশীল ভঙ্গ করবে না। অনন্তপক্ষে দিনে তিনবার 'সকল প্রাণী সুখী হোক' বলে মৈত্রী ভাবনা করবে। কোন প্রাণীর প্রতি অহিত, অমঙ্গল কামনা করবে না। দয়া-

দাক্ষিণ্য, ত্যাগ-তিতিষ্কার ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে সুভ্রাতৃত্ব ভাব অক্ষুণ্ণ রাখবে। দুঃখীজনের দুঃখ বুঝতে চেষ্টা করবে। দুঃখীজনকে যতদূর সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করার উত্তম। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, তাই সকলের প্রতি ক্ষমাশীল দৃষ্টি রেখে আত্ম-পর হিতকামী হবে। যে বাক্য নিজের কাছে অপ্রিয়, সেই অপ্রিয় বাক্য কখনো অপরকে প্রয়োগ করবে না। কারণ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগের প্রত্যুত্তরে তোমাকেও অপ্রিয় বাক্য শুনতে হবে। মিথ্যা কথা বলে অপরকে প্রভাবিত করবে না। পিস্তন-ক্রোধী ও ভেদপূর্ণ বাক্য পরিহার করে সকলের সঙ্গে শ্রুতি মধুর, মনোজ্ঞ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করবে। সর্বদা জাতিত ভাব বা সংঘম রক্ষা করে চলতে পারলে বহুবিধ দুঃখ-কষ্ট, ভয়-অন্তরায় ত্যাগ পাওয়া সম্ভব। সংঘম ইহ-পরলোকে অশেষ হিত সুখ সাধিত হয়। এবং কোন প্রকার দুঃখের মধ্যে পতিত হওয়ার কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না।

সাধু, সাধু, সাধু।

অকুশলকর্ম করলে মার খুব খুশী হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভ্রম্বে দেশনালায়ে উপস্থিত দায়ক দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—লোভ, দ্বেষ, মোহ চিন্তকে নিয়ে কেহ যদি সুখ ভোগ করতে চায় তাহলে তা' মার আকৃষ্ট চিন্ত বলে জানবে। মার আকৃষ্ট চিন্তই বিষয় ভাবনায় মত্ত থেকে এ সংসারে সুখ ভোগের ইচ্ছা পোষণ করে। এ সংসারে ভোগের মধ্যে সুখ আসে, সুখ লাভ হয়, সুখে অবস্থান করা যায় বলে মার সন্তুষ্টিগণকে প্রলুব্ধ করায়। ফলে সন্তুষ্টিগণ সর্বদা ভোগ লালসায় আসক্ত হয়ে বিষয় হতে বিষয়াস্তরে ঘুরে ঘুরে বিবিধ কামনা বাসনার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ থাকে। একটি কাম্য বস্তু লাভে আরো কত প্রকার যে কাম্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষা জাগে তা' ইয়ত্তা নেই। এভাবে তৃপ্তিহীন ভোগ তৃষ্ণার জ্বালায় তাদের দুঃখের অবধি নেই। সে কামনা বাসনায় নিপীড়িত চিন্তে পরম সুখ হবার দূরের কথা, ক্ষণিক সুখও লাভ হয় না। কিন্তু মার সন্তুষ্টিগণের চোখে মিথ্যার ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে সে প্রকৃত সত্যকে জানতে দেয় না। রঙিন চাশমা পড়লে সবকিছুকে যেমন রঙিন বলে মনে হয়। ঠিক তদ্রূপ মার আকৃষ্ট চিন্তে এ সংসারে ভোগ আর ভোগ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। তখন সন্তুষ্টিগণের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হয়। ভোগে নয় ত্যাগে যে প্রকৃত সুখ লাভ হয় তা' বুঝতে চাই না। যিনি নিজের চিন্তকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম তিনি মারের সকল প্রকার মিথ্যার ধাঁধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেন। তবে ভোগ বাসনা হতে চিন্তকে সুনিয়ন্ত্রিত করা বা সংঘমের দিকে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়—খুবই দুরূহ কাজ। মার কি বলে জান? কেহকে মুক্তি দেবো না, সবাইকে ভোগ বিলাসে আবদ্ধ করে রাখব। যারা

নির্বাণ লাভেচ্ছুক, সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভের প্রত্যাশী, সম্যক জ্ঞান অনুসন্ধানী আমি তাদেরকে পঞ্চকামগুণে বন্দী করব। তাদের জ্ঞান, দুঃখমুক্তি, নির্বাণ লাভের ইচ্ছা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বীর্যকে হতম করে দেবো। সত্ত্বদিগকে কষ্ট দেওয়া, দুঃখ প্রদান করা এবং চারি অপায়ে পতিত করা মারের কাজ। আবার, সত্ত্বদিগকে মেরে ফেলে বলে ভগবান বুদ্ধ থাকে মার নামে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধধর্মের মতে মার; ইসলাম ধর্মের শয়তান, খৃষ্টধর্মে শয়তান, হিন্দু ধর্মে শনি বলা হয়। তোমাদের যদি চারি আর্যসত্য অর্জন হয়, চারি আর্যসত্যের সাথে সাক্ষাৎ মিলে, আসবক্ষয় জ্ঞান উদয় হয় তাহলে মার আপনা-আপনি পরাজিত হবে।

সত্ত্বগণ ভোগ বিলাসে মত্ত থাকলে, নানা অকুশলকর্ম সম্পাদনে লিপ্ত থাকলে মার খুব খুশী হয়। কারণ এতে মারের পাপ করার সঙ্গী জুটে, জগতে পাপীর সংখ্যা বেড়ে যায়। সেই পাপীমিত্রদের সহিত একত্রিত হয়ে মার সহজে বহু অকুশলকর্ম সম্পাদন করে থাকে। এবং সদ্ধর্ম আচরণে বিরোধীতা করে। কাম হল মারের প্রধান সেনা; আরতি (আসক্তি) হল দ্বিতীয় সেনা; ক্রুৎ-পিপাসা হল তৃতীয় সেনা; তৃষ্ণা হল চতুর্থ সেনা; আলস্য ও তন্দ্রা হল পঞ্চম সেনা; ভীর্ণতা হল ষষ্ঠ সেনা; সন্দেহ হল সপ্তম সেনা; কুহনা ও জড়তা হল অষ্টম সেনা। এ ছাড়া লাভ-সৎকার, যশ, মিথ্যালব্ধ খ্যাতি, আত্মপ্রশংসায় রত হয়ে অপরকে ঘৃণা করা এসবও মারের সেনা। এ সকল সেনা দ্বারা মার সত্ত্বগণের চিন্তকে আক্রমণ করতঃ বিপথগামী করে দেয়। মার সেনাদের কাছে পরাজিত হয়ে আজ্ঞাবহ ভূত্যের মতন মারের বশানুগত হয়। মার তাদের জ্ঞানচক্ষু হরণ করে থাকে, যাতে কিছুতেই মুক্তির পথ খোঁজে পায় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-তোমাদের মনচিন্তের মধ্যে যদি অজ্ঞানতা ভাব থাকে তাহলে আমার উপদেশসমূহ ভালো লাগবে না। আর যদি জ্ঞান থাকে তবে ভালো লাগবে, উত্তম বলে মনে হবে। ‘আমি’, ‘আমার’ এ ধারণা যেমন মিথ্যা তেমনি ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’, ‘পুত্র-কন্যা’, ‘আত্মীয়-স্বজন’ সবই মিথ্যা বলে জানবে। বলা বাহুল্য, আসলে এ সংসারে সত্য, সার, আপন, নিজস্ব বলে কিছুই নেই। আপন নিজস্ব বলে যা দাবি করা হয় তা’ পাগলের প্রলাপ বলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। সংসারের সবকিছুকে মিথ্যা, অসার বলে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ অনাসক্তভাবে অবস্থান করাকে সত্যধর্ম বলা হয়। তোমরা মিথ্যাধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থেকে সত্যধর্ম আচরণ কর। সত্যধর্ম আচরণের ফলে তোমাদের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাদি সহ সংসারের সমস্ত দুঃখরাশি নিঃশেষ হয়ে যাবে। মিথ্যাধর্ম আচরণ করলে কিন্তু কখনো সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, কামের প্রতি লোভ, কামের প্রতি আসক্তি, কামের প্রতি

অজ্ঞানতা দ্বারা হীন মনুষ্যগণ বিপদে পরিচালিত হয়ে অনন্ত দুঃখের সম্মুখে পতিত হয়। তাই হীন মানুষ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বৌদ্ধধর্ম মতে, 'আমি মানুষ' এ ধারণা বিদ্যমান মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। আর তখন ভ্রান্ত মতের বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে মিথ্যাকে গ্রহণ করতঃ সত্যকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে ভগবান বুদ্ধ মানুষকে (আমি মানুষ এ ধারণাকে) হীন, তৃষ্ণাকে হীন, সংস্কারকে হীন বলে অভিহিত করেছেন। এবং সেই হীন সমূহ বর্জন করে সংসারচক্রে ঘুরে বেড়ানোর দুঃখ থেকে মুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মের উপদেশ হল পরধর্ম ও পরকাজ করা হতে বিরত থাকা। পঞ্চাঙ্গুরে নিজধর্ম এবং নিজকাজ সম্পাদন করা। যে ধর্মনীতিতে লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদ্যমান থাকে বা যে ধর্মনীতি আচরণ করলে লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপন্ন হয় তা' পরধর্ম। আর লোভ, দ্বেষ, মোহের সহিত যে কাজ করা হয় তা' পরকাজ। যে ধর্মনীতি আচরণ করলে লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপন্ন হয় না এবং পূর্বে উৎপন্ন লোভ, দ্বেষ, মোহ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায় তা' নিজধর্ম (সদ্ধর্ম)। অনুরূপভাবে যে কাজ লোভ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত তাকে নিজকাজ বলা হয়। নিজকাজ, নিজধর্ম আচরণে পার্থিব জীবনের অগণিত দুঃখ-তাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কামনা বাসনার সংঘাত বিন্দুমাত্রও বিক্ষুব্ধ করতে পারে না-সেপথে। তাই নিজধর্ম, নিজকাজ অনুশীলনই একমাত্র প্রকৃত সুখের পথ, শান্তির পথ, পরম তৃপ্তির পথ, আনন্দের পথ, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথ। পরধর্ম, পরকাজ ইহ-পরলোকে অশেষ দুঃখ যাতনা বয়ে আনে; মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়। ইহা দুঃখ, ভয়সঙ্কুল ও বিপদজনক পথ। তজ্জন্য নিজকাজ, নিজধর্ম আচরণশীল মুক্তি পথের পথিককে সতর্ক থাকতে হয়, যেন পরধর্ম, পরকাজের ফাঁদে না পড়ে। তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা নিজধর্ম, নিজকাজই অনুশীলন করবে। পরধর্ম, পরকাজ অনুশীলন করতে লজ্জা ও ভয় পাবে। বিভাগীয় কমিশনার যেমন লোকচক্ষুর লজ্জা ভয়ে মরে গেলেও পিয়নের চাকুরি করবে না। সে জ্ঞান কি? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষ্য জ্ঞান। চিন্তের মধ্যে এই জ্ঞান উদয় হলে পরম সুখ লাভ হয়।

মানুষের চিন্তা সর্বদা সুখ অন্বেষণে রত। কি করলে বা কোথায় গেলে সুখ লাভ হবে তা নিয়েই ব্যস্ত। সেই চিন্তা সুখের জন্য অনেকে খোঁজে উচ্চ পদবী, উচ্চতর ডিগ্রী; কেহ বা বিপুল অর্থবিস্ত। আবার, বর্তমানে কেহ কেহ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সব ভোগের দ্বারা চিন্তে প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। বরঞ্চ দুঃখই বেড়ে যাবে সার। যেহেতু আশা আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত ভোগমত্ততা কখনো সুখবহ নয়। সংযমের দ্বারা দমিত চিন্তাই মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে। একমাত্র দমিত চিন্তাই সুখের

কারণ। তবে চিন্তকে দমন করা, বশে আনা সহজ ব্যাপার নয়-যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। অজ্ঞব্যক্তির কখনো চিন্তকে বশীভূত করতে পারে না, অধিকন্তু নিজেরাই চিন্তের বশীভূত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই চিন্তকে দমন করতে সমর্থ হন। তারা দমিত, শান্ত চিন্তে নৈর্বাণিক সুখ উপলব্ধি করেন। সেজন্য তোমরা নির্বাণ সুখ লাভের তাগিদে ভোগ-লালসা ত্যাগ করতঃ আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন কর। দমিত আত্ম, দমিত চিন্ত, দমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পূরণ হয়। আর শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পূরণ হলে তবেই নির্বাণ লাভ হয়। তাই বুদ্ধ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পূরণের আগে আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন করতে উপদেশ দেন। কারণ দমিত না হলে অদমিত অবস্থায় শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা যথাযথভাবে আচরণ ও পূরণ করা যায় না। যেমন বিরাট একটি ধান্যক্ষেত্রের পাশে শতাধিক গরুর পালকে একজন মাত্র রাখাল বালকের পক্ষে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চরানো সম্ভব নয়। রাখাল বালক একটা গরুকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে অপর একটি গরু ক্ষেত্র নষ্ট করে ফেলবে। ঠিক তদ্রূপ প্রথমে আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন করতে না পারলে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা বর্ধিত বহুলীকৃত করা অসম্ভব। যেখানে পুরুষ মহিলাগণের গমনাগমন নেই সেখানে আত্মদমন করতে হয়। আর যেখানে মানুষ বা জন সমাগম নেই সেখানে চিন্তদমন করতে হয়। বলা যায় গভীর অরণ্য যেখানে গাছপালা, বন বনানী ছাড়া কিছু দেখা যায় না; কোন জনসাধারণের শব্দ শুনা যায় না; দিবারাত্রি সমভাবে নিঝুম, নিস্তব্ধ সেখানে আত্মদমন, চিন্তদমন করতে সহজ। ষড় ইন্দ্রিয়সমূহে ইচ্ছা মত ইন্দ্রিয় সেবী না হয়ে, উপরন্তু চক্ষু থাকতে অন্ধ, কর্ণ থাকতে বধির, শক্তি থাকতে দুর্বল, জ্ঞান থাকতে বোবা, প্রাণ থাকতে মৃত-এ পছা অনুশীলন করে ইন্দ্রিয়দমন করতে হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা সর্বদা অপ্রমত্ত বা সাবধানতা অবলম্বন কর। সাবধানতা রক্ষা করতে পারলে পাপ, অকুশল উৎপন্ন হতে পারে না। এবং জ্ঞান, কুশলে বলীয়ান হওয়া সম্ভব হয়। ভগবান বুদ্ধ হল ডাক্তার, ধর্ম হল ঔষধ আর জনসাধারণ (তোমরা) সবাই রোগী। তাই তোমাদেরকে ডাক্তাররূপী বুদ্ধের সকাশে এসে রোগমুক্তির জন্য ধর্ম ঔষধ সেবন করতে হবে। সেই ধর্মোষধ সেবনের দ্বারা তোমরা রোগমুক্ত হওত অজর, অমর নির্বাণ সুখ লাভ করো। আমি তো দেখতেছি তোমরা সবাই রোগী, রোগের অসহ্য জ্বালায় তোমাদের কারোর সুখ নেই। তোমরা কেমন রোগী জান? ক্রেশ রোগী, স্কন্ধ রোগী। দশবিধ ক্রেশের দুঃখ যাতনায় ও পঞ্চস্কন্ধের পীড়নে কাতর হয়ে তোমরা সর্বদা ছটপট করতেছ। কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টের শিকার হতে মুক্তির উপায় খোঁজে বের করতে পারছ না। অতএব, সেই রোগরূপ দুঃখ হতে মুক্তি লাভের জন্য বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্মোষধ সেবন করতে হবে। বুদ্ধের ধর্মোষধালয় হতে ঔষধ সেবন

করতঃ তোমরা সবাই রোগ আরোগ্য কর। আর তখনই রোগমুক্ত হয়ে সুখে অবস্থান করতে পারবে। সেই ধর্মোষধ কি? সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ ভগবান বুদ্ধের ধর্মোষধ। যথা-চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম বা বুদ্ধের ধর্মোষধ সেবনে ক্লেশ রোগ, স্কন্ধ রোগ চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকে নির্বাণ পরম সুখ উপলব্ধি হয়। ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রোগী এই ধর্মোষধ সেবন করে রোগ আরোগ্য হওত নির্বাণ সুখ লাভ করেছিল। বর্তমানে তোমরাও এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও ‘আমরা বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্মোষধ সেবন আমাদের রোগ আরোগ্য করতঃ নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান করব।’ ক্লেশ রোগ, স্কন্ধ রোগ আরোগ্যের জন্য ধর্মোষধ সেবনের কোন বিকল্প নেই। ধর্মোষধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্লেশ রোগ, স্কন্ধ রোগ নিরাময় করা যায় না। তাই তোমরা ধর্মোষধ সেবনে সচেষ্ট হয়ে স্বীয় স্বীয় রোগ আরোগ্য লাভ করতঃ নির্বাণ সুখ উপলব্ধি কর।

তোমরা কুপথ ত্যাগ করে সুপথের আশ্রয় গ্রহণ কর। আবার, জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করবে, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করবে। মিথ্যার সহিত এবং অজ্ঞানের সাথে অবস্থান করবে না। সত্য আর জ্ঞান তোমাদিগকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করবে। জ্ঞানেই তোমাদেরকে সংসার দুঃখ হতে মুক্তির পথ দেখাবে। সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে বর্জন করতঃ সুখে জীবন-যাপন করতে পারবে। সত্য এবং জ্ঞানেই তোমাদেরকে সুখ প্রদান করবে। সত্য, জ্ঞান লাভ হলে কখনো দুঃখের মধ্যে পতিত হতে হবে না। সর্বোপরি জ্ঞান এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তোমরা আমার উপদেশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতে সক্ষম হবে। আমি বলছি তোমরা যদি আমার উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন কর তাহলে তোমাদের জীবনে তার সুফল বয়ে আসবে। তোমরা বর্গরাম, বর্গনন্দী, বর্গকরনী বাক্য ত্যাগ করে সমগ্র রাম, সমগ্র নন্দী, সমগ্র করনী বাক্য প্রয়োগ কর। বর্গরাম, বর্গনন্দী, বর্গকরনী বাক্য অর্থ যে বাক্যসমূহ একে অপরের মধ্যে ভেদ, কলহ সৃষ্টি করে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশকে বিনষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে, সমগ্র রাম, সমগ্র নন্দী, সমগ্র করনী বাক্য অর্থ যে বাক্যসমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, মৈত্রী, মিলন, দৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করায় দেয়। তাই তোমরা সকলের সুখের জন্য বর্গরাম, বর্গনন্দী, বর্গকরনী বাক্য পরিহার করে সমগ্র রাম, সমগ্র নন্দী, সমগ্র করনী কথা বলবে। কখনো অজ্ঞতা ভাব উৎপন্ন হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করবে না। যেমন-মিথ্যা অপবাদ, পরচর্চা, পরনিন্দা, ক্রোধ উদ্দীপক, মনপীড়া বা মনোকষ্ট উদ্দীপক এই বাক্যসমূহ বর্জন করবে। তার পরিবর্তে শ্রুতি

মধুর, কর্ণ সুখকর, প্রিয়, মনোজ্ঞ, সর্বজন হৃদয়গ্রাহী, সত্যোদ্দীপক, সর্ব দুঃখহর অমৃতপ্রদ বাক্যই বলবে। তবে তোমাদের যদি জ্ঞান, কুশল অর্জিত হয় তাহলে পরস্পর পরস্পরে মৈত্রী, ঐক্যের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করতে পারবে। অন্যথায় পাশ্চাত্যের মতন একতা বা ঐক্য হবে সুদূর পরাহত।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সবাই এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারবে কি? 'আমরা অজ্ঞানের তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করবো না। আমরা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করব, জ্ঞানের সহিত অবস্থান করব।' তোমরা মিথ্যাধর্ম বর্জন করে সত্যধর্ম গ্রহণ কর। জ্ঞান ও সত্যের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে যত্নশীল হও। তাহলে অবশ্যই ইহ-পরলোকের জন্য তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি লাভ ও সুখ, মঙ্গল বয়ে আসবে। আমার দেশনার উদ্দেশ্য কি জান? তোমাদেরকে ভাবী দুঃখ-কষ্ট ও অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তোমাদের সুখ শান্তির ঠিকানা সুচিহ্নিত করে দেওয়া। তোমাদের নিম্নগামী চিন্তকে উর্ধ্বদিকে গতি পরিবর্তন করে দেওয়া। কারণ পাপের বিপাক কখনো সুখের হয় না। বরঞ্চ পরিণামে মহাবিপদ, সর্বনাশ দেখে আনে। অন্যদিকে কুশল, পুণ্যের ফল ইহ-পরলোকে সুখ ও মহা পরিতৃপ্তিকর আনন্দদায়ক। তাই দিবা-রাত্রি কুশল, পুণ্য সঞ্চয় করে তোমরা দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে সার্থক করে তোল। চিন্তকে সর্বদা উর্ধ্বদিকে ধাবিত করতে চেষ্টাশীল হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা, উচ্চতর সাধনা, উচ্চতর জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। কখনো নিম্নাকাঙ্ক্ষা, নীচমনা, হীন সাধনা, হীন জ্ঞানের কথা চিন্তা করবে না। মনে রাখবে, চিন্তের নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা, উচ্চতর সাধনা, উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা মার্গফল নির্বাণ সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

সাধু, সাধু, সাধু।

যে জাতিতে একজন সংপুরুষ উৎপন্ন হয় সে জাতির শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে দেশনালায়ে অনুষ্ঠিত দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা দিচ্ছেন। দেশনায় তিনি বলেন-তোমাদের মনের মধ্যে অজ্ঞানতা ভাব বিদ্যমান থাকলে তোমরা নিরয়গামী হবে। আর জ্ঞান বিদ্যমান থাকলে উর্ধ্বগামী হবে। আবার, তোমরা যদি অধোগামী হও, তোমাদের পরিহানি হয়; আমি লজ্জিত হবো বৈ কি। কারণ আমার অবস্থানকালে তোমাদের অধঃপতন, পরিহানি হবার কথা নয়। বুদ্ধ বলেছেন, যে জাতিতে একজন সংপুরুষ, মহাপুরুষ উৎপন্ন হয় সে জাতির গৌরব, সম্মান, সৌভাগ্য, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী। সেই জাতি অতিসত্ত্বর হয়ে উঠে ধন্য, পবিত্র, গৌরবান্বিত ও মহিমাম্বিত। সেই জাতির গৌরব কেতন বহুকাল পর্যন্ত উজ্জ্বলাকারে পরিব্যাপ্ত থাকে। তাই এটা স্মরণসিদ্ধ

যে, আমার কারণে তোমাদের মান, সম্মান, সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে। তবে তোমাদের মান, সম্মান বৃদ্ধির পূর্বে তোমাদেরকে অবশ্যই আমার কথা মত চলতে হবে। আমার উপদেশ, দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় এ সবেবের বিপরীতে অর্থাৎ আমার উপদেশ দিক নির্দেশনা মেনে না চললে তোমরা কিভাবে উপকৃত হবে? যেমন ধর, একজন ব্যক্তি ভীষণ পেট ব্যথায় কাতর হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ইত্যবসরে তার এক পাশে পেট ব্যথা নাশকের খুব ভালো ঔষধ (যা সেবনের মুহূর্তেই আরোগ্য লাভ হয়) পাওয়া গেল। লোকজন রোগীকে সেই ঔষধ সেবনে বারবার তাগিদ দিতে লাগল। কিন্তু রোগী কিছুতেই সে ঔষধ খেতে রাজি নয়। উপরন্তু বলতে থাকে, ‘আমি এই ঔষধ বিশ্বাস করি না, মরে যাবো তবুও ঔষধ খাবো না।’ আচ্ছা এখন তোমরা বল রোগীর পেট ব্যথা দুঃখের জন্য ঔষধ দায়ী নাকি রোগী নিজেই দায়ী? সবাই বলে উঠল, ‘ভস্মে ঔষধের কোন দোষ নেই। রোগী ঔষধ না খেলে ঔষধ তো আপনা-আপনি পেটের ভিতর ঢুকে গিয়ে বেদনা নাশ করে দিতে পারে না। কাজেই রোগী নিজেই দায়ী।’ শ্রদ্ধেয় ভস্মে এবার বললেন, ঠিক সেরুপই হচ্ছে। তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, দিক নির্দেশনা অনুযায়ী না চল তাহলে কিভাবে তোমাদের গৌরব, সম্মান বৃদ্ধি পাবে? আমার উপদেশ মত তোমরা যদি যাবতীয় খারাপ কাজ বর্জন কর, আমার প্রজ্ঞাপিত সুনীতিপূর্ণ শিক্ষাপদসমূহ যত্নের সহিত পালন কর তবেই তো তোমাদের গৌরব, সম্মান শ্রীবৃদ্ধি হবে। তোমাদের মহিমা চির অম্লানরূপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। কখনো পরিহানি হবে না। তোমরা সবাই কুপথ পরিহার করে সুপথে পরিচালিত হও। অজ্ঞান ত্যাগ করে জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টাশীল হবে। জ্ঞান ও সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলে অবশ্যই সুখ, সমৃদ্ধি লাভ হবে, মান, সম্মান, গৌরব উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমি বলছি তোমরা যদি আমার কথা মত চলো তাহলে তিন বৎসরে তোমাদের বর্তমান অবস্থান আমূল পরিবর্তন হবে। মনে রাখবে, সর্বদা মনের উন্নতি সাধন করা তোমাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংকীর্ণতা মনকে জ্ঞানের উচ্চস্তরে উন্নীত করতঃ মনের কলুষিত ভাব অপনোদিত কর। তাতে মন নির্মল আদর্শে, উচ্চতর চেতনায় ভরে উঠবে। এটাই মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উৎকৃষ্ট পন্থা। তখন আর কিছুতে পরিহানির সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন—যেই জাতি নারী নির্যাতন, নারী অত্যাচার, নারী বধ ও নারীকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করে সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা নারী নির্যাতন, নারী অত্যাচার, নারী বধ ও নারীকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করবে না। ভগবান বুদ্ধ নারী জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করতে বলেছেন। কারণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারলে নারীরাও মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বুদ্ধের নির্দেশ, নারী জাতির সাথে ভদ্র ব্যবহার করবে, তাদেরকে মর্যাদা দেবে। সন্তু অপরিহানিয়ে ধর্মে বলা হয়েছে, যে জাতি নারীকে শ্রদ্ধা করে, তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করে, কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে না সে জাতি ততই উন্নত। বৌদ্ধধর্মের মতে অবিবাহিত কুমারী নারীকে বোনের মতন এবং বিবাহিত নারীকে বয়স অনুসারে মায়ের মতন জানারই বিধান রয়েছে। বর্তমানে অনেক নারী আমার কাছে এসে তাদের স্বামী নেশা পান করতঃ আবোল ভাবোল বকা সহ তাদেরকে বিবিধ দুঃখ-কষ্ট প্রদান করার কথা বলে থাকে। আমি দেখতেছি সেভাবে নারীকে লালিত, অপমানিত করলে তো স্বামীর পাপ হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধ বলেছেন, সংসারী জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম, ভগ্নিপ্রেম বজায় রাখবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অপমান জনক, অমর্যাদা সূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করবে না, অন্যায় বা অশোভনমূলক ব্যবহার করবে না। উপরন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত প্রিয়ভাষী হবে এবং সর্বদা পঞ্চশীল রক্ষা করে চলবে। আর সেরূপ ধর্মাচারণ, শীল সম্পন্ন দম্পতি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে উৎপন্ন হয়। তাই বলি, সংসারী হয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করতে হলে চাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ, মর্যাদা সূচক আচার ব্যবহার, কল্যাণধর্ম পরায়ণ। সংসারী জীবনে সুখ লাভের জন্য পাপের প্রতি লজ্জাশীল ও ভয়শীল হওয়া উচিত। বুদ্ধের বচন হল অজ্ঞানের অনুগত না জ্ঞানীর সেবা করা পরম ধর্ম। মাতা-পিতাকে রক্ষণ ও সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ পোষণের দ্বারা সুখী করা পরম কর্তব্য। শীল পালন করা, গুরুজনের প্রতি গৌরব, সম্মান প্রদর্শন করা, মাঝে মাঝে ধর্মত বিষয়ে আলোচনা করা উত্তম মঙ্গল। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রকে ভালোভাবে সেবা যত্ন না করলে পাপ হয়। আবার, নেশা পান করে স্ত্রী, পুত্র কন্যাকে বিবিধ দুঃখ-কষ্ট প্রদান এবং মনোপীড়ার কারণ হলেও পাপ হয়। ন্যায় ও কুশলকাজ সম্পাদন করে সুখ লাভ হয়। তোমরা জ্ঞানী হলে অবশ্যই ন্যায়, কুশল ভালোকর্মই সম্পাদন করবে। কারণ জ্ঞানীরা কখনো অকুশল, মন্দ কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। কেহ যদি মন্দ, অন্যায়, অকুশলকর্ম সম্পাদন করে থাকে তাহলে জানবে সে অজ্ঞানী।

বুদ্ধ বলেছেন, যে সমস্ত শ্রমণ ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু মারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ; মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ; ইহলোক সম্বন্ধে অদক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে অদক্ষ তাদের কথিত উপদেশ যারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, অনুসরণ করে তারা দীর্ঘকাল অনন্ত দুঃখের ভাগী হয়। আর যে সমস্ত শ্রমণ ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষু মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমারভুবনে দক্ষ; মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ; ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক

সম্বন্ধে দক্ষ সে সমস্ত ভিক্ষু শ্রমণের কথিত উপদেশ যারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, অনুসরণ করে তারা দীর্ঘকাল হিতসুখ ও মঙ্গলের অধিকারী হয়। ভগবান বুদ্ধই ছিলেন মারভুবন-অমারভুবন, মৃত্যুরাজ-অমৃত্যুরাজ, ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ, সুনিপুণ। তাই বুদ্ধের কথিত উপদেশ, অনুশাসন শ্রদ্ধার সহিত গৌরব সহকারে শ্রবণ করতঃ যথাযথ অনুশীলন করলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়। এবং পরিশেষে সর্বদুঃখ হতে মুক্তি লাভ হওত নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হয়। বুদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় বলতেন— আমি মারভুবন সম্বন্ধে, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ; ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ। যারা আমার কথিত উপদেশ, অনুশাসন শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করবে তাদের দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হবেই। বর্তমানেও যে কোন জনের বক্তৃতা, উপদেশ, অনুশাসন মান্য করে চলার পূর্বে বুদ্ধের কথিত সেই নির্দেশনাটুকু স্মরণ করা উচিত। তবেই সুখে, শান্তিতে, নিরাপদে জীবন-যাপন করা যাবে-অন্যথায় নয়। যারা জ্ঞানী, পণ্ডিত তারা সেই নির্দেশনা মোতাবেক কার্য করতঃ স্বীয় জীবনে হিত সুখ, মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম হবেন। মূর্খ অজ্ঞানীদের দ্বারা মঙ্গলময় ভবিষ্যত রচনা করা কখনো সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তোমরা সবাই জ্ঞানী, পণ্ডিত হয়ে যাও। তোমাদেরকে অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, কার কথা শুনলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয় আর কার কথা শুনলে দীর্ঘকাল দুঃখের ভাগী হতে হয়।

এখন মারভুবন, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষতা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। প্রথমে মারভুবন কাকে বলে? যে সমস্ত ধর্ম কর্ম কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এ ত্রিলোকের মধ্যে সত্ত্বগণকে অধীন করে রাখে তাকে বলে মারভুবন। আর অমারভুবন? স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত এই লোকোত্তর জ্ঞানের স্তরসমূহকে বলে অমারভুবন। মারভুবন-অমারভুবন, মৃত্যুরাজ-অমৃত্যুরাজ একার্থবোধক শব্দ। মারভুবনে অবস্থান করলে বার বার মৃত্যুবরণ করতে হয় বলে তাকে বলা হয় মারভুবন। অন্যদিকে লোকোত্তর জ্ঞানস্তরে উন্নীত হলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয় বলে তাকে বলা হয় অমারভুবন। লোকোত্তর জ্ঞানের স্তরে অনুত্তীর্ণ সত্ত্বগণ (যেমন ভূত, প্রেত, যক্ষ, নাগ, যক্ষ, মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা সবাই) জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে। তারা এই পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু দুঃখের দ্বারা জর্জরিত। তাদের কোন প্রকার নির্মল সুখ লাভ হয় না। কিন্তু লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারীরা অমারভুবনে অবস্থান করতঃ সকল প্রকার দুঃখের অতীত হয়। তারা সর্বদা নির্মল (অনবদ্য) সুখে অবস্থান করে।

সত্ত্বগণ ইহলোকে চিন্তা করে থাকে ‘আমি কি করব, কিভাবে সুখের সন্ধান

মিলবে, কিরূপে অবস্থান করলে সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারব।' এসব চিন্তা দ্বারা তারা সর্বদা অস্থির থাকে। তবে সম্যক জ্ঞানের অভাবে তারা প্রকৃত সুখে, শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ একমাত্র জ্ঞান এবং পুণ্যের দ্বারাই ইহলোকে সুখ লাভ হয়। আবার, বিবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে ভাবী জন্মকে সুন্দর করে রচনা করার বীজ ইহজন্মেই রোপন করা সম্ভব। বলা যায়, জ্ঞান পুণ্য অর্জন করে বর্তমান জীবনকে সংভাবে পরিচালনা করতঃ পরমানন্দে অবস্থান করতে পারাকে ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ বলে। মানুষের জীবন (আয়ু) অতি স্বল্প, ক্ষণস্থায়ী। পলে পলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হতেই থাকে। পরলোক গমন করতে হয়, মৃত্যুর কবল থেকে কারোর অব্যাহতি নেই। কাজেই অকুশল ত্যাগ করে কুশল সম্পাদন করা সকলের উচিত। যাতে মৃত্যুর পর চারি অপায় দুঃখে পতিত হতে না হয়। উচ্চ-ধনাঢ্য মনুষ্যকুল, স্বর্গ, ব্রহ্মলোকে গমন করা সম্ভব হয়। এভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদিত করে পরলোকে গতি নির্ধারণ করতে পারা বা সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারাকে পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ বলে।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে বলেন-তোমরা জীবনে বিভিন্ন অবস্থায়, যেমন-শৈশব, কিশোর, যুব, বৃদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করতেছ। আচ্ছা একটু জ্ঞানের দ্বারা বিচার করে দেখ তো কোন অবস্থাটি সুখের? কোন অবস্থায় দুঃখ অনুভব হয় না? কেহ কি প্রমাণ করতে পারবে, জীবনের এ অবস্থাটি খুব সুখের ছিল-কখনো দুঃখ অনুভূত হয় নি। বরং জীবনের সব অবস্থা দুঃখে ভরা বেদনা দায়ক ও কষ্টসাধ্য। বুদ্ধের মতে সংসারে জন্মগ্রহণ অর্থ দুঃখ ভোগ করতে আসা। জন্ম গ্রহণে দুঃখ ছাড়া সুখ বলে কিছুই নেই। সন্তুগণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে এ জগতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সার। কিন্তু অজ্ঞানীরা সেই দুঃখকে যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না বলে পুনর্জন্মের অভিলাষী হয়। তারা সুখ ভ্রমে দুর্বিষহ দুঃখরাশিকে স্বাগতম জানাই মাত্র। তাদের সেই ঈষ্পিত পুনর্জন্ম যখন লাভ হয় তখন তাদের আর দুঃখের কোন সীমা থাকে না। অজ্ঞানীরা এভাবেই পুনর্জন্মে আবর্তিত হয়ে অসীম দুঃখ সাগরে হাবুডুবু খেতেই চলছে। তারা জন্ম দুঃখ, বার্ষিক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছার অপূর্ণতা দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দৌর্দমন্য-হতাশা-নিরাশা দুঃখে জর্জরিত হচ্ছে জন্ম জন্মান্তর ধরে। তাই ভগবান বুদ্ধ পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করাকে অতীব দুঃখ বলে দেশনা করেছেন। যারা জ্ঞানী তারা কিছুতে পুনর্জন্মকে অভিনন্দন, বৃদ্ধি করে না। ক্ষয় সাধন, ধ্বংসই করে থাকে।

যাদের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই তারা মৃত্যুকালীন খুব দুঃখ ও ভয় পায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তারা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, নাতি-

নাতনি, ধন-সম্পদকে নিয়ে বিবিধ দৃষ্টিস্তা করে থাকে। অহো! আমার মৃত্যু হচ্ছে, আদরের পুত্র-কন্যাকে ছেড়ে কিভাবে পরপারে যাবো, আমি বিহীন অবস্থায় তারা কিভাবে থাকবে। আমি আছি বলে কতই না দুঃখ পাচ্ছি, অথচ তারা সুখে রয়েছে। সেরূপ দৃষ্টিস্তাশ্রদ্ধাবস্থায় ভীষণ দুঃখ-কষ্টের সহিত মৃত্যুবরণ করে। আর সেই শোক, হাহতাশ চিন্তে মৃত্যুবরণের ফলে সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। তাই তোমরা সর্বদা মরণানুস্মৃতি ভাবনা কর। সকল জীবের মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যুর হাত থেকে কেহ রেহাই পায় না। ঘাতক যেমন শাপিত শস্ত্র উত্তোলন করে হত্যার পশ্চাত্তী হয় তেমনি জন্ম লগ্ন থেকে মৃত্যু জীবের পদানুসরণ করে থাকে। একদিন না একদিন জীবনের উপর নেমে আসে মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকা। আর তখন কিছুতে মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না। জগতে সকল জীবই মরেছে, মরতেছে, এবং মরবেই। সুতরাং আমিও মরব এতে কোন সন্দেহ নেই। ‘আমি মরে যাব, আমার মৃত্যু হবে’ এভাবে মৃত্যুকে স্মরণ করে করে মরণানুস্মৃতি ভাবনা করতে হয়। এ ভাবনা দ্বারা মৃত্যু জ্ঞান অপ্রান্তভাবে অভ্যুদয় হলে অপ্রমত্ত জ্ঞান জাত হয় এবং সংসার ও জীবন বিষয়ে কোন মমতা বোধ থাকে না। সংসারে অবস্থান করলেও সংসারের প্রতি তার তেমন আকর্ষণ থাকে না। বরঞ্চ সংসারের প্রতি অনিত্য জ্ঞান জাগ্রত হয়। সাধারণ মানুষ মরণানুস্মৃতি ভাবনা বিহীন বা মৃত্যু চিন্তা শূন্য তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত। তজ্জন্য মৃত্যুকালে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মরণানুস্মৃতি ভাবনাকারী ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নির্ভীক চিন্তে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। মরণানুস্মৃতিতে জাগ্রত বলে তারা মৃত্যুকালে কোন প্রকার ভয় ও মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞান হয় না। উপরন্তু সৎজ্ঞানে মৃত্যু হয় বিধায় তারা সুগতি স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়।

মৃত্যু চিন্তা মানুষকে কুশলকর্মে পরিচালিত করতে সহায়ক হয়। যখন মনুষ্যগণ প্রকৃতরূপে জানে যে, মৃত্যু নিশ্চিত, জীবন অনিশ্চিত তখন তারা নিজেকে অকুশলকর্ম সম্পাদন হতে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হয়। যেহেতু সে জানে যে, প্রতিনিয়ত মৃত্যু দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হচ্ছে। অর্থাৎ সে মৃত্যু পথের যাত্রী। সুতরাং তাকে অবশ্যই মৃত্যু পথের পাথেয় যোগার করতে হবে। আর এ চিন্তায় তার হৃদয়ে পাপের প্রতি ভয় ও লজ্জা জন্মে। এবং চিন্তে কোন পাপ, অকুশল চেতনা স্থান পায় না। যিনি সব সময় মরণানুস্মৃতি ভাবনা করেন তারপক্ষে কোন প্রকার অন্যায় বা অকুশলের দিকে পাপ বাড়ানো একেবারে অসম্ভব। তাই নির্ধিযায় বলা যায় মরণানুস্মৃতি ভাবনা পাপ সম্পাদন হতে নিজেকে উদ্ধার করা সম্ভব। আবার, তীক্ষ্ণ মরণানুস্মৃতি ভাবনা দ্বারা অরহত ফল পর্যন্ত লাভ হয়। এই মরণানুস্মৃতি ভাবনা মানব জীবনকে উন্নত, শ্রেষ্ঠতর করার এক মাধ্যম বিশেষ।

পরিশেষে তিনি বলেন—বুদ্ধাদি সৎপুরুষ এবং চারি আর্যসত্য এ' দুটির মধ্যে একটিও লাভ না হলে অনন্তকালের জন্য দুঃখ পেতে হয়। আমি বলছি, তোমরা একটু আমার কথা ধরে দেখ, তাহলে তিনবৎসরের মধ্যে তোমাদের অবস্থার উন্নতি সুনিশ্চিত। আমি বিদ্যামানে তোমাদেরকে অন্য কোন গুরুর কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। তোমরা পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল পালন কর। কোন প্রাণীকে টিল-দণ্ড-অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ, বন্ধন, প্রহার বা আঘাত করবে না। মানুষ হতে গুরু করে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। অহিত কামনা করবে না, দুঃখ প্রদানকারী হবে না। প্রাণী হিংসা করলে যেমন পাপ, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হওয়া মহাপুণ্য। বৌদ্ধধর্ম একদিকে ত্যাগে সুখ, অন্যদিকে সর্বজীবে দয়াই সুখ। তোমরা মনচিন্তকে ত্যাগের দিকে ধাবিত করতে যত্নশীল হও। এবং কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা, ক্রোধ, অমঙ্গল কামনা করবে না। তাহলে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হলে শীল পালন করা সম্ভব। হিংসা করলে শীল পালন করা যায় না। মনচিন্তের মধ্যে অতিরিক্ত কামনা বাসনাও জন্মাবে না। স্বীয় লব্ধ সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা কর। তাতে ধর্মত জীবন-যাপন করতে তেমন অসুবিধা হবে না। মনে রাখবে ত্যাগের মধ্যে প্রকৃত সুখ নিহিত। ভোগে কোন সুখ নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। আছে শুধু দুঃখ-যাতনা, মনস্তাপ ও মানসিক অশান্তি।

সাধু, সাধু, সাধু।

মারের পক্ষাবলম্বী না হয়ে বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী হও

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনালায়ে অনুষ্ঠিত সংঘদানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—সদ্ধর্ম লাভ করা দুষ্কর, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ। সদ্ধর্ম হল ভোগ বিরোধী, ভোগ লালসায় আসক্ত মনুষ্যগণ সদ্ধর্ম লাভ করতে পারে না। তবে ভোগ লালসা ত্যাগ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়—বড়োই দুষ্কর কাজ। ষড় ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহ ক্ষণে ক্ষণে সে দিকে ধাবিত করার প্রলোভনের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করে। মন যদি একবার সামান্য মাত্র ভোগের পিছনে ছুটে তাকে আর ফেরানো যায় না। সে সামান্য ক্রমে অসামান্য হয়ে সমস্ত মনকে অধিকার করে বসে। তখন সদ্ধর্ম লাভের সব প্রচেষ্টা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই জ্ঞানী ব্যতীত সাধারণ মানুষ ও সাধারণ ভিক্ষুর পক্ষে সদ্ধর্ম লাভ করা অসম্ভব। আবার, সদ্ধর্ম শ্রবণ করতে প্রয়োজন পরম সৌভাগ্য। কেননা বুদ্ধাদি সৎপুরুষগণের উৎপত্তি অতিশয় বিরল। বহুকাল ব্যাপী অতি কঠিন পারমী পরিপূর্ণ করে তারা জ্ঞার লাভ করার পর তাদের উপলব্ধ সদ্ধর্মের বাণী

জগতের হিতার্থে প্রচার করেন। সেরূপ জ্ঞানী মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে তাদের অনুগামী হওত সদ্ধর্ম শ্রবণ করা সত্যিই বিরল। উপরন্তু সে সময়ও মার সদ্ধর্ম শ্রবণ হতে বিরত রাখতে কতোভাবে না ভোগ বিলাসে ফাঁদে আটকে রাখতে চেষ্টা করে। আমি স্বীয়লব্ধ অভিজ্ঞতায় বলছি, মনুষ্য-দেবতা-ব্রহ্মাদের মধ্যে বুদ্ধের পক্ষপাতি বা বুদ্ধ পক্ষাবলম্বী ও মারের পক্ষপাতি বা মারের পক্ষাবলম্বী রয়েছে। যারা বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী তারা বুদ্ধের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থাশীল হয়। বুদ্ধের উপদেশসমূহ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করতঃ তা' যথাযথভাবে প্রতিপালন করে। তারা সকল প্রকার অজ্ঞান, অকুশলমূলক কার্য পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞান ও কুশলকার্যে আত্মনিয়োগ করে। এবং তাতে সুখ, আনন্দ অনুভব করে থাকে। তারা বুদ্ধের গুণকীর্তন চতুর্দিকে প্রচার করে। অন্যদেরকেও বুদ্ধের প্রতি আস্থাশীল হতে, বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, অনুপ্রেরণা যোগায়। আবার, বুদ্ধের চারি আর্যসত্য জ্ঞান দর্শনে প্রত্যাশী হয়। কর্মফল, পরকাল ও চতুরার্যসত্যের জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টাশীল হয়। তারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জগতের প্রকৃত স্বভাব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম দর্শন করতেও যত্নশীল হয়। যারা মারের পক্ষাবলম্বী তারা সর্বদা মারের ইঙ্গিত মত ভোগ বিলাসে প্রমত্ত হয়ে অবস্থান করে। তারা অজ্ঞান ও মারের সহিত সাক্ষাত করতঃ অকুশলে রত হয়। প্রাণীহত্যা; চুরি-ডাকাতি; কাটাকাটি, মারামারি, হানাহানি সত্ত্বাসী, চাঁদাবাজী, জোর-জুলুম, দণ্ড-কলহ; মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোহিন সেবন; মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ; পরদার লঙ্ঘন করা তাদের নিত্য নৈমন্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দুষ্কর্মাঙ্গ বা নানাবিধ পাপজনক কর্ম সম্পাদনে এবং অপরকেও সেকাজে উৎসাহিত করতে তারা সিদ্ধহস্ত। এইভাবে বিবিধ অকুশলমূলক কর্ম সহ নানা অনাচার, অত্যাচারে নিয়োজিত থাকা মারের পক্ষাবলম্বীদের কাজ। তাদের দ্বারা কোন মঙ্গলজনক, কুশলমূলক সুকার্য সম্পাদিত হয় না। বৌদ্ধধর্মের দুর্নাম রটা ও কুশলজনক, সদ্ধর্ম জ্ঞান উৎপাদক কর্মে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে দেওয়া তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে গয়ার বোধিমূলে বুদ্ধ যখন মারের সঙ্গে সংগ্রাম রত তখন বুদ্ধের প্রতি অভিপ্রসন্ন বা বুদ্ধ পক্ষাবলম্বী দেবপুত্রগণ ডান দিকে এবং বুদ্ধের প্রতি বিমুখ বা মারের পক্ষাবলম্বী দেবপুত্রগণ বুদ্ধের বাম দিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। তাই বর্তমানেও দেখতে হবে কারা বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী আর কারা মারের কারা পক্ষাবলম্বী? বুদ্ধের পক্ষাবলম্বীগণ বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান লাভ করতঃ বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের আশ্রয়ে অবস্থান করে থাকে। তারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে এবং সদ্ধর্ম লাভ করতে চেষ্টাশীল হয়। অন্যদিকে, মারের পক্ষাবলম্বীগণ মারের সংস্পর্শে অবস্থান করে অজ্ঞান ও মিথ্যার সাক্ষাৎ করতঃ মিথ্যাকে আশ্রয় করে থাকে।

তাই তারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না, বরং পরধর্ম শ্রবণ করে। সদ্ধর্ম লাভে চেষ্টাশীল না হয়ে পরধর্মে লিপ্ত থাকে। যারা বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী তারা ইহ-পরকাল উভয় কালে সুখে, শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে। তাদের সুখ, শান্তি, উন্নতি সর্বদা বর্ধিত হয়। আর যারা মারের পক্ষাবলম্বী তারা ইহ-পর উভয় লোকে দুর্বিষহ দুঃখ যাতনা ভোগ করে অনন্ত দুঃখের অধিকারী হয়। শুধু সাধারণ মানুষ দেবতা, ব্রহ্মা কেন বর্তমানে অনেক ভিক্ষুও মারের পক্ষাবলম্বী। ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে যদি বিনয় বহির্ভূত দুঃশীলতা আচরণ করে তাহলে সে মারের পক্ষাবলম্বী। তাকে কিছুতেই বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী বলা যায় না। তাই বর্তমান সময়ে মারের পক্ষাবলম্বীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এখন তোমরা নিজেরাই স্বীয় বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে দেখ তোমরা মারের পক্ষাবলম্বী নাকি বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী হবে? মারের পক্ষাবলম্বী হলে অকুশল চিন্তে করা কাজগুলোতে আপাতঃ সুখ দেখা যায় বটে; কিন্তু পরিণামে ভয়ানক নরক যন্ত্রণা সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আর তখন বিলাপ করলেও নরকের সে অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা হতে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যদিকে, যারা বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী মার তাদেরকে বিবিধ প্রকারে হুমকি প্রদান করতে থাকে। তোমাদেরকে আমি কিছুতেই সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে দেবো না। আমি তোমাদেরকে সংসারে বন্দী অবস্থায় রাখব। তোমরা সে বন্ধন কোনক্রমে ছিন্ন করতে পারবে না। মার কিভাবে সংসারে বন্দী করে রাখে জান? মনচিন্তে যদি রাগ, হিংসা, অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয় ও স্থিত থাকে তাহলে মার সংসারে বন্দী করে রাখতে সমর্থ হয়। তাই তোমরা মনচিন্তের মধ্যে রাগ, হিংসা, অজ্ঞানকে স্থান করে দিবে না। তখন মার কোনক্রমে তোমাদেরকে এসংসারে বন্দী করতে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরও বলেন-বুদ্ধ প্রত্যেক নর-নারীকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে ধর্মদান ও জ্ঞানদান করতে সমর্থ ছিলেন। আর সেজ্ঞান লাভ করে নর-নারীগণ তাদের মনচিন্তকে জ্ঞানের উচ্চস্তরে অবস্থান করায় মারকে পরাস্ত করত। জ্ঞানের দ্বারা ভোগ বিলাসের উর্ধ্বে উঠতে পারলে মার কিছুতেই মনচিন্তের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে না। এবং নির্বাণ মার্গে বাঁধা বিপত্তি সৃষ্টি করে দিতে পারে না। হুমকি প্রদান, অন্তরায় করতেও সমর্থ হয় না। তাই জ্ঞান লাভের সাথে সাথে মার পরাস্ত হয়ে যায়। মাররাজ্যকে অতিক্রম করে তখন নিঃস্বার্থ নির্বাণরাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞব্যক্তির মারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওত আকাশে পথহারা পাখির ন্যায় সত্যপথভ্রষ্ট হয়ে মিথ্যাপথে চালিত হয়। তারা জানে না কোন পথ অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার আর কোন পথ জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত। ভোগের পথে নয়-সংযমের মাধ্যমে প্রকৃত সুখ ও পরম তৃপ্তি লাভ হয়। তজ্জন্য তোমাদেরকে বলছি, তোমরা কায়-বাক্-মনে

সংযম রক্ষা করতঃ চিন্তের চাঞ্চল্যভাবে দূরীভূত করে চিন্তকে স্থির কর। কারণ চিন্ত স্থির না হলে চতুর্দিকে দৃশ্যমান বিষয় বাসনায় বিচলিত হয়, মারের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়।

বর্তমানে অনেক বিবাহিতা মহিলা এসে আমাকে বলতে থাকে-ভস্তু, আমার ছেলেটি বড় হয়ে আই, এ, পাস/বি,এ, পাস করেছে; কিন্তু খুব অবাধ্য। কিছুতেই আমাদের কথা মান্য করে না। নিজের ইচ্ছামত রাত-দিন ঘুরে বেড়ায়, টাকা-পয়সা অপব্যয় করে, কুবন্ধুর সঙ্গ দিয়ে নেশাও পান করে। এমন কি আমরা বাধা দিলে আমাদেরকে মারতে উদ্যত হয়। ভীষণ দুঃখ, মন কষ্টের মধ্যে আছি। ভস্তু! এসব দুঃখ লাঘবের জন্য আমাদেরকে একটু আশীর্বাদ করবেন। আবার, অনেকের কাছ থেকে শুনি, বেশ কিছু সংখ্যক ছেলে নাকি চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসীর মতন খারাপ কার্যেও জড়িত। তাই বলি, বর্তমানে তোমরা খুব দুঃসময়ের মধ্যে অবস্থান করতেছ। কত প্রকার যে দুঃখ কষ্টে শিকার হচ্ছে তা' হিসাব করে দেখবার নয়। আমি সংসার ত্যাগ করতঃ প্রব্রজিত হয়ে কী মঙ্গলজনক কার্যই-না করেছি। নতুবা আমাকেও তোমাদের মতন বিবিধ দুঃখ যাতনার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হতো। তবে যাদের চিন্তে জ্ঞান থাকে তারা নানা পরিবেশ পরিস্থিতির পীড়নেও অকুশলকর্ম সম্পাদন করে না। তারা বিপদের সময় হতবুদ্ধি হয়ে অকুশলকর্মের দিকে পা বাড়ায় না। বরং তারা চিন্তা করে বর্তমান সময়ে যখন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, কাজেই আগাম বিপদ উৎপত্তির হেতু পাপকর্ম কখনো করব না। এমন কি মৃত্যুর মুখে পতিত হলেও অকুশলের কাছে পদানত হবো না। অন্যদিকে, যে ছেলেরা মা-বাপের অবাধ্য, মা-বাপের সহিত ঝগড়া-তর্ক করে, খারাপ ব্যবহার করতেছে আমি তাদের ভবিষ্যত অবস্থা খুব খারাপ দেখতেছি। কারণ তারা যখন বিয়ে করে পুত্রের বাবা হওত আস্তে আস্তে বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের ছেলেরাও হবে খুব ডানপিটে। মা-বাপের কোন কথা, আদেশ-নির্দেশ মান্য করবে না। সবকিছুতে নিজের ইচ্ছামত করেই চলবে। আবার, মা-বাবা যদি কোনক্রমে বারণ করতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবে খরবদার বুড়া, টু শব্দ করবে না। আর একবার যদি আমাকে বারণ কর, তবে অবস্থা খারাপ হবে বলে দিচ্ছি। চুপ করে বসে থাক, আমার ব্যাপারে কোন নাক গলাবে না। এভাবে তারা সর্বদা স্বীয় ছেলে কর্তৃক বিবিধ উপায়ে লাঞ্চিত, অপমানিত, অপদস্ত, নির্যাতিত হয়ে থাকবে। কোনভাবেই সন্তান হতে সদাচার, নম্র ব্যবহার, মর্যাদা, সম্মান, গৌরব লাভ করতে পারবে না। এটা কোন কথার কথা নয় বা ভয় দেখানো নয়-আমি জ্ঞানে দর্শন করে বলছি। যেহেতু বর্তমান মুহূর্তে যে কর্ম করা হয়, পরবর্তী মুহূর্তে তা' ফল প্রসব করে থাকে। পাপের পরিণতি খুব ভয়ঙ্কর। পাপকর্মীর সেই কুফল

মাথার উপর উদ্যত বজ্রের মতন অমোঘভাবে নেমে আসে। সে যেখানে গমন করুক না, যেই উপায় অবলম্বন করুক না কেন তাকে ভীষণ অনুতপ্ত হৃদয়ে তার মূল্য দিতে হয়। বুদ্ধ মাতা-পিতাকে সেবা করা, সম্মান প্রদর্শন করাকে উত্তম মঙ্গল বলে উপদেশ দিয়েছেন। সিংগালবাদ সূত্রে পূর্বদিক রূপ মাতা-পিতাকে গৌরব, সৎকার, সম্মান, সেবা করা ও পিতৃ-মাতৃ বাক্য মান্য করাকে পুত্রের পরম কর্তব্য বলা হয়েছে। আর সেই কর্তব্যের ফলে ইহ জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সুনাম, সুখ্যাতি বর্ধক ও পর জীবনে স্বর্গ লাভ হয়ে থাকে। এতে তার পুত্র-কন্যারাও স্বীয় পিতা-মাতাকে সেবা, সম্মান, মান্য, গৌরব সহকারে প্রতিপালন করতে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাই পিতা-মাতার প্রতি নম্র ব্যবহার, গৌরব, সম্মান প্রদর্শন করা ও তাদের কথায় বাধ্য থাকা প্রত্যেক ছেলের একান্ত কর্তব্য।

তোমরা বুদ্ধের আশ্রয়ে অবস্থান কর। বুদ্ধ গুরু ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবে না। বুদ্ধের উপদেশ অন্য কারোর উপদেশে সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায় না। বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ একমাত্র সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করার উপায়। জগতে সকল আশ্রয়ের চেয়ে বুদ্ধের আশ্রয় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞান। আর জ্ঞানের আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের আশ্রয়ে অবস্থান করলে মানুষ কখনো বিপদগামী হতে পারে না। তাই জ্ঞানের আশ্রয় লাভ করতে পারলে মানুষের পরম সুখ, উন্নতি লাভ হয়। অন্যদিকে, বুদ্ধের আশ্রয়ে এসে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এ মায়াময় সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাসমূহকে দর্শন করা সম্ভব। আর তখনই হৃদয়ে জেগে উঠে সংসারের প্রতি আসক্তি রজ্জুটুকু ছিন্ন করে নিবৃত্তি পথ অনুসরণ করার মহান আদর্শ। যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর চিরাবসান হয়ে লাভ নির্বাণ লাভ হয়। তাই বুদ্ধের আশ্রয়ে এসে দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হয়। ভগবান বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ, দর্শনের মূলে রয়েছে এ'চারি আর্যসত্য। বুদ্ধ চারি আর্যসত্যকে ভিত্তি করে, কেন্দ্র করে চুরাশি হাজার ধর্মসঙ্ক প্রচার করেছেন। তাই চারি আর্যসত্য ছাড়া বৌদ্ধধর্ম হতে পারে না। তোমরা যদি চারি আর্যসত্যকে বুঝতে, জানতে, দর্শন করতে সমর্থ হও তাহলে তোমাদের সদ্ধর্ম জ্ঞান লাভ হয়েছে বলে জানবে। তখনই তোমরা প্রকৃত সুখী পরম জ্ঞানের লাভী হয়ে উঠবে। কিছুতেই তোমাদের আর অবনতি হবে না, দুঃখ থাকবে না; বরঞ্চ শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি হবে। একটু আগে তোমরা যে সংঘদান করেছ এটা দান যজ্ঞ। বৌদ্ধধর্ম মতে যজ্ঞ তিন প্রকার, যথা-ত্রিশরণের যজ্ঞ, পঞ্চশীলের যজ্ঞ, দান যজ্ঞ। এই ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা মহৎ পুণ্য অর্জিত হয়। বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাকে আশ্রয় গ্রহণ করাকে

ত্রিশরণের যজ্ঞ বলে। প্রসন্ন মনে প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-পিণ্ডন-পৌরুষ-সম্প্রলাপ বাক্য, যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা হতে বিরত থাকাকে পঞ্চশীলের যজ্ঞ বলে। লোভমুক্ত চিন্তে শ্রদ্ধার সহিত যে কোন বস্তু দান করাকে দান যজ্ঞ বলে। এই ত্রিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহৎ ফললাভী হওয়া যায়। আর সে মহৎ ফল ইহলোক ও পরলোকে অশেষ সুখ, কল্যাণ বয়ে আনে। কিন্তু কখনো পশুবলি যজ্ঞ করবে না। ত্রিশরণের যজ্ঞ, পঞ্চশীলের যজ্ঞ, দান যজ্ঞ দ্বারা যেমন মহাপুণ্য সঞ্চিত হয়, তেমনি পশুবলি যজ্ঞ দ্বারা অনেক অকুশল, পাপ অর্জিত হয়ে থাকে। যে পাপের ফল ইহ-পরলোকে অশেষ দুঃখ প্রদান করে থাকে, সেই পাপকর্ম সম্পাদন না করাই উত্তম। তোমরা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও 'আমরা ত্রিশরণের, পঞ্চশীলের, দানের যজ্ঞ সম্পাদন করবো, কখনো পশু বলি যজ্ঞ করবো না।'

পরিশেষে তিনি বলেন-বৌদ্ধধর্ম অহিংসার ধর্ম। এধর্মের কোন জীবকে হিংসা করতে পারে না, কারোর অহিত কামনা করতে পারে না। জীব হিংসা করলে আর্য বা নিম্পাপ হওয়া যায় না। যারা জীব হিংসা, অহিত কামনা করে তাদেরকে আর্য বলা চলে না। তাই তোমরা কোন জীবের প্রতি শত্রুতা ভাব পোষণ করবে না। কারোর প্রতি অন্যায় ভাব আচরণ করবে না। কারোর ক্ষতিসাধন ও নিদর্যতা ভাব সর্বতোভাবে পরিহার করে চলবে। মানুষ হতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান যে কোন প্রাণীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হবে না। সকল প্রাণীর অবৈরী হলে জন্ম জন্মান্তরে অনন্ত সুখ, শান্তির সন্ধান মিলে তোমরা উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ কর। অন্যায়ভাবে করবে না। সর্বদা অনলসভাবে ধর্ম আচরণে তৎপর থাক। ধর্মচারী ব্যক্তি ইহলোকে পরলোকে পরম সুখে অবস্থান করতে সমর্থ হয়। ধর্মচারীকে ধর্মই সুরক্ষা করে থাকে। তাই অতিসফুর উৎসাহের সহিত ধর্ম আচরণে সচেতন হও। ধর্ম আচরণ করা অতিশয় কল্যাণকর কাজ। চিন্তকে পাপকর্ম হতে মুক্ত রাখ। বিলম্বে ধর্মচারীর মনও পাপের দিকে ধাবিত হয়। অসদাচরণে লজ্জা ও ভয়শীল হয়ে সংযমী জীবন-যাপন কর। কায়-বাক্য-মন সংযমকারীকে কখনো পাপ কালিমা স্পর্শ করতে পারে না। পরকাল, কর্মফলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে অবস্থান কর। তাহলে কায়-বাক্য-চিন্তায় পাপ, অকুশল উৎপন্ন করা হতে চিন্তকে সহজে নিবৃত্ত রাখতে সমর্থ হবে। জগতের সকল প্রাণীর প্রতি সমান দয়াশীল, মৈত্রী ভাবাপন্ন ও সংযমী হলে ইহ-পরলোকের জন্য পরম সুখ লাভ হয়।

কৃপণ ব্যক্তির কখনো স্বর্গ লাভ হয় না

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বনরূপা নিবাসী জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে আয়োজিত সংঘ দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন—তোমরা লোভ-হিংসা-অজ্ঞানমূলক কোন কর্ম, কোন বাক্য, কোন চিন্তা করবে না। লোভের সহিত যে কোন কর্ম-বাক্য-চিন্তা করলে মৃত্যুর পর প্রেতকূলে জন্ম নিতে হয়। হিংসার সহিত কোন কর্ম-বাক্য-চিন্তা করলে মৃত্যুর পর নরকে পতিত হতে হয়। অজ্ঞানের সহিত কোন কর্ম-বাক্য-চিন্তা করলে মরণের সঙ্গে সঙ্গে তির্যককূলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। লোভ-হিংসা-অজ্ঞানমূলক কর্মে-বাক্যে-মননে মৃত্যুবরণ করলে চারি অপায়ে গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এবং অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতেই হয়। তাই তোমরা লোভ-হিংসা-অজ্ঞানমূলক কোন কার্য, কোন বাক্য, কোন মনন (চিন্তা) করবে না। একমাত্র লোভ-দেষ-মোহযুক্ত বাক্য-কর্ম-মনের দ্বারাই ইহ-পরলোকে সুখ লাভ হয়। কাজেই সুখ লাভ করতে হলে লোভ-হিংসা-অজ্ঞানযুক্ত কার্য, বাক্য, মনন করার কোন বিকল্প নেই। যে কর্ম-বাক্য-চিন্তা করে দুঃখের সহিত অনুতাপ করতে হয় না, যার ফল আনন্দের সহিত প্রফুল্ল চিত্তে উপভোগ করা যায় তা' করাই উত্তম। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি আপাত সুখের আশায় লোভ-হিংসা-অজ্ঞান বশে এমন অনেক পাপকাজ করে যা ইহ-পরলোকের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। এবং সে কাজের পরিণামে মূর্খ ব্যক্তিকে চারি অপায়গামী হতেই হয়। বুদ্ধ বলেছেন, কর্ম নিয়ন্ত্রণে অতীব সতর্কতা ভাব রক্ষা করা প্রয়োজন। খামখেয়ালী বশে কোন কর্ম সম্পাদন করা উচিত নয়। এতে ভালো কর্ম সম্পাদনের চেয়ে মন্দ কর্ম সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। বলা যায়, কোন কাজ (বাক্য, চিন্তা) করার আগে চিন্তা করা দরকার তা' করা উচিত নাকি অনুচিত। তজ্জন্য তোমাদেরকেও বলছি, যে কোন কর্ম-বাক্য-চিন্তা করতে সবসময় সতর্ক ভাব রক্ষা করবে। কোন কর্ম ভালো, নির্দোষ, কল্যাণকর ফল প্রদানকারী আর কোন কর্ম মন্দ, দোষযুক্ত এবং অকল্যাণকর ফল প্রদানকারী? এভাবে বার বার পরীক্ষা, যাচাই করতঃ মন্দ, অকল্যাণকর কর্ম পরিত্যাগ করে ভালো, কল্যাণকর কর্মই সম্পাদন করবে। তবে মূর্খব্যক্তিদের মন্দ কর্মের দিকে একটু বেশি আকর্ষণ থাকে। কারণ মন্দকর্মে সঙ্গী জুটে খুব বেশি। আর সাময়িকভাবে ঐহিকসুখও লাভ হয়। কিন্তু পাপের সে সুখ নিতান্তই অস্থায়ী। মুহূর্তের মধ্যেই সে সুখ তছনছ হয়ে অনুতাপ হৃদয়ে অশেষ দুঃখ-যাতনার শিকার হতে হয়। আর সেই পাপের দুঃখ যন্ত্রণা খিকিখিকি আগুনের মতন দাহন করে করে মূর্খকে দুর্গতিগামী করায়।

তোমরা অকৃতজ্ঞ, নরাধম এবং মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হও না। উপকারের

উপকার স্বীকার করবে; এবং হীন, অন্যায়, অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। মিথ্যানৃষ্টিমূলক আচরণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সম্যকদৃষ্টিমূলক আচরণ করবে। উপরায়, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে কর্মফলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর, চারি আর্যসত্য বিশ্বাসে তথা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হতে চেষ্টাশীল হও। তাহলে ইহ-পরকালে বিপুল সুখের অধিকারী হতে পারবে। এবং দুর্গতি প্রাপ্ত না হয়ে অনিবার্ণ কাল পর্যন্ত জন্ম জন্মে সুগতি প্রাপ্তই হবে। মনে রাখবে, পরকাল-কর্মফল ও চারি আর্যসত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে পরম সুখ লাভ হয়। আর যাদের পরকাল-কর্মফল ও চারি আর্যসত্যের প্রতি কোন বিশ্বাস, আস্থা নেই তাদেরকে অনন্তকালে জন্য সীমাহীন দুঃখে পতিত হতে হয়। তাই তোমরা একরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, ‘আমরা সর্বদা পরকাল-কর্মফল, চারি আর্যসত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা অটুট রাখব।’ পরকাল-কর্মফল চারি আর্যসত্যকে বিশ্বাস করলে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতিও বিশ্বাস জন্মে। এতে বিপুল, কুশল, পুণ্য অর্জিত হয়ে থাকে। সংসার দুঃখ হতেও মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন-কৃপণ ব্যক্তির কখনো স্বর্গ লাভ হয় না। কারণ তারা দানাদি ত্যাগময় ধর্ম আচরণে অভ্যস্ত হতে পারে না। অপরকে দান দিলে আমরা ধন সম্পদ ফুরিয়ে যাবে, আমরা তো কিছুই আর থাকবে না এ’ সংকীর্ণতা চিন্তায় কৃপণ ব্যক্তি কোনমতে দান করতে চায় না। তাই কৃপণ ব্যক্তি প্রভূত ধন সম্পদের মালিক হলেও ধনহানী এবং দানীয় বস্তুর প্রতি লোভ পরিত্যাগ করতে না পেরে দান করে না। সংকীর্ণতা মনোভাব তাকে আপন স্বার্থ চিন্তায় অন্ধ করে ফেলায়। সেই লাভের আধিক্য হেতু তখন তার পক্ষে পরহিতের তরে বিন্দুমাত্রও বিসর্জন দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সে শুধু গ্রহণেই প্রত্যাশী হয়-ত্যাগে নয়। দানের দ্বারা ইহ, পারত্রিক সুখ, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়; এবং পারলৌকিক সুখের জন্য অবশ্যই দান করা দরকার, সেসব বিশ্বাসটুকু হারিয়ে ফেলে। আবার, কৃপণ ব্যক্তির বুদ্ধের ত্যাগময় উপদেশ বাণী শ্রবণ করতেও অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। কৃপণ ব্যক্তি অন্যজনের বাড়ীতে গিয়ে ভালো-উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য ভোজন করলেও স্বীয় বাড়ীতে সে ব্যক্তিকে খারাপ-নিকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য পরিবেশন করে থাকে। স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বন্ধুর কিঞ্চিৎ কাজ করে দিয়ে মহৎ লাভের প্রত্যাশা করে। তাই কৃপণ ব্যক্তিগণ ইহলোকে গরিবতুল্য জীবন-যাপন করে আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। কারণ দান ব্যতীকে ইহ-পরলোকে পার্থিব অপার্থিব সুখ কিছুই লাভ হয় না। তারা সর্বদা দানে বিমুখ নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়। তোমরা কৃপণতা ভাবকে ত্যাগ করে পরকালের হিতসুখের জন্য সামর্থ্য অনুসারে দানে রত থাক। মনে রাখবে, ইহলোকে দান ধর্মে বিমুখ হলে, সর্বদা মিথ্যাবাক্য ভাষণ করলে মৃত্যুর পর চারি

অপায়ে পতিত হতে হয়। আবার, রাগী, ঝগড়াতে, উদ্ধৃত স্বভাবের মনুষ্যগণও চারি 'অপায়ে' গমন করে থাকে। তোমরা মিথ্যা দৃষ্টি ভাব ত্যাগ করে দান ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথাবাক্য বর্জন করতঃ সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করবে। যারা সর্বজীবের প্রতি অহিংসক ও দান-শীল-ভাবনায় রত তারা মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লাভ করতে সমর্থ হয়। আমি জ্ঞান দ্বারা দেখে বলছি, বর্তমানে তো খুব কম সংখ্যক লোকই দান-শীল-ভাবনায় বিশ্বাসী। অধিকাংশ লোকজনই দান-শীল-ভাবনা করে যে সুখ লাভ হয় এ'কথা বিশ্বাস করে না। তাই দান-শীল-ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস করার সংখ্যা সর্বত্রই দেখা যায়। পক্ষান্তরে দান-শীল-ভাবনায় আস্থাশীল, বিশ্বাসবান লোকজন সুদুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। কারণ বর্তমানে প্রায় সব মানুষ পাপত্মা মারের অধীন হয়ে রয়েছে। আর পাপত্মা মার তাদেরকে ইচ্ছামত পাপকর্ম করাতে বাধ্য করাচ্ছে। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকজনের পক্ষে বাচ্চা ছেলেকে 'কানে ধর, এদিকে আস, ওদিকে যাও; বলে আদেশ মানাতে বাধ্য করা সহজ ঠিক তেমনি মারের পক্ষেও তাদেরকে পাপকর্মে বাধ্য করা খুবই সহজ হয়েছে। মার কি বলে জান? পুণ্যকর্ম আমার কোন প্রয়োজন নেই। যারা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে ইচ্ছুক আমি তাদের সেই কার্য ব্যর্থ করে দিব। মারের প্রভাবের ফলে (সন্ধর্মে অজ্ঞ) মনুষ্যগণ পুণ্যকর্ম করতে পারে না। মার পুণ্যকর্ম করতে বাঁধা জন্মায়, সংকর্ম বা কুশলকর্মে বাধা দেয়, জ্ঞান লাভ করতে বাধা দেয় এবং দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে দেয় না। তাই মারের প্রভাব হতে উর্ধ্বে উঠতে না পারলে যথাযথভাবে সন্ধর্ম আচরণ, অনুশীলন করা সম্ভব নয়। তোমরা মারকে চিনতে চেষ্টা কর তাহলে মারের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারবে। কিভাবে মারকে চেনা যায়? সকল প্রকার ভোগ্য বিষয় হতে মনকে অনাসক্ত রাখলে মারকে চেনা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভোগ চেতনাই মার। মনচিন্তের মধ্যে সুখ ভোগ করার ইচ্ছা বিদ্যমান থাকলে তাকেও মার বলে জানবে। বৌদ্ধধর্ম বা সন্ধর্ম হল সম্পূর্ণ ভোগ বিরোধী একটি ধর্ম। ভোগ মত্ত মন হলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুশীলন, হৃদয়ঙ্গম করা কখনো সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বুদ্ধ বলেছেন, ভোগ বিলাসের মাত্রা বেড়ে গেলে সন্ধর্ম হতে চ্যুত হতে হয়। ভোগী মানুষ ক্পণ ও গরিব হয়ে যায়। তারা পরকালের হিতসুখের জন্য কোন প্রকার পুণ্য অর্জন করতে পারে না।

বনভন্তে বলেন-গতকাল জনৈকা এক উপাসিকা আমার সকাশে তার মদ্যপায়ী স্বামীর কথা বলেছিল। এবং সে নিজেই মদ্যপানে অভ্যস্ত বলে স্বীকার করেছে। আমি সেই দম্পতিকে মদ্যপানের কুফল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে মদ্যপান করা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলাম। আজকে তোমাদেরকেও বলছি, তোমাদের যদি মদ্যপান করার খারাপ অভ্যাস থাকে তা' সর্বতোভাবে

পরিত্যাগ করবে। মদ্যপান করলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, তারা উন্মাদ প্রায় হয়ে পড়ে। সংসারী জীবনের প্রায় অশান্তি সৃষ্টির মূলে রয়েছে মদ্যপানের বদ অভ্যাসটি। তাই মদ্যপানের দ্বারা ইহ-পর উভয় লোকে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। মদ্যপায়ী মৃত্যুর পর নরকে, তির্যক যোনীতে, প্রেতলোকে এবং অসুরলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখানে অনন্তকাল ব্যাপী নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকে। ঔষধস্বরূপ সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করলে পরকালে মনুষ্যকূলে জন্ম হয় বটে, তবে মৃগী রোগী, পাগল, উন্মাদ, খুব মূর্খ, বিশ্রী, বোবা হয়ে জন্ম ধারণ করে। মদ্যপানের জন্য মদ্যপায়ীর ইহলোকে ছয় প্রকার দোষ সংঘটিত হয়। যথা-১) ধন সম্পদের হানী ঘটে, ২) কলহ বৃদ্ধি পায়, ৩) নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, ৪) চারিদিকে অকীর্তি ঘোষিত হয়, ৫) লজ্জাভাব শূন্য হয়, এবং ৬) প্রজ্ঞা দুর্বল হয় বা জ্ঞান হ্রাস পেতে থাকে। আমি নিজেও অনেক মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় বারবার মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়ে অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে করতে মরতে দেখেছি। আবার, তোমরা মানুষ হয়ে যদি মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে না পার, তাহলে মৃত্যুর পর তির্যককূলে জন্ম নিলে তবে বুঝি ত্যাগ করবে? যারা বর্তমানে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মদ্য পান করে মরে যাচ্ছে (আমি জ্ঞান দিয়ে দেখছি) তাদের অবস্থা সে রকমই হবে। মদ্যপায়ী ইহকালে প্রত্যক্ষ দুঃখ ও পরকালে নরকে পতিত হয়ে মহা দুঃখ ভোগ করে থাকে। সে জন্মে জন্মে জ্ঞান বুদ্ধিহীন ও নীচস্বভাব সম্পন্ন হয়ে জন্ম ধারণ করে। প্রাণীহত্যা করলে জন্ম হতেই তথা অকাল মৃত্যু হয়, আগুনে, পানিতে বা যে কোন দুর্ঘটনা জনিত কারণে অকালে মৃত্যু হয়ে থাকে। চুরি করলে জন্মে জন্মে গরিব কূলে জন্মগ্রহণ করতঃ বিবিধ অভাব অনটনে দুঃখ ভোগ করতে হয়। ব্যভিচারে রত হলে জন্মে জন্মে নপুংসক, স্ত্রী কূলে জন্মধারণ করতে হয়। এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা ঝগড়া লেগেই থাকে। সংসারিক জীবনে কখনো শান্তি লাভ হয় না। মিথ্যাবাক্য ভাষণ করলে মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয়, জন্মে জন্মে তোতলা, নির্বোধ, অজ্ঞ হয়ে জন্মধারণ করতে হয়। তাই তোমরা সর্বদা পঞ্চশীল পালন করবে। পঞ্চশীল যথাযথভাবে পালন করে যদি আজকে বা আগামীকাল মরেও যেতে হয়, তাহলে মৃত্যুর পর অবশ্যই স্বর্গ লাভ হবেই। দুঃশীলতা আচরণ করে শত সহস্র বৎসর বেচে থাকার চেয়ে শীলবানের একমুহূর্ত কাল বেঁচে থাকাই শ্রেয়। কারণ দুঃশীল ব্যক্তি শত সহস্র বৎসর বেঁচে থাকলে কি হবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে নরকে পতিত হয়ে অনন্ত কাল পর্যন্ত সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করবে। তাই দুঃশীলতা আচরণ ত্যাগ করে শীল সম্পন্ন হয়ে একতিন বেঁচে থাকাও উত্তম, মঙ্গলজনক বলে জানবে।

তোমরা সতিপট্ঠান সূত্রটি অনন্ত দুইবার (ভোর সকালে ও সন্ধ্যা সময়)

পাঠ করতে চেষ্টা করবে। শুদ্ধভাবে পড়তে সক্ষম এমন একজনে পাঠ করতঃ বাকী অপর সদস্যগণ শ্রদ্ধার সহিত হাত জোড় করে শ্রবণ করবে। অথবা টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে সতিপট্ঠান সূত্রের ক্যাসেট চালিয়েও শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা যেতে পারে। এতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনে বিবিধ প্রকার মঙ্গল সাধিত হবে। সতিপট্ঠান সূত্র বইটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে দীপ, ফুল দ্বারা পূজা করলেও পুণ্য হয়। সর্বোপরি সতিপট্ঠান সূত্রটি সংগ্রহ, পঠন-পাঠন, আবৃত্তি, কণ্ঠস্থ এবং উপদেশ মত অনুশীলন মহাপুণ্যের কাজ। অন্যদিকে, মৃত্যুর শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে শুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে আবৃত্তি করে শুনাতে মৃত্যুর পর তার স্বর্গ লাভ সুনিশ্চিত হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-পাপকার্য পরিত্যাগ করে তোমরা কুশল, পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। অকুশল, পাপকর্ম সম্পাদন করতে লজ্জাশীল ও ভয়শীল হয়ে অবস্থান করবে। কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হও। কোন প্রাণীকে টিল-দণ্ড-অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ, বন্ধন, প্রহার করবে না। যে কোন প্রাণীকে কষ্ট না দিলে সুখ বৃদ্ধি পায়। কোন প্রকার শারীরিক দুঃখ ভোগ করতে হয় না। তোমরা বিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করে চল। হিংসা ত্যাগ করতে পারলে পরম সুখ লাভ হয়। এবং বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করাও সম্ভব হবে। আবারো বলছি, তোমরা লোভ-হিংসা-অজ্ঞানমূলক কর্মসমূহ পরিত্যাগ করে অলোভ-অদ্বेष-অমোহমূলক কর্ম সম্পাদন করবে। দিব্যরাত্রি মৈত্রী ভাবনায় রত থাক। পাপ, অকুশল, অজ্ঞান সর্বতোভাবে বর্জন করে পুণ্য, কুশল, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাক। বর্তমানে জ্ঞান পুণ্যের সহিত জীবন অতিবাহিত করলে ইহ-পর উভয়লোকে পরম সুখ, শান্তি লাভ হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞান বুদ্ধি কৌশলের সহিত চললে শ্রীবুদ্ধি হবে

আজ শুভ নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, ১৪ ই এপ্রিল ২০০০ সাল। রোজ শুক্রবার। নববর্ষ বিশ্বের সকল প্রাণীর হিতসুখ মঙ্গলের বার্তা বয়ে আনার জন্য রাজবন বিহার প্রাঙ্গনে আয়োজন করা বিরাট ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিহারের দক্ষিণ দিকে খোলা মাঠে প্রস্তুত করা হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ। যতই সময় গড়াতে থাকে ততই হাজার হাজার পুণ্যার্থী আগমনে মাঠ ভরে উঠে জন সমুদ্রে পরিণত হয়। হাজার হাজার পুণ্যার্থীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বাবু কল্প রঞ্জন চাকমা, তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী বিষয়ক টার্কফোর্স এর চেয়ারম্যান ও রাজ্যমাটির সংসদ সদস্য বাবু দীপঙ্কর তালুকদার, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু চিং কিউ রোয়াজা, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। যথাসময়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মঞ্চে আগমন করলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়। দানোৎসর্গ পরিদ্রাণ পাঠ পর্ব শেষে সকল প্রাণীর হিতসুখ মঙ্গলার্থে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মদেশনা শুরু করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মদেশনায় বলেন—শ্রোতামণ্ডলী যদি অন্তর্দৃষ্টিভাব সম্পন্ন হন, তাহলে তারা শ্রোতব্য বিষয় বুঝতে সক্ষম হন। আর তখনই উপদেশকের উপদেশ প্রদান এবং শ্রোতাদের শ্রবণ উভয় সার্থক হয় তথা ফলপ্রসূ রূপদান করে থাকে। সেই অন্তর্দৃষ্টি ভাব শব্দের অর্থ হল নিজকে বুঝবার ক্ষমতা এবং নিজকে দর্শন। বলা যায়, যে পুন্ডালের নিকট অন্তর্দৃষ্টিভাব বিদ্যমান থাকবে সেই পুন্ডালই একমাত্র বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। যার কাছে অন্তর্দৃষ্টি ভাব নেই সে কিছুতেই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারবে না। ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনার পূর্বে শ্রোতাদের অন্তর্দৃষ্টি ভাব উৎপন্ন হয়েছে কিনা তা' জ্ঞান যোগে দর্শন করতেন। যখন জ্ঞানেন্দ্রে দেখতেন যে, শ্রোতাদের চিন্তে অন্তর্দৃষ্টিভাব উৎপন্ন হয়েছে তখনই ধর্মদেশনা প্রদান করতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতামণ্ডলীরা স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতো। তাই বৌদ্ধধর্মের উপদেশ হল প্রথমে নিজকে পাপ, অকুশলকর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত রাখা। নিজকে বুঝতে চেষ্টা করা, নিজকে দর্শন করে অবস্থান করা। যাতে নিজের মধ্যে অকুশল চেতনা, ভুল ধারণা বিদ্যমান থাকলে সেসব সংশোধন করতঃ অকুশল, ভুলের উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে ঘটতেছে তার সম্পূর্ণ উল্টো। নিজকে বুঝতে চেষ্টা না করে অপরের দিকে কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ, নিজেকে সংযত না করে তার পরিবর্তে অপরের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা। পরের দোষ প্রকাশে পঞ্চমুখ আর নিজের দোষে বিমুখ এ নীতি চালিত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে।

সবাই যেন পরহিঁদ্র অশ্বেষণে বা পরচর্চায় ব্যস্ত। নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর সময় কোথায়? তাই বুদ্ধ বলেছেন, অপরের দোষ ধরা সহজসাধ্য ব্যাপার হলেও নিজের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে সচেতন থাকা বা দোষ ধরা সত্যিই সুকঠিন কাজ। অপরের ভুল সহজে প্রমাণিত হয়, দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু নিজের ভুলসমূহ প্রমাণ করা ও দর্শন করা দুরূহ ব্যাপার। বলা যায় পরচর্চা মানসিকতা থেকেই একে অপরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হয়। পরচর্চায় রত হলে একদিকে যেমন নিজের মধ্যে বিদ্যমান ভুল সংশোধন করা যায় না অর্থাৎ ভুলসমূহ রয়েই যায়; অন্যদিকে অন্যজনেরাও তাকে ভালো চোখে দেখে না। ফলে কলহ, বিবাদ, অজ্ঞানতা বেড়েই চলে।

মানুষ যদি ধর্মীয় রীতি-নীতিসমূহ সঠিকভাবে বুঝতে, পালন করতে অক্ষম হয় তাহলে তারা বিপদগামী হতেই বাধ্য। বিপদগামী হলে অকুশল, দুর্নীতি, দুষ্কৃতিমূলক কর্ম সম্পাদন করতঃ বিবিধ দুঃখের ভাগী হয়। পঞ্চান্তরে ধর্মীয় রীতি-নীতি সঠিকভাবে পালন করলে কোন দুঃখের কারণ হতে পারে না। সেই সঠিক রীতি-নীতি হল দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য, মার্গসত্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা জ্ঞানার্জন করা। এই চতুরার্য সত্যে জ্ঞানার্জন হলে সকল প্রকার ভ্রান্ত মত, ভ্রান্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। ভগবান বুদ্ধ অনেক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পুন্ডালকে সম্যকদৃষ্টির আলোক সন্ধান দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মিথ্যাদৃষ্টি, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী পুন্ডালের সংখ্যা অত্যাধিক। কে তাদেরকে সম্যকদৃষ্টির আলোক সন্ধান দিতে সমর্থ হবে? বনভন্তে ধর্ম সভায় উপস্থিত মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদারের উদ্দেশ্যে বলেন, কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান বা বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তি কি সম্যকদৃষ্টি আলোক সন্ধান দেখাতে পারবে? কখনো না। আমি জ্ঞানের দ্বারা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে মারের অশুভ শক্তি প্রবল আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাচ্ছে। কারণ বর্তমানে প্রকৃত জ্ঞানী লোকের বড়োই অভাব। তাই অতি সহজে মারের ফাঁদে পা দিচ্ছে এবং কুপথে পরিচালিত হবার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে আর চলছে। তাই বলি সংপথে চালিত হতে হলে, কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে, মারের সৃষ্টি সকল প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, প্রলোভন, হুমকির মধ্যেও অবিচলিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যিনি এমবিধ কঠিন কার্যে সফলকাম হয়ে সদ্ধর্ম আচরণের পথে বাধা-বিঘ্নসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন, পদদলিত করতে সমর্থ হন তিনিই পরম সুখ, শান্তি লাভ করেন।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ। সহজেই মনুষ্যকূলে জন্ম লাভ হয় না। অনেক প্রচেষ্টা ও বহুজন্মের অর্জিত পুণ্যের প্রভাবে একবার মনুষ্য জন্ম লাভ হয়ে থাকে। বর্তমানে দুষ্কৃতি কর্ম সম্পাদনের ফলে এহেন দুর্লভ মানব

জীবন হতে স্ফলিত হয়ে চারি অপায়ে পতিত হলে তা' অতিশয় বিপর্যয় বলে জানলে। কারণ বহু কল্পকাল ব্যাপী অনন্ত দুঃখ যজ্ঞণা ভোগ করেও আবার, কখন যে মানব জনম লাভ হবে তার হিসাব নিকাশ নেই। তাই মনুষ্য জনম লাভ করে তা' রক্ষা করা সুকঠিন একটি কাজ। আবার, বুদ্ধের দর্শন, সদ্ধর্ম লাভ করাও অতিশয় দুর্লভ। কেননা বুদ্ধ বা জ্ঞান দর্শন করা খুব বিরল। বহু কাল ধরে জ্ঞানের সাধনা করতে করতে তবেই জ্ঞানের দর্শন মিলে। অন্যদিকে, সদ্ধর্ম লাভ করতে চায় দৃঢ় বীর্যের সহিত আর্য মার্গ অনুশীলন, উপলব্ধি করণের মাধ্যমে সত্য জ্ঞানের সন্ধান লাভ হয়। সেই জ্ঞানের সন্ধান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম আচরণের ফলে অতি অল্প সংখ্যক পুঙ্গলেরা এই জ্ঞানের সন্ধান পায়। ধর্মদেশনা শ্রবণ করে যদি বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভের সুযোগ পাওয়া যায় তা' অতি সৌভাগ্যের বিষয়। তখন দেশনা শ্রবণকারীর অন্তর পরম ভক্তিতে ভরে উঠে, নির্মল সুখ লাভ হয় এবং অপায় দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভ করার পথে মার নামক অলৌকিক শক্তিশালী এক দেবতা কঠোর প্রতিরোধ সৃষ্টি করতঃ হুমকি, প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা নানা প্রকার বাঁধা-বিপত্তি ঘটায় থাকে। সন্তুদিগকে বিবিধরূপে দুঃখ প্রদান করা, লাঞ্ছিত, অপমানিত করা এবং স্বাধীনভাবে গমনাগমন করতে বঞ্চিত করা অর্থাৎ সর্বদা তার অধীনে মাথা নত করে অবস্থান করতে বাধ্য করা মারের কাজ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে (ধর্ম সভায় উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে) বলেন-বুদ্ধ বলেছেন যে দেশের নেতার সংখ্যা বেশি, সকলের চেয়ে বড় হতে চাই, তাদের কার্য বিনষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের অবস্থাও ঠিক সে রকমই হচ্ছে। আমি ধর্মীয় সফরে বের হলে দেখতে পায় রাস্তাঘাটসমূহ প্রায়ই ভাস্কচুরা, দেশের উন্নতি ছোয়া এতো পিছনে পড়ে আছে কেন? একদলের উন্নতি, ভালোর দিকটা অন্যদলের নেতারা সহ্য করতে চায় না। একদল অন্যদলের হিংসা, বিদ্বেষের রোষানলের শিকারে পতিত হয়ে কোন ভালো কাজ করতে পারছে না। বর্তমানে শুধুমাত্র ক্ষমতার মোহে, গদির লোভে জ্বালাও পোড়াও এ নীতিতে প্রায় সবাই বাস্তব। দেশ উন্নতি, অবনতি যেদিকে যাক না কেন। এমনিতে গরিব দেশ, তার উপর নানামত ও নানাপথ ফলে উন্নতি হবে কিভাবে? বুদ্ধ বলেছেন দেশ শাসন করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল। জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের সহিত দেশ শাসন করতে পারলে দেশের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সাথে সাথে জন সাধারণের কাছে নিজের গ্রহণ যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে নিজেকে যেমন উর্ধ্বদিকে নিয়ে যেতে পারে, অন্যদিকে দেশের জন্যও অনেক মঙ্গলময় কার্য

সম্পাদন করা সম্ভব হয়। কাজেই তোমরা জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল অবলম্বনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা কর। আবার ভালো, খারাপ ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। খারাপ বুদ্ধির সহিত কাজ করলে কোন রকমে একদিন স্বাচ্ছন্দে চলা যায় মাত্র। তারপর পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ভালো বুদ্ধির সহিত কর্ম সম্পাদন করলে সারা জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করা সম্ভব। সেখানে পতনের কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সংভাবে পরিচালিত হলে নিজের যেমন মঙ্গলময় ভবিষ্যতের আশা করা যায়, তেমনি অসংভাবে পরিচালিত হলে নিজের সর্বনাশটুকু ডেকে আনা ছাড়া কোন কিছু হয় না।

যারা চিন্তের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকবে সে খারাপ কর্ম ত্যাগ করে ভালো কর্মই সম্পাদন করবে। আর যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান নেই সে খারাপ কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য। তাই কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয় সে জ্ঞানী নাকি অজ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো খারাপ কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। বলা যায়, কর্মেই জ্ঞানীর লক্ষণ, কর্মেই অজ্ঞানীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তির যখন সর্বদা ভালো কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, তেমনি অজ্ঞানী ব্যক্তির মন্দ কর্ম সম্পাদনে কিছুতেই পিছ পা হয় না। তোমরা সকলে জ্ঞানী হয়ে যাও; ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা যাচাই কর। তারপর ভালো, ন্যায়, সত্যকে গ্রহণ করতঃ মন্দ, অন্যায়, মিথ্যাকে বর্জন কর। মনে রাখবে, ভালো-মন্দ বিচার করা, ন্যায়-অন্যায় যাচাই করা, সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। এসব বিচার, যাচাই, পরীক্ষা করার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত সার, সত্য নিরূপিত হয়ে থাকে। আর তখন অসার, মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সার, সত্যকে গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়। যারা জ্ঞানী তারা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যাকে যাচাই করতে সক্ষম। কিন্তু অজ্ঞানীরা এসব যাচাই বাছাই কিছু করতে পারে না। তাই তারা দিকভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিপরীত দিকে ধাবিত হতে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন, অজ্ঞানীর মূর্খ ব্যক্তি ছয়টি দোষ বিদ্যমান থাকে। কি কি? তারা ভালোকে মন্দ বলে, মন্দকে ভালো বলে, ন্যায়কে অন্যায় বলে, অন্যায়কে ন্যায় বলে, সত্যকে মিথ্যা বলে, মিথ্যাকে সত্য বলে থাকে। একথায় তারা সারকে অসার, অসারকে সাররূপে গ্রহণ করে থাকে। তজ্জন্য তারা কখনো সারবস্ত্র লাভ করতে পারে না। সর্বদা মিথ্যার মধ্যে নিজেকে আঁকড়ে রেখে খারাপ কর্মসমূহ সম্পাদন করতেই থাকে। কাজেই সে কর্ম হতে ফিরে আসা তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে উঠে না। আমার অনেক বছরের সাধনায় এই অভিজ্ঞা হয়েছে যে, মুখের কাছ হতে কোন ভালো কর্ম আশা করা সম্ভব নয়। ভালো কর্ম সাধন করতে হলে পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন। সুতরাং তোমরা সবাই পাণ্ডিত্য অর্জন কর। অনেক বেশি কথা বললে, কথায় বার্তায় চতুরতা প্রদর্শন

করলে, নানা যুক্তি উপমা সহকারে অনেক বক্তৃতা প্রদান করলে, সুমধুর স্বরে গাথা পাঠ করলে পাণ্ডিত্য অর্জিত হয় না। পণ্ডিত কাকে বলে জ্ঞান? একদিন আমি জনৈক অফিসারকে পণ্ডিতের লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করলে সে খুব সম্মত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম মতে, যিনি সহনশীলত, সর্বজীবের প্রতি দয়া, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমাশীল, মৈত্রীপরায়ণ, সর্বদা অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখতে যিনি সক্ষম তিনিই পণ্ডিত। একমাত্র এসব গুণের দ্বারাই পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়। কেহ যদি পণ্ডিত হয় সে আর অন্যায়মূলক কর্ম সম্পাদন করবে না, খারাপ, দোষপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত থাকবে না। কিন্তু যদি মূর্খ হয়ে থাকে তবে সে অন্যায়, অপরাধ, মন্দ কর্মসমূহ সম্পাদন করতে থাকবে। তাই আমার অনুরোধ, তোমরা সকলে অতিসত্বর পণ্ডিত হয়ে যাও। এখানে উপস্থিত নর-নারী যদি সবাই পণ্ডিত হয়ে যেতে পার তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আসবে। এটা কোন কথার কথা নয়; তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

বনভঙ্কে আরো বলেন-মূর্খ ব্যক্তির সব সময় আন্দোলন, মিছিল, দল, হরতালের মধ্যে নিজেই যুক্ত রাখে। এসব কর্মের দ্বারা তারা অরাজকতা সৃষ্টি করে থাকে, দুঃখ সৃষ্টি করে থাকে, সকলের দুর্দশা ডেকে আনে মাত্র। আর সবাইকে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা মতে দল, আন্দোলন, মিছিল, হরতাল করা অনুচিত। কারণ এ সবের দ্বারা দুঃখ সৃষ্টি হয়, পাপ সৃষ্টি হয়, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি দেশ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। তাই যারা মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য এবং সাধারণ একমাত্র তারাই দল, আন্দোলন, মিছিল, হরতালের মাধ্যমে দুঃখ যাতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে। জ্ঞানী, অসাধারণ ব্যক্তিদের কোন দল গঠন করতে হয় না। আন্দোলন, মিছিল, হরতাল পালন করারও কোন প্রয়োজন হয়ে পড়ে না। তারা সেসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন।

আমি জ্ঞান নেত্রে দেখতেছি, বর্তমানে সবাই অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টি, খল ও নরাধম। অকৃতজ্ঞ মানুষ, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, নরাধম মানুষ, খল মানুষ কিভাবেই শান্তি লাভ করবে? তারা তো মন্দ কর্ম ব্যতীত ভালো কিছু সম্পাদন করতে পারে না। বলা বাহুল্য, সাধু সত্ত্ব লাভে যেমন সুখ, শান্তি নেমে আসে তেমনি অকৃতজ্ঞ, নরাধম, খলের সংসর্গে জীবনের সর্বনাশ নেমে আসে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন কষ্টকময় স্থানে বাস করা কি দুঃখজনক, তদপেক্ষা অকৃতজ্ঞ লোকের সহিত বাস করা দুঃখজনক। শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে রাজমাটির সংসদ সদস্য বাবু দীপঙ্কর তালুকদারকে বলেন-হে দীপঙ্কর, মনে রাখবে অকৃতজ্ঞ লোকের সঙ্গে বাস করা খুবই দুঃখজনক। অকৃতজ্ঞ মহৎ পাপী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কখনো সুখ লাভ হয় না। কারণ হঠাৎ যদি কোন কষ্টক শরীরে গেথে যায় তা' বাহির

করলে দুঃখ আর থাকে না। কিন্তু অকৃতজ্ঞ লোক যেই দুঃখ দেয় সেই দুঃখ সহজে ভুলে যাবার নয়। তাই আমি বারবার বলছি, তোমরা সবাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। কেহ বিন্দুমাত্র উপকার করলেও তা কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করা উচিত। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে, সম্মান করে, স্নেহ মমতা প্রকাশ করে থাকে। কখনো অকৃতজ্ঞ হয়ো না। কৃতজ্ঞতা নিজের যেমন সুখ, মঙ্গল বয়ে আনে ঠিক তেমনি প্রত্যুপকারীকেও এনে দেয় পরমানন্দের তৃপ্তি। আবার নরাধম, খল ব্যক্তির কারণে উপকার করতে পারে না। তারা শুধু অপরের অপকার করে থাকে। উপকারের পরিবর্তে অপকার করতেই যেন তারা খুব পারদর্শী। তাই বলা হয়েছে—

ধরাতলে নরাধম, খল আছে যত,
ঠিক তারা উই আর ইদুরের মতন।

উই ইদুর যেমন গৃহস্থের কোন উপকার মূলক কাজে আসে না, কেবল ক্ষতিই করে, ঠিক তদ্রূপ নরাধম ও খল মানুষের দ্বারা কোন ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র উপকৃত হতে পারে না। কারণ তারা মঙ্গলজনক কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। বরঞ্চ অজ্ঞানতামূলক, অকুশল কর্মসমূহ সম্পাদন করে থাকে সার। সর্বদা কলহ, বিদ্বেষ, হিংসাহিংসি, রেষারেষি, শত্রুতা ভাব দ্বারা তারা নিজের ও অপরের শান্তি, সুখ ভঙ্গ করে থাকে। তাই তাদেরকে দুঃখ সৃষ্টিকারী, অমঙ্গল সৃষ্টিকারী, বিপদ আনয়নকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন—আজ হতে আর দুঃশীলতা আচরণ করবো না বলে তোমরা সবাই একরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোহিন যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা হতে দূরে থাকবে। পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল আচরণ কর, সর্বদা মনচিন্তকে দান-শীল-ভাবনা দিকে নিয়োজিত রাখ। সকলে দিনে দিনে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চেষ্টা কর। পাণ্ডিত্য অর্জন করতঃ দুষ্কৃতিমূলক কর্ম, বাক্য, মনন ত্যাগ করে ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট কর্মে আত্মনিয়োগ কর। উপকারীর উপকার স্বীকার কর। সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসক হয়ে অবস্থান করতঃ মৈত্রী ভাবনায় রত থাক। এসব সংত্ত্বের অধিকারী হতে পারলে আমি বলছি তোমাদের অবশ্যই সুখ, শান্তি, উন্নতি, সমৃদ্ধি বয়ে আসবে। মনে রাখবে আপন দুষ্কৃতি কর্মের দ্বারা মানুষ দিন দিন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। তখন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ হাজির হয়ে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। নিজের সংকর্মের দ্বারা যেমন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আসে তেমনি নিজের কৃত দুষ্কর্মের ফলে নিজেকে দুঃখ কষ্টের ভাগী হতে হয়। জ্ঞানের অভাব ও কুশলকর্মের সীমাবদ্ধতা হলে বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমার অনুরোধ তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো না, মূর্খ হবো

না। সাধু হয়ে যাও, পণ্ডিত হয়ে যাও। সাধু, পণ্ডিত ব্যক্তির স্বর্গ লাভ হয় আর অসাধু ব্যক্তি নিরয়গামী হয়ে বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহলোকে যেমন সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হয়, মৃত্যুর পরও স্বর্গ লাভ করে পরম সুখে থাকে। মূর্খ ব্যক্তির অর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখ সৃষ্টিকারী, বিপদ আনয়নকারী। জগতে যা কিছু দুঃখ সৃষ্টি হয় একমাত্র মূর্খতার দরুন। পক্ষান্তরে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকলের উপকারী, সুখ আনয়নকারী। তাই আবারো বলছি, তোমরা সকলেই পণ্ডিত হয়ে যাও। যদি সবাই পণ্ডিত হতে পারো তাহলে গ্যারান্টির সহিত বলল তোমাদের কখনো পরিহারী হবে না। বরঞ্চ উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হয়ে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি মঙ্গলময় ভবিষ্যত রচিত হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

সমাপ্ত

আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা

সিরিজ-২

প্রথম অধ্যায়

সংযম আচরণ ও আত্মজয়ে নির্বাণ লাভ হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসত্ত্বের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-মহাজ্ঞানী শারীপুত্র স্ববির বেঁচে থাকারও ইচ্ছা পোষণ করতেন না এবং মৃত্যুবরণেরও আকাঙ্ক্ষা করতেন না। যেহেতু বাঁচার ইচ্ছা পোষণ করলে সংসারবর্তের প্রশংসা করার সামিল হয় আর মরণের আকাঙ্ক্ষা করলে মৃত্যুর গুণ বর্ণনা করার ন্যায় হয়ে যায়। অন্যদিকে বেঁচে থাকাও যেমন দুঃখ, মৃত্যুবরণ করাও তেমনি দুঃখ। জন্ম-মৃত্যুর হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ অর্থাৎ জীবন মরণের অতীত হতে পারলে তবেই সুখ লাভ হয়। বুদ্ধ বলেছেন-হে ভিক্ষুগণ! কোন পার্থিব স্থানে বেঁচে থাকো বলে আমি ধর্মোপদেশ দিই না। আবার মৃত্যুবরণের জন্যও উৎসাহিত করি না। তোমাদেরকে বলছি তোমরাও বেঁচে থাকার কিম্বা মরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা পোষণ করবে না। আমি বেঁচে থাকব এটা বলা যেমন অজ্ঞানীর কথা তেমনি মরে যেতে পারলে ভালো হতো এটাও মূর্খতার পরিচায়ক। অজ্ঞানীরা বর্তমানে সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হলে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করে আর দুঃখে পতিত হলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির বেঁচে থাকতেও ইচ্ছা পোষণ করেন না, মরণ কামনাও করেন না। তারা জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়ে সুখে অবস্থান করেন। বস্ত্রতপস্কে বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করা ও মরণ কামনা উভয়ই দুঃখ সৃষ্টিকারী এবং পাপ বলে জানতে হবে। বুদ্ধের সময়কালীন অনেক ভিক্ষু নাকি অসুস্থ হলেও ঔষধ সেবন করতেন না। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিনির্বাণ লাভে অগ্রমত্ত হয়ে ধ্যানে আত্মনিয়োগ করতেন। তোমাদেরকে শারীরিক সুখ-দুঃখে স্থির থেকে আজীবন ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে হবে। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে-গরু যখন গাড়ীতে সংযোজিত হয় তখন সুখে কিংবা দুঃখে গাড়ী বহন করতেই থাকে। সেইরূপ সাধনা নিরত ভিক্ষু (যোগী)

যখন একবার প্রব্রজ্যাব্রত গ্রহণ করে তখন সুখে কিংবা দুঃখে যে কোন অবস্থাতেই জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। গরু নিজের ঘর (গোয়াল) ত্যাগ করে কোথাও চলে যায় না। সেইরূপ সাধনা নিরত ভিক্ষু কখনো প্রব্রজ্যা ত্যাগ করবে না। পুনরায় গরু আশ্রান নিয়ে ইচ্ছানুসারে জলপান করে। সেইরূপ সাধনা নিরত ভিক্ষু আচার্য ও উপাধ্যায়ের উপদেশ, আদর-যত্ন, প্রসন্নতা ও মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করা উচিত। পুনশ্চ গরু যে কারো দ্বারা গাড়ীতে যুক্ত হলে উহা বহন করে। সেইরূপ সাধনা নিরত ভিক্ষুর পক্ষে স্থবির (বৃদ্ধ), মধ্যম ও নবীন ভিক্ষু কর্তৃক এবং গৃহীদের মধ্যে যে কোন জনের হিতকর উপদেশ ও অনুশাসন বিনয়ের সহিত গ্রহণ করা উচিত। তোমরাও এই চারি প্রকার গুণধর্মসমূহ সযত্নে স্বীয় অন্তরে সর্বদা জাহ্নত করে রাখবে। সংসারের প্রতি অনাসক্ত ভাব বজায় রেখে অবস্থান কর। এবং কোন প্রকার সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করবে না। দেহের প্রতি অশুচি জ্ঞান করতঃ বত্রিশ প্রকার কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা কর। তাহলে সুখের সহিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হবে। কেশ, লোম, নখাদি বত্রিশ প্রকার অশুচি অংশ সমষ্টিতে এদেহ গঠিত। তাই দেহের প্রতি আকৃষ্ট হবার কোন কারণ বিদ্যমান নেই। যারা দেহের অশুচি অংশগুলো নিয়ে কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করে তাদের ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে যায়। তাদের মনচিন্তে দেহের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি ভাব উৎপন্ন হয় না। বরঞ্চ দেহের প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মায়। এবং মনকে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ তখন তারা জানে যে, এদেহ অতীব ঘৃণিত, অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ মাত্র। চারি মহা সাগরের জল দ্বারা এই দেহকে ধৌত করলে, কিম্বা মেরুপর্বত প্রমাণ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা লেপন করলেও এই অশুচিপূর্ণ দেহ পবিত্র হবে না। কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা বা দেহের প্রতি অশুচি ভাবনা করে বুদ্ধের সময় অনেক ভিক্ষু অর্হতু লাভ করেছিলেন।

তোমরা সংসারে সুখ ভোগ করাকে তুচ্ছ জ্ঞানে দর্শন করবে। দেহের প্রতি কোন আসক্তি উৎপন্ন করবে না এবং আমার মতো বল 'সংসারে সুখ ভোগ করব না, দেহের প্রতি আসক্তি ভাব ত্যাগ করব।' তাহলে নির্বাণ লাভ করতে কোন অসুবিধা হবে না। গৃহী অবস্থায় থাকাকালীন সংসারে যে সমস্ত সুখ ভোগে রত ছিলে তা' পুনরায় স্মরণ করবে না। সংসারে সুখ ভোগের প্রত্যাশী হলে সীমাহীন দুঃখের মধ্যে পতিত হতে হয়। সুখ ভোগ করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ সংসারের যাবতীয় বস্তু, বিষয়কে ত্যাগ করতে পারলে তবেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। 'আমি মানুষ', 'সে পুরুষ', 'সে মহিলা' এ ধারণাসমূহ মনচিন্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সংসারে সুখ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সংসারের ভোগ্য বিষয় সমুদয়ে নিমজ্জিত থাকাকে সুখরূপে দৃষ্ট হয়। তাতে অজ্ঞানতা বেড়ে গিয়ে

জ্ঞানচক্ষুকে হরণ করে। ফলে অকুশলের দিকে মনচিন্ত সবেগে ধাবিত হয়। মনচিন্তের মধ্যে ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’ এই ধারণাসমূহ বিদ্যমান থাকলে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতেই থাকে। আর সেই অজ্ঞানতার হেতুতে চক্ষু মনোরম দৃশ্যের দিকে ধাবিত হয়, কর্ণ মনোজ্ঞ শব্দের পশ্চাতে চালিত হয়; নাসিকা সুগন্ধের দিকে ছুটে চলে, জিহ্বা আনন্দনীয় বস্তুর প্রতি লালায়িত হয়; কায় সুখ স্পর্শের জন্য কাতর হয় এবং মন সুখকর চিন্তায় মগ্ন থাকে। অথচ এই সবই অলীক, ভ্রান্ত ধারণা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

তিনি আরো বলেন-দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করতে হলে তোমাদেরকে মারের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। কারণ কেহ মাররাজ্য (শাসন) অতিক্রম করে নির্বাণ লাভে উদ্যোগী হলে মুক্তি বিদ্যেবী মার কিছুতেই তা’ সহ্য করতে পারে না। আর তখনই মারের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে যায়। মার মুক্তিকামীদেরকে সংসারে সুখ ভোগের বিবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ कराয়ে, মোহ মুগ্ধ कराয়ে এবং বিভীষিকাময় দৃশ্য দ্বারা ভয়াদি প্রদর্শন कराয়ে মুক্তি লাভের সাধনায় বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে দেয়। এভাবে নানা প্রকারে অন্তরায় সৃষ্টি করতঃ সাধন মার্গ হতে বিচ্যুত করতে মার সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় মুক্তিকামীদেরকে প্রজ্ঞার দ্বারা মারের সৃষ্ট সে সকল অন্তঃশক্তি ও কুচক্রান্ত সমুদয়কে ছিন্ন-ভিন, বিধ্বস্ত করতেই হয়। নতুবা নির্বাণ লাভ করা যায় না। তোমরা মারের সেই সকল কুপ্রবৃত্তিকে মাটির পাত্রবৎ বানিয়ে জ্ঞানরূপ পাথরের আঘাতে ধুলিসাৎ করে দাও। তাহলে মারকে যুদ্ধে পরাজিত করে নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে। আবার পাপ অকুশলকর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত হওত মনকে বিষয় বাসনায় অনুরক্ত না করলে মার পরাজিত হতে বাধ্য হয়। তখন মারের সৃষ্ট সব কুচক্রান্তের অবসান ঘটে যায়।

নিত্য সংযমী, আত্মজয়ীদেরকে দেবতা, ব্রহ্মা, মার কেহ পরাজিত করতে পারে না। যারা নিত্য সংযমী তাদের দ্বারা কোন প্রকার অকুশল, পাপমূলক কর্ম সম্পাদিত হয় না। তারা সর্বদা জ্ঞানের সহিত জাগ্রত অবস্থায় বিহার করে থাকে। কখনো প্রমাদের বশবর্তী হয় না। তাই খারাপ কর্ম, খারাপ বাক্য, খারাপ চিন্তা তাদেরকে গ্রাস করতে পারে না। আত্মজয়ী অর্থ ‘আমি’ এ ধারণাটুকু পোষণ না করা। আমি ধারণা থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়। এই অহংকার বোধ হতে নিজকে অন্যের সাথে তুলনা করার চেতনা উদয় হয়েই বাদ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব সংঘাত, হীন স্বার্থপরায়ণতা, অশান্তি সংঘটিত হয়। অহংকার যত অনর্থের মূল। অহং মনোবৃত্তি থেকে অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি বৃদ্ধি হতেই থাকে। ফলে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অপরদিকে নিত্য সংযত আচরণ ও আত্মজয় করলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সহজ হয়। তাই তোমরা সর্বদা সংযম রক্ষা করে অবস্থান কর এবং আত্মকে জয় করতে চেষ্টাশীল হও। তাহলে

প্রব্রজিত জীবন সার্থক হবে, মহাফলপ্রসূ রূপদান করবে। যেই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে তা' সফল হবে। সমস্ত জগত বা সংসারকে দুঃখরূপে দর্শন করলে মনচিন্তা নির্বাণ মার্গের দিকে ধাবিত হয়ে সুখের সন্ধান পায়। দুঃখ সত্য জ্ঞাত হয়ে, সমুদয়সত্য ত্যাগ করে, নিরোধসত্য প্রত্যক্ষ করে, মার্গসত্য গঠন বা ভাবনা করে বারংবার সংসারে আনাগোনা (জন্মম্রহণ) জনিত দুঃখ হতে বিমুক্তি লাভ করতে হয়। সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভের তরে এই পন্থা অবলম্বনের কোন বিকল্প নেই। ইহাই দুঃখমুক্তি লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা।

তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ সংসারী হীন জীবন-যাপন করার ইচ্ছা পোষণ করবে না। কখনো সাংসারিক সুখ ভোগের লালসায় লালায়িত হবে না। স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অনার্য, পাপ, ঘোরতর দুঃখ বলে জানবে। প্রথমে একাই একটি দুঃখপুঞ্জ, তৎপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আরো একটি দুঃখ পুঞ্জের সংযোগ হয়। পরে যতজন সন্তান জন্ম নেয় (পূর্বের সাথে) ততটি দুঃখপুঞ্জ যোগ হয়ে থাকে। এভাবে অসহ্য দুঃখ, সীমাহীন যাতনায় ভরা সংসারী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। একমুহূর্তকালও সুখের সন্ধান মিলে না। 'আমি মানুষ', 'সে পুরুষ', 'সে মহিলা' এ ধারণাগুলো ত্যাগ করলে কোন প্রকার সাংসারিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে সুখ ভোগ ইচ্ছা জন্মাতে পারে না। এতে পরম সুখে প্রব্রজিত জীবন-যাপন করা যায়-অনায়াসে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-নির্বাণে দুঃখ বলে কিছুই নেই, নেই অতৃপ্তির কোন ছাপ। সংসারের সমস্ত দুঃখ ও জীবন যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ। অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয়ে চিন্তের কুলুম্বিত ভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হলে নির্বাণ সুখ লাভ হয়। মনচিন্তার মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকতে কিছুতেই নির্বাণ লাভ করা যায় না। সংসারী মানুষকে দেখে তারা অবিদ্যা ও তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে পরস্পরে বাদ বিবাদ, হিংসাহিংসি, রেষারেষি, বিবিধ গুণগোল সৃষ্টি করে অসহ্য দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। কাম্য ভোগ বাসনাদি চিন্তায় তারা নদীর আর্বতে পতিত বস্তুর ন্যায় অজ্ঞানের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখবে, মনচিন্তা অজ্ঞানের বশানুগত হলে কখনো সুখ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তখন মিথ্যাপথে পরিচালিত হওত অপরিসীম দুঃখ ভোগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। উপরন্তু নানাভাবে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অসম্মান, বেইজ্জতি, অপদস্থ হয়ে বর্ণনাভীত দুঃখ দুর্দশায় পতিত হতেই হয়। তোমরা প্রকৃত সুখ শান্তি লাভের জন্য অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয় সাধন করতঃ নির্বাণ প্রাপ্ত হও। সত্বর লোকোত্তর (নির্বাণ) ভূমিতে গমন কর। সর্ব দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়ে চিরশান্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে না পারলে আসল লক্ষ্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করতেছ বলে জানবে।

তোমরা 'মানুষ', 'পুরুষ', 'মহিলা' এসব ধারণার বশীভূত হয়ে অবস্থান

করো না। বরং প্রত্যেকে স্বীয় মনচিন্ত হতে এই ধারণাসমূহ উচ্ছেদ করে ফেলে দাও। মনচিন্তে এ ধারণাগুলো থাকলে বিবিধ প্রকার দুঃখ পেতে হয়, লজ্জিত হতে হয় এবং হাহতাশে হৃদয় দক্ষ-বিদক্ষ হতেই থাকে। কাজেই যারা ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’ ‘মহিলা’ ধারণার সহিত অবস্থান করে তারা কখনো নির্বাণ সুখ লাভ করতে পারে না। নির্বাণ লাভ করতে হলে মনচিন্ত হতে ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’ ধারণার মূলোচ্ছেদ সাধন করার কোন বিকল্প নেই। বনভন্তে বলেন বুদ্ধের সময় পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে সবাই নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিল। অসংখ্য পুরুষ অর্হৎ লাভ করে যেমন বুদ্ধের শ্রাবকরূপে পরিচিত হয়েছিল, তেমনি অসংখ্য মহিলাও অর্হৎ লাভ করতঃ বুদ্ধের শ্রাবিকা বলে পরিচিত হয়েছিল। তা কি করে সম্ভব হয়েছিল জ্ঞান? তারা ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’, এ ধারণা পোষণ করা হতে বিরত ছিলেন বিধায়। শাস্ত্রে দেখা যায়, ক্ষেমাদেবী ও উৎপলবর্ণা অর্হৎ লাভ করে অগ্রশ্রাবিকার পদ লাভের পর বুদ্ধের ডান এবং বাম পার্শ্বে বসার অধিকার পেয়েছিল। কারণ অর্হৎ লাভ হলে তাদেরকে আর ভুমি ‘পুরুষ’, ভুমি ‘মহিলা’ বলা যায় না। তখন মনচিন্তের মধ্যে ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’, এ ধারণাসমূহ বিদ্যমান থাকে না। তারা সে সব ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে যায়। কাজেই ক্ষেমাদেবী, উৎপলবর্ণা তখন তো আর মহিলা বলে পরিগণিত নন। তাই বুদ্ধের পাশে উপবেশন করতে তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। তোমরা ‘মহিলা’ এ কথা বলেও কেহ তাদেরকে বারণ করার অবকাশ পায়নি। যেমন কোন ব্র্যাক্‌বোর্ডে অ, আ, ই, ঈ বর্ণগুলো লেখার পর সেগুলো মুছে তৎস্থানে ক, খ, গ, ঘ লেখা হলে পূর্বে লেখা বর্ণের কোন অস্তিত্ব (চিহ্ন) থাকে না, ঠিক তদ্রূপ অর্হৎ প্রাপ্তির জ্ঞান উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে মনচিন্তের মধ্যে আর ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’, এ ধারণাগুলো থাকে না। অরহত্ব জ্ঞান লাভ হলে অজ্ঞান, ভ্রান্তমূলক সকল ধারণা সমূলে বিধ্বংস হয়ে যায়।

মনচিন্তের মধ্যে ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’ ধারণা বিদ্যমান থাকলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা বহুকষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বলা যায় সঠিকভাবে আচরণ, অনুশীলন করা যায় না। তাই প্রব্রজিত হয়ে সেই সকল ধারণা যারা বিদূরিত করতে চেষ্টাশীল নয় তারা পথভ্রষ্ট ভিক্ষু বলে জানবে। প্রব্রজিত জীবনের আসল লক্ষ্য হতে বহুদূরেই তাদের অবস্থান। অন্যদিকে যারা সেই ধারণাগুলো বিধ্বংস করেছেন বা বিধ্বংস করতে চারি আর্যসত্যকে আঁকড়ে ধরে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল হয়ে বিচরণ রত, তারা সতদ্রষ্টা ভিক্ষু।

পরিশেষে তিনি বলেন—‘আমি’ এই অহংকার বোধ না থাকলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। তোমরা মনচিন্তের মধ্যে অহংকার বোধকে কিছুতেই উদয় হতে দিবে না। এবং পূর্বে উৎপন্ন হওয়া অহংকার বোধকে নিরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা

চালিয়ে যাও। নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে কখনো শ্রেষ্ঠ, কখনো হীন, কখনো সমান মনে করাই অহংকার। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার মধ্যে যেমন অহংকার বোধ থাকে তেমনি থাকে সমকক্ষ এবং হীন মনে করার মধ্যেও। অন্য হতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে শ্রেষ্ঠ অহংকার, সমান মনে করে সদৃশ (সমকক্ষ) অহংকার, ছোট মনে করে হীন অহংকার বোধ প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠত্ব, সদৃশ, হীন যেভাবে অহংকার বোধ উদয় হোক না কেন তাতে অজ্ঞান, দুঃখই উদয় হয়ে থাকে মাত্র। এ‘সব অহংকারের মধ্যে কোন ক্রমেই সুখ, শান্তি লাভ হয় না। অহংকার সর্বমোট নয় প্রকার, যথা—(১) আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ (২) আমি শ্রেষ্ঠের সদৃশ (৩) আমি শ্রেষ্ঠ হতে হীন (৪) আমি সদৃশ হতে শ্রেষ্ঠ (৫) আমি সদৃশের সদৃশ (৬) আমি সদৃশ হতে হীন (৭) আমি অধমের উত্তম (৮) আমি অধমের সমান (৯) আমি অধম অপেক্ষা অধম। এই নয় প্রকার অহংকার ত্যাগ করতে সক্ষম হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ সুখ লাভ হয়। তোমরা এ‘কাজে উত্তীর্ণ হতে পারবে কি? অবশ্য নয় প্রকার অহংকার ত্যাগ করা সহজ কাজ নহে। মুখের জোরে বলা যায় বটে, কিন্তু মনচিন্ত থেকে মুছে ফেলা সহজ কথা নয়—অত্যন্ত জ্ঞানমূলক, অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকেরা নিজেকে (অন্যের সাথে তুলনা করতঃ) কখনো শ্রেষ্ঠ, কখনো সমকক্ষ, কখনো হীন মনে করতে অভ্যস্ত। তারা কিছুতেই সেই অহংবোধ ত্যাগ করতে পারে না। বরং সর্বদা অহং বোধের মারপ্যাচে আবদ্ধ হয়ে কলুষিত চিন্তে অবস্থান করে। অহংকার ত্যাগ করে তোমরা সবাই নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর। মনে রাখবে নির্বাণ লাভ না হলে কখনো প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে না। একমাত্র নির্বাণই সকল প্রকার পাপকালিমা ও দুঃখ যজ্ঞণা হতে চরম বিমুক্তির অবস্থা। তাই বুদ্ধ বলেছেন—‘নিব্বাণং পরমং সুখং’। নির্বাণ লাভ হলে মনচিন্ত হতে ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’, এবং আমি, আমার, আমিত্ব এই মিথ্যা ধারণাসমূহ চিরতরে বিদূরীত হয়। সংসারে সুখ ভোগ করা সহ সমস্ত তৃষ্ণার চির নিবৃত্তি ঘটে।

সাধু, সাধু, সাধু।

বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সহজ হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। দেশনায় তিনি বলেন—তোমরা সবাই অতিসত্বর দক্ষতা অর্জন কর। সেই দক্ষতা কিরূপ জ্ঞান? শমথ ও বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন সম্বন্ধে দক্ষতা লাভ করা। যারা শমথ ও বিদর্শন সম্বন্ধে দক্ষতা লাভ করতে সক্ষম তাদের সমস্ত সংযোজন ছিন্ন হয়ে যায়। বৌদ্ধ সাধনা প্রণালী হিসাবে শমথ ভাবনা হল লৌকিক সমাধি আর বিদর্শন ভাবনা হল লোকোত্তর সমাধি। শমথ ভাবনা চিত্তের অকুশলবৃত্তিগুলো উপশম, চিত্তকে সমাহিত করে মাত্র। বিদর্শন ভাবনা চিরতরে নির্মূল বা উচ্ছেদ সাধন করে। শমথ ভাবনা দ্বারা শীল ও সমাধি লাভ হয় কিন্তু অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমূলে ধ্বংস না হওয়ায় নির্বাণ লাভ করা যায় না। শমথ ভাবনায় ত্রিলক্ষণে (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা) প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। অন্যদিকে এ' অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান উদয় না হলে অবিদ্যা, তৃষ্ণা হতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না; ফলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। তাই শমথ ভাবনা দ্বারা স্বর্গ ব্রহ্মাদি লাভ হয় বটে কিন্তু নির্বাণ লাভ হয় না। বিদর্শন ভাবনা দ্বারা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা লাভ হওত অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়। তাই একমাত্র বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমেই ত্রিলক্ষণ জ্ঞান প্রতিভাত হয়ে অতিসত্বর নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়। বিদর্শন ভাবনা দ্বারা ত্রিলক্ষণ জ্ঞানের চরম সীমায় আরোহণ পূর্বক একত্রিশ প্রকার লোকভূমির সমস্ত কিছুতেই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা জ্ঞান দর্শন ব্যতীত নির্বাণ লাভ করা যায় না।

ভাবনা শব্দের অর্থ মনের কাজ, জ্ঞান উৎপাদক চিন্তা। যে জ্ঞানের দ্বারা সংসার দুঃখকে অবসান ঘটায় নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। নির্বাণ উপলব্ধি তথা যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্তি লাভের জন্য ইহাই উৎকৃষ্ট পন্থা। সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভের জন্য সকল মুক্তিকামীদেরকে এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়। বিদর্শন ভাবনা সত্ত্বগুণের মনচিত্তকে জ্ঞানের চরম সীমায় পৌছে দেয়। বলা যায় এ'ভাবনা অনুশীলন করলে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান এবং 'আমি মানুষ', 'সে পুরুষ', 'সে মহিলা' এ ধারণা (মনচিত্ত থেকে) চিরতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয়। আবার নামরূপ বিভাগ করে দেখতে না পারলে বা নামরূপ না চিনে বিদর্শন ভাবনা করা হলে তা' তাল-ছন্দ ছাড়া তবলা বাজানোর মতন হয়। এতে বিদর্শন ভাবনা কিছুই হয় না; বিদর্শন ভাবনার নামে ডেজাল, গুণগোল কাজে অনর্থক সময় ক্ষেপন করাই সার হয়। বর্তমানে অনেক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের সাইনবোর্ড এবং সেখানে বিদর্শন সাধক নামধারী লোকজন আনাগোনা করতে দেখা যায়। কিন্তু আমি তো দেখতেছি, তারা নামরূপ না চিনে, নামরূপ

না বুঝে তাল বিহীন তবলা বাজানোর মতন নামে মাত্র বিদর্শন ভাবনা করতেছে। প্রকৃত বিদর্শন ভাবনা কিছুই হচ্ছে না। কিভাবে নামরূপকে বিভাগ করবে জান? পৃথিবীর সমস্ত কিছুই নামরূপ মাত্র। এখানে নাম ও রূপ ছাড়া অন্য কিছুই অস্তিত্ব নেই। যত স্থূল পদার্থ (জড়) আছে সমস্তই রূপ, এবং যত সূক্ষ্ম মানসিক ধর্ম (চেতন) আছে, তৎসমস্তই নাম। যেমন-যা দেখতেছি তা রূপ, এবং যা দেখছি বলে জানতেছি তা নাম। যা শুনেছি তা রূপ, এবং যা শুনিছি বলে জানতেছি তা নাম। যা গন্ধানুভব করতেছি তা রূপ, এবং যা গন্ধানুভব করছি বলে জানতেছি তা নাম। যা আস্বাদন করতেছি তা রূপ, এবং যা আস্বাদন করছি বলে জানতেছি তা নাম। যা স্পর্শানুভূতি তা রূপ, এবং যা স্পর্শানুভূতি হচ্ছে বলে জানতেছি তা নাম। এভাবে নামরূপকে বিভাগ করে দর্শন করতে সক্ষম হলে তার কাছে দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, পুরুষ, মহিলা, আমি, তুমি, সে, তারা, অমুক, সমুক বলে কোন সংজ্ঞার অস্তিত্ব থাকে না; কেবলমাত্র নামরূপই দর্শন হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদর্শন জ্ঞানও আয়ত্ত্ব হয়ে থাকে। আর সাধক নামরূপের প্রতি বিতৃষ্ণ হওত এরূপ ভাবেন-‘এই নামরূপ আমার নহে, নামরূপে আমি অবস্থিত নহি এবং নামরূপ আমার আত্মা নহে। এই জ্ঞানের স্তরে উপনীত হলে সাধকের অবিদ্যা, তৃষ্ণা নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। এবং সংসারের যাবতীয় দুঃখ অবসান করতঃ নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করাই হল লোকোত্তর জ্ঞান উৎপাদন ও বর্ধনের একমাত্র উপায়। এই বিদর্শন ভাবনা সত্ত্বদিগকে অতিসত্ত্বর লোকোত্তর জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করায় তথা নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আমি অভিজ্ঞা দ্বারা বলতে পারি, বিদর্শন ভাবনা সঠিকভাবে অনুশীলন করা হলে মনচিন্তের মধ্যে অবিদ্যা থাকে না, তৃষ্ণা থাকে না, উপাদান থাকে না, মিথ্যা দৃষ্টি থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ লাভ হওত মনচিন্ত অমরভুবনে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি অনেক ভিক্ষুকে বলতে শুনেছি তারা নাকি বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে না। কারণ তারা চিন্তা করে বিদর্শন ভাবনা করতঃ নির্বাণ প্রাপ্তি হলে তাদের আর সংসারে সুখভোগ করা হবে না। পুনর্জন্ম বন্ধ হয়ে যাবে, ভব ভবান্তরে সুখভোগ করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ধনীকুল, রাজকুলে জন্মধারণ করে রূপ লাভণ্যে ও প্রভূত ধনসম্পদে অধিপতি হওত বিপুল কাম্য সুখ পরিভোগ করা হবে না। তাই তারা বিদর্শন ভাবনা বাদ দিয়ে শমথ ভাবনাই অনুশীলন করে-যাতে পরজন্মে ভব সুখ ভোগ করতে পারে। কিছু সংখ্যক ভিক্ষু আমাকেও সে পথের পথিক হতে উৎসাহিত করতে চেয়েছিল। আমাকে বলেছিল নির্বাণ লাভের জন্য এত তাড়াহুড়ো কিসের? আরো পুনর্জন্ম গ্রহণ করব, ভব ভবান্তরে সুখভোগ করব। বর্তমানে তো তেমন সুখভোগ করা যাচ্ছে না। সকল প্রকার সুখভোগ করার

শেষে নির্বাণ প্রাপ্ত হবো। সেসব হীন, নীচাশয় ভিক্ষুদের কাণ্ড দেখে আমি একাৰ্ণী অরণ্যে অবস্থান করেছিলাম। অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়ে তারা বুঝতে চায় না যে তৃষ্ণাবশীভূত চিন্তে কখনো প্রকৃত সুখ অনুভব হয় না। অতীত জন্মে কতবার যে রাজা, মহারাজা, দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব লাভ করে অভাবনীয় ভবসুখ লাভ করেছিলাম তার কোন ইয়াত্না নেই। তবুও ভোগ সুখের তৃষ্ণা জন্মাচ্ছে। বলা বাহুল্য এই ভোগ বিলাসের দ্বারা কিছুতেই তৃষ্ণাকে নিবৃত্তি করা যায় না। যেমন অগ্নিতে যতই ইন্ধনের উপকরন দেওয়া হয়, ততই অগ্নি বেড়ে উঠে; ঠিক তেমনি ভোগ তৃষ্ণা মেটাবার জন্য যতই ভোগ করা যায় ততই ভোগ তৃষ্ণা বেড়েই চলে যায়। কিছুতেই তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে না। বলা যায়, তৃষ্ণাকে ইন্ধন যোগালে তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অনন্ত দুঃখে পতিত হতে হয় মাত্র।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-বৌদ্ধধর্মের পরম লক্ষ্য নির্বাণ লাভ করতে হলে 'সর্বপ্রথমে নির্বাণের ট্রেনিং নিতে হবে। ট্রেনিং ছাড়া কোন কাজে সফলতা অর্জিত হয় না। যেমন-তোমরা নিশ্চয় জান পুলিশের চাকুরির জন্য প্রথমে পুলিশের ট্রেনিং নিতে হয়; কানুনগো চাকুরির জন্যও কানুনগো ট্রেনিং নিতে হয়; শিক্ষকের চাকুরি লাভের জন্য ট্রেনিং নিতে হয়। ঠিক তদ্রূপ নির্বাণ লাভ করতে হলেও নির্বাণের ট্রেনিং নেওয়ার কোন বিকল্প নেই। তোমাদেরকে নির্বাণের ট্রেনিং নিতেই হবে। সেই ট্রেনিং কি রকম জান? আত্মদমন, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন। আত্মদমন অর্থ মনচিন্ত থেকে আমি বা অহংবোধ ত্যাগ করা। কারণ এই আমি তথা অহং বোধ হতেই অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়ে নির্বাণ গমনের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। আমি ধারণা হতে অজ্ঞান, আমার ধারণা হতে তৃষ্ণা এবং আমিত্ব ধারণা হতে ভ্রান্ত মতের উদয় হয়। তাই আত্ম বা মমত্ববোধ বিদ্যমান থাকলে কিছুতেই নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা যায় না। চিত্তদমন অর্থ চিন্তকে সর্বপ্রকার পাপ, অকুশল মনন ও চিন্তন করা হতে মুক্ত রাখা। চিন্তের স্বভাব ধর্ম অনিত্য ও অস্থির; এক অবস্থায় থাকা সুকঠিন। বলা যায়, সদাসর্বদা পরিবর্তনশীল। চিত্ত উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিলয় হয়ে যায় এবং অন্য চিত্ত এসে সেই স্থান অধিকার করে নেয়। সুতরাং অকুশল কোন চিত্ত উৎপত্তিতে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। বিপথগামী হতে উদ্যত চিত্তকে আর্যমার্গ অনুশীলনে বশানুগত করে নির্বাণের দিকে ধাবিত করাই চিত্তদমন। ইন্দ্রিয়দমন অর্থ ষড়্‌ইন্দ্রিয় দ্বারে কোন প্রকার পাপ উৎপত্তি হতে না দেয়া। বুদ্ধ বাহিয় সূত্রে বলেছেন-হে বাহিয়! তুমি দেখলে দেখতে পার, শুনলে শুনতে পার, অনুমান করলে অনুমান করতে পার কিন্তু তাতে আসক্ত হবে না; তাহলে তুমি সে সবার দ্বারা মন কষ্ট পাবে না। যখন তুমি কষ্ট পাবে না, ক্লিষ্টও হবে না তখন তোমার মন সেখানে থাকবে না। যখন তোমার মন সেখানে থাকবে না তখন তুমি ইহলোকেও নও, পরলোকেও

নও, এবং ইহ-পর উভয় লোকের মধ্যেও নও; ইহাই দুঃখের অন্ত। আবার, ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ শয়ন মধ্যে শায়িত অবস্থায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করে বলেছিলেন হে বৎসগণ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা সংযত করবে। ইন্দ্রিয়গণকে দমন করতে পারলে সহজে নির্বাণরাজ্যে পৌছতে পারবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে নির্বাণের ট্রেনিং কতদিন পর্যন্ত দিতে হবে? এই ট্রেনিং-এ কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। যতদিন পর্যন্ত আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন কাজে সফলতা লাভ না হয় ততদিন পর্যন্ত নির্বাণের ট্রেনিং দিতে হবে। একদিনের মধ্যে যদি আত্ম-চিন্ত-ইন্দ্রিয় দমিত হয় তাহলে একদিনেই নির্বাণের ট্রেনিং সমাপ্ত হবে। আবার এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন হয়ে যায় তাহলে এক সপ্তাহে নির্বাণের ট্রেনিং সমাপ্ত হবে। এইভাবে এক বৎসর, দুই বৎসর হতে শুরু করে পনের বৎসর, ত্রিশ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, সারাজীবন অর্থাৎ আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণের ট্রেনিং দিতেই হবে। অন্যদিকে আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণের ট্রেনিং সমাপ্ত হয়ে যায়। নির্বাণের ট্রেনিং নেয়া সমাপ্ত হলে নির্বাণের শিক্ষা, নির্বাণের উপদেশ, নির্বাণের জ্ঞান পরিপূর্ণ করতে হয়। নির্বাণের শিক্ষা কি রকম? শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা, প্রজ্ঞা শিক্ষা। শীল শিক্ষা দ্বারা ব্যতিক্রম ক্রেশ চিরতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, কটু বাক্য, ভেদ বাক্য, বৃথা (অতি ভাষণ) বাক্য ও মিথ্যা জীবিকা এগুলিকে ব্যতিক্রম ক্রেশ বলা হয়। সমাধি শিক্ষা দ্বারা পর্যটন ক্রেশ নিঃশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা এই পঞ্চনীবরণকে পর্যটন ক্রেশ নামে অভিহিত করা হয়। পঞ্চ নীবরণ সাধনার পথে সর্বদা অন্তরায় ঘটায়ে থাকে। তাই পঞ্চনীবরণকে সাধনার প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রজ্ঞা শিক্ষা দ্বারা অনুশয় ক্রেশ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সপ্ত অনুশয়ই (এখানে) অনুশয় ক্রেশ নামে কথিত। যথা-কামারাগানুশয়, ভব রাগানুশয়, প্রতিষানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয় ও অবিদ্যা অনুশয়। এই সপ্ত অনুশয় চিন্ত প্রবাহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং হঠাৎ অনুকূল নিমিত্ত লাভ করলে তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে-যেন কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতন। এই অনুশয়গুলো সত্ত্বদিগকে সংসার মোহে মুগ্ধ করতঃ দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে দেয়। নির্বাণের উপদেশ কি রকম? সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহকে নির্বাণের উপদেশ বলে জানবে। যথা-চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই কুশলধর্মসমূহ বোধি বা জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য ও পরম সহায়ক বলে

বোধিপক্ষীয় ধর্ম নামে অভিহিত। মনে রাখবে বোধিপক্ষীয় ধর্মে বিচরণ করলে সর্ব দুঃখের অবসান হওত পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। তজ্জন্য সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মকে নির্বাণের উপদেশ বলা হয়। নির্বাণের জ্ঞান কি রকম জ্ঞান? চারি আর্ষসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান। চারি আর্ষসত্য জ্ঞান লাভের ফলে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাদি সহ যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান অর্জন হলে সংসারচক্রে ঘুরে বেড়ানোর কারণ বন্ধ হয়ে যায়। আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভব-ভবান্তরে পুনঃপুন জন্ম ধারণের হেতু একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ হলে সংসার স্রাব তথা বারবার সংসারে আনাগোনা করার তৃষ্ণা নিঃশেষে ধ্বংস হয়। সংসার ভ্রমণের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়ে সংসার দুঃখ হতে চিরমুক্তি লাভ হয়ে থাকে। সর্ব আসব নির্মূল হওত জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-তোমরা সুখ ভোগ পরিত্যাগ কর, কদাচ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করবে না। মনে রাখবে একমাত্র ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শান্তি; ভোগেই দুঃখ, ভোগ দোষপূর্ণ। ভোগ বিষময় অনন্ত দুঃখের আকর, ভোগাসক্ত মন অশেষ প্রকার ক্লেশ উৎপাদনের কারণ হয়ে থাকে। ইতিহাস সাক্ষী, ভোগের আশ্রয় গ্রহণ করে কেহ কোনদিন অনবদ্য সুখ, পরম শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। কারণ ভোগতৃষ্ণা কিছুতেই পূরণ হয় না, সর্বদা অতৃপ্তির হাহাকারে দম্ভ-বিদম্ভ হতেই থাকে। ভোগাসক্ত মন ভোগ লালসায় মুহূর্তে মুহূর্তে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ায়। অফুরন্ত ভোগ্যবস্ত্র প্রাপ্তিতেও তার তৃপ্তি হয়না। ভোগের দ্বারা ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই প্রতিনিয়ত দুঃখ ও অশান্তির শিকার হতেই চলছে। তোমরা ভোগ বিরতি হয়ে অবস্থান কর, মনচিন্তকে ভোগ্যবস্ত্র লাভের চিন্তা হতে মুক্ত করে রাখ। আমি বলছি, তাহলে তোমাদের সুখ লাভ হবে, মনচিন্ত অনাবিল শান্তি, পরম পবিত্রতায় ভরে উঠবে। তোমরা ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়ে অল্পই আহার গ্রহণ করবে। কখনো প্রমাণাতিরিক্ত ভোজন করবে না। সব সময় পাকস্থলীর চারভাগের একভাগ খালী রেখে ভোজন সেরে নিবে এবং বাকী অংশে পানি পান করতঃ দিনাতিপাত করবে। অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র স্থবির বলেছেন-

চারি কিম্বা পঞ্চ গ্রাস পুরিয়ে জলেতে,

ধ্যান রত শ্রামণের সুখ বিহার তরে।

বেশি ভোজন করলে দেহ ও মন আলস্য হয়ে পড়ে। সেই অলস শরীরে ধ্যান-সমাধি অনুশীলন করা যায় না। যেহেতু আলস্যভাবে ধ্যান-সমাধি অনুশীলন করার পরিকল্পনা পরাক্রমকে নষ্ট করে দেয়। আবার প্রতিনিয়ত খুব বেশি

ভোজন করলে কাম রিপূর উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন—‘হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অল্পই ভোজন করবে। আমিও অল্পই ভোজন করে থাকি। অল্প ভোজনে আমার সুখ বিহার হয়, দেহ মনে উৎসাহ ও শক্তি অটুট থাকে এবং নীরোগী হয়ে জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যে ভিক্ষু যত ক্ষুধা তৃষ্ণার পীড়ন সহ্য করতে সক্ষম সেই ভিক্ষু তত বুদ্ধের প্রকৃত শিষ্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ভোগ বিলাস মার্গে পদাচারণ করার অর্থ অনিবার্য পতন ডেকে আনা। ভোগান্বেষণ অধঃপতন ও নীচ মার্গ ছাড়া কিছুই নয়। ইহা জ্ঞান লাভের সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গ।

বৌদ্ধধর্ম মতে যারা মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি অর্থাৎ পৃথগ্জন তারা প্রকৃত সুখের অধিকারী হতেই পারে না। মার্গফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত কারোর পক্ষে লোকোত্তর সুখ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তাদেরকে (প্রায়ই) দুঃখের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে চারি অপায়ে পতনের ভয় সম্পূর্ণ নিরোধ হয়ে যায়। মনচিন্তা এই মার্গফলে অধিষ্ঠিত হলে আর অকুশলকর্মের দিকে ধাবিত হয় না; সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করে থাকে। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করা অর্থ নির্বাণ স্রোতে পতিত হওয়া। যেই স্রোত সর্বোচ্চ সাতজন্মের পর অবশ্যই নির্বাণে পৌঁছে দেয়। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করাকে জীবনুজ্জের প্রথম স্তর বলা হয়। তারপর ক্রমে সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হতে উন্নীত হয়ে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। তাই রাজকুলে জন্মধারণ করতঃ রাজত্ব লাভ, স্বর্গ ব্রহ্মাদিতে গমন, এমনকি ত্রিলোকের অধিপতি হওয়া অপেক্ষা স্রোতাপত্তি ফল লাভই শ্রেষ্ঠ। ভোগের দ্বারা অন্য সব লব্ধ ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্রোতাপত্তি ফলের কোন পতন নেই ক্ষয় নেই। তাতে চারি অপায় গমনের পথ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। সে সदा সর্বদা নির্বাণমুখী স্রোতে প্রবাহমান। তাই পৃথগ্জন রূপে অবস্থান করার চেয়ে নির্বাণ লাভের সর্বনিম্ন সোপান স্রোতাপত্তি মার্গ করা অনেক বেশি উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রাপ্তি।

পরিশেষে তিনি বলেন—আমার উদ্দেশ্যে কি জ্ঞান? তোমাদেরকে অধঃপতনে পতিত হতে না দেওয়া এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় এমন কর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত রাখা। কারণ তোমরা যদি অধঃপতনে পতিত হতে থাক, দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হয়ে জীবন-যাপন কর তাহলে আমি লজ্জিত হই বৈকি। মনে রাখবে অজ্ঞানী হলে দিন দিন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে হয় আর কুশল পরিত্যাগ করতঃ অকুশল সম্পাদন করলে দুঃখই পেতে হয়। তোমাদের অধঃপতনের গতিকে রোধ করে দিয়ে উর্ধ্বপথের সন্ধান দেওয়া এবং দুঃখের পীড়ন মুক্ত করে হৃদয়ে অনাবিল সুখের সুখা বিলিয়ে দেওয়া আমার

পরম ব্রত। তোমরা যদি সর্বদা জ্ঞান ও কুশলের সহিত অবস্থান করতে সক্ষম হতে পার তবে অবশ্যই উর্ধ্বদিকে (মার্গফলাদি) উন্নতি লাভ করতে পারবে, অনাবিল সুখের অধিকারী হতে পারবে। কারণ জ্ঞানের সহিত পুণ্যকর্মে রত থাকলে মনের মধ্যে অকুশল চেতনা থাকতে পারে না। ফলে পুণ্যের নিকট পাপ পরাভূত হয়। যারা পুণ্যকর্ম করে তারা নিম্নগামী হয় না, দুঃখ তাদেরকে গ্রাস করতে পারে না। বুদ্ধ বলেছেন—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অকুশলধর্ম পরিত্যাগ কর, কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ কর তাহলে সর্ব বিষয়ে জয়যুক্ত হবে। বুদ্ধ আরো বলেছেন—প্রজ্ঞা বলে উচ্চতা লাভ করবে, সর্ব ভবকে অতিভব করে উপরে উঠবে। অর্থাৎ জ্ঞান বলে সকল অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে পাপপঙ্ক হতে অনেক উর্ধ্বে বিচরণ করবে এবং কামভব, রূপভব, অরূপভবকে অতিক্রম করে লোকোত্তরে অবস্থান করবে। ভবের মধ্যে মনচিন্তু বিদ্যমান থাকলে পাপ উৎপন্ন হয়, কিছুতেই আর দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তোমরা উচ্চতর সাধনা কর, নিম্নস্তরের সাধনা করবে না। নিম্নস্তরের সাধনায় রত থাকলে বিহারে, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে যেখানে অবস্থান করা হোক না কেন কিছুতেই সুখ লাভ হবে না। সেই সাধনায় দুঃখভোগ ও রোদন করা ছাড়া কিছু থাকে না। তাই সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করে উচ্চতর সাধনা কর। কখনো মনচিন্তুকে নিম্নস্তরের সাধনার দিকে ধাবিত হতে দিবে না। এতেই প্রব্রজিত জীবনের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হওত মহৎ সদর্থ পরিপূর্ণ হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

মিথ্যাদৃষ্টি যত দোষ ও অকুশলের মূল

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—তোমরা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পুন্ডালের কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না, এমনকি তাদের কথায় কর্ণপাতও করবে না। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হতে নিজকে যতদূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই মঙ্গল। মিথ্যাদৃষ্টিকগণ মনে করে আমার অভিমত সবই সত্য, অপর সব মিথ্যা, ভ্রান্ত। তারা নিজের ভ্রান্ত মতকে প্রশ্নাতীতভাবে আঁকড়ে রেখে অন্যজনের যুক্তিসঙ্গত অভিমতকে মিথ্যাবলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। স্বীয় ভ্রান্ত ধারণাসমূহ তারা সর্বদা অপরের নিকট প্রকাশ করতেই থাকে। তাই মিথ্যাদৃষ্টি অতিশয় দুষণীয়। ইহার ন্যায় দুষণীয় কর্ম জগতে আর নেই। বুদ্ধ বলেছেন—“হে ভিক্ষুগণ! আমি মিথ্যাদৃষ্টির ন্যায় দুষণীয় জগতে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যত প্রকার দোষের হেতু একমাত্র মিথ্যাদৃষ্টি।” এই মতবাদে আবদ্ধ হলে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, সারকে অসার, অসারকে সার বলে প্রতীয়মান হয়। আর তখন

সত্যের বিপরীতে মিথ্যামার্গে পরিচালিত হয়ে সুখ ভ্রমে অনন্ত দুঃখ-কষ্টের পীড়ণে কাতর হওয়া ছাড়া কিছুই থাকে না। মিথ্যাদৃষ্টিকগণ কুশলাকুশল, পরকাল, কর্মফল চারি আর্যসত্যের প্রতি বিশ্বাসী নন। স্বীয় অজ্ঞতা হেতু তারা স্বর্গ-ব্রহ্ম, নরকাদির কথা বিশ্বাস করতে পারে না বিধায় সর্বদা অকুশলকর্মে নিজেকে ব্যাপ্ত করে রাখে। উপরন্তু তারা পাপ ধ্বংস করার জন্য তীর্থ ব্রত পালন, তীর্থে স্নান; পুণ্য অর্জনের তাগিদে মানস-ব্রতাদি পালন এবং ধন, বিদ্যা লাভের জন্য কুসংস্কারমূলক লক্ষ্মী, স্বরসতী পূজাসহ বিবিধ অপদেবতার আরাধনা ও পূজা প্রদান করে থাকে। তাই তো মিথ্যাদৃষ্টিকে অন্ধকুসংস্কারের জননী বলা হয়। অন্যদিকে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্নরা কিছুতেই বিয়ে না করে থাকতে পারে না। তারা পুত্র-মুখ দর্শন দ্বারা পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার হবার তাগিদে অনিবার্যরূপে ভার্যা গ্রহণ করে থাকে। তোমাদের মনচিন্তে যদি মিথ্যাদৃষ্টি উদয় হয় তাহলে ভার্যা গ্রহণের জন্য প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহী হতে হবে-কোন সন্দেহ নেই। আবার মনের মধ্যে এরূপ চিন্তাও জাগ্রত হতে পারে যে, “মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে অনর্থক বুঝি প্রব্রজিত জীবন-যাপন করছি? এ জীবন অবলম্বনে সত্যিই কি দুঃখমুক্তি লাভ হবে তথা প্রকৃত শান্তি মিলবে? আমার দ্বারা কৃত ধ্যান, সমাধি, কুশলকর্মের সুফল লাভ হবে তো! নাকি অনর্থক সময় ক্ষেপণ করছি? আমি জীবনকে প্রব্রজ্যা নামক নিঃরস, দুঃখের কাছে সমর্পণ করলাম না-তো? সত্যিই কি আমি গৃহীদের অপেক্ষা সুখের অধিকারী হয়েছি?” ইত্যাদি হাজারো দুষ্টিন্তার মুখোমুখি হয়ে তার সদুত্তরের সমাধান খুঁজে বের করতে নিজেকে কঠিন পরিস্থিতির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। তাই মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্নমূলক আচার-আচরণ, বাক্যালাপ, চিন্তন এবং মনন করা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। সেরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্নমূলক কর্ম, বাক্য, মনন পরিত্যাগ করতঃ সর্বদা সম্যকদৃষ্টিমূলক কর্ম-বাক্য-মননে অনুশীলন করতে চেষ্টাশীল হয়ে অবস্থান করবে। তাতে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারবে না এবং পূর্বে উৎপন্ন হওয়া মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মনচিন্তা নির্বাণ স্রোতে পতিত হওত স্রোতাপত্তি মার্গ লাভে সমর্থ হবে।

তোমরা অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টির বশীভূত না হয়ে সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। সংসারে সুখ ভোগের লিপ্সায় নিজেকে আবদ্ধ করো না। এই সংসারে সুখ ভোগের বাসনা করলে মনচিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা উদয় হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দুঃখোৎপত্তির কারণও সৃষ্টি হয়। কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণাভিভূত মনচিন্তে ত্যাগ, সংযম আচরণের কোন অবকাশ থাকে না; সর্বদা সুখ ভোগে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষার কোন শেষ নেই, পরিতৃপ্তি নেই। বরঞ্চ প্রবল হতে প্রবলতর হতেই থাকে। ফলশ্রুতিতে সেসব অদমিত

আকাজ্জাক্কে মিটাতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি নিজের বিবেক, সং জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়ে অন্যায় পথে পা বাড়াতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির সংসারে সুখের আশা ও ভোগের বাসনা উভয়ই পরিত্যাগ করতঃ পরম সুখ নির্বাণ লাভের প্রত্যাশী হয়। তাঁরা সংসারে সুখ ভোগ করাকে অসার এবং অনন্ত দুঃখকে আলিঙ্গন করা বলেই জানে। এভাবে তাদের জ্ঞানচক্ষু পরিস্ফুট হয়ে থাকে। মনচিন্তে সুখ ভোগের ইচ্ছা কখনো স্থান পায় না। তোমাদেরকেও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা সেই প্রকৃত সত্যকে যথাভূতরূপে জানতে, বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তবেই আসল সুখের সন্ধান মিলবে—অন্যথায় নয়।

শ্রদ্ধেয় ভগ্নে বলেন—বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষুরা কিভাবে প্রব্রজিত হতো জান? তারা এরূপ জ্ঞান করে প্রব্রজিত হতো “আমি দুঃখে অবতীর্ণ হয়েছি, দুঃখগ্রস্ত হয়েছি, কাজেই সেই দুঃখ হতে চির বিমুক্তি জন্য আমাকে প্রব্রজিত হতেই হবে।” সেইরূপে প্রব্রজিত হয়ে তারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করত। বাস্তবিক, প্রব্রজ্যধর্মে দীক্ষিত হবার আসল উদ্দেশ্য হল আশু দুঃখমুক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাদি দুঃখ থেকে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায় সেই পন্থা অবলম্বন করতে এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার তাগিদে প্রব্রজিত হওয়াকে সঠিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ বলা চলে। জ্ঞানী ব্যক্তির সেরূপ সত্যদ্রষ্ট প্রব্রজিত জীবনকে ‘প্রকৃত প্রব্রজ্যা গ্রহণ’ বলে অভিহিত করে থাকে। তজ্জন্য তোমাদেরকেও বলছি, তোমরা সর্বদা দুঃখ হতে মুক্তি লাভের উপায় তথা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। প্রব্রজিত হয়ে কখনো লাভ-সংকার, সুনাম-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ খ্যাতি লাভের পিছনে ছুটে বেড়াবে না। তাহলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করার আশা সুদূর পরাহত হবেই বলে জানবে। মনে রাখবে শীল সমাধি প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি জ্ঞান-দর্শন লাভ করতে সক্ষম হলে তবেই প্রব্রজিত জীবনের সার্থকতা অর্জিত হয়। সাথে সাথে প্রব্রজিত হবার উদ্দেশ্য শতভাগ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোন সাধক যদি বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন তথা প্রজ্ঞা লাভ করতে সমর্থ না হয়ে শুধুমাত্র শীল, সমাধি লাভী হন তাহলে তার অবস্থানকেও নিরাপদ বলা যায় না। কারণ শীল, সমাধি লাভের ফলে চিন্তে সাময়িক সুখ ও সাম্যভাব বিরাজ করে বটে, কিন্তু দুঃখের চির অবসান ঘটে না। উপরন্তু শীল, সমাধি লাভ করার দরুন লাভ সংকার বৃদ্ধি পাবার হেতুতে মনচিন্ত ভুলপথে ধাবিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেই অবস্থায় প্রজ্ঞা লাভ করে দুঃখমুক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করা দূরের কথা, বরং ক্রমান্বয়ে শীল সমাধি হতেও বিচ্যুতি ঘটে। তখন আর শত চেষ্টা করেও সেই ভ্রান্ত পথে ধাবিত চিন্তকে সম্যকপথে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। বুদ্ধের সময়কালীন দেবদত্তের কথা ধরা যাক। সে (প্রজ্ঞা পূরণ করতে ব্রতী না হয়ে) শীল সমাধি পূরণ করার ফলে অলৌকিক শক্তি লাভ

করতঃ প্রভূত লাভ-সৎকারের অধিকারী হয়েছিল। আর সেই লাভ-সৎকার, যশ-কীর্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহে অন্ধ হয়ে নিজকে বুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার এবং প্রমাণ করার জন্যে সে বিবিধ অপকৌশল অবলম্বন করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। এমন কি ভগবান বুদ্ধকে হত্যা করে নিজকে বুদ্ধরূপে জাহির করার জন্য কতো প্রকার কুচক্রান্তেই না মেতে উঠে ছিল। ফলশ্রুতিতে বুদ্ধের চরণে রক্তপাত ঘটায় অসীম মহা নিরয়গামী হয়েছিল।

ধর্ম শব্দটা আসলে কি এবং কর্ম শব্দটা আসলে কি? এসব বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। আবার, কোন ব্যক্তি কিরূপ কর্ম আচরণে অভ্যস্ত এবং কোন ব্যক্তি কিরূপ ধর্মে রুচিশীল সেসব জানাও খুব জটিল একটি ব্যাপার—যা ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতার আলোকে কিছুতেই বুঝা সম্ভব পর নয়। সেই সব গভীর তত্ত্বকে যথাযথভাবে জানতে হলে অসাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন। আমার সুদীর্ঘ সাধনার অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট যে, জগতের অধিকাংশ লোক (প্রায় সকলে) লোভ, দ্বেষ, মোহমূলক ধর্ম আচরণে রুচিশীল। তারা লোভ, দ্বেষ, মোহের দ্বারা হীন সুখভোগ লাভের প্রত্যাশী। অন্যদিকে সংসারে সুখ ভোগ করার জন্য তারা অবিরত মনুষ্যধর্ম সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু মনুষ্যকর্ম ও মনুষ্যধর্ম আচরণের মাধ্যমে কিছুতেই প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। বরং জ্ঞানীগণের নিকট মনুষ্যকর্ম ও মনুষ্যধর্ম দুঃখ এবং পাপ বলে বিবেচিত। তাই তারা নিজকে সে সব হতে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু অজ্ঞানীরা মনুষ্যকর্ম ও মনুষ্যধর্ম আচরণ করে নিজকে নিজে দুঃখিত ও পীড়িত করিয়ে থাকে। তারা লোভ, দ্বেষ, মোহমুক্ত পরমার্থ সুখের আকর লোকোত্তরধর্মকে জানতে পারে না, দেখতেও পায় না। তাদের মনচিন্তে লোভ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত পরমার্থ ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ তারা মনচিন্তে হতে লোভ, দ্বেষ, মোহ বিতাড়িত করে তৎস্থানে অলোভ, অদ্বেষ, অমোহকে স্থান করে দিতে সমর্থ হয় না। যার ফলে তাদের মনচিন্তে লোভ, দ্বেষ, মোহে পরিপূর্ণ। বলা বাহুল্য যে, লোভ, দ্বেষ, মোহ সমন্বিত কলুষিত মনচিন্তাকে কিছুতেই অলোভ, অদ্বেষ, অমোহমূলক লোকোত্তরধর্মের রঙে রাঙানো সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সেই সকল কলুষিত চিন্তে লোকোত্তরধর্ম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। মনে রাখবে তোমাদের মনচিন্তে লোভ, দ্বেষ, মোহকে স্থান করে দিলে অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কিছুতেই বিদ্যমান থাকতে পারবে না। তাই তোমাদেরকে জ্ঞানের সহিত বিচার করতে হবে মনচিন্তের মধ্যে লোভ, দ্বেষ, মোহকে স্থান করে দিবে, নাকি অলোভ, অদ্বেষ, অমোহকে স্থান দিবে? লোভ, দ্বেষ, মোহকে স্থান দিলে কখনো লোকোত্তর সুখের অধিকারী হতে পারবে না। বরঞ্চ অসহনীয় বর্ণনাভীত দুঃখকে বরণ করে নিতে হবে। আর সর্বদা অনুতপ্ত হৃদয়ে দক্ষ-বিদক্ষ হতে হতেই দিনাদিপাত করতে হবে। যা ইহলোকে ভীষণ দুঃখ, যাতনা প্রদান

করবে এবং জীবনাবসানে পরলোকে নরকাদি মহাদুঃখে নিষ্কেপ করে থাকবে। অপরংক্ষে মনচিন্তে অলোভ, অদ্বेष, অমোহকে স্থান করে দিলে সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন হওত পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। যা সর্ব দুঃখ গত এবং পরম ও চরম সুখের অবস্থা। সেই অবস্থায় চিত্ত সারাক্ষণ লোকোত্তর সুখের সাগরে স্নাত থাকে, পবিত্র অনন্ত সুখের অধিকারী হয়ে মনচিন্তা আনন্দিত ও প্রমোদিত হয়। সেই আনন্দের কোন তুলনা নেই, নেই সীমা, পরিসীমা।

তিনি আরো বলেন—বৌদ্ধধর্ম মতে, ধর্ম করলেও মুক্ত হতে পারে না, কর্ম করলেও মুক্ত হতে পারে না। কারণ যে কোন কারণে কর্ম সম্পাদন করা হোক না কেন তার সুফল কিম্বা কুফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম ধারণ করতেই হয়। অপর দিকে ধর্ম (বা কুশলকর্ম) সম্পাদন করলেও তার কুশল বিপাক ভোগ করার জন্য পুনঃ জন্ম গ্রহণ করতে হয়। বলা যায়, এক একটি কর্ম এক একটি পুনর্জন্ম ধারণের বীজ স্বরূপ। যত বেশি কর্ম সম্পাদন করা হয় ততই বেশি পুনর্জন্ম গ্রহণের বীজ বপিত হয়ে থাকে। ধর্মের বেলায়ও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। তাই দুঃখমুক্ত নির্বাণ লাভেচ্ছুকদেরকে ধর্ম ও কর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত থাকতে হবে। এবং পুনর্জন্ম বৃদ্ধিকারক সকল প্রকার কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে জন্মকে চিরতরে নিরোধ করতেই হবে। নতুবা কিছুতেই জন্ম-মৃত্যুকে বন্ধ করতঃ নির্বাণ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। মনে রাখবে, ধর্ম ও কর্ম সম্পাদন করা হতে নিজকে মুক্ত রাখাই হল তোমাদের আদি কর্তব্য। যেহেতু ধর্ম (দানাদি কুশল অর্জন) করলে ও মুক্তি নেই (অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করা হতে রেহাই নেই), কর্ম সম্পাদন করলেও মুক্তি নেই। বরং ধর্মের ও কর্মের অধীন হয়ে অবস্থান করতে হয়। তোমরা ধর্মেরও অধীন হয়ে অবস্থান করো না আর কর্মেরও অধীন হয়ে অবস্থান করো না। কারণ ধর্মের অধীন হয়ে অবস্থান করা এবং কর্মের অধীন হয়ে অবস্থান করা উভয়ই দুঃখ, পাপ বলে পরিগণিত হয়। সেই অবস্থায় কিছুতেই পরম সুখ নির্বাণ উপলব্ধি হতে পারে না। জগতের সত্ত্বগণ বিবিধ কর্ম সম্পাদন করতঃ কর্মের অধীন হয়ে অবস্থান করতেছে। এবং ইহ-পর লৌকিক মঙ্গল কামনায় ধর্ম (পুণ্যাদি) সম্পাদন করার মধ্যে নিজকে নিয়োজিত রেখে ধর্মের অধীন হয়ে অবস্থান করতেছে। তাদের সেই ধর্মের অধীন ও কর্মের অধীন অবস্থা সবই মারভুবন। অন্যদিকে মারভুবনে ধর্ম করলেও মুক্ত হওয়া যায় না, কর্ম করলেও মুক্ত হওয়া যায় না। তাই মারভুবনের মধ্যে তারা কি ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করতঃ বার বার জন্মধারণ করে জন্ম-মৃত্যুর মতন বিবিধ দুঃখ ভোগ করতেই থাকবে? ধর্ম ও কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বার বার ভবচক্রে ঘুরপাক খাওয়া সত্যিই দুঃখদায়ক। আবার এই পন্থা অবলম্বন করা হলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথও দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। কাজেই তোমরা

(নির্বাণ লাভেচ্ছুকগণ) ধর্মের থেকেও মুক্ত হও, কর্মের থেকেও মুক্ত হও। তাহণে আর ধর্ম ও কর্মের অধীন হয়ে থাকতে হবে না এবং জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে বারবার ভবচক্রে ঘুরে বেড়ানোও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যাদের মনচিন্তা কামলোক, রূপলোক, অরূপলোকের মধ্যে সুখ ভোগ করার প্রত্যাশা করে তারা কিছুতেই নিজেকে ধর্ম ও কর্ম হতে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয় না। উপরন্তু তারা সর্বদা ধর্ম ও কর্ম সম্পাদনের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে থাকে।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হল, পরধর্ম না করা এবং পরকর্ম না করা। নিজ ধর্ম (সদ্ধর্ম) ও নিজ কর্ম করা। যে সমস্ত ধর্ম কর্মের দ্বারা অবিদ্যা, তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়ে পুনঃপুন জন্মধারণ করতে হয় তা' পরধর্ম ও পরকর্ম নামে অভিহিত। অন্যদিকে যে সমস্ত ধর্ম কর্মের মাধ্যমে অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয় হয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং চিরতরে নিরোধ বা নিবৃত্তি ঘটে তা' নিজধর্ম ও নিজকর্ম। মনচিন্তার মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকলে বাধ্য হয়েই পরধর্ম, পরকর্মে নিয়োজিত হতে হয়। অবিদ্যা তৃষ্ণা বিদূরিত হয়ে জ্ঞান উদয় হলে তবেই পরধর্ম ও পরকর্ম হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তখন মনচিন্তে সর্বদা নিজধর্ম ও নিজকর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং পরধর্ম, পরকর্ম কিছুতে স্থান করে নিতে পারে না। তবে সকলের পক্ষে পরধর্ম ও পরকর্ম পরিত্যাগ করে নিজধর্মে, নিজকর্মে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, নিজধর্ম বা সদ্ধর্ম লাভ করা দুষ্কর; আর সদ্ধর্ম শ্রবণ করাও দুর্লভ। যেহেতু সদ্ধর্ম আচরণ করলে নিজেকে জাগতিক সুখ ভোগ করা হতে বিরত রাখতে হয়। জাগতিক সুখ ভোগের মধ্যে সদ্ধর্মের লেশ মাত্রও নেই। জাগতিক সুখ ভোগ প্রত্যাশী হলে নিজেকে সদ্ধর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব হয় না। সদ্ধর্ম অর্থ যা আচরণের মাধ্যমে যাবতীয় সুখ ভোগ পরিত্যাগ করা যায় এবং যা লাভের সঙ্গে সঙ্গে চিন্ত থেকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-নির্বাণে ধর্মও নেই, কর্মও নেই। ধর্ম (কুশলাদি) সম্পাদন করলে যেমন পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়, তেমনি কর্ম সম্পাদন করলেও পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। বলা যায় ধর্ম সম্পাদন করলেও (আশু) নির্বাণ লাভ করা যায় না; কর্ম সম্পাদন করলেও নির্বাণ লাভ করা যায় না। তোমরা ধর্ম-কর্ম উভয়ই পরিত্যাগ কর। আশু দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রত্যাশীদেরকে ধর্ম করাও বন্ধ করতে হবে, কর্ম করাও বন্ধ করতে হবে। তাদের কর্তব্য হল পুনর্জন্মের জননী সদৃশ ধর্ম-কর্মসমূহকে ক্ষয় করা, ধ্বংস করা এবং পুনর্জন্ম নিরোধ করা। তাই অন্যান্য ধর্মের মত যেখানে ধর্ম-কর্ম করতেঃ স্বর্গ ব্রহ্মলোকে গিয়ে সুখ ভোগ করতে উপদেশ প্রদান করে বৌদ্ধধর্ম সেখানে ধর্ম-কর্ম করা হতে বিরত থেকে কর্মক্ষয় এবং পুনর্জন্ম নিরোধ করতে উপদেশ দেয়। এটাই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম

তাৎপর্য বা আলাদা বৈশিষ্ট্য। মনে রাখবে ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ করতঃ কর্মকে ক্ষয়, ধ্বংস এবং পুনর্জন্মকে নিরোধ করতে সমর্থ হলে তবেই নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। তজ্জন্য কর্মকে ক্ষয় ধ্বংস করে পুনর্জন্ম নিরোধ করতে পারাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলা হয়। অন্যথায় নির্বাণ লাভের কোন উপায় নেই বলে জানবে। তোমরা সেই উপায়কে গ্রহণ করতে পারবে কি? যারা জ্ঞানী ও সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন তারা অবশ্যই পারবে; না পারার কোন কারণ নেই। আমি সফলকাম হতে পেরেছি। আমাকে উপমা করে তো তোমরা সেই উপায় অবলম্বন করতে পার। তাহলে অবশ্যই সেই উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য হতে পারবে। তাই আবার বলছি, তোমরা অতিসত্ত্বের নির্বাণ লাভের উপায় অবলম্বনে যত্নশীল হও। আর নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

দেহই সর্ববিধ দুঃখ ও ভয়ের কারণ

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা মূর্খ না হয়ে পণ্ডিত হতে যত্নশীল হও। কখনো মূর্খতা আচরণ করবে না। মনচিন্তের মধ্যে মূর্খতা ভাব ও মার বিদ্যমান থাকলে পাপ অকুশলে রমিত হওত ভোগাসক্তে মেতে উঠতে ইচ্ছা জন্মে। তোমরা যদি শুন যে, অমুক ব্যক্তি খুব বেশি অকুশলকর্ম সম্পাদন করে চলছে তাহলে জানবে সে মূর্খতা বশত মারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আর মার প্রভাব বশীভূত চিন্তে পাপকর্মকে সুখ ও মঙ্গল দায়ক বলে ধরে নিয়ে তা' সম্পাদনে ব্যস্ত রয়েছে। মার আচ্ছন্ন চিত্ত এভাবে সত্যে বিপরীতে মিথ্যার দিকেই ধাবিত হয়। তাই বলি তোমরা অতিসত্ত্বের পণ্ডিত হতে চেষ্টাশীল, অধ্যবসায়ী হও। পণ্ডিত হতে পারলে মনচিন্তের মধ্যে মার থাকতে পারবে না বা স্থান করে নিতে পারবে না। যার ফলে অকুশল পাপকে আর সুখ বলে মনে হবে না। বরং অহিত, অমঙ্গল, বিপদ আনয়নকারী এবং সীমাহীন দুঃখদায়ক বলে জানবে। মনে রাখতে হবে যে, মার প্রবল মনচিন্তা মিথ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে অতি উৎসাহ, আনন্দের সহিত পাপকর্মে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত হয়। যার চিন্তকে মার একবার অধিকার করে বশে তার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সেই মার অধিকৃত চিত্ত সর্বদা কুকর্মে, কুবাক্যে, কুচিন্তায় প্ররোচিত হয়ে ভয়ানক দুঃখপূর্ণ নরকে পতিত করায়। তজ্জন্য মূর্খতা ভাব পরিহার করে তোমরা পণ্ডিত হয়ে যাও। মাররাজ্য অতিক্রম করে নির্বাণরাজ্যে চলে এসো। পণ্ডিতেরা মাররাজ্যের ভিতরে অকুশল ও অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে না থেকে বীর বিক্রমে মাররাজ্য অতিক্রম করতঃ নির্বাণ চলে আসে। মূর্খের (উপযুক্ত) স্থান হল মাররাজ্য আর পণ্ডিত জ্ঞানীদের স্থান হল নির্বাণরাজ্য।

পণ্ডিত কাকে বলে? বাংলা, ইংরেজী ভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা (ধর্মীয়) বক্তৃতা দিতে পারলে তাকে পণ্ডিত বলা যায় না। তর্কের দ্বারা অপরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে সমর্থ হলেও তাকে পণ্ডিত বলা চলে না। বরং যিনি সহনশীলতা, জীবে দয়ালা, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমা-মৈত্রীপরায়ণ এবং নিজকে সর্বদা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম তিনিই পণ্ডিত। ভগবান বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুমমূলে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত একমাত্র ক্ষমা-মৈত্রী গুণেই মারকে পরাজিত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মতে মৈত্রীই হল মারকে পরাজিত করার সর্বোত্তম অস্ত্র। নিজকে অক্ষুন্ন রাখার অর্থ হল ক্ষুন্ন মনে না থাকা অর্থাৎ সর্বদা প্রীতিসিক্ত অন্তরে আনন্দের সহিত অবস্থান করা। মনোকষ্ট, মনঃস্তাপ, দৌর্মনস্য ভাবকে কিছুতেই মনের মধ্যে স্থান না দেওয়া। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা অষ্ট লোক ধর্মে কল্পিত না হয়ে সর্বাবস্থায় খুশিমনে থাকা। মনে রাখবে অজ্ঞানী মূর্খ জনসাধারণের নিন্দা-প্রশংসার কোন মূল্য নেই। তাদের দ্বারা তোমরা নিন্দিতও হতে পার, প্রশংসিতও হতে পার। তারা তোমাদেরকে খুব বেশি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তোমাদের কোন লাভ হবে না। আবার তোমাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য ভাষায় নিন্দা, অপবাদ, দুর্নাম রটালেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। দিনে দিনে পাণ্ডিত্য অর্জন করাই হল তোমাদের আসল কর্তব্য। কোন প্রকার কালক্ষেপণ না করে তোমরা মনচিন্ত থেকে মূর্খতা ভাবকে বিতাড়িত করে দাও। স্মরণ রাখবে, চিন্তের মধ্যে মূর্খতা ভাব থাকলে কিছুতেই মাররাজ্য অতিক্রম করে নির্বাণরাজ্যে পৌছা সম্ভব নয়। মূর্খব্যক্তি আপন পর উভয়ের অমিত্র তথা শত্রু বলে জানবে। তারা অনর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখসৃষ্টিকারী, বিপদ আনায়নকারী। জগতে যত প্রকার দুঃখ পেতে হয় তৎসমস্ত এ' মূর্খের দরুন। তারা নিজেরা যেমন দুঃখের ভিতর দিয়া দিনাতিপাত করতে থাকে তেমনি অন্যদেরকেও দুঃখ প্রদান করেই চলে। তাই মূর্খের দ্বারা কিছুতেই সুখ লাভের আশা করা যায় না। ভগবান বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ ঘটলেও মূর্খব্যক্তির পক্ষে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ তাদের হিতাহিত কোন জ্ঞানই থাকে না। কোন পথ অবলম্বনে প্রকৃত সুখ লাভ হয় আর কোন পথ অবলম্বনে দুঃখ পেতে হয় সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বুদ্ধ বলেছে—

যদ্যপি সহস্র মূর্খ থাকে একস্থান,

তথাপি না হয় এক পণ্ডিত সমান।

পুঞ্জ পুঞ্জ তারা না হরে আঁধার,

একচন্দ্র আলোক করে জগত সংসার।

পূর্ণিমার রাতে আকাশে উথিত চন্দ্রের ন্যায় তোমরা জ্ঞানের আলোকে স্বউজ্জ্বল হয়ে অবস্থান কর। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হলে লোকান্তর সুখের

সন্ধান মিলে। আর তখন অজ্ঞানের পঙ্ক কিছুতে মনচিন্তকে কলুষিত, কলঙ্কিত করতে পারে না। জ্ঞানরূপ পর্বতে আরোহণ করতঃ পাপপঙ্ক হতে নিজকে মুক্ত রাখ। মনচিন্তকে নিলগতি হতে না দিয়ে উর্ধ্বগতিতে নিয়ে চল এবং সংসারের পাপপঙ্ক হতে অনেক উর্দ্ধে (লোকোত্তরে) বিচরণ কর। তাহলে তোমাদেরকে পাপপঙ্ক কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না। সমস্ত পাপপঙ্ক হতে বিমুক্ত থাকা অবস্থাকে বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। তাই বুদ্ধরূপী সিদ্ধার্থ বলেছিলেন-

পঙ্কজ হইব পঙ্কেতে রইব

পঙ্ক না মাখিব,

মেঘে সাঁতারিব চন্দ্রমা হইব

আলোকিব বিশ্বভূমি।

বুদ্ধরূপী মহাসূর্য উদিত না হলে জগত অবিদ্যা অন্ধকারে আবৃত থাকে। বুদ্ধসূর্যের আলোক ব্যতীত নির্বাণ মার্গ দেখা যায় না। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে দুঃখমুক্তির মার্গ উন্মোচিত হয়। সেই মার্গ অনুসরণ করে জগতদ্বাসী জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাদি দুঃখের চির অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়। একমাত্র বুদ্ধের উপদেশে, নির্দেশে মোহাচ্ছন্ন দুঃখমুক্ত সত্ত্বগণের জ্ঞানচক্ষু পরিস্ফুট হয়ে থাকে। তারা অজ্ঞান আবৃত জীবনে জ্ঞানের আলোক লাভ করতঃ মুক্তিপথ খুঁজে পায়; সত্যপথ নির্ধারণে সমর্থ হয়, অমৃতময় ধর্মের ছোঁয়া লাভ করে এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। সর্বোপরি লোভ-দ্বেষ-মোহ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনটি কারণে জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। যথা-(১) নিজের বিমুক্তি (২) পারমী পূরিত সত্ত্বগণের বিমুক্তি (৩) পশ্চাদনুগামী সত্ত্বগণের পারমী সঞ্চয়ের হেতু উৎপাদন করতে। তাই বুদ্ধের আবির্ভাবে জগত ধন্য হয়, পবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেন-তোমরা লৌকিকধর্ম ত্যাগ করে লোকোত্তরধর্ম গ্রহণ কর। লোকোত্তরধর্মে সন্তরণ করাই তোমাদের (বৌদ্ধদের) পরম ও চরম লক্ষ্য। মনে রাখবে লৌকিকধর্মের মধ্যে পাপ থাকে, লৌকিক সুখের মধ্যে দুঃখ সংমিশ্রণ থাকে, তাই লৌকিকধর্ম অনার্য পাপ। তা' পরিণামে দুঃখই প্রদান করে। লোকোত্তরধর্ম পুণ্য, সুখ এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্তর লাভের পূর্ণ গ্যারান্টিতে ভরপুর। জ্ঞানীরা লৌকিক সুখ ত্যাগ করে লোকোত্তরধর্মে দীক্ষিত হন। তোমরাও এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও “আমরা লোকোত্তরধর্ম গ্রহণ করব, এতে আমাদের পরম সুখ নির্বাণ লাভের পথ সুগম হবে। সর্বদা নৈর্বাণিক সুখের মধ্যে অবস্থান করতে সক্ষম হবো। কখনো লৌকিকধর্ম গ্রহণ করব না, লৌকিকধর্ম হতে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখব।” কেন প্রব্রজিত হয় জানো? অবিদ্যার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হতে। কারণ কতদিন যাবত সংসার অন্ধকারে

অন্ধ অবস্থায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা যায়? জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট এ'দুঃখ কখনো গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। বুদ্ধ বলেছেন, অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও তোমরা কেন জ্ঞান আলোর অন্বেষণ করতেছ না? তাই বলি, তোমরা জ্ঞান লাভ করতে এবং তৃষ্ণামুক্ত হতে সত্ত্বর অধ্যবসায়ী হও। অন্ধকার স্বরূপ রাগ, ঘেঘ, মোহ, তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর। যার নিকট রাগ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই এবং তৃষ্ণা নেই সেই ব্যক্তি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওত পরম সুখে অবস্থান করে। মনে রাখবে মনচিন্ত হতে অবিদ্যা অন্ধকার বিদূরীত হয়ে গেলে জ্ঞানের আলো প্রকাশিত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখমুক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু জ্ঞানের আলো ছাড়া দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ অচিন্তনীয়।

চাকমা কথায়—“মানুচ্য ন-অনা, মানুচ্যলোই ন-থাণা; মিলে মরত ন-অনা, মিলে মরতোই ন-থাণা। মানুচ্য, মিলে মরত ন-অলে, ন-থেলে সুগ হয়, দুগত্ত্বন মুক্ত হই পারে। ম লগে লগে কঅ মানুচ্য আর ন-অভং, মিলে মরত ন-অভং; মানুচ্য ন-থেবং, মিলে মরতোই ন-থেবং। ইয়ানরে বুদ্ধধর্ম কয়। মানুচ্যলোই থেলে, মিলে মরত থেলে, মানুচ্য অলে, মিলে মরত অলে বুদ্ধধর্ম ন-পারিব।” অর্থাৎ ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ সকল ধারণা মনচিন্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে অজ্ঞান, পাপ, দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিছুতেই দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটেনা। অন্যদিকে সে ধারণাসমূহ মনচিন্তে স্থান না দিলে, চিন্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হয়। তাই বৌদ্ধধর্মের রসান্বাদ করতে হলে সে সকল ধারণা পরিত্যাগে যত্নশীল হতে হয় সর্বতোভাবে। কারণ ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’, ‘মহিলা’, ধারণাসমূহ ভ্রমদৃষ্টি সম্ভূত; দুঃখ, পাপ সৃষ্টিকারী। বুদ্ধ বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মনচিন্তে মানুষ, স্ত্রী-পুরুষের প্রবৃত্তিসমূহ বিদ্যমান থাকবে ততদিন জানবে তোমরা নির্বাণ লাভ করতে পারনি। নির্বাণ লাভীদের চিন্তে মানুষ, স্ত্রী, পুরুষের প্রবৃত্তি অকল্পনীয়। নির্বাণ লাভ হলে মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ, এবং আমি, আমার, আমিহু ধারণার অস্তিত্ব থাকে না। বৌদ্ধধর্মের মতে মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ সবই মিথ্যা। এ'ধর্ম মনচিন্ত থেকে ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ প্রবৃত্তিগুলো উচ্ছেদ সাধন বা ধ্বংস করতে শিক্ষা দেয়। তোমরা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরনের মাধ্যমে ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এবম্বিধ প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন কর। মনে রাখবে বৌদ্ধধর্মে মানুষ, সত্ত্ব, জীব, পুরুষ, মহিলার প্রবৃত্তি থাকতে পারে না। যদিও বা অন্যান্য ধর্মের মতে এ' প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান থাকতে কোন দোষের নয়।

শ্রদ্ধেয় ভক্ত আরো বলেন—শরীর বা দেহকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। আজকে হয়ত সুস্থ, সুন্দর রয়েছে বটে কিন্তু আগামী কালকেও এর ক্ষণভঙ্গুরতা প্রকাশিত বা বিকার প্রাপ্ত হতে পারে। কুম্ভকারের মৃন্ময়পাত্রের ন্যায় মুহূর্তেই

দেহের বিপত্তি ঘটে। আবার এ' দেহ অশুচি, ঘৃণিত, দুর্গন্ধময় পদার্থে পরিপূর্ণ। বত্রিশ প্রকার ঘৃণ্য বস্তু ছাড়া পবিত্র, সুন্দর সারবস্তু কিছু নেই দেহের মধ্যে। নবদ্বার দিয়ে সর্বদা 'অশুচিসমূহ নির্গত, নিঃসৃত, স্রাবিত হতেই থাকে। জীবিত হোক বা মৃত হোক এ'দেহ সর্বাবস্থাতে অশুচি ও ঘৃণিত। তাই দুর্গন্ধময় অশুচি, গলিত ঘৃণ্য বস্তুতে পূর্ণ দেহখানি জ্ঞানীর চক্ষে খুবই নিন্দিত। কিন্তু অজ্ঞানীদের চক্ষে অতিশয় প্রিয়, মনোজ্ঞ ও আদরনীয়। দেহকে নিয়ে অজ্ঞানীদের আনন্দ, গর্বের সীমা নেই। স্নো, পাউডার সহ বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী মেখে তারা অশুচি, দুর্গন্ধে ভরা, গলিত দেহে শোভা বর্ধনে আগ্রহশীল। এবং অশুচি দেহের প্রতি মোহিত, অনুরক্ত, আসক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা দেহকে পরিপক্ব ব্রণ তুল্য জ্ঞান করতঃ পরিত্যাগ করে থাকে। অন্যদিকে এ'দেহ বিবিধ দোষে ভরা, রোগের আলায় ও দুঃখের পুঞ্জ বিশেষ। নিত্য একটা না একটা রোগ দেহে বিদ্যমান থাকে। তার উপর ক্ষুধা-পিপাসা, ডংস মশকের উৎপাত, শীত-গ্রীষ্মের অসহ্য তাড়না এবং অপরের দ্বারা লাঞ্চিত, অপমানিত, প্রহারিত, নিহত হওয়া সবই দেহধারণের দরুন ঘটিয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-দেহ একটা শত্রু। এ'দেহ শত্রুকে যারা প্রত্যহ উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ভোজ্য পরিবেশন করতঃ সেবা যত্ন করতেছে তারা শত্রুকেই পোষণ করতেছে বলে জানবে। হ্যাঁ, ভগবান বুদ্ধ ঠিকই বলেছেন সত্যিই তো দেহ আমাদের শত্রু। দেহধারণের দরুনই আমাদেরকে সর্বদা সীমাহীন অসহ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে বৈকি! দেহ আমাদের জন্য দুষ্কপোষা সর্প সদৃশ। তাই দেহই আমাদের সর্ববিধ দুঃখ, ভয়ের কারণ। দুঃখদায়ক সেই দেহধারণ না করলে দুঃখ কোথা হতে উৎপন্ন হবে? মনে রাখবে দেহের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করেই নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে হয়। দেহকে নিয়ে উপভোগে রত হলে নির্বাণ সুখ উপলব্ধ হয় না। যিনি দেহকে বিষ্ঠার ঘট তুল্য বিসর্জন দিতে পারেন তিনিই নির্বাণ সুখ লাভে সমর্থ হন।

বৌদ্ধধর্ম মতে জীব দেহে সত্ত্ব, আত্মার অবস্থান কল্পনা মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক। এবং সত্ত্ব, আত্মা, আমি, আমার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করাও নিরর্থক। আর এ'মতাদর্শ দ্বারা অন্যান্য ধর্ম হতে বৌদ্ধধর্মের প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব লাভ করতে হলে চাই সে সকল ভ্রান্তমত হতে বিমুক্ত থাকা। তাই তোমরা বৌদ্ধধর্মের চরম ও প্রম লক্ষ্য নির্বাণ লাভের জন্য চিন্তা থেকে সত্ত্ব, আত্মা ধারণাকে উচ্ছেদ সাধন কর। নির্বাণে সত্ত্ব নেই, আত্মা নেই, পুরুষ নেই, মহিলা নেই, আমি নেই, আমার নেই, আমিহু নেই। অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হলে চিন্তা হতে এ'সব মিথ্যা ধারণা বা বিভ্রান্তির আবরন খসে পড়ে চিরতরে। যতদিন পর্যন্ত সত্ত্ব, আত্মা, নামক জীব, পুন্ডাল, পুরুষ, মহিলা নামক ভ্রান্ত ধারণা নিঃশেষে নিরোধ না হয় ততদিন পর্যন্ত কিছুতে নির্বাণ লাভ হয় না। নির্বাণ

লাভেচ্ছুকগণকে সে সকল ধারণা যে ভ্রমাত্মক তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে। বস্তুতপক্ষে সে ধারণাসমূহ মোহমূলক চিন্তা-বিকার মাত্র। সাধারণ নর-নারী সন্ত, আত্মা, পুরুষ, মহিলা মিথ্যা ধারণার বশীভূত হয়ে দেহের মধ্যে সেসব অস্তিত্বের অনুসন্ধানে রত থাকে। আর সে মিথ্যার মোহে নিগড়ে আবদ্ধ হওত তারা নির্বাণ লাভে ব্যর্থ হয়। পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুর অধীন হওয়ার মত সীমাহীন দুঃখকে অতিক্রম করতে অপারগ হয়। তোমরা চিন্তা থেকে সে সকল মিথ্যা ধারণা অপসারিত করে চিন্তকে সম্যক জ্ঞানে বিশুদ্ধ কর। যখন তোমরা সম্যক জ্ঞানের দ্বারা অবগত হতে পারবে যে, তোমাদের চিন্তের মধ্যে আর সন্ত নেই, আত্মা নেই, পুরুষ নেই, মহিলা নেই, আমি নেই, আমার নেই, আমিহু নেই (এ ধারণার অস্তিত্ব নেই) তখন জানবে তোমরা নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়েছ। তৃষ্ণা প্রাণীদিগকে কামলোক, রূপলোক, অরূপলোকে বন্ধন করে রেখে নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করায়। যার ফলে তারা ত্রিলোকে বারবার জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে ঘূর্ণমান। ঐদৃশ বন্ধন অতিক্রম করার নামই নির্বাণ। তাই নির্বাণে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোন বিষয়ে আশাও নেই, তৃষ্ণাও নেই, বাসনা বা স্পৃহাও নেই, অনুরাগ বা বিরাগ নেই, ইচ্ছা বা উদাসীন ভাবও নেই, কোন বিষয়ে সাপেক্ষও নহে, অধীরও নহে; কোন কামনায় (বা তৃষ্ণায়) চিন্তা প্রবৃত্ত হয় না-পরম মুক্তি। নির্বাণ কোন কারণ সম্বৃতও নয়। যেখানে উৎপত্তি থাকে, সেখানে বিনাশও থাকে। কিন্তু নির্বাণে উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। তাই নির্বাণে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নেই। নির্বাণ কারো সৃষ্টও নহে, চ্যুত হয় না; নির্বাণ অসংখ্যত ধর্ম। কেহ নির্বাণকে সৃষ্টি করতে পারে না। নির্বাণ যদি সৃষ্টি করা যেতো তাহাতে তো ভগবান বুদ্ধ সকলের জন্য নির্বাণ সৃষ্টি করতঃ বিতরণ করে দিতেন। গুরু নির্বাণ সুখের অধিকারী হলেও শিষ্য তার ভাগী হতে পারে না। তেমনি শিষ্যের নির্বাণ সুখও গুরুকে প্রদান করা যায় না। নির্বাণ সুখ স্বয়ং জ্ঞানগম্য বিষয়। অন্যদিকে নির্বাণ আমি, আমার নির্বাণও বলা যায় না। পৃথিবী, স্বর্গ, ব্রহ্মের মত নির্বাণ কোন স্থানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। নির্বাণে আমি, আমার বলে কিছু নেই। বায়ুবেগে অগ্নিশিখা যেরূপ অদৃশ্য হয়ে যায় তার অস্তিত্ব থাকে না এবং পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কোনদিকে চলে গেল তা' বলা যায় না, সেইরূপ অর্হংগণ মৃত্যুর পর পরিনির্বাণিত হন। তাদের জীবন প্রবাহ চিরতরে নির্বাণিত হয়, কোন অস্তিত্ব থাকে না। নির্বাণকে জানবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রত্যক্ষ বা স্বয়ং উপলব্ধি করণ। এটা অর্হং মার্গফল লাভীদের জ্ঞানগম্য হয় মাত্র। নির্বাণকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা দুষ্কর। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন কিন্তু নির্বাণের বর্ণনা করেন নি; বরং স্বয়ং নির্বাণ প্রত্যক্ষ করলে তা সঠিকভাবে জানা হবে বলে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ কাজেই লৌকিক সুখ বাদ দিয়ে লোকোত্তর সুখের প্রত্যাশী হয়ে অবস্থান কর। সেই লোকোত্তর সুখ কি? মার্গসুখ, ফলসুখ, নির্বাণসুখ এ'তিন প্রকার সুখই লোকোত্তর সুখ। কখনো লৌকিক সুখ ভোগের প্রত্যাশী হবে না। মনে রাখবে লৌকিক সুখ ভোগ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে পারলে তবেই লোকোত্তর সুখ অর্জন করা সম্ভব। লৌকিক সুখ ভোগের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকলে কিছুতে লোকোত্তর সুখ উপলব্ধি হয় না। অন্যদিকে লোকোত্তর সুখ করতে হলে সত্ত্ব, আত্মা, মানুষ, পুরুষ, মহিলা ধারণাসমূহ পরিত্যাগ করতে হয়। এবং দেহের প্রতি মমতা ত্যাগ করতঃ অনাসক্তভাবে থাকতে হয়। তাই তোমরা লোকোত্তর সুখ লাভের তরে কোন প্রকার কালক্ষেপণ না করে অতিসত্ত্বর সত্ত্ব, আত্মা, উচ্ছেদ সাধন কর। 'আমি মানুষ', 'সে পুরুষ', 'সে মহিলা' ধারণাসমূহ বিধ্বংস কর। কারণ লোকোত্তর সুখের মধ্যে সত্ত্ব নেই, আত্মা নেই, মানুষ নেই, পুরুষ নেই, মহিলা নেই, দেহ নেই। বলা বাহুল্য যে, লোকোত্তর সুখে বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় হয় না, আর ঐ সব ধারণাসমূহে মিথ্যা বা ভ্রান্ত সম্মত চেতনা ছাড়া সত্য কিছুই নেই। এবং পরিণামে তা' দুঃখই আনয়ন করে মাত্র। সুতরাং লোকোত্তর সুখের মধ্যে সেরূপ মিথ্যার সংমিশ্রণ কল্পনাভীত।

অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয়ই পরম সুখ। তোমরা অবিদ্যার অধীন, তৃষ্ণার অধীন হয়ে অবস্থান করো না। অধিকন্তু সত্ত্বর অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয় সাধন কর। অবিদ্যা ক্ষয় সাধন করতে সমর্থ হলে দেহধারণ করার পরিসমাপ্তি ঘটে। মনে রাখবে অবিদ্যার কারণে দেহধারণ করতঃ বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। অবিদ্যা ক্ষয় হলে দেহধারণ করা বন্ধ হয়ে যায়। তৃষ্ণা ক্ষয় করতে সক্ষম হলে পুনর্জন্ম গ্রহণের বীজ বিনষ্ট হয়। তৃষ্ণার কারণে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করার মত সীমাহীন দুঃখ কষ্টের শিকার হতেই হয়-কোন গতান্তর থাকে না। অন্যদিকে তৃষ্ণাক্ষয় হলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করার মত দুঃখ থেকে চির নিষ্কৃতি লাভ হয়। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, অবিদ্যাই দেহধারণ করে আর তৃষ্ণায় পুনর্জন্ম হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণার কারণে সত্ত্বগণ বিভিন্ন যোনিতে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করতঃ ভবচক্রে অনন্তকাল ব্যাপী দুঃখভোগ করতেছে। অবিদ্যা, তৃষ্ণাই সত্ত্বগণের পুনর্জন্মের জনক। অবিদ্যা থাকলে এক দেহ ত্যাগ করে অপর একটি দেহধারণ করতে হয়। তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে ফিরেই জন্মধারণ করতে হয়। এই দেহধারণ ও পুনর্জন্ম গ্রহণ উভয়ই বর্ণনাভীত দুঃখে পরিপূর্ণ। জ্ঞানীগণ উভয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটায় পরম সুখে অবস্থান করেন। তোমরাও পারবে কি? সকল প্রকার বীর্য, পরাক্রম, ধৈর্য ও জ্ঞান প্রয়োগ করে এ'কাজে এগিয়ে চল। এটা স্মরণ রাখবে যে, বিদ্যা উৎপত্তি হলে দেহধারণ করা নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

তৃষ্ণা নিরোধ হলে বা ক্ষয় হলে পুনর্জন্মের পরিসমাপ্তি ঘটে চিরতরে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সত্যধর্ম, সদ্ধর্ম, নির্বাণধর্ম আচরণে ব্রতী হও। কখনো মিথ্যাধর্ম, পরধর্ম, পাপধর্ম আচরণ করতে চেষ্টাশীল হবে না। এবং অপরকেও মিথ্যাধর্ম, পরধর্ম, পাপধর্ম হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, উপদেশ প্রদান করবে। অজ্ঞানের অন্ধকারে অবস্থান না করে জ্ঞানের আলোয় বেিরিয়ে এসো। তোমাদের মনচিন্তের মধ্যে বিদ্যমান সকল অজ্ঞতা ভাবকে বিতাড়িত করে দিয়ে তৎস্থানে জ্ঞানের অবস্থান সুনিশ্চিত কর। তাহলে মনচিন্ত সর্বদা জ্ঞানের সাগরে স্নাত হওত নির্বাণধর্মে রমিত হবে। এবং প্রকৃত সুখের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবে। বুদ্ধ বলেছেন-

দুঃখের জননী তৃষ্ণা,

দেখি তার হেন দোষ।

বীততৃষ্ণা অনাসক্ত হও ভিক্ষুগণ,

হও ধ্যানপরায়ণ-

পালিলে এ' ভিক্ষুধর্ম,

নিশ্চয় ভব বন্ধন হইবে ছেদন।

- ১। সেই ভিক্ষুধর্ম কি? জ্ঞানের সহিত অবস্থান করা। ভব সংসারকে ভয় দেখে বলেই ভিক্ষু। যে ভিক্ষু সংসারকে ভয় জ্ঞানে দর্শন করা হতে বিরত সে প্রকৃত ভিক্ষু নহে। প্রকৃত ভিক্ষুরা ভব সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতঃ ভব ভবান্তরে সুখ ভোগ করাকে ভয় জ্ঞানে দর্শন করে থাকে। আর তারা সংসারের প্রতি অনাসক্ত ও বীততৃষ্ণা হয়ে পরম সুখে অবস্থান করতে সমর্থ হয়। তোমরা বুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী হও। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান আসবক্ষ্য জ্ঞানই বুদ্ধজ্ঞান নামে কথিত হয়। বুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল জ্ঞানকে আসবক্ষ্য জ্ঞান বলা চলে না। কারণ সেই জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ হয় না। বরং অনেক সময় দুঃখই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। বলা যায় সেই জ্ঞানসমূহ দুঃখের ভেজালে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে বুদ্ধজ্ঞানে কোন ভেজাল নেই, নেই বিন্দুমাত্রও দুঃখের অস্তিত্ব। তাই বুদ্ধজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ উত্তম জ্ঞান। এ জ্ঞানের দ্বারাই লোভ, দ্বেষ, মোহক্ষয় সাধন হওত নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। বুদ্ধজ্ঞানের অভাবে সাধারণ নর-নারীগণ লোভ, দ্বেষ, মোহের অধীন হয়ে দুর্বিষহ দুঃখের মধ্যে দিনাতিপাত করতেছে। তারা লোভের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে, দ্বেষের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে, মোহের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধজ্ঞানের অভাব জনিত কারণে সে দুঃখকে ধ্বংস করতে সমর্থ হচ্ছে না। কাজেই তোমরা বুদ্ধজ্ঞান অর্জন করতে সচেষ্ট হও। যদি বুদ্ধজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হতে পার তাহলে পরম সুখের অধিকারী হবেই।

সাধু, সাধু, সাধু।

কিছুতেই মারের প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হবে না

এক সময় পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভক্ত) নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—বুদ্ধের উপদেশ মত ভিক্ষুর প্রকৃত আবাসস্থল হল অরণ্য, বৃক্ষমূল ও শূন্যাগার। অরণ্যে বৃক্ষের পাতা বিছিয়ে তৃণচর্বি ভিক্ষুর প্রকৃত, আসল বিছানা। গভীর অরণ্য যেখানে হিংস্র বন্যপশুর পদাচারণ এবং বাঘ, হাতি, সিংহের গর্জন সেরূপ স্থানে সত্বর তৃষ্ণাকে ক্ষয়সাধন করা সম্ভব হয়। কারণ সেই উপদ্রবপূর্ণ ভয়সঙ্কুল অরণ্যে মনচিন্তকে পাপ চেতনার দিকে প্রবাহিত করার সুযোগ কোথায়? অরণ্যের নির্জনতা বৈরাগ্যজনক পরিবেশ ভিক্ষুর জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভের অন্যতম সম্বল। বিবেকপ্রিয় অরণ্যবাসই বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত। ভগবান বুদ্ধ গহীন অরণ্যের বৃক্ষমূলে একাকী অবস্থান করতে উপদেশ দিতেন ভিক্ষুদিগকে। বুদ্ধের সময়ে প্রথম দিকে সব ভিক্ষুরাই অরণ্যে, বৃক্ষমূলে বাস করত। পরে রাজা বিম্বিসার ভগবানের সম্মতি নিয়ে বেণুবন বিহার নির্মাণ করে দিয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। তখন থেকেই ভিক্ষুসঙ্ঘ বিহারে বাস করা শুরু করে। রাজা বিম্বিসারই সর্বপ্রথম বিহার দান করেন। আমিও প্রথম দিকে ধনপাতায় গভীর অরণ্যের বৃক্ষমূলে ছিলাম। জীবনে বেঁচে থাকার সব আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করতঃ অনিদ্রায়, অনাহারে-অর্ধাহারে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতের ঠাণ্ডায় এবং মশার কামড় সহ্য করে থাকতাম। অরণ্যের মধ্যে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলেও কোন প্রকার উৎসাহশূন্য হইনি। আপন সংকল্প হতে পিছনে হটিনি। তখন আমি সারাক্ষণ বুদ্ধের কথা স্মরণ করতাম। ভগবান বুদ্ধ বোধিমূলে বলেছিলেন—“আমার শরীরের রক্ত মাংস শূন্য হয়ে যাক্, আরক্ত কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই আসন হতে উঠব না।” বুদ্ধের সেই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ উক্তিটি আমার হৃদয়কে নাড়া দিতো দারুনভাবে। ফলে জঙ্গলের ভিতর যত কঠিন বাধা-বিঘ্ন, অন্তরায়, উপস্থিত হোক না কেন আমার শ্রদ্ধা, বীর্যকে একচুলও টলাতে পারত না; বরং বৃদ্ধি সাধনই হতো। তোমাদেরকেও বলছি তোমরা একরূপ প্রতিজ্ঞা হবে—“আমাদের শরীরের রক্ত মাংস শুষ্ক হয়ে যাক্ প্রাপ্তব্য বিষয় না পাওয়া পর্যন্ত এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রধানভাবে অনুশীলনের চেষ্টা করব, এই হল আমাদের সম্যক ব্যায়াম”। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করার অর্থ হলো মার্গ ভাবনা করা। এ মার্গ ভাবনায় যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে। বুদ্ধের উপদেশ কি রকম জান? তোমরা নবলোকোত্তর ধর্ম গ্রহণ কর, নবলোকোত্তর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং সেই নব লোকোত্তরধর্ম (জনসাধারণের মাঝে) প্রচার কর। তাতে তোমাদের সকলের সুখ অর্জিত হবে; দুঃখ হতে মুক্তি

লাভ ঘটবে। মনুষ্যধর্ম গ্রহণ করবে না, মনুষ্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, মনুষ্যধর্ম প্রচার করবে না। মনুষ্যধর্ম দুঃখজনক, মনুষ্যধর্মের মাধ্যমে দুঃখমুক্তি অসম্ভব।

একসময় ভগবান বুদ্ধ সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করিয়ে বলেছিলেন—“সত্যধর্ম কি তোমরা তা জেনেছ? অজ্ঞানের অন্ধকার হতে তোমরা এখন জ্ঞানে এসেছ, এই হল তোমাদের নতুন জন্ম। এখন তোমরা পরস্পরকে ভাই বলে চেন।” এবার বনভক্তে বলেন তোমরাও যখন প্রব্রজিত হয়েছ এখন আর অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকতে পারবে না। সত্যধর্মের আলোতে আলোকিত হতে চেষ্টা কর, যাবতীয় বাদ-বিবাদ, শত্রু-মিত্রের উর্ধ্বে উঠে অজ্ঞনতামূলক মনুষ্যধর্ম পরিত্যাগ করতঃ নবলোকান্তর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক। সর্বদা স্মৃতির সহিত অবস্থান করতে সচেষ্ট থাক। স্মৃতির দ্বারা অবাধ্য চিত্ত, অবাধ্য ইন্দ্রিয়কে বাধ্য কর, দমন কর। আমি তো দেখতেছি, তোমাদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ এখনো পর্যন্ত অবাধ্য রয়েছে। সত্ত্বর বাধ্য করতে পারবে কি? নির্ভূল স্মৃতির দ্বারা অবাধ্যচিত্ত, অবাধ্য ইন্দ্রিয়সমূহ সত্ত্বর বাধ্য করতে না পারলে তোমাদেরকে কি অবস্থায় পড়তে হবে জান? ভিক্ষু হয়ে অবাধ্য চিত্ত, অবাধ্য ইন্দ্রিয়ার সহিত বাস করলে চাতুরালি করার মতনই হয় মাত্র। সেরূপ ভিক্ষু সহসা প্রব্রজ্যা হতে চ্যুত হওত গৃহী হয়ে যায়। সে সব ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে আমি বলি—হয়ে যে চাতুরালি, সাধুর মুখোশ যাবে খুলি, ভবের পথে ডানকানা।

বর্তমানে এরূপ চাতুরালি ভিক্ষুর সংখ্যা কিন্তু একেবারে কমও নয়। অন্যদিকে ধর্মবিনয়ে সচেতন ব্যক্তির সসব ভিক্ষুর কার্য-কলাপ দেখে ভিক্ষুদের প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ করতেছে। অনেক উপাসক উপাসিকা আমার নিকট এসে ভিক্ষুদের বহু চাতুরালি কাজের বিবরণ দিয়ে থাকে। সেই সব অজ্ঞানী, মিথ্যা ভিক্ষুদের হীন অনার্য কাজের দরুন অন্য ভিক্ষুরাও আজ সন্দেহের পায়ে পরিণত হচ্ছে। তোমরাও সেই রকম চাতুরালি কৌশল গ্রহণ করবে নাকি? (উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ একবাক্যে না বলে উত্তর প্রদান করে।) তাহলে তোমাদের কিছু হবে না। অন্যথায় সাধুর মুখোশটুকু যেমন সহসা খসে পড়ে সকলের নিকট নিন্দিত হবে তেমনি আমাকেও লজ্জিত করাবে। তোমরা সত্ত্বর অবাধ্য চিত্ত, অবাধ্য ইন্দ্রিয় দমিত কর এবং মনুষ্যধর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত থাক। মনুষ্যধর্মকে দুঃখরূপে দর্শন কর মনুষ্যধর্ম হতে নিজেকে পৃথক করে রাখ। নব লোকান্তরধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। নব লোকান্তরধর্মের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাক। তাহলে প্রকৃত ভিক্ষু বলে পরিগণিত হবে। সেখানে আর কোন প্রকার চাতুরালির গন্ধও থাকবে না। সর্বদা অনাবিল আনন্দের সহিত অবস্থান করতে সক্ষম হবে। শ্রদ্ধেয় বনভক্তে একটি সুন্দর উপমা উপস্থাপন করে বলেন—বৃটিশ আমলের কথা, ইন্দ্রমণি নামে একজন চাকমা দারোগা একদা রাগের বশে সামান্য দোষের

আসামি জনৈক স্ত্রীলোককে বেদম মারধর করেছিল। দারোগা বাবুর সেই কঠোর ও নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের ফলে স্ত্রীলোকটি ভীষণ আহত হয়ে পড়ে। সেই অমানবিক শাস্তি মেনে নিতে না পেরে আসামিনী এস, পি সাহেবের শরণাপন্ন হয়। এবং বেআইনী শাস্তি প্রদানের জন্য দারোগার বিরুদ্ধে এস, পির নিকট বিচার প্রার্থনা করে। এস, পি সাহেব দারোগা ইন্দ্রমণিকে তলব করতঃ যখন সমস্ত ঘটনার বিবরণ খুলে বলতে বললো তখন দারোগার প্রদত্ত শাস্তিটুকু যে অমানবিক ও বেআইনী ছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হল। সঙ্গে সঙ্গে এস, পি সাহেব গর্জে উঠে—“এখন দারোগার পোশাক খুলে ফেল।” আর দারোগা ইন্দ্রমণি চাকমাকেও দারোগার পোশাক খুলে ফেলতে হলো। এভাবে ইন্দ্রমণি চাকমা দারোগার চাকুরি হারিয়ে ফেলে। এবার বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেন, তোমরা যদি অবাধ্য ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে যুবতী সহিত সর্বদা রসিকতা হাসি-ঠাট্টা-তামাশায় রত হও তবে তোমাদেরকেও ইন্দ্রমণি দারোগার অবস্থায় পড়তে হবে। যুবতীরা সেই এস, পির চণ্ডে তোমাদেরকে বলে উঠবে—“এখন রং বস্ত্র (প্রব্রজ্যা) ফেলে দাও।” তখন তোমরা হবে ইন্দ্রমণি দারোগা আর যুবতীরা হবে এস, পি। সুতরাং তোমাদেরকে যুবতীদের সেই কথা মতো প্রব্রজ্যা ছেড়ে দিয়ে গৃহীজীবনে ফিরে যেতে হবে, এবং তাদেরকে বিয়ে করতেই হবে। আচ্ছা, কোন ভিক্ষু যদি সেই রকম পরিস্থিতির শিকার হয় তাহলে দোষটা ভিক্ষুর হবে নাকি যুবতীর? ভিক্ষুরই হবে। কারণ প্রব্রজিত হওয়ার অর্থ স্ত্রীলোকের সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা। আর ভিক্ষু হয়ে সে কেনই বা যুবতীর সঙ্গে রসিকতা-হাসি-ঠাট্টা-তামাশা-রঙ্গরসে মেতে উঠবে। তোমাদেরকে বলছি সাবধান, কখনো যুবতীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাশায় লিপ্ত হবে না। এমন হলে এস, পি রূপী যুবতীর আদেশ মত রং বস্ত্র (প্রব্রজ্যা) বিসর্জন দিতে হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন—পঞ্চস্কন্ধ বুঝতে না পারলে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। তাই পঞ্চস্কন্ধ যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে মুক্তিকামীদের পঞ্চস্কন্ধ পরিহার করা উচিত। তোমরা দৃশ্যমান কোন নারী, পুরুষ, প্রাণীকে নারী, পুরুষ, জীব, সত্ত্ব ইত্যাদি ভাবে দর্শন না করে পঞ্চস্কন্ধ রূপেই দর্শন করবে। নির্বাণ ব্যতীত মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সবই পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ বলে জানবে।

সূত্র বিনা বস্ত্র লাভ হয় না কখন,

পঞ্চস্কন্ধ বিনা মানব দেহ না হয় গঠন।

একমাত্র সূত্র দিয়েই যেমন কাপড় তৈরি হয় তেমনি পঞ্চস্কন্ধ সমন্বয়ে মানব দেহ গঠিত। জীব জগতের বিরাজমান সকল প্রাণী, মানুষ, নারী, পুরুষ, পশু-পক্ষী সবার দেহ পঞ্চস্কন্ধ হতে উৎপন্ন। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, এ’দেহে

কোন ব্যক্তিসত্তা যেমন আমি, তুমি, স্ত্রী, পুরুষ বলে কিছুই নেই, সবই পঞ্চস্কন্ধ। পঞ্চস্কন্ধ সমন্বয়ে গঠিত ভৌতিক এ'দেহকে আমি-আমার, তুমি-তোমার, সে-তাহার, স্ত্রী, পুরুষ বলে কল্পনা করা নিতান্ত মূর্খতা প্রসূত। তজ্জন্য বলছি, তোমরা পঞ্চস্কন্ধ সমন্বয়ে গঠিত ভৌতিক এ'দেহকে কখনো 'এটা নারী দেহ' আর 'এটা পুরুষ দেহ' ভেদে দর্শন করবে না। কারণ নারী-পুরুষ ভেদে দর্শন করলে পরস্পরের মধ্যে আসক্তি উদয় হওত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার ইচ্ছা জন্মাবে। নারী-পুরুষের এই বিবাহ বন্ধন পঞ্চস্কন্ধের সাথে পঞ্চস্কন্ধের দৃঢ় বন্ধন মাত্র। এমতাবস্থায় মুক্তি লাভ অসম্ভব।

তোমরা পঞ্চস্কন্ধকে বিবিধ দুঃখের আকর জেনে তা ত্যাগে সচেষ্ট থাক সারাক্ষণ। এবং পঞ্চস্কন্ধে শ্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা ও আসক্তি উৎপন্ন করবে না। পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপের প্রতি অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করবে। মনে রাখবে পঞ্চস্কন্ধ সর্বদা পরিত্যাজ্য। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধ পরিত্যাগ করতে পারলে চিরসুখ অর্জিত হয়ে থাকে। এভাবে পঞ্চস্কন্ধকে যথার্থরূপে জানতে ও চিনতে হবে। তোমরাও আমার সাথে বল, আমরা পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপের প্রতি অনাসক্ত হবো, পঞ্চস্কন্ধ পরিত্যাগ করে অবস্থান করবো। এতে আমাদের চিরসুখ নির্বাণ লাভ হবেই।

নির্বাণ যেতে হলে তোমাদেরকে বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপত্তি করতে হবে, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে, মার সৈন্য জয় করতে হবে। কিরূপে বিদ্যা উৎপত্তি হয়? জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ, আবাহ-বিবাহ হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলে। তোমরা এখন চাকমাও নহে, বড়ুয়াও নহে, মারমাও নহে, হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে, চাইনীজও নহে, জাপানীও নহে। তোমাদের আর কোন জাতিগত পরিচয় নেই। নদীসমূহ যেমন দিক বিদিক হতে এসে সমুদ্রে মিশে গিয়ে একাকার হওত পূর্বের পরিচয় হারিয়ে মহাসমুদ্রে গণ্য হয় তেমনি তোমরাও যেই জাতি থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না কেন বুদ্ধশাসনে এসে পূর্বের পরিচয়ে পরিচিত না হয়ে সবাই বুদ্ধপুত্র নামে অভিহিত। গোত্রবাদ হল 'আমি অমুক গোত্রের লোক', 'তুমি সমুক গোত্রের লোক' ইত্যাদি পৃথকীকরণ মনোভাব। প্রব্রজিতগণকে সেইরূপ পৃথক মনোভাব পোষণ করা হতে বিরত থাকতে হয়। মনে রাখতে হবে, হীন, নীচ সংকীর্ণ চেতনা দ্বারা প্রব্রজিত জীবনকে অপবিত্র করা কখনো উচিত নয়। মানবাদ হল 'তুমি আমার যোগ্য' 'তুমি আমার অযোগ্য' এসব কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করা। সাধারণ জনসমাজে যেমন ধনী-গরিব, উচ্চবংশীয়-নীচবংশীয়, বিদ্বান-নির্বোধ ইত্যাদি ভেদে বৈষম্যের প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়। মনে রাখবে ভগবান বুদ্ধ প্রব্রজিতদেরকে সেইরূপ আত্মপ্রশংসা ও অপরকে অবজ্ঞামূলক বাক্য প্রয়োগ

করতে বারণ করেছেন। অন্যদিকে যারা আত্মপ্রশংসায় রত হয়ে অপরজনকে অবজ্ঞা, ঘৃণা, নিন্দা করে থাকে বুদ্ধ তাদেরকে অসৎপুরুষ বলে গণ্য করেছেন। আবাহ বিবাহ শব্দের অর্থ হল বিয়ের ঘটকের কাজ করা বা ঘটকালী করা। অর্থাৎ “তোমার মেয়েকে অমুকের ছেলের সহিত বিয়ে দাও” আর “তুমি অমুকের মেয়েকে তোমার ছেলের জন্য পুত্রবধূ করে ঘরে আনো;” অমুকের ছেলেটি খুব ভালো, ভদ্র স্বভাবের, তোমার মেয়ের সঙ্গে বেশ মানাবে, তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হলে সুখেই জীবন-যাপন করতে পারবে; অমুকের মেয়েটিও খুব লক্ষ্মী, ভালো, নম্র স্বভাবের, তোমার ছেলে সঙ্গে চমৎকার মানাবে, তারা স্বামী-স্ত্রী হলে সুখে জীবন-যাপন করতে সমর্থ হবে এইভাবে বিয়ে সম্বন্ধ স্থপনকারীর কাজ করে দেওয়া। প্রব্রজিতগণকে এইরূপ হীন, অনার্য, অপবিত্র কাজ করা হতে বিমুক্ত থাকতে হবে। বহুদূরে থাকতেই সে অনার্য কাজকে পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে যদি নিজেকে জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ, আবাহ-বিবাহ হতে মুক্ত রাখা যায় তাহলে বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হওয়া যায়। সেই বিদ্যাচরণ সম্পন্নরা দেবতা, ব্রহ্মা হতেও শ্রেষ্ঠ।

পূজ্য বনভঙ্কে বলেন-নির্বাণ গমনের পথে মার তোমাদেরকে বিবিধ প্রলোভন, হুমকি, বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে দিয়ে জন্ম করতে চাইবে। মারকে সে কাজে সহযোগিতা করতে রয়েছে তার অসংখ্য সৈন্যদল। তৎমধ্যে কাম হল মারের প্রধান সেনাপতি। তৃষ্ণা, আরতি, রতি (রাগ) নামে রয়েছে তিনটি কন্যা। মারের সেই কন্যাগণ যুবতী মেয়েদের মনে প্রবিষ্ট হয়ে নির্বাণগামীদেরকে বিবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে সর্বদা ওতপেতে থাকে। সুযোগ বুঝে তারা যুবতী মেয়েদের মনে প্রবিষ্ট হওত মুক্তিকামী সাধকদেরকে মোহিত করে পথভ্রষ্ট করতে প্ররোচিত করায়। আর মারকন্যা প্রবিষ্ট যুবতীরা ভিক্ষুদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলোভনের জাল পেতে প্রলুব্ধ করায় বিপথগামী করে ফেলে। তাই তোমাদের সর্বদা সতর্ক অবস্থায় বিহার করতে হবে। শ্রদ্ধেয় ভণ্ডে নানা উপমা দিয়ে মারকন্যা প্রবিষ্ট যুবতীদের বিবিধ প্রলোভনের কথা আগাম বলে দিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সজাগ হতে বলেন। মার্গফল লাভ না করা পর্যন্ত ভিক্ষু জীবনও বিপদমুক্ত নহে, ভয়মুক্ত নহে। সুতরাং সাবধান, কিছুতেই প্রমাদের বশবর্তী হবে না। তিনি ভিক্ষুদেরকে আবারো সতর্ক করে দিয়ে বলেন মারকন্যা প্রবিষ্ট যুবতীরা খারাপ উদ্দেশ্যে বিহারে আসতে পিছ পা হয় না এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রলোভন প্রদর্শন করতে থাকে। যেমন ধর কোন যুবতী তোমাদের চিন্তে চাঞ্চল্য ভাব উদ্বেক করে দিবার তাদিগে নিতান্ত স্বল্প বসন পরিধান করতঃ সন্ধ্যা সময় বিহারে এসে অবাধে ঘুরা-ফেরা করতে পারে। তখন তোমরা কি সেই নিলজ্জ যুবতীকে বারণ করতে পারবে? পারবে না। কারণ বারণ করতে গেলে সে বলে

উঠবে, আমার গরম লাগছে বলে একরূপ বসন পরিধান করেছি তাতে তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে! আবার মারকন্যা প্রবিন্ট কোন যুবতী খারাপ মতলব নিয়ে ধর্ম আলোচনার ভানে তোমাদের সাথে আলাপে রত হল। কিন্তু সে ধর্মালোচনা না করে বাজে কথাবার্তা, বাজে ভঙ্গি করবে বারবার। এবং শেষে চলে যাবার সময় অঙ্গ ভঙ্গিমায়াও অনেক কূট কৌশল প্রদর্শন করতে থাকবে-যাতে তোমাদের চিন্তে আসক্তি উদয় হয়। অন্যদিকে সেই মারকন্যা প্রবিন্ট যুবতী তোমাদেরকে মায়াব বন্ধনে বাঁধতে একরূপও বলতে পারে-

এসো হে এসো হে পরহে ফুল মালা
যৌবন জুড়ায় হৃদয়ে আকুল,
প্রেম তরঙ্গে ভেঙ্গেছে দু'কুল।

আরো বলতে পারে-

ঝিম ঝিমে নয় ঝম ঝমাজম,
রম রমারম ফুরতি।
ঝম ঝমিয়ে রেখে যাব,
ধরে কোকিল বাতাস সুরতি।

বলা বাহুল্য যে, সেই সময় তোমাদেরকে জানতে হবে-এই যুবতীরা মারকন্যা। তারা তোমাদেরকে মায়াব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চেষ্টায় রয়েছে। তখন তোমাদের উচিত হবে সে স্থান হতে কেটে পড়া। এবং চিন্তের মধ্যে সম্যক জ্ঞান উদয় করতঃ সেই সমস্ত প্রলোভন ছিন্ন-ভিন্ন পদ দলিত করতে সচেষ্ট থাকা। ভগবান বুদ্ধ যখন অপরাজেয় বোধিপালঙ্কে উপবিন্ট ছিলেন তখন মাররাজ প্রহরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-প্রহরী! জ্বী হজুর! লয়ে এসো আমার কন্যাগণকে। জ্বি আজ্ঞা হজুর! তৃষ্ণা, আরতি, রাগ পিতার কাছে এসে বলল-পিতঃ আমাদের কিবা কার্যে ডেকেছ? হ্যাঁ, ডেকেছি তোদের সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে কঠিন ব্রত করছে। যাও তাকে কৌশলে একবার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়ে তার চিন্তেকে বিপথগামী করে দাও। পিতার নিকট হতে সেইরূপ আদিষ্ট হয়ে মারকন্যাগণ হুটমনে গেয়ে উঠল-

চল চল চল চল
সিদ্ধার্থের ধ্যান ভাঙ্গিতে
গয়াধামে চল।

অনন্তর মারকন্যাগণ বুদ্ধের সম্মুখে গিয়ে প্রলোভনের স্বরে বলল-'হে শ্রমণ, আমরা আপনার পদ সেবা করতে ইচ্ছুক, আপনি আমাদের গ্রহণ করুন।' বুদ্ধকে মোহিত করার জন্য তৃষ্ণা মধুর স্বরে বলতে লাগল-হে যুবরাজ! আপনি সাম্রাজ্যসুখ ত্যাগ করে কেন দীনভাবে কাল যাপন করছেন? সেই সম্পদ সমূহ

ত্যাগ করে মুক্তি লাভ সম্ভব আপনি কার কাছে শুনেছেন। আপনি আমাদের আলয়ে আগমন করুন। এবং স্বীয় প্রেম নিবেদনার্থে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কান্নার স্বরে গেয়ে উঠল—

ওহে যুবরাজ একি কর কাজ!

পর্ণকুটিরে বসি।

তুমি ধন হীন নও, জ্ঞান হীন নও,

অর্থ হীন নও...।

তৃষ্ণার বাক্য শেষ না হতেই আরতি গেয়ে উঠল—

দেখ তুমি কত সুন্দর,

আমি কত সুন্দর,

সুন্দরে সুন্দরে হই গো মিলন।

এবার রতি একটু ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে বুদ্ধকে কৃতাজ্জলি পুটে বলতে লাগল—হে ভগবান, আমরা আপনার আশ্রমে আগমন করেছি। আপনি আমাদের প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। আপনার মতো আমরাও গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করে সুবর্ণপুর হতে এখানে এসেছি। আমরা কন্দর্প রাজার কন্যা। মারকন্যাগণকে ভৎসনা করে এবার বুদ্ধ বলে উঠলেন—হে মারকন্যা! যার নিকট লোভ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই, নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধ; সেই বুদ্ধকে তোমরা কিসের আশায় কলঙ্কিত করতে এসেছ? তোমাদের প্রচেষ্টা কিছুতেই সফল হবে না, শীঘ্রই এ স্থান হতে সরে পর। বুদ্ধের সেই গম্ভীর কথা শ্রবণ করে মারকন্যাগণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেল। এভাবে ভগবান বুদ্ধ মারের সকল প্রকার হুমকি, প্রলোভন, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতঃ মারকে সসৈন্যে পরাজিত করেছিলেন। বনভ্রমে বলেন আচ্ছা, এখন যদি মারকন্যাগণ এরূপ বলে—

চল চল চল,

বন বিহারে চল;

বনভ্রমের শিষ্যগণের ধ্যান ভাঙ্গিতে

বন বিহারে চল।

এবং মারকন্যান্যগণ এই যুবতীদের মনে প্রবিষ্ট হওত তোমাদেরকে নানাভাবে প্রলোভন প্রদর্শন করতে থাকে, তখন কি করবে? ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। তিনি বলেন, যুবতীরা তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করতে যদি এভাবে বলতে শুরু করে—

আজ মনের মুকুল উঠল ফুটে,

উঠল ফাগুন হাওয়া;

দেখেছি তোর গোপন হাসি,

ক্ষণে ক্ষণে পথ চাওয়া ।
 মনের বাঁধন খুলিয়ে দিয়ে,
 টুটলো আজি টুটলো;
 বন হরিণী চপল পায়ে,
 বনে দিকে ছুটলো ।
 নিবিড় গোপন ভালোবাসা,
 করছে প্রাণে আসা যাওয়া ।

আবার অন্য একজন যুবতী যদি বলে—

আঁধার রাতে স্বপ্ন দেখি তাই,
 ওগো প্রিয়তম! তুমি এখন কোথায়?

পূজ্য বনভক্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন, আচ্ছা এমন হলে তোমরা কি করবে বল তো? তখন অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হবে তো? নাকি তোমরাও এরূপ বলে উঠবে—

স্বপ্ন দেখি একটি নতুন,
 তুমি আমি দুজন প্রিয় ।

সেইরূপ কিছু বললে তো অবস্থা খারাপ হবে? তখন প্রব্রজ্যা জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে । ভক্তের এ কথায় সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘ হৌ হৌ করে হেসে উঠলো । শ্রদ্ধেয় বনভক্তে একের পর এক এভাবে যুবতীদের দ্বারা সৃষ্টি বিভিন্ন প্রলোভনের বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলতে থাকেন—

তুমি আমায় নিলে না প্রিয়,
 মোর হৃদয় ফুলের পূজনীয় ।
 নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিলাম,
 মালার কুসুম প্রিয় প্রিয়.. ।

অতঃপর অন্য কেহ এরূপ বলতে পারে—

আমি পূজারী, আমি পূজারী,
 গোপন কামনা জানাব তোমারে;
 ত্রিলোকের তুমি আলোকধারী ।
 ফুলের আসন রেখেছি বিছায়ে
 মম মন্দিরের হৃদয়ে বসো হে ।

এগুলো হল মারকন্যা প্রবিষ্ট যুবতীদের প্রলোভন । তারা এভাবে ভিক্ষুদেরকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে নির্বাণ মার্গ হতে বিচ্যুত করে দেয় । ভগবান বুদ্ধ মহা প্রলোভন জাতকের মধ্যে এই বিষয়ে ভিক্ষুদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন । বুদ্ধ বলেছেন নারীরা হচ্ছে প্রব্রজ্যা জীবনের মল । নারীর রূপে,

নারীর গঞ্জে, নারীর গুণে মুগ্ধ হলে তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রদ্ধেয় ভক্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে আবারো প্রশ্ন করে বলেন-যুবতীরা এক্রূপে প্রলোভন প্রদর্শন করলে তোমাদের চিত্ত বিচলিত হবে নহে কি? সেই প্রলোভনে তোমরা প্রলুব্ধ হবে না। যুবতীদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হলে তোমাদের প্রব্রজ্যা জীবন মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়বে। নারী হল প্রব্রজ্যা জীবনের প্রধান শত্রু।

পরিশেষে তিনি বলেন-মারকন্যাগণ যেখানে ভগবান বুদ্ধের মত মহাজ্ঞানীকে প্রলোভনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল সেখানে তোমাদের কথাই বা কি? কাজেই মারকন্যা প্রবিষ্ট যুবতী হতে সাবধান। সর্বদা অগ্রমাদের সহিত অবস্থান করবে। দশ অন্ত ভাবনা সহ বত্রিশ প্রকার অন্ত ভাবনা অনুশীলনে রত থাকবে। এদেহকে অন্তি জ্ঞানের মাধ্যমে দর্শন করলে কিছুতেই দেহের প্রতি লোভ, আসক্তি, উৎপন্ন হতে পারবে না। তখন আর যুবতীরা কিছুই করতে পারবে না। তোমরা সহজেই নির্বাণমার্গে অগ্রসর হওত নির্বাণ পরম সুখ লাভে সমর্থ হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞান লাভ সত্য লাভই প্রব্রজিতদের প্রকৃত লাভ

এক সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহুবির (বনভক্ত) নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমরা কিসের উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছে? লাভের উদ্দেশ্যে নয় কি? কারণ কেহ লোকসানের উদ্দেশ্যে কিছু করে না। তবে তোমাদের পার্থিব কিছু লাভ করা নয়। তোমরা জ্ঞান লাভ ও নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছে। প্রব্রজিত হয়ে চারি আর্যসত্য জ্ঞান লাভ এবং চারি আর্যসত্য লাভ করাই হল তোমাদের লাভ। আবার এখন তোমাদেরকে কি দর্শন করে অবস্থান করতে হবে জান? বুদ্ধকে দর্শন ও ধর্ম দর্শন করে। বুদ্ধ বলেছেন, যে ব্যক্তি বুদ্ধকে দর্শন করতে সক্ষম সে ব্যক্তি ধর্মকেও দর্শন করতে সমর্থ হয়। বুদ্ধকে দর্শন অর্থাৎ বুদ্ধের জ্ঞানকে দর্শন করা, যথা-দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধগামিনী পটিপদায় জ্ঞান, এই চারি আর্যসত্য জ্ঞানকে দর্শন করাই হল বুদ্ধের জ্ঞানকে দর্শন করা। ধর্ম দর্শন হল দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য, মার্গসত্য এ'চারি আর্যসত্যকে দর্শন করাই হচ্ছে ধর্ম দর্শন করা। তাহলে তোমরা কি দর্শন করবে? জ্ঞান দর্শন, সত্য দর্শনই করবে। যদি বলা হয় একজন যুবতী মেয়ে দর্শন করেছে তাহলে সেটা কি হবে? অজ্ঞানকে দর্শন করা হবে। সেরূপ অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন না করে তোমরা জ্ঞান সত্যকেই দর্শন করবে। অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন করলে অজ্ঞান, মিথ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আর সেই অজ্ঞান, মিথ্যার ফলে দুঃখ, পাপ উদয় হওত

তোমাদেরকে জন্ম জন্মান্তর ধরে অসহ্য ভব যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এভাবে অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন করার ফলে যদি ভব যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা' প্রব্রজিতদের জন্য লোকসানই জ্ঞানবে। অন্যদিকে সর্বদা জ্ঞান ও সত্যকে দর্শন করার ফলে বুদ্ধ দর্শন, ধর্ম দর্শন হওত ভব বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা' প্রব্রজিতদের জন্য লাভ (উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি) বলে জ্ঞানবে। সর্ব নিম্নে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে অরূপ লোক, তার উপরে লোকোত্তর। কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এগুলোকে বলা হয় ভব। অর্থাৎ কামভব, রূপভব, অরূপ ভব। সত্ত্বগুণের মধ্যে কেহ কামভবকে সুখ মনে করে, কেহ রূপভবকে সুখ মনে করে, কেহ অরূপ ভবকে সুখ মনে করে এবং স্বীয় কাঙ্ক্ষিত সেই ভবের মধ্যে তারা সুখ ভোগে রত থাকে। তোমরা কিন্তু সেসব ভবের মধ্যে না থেকে ভব হতে উর্ধ্বে উঠে নির্বাণ বা লোকোত্তর স্তরে উন্নীত হও। তাহলে যে উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হয়েছ সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে, পরম সুখের অধিকারী হওত তোমাদের নির্বাণ লাভ হবে। বলা বাহুল্য প্রব্রজিতগণকে ভব অন্বেষণ করতে নেই, ভব ভবান্তরে সুখ ভোগের ইচ্ছা তাদের জন্য একেবারেই বেমানান। প্রব্রজিত হয়ে যদি ভব ভবান্তরে ভ্রমণ করতঃ সুখ ভোগের প্রত্যাশী হও তা' নির্লজ্জের কাজও বটে।

বৌদ্ধ ধর্মের মতে, নির্বাণই একমাত্র প্রকৃত সুখ। অন্যান্য ধর্মের মতে কেহ স্বর্গকে আর কেহ ব্রহ্মকে প্রকৃত সুখ বলে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম স্বর্গ, ব্রহ্মকেও দুঃখ বলে জ্ঞানে। কারণ স্বর্গ, ব্রহ্ম লাভে অবিদ্যা, তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গ, ব্রহ্মাদি অবিদ্যা তৃষ্ণার অধীন। কাজেই স্বর্গ, ব্রহ্মার মধ্যে প্রকৃত সুখের হৃদিস মিলে না কখনো। তাই বুদ্ধ বলেছেন—সাধারণ (স্বল্পজ্ঞান) মানুষ আমার এ'ধর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। বৌদ্ধধর্ম হল অসাধারণ জ্ঞানের ধর্ম। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা এ'ধর্ম অনুধাবন করা, আচরণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। যাদের নিকট অসাধারণ জ্ঞান থাকে কেবল তারাই এ'ধর্ম আচরণ, অনুধাবন করতে সমর্থ হন। যেমন, কোন পা বিহীন ব্যক্তির পক্ষে কি দৌড়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয়? হয় না। তবে পা বিদ্যমান থাকলে তার পক্ষে দৌড়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নির্দিষ্ট। ঠিক তেমনি সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন, আচরণ করা যায় না। অসাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন, আচরণ করতে হয়। আচ্ছা, বর্তমান বৌদ্ধ উপাসক যথা—চাকমা, মারমা, বড়ুয়া এমনকি ভিক্ষুদের মাঝেও অসাধারণ জ্ঞানী আছে কি? নেই। বর্তমানে সবাই সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী মাত্র। কাজেই এদের দ্বারা কিভাবে বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন, আচরণ করা সম্ভব হবে আমি ভেবে পাচ্ছি না। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা তো যাবে না। বুদ্ধ বলেছেন—

বিদর্শন ধ্যান বলে লও প্রজ্ঞা জ্ঞান,
সাধারণ জ্ঞানে কিছু হবে না প্রমাণ ।
সুখ-দুঃখ অনুভূতি জাগে অবিরাম,
সুখ শুধু স্বপ্ন তাই, দুঃখ পরিণাম ।

কিসের জন্য বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করা? জ্ঞান উদয় হওত পঞ্চকঙ্কাকে পরিত্যাগ করার জন্য । কারণ পঞ্চকঙ্ককের মধ্যে কিছুমাত্র সত্য, সার, নিত্য এবং কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই । মার্গ নেই, ফল নেই, নির্বাণ নেই । পঞ্চকঙ্কাকে দুইভাগে দর্শন করা হয় । যারা মার্গফল লাভী তারা পঞ্চকঙ্কাকে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা ও অন্তচিরুপেই দর্শন করে । তাই তারা পঞ্চকঙ্কাকে জীব, পুদাল, স্ত্রী, পুরুষ, আমি, তুমি সে ইত্যাদি বলে জীব সংজ্ঞায় ধারণা করে না । যারা পৃথগ্জন অর্থাৎ মার্গফল লাভী নন তারা পঞ্চকঙ্কাকে নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুচিরুপেই দর্শন করে । তজ্জন্য তারা পঞ্চকঙ্কাকে জীব, পুদাল, স্ত্রী, পুরুষ, আমি, তুমি, সে সব বলে জীব সংজ্ঞা ধারণা করে । আর তাতে আসক্ত হয়ে থাকে । পৃথক্জন আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা-(১) কল্যাণ পৃথগ্জন ও (২) অন্ধ পৃথগ্জন । যারা সর্বদা দান, শীল, ভাবনায় নিজেদেরকে ব্যাপ্ত রাখে তারা কল্যাণ পৃথগ্জন । যারা সংসার মোহে আচ্ছন্ন তাদেরকে অন্ধ পৃথগ্জন বলা হয় । অন্ধ পৃথগ্জনেরা কিছুতেই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে চায় না ।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-(শান্ত্রে দেখা যায়) বুদ্ধের সময় দশসন্তানের জননী এক গৃহবধু অরহত্ব লাভের পর সবিস্ময়ে চিন্তা করে-“কী আশ্চর্য! আমি দশ সন্তানের জননী হয়েও কি করে অরহত্ব লাভ করলাম । সত্যিই আশ্চর্য, অদ্ভুত বটে!” আচ্ছা, সেই দশ সন্তানের জননী কিভাবে অরহত্ব লাভ করেছিল জান? সে তার সন্তানসমূহ মিথ্যারূপে দর্শন করেছে এবং আমিও ধারণা ত্যাগ করেছে, সর্বোপরি অনিত্য দুঃখ অনাত্মা জ্ঞানে সন্তান সম্ভূতি ত্যাগ করেছে বিধায় । এক কথায় আমি বা আমার বলতে কিছুই নেই এজ্ঞান বর্ধিত করায় সে অরহত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল । তোমাদেরকেও নির্বাণ লাভের জন্য আমি, আমার, আমিও ত্যাগ করতঃ অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান নেই, ক্লেশ নেই ভাবে অবস্থান করতে হবে । অরহত্ব কিরূপে হয় জ্ঞান? অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান কঙ্ক নেই, ক্লেশ নেই ভাবে থাকলে । যার চিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ নেই সেই অরহত বা নির্বাণলাভী । তোমরা সকলে একরূপ বল “আমরা অবিদ্যা মুক্ত, তৃষ্ণা মুক্ত, উপাদান মুক্ত, ক্লেশ নিবৃত্তি করে অরহত্ব লাভ করবো । বর্তমানে যেই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ দ্বারা আমরা দুঃখ পাচ্ছি সেই অবিদ্যা, তৃষ্ণাদি প্রহীন করতঃ নির্বাণ পরম সুখে থাকবো ।” বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম সুখ নির্বাণ হল অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ক্লেশের চির নিবৃত্তি

অবস্থা। তাই অন্যান্য ধর্মের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ থাকলেও বৌদ্ধধর্মে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ নেই। বৌদ্ধধর্ম অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত একটি ধর্ম। তাই চিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণাদি বিদ্যমান থাকলে বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাক, আচরণ করতেও সমর্থ হবে না।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা স্বর্গ ব্রহ্মা লাভের শিক্ষা নয়। ভগবান বুদ্ধ সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত নির্বাণ লাভের শিক্ষা দিয়েছেন। তজ্জন্য বলা হয়েছে, কি পছা অবলম্বন করলে মানুষ যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারে, সেই সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য বুদ্ধ গৃহত্যাগে কৃত সংকল্প হন। রাজারপুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও জগতের মঙ্গলার্থে জ্ঞানের সন্ধানে বহির্গত হলেন। আবার বুদ্ধ চিন্তা করেছিলেন যে, পৃথিবীর কোন কার্যই কঠোর সাধনা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। সেই সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন। এভাবে নিজে সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে এখন লোকের মুক্তির জন্য ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তোমাদেরকেও বীর বিক্রমের সহিত একের পর এক বাধা অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করতে হবে। নির্বাণ লাভের পথে যেই রকম বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হোক না কেন সেই সব বিপত্তিকে টপকিয়ে যেতে হবে। কিছুতেই পিছু হটে আসতে পারবে না। মারের সৃষ্ট শত সহস্র প্রলোভন, লোমহর্ষকর হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শনেও অদম্য বীর্যের সাথে আপন অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, মারের প্রলোভনে, হুমকিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তোমরা কি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে সোজা গৃহী হয়ে যাবে? সে রকম হীন বীর্য হলে তো নির্বাণ লাভ করা যাবে না। মনে রাখবে একবার যখন প্রব্রজিত হয়েছ জীবন ধ্বংস হয়ে গেলেও প্রব্রজ্যা ত্যাগ করবে না। যেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে প্রব্রজিত হয়েছ মাঝপথে এসে সেই লক্ষ্য বিসর্জন দিবে না। “যে বাকুয়া ধচ্যা সিবো ধুবগৈ; আদান্যা ন-গচ্যা”। অর্থাৎ যেই কাজটি শুরু করেছ সেটা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত করে যাও, অর্ধেক বা কিছু অংশ করার পর ইন্তুফা দিবে না। তাই বলা হয়েছে—

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল

এগিয়ে চল বীর।

ক্লেশ, কাঁটায় ফুটবে না গো

সোজা পথে চলো ধীর।

এসব শুনলে তোমাদের কি বীর্য উৎপন্ন হয় না? আমার তো শতগুণে বীর্য বৃদ্ধি পায়। জঙ্গলে অবস্থান করার সময় এগুলো আমি প্রায়ই আবৃত্তি করতাম। আর প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করতাম মনের মধ্যে। সেই উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা আমি কখনো ভেঙ্গে পড়িনি নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও। তোমাদেরকে

সর্বদা আত্মোৎকর্ষ সাধনে তৎপর থাকতে হবে। সেই আত্মোৎকর্ষ কি? আপন উন্নতি, আপন শ্রেষ্ঠত্ব, স্বকীয় উৎকৃষ্টতা। ‘কিরূপে আমি নিজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, নিজকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করব এবং নিজকে উৎকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠা করব’ এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহ তোমাদেরকে সব সময় মনে জাগরুক রাখতে হবে। মনের মধ্যে যাদের নিকট আপন উন্নতি, আপন শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বীয় উৎকৃষ্টতা সাধনের চেষ্টা থাকে তারা কিছুতেই পাপকর্ম সম্পাদন করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন-তোমরা পরধর্ম, পরকর্ম সম্পাদন করবে না, নিজধর্ম (সদ্ধর্ম) এবং নিজ (আপন) কর্ম সম্পাদন কর। যদি দুঃশীলতা আচরণ কর তাহলে সেটা পরধর্ম পরকর্ম করতেছ বলে জানবে। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ ও উপাসক-উপাসিকাদের সামগ্রিক জীবন-যাপন এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেই বিনয় বা শীল প্রজ্ঞপ্তি করেছেন আসলে তা কি জান? পরধর্ম পরকর্ম সম্পাদন করতে বারণ করেছেন মাত্র। তজ্জন্য বলা হয়েছে-

বুদ্ধের আপন কাজে শীল রত্ন যত,
কর্মগুণে লও কিনে, পরিধান কর অবিরত।

সদ্ধর্ম আচরণ ও আপনকর্ম সম্পাদন করতেই শীলের প্রয়োজনীয়তা। শীল বা বিনয় শব্দের অর্থ হল দুর্নীতি বিরোধ আদেশ, অপরাধ করলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান। তোমরা দুর্নীতি আচরণ না করে, সুনীতি আচরণ কর। নিজকে সবসময় দুর্নীতি হতে পৃথক রেখে সুনীতি আচরণ করাই হল তোমাদের আসল কাজ। আচ্ছা, অপরাধ করলে কিভাবে প্রায়শ্চিত্তের ভোগ করা যায়? কে অপরাধ করে জান? চিত্ত চৈতসিক ও রূপের দ্বারাই অপরাধ সংঘটিত হয়। এই অপরাধ বা পাপ সর্বমোট দেড় সহস্র। যথা চিত্ত ১ + চৈতসিক ৫২ + নিম্পন্নরূপ ১৮ + লক্ষণরূপ ৪ = ৭৫ এইগুলোকে দশক্রেশ দ্বারা গুণন করলে $৭৫ \times ১০ = ৭৫০$ । আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ২ কলুষ দ্বারা গুণন করলে $৭৫০ \times ২ = ১৫০০$ । এইরূপে পাপ সর্বমোট দেড় সহস্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত অপরাধের মূলে রয়েছে চিত্ত, চৈতসিক। প্রায়শ্চিত্ত করার অর্থ চিত্তকে অপরাধ হতে ফিরে আনা। চিত্তে চৈতসিক, রূপ এগুলো হল অনিত্যধর্ম, দুঃখপূর্ণ ধর্ম। আর নির্বাণ হল অনাত্ম ধর্ম, অনাত্ম ধর্মের দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়। তোমরা অনিত্য ধর্ম করবে না, দুঃখপূর্ণ ধর্ম করবে না। অনিত্যধর্ম, দুঃখপূর্ণ ধর্ম করলে পাপ উৎপন্ন হয়। চিত্ত, চৈতসিক, রূপের মধ্যে না থাকলে নির্বাণ লাভ হয়। তখন কোন প্রকার পাপ উৎপন্ন হবার অবকাশ নেই, যাবতীয় পাপ হতে চির বিমুক্তি।

তোমরা বাজে কথা বলে বাজে গল্প দিয়ে সময় কাটাতে না। বুদ্ধ বলেছেন-হে ভিক্ষুগণ! তোমরা একে অপরে সাক্ষাৎ হলে ধর্মালোচনা করবে। তা

না হলে মৌনভাব অবলম্বন করে থাকবে। বুদ্ধ আরো বলেছেন, সমস্ত দিন আলাপে সালাপে কাটায়ে, সারারাত্রি নিদ্রা গিয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তি ক'বে সংসার হতে মুক্ত হবে? তাই তোমরা বল-“আমরা সারাদিন আলাপে সালাপে সময় নষ্ট করব না এবং সারারাত্রি নিদ্রা যাব না।” আমি তো তোমাদেরকে মাঝে মাঝে খুব বেশি কথা বলতে শুনি। তোমাদের কি এখনো নিরবতা পালন শিক্ষা বর্ধিত, বহুলীকৃত হয়নি। বেশি কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করবে। যদি কথা বলতে হয় তাহলে দশ প্রকার আর্যসম্মত আলাপই করবে। যথাঃ-(১) শীল কথা-শীল সম্বন্ধীয় আলাপ করা (২) সমাধি কথা-সমাধি সম্বন্ধীয় আলাপ করা (৩) প্রজ্ঞা কথা-প্রজ্ঞা উৎপাদনমূলক আলাপ করা (৪) বিমুক্তি কথা-অরহত্ব ও নির্বাণ বিষয়ক আলাপ করা (৫) বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন কথা-অর্জিত জ্ঞানের পর্যবেক্ষণ আলাপ করা (৬) অল্লেক্ষা কথা-তৃষ্ণাবহুল না হওয়ার জন্য পরস্পরের সহিত আলাপ করা (৭) সন্তুষ্টি কথা-ধর্মত লব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকার জন্য আলাপ করা (৮) প্রবিবেক কথা-প্রবিবেক তিন প্রকার (ক) নির্জন বাস বিষয়ক কায় বিবেক (খ) কাম চিন্তা ত্যাগে ধ্যান চিন্তোৎপাদক চিন্তা বিবেক (গ) পঞ্চকক্ষে আমিত্ব ত্যাগে উপধি বিবেক। এই তিন প্রকার বিবেক বিষয়ে আলাপ করা (৯) অসংসর্গ কথা-স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগে সুখ এই সম্বন্ধে (বা প্রকারে) আলাপ করা (১০) বীর্যরম্ভ কথা-কিভাবে বীর্যোপাদান করা যায় সেই সম্বন্ধে আলাপ করা। ভগবান প্রব্রজিতগণকে এই দশ প্রকার আর্যসম্মত আলাপ করে একে অপরকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দান করতে বলেছেন। যাতে করে প্রব্রজিত জীবন চিরস্থায়ী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে। শীল কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযমই শীল। ব্যতিক্রম ক্রেশসমূহ ধ্বংস করতেই শীল। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যতিক্রম ক্রেশসমূহ ধ্বংস হয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত শীল পালন করতে হবে। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, কটু, ভেদ, বৃথা বাক্য ও মিথ্যাজীবিকা এই আটটি ব্যতিক্রম ক্রেশ। গৃহীদের ক্ষেত্রে মৎস্য, মাংস, অস্ত্র, সুরা, বিষ এই পঞ্চ নিষিদ্ধ বাণিজ্যই মিথ্যাজীবিকা। ভিক্ষুসঙ্ঘের ক্ষেত্রে লপন, কুহন, নিমিত্ত, নিষ্পেষণ এই চতুর্বিধ কর্মই মিথ্যাজীবিকা নামে অভিহিত। লপন কর্ম কিরূপ? ভালো, উত্তম প্রত্যয় লাভের আশায় গৃহীর মনোরঞ্জনার্থে তাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া। কুহন কর্ম কিরূপ? অত্যাধিক লাভ-সংকার, যশকীর্তি, সুনাম লাভের জন্য গৃহীর মন আকষণার্থে আমি খুব শীলবান সমাধি লাভী বলে প্রচার করা তথা নিজের নিকট অবিদ্যমান গুণসকল বিদ্যমান আছে বলে প্রকাশ করতঃ অন্যদের সহিত প্রতারণা করাই কুহন কর্ম। নিমিত্ত কর্ম কিরূপ? অলঙ্কারী অবস্থায় দর্শন করে থাকা, অর্থাৎ কোন একজন দায়ককে খাদ্য নিয়ে যেতে দেখে নিজে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য কিহে, উপাসক খাদ্য আনতেছ, বেশ ভালো খাদ্যই তো

পেয়েছ বলে দর্শন করে থাকাকে নিমিত্ত কর্ম বলে। নিষ্পেষণ কর্ম কিরূপ? নিষ্পেষণ অর্থ পরের গুণ মেন্ছে ফেলা দেওয়া। সে কি আর শীলবান, প্রজ্ঞাবান, নির্বাণলাভী এভাবে পরের শীলগুণ, ধূতান্গুণ, মার্গফলগুণ, নির্বাণগুণ মুঁছে ফেলে দিয়ে নিজে লাভবান হওয়ার উপায় অবলম্বনকে নিষ্পেষণ কর্ম বলা হয়। বুদ্ধ কর্তৃক ঘৃণিত এই কর্মদ্বারা জীবন-যাপন করাই (ভিক্ষুদের জন্য) মিথ্যাঙ্গীবিদ্যা। এই আটটি ব্যতিক্রম ক্রেশ সমূলে ধ্বংস হলে শীল শিক্ষা সমাপ্ত হবে। তারপর সমাধি শিক্ষা শুরু করবে। সমাধি শিক্ষা কতদিন করতে হবে? যতদিন পর্যন্ত পর্যটন ক্রেশ ধ্বংস না হয় ততদিন পর্যন্ত সমাধি শিক্ষা করে যেতে হবে। সেই পর্যটন ক্রেশসমূহ কি? পঞ্চনীবরণ, যথা-কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা। সমাধি শিক্ষা দ্বারা পঞ্চনীবরণ ধ্বংস হয়ে গেলে সমাধি শিক্ষা সমাপ্ত হবে। তখন আর সমাধি শিক্ষার প্রয়োজন থাকবে না। সমাধি শিক্ষা সমাপ্ত হলে প্রজ্ঞা শিক্ষা করতে হবে। প্রজ্ঞা শিক্ষা কতদিন পর্যন্ত করে যেতে হবে? যতদিন পর্যন্ত অনুশয় ক্রেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রজ্ঞা শিক্ষা করে যেতেই হবে। দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ যত বৎসর এমনকি জীবন প্রদীপ নিভে যাবার পূর্ব পর্যন্তও যদি অনুশয় ক্রেশ ধ্বংস হয়ে না যায় ততদিন পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রজ্ঞা শিক্ষা করতে হবে। আবার যদি এক, দুই, পনের দিনে অনুশয় ক্রেশ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পনের দিনে প্রজ্ঞা শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। অনুশয় ক্রেশ কি? সত্ত অনুশয়, যথা-(১) কামরাগানুশয় (২) ভবরাগানুশয় (৩) প্রতিঘানুশয় (৪) মানানুশয় (৫) দৃষ্টি অনুশয় (৬) বিচিকিৎসানুশয় ও (৭) অবিদ্যানুশয়। শীল শিক্ষা দ্বারা ব্যতিক্রম ক্রেশ, সমাধি শিক্ষা দ্বারা পর্যটন ক্রেশ, প্রজ্ঞা শিক্ষা দ্বারা অনুশয় ক্রেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ হয়। তোমরা অতিসত্ত্বর শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা পর্যায়ক্রমে সমাপ্ত করতঃ নির্বাণ পরম সুখ লাভে তৎপর থাক।

পরিশেষে বনভঙ্কে বলেন-চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিকে যথাযথভাবে জানতে, বুঝতে না পারলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। যারা এই চারি আর্যসত্যকে এবং প্রতীত্য সমুৎপাদনীতিকে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে বুঝতে, জানতে অক্ষম তাদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম দুর্জয়। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে চারি আর্যসত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদনীতির কথা নেই বলে তারা পুনর্জন্মের বিশ্বাসী নয়। ফলে নানাবিধ দুষ্কর্ম সম্পাদনে তাদের জন্য সহজ কাজ বৈকি! প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির কথা নেই বলে তারা পুনর্জন্মকে দেখতে পায় না। যাকে দেখা যায় না তাকে অবিদ্যমান ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞানের দ্বারা পুনর্জন্মকে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং পুনর্জন্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়।

সতিপট্ঠান সূত্রে পুনর্জন্মকে এভাবে প্রকাশিত করা হয়েছে “যা যং তণ্হা পোনোভাবিকা নন্দিরাগ সহগত তত্র তত্রা ভিনন্দিনী”। অর্থাৎ যে তৃষ্ণা পুনর্জন্মের কারণ, যার সহিত আনন্দ ও আসক্তি থাকে, যা যেখানে সেখানে পুনর্জন্ম হবার অভিলাষ করে। যথা-কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। কামতৃষ্ণা হল স্বামী-স্ত্রীরূপে সংসারে সুখভোগের ইচ্ছা বা পঞ্চকামগুণ সুখে প্রমত্ত হওত প্রমত্তার মধ্যে সুখ লাভের ইচ্ছা। ভব তৃষ্ণা-ভব ভবান্তরে সুখ ভোগের বাসনা। কামভব, রূপভব, অরূপভব এই ত্রিভবের মধ্যে নানা যোনিতে পুনঃপুন জন্ম হয়ে সুখ ভোগ করার ইচ্ছা। বিভবতৃষ্ণা-উচ্ছেদ ধ্বংস জনিত বীততৃষ্ণা ইত্যাদির মাধ্যমে সুখ ভোগ করে যাওয়ার ইচ্ছা। চাকমা সমাজে একটা কথা আছে “দিলুং ভাতজড়া গত্তারে মলে মরিবোং সমারে” এটাও বিভবতৃষ্ণা বলে জানবে।

তোমরা যদি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে চাও, নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে চাও তাহলে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ কর। বুদ্ধগুরু ব্যতীত অন্য কোন গুরুর আশ্রয়, শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করবে না। বুদ্ধ গুরু ব্যতিরেকে কোন গুরুর পক্ষে দুঃখমুক্তি নির্বাণ মার্গ প্রদর্শন করার সামর্থ্য নেই। বুদ্ধের শিক্ষা ছাড়া অন্য কারোর শিক্ষায় নির্বাণ লাভ করা যায় না। তজ্জন্য নির্বাণ লাভেচ্ছুকগণকে এরূপ কৃতসংকল্প হতে হবে যে, “আমি একমাত্র বুদ্ধের উপদেশেই নির্বাণ লাভ করব, অন্য কারোর শিক্ষায় বা উপদেশে নয়।” তোমরাও সেরূপ কৃতসংকল্প হয়ে নির্বাণ লাভী হও। বুদ্ধের শিক্ষা বাদ দিয়ে অন্য গুরুর শিক্ষা গ্রহণে নির্বাণ-বিমুক্তি সম্ভব নহে কি? চিন্তকে সেরূপে সংশয়াচ্ছন্ন করা হলে নির্বাণ লাভ হবে না। বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা ভিন্ন কিছুতেই নির্বাণ লাভ হয় না। এইরূপ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তের অধিকারী হয়ে তোমরা নির্বাণ লাভে তৎপর থাক।

সাধু, সাধু, সাধু।

ষড় ইন্দ্রিয়কে দমন করতে অসমর্থ হলে দুঃখ পেতে হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশুভির (বনভক্তে) মহোদয় নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশনা প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা আমার সান্নিধ্যে এসে প্রব্রজিত হয়েছ সুখ লাভের জন্য নয় কি? দুঃখ ভোগ করার জন্য তো নয়। এখানে তোমরা কিষ্ট্র ভোগ বিলাসের সুখ করতে পারবে না; আমোদ প্রমোদের সুখ করতে পারবে না। তাহলে কি সুখ? ত্যাগে সুখ, নিরোধে সুখ, নিবৃত্তিতে সুখ, অনাসক্তে সুখ লাভ করে থাকতে হবে। তোমাদেরকে কেহ যদি প্রশ্ন করে তোমরা প্রব্রজিত হয়ে কি রকম সুখে অবস্থান করতেছ? তাদেরকে বলবে “আমরা ত্যাগে সুখ, নিরোধে সুখ, নিবৃত্তিতে সুখ, অনাসক্তে সুখ লাভ করে অবস্থান করিতেছি।” সেই ত্যাগ কি? অবিদ্যা ত্যাগ, তৃষ্ণা ত্যাগ। নিরোধ কি? অবিদ্যা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধ। নিবৃত্তি কি? ক্লেশ নিবৃত্তি। অনাসক্ত কি? পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনাসক্ত। অন্যদিকে সেই ত্যাগ সুখ কি রকম? স্বল্পসুখ পরিত্যাগ করে বিপুল সুখ অর্থাৎ নির্বাণ সুখ লাভ করা। ভোগ ত্যাগ করলে প্রকৃত সুখ নির্বাণ লাভ হয়। বুদ্ধ বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বল্পসুখ পরিত্যাগ করে যদি বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা পান, তবে তিনি স্বল্প সুখ অবশ্যই ত্যাগ করবেন। জ্ঞানী ব্যক্তির সম্যক বিবেচনা করে পরম সুখ নির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় পার্থিব সুখকে প্রত্যাখান করেন। তারা আপাত সুখকে পরিহার করে চিরস্থায়ী ও প্রকৃতসুখ নির্বাণকে বেছে নেন। আবার, যেই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের জন্য অথবা পরের জন্য ধন কামনা, পুত্রকামনা, রাজ্যকামনা, এমনকি (অধর্মত উপায়ে) আপন সমৃদ্ধিও ইচ্ছা করে না, তিনিই প্রকৃত শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ধার্মিক। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানেন যে, এসবের দ্বারা প্রকৃত সুখ, শান্তি লাভ হয় না। ভোগ্য সুখের সেই উপকরণ লাভে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না। তোমরা অজ্ঞানী হলে নিজের তথা অপরের (স্বীয় প্রিয়, মনোজ্ঞ ব্যক্তির) জন্য ধন কামনা, পুত্র কামনা, রাজ্য কামনা এবং নিজের সমৃদ্ধি প্রত্যাশী হবে। বলা যায়, যারা সেইরূপ কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে অবস্থান করে তারা অজ্ঞানী বলেই পরিগণিত হয়। তাই তোমরা অজ্ঞানী না হয়ে জ্ঞানী এবং শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ধার্মিক হয়ে অবস্থান কর। কিভাবে জ্ঞানী ও শীলবান প্রজ্ঞাবান, ধার্মিক হবে? নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য ধন, পুত্র, রাজ্য ও সমৃদ্ধি কামনা না করার নীতি অনুসরণ করে। জ্ঞানী ব্যক্তির সেই সব বিষয়ে সতত স্পৃহাশূন্য হয়ে অবস্থান করেন। তারা পার্থিব কামনা বাসনা হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকেন। বুদ্ধ বলেছেন, কামনা বাসনা বিজয়ী জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যধর্মের সন্ধান পেয়ে পরের বৃথা কথায় কর্ণপাত না করে আপন মনে নিজ কর্তব্য

সম্পাদন করে থাকেন। তাহলে তোমাদের কাজ কি জ্ঞান? কামনা বাসনা জয় করা।

ষড় ইন্দ্রিয়কে দমন করতে অসমর্থ হলে দুঃখ পেতে হয়। যতদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করতঃ স্বীয় বাধ্যগত করা না যায় ততদিন পর্যন্ত শীল সমাধি প্রজ্ঞা লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ অদমিত ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বদা অকুশল পাপের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। আবার সেদিকে খুব বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরবর্তীতে ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যকপথে ফিরিয়ে আনা সুকঠিন হয়। তাই বলা হয়েছে,-

চক্ষুশ্রবণ অন্ধতুল্য বিহার করিবে,
কর্ণ বর্তমানে তুমি বধির হইবে।
অস্তিম গমন কাল আসিবে যখন,
নিষ্পাপ সন্তুষ্ট চিন্তে করিবে শয়ন।

অদমিত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শে, মননে পাপই উৎপন্ন হয়। সেই অদমিত ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়-বাসনায় অতিশয় প্রমত্ত হয়ে মুক্তির পথকে কণ্টকময় করে তোলে। তাই জ্ঞানীরা অদমিত, অসংযম ইন্দ্রিয়কে অতিশয় ভয়ের চক্ষে দেখেন এবং ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত থাকে না। বরং ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করতঃ অপ্রমাদকে অনুশীলন করে নির্বাণ উপলব্ধি করেন। কিভাবে? চক্ষু বিদ্যমান থাকতে অন্ধের ন্যায়, কর্ণ বিদ্যমান থাকতে বধিরের ন্যায়, জ্ঞান বিদ্যমান থাকতে বোবার ন্যায়, শক্তি বিদ্যমান থাকতে দুর্বলের ন্যায় এবং প্রাণ বিদ্যমান থাকতে মৃতের ন্যায় হয়ে অবস্থান করে। অর্থাৎ অন্ধ, বধির, বোবা, দুর্বল, মৃতের ন্যায় হয়ে প্রমাদকে সর্বতোভাবে পরিহারপূর্বক নির্বাণ লাভের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টায় থাকতে বলেন। তোমরাও সেই নিয়ম অনুসরণ করতে পারবে কি? চক্ষু ইন্দ্রিয়ে কোন রূপ বা দৃশ্য প্রতিভাত (বা দৃষ্টিগোচর) হলেও তা' আমি দেখিনি, কর্ণ ইন্দ্রিয়ে কোন শব্দ এসে পৌছলেও তা' আমি শুনি নি বলে জ্ঞানত বিচার করতে হবে। অন্যদিকে, স্মৃতির মানসপথে যদি চক্ষু ইন্দ্রিয়ে কোনরূপ ধরা পড়ে তাহলে কেবলমাত্র দেখছি বলে জানবে। পশু-পক্ষী দেখছি নাকি মানুষ দেখছি, পুরুষ দেখছি নাকি মহিলা দেখছি, সুন্দর দেখছি নাকি বিশ্রী দেখছি এভাবে বাদ বিচার করা যাবে না। কর্ণ ইন্দ্রিয়ে কোন শব্দ এসে লাগলেও কেবলমাত্র শুনি বলে জানবে। পশু-পক্ষীর শব্দ শুনি নাকি মানুষের শব্দ শুনি, পুরুষের শব্দ শুনি নাকি মহিলার শব্দ শুনি, কর্ণসুখকর শব্দ শুনি নাকি বিরক্তিকর শব্দ শুনি এভাবে বাদ বিচার করা যাবে না। নাসিকা ইন্দ্রিয়ে কোন গন্ধ এসে লাগলেও কেবলমাত্র গন্ধ বলে জানবে। সুগন্ধ নাকি দুর্গন্ধ, পুরুষের গন্ধ নাকি মহিলার গন্ধ, পশু-পক্ষীর গন্ধ নাকি মানুষের গন্ধ

এভাবে বাদ বিচার করা যাবে না। জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে কোন খাদ্য এসে পড়লেও কেবলমাত্র খাচ্ছি বলে জানবে। টক খাচ্ছি নাকি মিষ্টি খাচ্ছি, অমৃকের টক খাচ্ছি, অমৃকের মিষ্টি খাচ্ছি এভাবে বাদ বিচার করা যাবে না। কায় ইন্দ্রিয়ে কোন কিছু স্পর্শ হলেও তা কেবলমাত্র স্পর্শ বলে জানবে। সুখকর স্পর্শ নাকি দুঃখকর স্পর্শ, ঠাণ্ডা নাকি গরম এভাবে বিচার করা যাবে না। মন ইন্দ্রিয়েও যদি কোন চিন্তা বা কল্পনার উদয় হয় কেবলমাত্র চিন্তা বা কল্পনা বলে জানবে। কিসের চিন্তা বা কল্পনা বাদ বিচার করে তাতে ডুবে যেতে পারবে না। ইন্দ্রিয়ে গোচরীভূত আলম্বনসমূহ বাদ বিচার করলে তাতে চিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন স্মৃতি ভাবনায় একাত্মতা স্থাপন করা কষ্টকর হবে।

পূজ্য বনভঙ্কে আরো বলেন—তোমরা সর্বদা অনিত্য দুঃখ অনাত্ম দর্শন করে অবস্থান কর। এই ত্রিবিধ দর্শন ভাবিত, বর্ধিত, বহুলীকৃত করলে নির্বাণ লাভ করতে সমর্থ হবে। অনিত্য কি? ক্ষয় লয় হচ্ছে বলে অনিত্য। দুঃখ কি? অহরহ নিম্পেষিত হচ্ছে বলে দুঃখ। অনাত্ম কি? আপনার নহে বলে অনাত্ম, কেহকে ইচ্ছা মত পরিচালিত করতে পারে না বলে অনাত্ম, অনিচ্ছা বশে সংঘটিত হচ্ছে বলে অনাত্ম। এই ত্রিবিধ দর্শনই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। যখন কোন সাধক সম্যক জ্ঞানের দ্বারা এ' ত্রিবিধ দর্শন উপলব্ধি করেন তখন তিনি সর্ব দুঃখে নির্বেদ প্রাপ্ত হন। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মই হল বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও সারাংশ। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মকে বিস্তারিতভাবে খুলে বলতে গিয়ে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ বা ত্রিপিটক শাস্ত্রের উৎপত্তি। সেই ত্রিপিটক শাস্ত্রে আমরা বুদ্ধের শিক্ষা ও বুদ্ধের উপদেশ লাভ করে থাকি। নির্বাণ লাভের জন্য তোমরা নির্বাণের শিক্ষা, নির্বাণের উপদেশ, নির্বাণের ট্রেনিং, নির্বাণের জ্ঞানার্জনে তৎপর থাক। ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে নির্বাণের শিক্ষা ও নির্বাণের উপদেশ রয়েছে। ত্রিপিটক শাস্ত্র পাঠ করে নির্বাণের শিক্ষা, নির্বাণের উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করতে ত্রিপিটক শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বর্তমান পুস্তকের যুগে নির্বাণ যেতে হলে শিক্ষিত হতে হবে। নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করার পর নির্বাণের ট্রেনিং, নির্বাণের জ্ঞান অর্জন করে নিতে হবে। কিভাবে? বলা বাহুল্য যে, ত্রিপিটক শাস্ত্রে নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ থাকলেও নির্বাণের ট্রেনিং, নির্বাণের জ্ঞান সেখানে নেই। নির্বাণের ট্রেনিং নিজকে স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা নিতে হবে এবং নির্বাণের জ্ঞানটুকুও নিজকে সম্যক জ্ঞানের আলোকে অর্জন করতে হবে। ট্রেনিং ছাড়া কোন কাজে সফলতা আসে না; তাই নির্বাণ যেতে হলে তোমাদেরকেও নির্বাণের ট্রেনিং নিতেই হবে। নির্বাণের ট্রেনিং কি? আত্মদমন, চিত্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন। আত্মদমনই সুখ, চিত্তদমনই সুখ, ইন্দ্রিয়দমনই সুখ। আত্মদমন করা হল অহংবোধকে ত্যাগ করা। চিত্তদমন হল

চিন্তকে কোন প্রকার পাপ অকুশলের দিকে ধাবিত হতে না দেওয়া এবং চিন্তের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত অকুশল, অকুশল ভাবকে বিদূরিত করা। ইন্দ্রিয়দমন হল ষড় ইন্দ্রিয়কে সংযত করতঃ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অকুশল পাপ না করা। এভাবে নির্বাণের ট্রেনিং সমাপ্ত হলে নির্বাণের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পঞ্চক্ক দৃষ্ট আর্ষসত্য, অবিদ্যা তৃষ্ণা সমুদয় আর্ষসত্য, নির্বাণ নিরোধ আর্ষসত্য, শমথ বিদর্শন মার্গ আর্ষসত্য এ' চারি আর্ষসত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করাকে নির্বাণের জ্ঞান অর্জন করা বুঝায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণের জ্ঞান না জন্মাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচিকিৎসা বা সন্দেহ কারোর দুরীভূত হবে না। বিচিকিৎসা বা সন্দেহ হতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে যাবতীয় দুঃখ হতে নিবৃত্তি লাভের জন্যই নির্বাণ।

সুখ-দুঃখ উভয় বন্ধন হতে চিরমুক্তিই হল নির্বাণ। বর্তমানে সুখ লাভ হলে জানবে সেটা সুখের বন্ধন। আর দুঃখ ভোগ করতে হলে জানবে সেটা দুঃখের বন্ধন। মনে রাখবে যে, বর্তমানে যেই সুখ লাভ (অনুভূত) হচ্ছে, সেই সুখ বেশিদিন থাকবে না; আর যেই দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে, সেই দুঃখও বেশিদিন থাকবে না। কারণ সুখ-দুঃখ সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী সেই সুখ লাভ হলে আনন্দিত, উল্লাসিত হন না আর সীমাহীন দুঃখের সম্মুখীন হলেও হতাশা হন না, ভেঙ্গে পড়ে না। সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় তারা অনাসক্ত থেকে নির্বাণের অনুসন্ধান করেন।

তিনি বলেন-তোমরা সত্য মিথ্যা যাচাই করে অবস্থান কর। সত্য মিথ্যা যাচাই না করে আন্দাজের সহিত কোন কিছু গ্রহণ করবে না। যাচাই করার পর সত্য বলে প্রমাণিত হলে গ্রহণ কর। অন্যদিকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে বর্জন কর। মিথ্যাকে কখনো গ্রহণ করবে না। তাতে সুখের বিপরীতে দুঃখ আর সম্যক মার্গে বিপরীতে মিথ্যা মার্গে দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তবে সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের। জ্ঞান না থাকলে অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য মিথ্যা যাচাই করা সম্ভব হয় কি? কিছুতেই হয় না। কাজেই সত্য মিথ্যা নিরূপণে অক্ষম অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই আন্দাজের সহিত যে কেহ জনের কথাই বিশ্বাস করে, তাদের কথা গ্রহণ করে; তাদেরকে গুরুরূপে মেনে নেয়। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সত্য মিথ্যা যাচাই করার পর সম্যক সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তির কথা গ্রহণ করতঃ তাকে গুরুরূপে মেনে নেন। সংপরামর্শ ভালো উপদেশ লাভের জন্য তাদেরকে আর এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। বার বার গুরু পরিবর্তন করার প্রয়োজনও পড়ে না। তোমাদেরকেও বলছি, তোমরা আমার কথা মেনে চল। কখনো নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবে না। আচ্ছা, ধর তুমি কোন একটি পথ হারিয়ে ফেলার পর সেটা খুঁজে পেতে চারজনের শরণাপন্ন হলে, আর তারা কেহ

উত্তর দিকে', কেহ দক্ষিণ দিকে', কেহ পূর্বদিকে', কেহ পশ্চিম দিকে', বলে দেখিয়ে দিলে, তখন পথের সঠিক সন্ধানটুকু পাওয়া যাবে কি? কিছুতেই না। ঠিক তদ্রূপ গুরুর সংখ্যা যতই বাড়বে তাদের নির্দেশিত মতেরও ততই বিভ্রান্তি ঘটবে। তাই তোমাদেরকে একগুরুর উপদেশ মত নির্বাণ মার্গের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যারা অজ্ঞানী সত্য মিথ্যা যাচাই করতে অপারগ কেবল তারই নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে তাদের না হয় বর্তমান সুখ লাভ, না মিলে সঠিক পথের সন্ধান। শুধুমাত্র সারাজীবন দৌড়াদৌড়ি করাই সার হয়। যারা কারোর উপদেশ গ্রহণ না করে আপন প্রতিভা বলে জ্ঞান লাভ করে তারা সম্যক সম্বুদ্ধ নামে কথিত। আর যারা শুধুমাত্র বুদ্ধের উপদেশে জ্ঞান লাভ করে তাদেরকে বলা হয় অর্হৎ। তোমরাও যদি অর্হৎ লাভ করতে চাও তাহলে কেবলমাত্র বুদ্ধের উপদেশই মেনে চলবে। বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন গুরুর উপদেশে অর্হৎ লাভ করা যায় না। বুদ্ধের উপদেশ ছাড়া নির্বাণ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

তোমরা পঞ্চস্কন্ধকে পরিত্যাগ করতঃ পরম সুখে অবস্থান কর। কখনো পঞ্চস্কন্ধে প্রিয়, প্রেম ভালোবাসা করবে না। পঞ্চস্কন্ধে প্রিয় প্রেম ভালোবাসা করলে পরিত্যক্ত তুমের স্বপ্নে চড়ুই পাখির খাদ্য (চাউল) অনুসন্ধান করার ন্যায় হবে। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ, পরিত্যক্ত তুমের স্বপ্নে ঝাঁক ঝাঁক চড়ুই পাখি এসে সারাদিন ধরে খাদ্যের অন্বেষণে তুষ উল্টাতেই থাকে। আচ্ছা, চড়ুই পাখিরা চাউলের সন্ধান পায় কি? পেট ভরে খাদ্য খেতে সক্ষম হয় কি? হয় না। কারণ সেই পরিত্যক্ত তুমের স্বপ্নে তো চাউল থাকে না। হয়ত খুব ভাগ্যের জোরে দু'একটা ভান্সা চাউলের অংশবিশেষ খেতে পায় এ'টুকুমাত্র। তাতে তাদের ক্ষুধার জ্বালা মিটে যাওয়া দূরের কথা বরং বৃদ্ধির কারণই হয়। কিন্তু জ্ঞান হীন পাখি জানতে পারে না যে, সেই তুমের স্বপ্নে চাউল থাকে না। সারাদিন তুষ উল্টালেও তাদের পেটে তেমন কিছু খাদ্য জুটবে না। অধিকন্তু তাদের সারাদিনের শ্রমটুকুই পণ্ড হয়ে যায় মাত্র। ঠিক তদ্রূপ এই পঞ্চস্কন্ধেও প্রকৃত সুখ বলে কিছু নেই, সার বলে কিছু নেই, সত্য বলে কিছু নেই। মিথ্যা অসার পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে অবস্থান করলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। নির্বাণ লাভেচ্ছুকগণকে মিথ্যা, অসার পঞ্চস্কন্ধকে পরিত্যাগ করতে হবে। তা না হলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ অসম্ভব। তাই বলা হয়েছে-

যে পঞ্চস্কন্ধকে ভালোবাসে, দুঃখকে সে বাসে ভালো,
দুঃখকে যে ভালোবাসে, দুঃখ হ'তে চিরকাল,
মুক্তি কভু নাহি লভে কহে বুদ্ধ ভগবান,
তাই পঞ্চস্কন্ধে প্রেম নাহি কর হে ধীমান।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এগুলো হল পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধ

আমি নই, আমার নয়, আমার আত্মা নয়—এরূপ জ্ঞানের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম উপলব্ধি করতে পারলে নির্বাণ সুখ লাভ হয়। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি প্রিয়, প্রেম, ভালোবাসা উচ্ছেদ সাধন পূর্বক তোমরা সকলে নির্বাণ সুখ লাভে তৎপর থাক। ইহাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম প্রাপ্তি লাভ।

পরিশেষে পূজ্যভগ্নে বলেন—তোমরা ভোগ পরিত্যাগ করে অবস্থান কর। দায়ক-দায়িকাগণ দান দিলেও তোমরা তা' ভোগ করবে না। মনে রাখবে ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়ালে সঙ্কর্ম থেকে চ্যুত হতে হয়। সঙ্কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আর সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বৌদ্ধধর্ম ভোগ বিরোধী ধর্ম। এখানে কোথাও ভোগ করার উপদেশ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়নি। এ ধর্মের মতে ভোগ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তাই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প খেতে শুরু করি। কখনো ভোগী হয়নি বা বেশি পরিভোগের ইচ্ছা করিনি। আমার উপদেশ হল, তোমরা ভোগ করতে সংকোচ বোধ করবে। সব সময় স্মরণ রাখবে “ভোগ করার জন্য তো.আমরা প্রব্রজিত হইনি; সুতরাং ভোগ করবই বা কেন?” প্রব্রজিত হয়ে যদি বেশি ভোগ করতে থাক তাহলে দায়ক-দায়িকাগণ ভাববে যে, তোমরা গরিব ঘরের ছেলে, প্রব্রজিত হবার আগে ঠিকমত খাবার জুটেনি বিধায় প্রব্রজিত হয়ে ভোগে রত হয়েছে। প্রব্রজিতদের অতি ভোজন বিষপান সদৃশ। অতি ভোজন করে কারা? যারা তৃষ্ণাতুর তারাই তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে অতি ভোজন করে থাকে। তৃষ্ণাকে ধ্বংস ক্ষয় করতে চেষ্টাশীল ব্যক্তির যতসম্ভব অল্প পরিমাণ ভোজন করতঃ সন্তুষ্ট মনে অবস্থান করে। তাই হ্রিবির শারীপুত্র বলেছেন—

চারি কিংবা পঞ্চ গ্রাস পুরিয়ে জলেতে,

ধ্যান রত শ্রমণের সুখ বিহার তরে।

অতি ভোজন করলে শরীরে আলস্য ও তন্দ্রা ভাব এসে শরীরটাকে অকর্মণ্য করে দেয়। তখন ঠিকমত ধ্যান-সমাধি অনুশীলন করা সম্ভব হয় না। তাই বুদ্ধ বলেছেন অল্প ভোজনই সুখ; এতে শরীর একদিকে যেমন কর্মক্ষম থাকে অন্যদিকে তেমনি শরীরে রোগ ব্যাধি স্থান করে নিতে পারে না। তজ্জন্য ভিক্ষুগণ তোমরা অন্নাহারই করবে। অন্নহারের দ্বারা সহজে তৃষ্ণাকে ক্ষয়সাধন করা সম্ভব হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

কোম্পানীর বোতল ফেরৎ দিতে হবে

এক সময় পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাখনানন্দ মহাশুভির (বনভক্তে) মহোদয় নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমরা আত্মদমন, চিন্তদমন, ইন্দ্রিয়দমন কর। দমন অর্থ বাধ্য করা। আত্মদমনই সুখ, চিন্তদমনই সুখ, ইন্দ্রিয়দমন সুখ। সত্ত্বগুণের আত্ম অদমিত, চিন্ত অদমিত, ইন্দ্রিয় অদমিত; তারা আত্মকে দমন করতে পারছে না, চিন্তকে দমন করতে পারছে না, ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পারছে না বিধায় অসহ্য দুঃখ যাতনার শিকার হচ্ছে। মানুষের সমস্ত দুঃখ অশান্তির মূলের রয়েছে এই অদমিত ইন্দ্রিয়। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। অদমিত, অসংযম ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ বিষয়সেবী হয়ে চিন্তকে অস্থির, চঞ্চল করে তোলে। আর ভোগ বাসনার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই তৃষ্ণার প্রগীড়নে অস্থির, চঞ্চল চিন্তের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য জানার অবকাশ নেই, তাই তার প্রজ্ঞা পরিপূর্ণতায় পৌছায় না। ইন্দ্রিয় সবকটিকে দমন করে শুদ্ধ করতে না পারলে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানোর আশা সুদূর পরাহত। যারা ইন্দ্রিয়দমন করতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় মন সংযত করতে পারে একমাত্র তারাই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটায় প্রকৃত সুখ, শান্তি নির্বাণ লাভ করে থাকে।

তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশাভিভূত চিন্তে অবস্থান করবে না। চিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ বিদ্যমান কখনো নির্বাণ লাভ হয় না। মনে রাখবে অবিদ্যা বিদ্যামানে দুঃখ, তৃষ্ণা বিদ্যামানে দুঃখ, উপাদানে বিদ্যামানে দুঃখ, ক্লেশ বিদ্যামানে দুঃখ এবং চিন্ত গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। অবিদ্যাই তোমাদেরকে দুঃখ প্রদান করতেছে, তৃষ্ণাই তোমাদেরকে দুঃখ প্রদান করতেছে, উপাদানেই তোমাদেরকে দুঃখ প্রদান করতেছে, ক্লেশেই তোমাদেরকে দুঃখ প্রদান করতেছে। সে অবস্থায় দুঃখের অবসান করা যায় না কিছুতেই। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ সমূলে উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম হলে তবেই দুঃখ থেকে মুক্তি। তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ত্যাগ ও ক্লেশ নিবৃত্তি করতঃ নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে তৎপর থাক। মনচিন্তের মধ্যে কখনো অবিদ্যা, তৃষ্ণা উপাদানকে স্থান দিবে না। একবার মাত্র স্থান পেলেই সমস্ত চিন্তকে অধিকার করে বসবে। আর তখন প্রব্রজিত জীবন রক্ষা করাও কষ্টকর হয়ে পড়বে। এমন কি চ্যুত হয়ে যেতেও পারে। তাই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানসমূহ উৎপন্ন হবার আগেই সর্বতোভাবে পরিহার করে চলতে সচেষ্ট থাকবে। বৌদ্ধধর্ম অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ মুক্ত। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে

অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ বিদ্যমান থাকলেও বৌদ্ধধর্মে থাকতে পারে না। এমন কি অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ বিদ্যমান চিন্তে এ'ধর্ম অনুশীলন করাও যায় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বুদ্ধরূপী মহাসূর্য উদিত না হলে জগত অবিদ্যাক্ষকারে আবৃত থাকে। বুদ্ধসূর্যের আলোক ভিন্ন অবিদ্যা মুক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, উপাদানমুক্ত, ক্লেশমুক্ত নির্বাণের পথ দেখা যায় না। আমি কথাটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তোমরাও কর কি? হ্যাঁ ভগ্নে, সকলের একবাক্যে স্বীকারোক্তি। বুদ্ধগণের উৎপত্তিতে জগদ্বাসী অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ, হতে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়। কারণ বুদ্ধগণ নিজেরা যাবতীয় দুঃখরাশি হতে মুক্ত হয়ে অপরাপর দুঃখহস্ত সত্ত্বগণের জন্য মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। সেজন্য বুদ্ধের উৎপত্তি সকলের সুখবিধায়ক। মুক্তিকামীগণ তাঁদের (বুদ্ধগণের) প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করে, প্রচারিত সদ্ধর্মবাণী শ্রবণ করে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ মুক্ত হয়ে সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে।

তিনি আরো বলেন—তোমরা যদি অজ্ঞানী হও তাহলে সংসারী এই নর-নারীদেরকে দেখে সুখ বলে মনে করবে। এবং তাদের মত সংসারী সুখ ভোগে রত হতে চাইবে। ‘অমুক যুবতীটি দেখতে সুন্দরী তাকে বিয়ে করলে ভালো হবে, সংসারী হয়ে অমুক চাকুরি (কাজ) করে জীবন-যাপন করব’ ইত্যাদি হীনচিন্তা, পরিকল্পনার আঁচ কাটবে মনের মধ্যে। কিন্তু জ্ঞানীজনেরা সংসারের দৈনন্দিন ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত কেবলমাত্র কাপড়ে-চোপড়ে সুখী নর-নারীদের দেখে কখনো সুখ বলে মনে করে না। তারা বাহ্যিক মিথ্যা সুখের আভরণে যে অসহ্য দুঃখ, যাতনা নিহিত রয়েছে সেই প্রকৃত সত্যটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই সংসারী জীবনের কামনা বাসনার সংঘাতে তাদেরকে আর ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় না। গৃহীজীবন তাদের কাছে ভীতিকর। সংসারী জীবনের অজস্র দুঃখকে অবহিত হয়ে তারা সংসার নিবৃত্ত চিন্তে প্রব্রজিত জীবন-যাপন করে অনন্ত সুখের অধিকারী হন। বুদ্ধের মতে মানুষ মিথ্যা, দেবতা মিথ্যা, ব্রহ্মা মিথ্যা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মিথ্যা, মার মিথ্যা। মানুষ দুঃখ, দেবতা দুঃখ, ব্রহ্মা দুঃখ, মার দুঃখ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণও দুঃখ। এককথায় পুরো ত্রিভুবনই মিথ্যা আর দুঃখ। সুতরাং কোথাও সুখ নেই, কোথাও সুখ মিলে না। যা সুখ বলে দৃষ্ট হয় তা সবই মায়া মরীচিকা মাত্র। একমাত্র নির্বাণ সুখ, নির্বাণই শান্তি। নির্বাণ প্রাপ্ত হলে আর দুঃখ পেতে হয় না, মিথ্যাকে নিয়ে ভব ভবান্তরে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যায়।

তোমরা চক্ষুতে কাহাকেও স্ত্রী বিগ্রহ, পুরুষ বিগ্রহরূপে দর্শন করবে না। অর্থাৎ কারোর প্রতি ‘উনি স্ত্রী’, ‘উনি পুরুষ’, রূপে দর্শন করতে নেই। কারণ উনি স্ত্রী উনি পুরুষ রূপে দর্শন করলে চক্ষুতে আত্ম তৃষ্ণা উদয় হয় এবং একে অপরের প্রতি আসক্তি জন্মে। সেই আসক্তি হতে দৌর্মনস্য জাত হয়ে লোভ,

দেহ, মোহ বৃদ্ধি পেয়ে নির্বাণ পথের অন্তরায় ঘটায়। প্রশ্ন আসতে পারে, তবে কিরূপে দর্শন করবে? চারি মহাধাতু রূপে, যথা—মাটি, জল, বায়ু, তাপ এই চারি মহাভূত ধাতু উপকরণের সমষ্টিরূপে। অর্থাৎ চারি ধাতু সমবায়ে গঠিত এ'দেহখানি। এইটি স্ত্রীর দেহ নহে, পুরুষের দেহও নহে। তাই দেহে স্ত্রী পুরুষ ধারণা ভ্রমাত্মক মাত্র। দেহের যা 'শজাংশ তা' মাটি (বা পৃথিবী ধাতুর অংশ), যা তরলাংশ তা' জল (বা অপ ধাতুর অংশ), যা শৈত্য উষ্ণাংশ তা' তেজ (বা তাপ ধাতুর অংশ), যা বায়বীয়াংশ তা' বায়ু (বা বায়ু ধাতুর অংশ)। সুতরাং এ' চারি ধাতু উপকরণের সমষ্টিতে গঠিত দেহে স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ করা চলে না। শুধুমাত্র চারিধাতুরূপেই দেখতে হয়। এভাবে নিজ ও পর দেহকে মাটির অংশ, জলের অংশ, তেজের অংশ ও বায়ুর অংশ ভেদে বিভক্ত করলে স্ত্রী, পুরুষ সংজ্ঞা (ধারণা) তিরোহিত হয়। তাই আবারো বলছি, তোমরা কোন দেহের প্রতি স্ত্রী বিগ্রহ, পুরুষ বিগ্রহ রূপে দর্শন করবে না। কারণ উনি স্ত্রী, আমি পুরুষ এভাবে দর্শন করলে পরস্পরের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হবে। সেই আসক্তি থেকে কোন একজন মনোপুত স্ত্রী দেখলে তাকে পেতে চাইবে। তাকে বিয়ে করার, তাকে নিয়ে সংসারী হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগবে। তখন আর প্রব্রজিত হয়ে থাকা সম্ভব হবে না কিছুতেই। বর্তমান অজ্ঞানী ভিক্ষুরা দেহের প্রতি স্ত্রী পুরুষরূপে দর্শন করে বলে তাদেরকে কোন একজন স্ত্রীকে বিয়ে করে পুনঃ সংসারী হতে হচ্ছে। তোমরা অজ্ঞানী সেই ভিক্ষুদের ভুলপথে পা দিও না। সর্বদা সতর্কতার সহিত অবস্থান করতঃ যে কোন দেহকে চারিধাতু মাটি, জল, তেজ, বায়ু রূপে দর্শন করবে। তখন এ'দেহ আমার দেহ, তোমার দেহ, স্ত্রীলোকের দেহ, পুরুষের দেহ এ সকল মহাত্মান্ত ধারণা বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি উৎপন্ন হবে না। আসক্তি হতে দৌর্মনস্য জাত হওত লোভ, দ্বেষ, মোহ বৃদ্ধি পেয়ে নির্বাণ পথে অন্তরায় ঘটানোর সুযোগ থাকবে না। বরং বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হবে। এবার শ্রদ্ধেয় বনভক্তে খুব সুন্দর একটি উপমার সহিত বলেন, তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে অন্য একটি রূপে দেখতে পার, কিরূপে? কোম্পানীর বোতল রূপে। আমি স্ত্রীলোকদেরকে কোম্পানীর বোতলই বলি। তোমরা নিশ্চয় জান, কোকাকোলা, ফান্টা, পেপ্সি কোম্পানীগুলোর বাজারজাত কৃত কোমল পানীয়টুকু খেয়ে বোতলসমূহ পুনঃ কোম্পানীকে ফেরৎ দিতে হয়। নিজের আয়ত্বে রাখা যায় না। কেমন ফেরৎ দিতে হয় তো? হ্যাঁ ভক্তে, ফেরৎ দিতে হয়, (সকলের একবাক্যে স্বীকারোক্তি)। কেন দিতে হয়? কারণ কোম্পানীগুলো কেবলমাত্র কোমল পানীয়ের মূল্য ধার্য করেই বিক্রি করে, সেখানে বোতলের মূল্য থাকে না। তাই পানীয়টুকু খেয়ে ফেলার পর বোতলগুলো কোম্পানীকে

ফেরৎ দিতেই হয়। কোম্পানী সেই বোতলগুলো পুনরায় ফ্যাষ্টরীতে নিয়ে গিয়ে আবারো পানীয় ঢুকিয়ে বাজারে ছাড়ে। এভাবে একই বোতলে বার বার কোমল পানীয় পুরিয়ে কেবলমাত্র তরল পানীয় বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করাটাই কোম্পানীর ব্যবসা। কোমল পানীয় বিক্রি করে বোতলগুলো ফেরৎ নেওয়া হল কোম্পানীদের কাজ। কোম্পানীরা বোতল বিক্রি করে না (হঠাৎ ভেঙ্গে গেলেও তার দাম দিতে হয়)। কারণ প্রতিবার নতুন বোতলে ঢুকিয়ে তরল পানীয় বিক্রি করতে গেলে কোম্পানীর লোকসান হয়। আর বোতলের ভিতর না পুরিয়ে কোমল পানীয় বিক্রি করাও অসম্ভব। তাই কোম্পানীরা বোতলগুলো বিক্রি করে না; কোম্পানীর বোতল কোম্পানীকেই ফেরৎ দিতে হয়। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য মেয়েদের বেলায়। মেয়েরা বিহারে এসে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান দিয়ে থাকে। তাদের দানীয় বস্তু হল কোকাকোলা, ফান্টা, পেপ্সি কোমল পানীয় তুল্য আর মহিলারা হল কোম্পানী বোতল সদৃশ। তোমরা (ভিক্ষুরা) কোমল পানীয়রূপ দানীয় বস্তু গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু কোম্পানীর বোতলরূপ মেয়েদেরকে কিছুতে গ্রহণ করতে পারবে না। গ্রহণ করার ফন্দিও আঁটতে পারবে না। এমন কি ‘অমুক মেয়েটি খুব ভালো, দেখতে সুন্দরী তাকে যদি বিয়ে করতে পারতাম ভালোই হতো’ এরূপ লোভমূলক চিন্তেও কোন মেয়ের দিকে তাকাতে পারবে না। পাপ চিন্তা, হীনচিন্তার সহিত কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রচেষ্টা পরিকল্পনা করতে পারবে না। তোমরা সেইরূপ কিছু করতে চাইলে তা’ হবে মস্ত বড় অন্যায় ও অমার্জিত অপরাধ। মনে রাখবে মেয়েদের মা-বাপেরা পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য তাদের মেয়েদিগকে বিহারে পাঠায়; তোমাদের নিকট বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। তাই আমি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে তোমাদেরকে সাবধান করি দিচ্ছি, সেই রকম নির্লজ্জ, অস্পৃশ্য কাজ করবে না। সেরূপ নির্লজ্জ কাজ করলে নিজের জন্য তো সর্বনাশ ডেকে আনবে আর আমাকেও লজ্জিত করবে। তোমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, কোম্পানীর বোতল কিছুতেই নিজের আয়ত্বে রাখা যায় না বা গ্রহণ করা যায় না। গ্রহণ করলে অপরাধ হয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী। এবং তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। প্রব্রজিতদেরকে এ কারণে সব সময় মেয়েদের কাছ হতে বহুদূরে সরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বনভন্তে বলেন, আমি অন্য জায়গায় একদা এই উপদেশটি (অর্থাৎ মেয়েরা কোম্পানী বোতল, কোম্পানী বোতল ফেরৎ দিতে হবে) প্রদান করলে জটনৈক এক ভিক্ষু আমাকে বলেছিল—“ভন্তে কিছু কোম্পানীর বোতল তো ভালো থাকে; আর সেখানে অনেক কিছু রাখাও যায়। সেরূপ বোতল গ্রহণ করলে ক্ষতি হবে কি?” (একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল পড়ে গেল)। “আচ্ছা, বলতো দেখি, সেই ভিক্ষুটি কেন এরূপ বলছে? তার নিকট পাপদৃষ্টি,

হীনদৃষ্টি আছে বলে সে এমন বলছে। অধিকন্তু সে নিলু আকাজ্জা, নীচমনা, হীনজ্ঞান ও নিলুস্তরের সাধনায় নিয়োজিত রয়েছে। তোমারও কি এই ভিক্ষুটির মতো? সাবধান, সেই পাপদৃষ্টি, হীনদৃষ্টির সহিত অবস্থান করবে না। অবশ্য তোমাদেরকেও আমি তেমন বিশ্বাস করতে পারি না। যেমন বৃক্ষজিতের কথাই ধর; সে তো কোম্পানীর বোতল ফেরৎ না দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। শেষে কোম্পানী খবর পেয়ে তার বোতলটি কেড়ে নিয়ে যায়। আর বৃক্ষজিতের পক্ষে কোম্পানীর বোতলটি নিজ আয়ত্বে রাখা সম্ভব হয়নি। ‘মেয়েরা কোম্পানীর বোতল’ একথাটি শুনে বেহুলা (বিপুলা) নামে জনৈক এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করেছিল-‘ভগ্নে, মেয়েরা কোম্পানীর বোতল আপনার একথা মানলাম। কিন্তু ছেলেরা কি? তারা গ্লাস, নাকি শিশি? তখন আমি তাকে বললাম, মেয়েরা কোম্পানীর বোতল আর ছেলেরা গ্লাস বা শিশি এ’রকম কথা নয়। নির্বাণ যেতে হলে ছেলেদেরকে যেমন বলতে হবে ‘মেয়েরা কোম্পানীর বোতল’ তেমনি মেয়েদেরকেও বলতে হবে ‘ছেলেরা কোম্পানীর বোতল’। ছেলেদেরকে কোম্পানী বোতলরূপ ‘মেয়ে’ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হবে আর মেয়েদেরকে কোম্পানী বোতলরূপ ‘ছেলে’ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হবে। এভাবে ছেলে মেয়েরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন না করে ছেলেরা মেয়েকে, মেয়েরা ছেলেকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারলে নির্বাণ সুখ হয়। বনভঙ্কে আবারো ভিক্ষুসঙ্ঘের উপর জোর দিয়ে বলেন, তোমরা কোম্পানীর বোতল ফেরৎ দিবে; কখনো গ্রহণ করবে না। এমন কি গ্রহণ করার চিন্তা পরিকল্পনাও করবে না। তাহলে সম্যকপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে সফলকাম হবে। এতে তোমাদের পরম সুখ নির্বাণ লাভ হবে।

পূজ্য বনভঙ্কে বলেন-তোমরা সংসারে সুখ ভোগ করাকে তুচ্ছ জ্ঞানে দর্শন কর। সংসারে সুখ ভোগে রত হতে চাইলে সুখ লাভ করা দূরের কথা অসহ্য দুঃখ ভোগই করতে হয় মাত্র। জ্ঞানের বল কুশলের বল নিয়ে অবস্থান করবে। জ্ঞানের দুর্বলতা ও কুশলের দুর্বলতা থাকলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অবস্থান করা যায় না। কারণ জ্ঞানের দুর্বলতা থাকলে সে প্রব্রজিত জীবন-যাপন করাকে দুঃখই মনে করবে। অতীত জন্মের কুশলের বল না থাকলে প্রব্রজ্যা জীবনে মন রমিত হবে না। প্রব্রজিত হয়ে অবস্থান করাও সহজ নয়। সকলের পক্ষে এই প্রব্রজিত জীবনাচারণ করা সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে, পূর্বজন্মের নৈক্রম্য পারমীর জোর না থাকলে ইচ্ছা করলেও প্রব্রজিত জীবন ধরে রাখা খুব কষ্টসাধ্য। যদি শুনা যায় যে, অমুক ভিক্ষু প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে সংসারী হয়েছে তাহলে জানবে তার নিকট জ্ঞান ও কুশলের দুর্বলতা (অভাব) ছিল। জ্ঞানের জোর, কুশলের জোর থাকলে সে কিছুতেই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করত না। তাই তোমাদেরকে অতীতের পারমী উপর

ভর করে বর্তমানেও জ্ঞান, কুশলের সম্যক সাধনা করতে হবে। তাই বলা হয়েছে-

দাও প্রভু জ্ঞান বল শক্তি অমরতা,
ত্যাগের বিমল বুদ্ধি দৃষ্টি অসারতা।
চিরঞ্জয়ী দেখে যাব জ্ঞানের প্রভাব,
মানস স্বভাব ফুটে মনের আকাশ।
অভিনব মুক্তিপথ সর্ব তৃষ্ণা জয়,
অহিংসা পরম ধর্ম বিশ্ব প্রেম ময়।

তোমরা সর্বদা চারি সতিপট্ঠান ভাবনা অনুশীলন কর। কায়-বেদনা-চিন্তা-ধর্ম এ চারি সতিপট্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকলে জ্ঞান ও কুশল বৃদ্ধি পায়। অজ্ঞান, অকুশল ক্রমান্বয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে থাকে। সতিপট্ঠান ভাবনা দ্বারা অনুৎপন্ন জ্ঞান, কুশল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন জ্ঞান, পুণ্য সংরক্ষণ হয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে অনুৎপন্ন অজ্ঞান, পাপ উৎপন্ন হতে পারে না এবং উৎপন্ন অজ্ঞান, পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়। পানি না পেয়ে যেমন বৃক্ষ মরে যায়। তাই তোমরা দিবারাত্রি সতিপট্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাক যাতে করে তোমাদের জ্ঞান, পুণ্য সহসা বৃদ্ধি পেয়ে অসাধারণ শক্তিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই জ্ঞান ও কুশলের অসাধারণ শক্তিতে তোমাদের প্রব্রজিত জীবনের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অমূল্য সম্পত্তি। কোন পার্শ্বিক সম্পত্তির সহিত ইহা তুলনা করা যায় না। লোক সমাজে সাধারণতঃ অর্থ-বিশ্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-জনকে মূল্যবান সামগ্রী বলে মনে করা হয়। কিন্তু চরিত্রই মানবের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। তোমরা নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী হবে, কখনো কলঙ্কিত জীবন-যাপন করবে না। কিরূপে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী হবে? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহের সহিত অবস্থান করে। চিন্তের মধ্যে লোভ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই, তৃষ্ণা নেই, লোভ হতে মুক্ত, হিংসা হতে মুক্ত, অজ্ঞান হতে মুক্ত তৃষ্ণা হতে মুক্ত অবস্থাকে নিষ্কলঙ্ক বলা হয়। কিন্তু চিন্তের মধ্যে লোভ বিদ্যমান থাকলে, হিংসা বিদ্যমান থাকলে, অজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে চিন্ত কলুষিত হয়ে উঠে। তখন আর নিষ্কলঙ্ক হওয়া সম্ভব হয় না। তোমরা পাপধর্ম, মনুষ্যধর্ম আচরণ করো না। লোকোত্তরধর্ম, নির্বাণধর্ম আচরণ কর। পাপধর্ম, মনুষ্যধর্ম আচরণ করলে চিন্ত অজ্ঞান, অকুশলের দিকে ধাবিত হয়। আর খুব বেশি অজ্ঞান, অকুশলের দিকে ধাবিত হয়ে গেলে জ্ঞান, কুশলের দিকে ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। নির্বাণধর্ম, লোকোত্তরধর্ম আচরণ করলে চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, অকুশল থাকতে পারে না। জ্ঞান, কুশলে চিন্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। মাররাজ্য, মারভুবনে থাকলে বাধ্য হয়ে মনুষ্যধর্ম, পাপধর্ম করতে হবে। কারণ

মাররাজ্য মারভুবনে থাকলে নির্বাণধর্ম, লোকোত্তরধর্ম আচরণ করা যায় না। মার তার রাজ্যের মধ্যে নির্বাণধর্ম, লোকোত্তরধর্ম আচরণ করতে দেয় না। তাই তোমরা মাররাজ্য, মারভুবন ছেড়ে নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে চলে যাও। নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে চলে গেলে তবেই নির্বাণধর্ম, লোকোত্তরধর্ম আচরণ করা সম্ভব। তোমরা নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে চলে যেতে সচেষ্ট আছো তো? তোমরা যদি অজ্ঞানী হও তাহলে নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে যেতে চাইবে না। তাই বলছি, তোমরা সবাই জ্ঞানী হওত মাররাজ্য, মারভুবন ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে চলে যাও। এতে প্রকৃত সুখ নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে। আমার সাথে সাথে বল “আমরা আর মাররাজ্য, মারভুবনে না থেকে নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে চলে যাবো। সেখানে নির্বাণধর্ম, লোকোত্তরধর্ম আচরণ করে পরম সুখ নির্বাণ উপলব্ধি করবো।” সত্যিই কি তোমরা নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে যেতে প্রত্যাশী? আমরা সবাই একবাক্যে বললাম, হ্যাঁ ভগ্নে। আমরা মাররাজ্য, মারভুবন ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্য, অমারভুবনে যেতে প্রত্যাশী। তাহলে তোমাদের পরম সুখ অর্জিত হবে। নির্বাণ সুখ অর্জিত করে তোমরা সুখী হও।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা বুদ্ধের শাসনের ভিতরে অবস্থান কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভক্তে মহোদয় নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—প্রব্রজিতদের কর্তব্য হল, বুদ্ধের আবিষ্কৃত সদ্ধর্ম ও অহিংসা বাণী প্রচার করে অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত সত্ত্বগণকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসা। সদ্ধর্ম কি? লোভ, দ্বেষ, মোহের সহিত অবস্থান না করে অলোভ, অদ্বেষ, অমোহের সহিত অবস্থান করাই সদ্ধর্ম। সদ্ধর্ম ও অহিংসা বাণী প্রচার করা অর্থ জনসাধারণকে নানায়ুক্তি নানা উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলা। দেখ, বর্তমানে তোমরা পরধর্ম আচরণ ও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করতেছ। সেই পরধর্ম আচরণ এবং বৈরীভাব পোষণের দরুন তোমাদেরকে কতো অসহ্য দুঃখ ভোগ না করতে হচ্ছে তার অন্ত নেই। এক মুহূর্ত কালের জন্যও সুখ, শান্তি অর্জিত হচ্ছে না। সর্বদা দুঃখ, অশান্তির অনলে পুড়ে যাচ্ছে তোমাদের অন্তর। কারণ পরধর্ম আচরণ এবং বৈরীভাব পোষণের পরিণাম এমনই হয়। অন্যদিকে বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্ম ও অহিংসা নীতি দুঃখ অশান্তি উপশম কারক এবং সুখ, শান্তি উৎপাদক যা হিংসা-বিদ্বেষ, দুঃখ-ক্লিষ্টে জর্জরিত মনকে পরিতৃপ্ত করতঃ অশেষ কল্যাণ ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। বুদ্ধের প্রচারিত এ’ধর্ম সত্ত্বদিগকে সর্ব দুঃখ নিবৃত্তি নির্বাণের দিকে সংবর্তন করে। দেব মানবের অর্থ-

হিত-সুখের জন্য বুদ্ধ এ'ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। কাজেই তোমরা পরধর্ম ও বৈরীভাব পরিত্যাগ করে সদ্ধর্ম, অহিংসার বাণী অনুসরণ কর। সদ্ধর্ম আচরণ ও অহিংসা নীতি মেনে চললে তোমাদেরকে আর দুঃখ অশান্তির শিকার হতে হবে না। বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্ম ও অহিংসার বাণী জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরলে, দেশনা করলে, দেব মানবের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এবং যাদের জ্ঞানচক্ষু মলিনতা স্পর্শ করতে পারেনি, অবিদ্যা তিমিরে আচ্ছন্ন নয় তারা এ'ধর্মের রসান্বাদন করতেও সক্ষম হয়। বনভক্তের উদ্দেশ্য কি জ্ঞান? তোমাদেরকে পরিহানি ও অধোগামী হাত থেকে রক্ষা করে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন সুনিশ্চিত করা। আমি বিদ্যামানে যেন তোমাদের অমঙ্গল, পরিহানি হতে পারে না। সেই উন্নতি কি? আত্মোন্নতি। তোমাদের সকলকে আত্মোন্নতির সাধনায় সচেষ্টি থাকতে হবে। মনে রাখবে, আত্মোৎকর্ষ সাধনার চরম লক্ষ্য। আত্মোৎকর্ষ শব্দের অর্থ হল আপন উন্নতি, আপন শ্রেষ্ঠত্ব, স্বকীয় উৎকৃষ্টতা। এই তিনটি মহৎ লক্ষ্য থাকলে নিজেকে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধির দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়; কখনো পরিহানি হবার আশঙ্কা থাকে না। যিনি এ'তিন মহৎ গুণে মহীয়ান তার উন্নতি সুনিশ্চিত। অপরদিকে আপন উন্নতি করতে হলে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। তাই বলা হয়েছে,

উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকে যদি মনে,

গর্দভের তিনগুণ শিখিবে যতনে।

শীত-উষ্ণ, রোদ-বৃষ্টি, সকালে-বিকালে

অনলস বহে বোঝা, অগ্রাহ্য সকলে।

গাধা শীত-উষ্ণ, রোদ-বৃষ্টি, সকাল-বিকাল সব কিছু অগ্রাহ্য করে সর্বদা অনলসভাবে বোঝা বহন করতেই থাকে। তোমাদেরকেও সর্বদা নিরলসভাবে আত্মোন্নতির স্পৃহা নিয়ে জীবনের পূর্ণতা ও সফলতা সাধনে তৎপর থাকতে হবে। অলস, হীনবীর্য ও আত্মোন্নতির স্পৃহাহীন ব্যক্তির জীবনে কখনো উন্নতি করতে পারে না। জীবনের মূল্যবান দিনগুলো অলসভাবে কাটিয়ে দিয়ে তারা জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেয়। মরিচা যেমন শক্ত লৌহেরও বিনাশ করে থাকে তেমনি আলস্য মেধাবী ব্যক্তিদেরকে পর্যন্ত ধ্বংস সাধন করে। আলস্য দ্বারা আক্রান্ত হলে বলবান ব্যক্তিও অকর্মণ্য অপদার্থ কাপুরুষে পরিণত হয়। আলস্য পিশাচ মানুষকে চিবিয়ে ইক্ষুর খোসার মত বর্জনীয় পদার্থ করে ফেলে। উন্নতির পথে যত শত্রু আছে তন্মধ্যে আলস্যই প্রধান। তোমরা আলস্য, তন্দ্রাকে সর্বতোভাবে বর্জন করে অবস্থান করবে। আলস্য, তন্দ্রার বশীভূত হলে তোমাদের কিছুতেই উন্নতি হবে না। বুদ্ধ আলস্য, তন্দ্রাকে কারাগারের সহিত তুলনা করেছেন। তজ্জন্য আলস্য, তন্দ্রার সহিত অবস্থান করলে তোমরা কয়েদী

বলে জানবে। কয়েদী যেমন নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু করতে পারে না। ঠিক তেমনি আলস্য তন্দ্রাভিভূত হলে তোমরা কখনো আপন উন্নতি সাধন করতে পারবে না। মনে রাখবে উন্নতি করতে হলে তোমাদেরকে অবশ্য আলস্য, তন্দ্রাকে পরিহার করতে হবে। উন্নতি সাধনের পথে আলস্য, তন্দ্রার অনুপস্থিতি থাকা চাই।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-তোমরা অন্য কোন কাজ না করে শুধুমাত্র চারি সতিপট্ঠান ভাবনা অনুশীলন কর। কায়-বেদনা-চিন্তা-ধর্ম এই চারি সতিপট্ঠান ভাবনায় নিযুক্ত থেকে সব সময় অবস্থান করলে জ্ঞান ও পুণ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেই থাকবে এবং অনায়াসে নিজেকে অকুশল পাপ হতে রক্ষা করা যাবে। সতিপট্ঠান অর্থ সর্বদা স্মৃতি সহকারে বাস করা। স্মৃতি দৌবারিকের ন্যায় পাপ পাহাড়া দিয়ে মনের মধ্যে পাপ উৎপন্ন হতে দেয় না; কুশল বাড়ায়, জ্ঞান বাড়ায়, আর নিজেকে ও অপরকে রক্ষা করে। অর্থাৎ স্মৃতি অনুশীলনের দ্বারা নিজে রক্ষিত হয়ে অপরকেও রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাই দেখা যায়, বুদ্ধ বলেছেন-ভিক্ষুগণ! স্মৃতিকেই আমি সর্বার্থ-সাধক বলি। পূর্বস্মৃতি আর বর্তমান-স্মৃতির সংযোগে মার্গফল লাভ হয়। অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংরক্ষিত স্মৃতির সহিত বর্তমানে অনুশীলনকৃত স্মৃতির সংযোগ হওত যদি স্মৃতি বর্ধিত, বহুলীকৃত হয়ে যায় তখন মার্গফল লাভ নিশ্চিত হয়। সর্বদা স্মৃতি অনুশীলন করলে জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েই থাকে। বলা যায়, স্মৃতি বজায় রাখলে জ্ঞান আপনা-আপনি উদয় হয়। তখন জ্ঞানের জন্য চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু স্মৃতি বজায় না রাখলে জ্ঞান কিছুতেই উদয় হবে না। অন্যদিকে স্মৃতিবিহীন মনুষ্যগণ সব সময় বিপদমুগ্ধ হয়। যেমন ক্ষুদ্র নৌকা দিয়ে সুবৃহৎ নদী পাড়ি দিতে গেলে সর্বদা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কারণ নদী পার হতে গিয়ে যদি হঠাৎ সৃষ্ট ঝড়ো বাতাসের বিশাল বিশাল তরঙ্গ এসে আঘাত হানে তবে ক্ষুদ্র নৌকা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আর যাত্রীদের তখন মৃত্যুই অবধারিত। তবে ডিঙ্গি নৌকা হলে সেক্ষেপ বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। অনুরূপভাবে বলা যায়, যারা স্মৃতি বিহীন হয়ে অবস্থান করে তারাও ক্ষুদ্র নৌকা দিয়ে বিশাল নদী পাড়ি জমাচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে তারা। অপরদিকে যারা সব সময় স্মৃতির সহিত অবস্থান করে তারা বড়ো নৌকা দিয়ে নদী পাড়ি জমাচ্ছে, তাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। তাই স্মৃতি বিহীন জীবন সর্বদা বিপদজনক। তোমরা চিন্তের মধ্যে সর্বদা স্মৃতি জাগ্রত রেখে অবস্থান কর। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, “হে ভিক্ষুগণ! স্মৃতি সহকারে বাস করাই আমার অনুশাসন”। স্মৃতি সহকারে বাস করার অর্থ সর্বদা সাবধানতা ভাব রক্ষা করে অবস্থান করা। দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, শয়নে সর্বাবস্থাতেই সাবধানতা রক্ষা করলে কোন বিপদে পতিত

হতে হয় না। এরূপ সাবধানতা ভাব রক্ষা করে চলাই বুদ্ধের শাসন। তোমরা বুদ্ধের শাসনের ভিতর অবস্থান কর, শাসনের বাইরে যাবে না। শাসনের বাইরে গেলে তোমাদের নানা প্রকার বিপদও হতে পারে। এই বলে বনভন্তে উপমাচ্ছলে অতি সংক্ষেপে জাতক বলেন। বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে বর্তক পক্ষীকূলে জন্মগ্রহণ করতঃ বড় বড় ঢিল সংযুক্ত এক চষাক্ষেত্রে বাস (বিচরণ) করতেন। সাধারণত ঐ বিচরণ ভূমির বাইরে কখনো যেতেন না। একদিন খাদ্য অন্বেষণ করতে করতে হঠাৎ অসাবধানবশতঃ বিচরণ ভূমির বাইরে চলে যান। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্যেন পক্ষী এসে ছোঁ মেয়ে ধরে ফেলল তাঁকে। শ্যেন কর্তৃক ধৃত হলে বোধিসত্ত্ব পরিবেদন করতে লাগল, “হায়, আমি হতভাগ্য! আমার কি কিছু বুদ্ধি আছে? আমি পরের অধিকারে কেন চরতে আসলাম? আমি যদি আজ নিজের বিচরণ ভূমিতে চরতাম, তা হলে এই বাজপাখিটা, “এস যুদ্ধ কর বলে আসলেও আমার সঙ্গে পেরে উঠত না”। ইহা শুনে বাজপাখি রেগে বলল “আরে বর্তক তোর চরবার স্থান কোথায়? বোধিসত্ত্ব বলল একখানা চষাভূমি; সেখানে কেবল বড় বড় ঢিল। এবার শ্যেন পক্ষী নিজের বল সংবরণ করে বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে রাগের স্বরে বলল—“যা তুই তোর বিচরণ ভূমিতে; সেখানেও তোর নিষ্ফ্রুতি নেই। বোধিসত্ত্বও চষা ক্ষেত্রে উড়ে গিয়ে বড় একটা ঢিলের উপর বসে, “এখন এস দেখি, একবার”, বলে বাজ পাখিকে আহ্বান করতে লাগল। তা শুনে শ্যেন পক্ষী পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্বক বর্তককে ধরবার জন্য সমস্ত বল প্রয়োগ করে ছোঁ মারল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝল, শ্যেন সত্য সত্যই ভীম বেগে তাকে আক্রমণ করতে আসতেছে, তখন সে ডিগবাজি খেয়ে ঢিলটার আড়ালে গেল। এদিকে শ্যেন নিজের বেগ সামলাতে না পেরে ঢিলের ওপর এসে সজোড়ে আঘাত করে। আর সেই আঘাতে শ্যেন পক্ষীর হৃদপিণ্ডটা ফেটে যায় চক্ষু দুইটা কোটর হতে বাহির হয়ে যায় এবং তখনই শ্যেন পক্ষীর মৃত্যু হয়। এখানেও তোমরা যদি বুদ্ধের শাসনে বাইরে যাও অর্থাৎ বিস্মৃতি হয়ে অবস্থান কর তাহলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ এসে তোমাদেরকে গ্রাস করতে পারে। কিন্তু স্মৃতির সহিত অবস্থান করলে কোন বিপদ আসতে পারে না। তাই তোমরা সর্বদা বুদ্ধের শাসনের মধ্যে থেকে অবস্থান করবে। বুদ্ধের শাসনের বাইরে যাওয়াকে লজ্জা ও ভয় জ্ঞানে দর্শন করবে।

তিনি আরো বলেন—মনচিন্তের মধ্যে লোভ, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, আসক্তি, সৌন্দর্য স্পৃহাকে স্থান দিবে না। সে সবকে মনচিন্তে স্থান না দিতে তোমাদেরকে বক্রিশ প্রকার অন্তি ভাবনা করতে হবে। যারা দেহের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লোভ, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, আসক্তি উৎপন্ন করতঃ তা’ লাভ করতে ইচ্ছুক হয় তাদের জন্য বুদ্ধ কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা দেশনা করেছেন। পথ চলতে গিয়ে পথিক আছাড়

খেয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলে যেমন বহুকষ্ট পায় ঠিক তেমনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন না করলে চিত্তের মধ্যে লোভ, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, আসক্তি উৎপন্ন হয়ে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করলে স্বশরীর বা পর শরীরের প্রতি লোভ, আসক্তি, অনুরাগ থাকে না। সেই ভাবনাকারী পুনঃপুন কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা দ্বারা জ্ঞানচক্ষুতে দেখতে পান যে শরীরে বত্রিশ প্রকার অণুটি, দুর্গন্ধ, ঘৃণিত জিনিষ ব্যতীত আর কিছু নেই। আর বত্রিশ প্রকার অণুটি, ঘৃণিত জিনিষের পরিপূর্ণ এই শরীরে কায়সংসর্গ উপভোগের প্রশ্নই উঠে না। তাই বলে হয়েছে—

কায়গতানুস্মৃতি করিয়া স্মরণ,
চক্ষু, কর্ণ আদি করি' সংবরণ।
সতত শ্রমণ সমাধি প্রবণ,
জানিও লভেছ নির্বাণ আপন।

কাম রিপুকে দমন করার জন্য প্রত্যেক প্রব্রজিতদেরকে অপরিহার্যরূপে এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করতে হয়। নিত্য কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করলে দেহের প্রতি কোন আসক্তি, অজ্ঞান, তৃষ্ণা, অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রেম কিছুই থাকবে না। কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা বর্ধিত হলে প্রব্রজিতগণের মহোপকার সাধিত হয়। কায় ও মন প্রশান্ত হয়ে থাকে; বিবিধ অকুশল পাপ বিতর্কসমূহ দূরীভূত হয়। চঞ্চল চিত্তকে স্থির, শান্ত করতে এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা মহৌষধ স্বরূপ। কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা ছাড়া কিছুতে চিত্তকে স্থির করা যায় না। বুদ্ধ বলেছেন, যাদের কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা আরম্ভ হয়েছে তাদের নির্বাণ আরম্ভ হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা দ্বারা ক্লেসসমূহ ধ্বংস করে অরহত্ব লাভ করতঃ নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হয়। প্রাথমিক কায়গতানুস্মৃতি ভাবনায় যদিও আনুপূর্বিক (অনুক্রমে) মনোনিবেশের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে এ' আনুপূর্বিকতা রক্ষার প্রয়োজন হয় না। বত্রিশ অণুটির মধ্যে যেটা বেশি প্রকট (সুবোধ্য) হয় কেবলমাত্র সেটা যেমন—‘কেশ’, ‘দন্ত’, ‘অস্থি’, মনোনিবেশ করবে। তখন সেই ‘অস্থি’ আবৃত্তিতেই বত্রিশ প্রকার অণুটির জ্ঞানই জন্মাবে। তজ্জন্য বলা হয়েছে—

বত্রিশ অণুটির মাঝে কোন এক পথ,
স্মৃতির সাধনে দৃঢ় কর নিরন্তর।
কঠিন বা নরম যথা হও স্মৃতিমান,
ত্রিলক্ষণে জ্ঞান হলে তবেই নির্বাণ।

দেহটিকে বত্রিশ প্রকার অণুরূপে ভাবনা করলে তা শমথ ভাবনা আর বিয়াল্লিশটি ধাতুরূপে ভাবনা করলে বিদর্শন ভাবনা হয়। শমথ ও বিদর্শন উভয়

ভাবনা বর্ধিত, বহুলীকৃত হলে ত্রিলক্ষণ জ্ঞান আয়ত্ব হওত নির্বাণ লাভ হয়।

নির্বাণ পিয়াসী ভিক্ষুগণ দেহের প্রতি বত্রিশ প্রকার অশুচি ভাবনা দ্বারা কামাসক্তি ত্যাগ ও বিয়াল্লিখটি ধাতু ভাবনা দ্বারা আমিত্ব অহংকার ত্যাগ করতঃ ত্রিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করে অচিরেই নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন-যদি তোমাদের চিন্তের মধ্যে একেবারেই জ্ঞান না থাকে তাহলে আমার উপদেশেও তোমাদের কিছু লাভ হবে না। কারণ অগ্নি বিহীন ভস্ম স্বপ্নে যতই ফুঁ দেওয়া হোক না কেন কিছুতে আগুন জ্বলে উঠবে না। কারণ ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানোর জন্য সেখানে আগুনের ফুলকি বিদ্যমানতা থাকা চাই। তাই তোমাদের চিন্তের মধ্যেও জ্ঞান থাকা চাই। সেই জ্ঞান কি? পূর্বজন্মের সংরক্ষিত চারি আর্যসত্য জ্ঞান অর্থাৎ অতীত জন্মের জ্ঞান ও বর্তমান জন্মের জ্ঞান একত্রিত হলে তবেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। তবুও তোমরা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর; জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর, অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বদা জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, অজ্ঞান হ্রাস পাবে। কিন্তু অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করলে সর্বদা অজ্ঞানই বৃদ্ধি পাবে আর জ্ঞান হ্রাস পাবে। সত্যের মধ্যে তোমরা চারি আর্যসত্যকেই বিশ্বাস করবে, মার্গের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অনুশীলন করবে। কিছুদিন আগে এক সন্যাসী (হিন্দু ধর্মের) আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল-“ভগ্নে অরহত কাকে বলে? আমি বলেছিলাম, যার নিকট অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপদান নেই, ক্লেশ নেই তাকেই অরহত বলে। যার নিকট অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ রয়েছে সে সর্বদা দুঃখ ভোগ করতেছে; কাজেই তার পক্ষে অরহত্ব লাভ করা অসম্ভব। এই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশসমূহের দ্বারা সত্ত্বগণ সর্বদা দুঃখে পতিত হয়। এক মুহূর্তকালও তাদের চিন্তে সুখ লাভ হয় না। সেই দুঃখদায়ক অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশকে চিরতরে নিবৃত্তি করে তোমরা নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ কর। তাই উদান গাথায় বলা হয়েছে,

দুঃখের জননী তৃষ্ণা,

দেখি তার হেন দোষ

বীততৃষ্ণা, অনাসক্ত হও ভিক্ষুগণ

হও ধ্যানপরায়ণ

পালিলে এ' ভিক্ষু ধর্ম,

নিশ্চয় ভব বন্ধন হইবে ছেদন।

অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশই তোমাদের সব সময় দুঃখ প্রদান করতেছে। তাই সত্ত্বর অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে চিন্ত থেকে মূলোৎপাটন কর। মনে রাখবে, “নিক্বানং

পরম সুখং”। নির্বাণ ব্যতীত কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। নির্বাণ ছাড়া সমস্ত কিছুই দুঃখময়। নির্বাণ লাভ করতে না পারলে কিছুতেই শান্তি নেই, সুখ নেই। তোমরা সর্বদা নির্বাণের মন, নির্বাণের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর এবং অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপদান, ক্লেশসমূহ সত্ত্বর নিবৃত্তি সাধন করে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) কর। এটাই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম।

সাধু, সাধু, সাধু।

জগতে তিন প্রকার ধর্মন্তর বিদ্যমান

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমরা কেন প্রব্রজিত হয়েছ? সংসারের সর্ব দুঃখ হতে চিরমুক্তি নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যেই তো? প্রব্রজিত হবার সময় সেরূপ প্রার্থনাই করেছিলে নয় কি? হ্যাঁ ভন্তে। তাহলে তোমাদেরকে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করার জন্য অবিদ্যা, তৃষ্ণার মূলোৎচ্ছেদ সাধন করতে হবে। অবিদ্যা তৃষ্ণাই নির্বাণ লাভের পথে বড় প্রতিবন্ধক। চিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকলে কিছুতেই নির্বাণ লাভ হয় না। অবিদ্যা ও তৃষ্ণা এই দুইটি মূল কারণে পুনর্জন্ম লাভ হয়ে থাকে। তাই যতদিন পর্যন্ত অবিদ্যা, তৃষ্ণা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত নির্বাণ লাভের আশা অবাস্তব। কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা যতদিন থাকবে ততদিন পুনর্জন্ম হবেই। অবিদ্যা, তৃষ্ণা থাকলে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। তাহলে নির্বাণ লাভের উপায় কি? উপায় হচ্ছে অবিদ্যা দূরীভূত করে বিদ্যা উৎপন্ন করা। এবং তোমাদেরকে সেই লক্ষ্যে অবিদ্যা বিরতি হয়ে অবস্থান করতে হবে। তাই তোমাদের কর্তব্য হল মনচিন্তের মধ্যে বিদ্যা উৎপত্তি দ্বারা অবিদ্যাকে দূর করতে সচেষ্ট থাকা। এভাবে এক সময় চিন্তা থেকে সমস্ত অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হবেই। অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হওত বিদ্যা উৎপন্ন হলে পুনর্জন্ম বন্ধ হয়। কারণ অবিদ্যা ধ্বংস নিরোধ হয়ে গেলে সকল প্রকার তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে। তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটলে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়। পুনর্জন্ম নিরোধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব দুঃখের অবসান হয়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়। নির্বাণের দু’টি স্তর-ক্লেশ নির্বাণ ও স্কন্ধ নির্বাণ। প্রথম অবস্থা ক্লেশের নির্বাণ, শেষের অবস্থা স্কন্ধের নির্বাণ। ভগবান বুদ্ধ তাঁর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে মারকে সসৈন্যে জয় করে বুদ্ধ গয়ায় ক্লেশ নির্বাণ লাভ করেন এবং আশি বৎসর বয়সে কুশীনারার শালবনে স্কন্ধ নির্বাণ লাভ করেন। তোমরাও অবিদ্যা পরিত্যাগ করে বিদ্যা বা জ্ঞান উদয় কর। বুদ্ধের ভাষিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দৃঢ়ভাবে অনুশীলন কর যা প্রজ্ঞাচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, অভিজ্ঞা উৎপাদক, উপশমকারক, সত্য প্রজ্ঞাপক ও নির্বাণ সংবর্তক।

তোমরা অহংকারে ক্ষীণ হয়ে অবস্থান করবে না। মনে রাখবে মিথ্যাদৃষ্টি হতেই অহংবোধের উদয়। কাজেই নির্বাণ প্রত্যাশীগণ সকল প্রকার অহংকারের উর্ধ্বে উঠে অবস্থান করবে। এ প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, কুণ্ডের এক গুণ গ্রহণীয়। সেই গুণ কি? কুণ্ড জলপূর্ণ থাকলে শাস্ত রহে, শব্দ করে না। সেইরূপ যোগীও শাস্ত্রজ্ঞানে, মার্গফল জ্ঞানে, সত্যোপলব্ধিতে, গুণে পারঙ্গম হলেও মানদর্প দেখাবে না। তজ্জন্য উচ্চশব্দ করা অনুচিত। অভিমান প্রদর্শন করা উচিত নহে। নিরভিমান ও নিরহংকার হওয়া উচিত। আর সরল ও মিতভাষী হওয়া কর্তব্য। তোমাদেরকেও বলছি তোমরা কখনো লোকজনের সামনে এ'রূপ বলবে না যে, “আমি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অনেক শাস্ত্রজ্ঞান আমার আয়ত্ত্ব হয়েছে, আমার অমুক জ্ঞান লাভ হয়েছে, আমি অমুক সমুক প্রদর্শন করতে পারি”। এগুলো হীন প্রকৃতি লক্ষণ। যারা জনসাধারণের সম্মুখে এসব বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে চায় তাদেরকে কিছুতেই জ্ঞানী বলা যায় না। কারণ যত্রতত্র আত্মপ্রশংসা বর্ণনা করা একমাত্র মূর্খ ব্যক্তিদের পক্ষেই শোভা পায়। প্রকৃত জ্ঞানীরা জলপূর্ণ কুণ্ডের মতন শাস্ত রহে, শব্দ করে না। অন্যদিকে, আমিই একমাত্র ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অপর সকলে গজমূর্খ বললে সন্ধর্মের গ্লানি করা হয় মাত্র। সেরূপ উচ্চবাক্য দ্বারা কেহ পণ্ডিত হতে পারে না। তারা পণ্ডিতাভিমানী মহামূর্খ মাত্র। সেই পণ্ডিতাভিমানী মূর্খগণ আত্মপ্রশংসা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের অনেক ক্ষতিসাধনই করে থাকে। তাদের দ্বারা দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সুকঠিন হয়ে পড়ে।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-আত্মদমন, আত্মজয় করাই তোমাদের আসল কাজ। নিজকে দমন করলে, নিজকে জয় করলে তবেই সুখ লাভ হয়। কারণ নিজকে দমন, নিজকে জয় করলে পঞ্চমারও পরাজিত হয়ে যায়। সেই পঞ্চমার হল, যথা-(১) ক্রেশমার (২) ক্ষক্শমার (৩) অভিসংস্কার মার (৪) বশবর্তী দেবপুত্র মার ও (৫) মৃত্যুমার। মোটকথা, ভোগ চেতনাই মার। সংসারে সুখ ভোগ করার জন্য যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা হয় তা' মারের প্রভাবেই সম্পাদিত হয়। কুশল, অকুশল প্রভৃতি কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সত্ত্বগণকে ভবচক্রে বেঁধে রেখে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করায় নির্বাণ লাভ করতে না দেওয়াই মারের কাজ। সাধকগণ (নির্বাণ লাভেচ্ছুকগণ) যাতে মারের প্রভাবের বাইরে যেতে না পারে সে জন্য মার সাধকদের সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তবে যেই সাধকগণ দৃঢ়চেতা, প্রবল বীর্যবান মার তাদেরকে কোনক্রমে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, দৃঢ়চেতা বা দৃঢ় ইচ্ছা যার কাছে রয়েছে তার নিকট তার (মার) পরাজিত হয়। ইচ্ছার সঙ্গে তৃষ্ণা কিছুতেই পেরে উঠতে পারে না। তৃষ্ণা হতে ইচ্ছা বলবান। কুমার সিদ্ধার্থকেও এই ইচ্ছাশক্তিই

গৃহত্যাগে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল। সিদ্ধার্থের ইচ্ছাশক্তির কাছে সংসারের সুখভোগের তৃষ্ণা পরাজিত হয়েছিল সেদিন। তাই তোমরাও যদি একান্তই নির্বাণ লাভের ইচ্ছুক হয়ে অবস্থান কর, তাহলে তৃষ্ণাকে ক্ষয় সাধন করতে পারবে। তজ্জন্য বলি, নির্বাণ যেতে হলে নির্বাণ লাভের ইচ্ছা থাকতে হবে, তৃষ্ণার বশবর্তী না হয়ে তোমরা নির্বাণ লাভের ইচ্ছুক হও। সর্বদা নির্বাণের মন, নির্বাণের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর। কোনক্রমে নির্বাণ লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করবে না। বলা বাহুল্য, নির্বাণ লাভের ইচ্ছা না থাকলে কিন্তু নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

আমি বর্তমান থাকতে তোমাদেরকে কোথাও যেতে হবে না এবং কোন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে না। আমার বহু বৎসর গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নানা দেশ, নানা জনপদ ঘুরে বেড়ানো নিষ্ফল। নানাজনের নানামত পূর্ণ করা দুঃসম্ভব এবং বিজ্ঞি গুরুর নিকট বিভিন্ন উপদেশ গ্রহণ করা ভ্রাম্যঙ্গক। বিভিন্ন আচার্যের বিভিন্ন উপদেশ, শিক্ষা, গ্রহণ করতে গেলে মনচিন্তে নানা বিতর্কের উদয় হয়। তাই একজন সং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সারাজীবন তার উপদেশে, শিক্ষায় চালিত হবে। এক গুরুর এক শিক্ষাই অনুসরণীয়। ভগবান বুদ্ধ কালাম সূত্রে বলেছেন, জগতে তিন প্রকার ধর্মগুরু বিদ্যমান রয়েছে। তিন প্রকার কি কি? যথা—(১) এক শ্রেণীর ধর্মগুরু কাম ত্যাগ করতে বলে কিন্তু রূপ, বেদনা ত্যাগ করতে বলে না। (২) অপর এক শ্রেণীর ধর্মগুরু কাম, রূপ ত্যাগ করতে বলে কিন্তু বেদনা ত্যাগ করতে বলে না। (৩) অপর এক শ্রেণীর ধর্মগুরু কাম, রূপ, বেদনা তিনটি ত্যাগ করতে বলে। এই তিন প্রকার ধর্মগুরুসমূহ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের অধিকারী। তাদের মতবাদ কখনো এক নহে, আলাদা আলাদা। ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন সেই ধর্মগুরু যিনি কাম, রূপ, বেদনা এ' তিনটিই ত্যাগ করতে উপদেশ দেন। কারণ কাম দুঃখ, রূপ দুঃখ, বেদনা দুঃখ আর কাম ত্যাগ করাই সুখ, রূপ ত্যাগ করাই সুখ, বেদনা ত্যাগ করাই সুখ। যতক্ষণ পর্যন্ত কাম, রূপ, বেদনা এই তিনটি ত্যাগ করা যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। নির্বাণ লাভ করতে হলে অবশ্যই কাম, রূপ, বেদনা, এ' তিনটিকে ত্যাগ করতে হয়। তা না হলে নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তোমরা কাম, রূপ, বেদনা তিনটিই পরিত্যাগ কর। শুধুমাত্র অন্যান্য ব্রহ্মচারীরা কেন বর্তমান বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও এ' কাজে সফলকাম হতে পারছে না। অনেকে কাম ত্যাগ করতে সফল হলেও রূপ, বেদনা ত্যাগ করতে পারছে না। কি উপায়ে কাম, রূপ, বেদনা ত্যাগ করতে হয়? কাম, রূপ ও বেদনার আশ্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণসমূহ যথাযথভাবে অবগত হয়ে। কামের আশ্বাদ কি রকম? চক্ষুর সাথে রূপের, কর্ণের সাথে শব্দের, নাসিকার সাথে গন্ধের, জিহ্বার সাথে রসের,

কায়ের সাথে স্পর্শের সংযোগে ইষ্ট, কমনীয়, মনোজ্ঞ, শ্রিয়, সুখ ধারণায় কামভোগের উপাদানসমূহ মনোরঞ্জনীয় রূপে গৃহীত হয়ে মন যে আনন্দ, খুশিতে ভরে উঠে তা' কামের আনন্দ। এক কথায়, পঞ্চ কামগুণ হেতু যেই সুখ সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তাই কামের আনন্দ। কামের আদীনব কি? কাম-হেতু, কাম-কারণ, কামাদিকরণে কাম্যবশে রাজা রাজার সাথে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে, মাতা পুত্রের সাথে, পুত্র মাতার সাথে, মাতা মেয়ের সাথে, মেয়ে মাতার সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, ভ্রাতা ভ্রাতার সাথে, ভ্রাতা ভগ্নির সাথে ভগ্নি ভ্রাতার সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে বিবেষ সৃষ্টি হয়। তারা পরস্পর মৌখিক কলহ বিবাদ থেকে ক্রমশঃ হাতাহাতি এমনকি অস্ত্রধারণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এতে তারা মৃত্যুতুল্য দুঃখ পায়, অনেক সময় মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। আবার কাম-হেতু, কাম-কারণ, কাম নিদান ও কাম হেতুই মনুষ্যগণ কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি করতঃ মহাদুঃখ যজ্ঞপার মাঝে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আর ভোগ সম্পদ উৎপন্ন করতে গিয়ে আশানুরূপ সম্পদ উৎপন্ন করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে; অর্জিত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে গিয়ে এবং রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে মনুষ্যগণ যে অনুতপ্ত হয়, ক্লান্ত হয়, বিলাপ করে, বক্ষে করাঘাত করে ক্রন্দনে রত হয়, সে সব কামসমূহের আদীনব বা প্রত্যক্ষ অগুণ। কাম হতে নিঃসরণ কি? কামের প্রতি (কাম সম্পর্কে) যেই ছন্দরাগ তা' দমন, পরিহার বা সম্পূর্ণরূপে আসক্তি ত্যাগ করাই কাম হতে নিঃসরণ। রূপের আনন্দ কি রকম? ষোড়শ হতে বিংশতি বয়সী যে কোন যুবক বা যুবতীকে সাধারণত পরম রূপ লাভণ্যময়ী দেখায়। সেই সুন্দর রূপ লাভণ্য হেতু মনের মধ্যে যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তাই রূপের আনন্দ। সহজ কথায় বলতে গেলে, রূপ জনিত যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তা' রূপের আনন্দ। রূপের আদীনব কি রকম? যেইরূপ অনিত্য, দুঃখদায়ক ও দুঃখ পরিণামী তাই রূপের আদীনব। অর্থাৎ সেই পরম লাভণ্যময় শরীর অপর সময়ে অশীতি, নবুতি বা শতবর্ষিয়কালে জীর্ণ-শীর্ণ, শিথিল, বিবর্ণ, বক্রদেহ, সদা কম্পমান, চলন শক্তি রহিত, বিগত যৌবন, পঙ্ককেশ, দন্তহীন, ক্ষীণদৃষ্টি, লোলাচর্ম ঞ্জলিত শির হয়ে যায়। এভাবে পূর্বের রূপ লাভণ্য অন্তর্হিত হয়ে বার্ষিক্যের ছবি সুস্পষ্টভাবে ভেসে উঠে। ইহাই রূপের আদীনব। আবার সেই লাভণ্যময় যুবক বা যুবতী কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে স্বীয় মলমূত্রে প্রলিপ্ত, সর্বদা শায়িত, অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠতে বসতে অক্ষম অথবা সেই যুবক বা যুবতীরই মৃতদেহ শশানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ক্ষীত, পুষ্যুক্ত, অথবা কাক, কুকুর, শৃগাল, বিবিধ কৃমিকীট ভক্ষণরত অথবা অস্থিসমূহ এদিকে ঐদিকে তথা নানাদিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখন কি আর পূর্বের লাভণ্যময়

রূপে থাকবে? কখনো না। ইহাও রূপের আদীনব। রূপ হতে নিঃসরণ কি? রূপের প্রতি যে ছন্দরাগ তা' দমন, পরিহার, সম্পূর্ণরূপে আসক্তিত্যাগ করাই রূপ হতে নিঃসরণ। বেদনার আশ্বাদ কি রকম? বেদনা জনিত যে সুখ ও সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তাই বেদনার আশ্বাদ। আবার, এই শাসনে ভিক্ষু কাম সম্পর্কে ও অকুশলধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজ্ঞ প্রীতি সুখ মণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করে বাস করে। প্রথম ধ্যান লাভ করার পর হতে সে নিজের দুঃখ, অপরের দুঃখ আত্ম-পর উভয় দুঃখ আনয়নের জন্য কখনো চেতনা উৎপাদন করে না। তখন সে নিদুঃখ বেদনাই অনুভব করে। ইহাই বেদনার আশ্বাদ। আবার, বিতর্ক-বিচার উপশমে আধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিন্তের একাক্ষতা, আনয়নকারী বিতর্ক বিচারাভীত সমাধিজ্ঞ প্রীতিসুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থধ্যান লাভ করে বাস করে। ... তখন সে নিদুঃখ বেদনাই অনুভব করে। এই নিদুঃখ বেদনাসমূহ বেদনার আশ্বাদ। বেদনার আদীনব কি রকম? যেই বেদনা অনিত্য, দুঃখদায়ক ও দুঃখপরিণামী তাই বেদনার আদীনব। বেদনা হতে নিঃসরণ কি? বেদনা প্রতি যেই ছন্দরাগ তা' দমন, পরিহার বা সম্পূর্ণরূপে আসক্তি ত্যাগ করাই বেদনা হতে নিঃসরণ। এইভাবে কাম, রূপ, বেদনাসমূহের আশ্বাদকে আশ্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে, নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে সম্যক অবগত হয়ে কাম, রূপ, বেদনা ত্যাগ করতে হয়। অন্যথায় আশ্বাদ, আদীনবাদি সম্যকরূপে অবগত না হলে কাম, রূপ, বেদনাসমূহ পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না। তাই তোমরা কাম, রূপ, বেদনাসমূহের আশ্বাদ, আদীনব, নিঃসরণকে সম্যক রূপে অবগত হয়ে কাম, রূপ, বেদনা পরিত্যাগ করতঃ নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

পরিশেষে তিনি বলেন-অতীতের পারমী, বর্তমানে নিজের প্রচেষ্টা ও সৎপুরুষের (বুদ্ধপ্রমুখ অনুত্তর শ্রাবকসম্ভ) উপদেশ এই তিনটির সমন্বয়ে মার্গফল লাভ করা যায়। এই তিনটি হতে একটি অপূর্ণ থাকলেও মার্গফল লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। শাস্ত্রে দেখা যায়, সুণক্ষত্র নামে লিচ্ছবি গোত্রীয় এক ব্যক্তি মার্গফল লাভ করার জন্য বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হয়েছিল। এবং বুদ্ধের সকাশে গিয়ে প্রার্থনা করে বলেছিল 'প্রভু ভগবান, আমাকে মার্গফল লাভের পথ সুগম করে দিয়ে নির্বাণ সুখ লাভের ভাগী করুন। কিন্তু তার অতীত জন্মের পারমী ভালো ছিল না বিধায় তারপক্ষে মার্গফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মগধরাজ অজাতশত্রু ছিলেন পূর্বজন্মের পারমী সম্পন্ন পুন্ডাল। বুদ্ধকে প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মার্গফল লাভ করতে পারতেন। তবে বুদ্ধকে দর্শন করার পূর্বে অসৎপুরুষ দেবদত্তের উপদেশ শ্রবণ করতঃ পিতৃহত্যা করায় মার্গলাভে বঞ্চিত হন। তাই মার্গফল লাভ করতে হলে অতীতের পারমী বর্তমানে

নিজের প্রচেষ্টা, সংস্কার উপদেশ এই তিনটি একই সাথে প্রয়োগ ঘটাতে হবে। অনেকে বলে থাকে আমার অতীতের পারমী আছে নাকি নেই তা' কি করে জানব? এটার সরাসরি উত্তর কেহ বলে দিতে পারে না। তবে আমার গবেষণা সিদ্ধান্ত হল, তোমাদের মনের মধ্যে যদি চারি আর্যসত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় এবং তোমরা নিজে নিজে এটা দুঃখ, এটা দুঃখ সমুদয়, এটা দুঃখ নিরোধ এটা দুঃখ নিরোধের মার্গ বলে প্রাথমিকভাবে চারি আর্যসত্য জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করতে, জ্ঞানতে সমর্থ হও তাহলে তোমাদের অতীতের পারমী বলে আছে জানবে। অব্যবহারের দরুন ময়লাযুক্ত অনুজ্জ্বল পিতলের কোন বস্তুকে ঘষামাজা করার পর সেটা যেমন উজ্জ্বল হয়ে চক্‌চক্‌ করে। ঠিক তদ্রূপ চারি আর্যসত্য জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরকে সংস্কার উপদেশের আলোকে এবং বর্তমানে নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় আরো বর্ধিত, বহুলীকৃত করা সম্ভব। এইভাবে চারি আর্যসত্য জ্ঞান বর্ধিত বহুলীকৃত হয়ে ইহলোকেই মার্গফল লাভ হয়ে থাকে। তোমরাও মার্গফল লাভের তরে চারি আর্যসত্য জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় তৎপর থাক।

সাধু, সাধু, সাধু।

সাধারণের নিন্দা প্রশংসার কোন মূল্য নেই

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-আসব অর্থ পাপ। আসব হতেই পাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আসব ক্ষয় হয়ে গেলে পাপও উৎপন্ন হতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সর্বদাই আসব ক্ষয় করে অরহত্ব লাভ করতে উপদেশ দিতেন। আসব থেকে অবিদ্যার উৎপত্তি, অবিদ্যা থেকে আসবের উৎপত্তি। অন্যদিকে আসব নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ, অবিদ্যা নিরোধে আসব নিরোধ হয়ে থাকে। আসব হতেই লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপন্ন হয়ে নির্বাণ পথে অন্তরায় ঘটায়। যা হতে ভাবী সংসার স্রাব (মল) উৎপন্ন হয় তাই আসব। আসব চিন্তের মত্ততা উৎপাদক, অকুশল মনোবৃত্তি। আসব চার প্রকার, যথা-(১) কামাসব (২) ভবাসব (৩) দৃষ্টি আসব ও (৪) অবিদ্যা আসব। কামাসব ও ভবাসব উভয়ই লোভ চৈতসিক। ইহারা ভব ভবান্তরে সুখ ভোগে প্রলোভিত করে। দৃষ্টি আসব ও অবিদ্যা আসব হল মোহ চৈতসিক। দৃষ্টি আসব মিথ্যাদৃষ্টি বা ভুল ধারণা। দৃষ্টি আসবের আলম্বন অবিনশ্বর বাদ বা আত্মবাদ। অবিদ্যা আসব অজ্ঞান প্রসূত সমস্তের সাথে (সকল বিষয়ে) জড়িত। কামাসব সকৃদাগামী মার্গ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। ভবাসব অর্হত্ব মার্গ লাভে নিরুদ্ধ হয়। দৃষ্টি আসব স্রোতাপত্তি মার্গ লাভে ধ্বংস হয়। অবিদ্যা আসব অর্হত্ব মার্গ লাভে ক্ষয় হয়। এই আসবসমূহ ক্ষয় সাধন করতে না পারলে সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। বৌদ্ধধর্মের

মতে, আসব ক্ষয় করতে না পারলে কেহই প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না।
তাই বলা হয়েছে—

আসবের ক্ষয়কাল না হয় যতদিন,
এসব বিশ্বাস ভিক্ষু করিও না ততদিন।

যতদিন পর্যন্ত আসবসমূহ ক্ষয়সাধন না হয় ততদিন পর্যন্ত কোন ভিক্ষু শ্রামণ বা গৃহী কেহই প্রকৃত বিশ্বাসীরূপে পরিচিত হতে পারে না। কারণ আসব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তারা কেহ পাপ মুক্ত নহে, পাপকার্যের উর্ধ্বেও নহে। সর্ব নিম্নে স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত না হলে কাহাকেও বিশ্বাস করতে নেই। পণ্ডিত ভিক্ষু দুঃখান্ত নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারে না। চারি প্রকার আসব হতে অন্ততঃপক্ষে একটি আসবও ক্ষয়সাধন করতে না পারলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ই সমান দুঃখী। আসব ক্ষয় করতে অক্ষম হলে শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য অর্থহীন। আসব ক্ষয় সাধন করা না গেলে নিজকে পাপ মুক্ত বা পাপ হতে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বুদ্ধের সময়কালীন কথা, একদিন জনৈক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের সমীপে এসে বলল হে গৌতম, আমি নৈরঞ্জনার জলে স্নান করতঃ পাপ মোচন করে পরিশুদ্ধ হয়েছি। ব্রাহ্মণের কথা শুনে বুদ্ধ বললেন—ব্রাহ্মণ, নৈরঞ্জনার জলে স্নান করে তোমার অন্তরের লোভ, দ্বেষ, মোহ সমূহ বিদূরীত হয়েছে? ব্রাহ্মণ—না, হয়নি। অন্তরে লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি কিরূপে নিজকে পরিশুদ্ধ বলে দাবি করছ? প্রকৃতপক্ষে তুমি নৈরঞ্জনার জলে স্নান করে দেহকে ধৌত করেছ মাত্র কিন্তু অন্তরের পাপমলকে বিধৌত করতে পারনি। হে ব্রাহ্মণ, একথা শুনে রাখ অন্তরের লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদূরীত করতে না পারলে পরিশুদ্ধ হওয়া যায় না। নদীর জলে স্নান করলে কখনো পাপ মোচন হয় না। পাপ মোচন করতঃ পরিশুদ্ধ হতে হলে অন্তরের লোভ, দ্বেষ, মোহ সমূহ চিরতরে বিশোধিত করতে হয়। বনভক্তে বলেন, বর্তমানেও অনেক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ মোচনের আশায় গঙ্গার জলে স্নান করে থাকে। এগুলো ভ্রান্তধারণা ছাড়া কিছুই নয়। কিভাবে পাপ উৎপন্ন হয় জান? সংকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, ঈর্ষা, মাৎসর্য এই পাঁচটি দ্বারাই পাপ উৎপন্ন হয়। অন্তরের মধ্যে এই পাঁচটি বিদ্যমান থাকলে সর্বদা পাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভীগণ কায়-বাক্য মনের দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন করে না। অগত্যা কোন ক্ষুদ্র পাপ করলেও তা গোপন করতে পারে না। কারণ তাদের মনচিন্তে পাপ চেতনা থাকে না। মনচিন্তের মধ্যে যার যত বেশি পাপ চেতনা ও অজ্ঞানতা ভাব বিদ্যমান থাকবে সে তত বেশি পাপ গোপন করে রাখে। অজ্ঞানের স্বভাব হল

পাপসমূহ গোপন করে রাখা। তজ্জন্য তারা বারবার পাপকর্ম সম্পাদন করে থাকে। মোটকথা হল, যারা মার্গফললাভী নয় তাদেরকে যে কোন মুহুর্তে পাপ, দুঃখ এসে গ্রাস করতে পারে। অন্যদিকে যারা মার্গফললাভী তাদের অন্তরে কিছুতেই পাপ, দুঃখ এসে অবস্থান করতে পারে না। মার্গফল লাভ করতঃ মনচিন্ত্ত অমরভুবনে অবস্থান করলে কিছুতেই দুঃখ, পাপ উৎপত্তি হবার আশঙ্কা থাকে না। অমরভুবন হল মারের প্রভাব মুক্ত অবস্থা; সেখানে মার পৌছতে পারে না। সেই অমরভুবনেই একমাত্র সুখ, শান্তি অর্জিত হয়।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা প্রব্রজিত হয়ে আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করছ বিধায় তোমাদেরকে নানাজনে নানাকথা বলতে পারে। কেহ প্রশংসাও করতে পারে, কেহ নিন্দাও করতে পারে। কারণ এটা জগতের ধর্ম। ভালোজনে ভালো বলে আর মন্দজনে মন্দই বলে থাকে। যতই ভালো কর্ম করা হোক না কেন প্রশংসার চেয়ে নিন্দাবাক্যই বেশি শুনতে হয়। নিন্দুকের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা অসম্ভব। তাই বুদ্ধ বলেছেন, সাধারণের নিন্দা-প্রশংসার কোন মূল্য নেই। সাধারণ জনতা তোমাদেরকে নিন্দা করলে তা' যেমন মূল্যহীন, তেমনি প্রশংসা করলেও তা' মূল্যহীন। তোমরা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকলে সবই ঠিক বলে জানবে। তাদের নিন্দা-প্রশংসা বাক্য শুনে কাজ নেই। তাদের প্রশংসা বাক্য তোমাদের সাধনা মার্গকে সুগম করতে পারবে কি? নাকি তাদের নিন্দাবাক্য তোমাদের সাধনা মার্গকে কষ্টকময় করতে পারবে? কিছুই করতে পারবে না। সত্যের পথ লোকের নিন্দা-প্রশংসার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কাজেই সাধারণের নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হবে না। ধর্ম তুমি মহামূল্যবান উৎকৃষ্ট একখানি চাদর গায়ে দিয়ে চেয়ারে বসে আছে। ইত্যোবসরে চাদরের এক কোনে সামান্য বালি লাগল। আচ্ছা, সেই সামান্য বালি লেগে যাওয়ার জন্য চাদরটি একেবারেই কি ফেলে দিতে হবে? বা ফেলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কি? হবে না। কারণ একটু ঝেড়ে নিলেই তো চাদর হতে বালিটুকু পড়ে যাবে। একটুখানি বালি লাগার ফলে তো আর মূল্যবান চাদরখানি নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। ঠিক তদ্রূপ, লোক নিন্দাকেও তোমরা সেরূপেই জানবে। এবং আট প্রকার লোকধর্মে (সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা) কখনো কম্পিত হবে না। তাই বলা হয়েছে-

এক বটে শৈল যথা বায়ুবেগে না হয় কম্পিত,

যথা নিন্দা-প্রশংসাতে সুপণ্ডিত নহে বিচলিত।

পর্বত যেমন বায়ুবেগে কম্পিত হয় না ঠিক তদ্রূপ তোমরাও অপরের নিন্দা-প্রশংসা বাক্যে কম্পিত, বিচলিত হবে না। মনে রাখবে জগতে লোকনিন্দা নতুন নহে। ইহা অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বুদ্ধের

সময়কালীন ঘটনা, শ্রাবস্তীর অতুল সহ পাঁচশত উপাসক ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্য রেবত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়। রেবত স্থবির ধ্যান সুখে মগ্ন বলে নিরবে রইলেন, উপাসকগণ ‘এই ভিক্ষু নিশ্চয় বোকা, কিছুই বলতে জানে না’ বলে নিন্দা করতঃ স্থবির শারীপুত্রের নিকট গেল। শারীপুত্র স্থবির গভীর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বিস্তারিতভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন। এবার উপাসকগণ ‘এই ভিক্ষু কথায় বোধ হয় অস্ত নেই’ বলে নিন্দা করতঃ আনন্দ স্থবিরের নিকট গেল। স্থবির আনন্দ সরল কথায় অল্প পরিমাণ ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। তখন উপাসকগণ তাঁকেও ‘এই ভিক্ষু বোধ হয় নিজের কথাকে স্বর্ণ রৌপ্য তুল্য মনে করে, সেজন্য দু’একটি বলে নিরব থাকে’ বলে নিন্দা করতঃ বুদ্ধের নিকটে চলে গেল। পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেহ নেই, কেউই সমালোচনার অতীত নয়। একান্ত নিন্দিত ও একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি কখনই হয়নি, হবেনা, এখনও নেই। তাই লোকের নিন্দা-প্রশংসায় গুরুত্ব না দিয়ে আপন মনে নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হও। সাধারণ লোকের নিন্দা-প্রশংসায় কিছুই আসে যায় না।

অজ্ঞানী ব্যক্তির সংসার কারাগারে অনন্ত দুঃখ ভোগ করলেও তবু কারাগারের প্রতি বীতস্পৃহ হয় না, কারণ অজ্ঞ ব্যক্তির স্বীয় অজ্ঞতা দোষে অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হলেও তা’ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যেমন ঘনকালো মেঘ চন্দ্রকে আবৃত করলে চন্দ্রের আলো পৃথিবীতে প্রকাশিত হতে পারে না। তাই অজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে সংসার কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব পর হয়ে উঠে না। বাস্তবিক সত্ত্বগণ জন্ম-মৃত্যু চক্রে পুনঃপুন আবর্তিত বিবর্তিত হয়ে কতো বর্ণনাভীত দুঃখই না ভোগ করছে। কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষুর অভাবে তারা সেই সব প্রকৃত সত্যকে দর্শন করতে পারছে না। দুঃখময় অনিত্য অস্তঃসার শূন্য এ’সংসারের প্রতি তাদের কিসেরই বা আকর্ষণ, কিসেরই বা অনুরাগ। এই সংসার রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-অনুশোচনা প্রভৃতি অগ্নিতে নিত্য প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। এই অবস্থায় সংসারে সুখ ভোগের ইচ্ছা বা কামনা বাসনা অজ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য শোভা পেলেও জ্ঞানী ব্যক্তির সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হন। তবে প্রজ্ঞাচক্ষুর অভাবে জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জগতের প্রকৃত স্বভাব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এ’ ত্রিলক্ষণ দেখতে পান। মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে অধিকাংশ মানুষ দুর্গতি প্রাপ্ত হওত অনন্ত দুঃখে পতিত হয়, আর অতি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে। তোমরাও অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে না, প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন কর। সংসারের সকল বস্তুতে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম দেখতে চেষ্টা কর। সংসারের প্রতি দুঃখ ও ভয় জ্ঞানে অবস্থান করতে সক্ষম হলে যাবতীয় তৃষ্ণাকে ক্ষয় সাধন করে

নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে। তখন আর কোন প্রকার দুঃখেই তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তোমরা সর্বদা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, ঈক্ষিত বস্তুর অলাভ দুঃখকে দর্শন করতঃ অবস্থান করবে। সংসারে দুঃখময় দৃশ্যই তোমাদের দর্শনীয় বিষয়। সেই দৃশ্য সম্যকভাবে দর্শন করা সম্ভব হলে চিন্তা থেকে পাপ দূরীভূত হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে—

বুদ্ধের শাসনে জন্ম করিয়া গ্রহণ,
দুঃখকে করিয়া ভয় মুক্তির কারণ।

নির্বাণ লাভ করতে হলে সংসার দুঃখকে ভয় করার কোন বিকল্প নেই। কারণ সংসারকে দুঃখরূপে দর্শন করতঃ সংসারের প্রতি ভয় জ্ঞান উৎপন্ন হলে তবেই সংসার ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। ভগবান বুদ্ধও এই সংসারে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণাদি দুঃখ দেখে তা' হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নির্বাণের অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই তোমাদেরকেও সংসারের যাবতীয় দুঃখাদি পুনঃপুন দর্শন করতঃ সেই দুঃখ হতে চিরমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রত্যাশী হয়ে অবস্থান করতে হবে। এই সংসার অনিত্য, এখানে সুখ বলে কিছুই নেই। কেহ যদি সংসারে সুখ দেখে এবং সংসারে সুখ পেয়েছে বলে; তা' পাগলের প্রলাপ বলা সদৃশ। জলবুদবুদ যেমন ফুটে না ফুটেই ভেঙ্গে যায়, ঠিক তেমনি এই সংসারও জল বুদবুদের মতই অন্তঃসার শূন্য আর মরীচিকার মতই মিথ্যা। তোমরা সংসারের এইরূপ অনিত্যতা, দুঃখময়তা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ কর। অতঃপর দুঃখ উপশমকারী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন কর। এতে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে সর্ব দুঃখে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা দশ অকুশল পরিত্যাগ করে দশ কুশলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাক বা দশ কুশল গঠন কর। সেই দশ অকুশল কি? মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সঙ্কল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা বিমুক্তি। আর দশ কুশল কি? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তি। যারা সম্যক দৃষ্টি গঠন করবে তাদের মিথ্যা দৃষ্টি থাকতে পারবে না। এবং সম্যক সঙ্কল্প গঠন করলে মিথ্যা সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য গঠন করলে মিথ্যা বাক্য, সম্যক কর্ম গঠন করলে মিথ্যা কর্ম, সম্যক আজীব গঠন করলে মিথ্যা আজীব, সম্যক ব্যায়াম গঠন করলে মিথ্যা ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি গঠন করলে মিথ্যা স্মৃতি, সম্যক সমাধি গঠন করলে মিথ্যা সমাধি, সম্যক জ্ঞান গঠন করলে মিথ্যা জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তি গঠন করলে মিথ্যা বিমুক্তি থাকতে পারবে না। সম্যক দৃষ্টি..... সম্যক সংকল্পাদি আর্য

অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে তো জানা আছে নয় কি? সম্যক জ্ঞান কি জান? এটা সত্য এটা মিথ্যা, এটা কুশল এটা অকুশল এবং এটা দুঃখ, এটা দুঃখ সমুদয়, এটা দুঃখ নিরোধ, এটা দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলা হয়। সম্যক বিমুক্তি কি রকম? যাবতীয় পাপ, অকুশল এবং দুঃখ থেকে চিস্তা বিমুক্ত করাকে সম্যক বিমুক্তি বলে। তাই আবারো বলছি, তোমরা দশ অকুশল সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে দশ কুশল গঠন কর। এটাই হচ্ছে প্রব্রজিতদের আসল কাজ। যারা এ'কাজে সফলকাম হবে তারা প্রব্রজিত জীবনকে সার্থক রূপদান দিতে সমর্থ হবে। আর যারা প্রব্রজিত হয়েও দশ কুশল গঠন করতে অক্ষম হয়ে থাকে তারা অকৃতকার্যই বলে জানবে। দশ কুশল গঠন করতঃ তোমরা নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন তিনিই সঙ্খ্যাম জয়ী

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মুখে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমরা দেহের প্রতি আমি, আমার, আমিত্ব ত্যাগ কর। আমি বললে অজ্ঞান, আমার বললে তৃষ্ণা, আমিত্ব বললে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়। মানুষের 'আমি' বা 'আমার' বোধ একটা মিথ্যা ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধ সমবায়ে গঠিত দেহই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের চিন্তে মিথ্যা আমিত্বের বোধ জাগায়। পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে তারা আত্মরূপে ধরে নিয়ে সেখানে নিত্য আত্মার অবস্থান কল্পনা করে থাকে। সেই ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এই পঞ্চস্কন্ধ আমার, এতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা বলে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। এবিধ ভ্রান্ত কল্পনার নিকটে আবদ্ধ হয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তৃষ্ণা, আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে এবং বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করতঃ অনন্ত দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির পঞ্চস্কন্ধকে জেনে সম্যকভাবে সেখানে মমত্ববোধ উদয় করে না। তারা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি বীতৃষ্ণ হন এবং ইহা আমার নহে, এতে আমি অবস্থিত নহি, ইহা আমার আত্মা নহে' বলে জানেন। সেই সম্যক জ্ঞান লাভের ফলে তারা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আমি, আমার, আমিত্ব ধারণাসমূহ পরিত্যাগ করতে সমর্থ হন। এবং সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হওত নির্বাণ লাভ করেন। তাই তোমরাও পঞ্চস্কন্ধের প্রতি 'আমি, আমার, আমিত্ব' ধারণা পরিত্যাগ করে অবস্থান কর। মনে রাখবে পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আমি ধারণা পরিত্যাগ করাই সুখ, আমার ধারণা পরিত্যাগ করাই সুখ, আমিত্ব ধারণা পরিত্যাগ করাই সুখ। বাস্তবিক পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আমি, আমার, আমিত্ব ধারণাসমূহ সত্যের বিপরীতে মিথ্যা ভ্রান্তমত ছাড়া

কিছুই নয়। আর এই ভ্রান্ত মমত্ববোধের কারণে অজ্ঞজনেরা অশেষ দুঃখ ভোগান্তির শিকার হয়। সংসার দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না। তাই বলা হয়েছে—

আমি যে আমার বাড়ি আমিত্ব ধারণা,
মোহ অজ্ঞানতা সব বিজ্ঞপ্তি কল্পনা।
বিদর্শন প্রজ্ঞালো জ্বলে যবে যথা,
অবিদ্যার মোহ ভাগ্নে ঘুচে অজ্ঞানতা।
চলাফেরা উঠা বসা প্রতি সঞ্চালনে,
নামরূপ জন্মে পুনঃ ক্ষয় সেইক্ষণে।

পঞ্চক্কক বা সংসার সবই মিথ্যা, অসার। এখানে সত্য, সার, নিত্য বলে কিছুই নেই। ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘সে’ এগুলিও মিথ্যা। পঞ্চক্ককের সমান দুঃখ নাই, পঞ্চক্কক সমন্বিত দেহধারণ অতিশয় দুঃখদায়ক। এই অনিত্য, ক্ষয়শীল, ব্যয়ধর্মী, নিঃসার, দুঃখময় সংসার হতে চির বিমুক্তি বা উৎপত্তি ও নিরোধের উপশমই পরম সুখ।

তোমাদের আসল কর্তব্য কি জান? আত্মদমন, আত্মজয় এবং নিজকে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার করা। আত্মদমনই সুখ, আত্মজয়ই সুখ, নিজকে পাপমুক্ত করাই সুখ। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আত্মদীপ, আত্মশরণাপন্ন হয়ে কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। অপরকে দর্শন করার পরিবর্তে শুধুমাত্র নিজকে দর্শন করাই প্রব্রজিতদের প্রকৃত কর্তব্য। তোমরা নিজকে নিজে দমন না করলে অন্য কেহ এসে তোমাকে দমন করতে পারবে না। একজন অপরজনকে কখনো দমন করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে দমিত না হয়। নিজের সম্যক প্রচেষ্টায় নিজকে দমন করতে হয়। আত্মদমন করার জন্য ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। কাজেই নিজে উদ্যোগী হয়ে আত্মদমন না করলে কিছুতেই নিজকে দমন করা সম্ভব হবে না। যিনি নিজকে দমন করার উদ্যোগী হয়ে আত্মদমনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনিই আত্মদমন করতে সক্ষম হন। তবে নিজকে দমন করার মত কঠিন কাজ আর নেই। অথচ আত্মদমন করতে না পারলে সবই বৃথা। কেননা আত্মদমন ব্যতিরেকে নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব। আত্মদমন করতে পারলে তবেই দুর্লভ সুখ নির্বাণ অর্জিত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে—

আত্মকে সুদমিত যখন করিবে,
দুর্লভ অরহত্ব ফল তখন লভিবে।

তোমরা নিজকে নিজে দমন কর। নিজকে দমন করার মাধ্যমে চিন্ত হতে লোভ, দ্বেষ, মোহ অপসারিত হলে পরম সুখ নির্বাণ উপলব্ধি হয়। এইভাবে

নিজকে দমন করার কাজে সফল হলে অপরকেও দমন করা সম্ভব হয়। আত্মজয় করার অর্থ নিজকে নিজে জয় করা। সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যিনি নিষ্কলুষ হওত আত্মজয়ী হন, তাঁর সেই জয়ই শ্রেষ্ঠ জয়। তাই বলা হয়েছে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত সহস্র লোক জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেষ্ঠ। এবং যিনি নিজকে জয় করতে পেরেছেন তিনিই প্রকৃত সংগ্রাম জয়ী। বৌদ্ধধর্মের মতে, অন্যজ্ঞনকে জয় করার মাঝে কোন আনন্দ নেই, সেই জয়ের প্রকৃত তাৎপর্যও নেই। অন্যজ্ঞনকে জয় করে আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করারও কিছুই নেই। কারণ অপরের উপর জয় লাভের দ্বারা সংযমী হওয়া যায় না; সদাচারী জিতেন্দ্রিয় পুরুষও হওয়া যায় না। তাই মনে রাখবে যে নিজেকে জয় করতে পারে সেই প্রকৃত (সংগ্রাম) জয়ী। অন্তরের লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা বিদূরীত করতঃ যেই আত্মজয় সেই জয়ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জয়। এই জয়ের কোন তুলনাই হয় না। এইরূপ আত্মজয়ী পুরুষের জয়কে দেবতা, ব্রহ্মা কিংবা মার কেহই পরাজয় করতে পারে না। কায়-বাক্য-মনে কোন প্রকার পাপকর্ম সম্পাদন করা হতে মুক্ত হওয়াকে নিজকে পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করা বুঝায়। তোমরা যাবতীয় পাপ কলুষাদি থেকে বিমুক্ত হতে নিষ্কলঙ্কভাবে অবস্থান কর। মনে রাখবে নিষ্পাপ অন্তরে কিছুতেই পাপ কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারে না। তবে যাবতীয় অকুশল পাপ চেতনাসমূহ স্বীয় চিত্ত থেকে মূলোৎপাটন করতঃ নিজকে পাপ হতে উদ্ধার করার কাজ সহজ নয়। সর্বদা পাপ বিরতি হয়ে অবস্থান করতে হয়। চিন্তের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও পাপ চেতনাকে স্থান দেওয়া যায় না। অন্যদিকে নিজকে পাপ হতে উদ্ধার করতে না পারলে আপন উন্নতির সব আশা আকাঙ্ক্ষা নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। এই জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ চিত্ত থেকে অকুশল পাপকে মূলোচ্ছেদ সাধনে তৎপর হয়ে থাকে। নিজকে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার করতে পারলে পরম সুখ শান্তি লাভ হয়। যারা সেই পরম সুখের অধিকারী তারা অপরকেও পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু যারা নিজকে পাপপঙ্ক হতে এখনো উদ্ধার করতে পারেনি তাদের দ্বারা অপরকে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার করা অসম্ভব।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা কর্মকে ক্ষয় সাধন কর এবং কর্মকে ধ্বংস কর। কর্মকে ক্ষয় ধ্বংস সাধন করতে না পারলে পুনঃপুন জন্মধারণ করতঃ বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হবে। কর্মকে ক্ষয়, ধ্বংস সাধন করলে পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। বৌদ্ধধর্মের মতে, এক একটি কর্মই এক একটি পুনর্জন্ম (পুনর্জন্মের বীজ সদৃশ)। যতটি কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে ততটি পুনর্জন্ম বৃদ্ধি হচ্ছে। তার রেশ ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে দুঃখের পরিধিটুকুও। তাই ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সর্বদা

কর্মকে ক্ষয় করতে উপদেশ দিতেন। এবং ভিক্ষুসম্মকে বিবিধ কর্মে লিপ্ত না থাকতে অনুশাসন প্রদান করতেন। তাই তোমরা একরূপ প্রতিজ্ঞা কর “আমরা কর্মকে ধ্বংস সাধন করব, কর্মকে ক্ষয় করব”। কর্ম সম্পাদন করার হেতু কি জ্ঞান? অবিদ্যা, তৃষ্ণা। অবিদ্যা তৃষ্ণার কারণে সত্ত্বগুণ কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা না থাকলে কর্ম সম্পাদন করতে হয় না। কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয় হয়ে গেলে কর্মও ক্ষয় হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়। আর তখন তো কর্ম সম্পাদন করার প্রশ্নও আসে না। এটাই হল প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম। তজ্জন্য বলা হয়েছে, বৌদ্ধধর্ম অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান মুক্ত ধর্ম। অন্যান্য ধর্মে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান বিদ্যমান থাকলেও বৌদ্ধধর্মে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান থাকতে পারে না। তজ্জন্য অবিদ্যা, তৃষ্ণা উপাদানযুক্ত চিন্তে কেহ যদি বলে আমি বৌদ্ধধর্ম আচরণ করছি তাহলে সেটা মিথ্যাকথা বলা সদৃশ হবে। যেহেতু বৌদ্ধধর্ম আচরণের মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভের তাগিদে। অন্যদিকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান অভিভূত চিন্তে কখনো নির্বাণ লাভ করা যায় না। কারণ নির্বাণ অবিদ্যামুক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, উপাদানমুক্ত। নির্বাণ এমন এক জ্ঞানের স্তর যেখানে অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান নেই। চির সুখ, চির শান্তি ও পরম বিমুক্তির এক অবস্থা। তোমরাও সেই সুখ, শান্তি লাভের তরে অবিদ্যামুক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, উপাদানমুক্ত বৌদ্ধধর্মই অনুশীলন কর। এই ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা তোমাদের নির্বাণ লাভ হবে।

তোমরা কোন বিষয় দেখলে দেখতে পার, শুনতে শুনতে পার, অনুমান করলে অনুমান করতে পার। কিন্তু তাতে আসক্ত হবে না। আসক্ত না হলে মনও সেখানে যাবে না, মন সেখানে না গেল দুঃখও পাবে না। যখন তোমাদের মন সেখানে যাবে না তোমরা ইহলোকেও নও, পরলোকেও নও এবং ইহ-পর উভয়ের মধ্যেও নয়, ইহাই দুঃখের অন্ত বা দুঃখ নিরোধের উপায়। তোমরা যদি কোন বিষয় দেখার পর তাতে আসক্ত হও তাহলে তৎক্ষণাৎ তৃষ্ণা উৎপন্ন হবে। তৃষ্ণা উৎপন্ন হলে তা উপভোগ, পরিভোগ করার প্রবল কামনা বাসনা উদয় হবে। আর তখন দুঃখের কোন সীমাই থাকবে না। উপমা স্বরূপ বলা যায়, ধর কোন একজন যুবতী মেয়েকে দেখতে পেল। তখন যদি তাতে আসক্ত হও, তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা উৎপন্ন হবে নয় কি? নিশ্চয় হবে। আর যদি যুবতী মেয়েকে মেয়ে রূপে দর্শন না করে চারিধাতু রূপে দর্শন কর তাহলে তো কোন আসক্তি, তৃষ্ণা, উপাদান উদয় হবার সুযোগ থাকবেই না। কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন বিষয় দর্শন, শ্রবণ, অনুমান করার সময় যদি তাতে অজ্ঞানের সহিত দর্শন করা যায়, তাহলে অবিদ্যা বৃদ্ধি পায়, তৃষ্ণা, উপাদান তথা অত্যাশক্তি উদয় হয় এবং সেই হেতু অশেষ দুঃখের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোন

বিষয় দর্শন, শ্রবণ, অনুমান করার সময় তাতে আসক্ত না হয়ে জ্ঞানের সহিত যদি সে কার্য সম্পাদন করা যায় তাহলে অবিদ্যা বৃদ্ধি পায় না, তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না, উপদানও উৎপন্ন হয় না। এবং কোন প্রকার দুঃখের সম্মুখীনও হতে হয় না।

বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূল শিক্ষা হল অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদেরকে এই তিনটি শিক্ষা সম্যকভাবে আয়ত্ত্ব করতে হয়। জগতের সবকিছুই অনিত্য, কোথাও নিত্য স্থায়ী বলে কিছুই নেই। ‘সব্বে সত্ত্বা দুঃখময়’, জগতের সকল প্রাণীই দুঃখের মধ্যে অবস্থান করতেছে। জগতের সমস্ত কিছুই অনাত্ম। অর্থাৎ জগতে আত্ম বলে কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। এই তিনটি লক্ষণ দ্বারা জগতকে বিশেষরূপে জেনে, দর্শন করে অবস্থান করলে ইহজন্মে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয়। যারা জগতের সমস্ত কিছুতেই (প্রাণী, বস্তু) অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিবিধ লক্ষণের আলোকে দর্শন করে তাদের যাবতীয় দুঃখ নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা সর্বদা এরূপ বলতে শিক্ষা করবে-

সকল সংস্কার অনিত্য

সকল সংস্কার দুঃখজনক

সর্ব ধর্ম অনাত্ম

প্রজ্ঞায় যখন হেরে,

ইহাই জ্ঞান’ বিশুদ্ধিমার্গ তরে।

অর্থাৎ সংস্কারসমূহ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম বলে প্রজ্ঞাচক্ষুতে দৃষ্টিগোচর (প্রতিভাত) হলেই দুঃখসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাই বিশুদ্ধিমার্গ বা বিশুদ্ধি লাভের উপায়। তাই তোমাদেরকে বলছি, তোমরা সর্বদা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এ ত্রিবিধ জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে অবস্থান করবে। অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে কখনো জগতের প্রতি নিত্য, সুখ আত্ম কল্পনা করতঃ মিথ্যার আশ্রয়ে অবস্থান করবে না। জগতে কোথাও নিত্য, সুখ, আত্ম বলে কিছুই নেই।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সবাই প্রজ্ঞাবান হও, কখনো দুঃস্প্রাজ্ঞ হয়ে অবস্থান করবে না। কারা দুঃস্প্রাজ্ঞ? যারা দুঃখ কি তা’ জানে না, দুঃখ সমুদয় কি তা’ জানে না, দুঃখ নিরোধ কি তা’ জানে না, দুঃখ নিরোধের উপায় কি তা’ জানে না তারাই দুঃস্প্রাজ্ঞ। অন্যদিকে যারা দুঃখ কি তা’ জানে, দুঃখ সমুদয় কি তা’ জানে, দুঃখ নিরোধ কি তা’ জানে, দুঃখ নিরোধের উপায় কি তা’ জানে তারাই প্রজ্ঞাবান। তোমরা প্রজ্ঞাবান হতে পারবে তো? ভিক্ষুসঙ্ঘ এক কণ্ঠে বলে উঠল-হ্যাঁ, ভগ্নে পারবো। আশীর্বাদ করুন যেন অতিসত্ত্বর প্রজ্ঞাবান হতে পারি। মনে রাখবে, দুঃস্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা অসম্ভব। একমাত্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে সমর্থ হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সর্বদা শীলবান হয়ে থাকে। কারণ যথায় প্রজ্ঞা তথায় শীল, যথায় শীল তথায় প্রজ্ঞা।

শীলবানই প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাবানই শীলবান। শীল ও প্রজ্ঞা দ্বারা সর্বক্ষেত্রে জয়যুক্ত হওয়া যায়। শীলবান ব্যক্তি কখনো দুঃশীল হতে পারে না। যেহেতু প্রজ্ঞা অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা থেকে যাবতীয় পাপসমূহ অপসারিত হয় এবং অজ্ঞান, মার বহুদূরে সরিয়ে যায়। কাজেই চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, মারের অনুপস্থিতিতে কে-ই বা দুঃশীলতা আচরণ করবে? অন্যদিকে যারা দুঃশ্রদ্ধ তারা দুঃশীল; তাদের দ্বারাই দুঃশীলতা আচরণ করা হয়। তোমরা একরূপ প্রতিজ্ঞা কর 'আমরা আজ হতে আর দুঃশ্রদ্ধ হবো না, প্রজ্ঞাবান হয়ে অবস্থান করবো।' সর্বদা শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা, প্রজ্ঞা শিক্ষা ও শীল অভ্যাস, সমাধি অভ্যাস, প্রজ্ঞা অভ্যাস এবং শীলাচরণ, সমাধি আচরণ, প্রজ্ঞা আচরণে তৎপর থাকবে। চিন্তের মধ্যে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার ক্রমিক গতি, ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক আচরণ সমাপ্ত না হলে হঠাৎ অরহত্ব লাভ করা যায় না। পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে বলেন-তোমরা চিন্তের মধ্যে অজ্ঞানকে স্থান দিচ্ছো, নাকি জ্ঞানকে স্থান দিচ্ছো? যদি অজ্ঞানকে স্থান করে দাও তাহলে চিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকতে পারবে না আর জ্ঞানকে স্থান দিলে অজ্ঞান থাকতে পারবে না। তোমরা জ্ঞানকে স্থান দিবে, কখনো অজ্ঞানকে স্থান দিবে না। অজ্ঞানকে স্থান না দিয়ে জ্ঞানকে স্থান দেওয়াই তোমাদের কর্তব্য। কারণ জ্ঞানকে স্থান দিলে তবেই নির্বাণ লাভ করা যাবে; সংসারের যাবতীয় দুঃখের চির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য লোকোত্তর সুখের অধিকারী হওয়া যাবে। অন্যথায় নির্বাণ লাভের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যা ভিক্ষু জীবনে কখনো কাম্য হতে পারে না। তাই তোমরা সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর, কখনো অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করবে না। ইহাই নির্বাণ লাভের উপায়।

সাধু, সাধু, সাধু।

নির্বাণের মন নির্বাণের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মুখে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করতে হলে তোমাদেরকে জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হতে হবে। সর্ব ভবকে অভিভব করতঃ জ্ঞানের উচ্চতা লাভ করতে হবে। নিম্ন আকাঙ্ক্ষা, হীন জ্ঞান, নিম্ন স্তরের সাধনা পরিত্যাগ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করতে হবে। তা না হলে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করা সম্ভবপর নয়। এই বৌদ্ধধর্ম বা সদ্ধর্ম অনুশীলন করা সাধারণ (হীন জ্ঞান সম্পন্ন পুদাল) লোকের পক্ষে অসম্ভব। সদ্ধর্ম কি? যেই ধর্মে লোভ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই তাই সদ্ধর্ম। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সদ্ধর্ম লাভ দুষ্কর। সহজে সদ্ধর্ম লাভ করা যায় না। বলা বাহুল্য যে, লোভ, ঘেঁষ, মোহ বিদূরীত অলোভ, অঘেঁষ, অমোহ যুক্ত পবিত্র চিন্তে একমাত্র সদ্ধর্ম লাভ হয়। অন্যথায় সদ্ধর্ম লাভ হয় না। যারা মনচিন্তা থেকে লোভ, ঘেঁষ, মোহ সম্পূর্ণ গ্রহীণ করতে সক্ষম তারা সদ্ধর্ম লাভী হয়। এ জগতে বুদ্ধের উৎপত্তি দুর্লভ, মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ, প্রব্রজ্যা লাভ করা দুর্লভ, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ, শ্রদ্ধা সম্পত্তি দুর্লভ। বুদ্ধগণ সর্বদা বা সর্বত্রই আবির্ভূত হন না। বুদ্ধ উৎপত্তি হলে জগতে মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি, নির্বাণ সম্পত্তি উদয় হয়। যেই নির্বাণ সম্পত্তি লাভে সত্ত্বগণের যাবতীয় দুঃখে চির অবসান হয়ে থাকে। মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করাও পরম সৌভাগ্য বিষয়। বহু প্রচেষ্টা ও পূর্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যের প্রভাবে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে বলেই তোমরা আমার নিকট প্রব্রজিত হতে পেরেছ। বলা যায় কতো সাধনার ফলেই না এই মনুষ্য জনম লাভ হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। অন্যথায় মনুষ্যকূলে জন্ম না নিয়ে যদি তির্যককূলে জন্ম নিতে তাহলে কি তোমাদের প্রব্রজ্যা লাভ করা সম্ভব হতো? কখনো হতো না। এমন কি স্বর্গের দেবতা ও ব্রহ্মাদের পক্ষেও এই প্রব্রজ্যা লাভ করা সহজ হয় না। অন্যদিকে দেবতাদেরও দুর্লভ এ' প্রব্রজ্যা লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্বজন্মের নৈক্রম্য পারমী না থাকলে ইচ্ছা করলেও প্রব্রজিত হওয়া যায় না। পৃথিবীতে সর্বত্র ভোগে জয় জয়কার। সবাই ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত; কেউ ভোগ পরিত্যাগ করতে আগ্রহী নয়। এবমিধ কারণে কারোর মুখ হতে ভোগ বিরতি সদ্ধর্মের কথা প্রকাশ হয় না। তজ্জন্য পরম হিতকর সদ্ধর্ম সহজে শ্রবণ করা যায় না। চিন্তের মধ্যে শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত করাও সহজ কথা নয়। সহজে শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত হতে চাহে না। স্বচ্ছ সলিলে যেমন চন্দ্র সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তেমনি বুদ্ধাদি সংপুরুষ দর্শনে শ্রদ্ধা উৎপত্তি হয়।

ভগবান বুদ্ধ বারবার বলেছিলেন-‘হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অকুশলধর্মসমূহ

ত্যাগ কর, কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ কর। তাহলে ঋদ্ধি সমৃদ্ধি বিপুলতা লাভ করবে। ভগবান বুদ্ধ গৃহত্যাগ করার পর অন্য কোন বাজে বিষয়ে মনোযোগী হন নি। কেবল কুশল কি? সর্বজ্ঞতা জ্ঞান কি? এই দু'টি অনুসন্ধান এবং লাভে তৎপর হয়েছিলেন। তোমাদেরকে অতিসত্বর যাবতীয় অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ করতেই হবে। যদি এ' কাজে সফলতা অর্জন করতে পার তাহলে পরম সুখের অধিকারী হবে। কুশল কি? দেব সম্পত্তি, মনুষ্য সম্পত্তি, ব্রহ্ম সম্পত্তি, মার সম্পত্তিসমূহের মূল বন্ধন (তৃষ্ণা) হতে মুক্ত অবস্থাকে কুশল বলা হয়। দেব সম্পত্তি, মনুষ্য সম্পত্তি, ব্রহ্ম সম্পত্তি, মার সম্পত্তিতে তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে বলে সেগুলো অকুশল। তাই এটা নির্দিধায় বলা যায় যে, তৃষ্ণাই অকুশলের মূল। যেখানে তৃষ্ণা সেখানেই অকুশল। তৃষ্ণা মুক্ত হলে তবেই কুশল অর্জিত হয়। তাই বুদ্ধের উপদেশ মতো অকুশলধর্ম পরিত্যাগ করে কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য তোমাদেরকে তৃষ্ণামুক্ত চিন্তে অবস্থান করতে হবে।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-তোমাদেরকে সপ্ত আর্যধনে ধনী হতে হবে। সেই সপ্ত আর্য ধন কি? (১) শ্রদ্ধা ধন (২) শীল ধন (৩) লজ্জা ধন (৪) ভয় ধন (৫) শ্রুতি ধন (৬) ত্যাগ ধন ও (৭) প্রজ্ঞা ধন। শ্রদ্ধা ধন অর্থ কর্ম ও কর্মফলের প্রতি এবং চারি আর্যসত্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। শীল ধন অর্থ জীবনের বিনিময়ে হলেও শীল ভঙ্গ করার দোষে দূষিত না হওয়া। লজ্জা ধন অর্থ পাপ অকুশলকর্ম সম্পাদনের প্রতি লজ্জাশীল হওয়া। ভয় ধন অর্থ চারি অপায় দুঃখ ভোগে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করা। শ্রুতি ধন অর্থ বহুশ্রুত শাস্ত্র জ্ঞানে ও ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া। ত্যাগ ধন অর্থ সর্বদা ত্যাগময় চিন্তে অবস্থান করা। প্রজ্ঞা ধন অর্থ ভালো-মন্দ, সার-অসার, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান। এই সপ্ত ধনে ধনী হতে পারলে সুখ লাভ সুনিশ্চিত বলে জানবে। বৌদ্ধধর্ম হল প্রজ্ঞা প্রধান ধর্ম। এখানে অজ্ঞানের কোন স্থান নেই। সুতরাং তোমরা একরূপ প্রতিজ্ঞা হও 'আমরা জ্ঞানের সহিত এবং সত্যের সহিত অবস্থান করব। অজ্ঞান, মিথ্যাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করব।' মিথ্যা ত্যাগ করে সত্যের আশ্রয়, অজ্ঞান ত্যাগ করে জ্ঞানের আশ্রয়ে বাস করাই সুখ।

তোমরা মারভুবনে অবস্থান করবে না, অমারভুবন বা নির্বাণরাজ্যেই অবস্থান কর। 'নির্বাণরাজ্যত্ কোন তালিমালি নেই, গুণগোল নেই, গোলযোগ নেই, ভেজাল নেই' অর্থাৎ নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করলে কোন প্রকার তালগোল, গোলমাল, গোলযোগ, ভেজাল, বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। কিন্তু মাররাজ্যের মধ্যে সব সময় তালগোল, গোলমাল, গোলযোগ, ভেজাল, বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। তাই বলা হয়েছে নির্বাণরাজ্যই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। নির্বাণরাজ্যেই প্রকৃত সুখ, শান্তি মিলে। নির্বাণ লাভ করতে হলে তোমাদেরকে কেবলমাত্র

নির্বাণের মন, নির্বাণের চিন্তা হয়ে অবস্থান করতে হবে। নির্বাণ লাভের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করতে পারবে না। সর্বদা এক মন, এক চিন্তে সুস্থির থাকতে হবে। দুই মন দুই চিন্তা হলে চলবে না। অর্থাৎ চিন্তকে কেবল নির্বাণের রঙে রাঙাতে হবে, নির্বাণের রঙ ব্যতীত অন্য কোন রঙে রাঙানো যাবে না। কখনো নির্বাণের মন আর কখনো বা সংসারের মন হলে কিছুতেই নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তোমরা নির্বাণের মন, নির্বাণের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর। তোমাদের মনচিন্তা যদি চঞ্চল হয়ে যত্রতত্র বিচরণ করতে থাকে তবে তা' সত্বুর সুস্থির করে ফেল। এবং নির্বাণ লাভের জন্য দৃঢ় বীর্যের সহিত স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন কর। তাতে তোমাদের নির্বাণ লাভ হবে, ইহা নির্বাণ লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তাই বলা হয়েছে-

স্মৃতি বিদর্শনে যিনি স্থিরবীর্য হন,
সম্ভবে সপ্তম দিনে নির্বাণ দর্শন।

তোমরা সব সময় প্রজ্ঞার উপর ভর দিয়ে বিচরণ কর। প্রজ্ঞার উপর ভর দিয়ে বিচরণ করাই তোমাদের আসল কর্তব্য। যদি প্রজ্ঞার উপর ভর দিয়ে বিচরণ করতে সমর্থ হও তাহলে তোমাদের চিন্তা ন্যায় পথে বিচরণ করবে। অন্যায় পথে বিচরণ করতে সক্ষম হবে না। তোমাদের মনচিন্তা যাতে ন্যায় পথ ছেড়ে অন্যায় পথে বিচরণ করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাক। সত্তে সত্তে তোমার মনচিন্তাকে এই বলেও সতর্ক করে দাও “হে মন খবরদার! হুঁশিয়ার! কিছুতেই অন্যায় পথে বিচরণ করবে না। সর্বদা ন্যায় পথে বিচরণ কর।’ চিন্তা ন্যায় পথে উত্তম পথে বিচরণ করলে সুখ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যায় পথে হীন পথে বিচরণ করলে পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। তাই তোমরা সবসময় জ্ঞানের উপর ভর দিয়ে ন্যায় পথে উত্তম পথেই বিচরণ করবে। এতে তোমাদের চিন্তের মধ্যে পরম সুখের সন্ধান মিলবে। কখনো অজ্ঞানের উপর ভর দিয়ে অন্যায়, হীন, অধর্ম পথে বিচরণ করবে না। অন্যায়, হীন, অধর্ম পথ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তোমরা কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছ? নিজেদেরকে ন্যায় ও উত্তম পথে প্রতিষ্ঠিত করতে নয় কি? অবশ্যই তাই। কারণ বুদ্ধের শিক্ষা কখনো অন্যায়, অধম নয়। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা কোন জনকে অন্যায়, অধর্ম পথে ঠেলে দেয় না। বরং সবাইকে ন্যায় উত্তম পথে তুলে আনে। তাই বুদ্ধের শিক্ষাই উত্তম, বুদ্ধের শিক্ষাকে বলা হয় ন্যায় সাগর। বুদ্ধের শিক্ষায়, বুদ্ধের অনুশাসনে কোন প্রকার অন্যায় নেই। যারা অন্যায়, অধম পথে পরিচালিত হয় তারা বুদ্ধের অনুশাসন হতে বহু দূরেই বলে জানবে। তোমরা মনুষ্যধর্ম ত্যাগ করে নির্বাণধর্ম গ্রহণ কর। মনুষ্যধর্ম অন্যায়, অধম, হীন ও পাপ। ইহাতে দুঃখমুক্তির কোন উপায় নিহিত নেই। অন্যদিকে নির্বাণধর্ম ন্যায়, উত্তম ও সুখ।

নির্বাণধর্মের মাধ্যমে যাবতীয় দুঃখের চির অবসান হয়ে যায়। তাই আবারো বলছি, তোমরা মনুষ্যধর্ম আচরণ করো না। মনুষ্যধর্ম আচরণ করলে অনুৎপন্ন অবিদ্যা যেমন উৎপন্ন হবে তেমনি উৎপন্ন অবিদ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ফলে দুঃখের চির অবসান ঘটায় নির্বাণ লাভ করা সম্ভবপর হবে না। সেই অবিদ্যা কি? যেখানে বিদ্যা নেই তাই অবিদ্যা। দুঃখ কি, দুঃখ সমুদয় কি, দুঃখ নিরোধ কি, দুঃখ নিরোধের উপায় কি? এই চারি আর্যসত্য না জানাই অবিদ্যা। আবার স্ত্রী-পুরুষের হাত, পা, নাক, কান, মুখ, উরু, বক্ষস্থল, স্তনস্থল, সত্য বিদ্যমান আছে বললে তাও অবিদ্যা। সুখ নেই সুখের সত্ত্ব কল্পনা করা এ'দেহ আপন নয় তবুও দেহকে আপন বলে মনে করা এটাই হচ্ছে অবিদ্যা। যেখানে বিদ্যা নেই তাই অবিদ্যা। পক্ষান্তরে দুঃখ কি, দুঃখ সমুদয় কি, দুঃখ নিরোধ কি, দুঃখ নিরোধের উপায় কি সে সব সম্যকভাবে জানাই বিদ্যা। আর স্ত্রী-পুরুষের হাত, পা, চোখ, সত্য নয় এবং দেহকে বত্রিশ প্রকার অশুচি পদার্থে বিভাজন ও বিয়াল্লিশটি ধাতুযোগে দর্শন করাই বিদ্যা (বা জ্ঞান)।

শ্রদ্ধেয় ভগ্নে বলেন-বুদ্ধের শাসনকে উজ্জ্বল ও উন্নতি করার জন্য বর্তমানে আমার উচ্চশিক্ষিত শিষ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার জন্য চাই এম এ পাশ, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিষ্য। সেরূপ শিষ্য পেলে কি করবো জান? সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগ্রহ করতঃ তাদেরকে ত্রিপিটক শাস্ত্র গবেষণা করায় সুশিক্ষিত, ধর্ম বিনয়ে দক্ষ করে তুলব। তারপর দশবল বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবুদ্ধি সাধন তথা উন্নতির কাজে হাত দিব। তাই দশবল বুদ্ধের শাসনকে রক্ষা ও দিকে দিকে প্রচার, প্রসার করতে সামর্থ্যবান এমন শিষ্যই আমি খুঁজতেছি। ত্রিপিটক শাস্ত্রে দক্ষ, সুপণ্ডিত ও মার্গফললাভী এবম্বিধ ভিক্ষু ব্যতীত দশবল বুদ্ধের শাসনকে সঠিকভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভগবান বলেছেন, দশবল বুদ্ধের শাসন সঠিকভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হলে মনুষ্য, দেবতা, ব্রহ্মা সকলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। বুদ্ধের শাসনকে জগতের বুকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য দক্ষ প্রচারক বাহিনী ভিক্ষুর কোন বিকল্প নেই। বলা বাহুল্য এখনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য সমৃদ্ধ নয়, সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। তাই ত্রিপিটক শাস্ত্র গবেষণা, শিক্ষা, পঠন-পাঠন করতে হলে উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সে জন্য চাই এম, এ পাশ ও ডক্টরেট ডিগ্রী ধারী। এম, এ পাশ, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী হলে তারা প্রয়োজনে ত্রিপিটককে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কাজেও হাত বাড়াতে পারবে। এভাবে তাদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম দিকে দিকে প্রচার, প্রসার ঘটানো সহজ হবে। যা বুদ্ধের শাসনকে অনেকাংশে উন্নতি শ্রীবুদ্ধি সাধিত করবে।

তোমরা সকলে বুদ্ধের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হও, বুদ্ধের জ্ঞানে জ্ঞানী হও।

কেবলমাত্র বুদ্ধের শিক্ষা ও বুদ্ধের জ্ঞানের দ্বারাই নির্বাণ লাভ হয়। বুদ্ধের শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা, জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণ লাভ হয় না। তাই তোমাদেরকে বুদ্ধের জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। সেই জ্ঞান কি? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞান। দুঃখ জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দুঃখ সমুদয় জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ সমুদয় আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দুঃখ নিরোধ জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ নিরোধ আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দুঃখ আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে সঙ্কায় দৃষ্টি পাপ দূরীভূত হয়। দুঃখ সমুদয় আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে উচ্ছেদদৃষ্টি পাপ দূরীভূত হয়। দুঃখ নিরোধ আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে শাশ্বতদৃষ্টি পাপ দূরীভূত হয়। দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে অক্রিয়দৃষ্টি পাপ দূরীভূত হয়। সংকায়দৃষ্টি, উচ্ছেদদৃষ্টি, শাশ্বতদৃষ্টি, অক্রিয়দৃষ্টি হতে পাপ অকুশল সৃষ্টি হয়ে থাকে। চারি আর্যসত্য জ্ঞান উদয় হওত চারি আর্যসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অকুশল পাপ হতে মুক্ত তথা নির্বাণ লাভ হয়। তাই তোমরা চারি আর্যসত্যের আশ্রয় এবং চারি আর্যসত্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

পরিশেষে তিনি বলেন—এ' জগতে বুদ্ধের ছায়া সুখদায়ক, তারচেয়ে পিতা-মাতার ছায়া সুখদায়ক, তারচেয়ে রাজার ছায়া সুখদায়ক, তারচেয়ে বহুতণে বুদ্ধের ছায়া সুখ দায়ক। কারণ বৃক্ষ, পিতা-মাতা, রাজার ছায়া আশ্রয়ে লোভ, দ্বेष, মোহ ক্ষয় সাধন করা যায় না। তাই সে সব ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করলে কিছুটা শারিরীক সুখ লাভ হলেও প্রকৃত শান্তি লাভ হয় না। শান্তির শীতল বাতাস এসে চিন্তকে শাস্ত, পরিতৃপ্ত ও পরমানন্দের অধিকারী করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধের ছায়ায় অবস্থান করলে যাবতীয় দুঃখে পরিসমাপ্তি ঘটে। তোমরা সেইরূপ অনন্ত সুখের আশ্রয় বুদ্ধের ছায়া তথা শাসনের মধ্যে রয়েছে—এটা তোমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মনচিন্ত থেকে ভোগ বাসনাকে বিতাড়িত, নিঃশেষ করতে সমর্থ না হলে বুদ্ধের সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ভোগাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে বুদ্ধের ছায়ায় অবস্থান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ভোগী ব্যক্তিদের কখনো বুদ্ধের ছায়ায় চিরস্থায়ী স্থান হয় না। ভোগাকাঙ্ক্ষা হতে লোভ, দ্বেষ, মোহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বুদ্ধের সুশীতল ছায়া থেকে চ্যুত করায়। তাই তোমরা সর্বদা অগ্রমাদের সহিত অবস্থান করতঃ চিন্তকে ভোগ বাসনা হতে বিরত রাখ। ভোগ বাসনা বা তৃষ্ণার জাল ছিন্ন করে লোভ, দ্বেষ, মোহমুক্ত চিন্তে

অবস্থান করতে তৎপর হও। ভোগ বাসনা নির্লিপ্ত ব্যক্তিগণ লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয় সাধন করে প্রকৃত সুখের অধিকারী হন। এভাবে তারা বুদ্ধের ছায়ায় আসতে পারার ভাগ্যকে একশত ভাগ সাফল্যমণ্ডিত করে। বুদ্ধের সুশীতল ছায়ায় চিরস্থায়ী আশ্রয় খুঁজে পান। তোমরা অনুরূপভাবে সর্বদা ভোগ বাসনায় নির্লিপ্ত হয়ে লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয়সাধন করতঃ বুদ্ধের সুশীতল ছায়ায় চিরস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত কর। এ'তে তোমাদের প্রব্রজিত জীবন লাভ করা টুকু সার্থক হবে। বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বাণ সুখ এতেই উপলব্ধি হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাজ্ঞানীদের পদাঙ্ক যত অনুসরণ করা যায় তত সুখ

আজ ১৫ই অক্টোবর ২০০০ সাল, রোজ রবিবার। সুবলং শাখা বনবিহারে দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান। বিহারের দক্ষিণদিকে বিরাট খোলা মাঠে অনুষ্ঠান মঞ্চ নানা রঙ বেরঙে সজ্জিত করা হয়। যথাসময়ে পূজ্য অর্হৎ বনভন্তে প্রমুখ পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসঙ্ঘ তুমুল সাধুবাদ ধ্বনিতে মঞ্চে আগমন করেন। কঠিন চীবর দান ও উৎসর্গ পর্ব শেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনা প্রদানকালে বলেন—আমি সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম গবেষণায় বুঝলাম, অজ্ঞানীদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করতে হলে প্রয়োজন অসাধারণ জ্ঞানের শক্তি। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কিছুতেই বৌদ্ধধর্ম সঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না। তাই তো বর্তমানে দেখা যায় শুধু গৃহীরা কেন ভিক্ষুরা পর্যন্ত প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ তারা অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে, ভিক্ষুরা স্ত্রীলোকের রূপে মোহিত হওত প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে সংসারী হয়ে যায় এবং দুঃশীলতা আচরণ করতে থাকে। তাহলে কিভাবে তাদেরকে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণশীল হিসাবে জানব? তজ্জন্য মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে বৌদ্ধধর্ম সঠিকভাবে আচরণকারী ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম ব্যক্তি বুঝি নেই? কই সেরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির দর্শন তো দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, শারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন, আনন্দ প্রমুখ অনেক ভিক্ষুদেরকে রমণীরা প্রলোভন প্রদর্শন করতঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। এমন কি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধকে মাগন্ধিয় নান্দী এক পরমা সুন্দরী যুবতী বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ ও সেই জ্ঞানী ভিক্ষুগণ কিছুতেই প্রলোভনের ফাঁদে পা রাখেননি। তারা রমণী কর্তৃক প্রদর্শিত সকল প্রকার প্রলোভন ছিন্ন-ভিন্ন, পদ দলিত করে বীর বিক্রমে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। আর বর্তমানের ভিক্ষুরা রমণী কর্তৃক সামান্য প্রলোভন প্রদর্শিত হতে না হতেই মোহিত হয়ে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতঃ নির্বাণের লক্ষ্য হতে চ্যুত হয়। শুধু অল্পশিক্ষিত, নবীন ভিক্ষুরা কেন ত্রিপিটক শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত এবং প্রবীন ভিক্ষুরাও একই পথের পথিক। তার কারণ কি? বর্তমান সময়ে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ভিক্ষুসঙ্ঘ নেই বা দুর্লভ বলে। আমি অনেক (মারমা, বড়ুয়া) ভিক্ষুর মুখে শুনেছি “বর্তমানে ভালো গুরু পাওয়া যায় না।” আর চিৎমরমের

বুড়াভন্তে আমাকে বলেছিলেন “এখানে ভালো ভিক্ষু নেই। তুমি কোঁদে কোঁদে মরে গেলেও ভালো, জ্ঞানী ভিক্ষুর খোঁজ পাবে না।” অপর পক্ষে গৃহীদের অবস্থাও বেহাল প্রায়। কুশল, পুণ্যকর্মাঙ্গী সম্পাদনে সর্বদা উড়ু উড়ু ভাব। পঞ্চশীল রক্ষা বা প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও সবাই পরামুখ। দুঃশীলতা আচরণে যেন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলতেছে বর্তমানে। প্রাণীহত্যা, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষ্য ভাষণ, মাদকদ্রব্যাদি সেবন করা প্রত্যেকের জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই রয়েছে। আর একে অপরে হিংসা-হিংসী, রেষা-রেষি, বাদ-বিবাদ, শত্রুতা ও অমঙ্গল, অহিত কামনা করা যেন নিত্য দিনের সঙ্গী। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ-সত্যতা, আচরণ-ব্যবহার, চাল-চলন, সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের লালন পালন করা নেই বললেই চলে। কাজেই বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম আচরণে তৎপর ব্যক্তি (ভিক্ষু বা গৃহী) রয়েছে বলে আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। এবিধি প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে, তাহলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যাবে কি? হ্যাঁ যাবে; তবে বর্তমান ভিক্ষুসম্মত ও দায়ক-দায়িকাদের আচরিত রীতি-নীতি অনুশীলন করে নয়। কেবলমাত্র বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষুসম্মত ও দায়ক-দায়িকাদের আচরিত রীতি নীতিই অনুসরণ করতে হবে। তাদের আচরণ করা সেই মার্গকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে চলতে সমর্থ হলে অবশ্যই বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যাবে। বুদ্ধ প্রমুখ শারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন, মহাকশ্যপ, আনন্দ মহাজ্ঞানীদের আচরিত পন্থা মেনে চললে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে কোন বেগ পেতে হয় না। তোমরা সেই মহাজ্ঞানীদের আচরিত মার্গ অনুসরণ করতে সদা তৎপর থাকবে। আমি জঙ্গলে অবস্থানকালীন সময়ে একমাত্র সেই মহাজ্ঞানীদের জীবনকথা স্মরণ করতাম। শীতকালের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের প্রখর তাপ এবং ক্ষুধা পিপাসার প্রপীড়নকে সহ্য করতাম। তাই বলা হয়েছে-

মহাজ্ঞানী আর্যগণ যে পথে করেছে গমন,

লভিয়াছে সম্যক দর্শন

সেই পথ লক্ষ্য করে আচরিবে ধৈর্য ধরে,

সার্থক কর (তবে) এ' জনম।

মহাজ্ঞানীগণ যেই পথে পরিচালিত হয়ে সম্যক (সত্য) জ্ঞানের অধিকারী হওত জগতে স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন সত্যানুসন্ধানীকেও সেই পথ অনুসরণ করতে হয়। একমাত্র সেই পথ অনুসরণ করেই সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব-অন্যথায় নয়। এটা মনে রাখতে হবে, সত্যের বিপরীতে মিথ্যাপথে পরিচালিত হয়ে কেহ জগতে স্মরণীয়, বরণীয়রূপে স্বীকৃতি পায় না তথা মহাজ্ঞানী হতে পারে না। কাজেই মহাজ্ঞানীদের জীবনে আচরিত আদর্শ, রীতি-নীতি, আচার

নিষ্ঠা অবশ্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। সত্য লাভের প্রত্যাশী অথচ সত্যদ্রষ্টা মহাজ্ঞানীদের পথ অনুসরণে বিমুখ তাহলে কিরূপে সত্য লাভ হবে? সেই রকম ভুল মার্গের পথিকের পক্ষে কখনো সত্যকে লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সত্য লাভের প্রত্যাশা তাদের কাছে চিরকাল সোনার হরিণ হয়েই থাকে। বলা বাহুল্য যে, জগতের প্রাচ্যঃ স্মরণীয় মহাজ্ঞানীদের মতাদর্শ, প্রদর্শিত মার্গ সর্বোপরি তাদের শিক্ষা ও উপদেশ সর্বদা অনুসরণ যোগ্য। এহেন মহাজ্ঞানীগণের আদর্শ এবং পদাঙ্ক যতো অনুসরণ করা যায় ততোই মঙ্গল সাধিত হয়। আর যারা সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে প্রয়াসী হন তারাও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ মহাজ্ঞানীদের পদাঙ্ক অনুসরণের তাগিদে তাদের ত্যাগময় জীবনাদর্শ ও মুক্তির ললিতবাণী মেনে চললে মানুষের চিন্তা চেতনার জগতে জ্ঞানের আলোর প্রকাশ ঘটে। সেই জ্ঞানের দ্বারা দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন—বই বা পিটক গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে কি? একদিকে প্রয়োজন আছেও বটে, আবার অন্যদিকে প্রয়োজন নেই। যেমন—সোজাসোজি নির্বাণ লাভেচ্ছুকগণের গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কর্মস্থান ভাবনা অনুশীলন করে মার্গফল লাভ করতঃ নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে নিজের অধিগত নির্বাণ সুখ অন্যদের নিকট বর্ণনা করতঃ তাদেরকেও নির্বাণ সুখ লাভের অনুপ্রেরণা যোগাতে, উৎসাহিত করতে গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একমাত্র পিটক গ্রন্থেই আমরা বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে পেয়ে থাকি। অন্য কোন গ্রন্থে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করা সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশসমূহ অর্জন করতে হলে ত্রিপিটক শাস্ত্রের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা অনস্বীকার্য। এবং বৌদ্ধধর্মকে জনসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরে ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতঃ দিকে দিকে প্রচার, প্রসার করতে অবশ্যই পিটক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতে হবে। অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত, দুঃখ কবলিত সত্ত্বগণকে দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শন করতে ভগবান বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী যেই উপদেশ প্রদান করেন সেই সকল সংগৃহীত বাণীই ত্রিপিটক শাস্ত্র। তাই বৌদ্ধধর্ম প্রচার, প্রসারের জন্য ত্রিপিটক শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তজ্জন্য আমি বলি বর্তমান নিম্প্রভ প্রায় বুদ্ধের শাসনকে উজ্জ্বল ও শ্রীবৃদ্ধি করতে আমার এম, এ পাশ, ডক্টর ডিগ্রীধারী শিষ্যের প্রয়োজন হয়েছে। চাকমা, মারমা, বড়ুয়া হতে সেইরূপ শিষ্যের সহযোগিতা পেলে বৌদ্ধধর্ম আরো গতিশীল উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আবার ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে কেহ যদি তদানুরূপ আচরণে যত্নশীল না হয়, উপরন্তু দুঃশীলতা আচরণ করতে থাকে তাহলে সে মৃত্যুর পর নিরয়গামী

হতে বাধ্য। তখন ট্রিপটিক শাস্ত্র সেই পণ্ডিত ভিক্ষুকে কিছুতেই নিরয়গামী হবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অপরপক্ষে যিনি অল্প পরিমাণ বুদ্ধের বাণী অধ্যয়ন করতঃ তা যথাযথ আচরণে তৎপর হয়ে মনচিন্ত হতে লোভ দ্বেষ মোহ উৎপাটিত করতে সক্ষম হয় তাহলে সে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল অবিদ্যা তৃষ্ণা হতে মুক্ত হওয়া। অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মনচিন্তের মধ্যে অবস্থান করার সুযোগ না দেওয়া। কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কখনো বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। বলা যায়, অবিদ্যা তৃষ্ণাকে নিঃশেষে নিরোধে নিবৃত্তি করাই বৌদ্ধধর্ম। আমি দৃষ্ট কণ্ঠে বলছি, যারা অবিদ্যা তৃষ্ণার সহিত বৌদ্ধধর্ম চর্চা করতে প্রত্যাশী হবে তারা কোন প্রকারে ধর্মের কুল কিনারা পাবে না। বৌদ্ধধর্ম সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হলে প্রয়োজন অবিদ্যা, তৃষ্ণার নিরোধ করতে দৃঢ় মানসিকতা, প্রবল উদ্যম ও প্রাণপণ প্রচেষ্টা। অবিদ্যা হল অজ্ঞান, তৃষ্ণা হল আসক্তি। এই অজ্ঞান আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ এবং অহিত অমঙ্গল, অশান্তি আনয়নকারী।

তোমরা সংসারে সুখ ভোগ করার ইচ্ছা ত্যাগ কর। সুখ ভোগ ত্যাগ করতে পারলে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করা সহজ হবে। মনে রাখবে ভোগই দুঃখ, ত্যাগই সুখ। একমাত্র ত্যাগের মাধ্যমে নির্মল সুখের অধিকারী হওয়া যায়; প্রকৃত শান্তি, আনন্দ ও পরম তৃপ্তি লাভ হয়। ভোগের বাসনা দ্বারা কখনো প্রকৃত সুখ লাভ হতে পারে না। মনকে মহাতৃপ্তির অবগাহনে সিঁড়ি করা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, তোমরা তো বর্তমানে খুব বেশি ভোগের মধ্যেই আছ, তাই না? দিনে যতবার ইচ্ছা হয় ততবারই ভোজন কর। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী মাছ, মাংস সহ বিবিধ সুস্বাদু, রসালো খাদ্য গ্রহণ করতঃ উদর পূর্ণ করে রাখতে কতো প্রচেষ্টা; নানা বাহারী বেশভূষা ধারণ এবং আরামদায়ক, মনোজ্ঞ শয়নাশনের ব্যবস্থা করতে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লে তা সুচিকিৎসা করার জন্য কাল বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজের নিকট শরণাপন্ন হয়ে থাক। আমার প্রশ্ন হলো, এতো সব ভোগ বিলাসের আয়োজন করেও তোমরা অমর হতে পেরেছ কি? মৃত্যুকে জয় করে সেই আরাম আয়েশী জীবন-যাপন অনন্তকালের জন্য হয়েছে কি? কখনো না। যত ভোগ বিলাসে রত থাকা হোক না কেন মৃত্যুর হাত হতে কারোর রক্ষা নেই। সুতরাং সুখ ভোগ করার জন্য এতো মিথ্যা, সারহীন আয়োজন কিসের? তজ্জন্য তোমরা সর্বদা ভোগ ত্যাগ করার শিক্ষা কর, অভ্যাস কর। বর্তমানে ভোগ ত্যাগ করার অভ্যাস আমার কাছে এতো প্রগাঢ় যে, ভোগ্য দ্রব্য দেখলে আপনা-আপনি বমিভাব উদ্বেক হয়ে থাকে। কোন খাদ্যই খেতে ইচ্ছে করে না, যতই অল্প খেয়ে থাকতে পারি ততই সুখ অনুভব হয়ে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, ভোগ সুখ বিমুখ হয়ে অবস্থান

করতে সক্ষম হলে তবেই নিজকে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব-অন্যথায় নয়।

মানব জীবন লাভ করা দুর্লভ। অন্যদিকে দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থকরূপে দান করাও অতিশয় কষ্টকর। সদাচার বা কুশলকর্ম সম্পাদন এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তবেই দুর্লভ মানব জীবন সার্থক হয়। এহেন দুর্লভ জীবন লাভ করেও যারা দুঃশীলতার মাধ্যমে জীবনের দিনগুলি ক্ষয় সাধন করে তারা চারি অপায়ে পতিত হয়। এবং দুর্লভ এ' জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গুরু হয় জন্ম জন্মান্তর ধরে অনন্ত দুঃখ ভোগের অধ্যায়। কারণ বর্তমানে অকুশলকর্ম সম্পাদনের ফলে একবার যদি মানব জীবন হতে বিচ্যুতি ঘটে তাহলে আবার কখন যে মানব জীবন লাভ হবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই তোমাদেরকে বলছি, জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমরা দুঃশীলতা আচরণ করবে না। শীল পালন ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করতে তৎপর থাক। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আসক্তি বর্জন করে অবস্থান করতে সক্ষম হলে শীল পালন করা সহজ হয়। পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত হলে কখনো শীল পালন করা সম্ভব হয় না। মনে রাখবে পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আমি, আমার, আমিত্ববোধ ত্যাগ করতে পারলে বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করতে সক্ষম হবেই।

তিনি আরো বলেন-বৌদ্ধ পরিষদ চতুর্বিধ, যথা-ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা পরিষদ। বুদ্ধ বলেছেন চতুর্বিধ বৌদ্ধ পরিষদের মধ্যে যারা আমার বাক্যের দিকে কর্ণপাত করবে না অর্থাৎ শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না তারা সবাই অপায়ে গমন করবে। যারা বুদ্ধের উপদেশ বাক্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয় তারা ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা যেই হোক না কেন নিরয়গামী হবেই। চতুর্বিধ বৌদ্ধ পরিষদকে বুদ্ধের উপদেশ মত চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে চারি অপায়দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। যারা বুদ্ধের উপদেশ বাক্যে সেইরূপ শ্রদ্ধাশীল এবং সম্যক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র তারাই বৌদ্ধ পরিষদের সদস্য বলে বিবেচ্য হয়। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুশীলন করতে হলেও অবশ্যই সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় ও তৃষ্ণা বহুল চিত্তে বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুশীলন করা সম্ভব নয়। আমিতো দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা অজ্ঞানতা অবস্থায় আন্দাজের সহিত বৌদ্ধধর্ম আচরণ, অনুশীলন করার চেষ্টা করতেছ। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম আন্দাজের সহিত অনুশীলন করার ধর্ম নয়। আন্দাজের সহিত এ'ধর্মকে বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মনে রাখবে বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানীর ধর্ম; অজ্ঞানী, মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং হীন কাপুরুষের ধর্ম নয়। এ'ধর্ম আচরণ, অনুশীলন ও উপলব্ধি করতে হলে চাই সম্যক জ্ঞানবল। এ'ধর্ম যতই জ্ঞানের সহিত আচরিত, অনুশীলিত হয় ততই

সরল ও সহজবোধ্য হয়ে উঠে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানীজন কর্তৃক বিদিত বা জ্ঞাতব্য ধর্ম। এ'ধর্ম আয়ত্ত্ব করতে হলে প্রয়োজন অসাধারণ জ্ঞান শক্তি। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে এ'ধর্ম আয়ত্ত্ব করা মোটেই সম্ভব নয়। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম হল উচ্ছাকাঙ্ক্ষা, উচ্চতর জ্ঞান এবং উচ্চমনা ব্যক্তিদের জন্য; নিম্ন আকাঙ্ক্ষা, হীনজ্ঞান ও নীচমনা ব্যক্তিদের জন্য নয়। তাই আবারো বলছি, বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ভিক্ষু গৃহী উভয়কে জ্ঞানবান ও সংযমী হতে হবে। জ্ঞান অর্জন ও সংযম শিক্ষা করতে না পারলে নিজেকে বৌদ্ধধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়ালে (অর্থাৎ অসংযমী হলে) বৌদ্ধধর্ম হতে চ্যুত হতে হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণার সহিত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা হলে শুধুমাত্র দুঃখ, কষ্টের শিকার হতে হয়; প্রকৃত সুখ সত্য কিছুই লাভ হবে না। কারণ বৌদ্ধধর্ম অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, নির্ভেজাল। এখানে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের মত ভেজালের কোন অস্তিত্ব নেই। তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে বা পরিত্যাগ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বৌদ্ধধর্ম আচরণে তৎপর থাক।

তোমরা সর্বদা জ্ঞানের সহিত বিচার বিশ্লেষণ করেই কর্ম (কায়িক, বাচনিক, মানসিক) সম্পাদন করবে। আর এটা' কোনক্রমে ব্যাহত হলে অনিবার্য দুঃখ বলে জানবে। কারণ অসতর্ক অবস্থায় লোভ চিন্তে কর্ম সম্পাদন করলে দুঃখে পতিত হতে হয়, হিংসা চিন্তে কর্ম সম্পাদন করলে বিপদে পতিত হতে হয়। লোভের পরিণাম দুঃখ, হিংসার পরিণাম বিপদ। যদি তোমরা শুন যে অমুক ব্যক্তি বর্তমানে খুব দুঃখের মধ্যে রয়েছে, তাহলে জানবে সে লোভ চিন্তে কর্ম সম্পাদনে রত আছে। আর যদি শুন যে অমুক ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত বা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তাহলে জানবে সে নিশ্চয় হিংসা চিন্তে কর্ম সম্পাদনে রত হয়েছে। তাই দুঃখে পতিত ও বিপদগ্রস্ত হবার হাত থেকে মুক্তির জন্য চিন্তকে লোভ এবং হিংসা থেকে মুক্ত করে রাখার কোন বিকল্প নেই। সুখে শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন-যাপন করার জন্য তোমরা নিজেকে লোভ, হিংসা হতে দূরে সরে রাখ। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চশীলাদি পালনসহ কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর, তাহলে প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা জগতের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করবে। বৌদ্ধধর্মের মতে একদিকে ত্যাগেই সুখ অন্যদিকে সকল প্রাণীর প্রতি দয়াই সুখ। প্রত্যহ সকাল, বিকাল, দুপুর 'সকল প্রাণী সুখী হোক' বলে তিনবার মৈত্রী ভাবনা করবে। এভাবে শত্রুমিত্র ভেদ জ্ঞান না করে সকলের প্রতি মৈত্রী ভাবনায় রত থাকতে পারলে তাদের কোন শত্রু থাকে না। মৈত্রী ভাবনাকারীকে অগ্নি, বিষ, কিংবা অস্ত্র দ্বারাও অনিষ্টসাধন করা যায় না। তজ্জন্য

নির্ধিধায় বলা যায়, মৈত্রীভাবনার প্রভাবে নানা প্রকার আপদ-বিপদ ও বিবিধ অন্তরায় হতে ত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়। কারণ মৈত্রী ভাবনাকারী মানুষের যেমন শ্রিয় হয় তেমনি অমনুষ্যদেরও শ্রিয় হয় এবং সৎ দেবতারা তাকে রক্ষা করে থাকে। মৈত্রী ভাবনাকারী সম্বন্ধের শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসক যেই জন,

তাহাদের শত্রুভাব না থাকে কখন।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হল কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না, জীব হিংসা মহাপাপ। হিংসুক ব্যক্তির অন্তরে কখনো শান্তি লাভ হয় না। সর্বদা সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়েই অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে, দণ্ড, অস্ত্র দ্বারা প্রাণীকে আঘাত করতঃ দুঃখ-কষ্ট দেয় সে কখনো আর্য হতে পারে না। আর্য হতে হলে তোমাদেরকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করতে হবে “আমরা কোন প্রাণীকে হিংসা করব না। কারোর ক্ষতিসাধন করব না, কারোর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করব না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করব না।” মনে রাখবে কোন প্রাণীকে হিংসা না করা, কারোর অনিষ্ট বা ক্ষতিসাধন না করা, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করা এবং উত্তমভাবে ধর্মাচরণ করা এ’ চারটি হল গোটা ত্রিপিটকের সারাংশ। আমার এত বৎসরের গবেষণার ফল-“রাগ চিন্তে কোন কাজ করতে নেই। রাগ চিন্ত দ্বারা কিছুতেই সুখ লাভ ও মঙ্গল সাধিত হয় না। বরং সেই রাগের অনলে পুড়ে নিজেই নিদারুণ দুঃখ ভোগ করতে হয়। সর্বদা মনস্তাপের যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।” কারণ রাগচিন্ত ভীষণ জ্বালাময়ী, রাগ-দম্ভ অন্তরে কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না। সেই চিন্ত অজ্ঞ মানবকে অস্থির করে তোলে। তাই তাদের রাগান্বিত হৃদয়ে কখনো সুখ, শান্তি, মঙ্গলময় কামনার চেতনা জন্মে না। বৌদ্ধধর্ম মতে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণাকে উচ্ছেদ সাধন করতে সমর্থ হলে প্রকৃত সত্য ও সুখ লাভ হয়ে থাকে। বৌদ্ধধর্মে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণার কোন স্থান নেই। এ ধর্ম রাগ, হিংসা, অজ্ঞান ও তৃষ্ণা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং নির্ভেজাল। তজ্জন্য স্বীয় মনচিন্তে বিদ্যমান রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণাসমূহকে চিরতরে ধ্বংস করবে এবং নতুন রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা যেন মনচিন্তে স্থান করে নিতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে। যতদূর সম্ভব কাল বিলম্ব না করে নিজকে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত কর। মনে রাখবে রাগ হতে মুক্ত, হিংসা হতে মুক্ত, অজ্ঞান হতে মুক্ত এবং তৃষ্ণা হতে মুক্ত অবস্থাকে নির্বাণ বলা হয়। কাজেই স্বীয় স্বীয় সুখের জন্য মঙ্গলের জন্য তোমরা সকলে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণাশূন্য হয়ে অবস্থান করতে সচেষ্ট থাক। তোমরা যদি আমার কথামত রাগ, হিংসা, অজ্ঞান তৃষ্ণাশূন্য হয়ে অবস্থান করতে পার তাহলে অবশ্যই সুখ লাভ হবে।

তখন আর কোন দুঃখ অশান্তি, পাপ থাকতে পারবে না। আজকের এই দানানুষ্ঠানের দ্বারা তোমরা কি লাভবান হয়েছ বলে মনে কর? নাকি অনর্থক কিছু টাকা অর্থের অপচয় হয়েছে বলে মনে কর? এটা জেনে রাখবে যে, দান করা মানে টাকা পয়সা লোকসান দেওয়া নয়। ইহ পরলোকের জন্য সুখ অর্জন ও উন্নতির তরে পুণ্য সম্বয় করা। যা অজেয় অনুগামী নিধি তুল্য। অর্থাৎ যেই পুণ্যসম্পদ চোর, ডাকাত বা কোন শত্রু দ্বারা হরণ করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সর্বদা ছায়ার মতন অনুসরণ করতঃ পুণ্যবান ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করে থাকে। তাই কোন কিছু দান করলে তা' উন্নতি করেছে বলে জানবে। আজকের এই পুণ্যকর্মের দ্বারা তোমরা একরূপ প্রার্থনা কর—“এই পুণ্যের প্রভাবে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরে চারি অপায় দ্বার বন্ধ হয়ে স্বর্গ মোক্ষ লাভ হোক। মারের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা যেন সর্বদা কুশলে রত থাকতে সমর্থ হই। আমাদের সম্যক জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি উন্নতি লাভ করুক। পরিশেষে আমাদের দুঃখমুক্তি পরম সুখ নির্বাণ লাভ হউক! ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম প্রার্থনা।

পরোপকার অতীব সুখকর, বড়োই আনন্দদায়ক। পরোপকারী ব্যক্তির মিত্রের অভাব হয় না। তারা যে কোন সময় বিপদে পতিত হলেও মিত্রের দ্বারা উপকৃত হয়ে বিপদ থেকে মুক্ত হন। তাই তোমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার না করে পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ হতে গুরু করে মানুষ দেবতা ব্রহ্ম সকলের প্রতি সমান দয়াশীল হবে। কোন প্রকারে অপরের অহিত কামনা করবে না। উপরন্তু সর্বদা জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করবে। অপরজনকে উপকার করার সামর্থ্য না থাকলে বিন্দুমাত্রও অপকার বা ক্ষতিসাধন করবে না; তাতেও পুণ্য অর্জিত হয়। আর এতে পাপ বা অকুশল সম্পাদিত হবার কোন অবকাশ থাকে না। মনে রাখবে অপরের দুর্বাক্য, দুর্ব্যবহারের মধ্যেও ক্ষমাশীল হয়ে থাকতে পারলে কিছুতেই দুঃখ অনুভব হয় না। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বিবিধ দুঃখ, ভয়, বিপদ হতে ত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এবং সর্বদিকে তার জয় হয়ে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন পুণ্যের নিকট পাপ পরাভূত হয়ে থাকে। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হয়। তজ্জন্য তোমরা অধঃপতনের হাত হতে নিজকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদনে রত থাক। যাতে করে অসহ্য দুঃখ ও ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না।

আমার এ'দেশনা কখনো ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়, নয় নিজকে তোমাদের নিকট পণ্ডিত বলে জাহির করার উদ্দেশ্যে। বরং তোমাদের মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য, তোমাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে। বিপদের থেকে উদ্ধার করতে, অকুশলের অতল গহ্বরে ডুবে যাওয়া থেকে টেনে উপরে তোলার

এবং অজ্ঞানের অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসার জন্যেই। যাতে তোমাদের গতি নিশ্চয়্যামী না হয়, অধঃপতনের দিকে না হেলে; বর্তমানের দুঃখ, বিপদ, দুর্দশা, দুর্দিন কেটে যায়। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তোমরা যদি আমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর তাহলে তিন বৎসরের মধ্যে এ' অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবেই। কিন্তু তোমরা তো আমার উপদেশ মেনে চলতে, পালন করতে সচেষ্ট থাক না। তবুও আমি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রাণপণে। তোমরা সবাই সচেতন হয়ে উঠ। আর অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে না, জ্ঞানের আলোতে বেরিয়ে এসো। ধর্ম আচরণ কর, ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ কর, প্রমত্তভাবে করবে না। ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখে কালযাপন করেন। ধর্মাচারণকারী সঞ্চিত পুণ্য প্রভাবে চারি অপায়ে গমন করে না। কারণ ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে থাকে। আমি বলছি, তোমরা যদি উত্তমরূপে ধর্মাচরণ কর তাহলে ধর্মেই তোমাদেরকে রক্ষা করবে। কখনো তোমাদের পরিহানি হবে না, উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হবে। ধর্মের দ্বারাই তোমরা সুরক্ষিত হবে। মনে রাখবে ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়। ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। তাই ধর্মকে নিজের অধিপতিরূপে গ্রহণ কর। এবং সদুপায়ে জীবিকার্জন পূর্বক প্রমত্ততা ও ভোগ বিলাসী ত্যাগ করে সধর্মচারণ করতে চেষ্টাশীল হও। এই আদর্শকে সামনে রেখেই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ প্রমাদমুক্ত হয়ে অবস্থান করবে। এ' পথই স্থায়ী সুখের পথ, প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ লাভের উৎকৃষ্ট মার্গ।

অধর্মতঃ জীবন-যাপনের দ্বারা কখনো প্রকৃত সুখ, শান্তি এবং নির্মল আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয় না। অধর্মতঃ জীবন যাপনকারীর অন্তরে সর্বদা অস্থির ও অশান্তি ভাব বিরাজ করে। নিজের কৃত অপরাধের জন্য তারা মানসিক অনুতাপ ভোগ করে এবং অনুশোচনার তীরে বারবার বিদ্ধ হয়ে অসহ্য দুঃখ ভোগের শিকার হয়। তাই তোমরা অকুশলকর্ম সম্পাদন করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কর এবং কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল ও মৈত্রীপরায়ণ হয়ে অবস্থান কর। প্রাণের বিনিময়ে হলেও শীল ভঙ্গ করবে না। তাহলে তোমাদের ইহ-পরকাল উভয়লোকে সুখ শান্তি লাভ হবেই। এটাই হল বৌদ্ধধর্ম। তোমরা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করে নৈর্বাণিক সুখ লাভে সচেষ্ট থাক।

সাধু, সাধু, সাধু।

প্রকৃত বৌদ্ধ হতে হলে চিন্তে জ্ঞান থাকতে হবে

নানিয়ারচর রত্নাকুর বন বিহারে আয়োজিত কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান ২০০০ সাল উপলক্ষ্যে উপস্থিত উপাসক উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-ধর্মদেশনা প্রদান করে শ্রোতাবৃন্দ যদি তা' হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে দেশনা প্রদানে তৃপ্তির লাভ করা সম্ভব কি? বরং অনেকটা বিরক্তিভাবই জন্মে। আমার অবস্থাও ঠিক সেরূপ। মাঝে মাঝে একদম ধর্মদেশনা বন্ধ করে দিয়ে তুষ্টীভাব অবলম্বন করতঃ চুপ করে থাকতে ইচ্ছা হয়। কারণ ধর্মদেশনা শ্রবণ করে শ্রোতা যদি কিছুই উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে শ্রোতাদের মনের মধ্যে যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ও সুখ অনুভব হয় না, তেমনি ধর্মদেশকের দেশনা করার আসল উদ্দেশ্যও ফলপ্রসূ হয় না। শুধুমাত্র কষ্টই সার হয়ে থাকে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় দেখা যায়, ধর্মদেশনা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাবর্গের ধর্মচক্ষুও ধর্মজ্ঞান উদয় হতো। যার ফলে ধর্মদেশকের দেশনা এবং শ্রোতাদের মনোযোগ উভয়ই সার্থকতা এবং ফল দান করত। ভগবান বুদ্ধ বোধিধূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে জগতের সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা ও হিত সুখের পথ প্রদর্শন করনার্থে তাঁর নব লব্ধ সদ্ধর্ম প্রচার করেন। এই সদ্ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধ দুঃখে জর্জরিত সত্ত্বগণকে সর্বদুঃখ হতে মুক্তির উপায় নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ, চিত্ত সংযম (রক্ষায়) দক্ষ, শমথ বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে দক্ষ তাদের কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়। আর যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ মারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ, ইহলোক সম্বন্ধে অদক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে অদক্ষ, চিত্ত সংযম রক্ষায় অদক্ষ, শমথ বিদর্শন ভাবনায় অদক্ষ তাদের কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে দীর্ঘকাল ব্যাপী দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমি তথাগত মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ, চিত্ত সংযম রক্ষায় দক্ষ, শমথ বিদর্শন ভাবনায় দক্ষ। আমার কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে, আচরণ করলে দীর্ঘকাল সুখ সাধিত হয়। স্থবির অঙ্গুলিমালা বলেছেন, যাঁরা লোকোত্তরধর্ম গ্রহণ করাতে সমর্থ তাদের সেবা করবে। যাঁরা ক্ষান্তিশীলতার কথা বলেন, মৈত্রীধর্মের প্রশংসা করেন তাদের নিকটে গিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ এবং যথাধর্ম আচরণ করবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, চিরসুখ তথা

নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ শারীপুত্র, মৌদালায়ন, মহাকাশ্যপ মহোদয়গণের ন্যায় অর্হৎ মহাপুরুষের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করতঃ যথাযথভাবে আচরণ করতেই হবে। মুক্তিকামীদের জন্য ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ বা উপায় নেই। সেইরূপ মহাপুরুষের কথিত উপদেশের মাধ্যমে নির্বাণ সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। অন্যদিকে বর্তমান ভিক্ষুদের অবস্থা কি রকম? আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে, তাদেরকে মারভুবন, অমারভুবন, মৃত্যুরাজ, অমৃত্যুরাজ, ইহলোক পরলোক, চিত্ত সংযম, শমথ বিদর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে সবাই হাঁ করে থাকবে; কিছুই উত্তর প্রদান করতে পারবে না। কারণ এসব বিষয় তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জ্ঞানের পরিধি নিতান্ত স্বল্প বিধায় এত গভীর জ্ঞান গভীর তত্ত্ব উৎঘাটন করা তাদের কাছে বাতুলতা মাত্র। সে সব তত্ত্বের সঠিক হিসাব নিকাশ হতে তারা বহুদূরে অবস্থিত। স্মরণ রাখতে হবে বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানের ধর্ম; জ্ঞানই হল এ'ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধধর্মকে জানতে হলে প্রয়োজন অসাধারণ জ্ঞান শক্তির উৎস। তাই শুধুমাত্র মুখে পরিচয়ধারী এবং জনগত প্রথা অনুসারে কেহ প্রকৃত বৌদ্ধ হতে পারে না। প্রকৃত বৌদ্ধ হতে হলে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তির কখনো বৌদ্ধধর্মের অধিকারী হতে পারে না। জ্ঞান বিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র মাথা মুগ্ধ ও চীবর পরিধান করলেও কেহ প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার যোগ্যতা রাখে না এবং সকাল বিকাল বিহারে গমন করতঃ বুদ্ধের নাম জপ করলেও প্রকৃত উপাসক হওয়া যায় না। তজ্জন্য বলি'-

(চাকমা কথায়)

“খবং বান্যা জুম্ম সিলুম্ উজ্যা,
ধার তাগল্ বগলত লই খেলে
সিবে কন-অ কাম্মোয়া ভিলে কাম্মোয়া নয়।
চুল মুরেয়া রং কাপড় উজ্যা হ্লে
সিবে কন-অ ঠাণ্ডর ভিলে ঠাণ্ডর নয়।
বেন্যা বেল্যা বানা নমঃ নমঃ গল্যে
সিবে কন-অ ধার্মিক ভিলে ধার্মিক নয়।”

অর্থাৎ কেবলমাত্র মাথায় পাগড়ী বেঁধে কাজের পোশাক পরিধান করতঃ ধারালো দা গ্রহণের দ্বারা কাজের লোক পরিচয় দিলে কাজের লোক হয় না। মুণ্ডিত মস্তক এবং গেরুয়া বসন পরিধান করে ভিক্ষু পরিচয় দিলেও প্রকৃত ভিক্ষু হয় না। ধার্মিক সেজে সকাল-বিকাল বিহারে গমন করতঃ নমঃ নমঃ বললেও ধার্মিক হওয়া যায় না-যদি ঐ সকল কর্মের মধ্যে কৃত্রিমতা বিদ্যমান থাকে। প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ উপাসক হতে হলে উভয়ের চিন্তে জ্ঞান থাকতে হবে। যাদের কাছে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে একমাত্র তারাই প্রকৃত বৌদ্ধ পদবাচ্য লাভের

অধিকারী। মনে রাখতে হবে, শুধু নামে মাত্র বৌদ্ধ পরিচয় দিলে চলবে না জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কর্মের মাধ্যমে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। জ্ঞানের সহিত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে চেষ্টাশীল হলে তবেই এ ধর্মকে জানা, বুঝা এবং হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। জ্ঞানের স্বল্পতা হেতুতে বৌদ্ধধর্ম জানা, বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই স্বল্প জ্ঞানীদের পক্ষে জ্ঞান গভীর বৌদ্ধধর্মের গভীরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জ্ঞানের সহিত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে হাতে হাতেই তার সুফল অর্জিত হয়ে থাকে। যা দ্বারা লৌকিক লোকোত্তর উভয় সুখের অধিকারী হওয়া যায়। বলা বাহুল্য জ্ঞানহীন সন্তুগণের সদ্ধর্ম লাভ করার আশা সুদূর পরাহত। সদ্ধর্মের বিমল আলো তাদের নিকট চিরকাল অপ্রকাশিত থাকে। তজ্জন্য তাদেরকে সদ্ধর্ম হারা, জ্ঞান হারা হয়ে অস্বাভাবিক জন্ম মৃত্যুর আবর্তে দুঃখ ভোগ করতেই হয়। মনে রাখবে সদ্ধর্ম হারা ও জ্ঞান হারাদের কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। সদ্ধর্ম ও জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাদের দুঃখ হতে অব্যাহতি নেই। অন্যদিকে অজ্ঞানে অভিভূত মানুষের সদ্ধর্ম এবং জ্ঞান লাভের সুযোগ কোথায়? সদ্ধর্ম ও জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করার পরিবর্তে তারা মিথ্যা, অজ্ঞানতামূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে পড়ে থাকে। যার ফলে তাদের পক্ষে আর সীমাহীন দুঃখের বলয় হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। বলা যায় দুঃখ বেড়েই চলে মাত্র, পরিসমাপ্তি ঘটে না কিছুতেই।

আমি তো দেখতেছি, বর্তমান নর-নারীদের মনচিত্তের মধ্যে জ্ঞান, সদ্ধর্ম, বুদ্ধি, কুশল বলে কিছু নেই। আর সেজন্যই তাদেরকে অসহনীয় দুঃখ পোহাতে হচ্ছে। যেহেতু জ্ঞান এবং সদ্ধর্ম না থাকলে সুখ লাভের সকল প্রচেষ্টা ও আশা অন্ধুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে সুখের পরিবর্তে দুঃখকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আমি অনেক দুঃখগ্রস্ত নর-নারীকে বলতে শুনেছি, আমার তুলনায় এই পশু-পক্ষীরা তো সুখেই রয়েছে। আমি মানুষ হয়ে কেন এত দুঃখ পাচ্ছি? উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাদের প্রশ্ন করে বনভ্রম্বে বলেন আচ্ছা, তোমরা বলতো দেখি, তারা ঠিক কথা বলেছে কি? অজ্ঞ মানুষ পাপকর্মের দরুন দুঃখে পতিত হলে এভাবে হাহুতাশ করে থাকে। মনে রাখবে সুখ লাভ করতে হলে তোমাদিগকে বুদ্ধের ভাষিত সদ্ধর্মের শিক্ষা, উপদেশসমূহ অবশ্যই অখণ্ডনীয়ভাবে পালন করতে হবে। জীবনে সফলতা ও প্রকৃত সুখ আনতে বুদ্ধের সদ্ধর্ম শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই বিশ্বে যেসব মনীষী নানা ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা প্রায় সবাই জ্ঞান প্রধান ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বৌদ্ধধর্মকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। বর্তমানে দেশী বিদেশী অনেক উচ্চ শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকজন আমার নিকটে আসলে তারাও বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে এ'ধর্মের বিশেষত্বে আকৃষ্ট হয়ে উচ্ছ্বসিত

মন্তব্য করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আমার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং চিরকাল রাজ বনবিহারে অবস্থান করার প্রার্থনা সম্বলিত পত্র প্রায়ই প্রদান করেন। তোমরা বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষায় প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে অক্ষম বিধায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গৌরব ও সম্মান বজায় রাখতে হচ্ছে না।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-আদর্শ জীবন গঠন এবং জীবনের সাফল্য আনতে হলে জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের সহিত চালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পথ ব্যতিরেকে জীবনকে সাফল্য মাণ্ডে ভূষিত করা কখনো সম্ভব নয়। সেই জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল কি রকম? ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে জ্ঞান। মনে রাখা দরকার জীবন চলার পথে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য সবকিছুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। আর তখন বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের সহিত বাদ বিচার করতঃ কুমার্গকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে সুমার্গকে বেচে নিতে হয়। ভালোকে গ্রহণ মন্দকে ত্যাগ, ন্যায়কে গ্রহণ অন্যায়কে ত্যাগ, সত্যকে গ্রহণ করে মিথ্যাকে ত্যাগ, পুণ্যকে গ্রহণ করে পাপকে ত্যাগ এবং শ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করে হীনকে ত্যাগ করাই হল জ্ঞান। এক কথায়, দুঃখ আনয়নকারী পথ বাদ দিয়ে সুখ প্রদায়ী পথ অনুসরণ করাই জ্ঞান (যা আত্ম উন্নতির পক্ষে সহায়ক)। বুদ্ধি দুই প্রকার, যথা-(১) সুবুদ্ধি ও (২) কুবুদ্ধি। এই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে সুবুদ্ধি সর্বদা অনুসরণীয়। জ্ঞানীজন কর্তৃক সুবুদ্ধি অনুসৃত হয়ে থাকে। যেই বুদ্ধির মধ্যে চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলীর উপাদানসমূহ অনুপস্থিত বরং প্রভারণা, হঠকারী, পরশ্রীকাতরা বিদ্যমান এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ হয়ে অন্যায় পথে ধন, সম্পদ, যশ, সুনাম, খ্যাতি আহরণে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে তাই কুবুদ্ধি। অন্যদিকে তার বিপরীতের নামই সুবুদ্ধি। সুবুদ্ধি অবলম্বনের দরুন ইহ-পরকালে কখনো অনুশোচনা, অনুতাপের অগ্নিতে জ্বলতে হয় না পুড়তে হয় না। তজ্জন্য কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সুবুদ্ধির সহিত চালিত হওয়া প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য। কৌশল হল উপায় অবলম্বন করা বা উপায়ে বলীয়ান হওয়া। যেমন-মূর্খ পাপমিত্রের সংসর্গ পরিত্যাগ করে একাকী নিজ অতীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। সর্বদা সংপুরুষের পরামর্শ অনুসারে চালিত হওয়া। মিত্ররূপী অমিত্রকে সযত্নে এড়িয়ে চলা। দুর্মতি, নীচাশয় ও অসৎ ব্যক্তির শত সহস্র প্রলোভনেও প্রলুব্ধ না হওয়া। অজ্ঞানী খল নর-নারীর মিথ্যা দুর্নাম, দুর্ব্যবহার, রোষানল ধৈর্যের সাথে সহ্য করে হলেও নিজকে সংকর্ম হতে একচুলও বিচ্যুত না করা। মূর্খ, একগুঁয়ে ব্যক্তিদেরকে নিরর্থক উপদেশ, অনুশাসন প্রদান না করে নীরব থাকা।

বৌদ্ধধর্ম মতে আত্মা হল মন চেতনার মিথ্যা ধারণা মাত্র। আমি আমার

আমিত্ববোধ সমূহ ভ্রান্ত ধারণার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। আমি আছি, আমার আছে, অর্থাৎ এই স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি ইত্যাদি সবকিছু আমার এবং এসবের মধ্যে মমত্ব বা আমিত্ব বোধের অস্তিত্ব খোঁজা সবই ভ্রান্ত ধারণা বিধৃত। ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন মনের মধ্যে এইরূপে আত্মা বা মমত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ আত্ম চেতনার অন্তরমূলে রয়েছে অজ্ঞান। বলাবাহুল্য বিজ্ঞান জ্ঞাত এরূপ আত্ম চেতনা হতে যত দুঃখের উৎপত্তি হয়। অজ্ঞানীরা এই আত্ম ধারণার বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে অকুশলকর্মে নিয়োজিত হওত বর্ণনাভীত দুঃখ ভোগ করে থাকে। অপরদিকে তারা নিজের সে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ অন্যজনের নিকট প্রকাশ করতে সিদ্ধহস্ত। ফলে অন্যদেরকেও দুঃখে পতিত করায়। বর্তমান নর-নারীদের অবস্থাও ঠিক সেরকম। তারা নিজেরাই যেমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অবস্থান রত তেমনি অন্যদেরকেও ভ্রান্ত মতে চালিত হতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতেছে। ফলশ্রুতিতে সবাই সুখের সন্ধান মিলাতে ব্যর্থ হচ্ছে-বারবার। তজ্জন্য বলা হয়েছে-

ধনজন স্ত্রী পুত্রের মোহে যেবা রয়,
ভবর্ত দুঃখ তার মুক্তি কভু নয়।

পূজ্য বনভঙ্কে বলেন-বুদ্ধ কর্তৃক এরূপ ভাষিত হয়েছে যে, শক্তি না থাকলে কোন কাজে সফলতা আসে না। সফলতা লাভের জন্য শক্তির কোন বিকল্প নেই। আজকের এই দানানুষ্ঠানও জ্ঞান শক্তির একটি উদাহরণ বলা চলে। কারণ যে কোন পুণ্য বা কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে জ্ঞান শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জ্ঞান শক্তির অভাব হলে মনচিত্ত কুশলকর্মের দিকে ধাবিত না হয়ে অকুশলের দিকেই ধাবিত হয়। যার ফলে আর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা যায় না। তখন পুণ্যকর্ম বাদ দিয়ে পাপকর্মে নিয়োজিত থেকেই মানব জীবনকে নষ্ট করে ফেলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। ধর্মদেশনা প্রদান করতে হলেও জ্ঞান শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশনা প্রদানের আগে ধর্মাসনে বসে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান শক্তি বের করতে হয়। এবং শ্রোতাদের বোধগম্য হয় মতন সুন্দরভাবে দেশনা করতে হয়। তজ্জন্য যার যতবেশী জ্ঞানশক্তি থাকবে সেই তত সুন্দরভাবে নানা যুক্তি, উপমা উপস্থাপন করে ধর্মদেশনা প্রদান করতে সমর্থ হয়। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন অসীম জ্ঞানশক্তির অধিকারী। যেই জ্ঞানশক্তির দ্বারা তিনি কোটি কোটি দেব-মনুষ্যকে সন্ধর্মের চক্ষু উন্মিলন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যহ দিবসের পূর্বাহ্নে জগতের প্রতি অবলোকন করতঃ দেব-মনুষ্য, মার ও ব্রহ্মলোকের মধ্যে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-ব্রহ্ম এবং মনুষ্যকে নিজের সদৃশ বা তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে পারে বলে দেখতে পেতেন না। আবার শক্তিকে আমি সাতভাগে বিভক্ত করে

থাকি। যথা-(১) রাজশক্তি (২) জনশক্তি (৩) অস্ত্রশক্তি (৪) কর্মশক্তি (৫) মারশক্তি (৬) ধ্যানশক্তি এবং (৭) জ্ঞানশক্তি। ধ্যানশক্তি ও জ্ঞানশক্তি ব্যতীত অপর শক্তিসমূহ অজ্ঞান এবং পাপ বলে জানবে। সেই পাঁচ প্রকার শক্তিকে দুঃখ বিপদ অমঙ্গল সৃষ্টিকারী বলা যায়। সেসব শক্তি দ্বারা কিছুতেই প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। জ্ঞানশক্তি, ধ্যানশক্তিতে সুখ লাভ হয়ে থাকে মাত্র। তোমরা জ্ঞানশক্তি ও ধ্যানশক্তিতে বলীয়ান হতে যত্নশীল হও। তাহলে পাপমতি মার তোমাদেরকে আর অকুশলকর্ম সম্পাদনে বাধ্য করাতে পারবে না। বরং পাপী মার নিজে পরাজিত হয়ে যাবে। পাপ, দুঃখমুক্ত হয়ে চির সুখের সহিত অবস্থান করতে সমর্থ হবে। বর্তমানে প্রায় ভিক্ষু শ্রামণই বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষাপদ বাদ দিয়ে সাধারণ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর সে ডিগ্রী অর্জিত হলে গৃহীদের ন্যায় জীবিকা প্রবৃত্তি বশে চাকুরিতে নিজেকে নিয়োজিত করে। বলা যায়, টাকার জন্য চাকুরি যোগাড় করে নেয়। আমরা জানি ভগবান বুদ্ধ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য ভিক্ষুদের স্পর্শেরও অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর বর্তমান ভিক্ষুরা সেই টাকা লাভের জন্য চাকুরি করতেছে। এটা যে কতো দোষণীয় ও নিন্দনীয় কর্ম হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভিক্ষুদের স্বীয় উদর ফুটি ও আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন করার সুব্যবস্থা এতে হয়ে যায় মাত্র। আবার অনেকে প্রব্রজিত জীবন পরিত্যাগ করে বিয়ে করতঃ সংসারী হয়ে যায়। এই দ্রাস্ত নীতি ভিক্ষুসঙ্ঘকে এমনভাবে আড়ষ্ট করে ফেলেছে যে, বর্তমান ভিক্ষুরা ধর্ম বিনয় শিক্ষা ও আচরণে সর্বদা উদাসীন এবং অনীহা ভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তে তারা সাধারণ শিক্ষার প্রতিই গুরুত্ব দেন সমধিক। এবং একে অপরকে সেই শিক্ষা অর্জনের জন্য উপদেশ, নির্দেশ, উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেই যাচ্ছে সবসময়। একরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বর্তমান ভিক্ষুসঙ্ঘের জীবন বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা হতে ভিন্নমুখী স্রোতে প্রবাহিত হতে চলছে। বলা যায়, বিপথগামী সেই ভিক্ষুসঙ্ঘ একদিকে নিজেরা যেমন সুখিসমাজে হয়ে প্রতিপন্ন হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধের শাসনকেও নিষ্প্রভ, নিলুগামী এবং ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানের ভিক্ষুরা প্রকৃত বুদ্ধশিক্ষা চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে নিজেকে এবং নতুন প্রজন্মের ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্ম-বিনয়ভিজ্ঞ, শাসন হিতৈষী করে তোলার কোন পথ নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই। তাই বলি, প্রব্রজিত অবস্থায় সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে যারা বিকাল ভোজন সহ বিবিধ বিনয় বহির্ভূত আচরণে রত আমি তাদেরকে সংশোধন করাতে পারব না। তাদেরকে বাদ দিতে হবে। তাই আমি শিক্ষিত যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, তোমরা বুদ্ধের শাসন উল্লিখিত, শ্রীবুদ্ধি তরে

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ আমার সান্নিধ্যে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও অনুশীলন করতে এগিয়ে এসো। যাতে করে সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণ, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের মৌলিক ধর্মাদর্শকে চির সমুন্নত করে রাখা সম্ভব হয়। প্রচারক বাহিনী দক্ষ, কুশলী, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ না হলে ধর্মকে অক্ষত অবস্থায় চিরজাগরুক রাখার কাজে সফল হওয়া যায় না। তজ্জন্য বর্তমানে আমার ষাট হাজার দক্ষ ও শিক্ষিত ভিক্ষু শিষ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ সদ্ধর্ম শাসনের জন্য সবকিছু করা এবং সর্বদিকে নজর রাখার মত গুরু দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে একাকী সম্ভব নয়। তোমরা নিশ্চয় জান সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি। বলা যায়, বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতে আরো বেশ কিছু সময় লাগবে। অন্যদিকে ইংরেজীতে বৌদ্ধসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। সুতরাং ত্রিপিটক শাস্ত্র ভালোরূপে অধ্যয়ন করতে হলে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। আমরা তো মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ডের ভাষায় অনুবাদিত ত্রিপিটক অধ্যয়ন করতে সমর্থ নই। কাজেই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা পুস্তকগুলোই আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে। এটা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই আমাদের জন্য। এই ইংরেজী পুস্তক পড়তে বুঝতে হলে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। আমি বার্মিজ একটি পুস্তকের বাংলা অনুবাদে পড়েছি, ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) নাকি কোন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করে শুধুমাত্র পুস্তকের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতঃ অনেকেই মার্গফল লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেখানে সেইরূপ প্রমাণের ভূরি ভূরি কাহিনী রয়েছে। পুস্তকে আরো উল্লেখ আছে যে, বর্তমান সময়ে একেবারে পুস্তক না পড়লে মার্গফল লাভ করা অসম্ভব প্রায়। বুদ্ধের সময়কালীন যদিও তা' সম্ভব হয়েছিল কারণ তখন তো সরাসরি বুদ্ধের মুখ নিসৃত বাণী শ্রবণ করার উপায় ছিল। আর বর্তমানে সেই সুযোগ তো বন্ধ। আমার সাধনার অভিজ্ঞতা থেকে আমিও একথা স্বীকার করি যে, পুস্তকের নির্দেশিত পদ্ধতি ছিল আমার একমাত্র ভরসা ও সাধনার পথ দিশারী। কাজেই সমগ্র ত্রিপিটক সম্বন্ধে না জানলেও অন্ততপক্ষে সাধনা পদ্ধতি সম্পর্কিত পুস্তকের উপর পরিস্কার ধারণা এবং জ্ঞান থাকতে হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সকল প্রকার অকুশলকর্ম পরিত্যাগ কর। যাবতীয় অকুশল পাপকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম সম্পাদন এবং স্বীয় চিত্তকে পরিশোধন করাই বুদ্ধের শাসন। আমি তো দেখতেছি, বর্তমানে তোমরা যে রকমের অকুশলকর্মে নিয়োজিত আছ তাতে দুঃখ অশান্তি অমঙ্গল ব্যতীত সুখ শান্তি মঙ্গলের আশা সুদূর পরাহত। তিনি নর-নারীদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরে বলেন তোমাদের এ' অবস্থার পিছনে কি কারণ রয়েছে জান?

নিশ্চয় জান না। জানলে তো সে দুঃখ দুর্দশা হতে ত্রাণ পাওয়ার রাস্তা বের করে নিতে। অজ্ঞানতা বশত অকুশলকর্ম সম্পাদন করতঃ কুশলকর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত থাকার হেতুতে তোমাদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশা। তাহলে মনে রাখবে অজ্ঞানের বশীভূত অকুশলে রত নর-নারীগণ দুঃখময় হয়। যেহেতু অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে আপাত সুখের মনে হলেও তার বিপাক কিছুতেই সুখের হয় না। অজ্ঞ জনেরা মিথ্যা সুখের আশায় অতি উৎসাহ, আনন্দের সহিত অকুশলকর্ম করে থাকে বটে। কিন্তু সেই অকুশলের বিষময় বিপাক যখন ফলতে শুরু করে তখন আর তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। পাপের বিপাক ইহলোকে যেমন দুঃখ দেয় তেমনি মৃত্যুর পরও চারি অপায়ে পতিত করায়। মনে রাখবে পাপকর্মের বিপাক কখনো সুখের হতে পারে না। তাই বুদ্ধ বলেছেন যেই কর্ম সম্পাদন করলে দুঃখ পেতে হয় না, অনুশোচনার তাপে দম্ভ-বিদম্ভ হতে হয় না সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক, উত্তম কর্মই সম্পাদন করো। দুঃখদায়ক পাপকর্ম পরিত্যাগ করে সুখদায়ক কুশলকর্ম সম্পাদন করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির আদি কর্তব্য। এতে অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। গতকাল আমাকে একটি যুবক বলেছিল ভগ্নে আমি দুঃখ হতে মুক্ত হতে ইচ্ছুক; মুক্ত হতে পারব কি? প্রশ্ন হল কারাই বা দুঃখ হতে মুক্তির প্রত্যাশা করে? যারা দুঃখের কবলে পতিত হওত সেই দুঃখকে জয় করে সুখী হতে চায় তারাই মুক্তির প্রত্যাশা করে থাকে। এক কথায় যারা স্বীয় দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন তারাই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে প্রত্যাশী। প্রত্যেক নর-নারী তথা এ জগতের সকল প্রাণীই চায় সুখ ও শান্তি। কেহ দুঃখের প্রত্যাশা করে না। এক মুহূর্তের জন্যও দুঃখ কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে সুখে শান্তিতে এবং নিরাপদে নিরুদ্বেবে অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু সবাই কি কাক্ষিত সেই সুখের সন্ধান পায় বা সুখী হতে পারে? পারে না। কারণ মারের অধীনে থেকে (তার গতিতে অবস্থান করে) কেহ অনবদ্য সুখের অধিকারী হতেই পারে না। মার সত্ত্বগণকে কু-প্রলোভন দেখায়ে সৎপথ ভ্রষ্ট করে অসৎপথে পারিচালিত হতে প্রভাবিত করে। এবং তাদের মনচিন্তকে ভোগমুখী করে দিয়ে অকুশলকর্ম সম্পাদনে বাধ্য করায়। সেই অকুশলকর্ম সম্পাদনের ফলে সত্ত্বগণ দুঃখময় হয়, দুঃখের আবর্ত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সুখ লাভের পথে মার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সত্ত্বগণকে অকুশলে নিয়োজিত করায় দুঃখ দেয়া মারের কাজ। কুকর্মে নিয়োজিত করে জীবগণকে কষ্ট দেয়, মারে বলে (এস্থলে) মার বলা হয়।

ভগবান বুদ্ধ বিশ্ববাসীর দ্বারা গিয়ে বলেছিলেন—“তোমাদের এতো দুঃখ কেন? এসো আমি তোমাদেরকে শান্তির সন্ধান দিই।” সেই শান্তির সন্ধান কি রকম জান? অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে সত্ত্বগণকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে

আসা। অকুশলকর্ম সম্পাদন করা হতে বিরত রেখে কুশলকর্মে নিয়োজিত করা। ভোগাসক্ত কলুষিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ চিন্তকে সংযত করার মাধ্যমে লোকোত্তরের দিকে উন্নীত করা। অজ্ঞানতা বশতঃ নর-নারীগণ অকুশলকর্মে লিপ্ত হয়ে নিজের সৃষ্ট দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেয়েই চলছে জন্ম জন্মান্তর ধরে। তবে জ্ঞানী ব্যক্তি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা, উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনার মাধ্যমে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটায় পরম সুখে অবস্থান করতে সমর্থ। মনে রাখবে চিন্তের নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা, উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সাধনা দ্বারা পরম শান্তির সন্ধান মিলে। তোমরা কখনো কলুষিত চিন্ত, নিম্ন আকাঙ্ক্ষা, নীচমনা, হীন জ্ঞান ও নিম্নস্তরের সাধনা করবে না। কারণ ঐ সাধনা করলে রোদন করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না-তোমাদের। তোমরা অজ্ঞানতা পরিহার করে জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর। জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করতে সমর্থ হলে দুঃখকে জয় করা সম্ভব হবে। জ্ঞানই হল সুখ লাভের পূর্বশর্ত। তাই বুদ্ধের উপদেশের মূলে রয়েছে অজ্ঞানের সহিত অবস্থান না করে জ্ঞানের সহিত অবস্থান করা। অকুশল, মিথ্যা পরিত্যাগ করে সত্য কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তাতে প্রকৃত সুখ লাভ হয়-অন্যথায় নয়। হীন বিষয় সেবা না করলে অজ্ঞানের বশীভূত না হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান উদয় হয়। জ্ঞান উদয় হলে দুঃখের চির অবসান ঘটে। দুঃখমুক্তি পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। তাই আবারো বলছি, তোমরা দুঃখমুক্তি লাভের তরে সকল প্রকার অকুশলকর্ম ত্যাগ কর। দান-শীল-ভাবনা কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ কর। মারের পক্ষ অবলম্বন না করে, মারের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে, মারের মায়া জালকে সুখ মনে না করে বরং বুদ্ধের পক্ষ অবলম্বন করতঃ বুদ্ধের উপদেশ অনুশীলন, প্রতিপালন করে পরম সুখে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

অতীতের পাপ এবং বর্তমান পাপে বিন্দুমাত্রও সুখ হয় না

মিলনপুর বন বিহারে অনুষ্ঠিতব্য 'দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান' ২০০০ সাল উপলক্ষ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে শ্রদ্ধেয় বনভক্তে বলেন-ভগবান বুদ্ধ প্রথমবার ধর্মদেশনা প্রদান করে দেবতা-ব্রহ্মা মানুষসহ নব্বই কোটি প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিল। অর্থাৎ নব্বই কোটি শ্রোতা বুদ্ধের দেশিত ধর্মকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল। যার ফলে তাদের মনচিন্তা থেকে পাপ, অকুশল সমূলে উচ্ছেদ সাধন হওত সকল প্রকার দুঃখ অশান্তির পরিসমাপ্তি ঘটে চিন্তে অনাবিল সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মনে রাখবে যাদের ধর্মজ্ঞান অর্জিত হয়নি তারা পাপ অকুশলকর্ম সম্পাদন করতেই থাকে। তারা কখনো সদ্ধর্ম আচরণে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তাদের চিন্তে সর্বদা দুঃখ, অশান্তি বিরাজ করে। বুদ্ধের দেশিত এ'ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল লজ্জা ও ভয়। যাদের চিন্তে পাপ অকুশলের প্রতি লজ্জা এবং ভয় জ্ঞান থাকে তারা এ'ধর্ম আচরণ, প্রতিপালনে সক্ষম হন। তাই বলা হয়েছে-

“লজ্জা-ভয় দুই এই লোকের পালক,
না থাকলে এই দুই সমান তির্যক।”

লজ্জা ও ভয় এ'দুই কুশল মনোবৃত্তিই মানুষকে ইতরপ্রাণী হতে শ্রেষ্ঠ করে রাখে। লজ্জা, ভয়হীন মানুষ পশুর সমতুল্য। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, জগতের মনুষ্যগণের যখন পাপের প্রতি লজ্জা-ভয় জ্ঞান উঠে যাবে তখন তারা ইতর প্রাণীর সমতুল্য হয়ে অবস্থান করবে। সে সময় জগতে কোন প্রকার ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। পাপের প্রতি লজ্জা এবং দুঃখের প্রতি ভয় জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যগণ অকুশলকর্ম বর্জন করে চলে। এ'দুই মনোবৃত্তিই মনুষ্যগণের নিম্নগামী হওয়া থেকে রক্ষা এবং উর্ধ্বদিকে নিয়ে যায়। গাড়ী যেমন চাকার উপর ভর দিয়ে চালিত হয়, চাকা না থাকলে গাড়ী চলতে পারে না ঠিক তেমনি ধর্ম আচরণও লজ্জা-ভয়ের উপর নির্ভরশীল। পাপের প্রতি লজ্জা-ভয় জ্ঞান না থাকলে ধর্মাচরণ করাও সুকঠিন হয়ে যায়। পাপের প্রতি লজ্জা-ভয়শূন্য ব্যক্তি করতে পারে না বলে এমন কোন অকুশল পাপকাজ নেই। অন্যদিকে যার নিকট লজ্জা-ভয় থাকে সে অকুশল, পাপকর্ম সম্পাদন করা হতে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যেমনটি গগণমার্গে বিচরণের সময় পাখির পালক পাখিকে পতন হতে রক্ষা করে। তজ্জন্য লজ্জা-ভয়কে লোকপালক হিসাবে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, জ্ঞান থাকলে তবেই পাপের প্রতি লজ্জা-ভয় জন্মায়। জ্ঞান না থাকলে কিছুতেই পাপ অকুশলে লজ্জা-ভয় জন্মায় না। যার নিকট পাপের প্রতি লজ্জা-ভয় থাকে তার জ্ঞানও থাকে। যাদের পাপের প্রতি লজ্জা-ভয় কিছুই নেই

তাদের জ্ঞানও নেই বলে জ্ঞানবে। জ্ঞানী ব্যক্তির পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল হয়ে অবস্থান করে থাকে। কিন্তু অজ্ঞানীরা সর্বদা পাপের প্রতি লজ্জা এবং ভয়শূন্য। তারা পাপের মধ্যেই জীবন-যাপন করতে আশ্রয়ী।

অজ্ঞানীর স্বভাব হল পাপ, অকুশলকে নিয়ে হীন সুখ ভোগের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। তারা পাপ এবং অজ্ঞানমূলক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ভোগে নিমগ্ন থাকাকে পরম সুখ বলে মনে করে। এবং নিজেকে প্রতিনিয়ত অকুশল, অজ্ঞানমূলক কর্মে ডুবিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকে। পাপ, অকুশলমূলক কর্মের দ্বারা অজ্ঞানীরা ক্ষণিক সুখ লাভ করে বটে কিন্তু তার পরিণাম অতিশয় দুঃখবহ ও ভয়ঙ্কর। তাদেরকে অনন্তকালের জন্য দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট এবং অনুশোচনার তীরে বিদ্ধ হতে হতেই সে পাপের মাসুল গুণতে হয়। যারা জ্ঞানী তারা সদ্ধর্ম আচরণের মাধ্যমে সুখ প্রত্যাশী হয়ে থাকে। অজ্ঞান, অকুশলমূলক কর্মসমূহ তাদেরকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। জ্ঞান ও সদ্ধর্মের সহিত তারা পবিত্র জীবনযাপন করে থাকে। (তোমাদেরকে বলছি) তোমরা যদি পাপের প্রতি লজ্জা-ভয়শূন্য অজ্ঞান হয়ে থাক, তাহলে সদ্ধর্মকে বাদ দিয়ে পরধর্ম ও অজ্ঞানতার মাধ্যমে সুখভোগ করতে চাইবে। বর্তমানে এতো প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ এবং নেশাপানের বিভীষিকাময় দৃশ্য কেন দেখা যায় জ্ঞান কি? বর্তমান সময়ের প্রায় মানুষই পরধর্মে রত রয়েছে বলে। কারণ পরধর্ম মানুষকে অজ্ঞানতা ও অকুশলের মধ্যে নিয়োজিত রেখে ভোগী করে তোলে। আর সেই অতৃপ্তিকর ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষকে কুপথে পা বাড়ানো ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। তাই বর্তমানে এত দুঃখ, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। মনে রাখবে পাপধর্মে রত হলে সদ্ধর্মের প্রতি কোন প্রকার রুচিবোধ থাকে না। সদ্ধর্ম আচরণ কষ্টকর, কঠিন এবং অনর্থক বলে মনে হয়। তাই পরধর্ম আচরণকারীর নিকট সদ্ধর্ম কিছুতেই রুচিসম্মত ও সুখের বিষয় নয়। সদ্ধর্মের আদর্শ, শিক্ষা, উপদেশ তাদের জন্য আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। সদ্ধর্ম আচরণ করতে গেলে যে ধরনের উচ্চতর মানসিকতার প্রয়োজন পরধর্ম আচরণকারীর নিকট তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সদ্ধর্মের ত্যাগময় জীবনযাপন এবং ভোগ বিমুখতা তারা কিছুতেই আয়ত্ত্ব করতে পারে না। মোদকখা সদ্ধর্ম হল ভোগ বিরোধী। সদ্ধর্ম আচরণে কোন প্রকার ভোগ বিলাসী হয়ে এবং পাপ অকুশলকর্মের মাধ্যমে সুখ ভোগ করা যায় না। আর পরধর্ম হল ত্যাগ বিরোধী। পরধর্মে শুধুমাত্র ভোগ আর ভোগ। অকুশল, পাপমূলক যে কোন কর্ম সম্পাদন করতে কোন বাধা নেই, বরং উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। যাকে মারের উপদেশ বা মাররাজ্য বলা চলে। তাই পরধর্ম আচরণকারীর জন্য ইহলোকে পাপময় কষ্টকর জীবনযাপন এবং মৃত্যুর

পর নিরয়ের মহা জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা সদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। বর্তমানে যারা প্রাণীহত্যা চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষ্য ভাষণ এবং নেশাপানের বিভীষিকাময় বিবিধ প্রকার অকুশল পাপকর্মে জড়িত রয়েছে তাদের পরিণতি এরূপই হবে। যদিও অজ্ঞানতা বশত তারা এই পরিণতি জানতে, বুঝতে অক্ষম।

শ্রদ্ধেয় বনুভক্ত আরো বলেন-সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ এবং সদ্ধর্ম লাভ করা দুষ্কর। কারণ সহজেই সদ্ধর্মের অমিয়বাণী শ্রবণ করার সুযোগ হয়ে উঠে না। আর সদ্ধর্মের বাণী শ্রবণ করে তা' হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে সমর্থ হওয়াও বড়োই কঠিন ব্যাপার। তজ্জন্য সদ্ধর্ম শ্রবণ ও সদ্ধর্ম লাভ করা উভয়ই ভাগ্যের গুণে জুটে মাত্র। অপরদিকে সদ্ধর্মহারা জ্ঞানহারা নর-নারীদের ইহকালেও সুখ লাভ হয় না, পরকালেও সুখ লাভ হয় না। তাদেরকে ইহ-পর উভয়কালে দুঃখ ভোগ করতে হয়। মনে রাখবে সুখ লাভ করতে হলে সদ্ধর্ম এবং জ্ঞান লাভের কোন বিকল্প নেই। সুখ লাভেচ্ছুকগণকে এ'কাজে উত্তীর্ণ হতেই হবে। এ'পথ অনুসরণ না করলে সুখ অর্জিত হয় না। (তিনি উপস্থিত দায়ক-দায়িকাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন) আজকের এ' দানানুষ্ঠান সুখ লাভের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়েছে নয় কি? দায়ক-দায়িকাগণ একবাক্যে ইঁা বলে উত্তর প্রদান করে। তাহলে তোমাদেরকে গভীর মনোযোগের সহিত সদ্ধর্ম শ্রবণ, সদ্ধর্ম লাভ করতঃ সর্বদা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তে অবস্থান করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। চারি আর্থসত্যকে যথার্থরূপে জেনে, বুঝে, উপলব্ধিতেই সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটে-যা সদ্ধর্ম নামে খ্যাত। বুদ্ধের উপদেশ কি রকম জ্ঞান? তোমরা পরধর্ম আচরণ না করে সদ্ধর্ম আচরণ কর। কারণ সদ্ধর্ম আচরণে অনাবিল সুখ শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। অন্যদিকে পরধর্ম আচরণের পরিণামে সীমাহীন দুঃখের ভাগী হওয়া ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আমি অভিজ্ঞা দ্বারা দেখছি যে, তোমরা প্রায় সকলেই পরধর্মে নিয়োজিত রয়েছ। তজ্জন্য তোমাদেরকে হানাহানি, মারামারি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, একে অপরে অবিশ্বাস, অহিত কামনা, অমঙ্গল চিন্তা সহ অবর্ণনীয় পাপকর্ম ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন আতিবাহিত করতে হচ্ছে।

তোমরা অজ্ঞান হয়ে অবস্থান করবে না। অজ্ঞানতা দ্বারা কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। অজ্ঞানীরা সব সময় নিজেকে অকুশলকর্মে নিয়োজিত করায় দুঃখ সৃষ্টি করে। কারণ অজ্ঞান কুশলকর্ম সম্পাদনে শক্তিহীন দুর্বল বটে, কিন্তু পাপকর্ম সম্পাদনের নানা উপায় উদ্ভাবনে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। যেমন ধর বর্তমানে প্রায় মানুষ মদ্যপান ও ব্যভিচারের দূরভিসন্ধিমূলক কর্মে আসক্ত। এসব অজ্ঞানতার কারণে হচ্ছে। অজ্ঞানবশতঃ তারা ব্যভিচারে রত হলে কি রকম দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হবে তা' জানতে পারছে না। প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি,

কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি, জোর-জুলুম, পরশ্রীকাতরা, কুটবুদ্ধি, স্বার্থপরতাসহ নানা অনাচার, নানা অত্যাচার সবই অজ্ঞানতা প্রভাবে সংঘটিত হয়। অজ্ঞানীরা অপরের বিষয় সম্পদ নিজের অধিকারে এনে ভোগে রত থাকতে পারাকে সুখ মনে করে থাকে। তজ্জন্য সেই অজ্ঞানদেরা সর্বদা অপরের বিষয় সম্পত্তি নিজের অধিকারে আনার অনুধাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার অজ্ঞানীদের ধারণা এ'সংসারে শুধুমাত্র তারাই দুঃখ পাচ্ছে, অন্যজনেরা সবাই সুখে অবস্থান করতেছে। বর্তমান সময়ে তোমরা অজ্ঞানতা বশত এসব অকুশল, পাপ সৃষ্টিকারী কার্যকলাপে জড়িত থেকে দুঃখ ভোগ করতেছ। এখনো সময় আছে এ সকল অকুশলকর্ম পরিত্যাগ কর। নচেৎ তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে জানবে। তোমরা যদি অকুশল কর্মসমূহ পরিত্যাগ না কর, তাহলে দশ বার বৎসর পরে বর্তমান অপেক্ষা আরো করুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তোমাদেরকে। আমি বলছি, তোমরা অতীতে পাপকর্ম সম্পাদন করে থাকলেও বর্তমানে আর পাপকর্ম করো না। কারণ অতীতের পাপ এবং বর্তমান পাপ একত্রিত হলে বিন্দুমাত্রও সুখের আশা করা যায় না। সেই পাপের পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। তাই তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতঃ আবারো বলছি, তোমরা আর অকুশল পাপমূলক কর্ম সম্পাদন করবে না। সকল প্রকার অনাচার অত্যাচার মন্দ ও পাপকর্ম হতে নিজদেরকে বিরত রাখ। এবং দিব্যরাত্রি পুণ্যমূলক কুশলকর্ম সম্পাদন কর। গোপনে প্রকাশ্যে কোন প্রকার পাপকর্মে জড়িত হবে না।

অজ্ঞানচ্ছন্ন নর-নারীগণ ভৌতিক দেহকে নিয়ে আমি আমার আমিভূ বলে কর্তৃত্বাভিমানে স্ফীত হয়ে থাকে। এবং আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পুত্রবধু, আমার জামাই, আমার নাতি, আমার নাতিনী বলে বৃথা দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে। অথচ জ্ঞানের দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় নিজ দেহের উপর তাদের কতটা কর্তৃত্ব রয়েছে। চলাফেরা, উঠা বসা ইত্যাদি কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়া ছাড়া দেহকে ইচ্ছামত পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় কি? কখনো না। দেহ চলছে তার নিজস্ব গতিতে। প্রতিমুহূর্তে দেহের মধ্যে ঘটছে রূপান্তর, বয়ে চলছে পরিবর্তনের অবিরাম স্রোত। আর এক সময় মৃত্যুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। দেহের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই এসব হচ্ছে। সুতরাং দেহের প্রতি আমি আমার দাবি কি যুক্তি সঙ্গত? যেখানে নিজের দেহ নিজের নয়, সেখানে (অন্যদেহ) আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পুত্রবধু, আমার জামাই, আমার নাতি, আমার নাতিনী এ সব দাবি করার প্রশ্নই উঠে না। জ্ঞানীরা এভাবে সম্যক দর্শনের মাধ্যমে অবস্থান করেন। তাই তাদেরকে আমি, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, এই সকল দুঃখ গ্রাস করতে পারে না।

তিনি বলেন আচ্ছা, বলতো দেখি, আমি যে তোমাদেরকে দান শীলাদি প্রতিপালন করার উপদেশ দিয়ে চলছি তা' সঠিক হচ্ছে কি? নাকি খোঁড়া ব্যক্তিকে সজোরে হাঁটার জন্য তাগিদ দেওয়ার মত হচ্ছে? খোঁড়া ব্যক্তিকে জোরে হাঁটতে বললে তো কোন লাভই হবে না। কারণ সে সজোরে হাঁটতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাকে আস্তে আস্তে করে হেঁটে চলতে হয়। বরং খুববেশী জোরে হাঁটার কথা বললে সে রেগে যাবে। এবং বলে উঠবে তোমার পা দু'টো ভালো আছে বলে তুমি জোরে হাঁটতে পার কিম্বা আমার পা গুলোর অবস্থা তুমি দেখতেছ না? কেনই বা আমাকে বারবার সজোরে হাঁটার তাগিদ দিচ্ছ? আমাকে এত বলতে হতো না যদি আমার পা দু'টো ভালো থাকত। আমারও সজোরে হাঁটার ইচ্ছা জাগে, কিম্বা খোঁড়া পায়ে তো জোরে হাঁটা সম্ভব নয়। তোমার যদি একান্ত জোরে হাঁটার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তুমিই জোরে হাঁটলে পার। আমাকে হাঁটার কথা বলে বিরক্ত করতেছ কেন? যাও তুমি এগিয়ে চল, আমাকে নিয়ে কষ্ট করতে হবে না। আমি তো দেখতেছি তোমাদের অবস্থাও ঠিক সেরকমই। কই আজকে আমার ধর্মদেশনার এতো বছরেও কেহ সজোরে হাঁটতেছে না। তোমরা সবাই খোঁড়া লোক। আর খোঁড়া লোককে সজোরে হাঁটানোর চেষ্টা করার আশা কিছুতেই সফল হয় না। খোঁড়া লোক অর্থ কি জ্ঞান? অজ্ঞানী লোক। অজ্ঞানীরা কিছুতেই দানশীলাদি কুশলকর্মে রত থাকতে পারে না। কারণ দানশীলাদি প্রতিপালন করতঃ কুশলকর্ম সম্পাদন করতে যেই জ্ঞান শক্তির প্রয়োজন তা' তাদের নিকট অনুপস্থিত। সজোরে হাঁটার অর্থ হল দানশীলাদি কুশলকর্মের মাধ্যমে জীবন-যাপন করে সুখ লাভের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। তিনি প্রশ্ন করে বলেন সত্যিই কি তোমরা কুশলকর্মে রত থাকতে চেষ্টাশীল হবে না? যদি তাই হয়, তবে তোমাদেরকে ইহ-পর উভয়লোকেই দুর্বিষহ দুঃখভোগ করতে হবে। তাই বলছি তোমরা অজ্ঞানী না হয়ে জ্ঞানী হতে চেষ্টাশীল হও। অজ্ঞানতা ভাব-পরিত্যাগ করে জ্ঞান অর্জনে তৎপর থাক। অজ্ঞানতামূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রেখে জ্ঞান উৎপাদকমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ কর। জ্ঞান অর্জনের তাগিদে সর্বদা সংকর্ম, সংবাক্য, সংচিন্তা করতে সচেষ্ট থাক। উৎপন্ন অজ্ঞানতা ভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর, অনুৎপন্ন অজ্ঞানতা ভাব যাতে উৎপন্ন হতে না পারে সে চেষ্টা কর। এবং অনুৎপন্ন জ্ঞানকে উৎপন্ন কর, উৎপন্ন জ্ঞান ভাবিত, বর্ধিত, বহুলীকৃত কর তবেই জ্ঞানী হতে পারবে। কখনো অজ্ঞানী ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে না। তাহলে অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে জ্ঞান অর্জিত হবে। আর তখন দানশীলাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করতঃ সজোরে হেঁটে চলতে সক্ষম হবে। এককথায় সহজে নিজেকে সুখের দিকে অগ্রসর করাতে সক্ষম হবে, সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধধর্ম একদিকে ত্যাগের ধর্ম, অন্যদিকে দয়ার ধর্ম। এ' ধর্মের মতে

সকল প্রকার পাপ ত্যাগ করা যেমন সুখ তেমনি প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া পোষণ করাও পরম সুখ। সকল পাপ পরিত্যাগ ও সর্বজীবে দয়া সুখ লাভের পূর্বশর্ত। তোমরাও কোন প্রাণীকে টিল, দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করবে না। সকল প্রকার বধ, বন্ধন, প্রহার করা হতে নিজেকে বিরত রাখবে। মানুষ হতে শুরু করে পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গাদি পর্যন্ত কোন প্রাণীর প্রতি হিংসাভাব পোষণ করবে না, অহিত কামনা করবে না। তাতে পরম সুখের অধিকারী হতে পারবে। মনে রাখবে, প্রাণীর প্রতি যারা নির্দয়, দয়ামায়াহীন তাদের কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। নির্দয় ব্যক্তিদের প্রতি দেবতাগণও ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে যারা সকল জীবে দয়াশীল সং দেবতাগণ তাদেরকে বিপদের সময় রক্ষা করে এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই আবারো (তোমাদেরকে) বলছি, তোমরা সকল প্রকার পাপ বিরতি এবং সর্বজীবে দয়াশীল হও। সেই মার্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হলে সুখ লাভ হবেই। বর্তমান নর-নারীর জীবন দুঃখে ভরাক্রান্ত। বিভিন্ন প্রকার অশান্তি এবং কষ্টের প্রপীড়নে তারা জর্জড়িত ও কাতর। কেহ প্রকৃত সুখে শান্তিতে নেই। তার কারণ কি জান? বর্তমানে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। নেই ক্ষমা মৈত্রী, ধৈর্য-সহ্য করার সদৃশ। যার ফলে এ'বেহাল অবস্থা সদা বিরাজমান; কোথাও সুখ নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যায়, ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভগ্নি-ভগ্নিতে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস বাদ-বিবাদ, ঝগড়া-কলহ, মনোমালিন্য, দ্বন্দ্ব সহ নানাবিধ অশান্তি লেগেই রয়েছে। এতে সাংসারিক জীবনের ক্ষণিক সুখটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়। আমার প্রশ্ন হল, তোমরা একে অপরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওত স্বামী-স্ত্রী হয়েছে প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে সুখে শান্তিতে সংসার ধর্ম পালন করতে নয় কি? তাহলে এখন দুঃখ পাচ্ছে কেন? শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসারী হলে চলবে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হতে হবে। শীল, প্রজ্ঞা, কুশলাদি ছাড়া কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের নিকট যদি জ্ঞান ও কুশল না থাকে তাহলে সে সংসারে বাদ-বিবাদ ঝগড়া-কলহ, মারামারি কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই কর্মে ইহলোকে যেমন সুখশান্তি লাভ হয় না তেমনি মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নিরয়গামী হতেই হয়। তাই স্বামী-স্ত্রীকে দানশীলাদি কুশলকর্মে রত থেকে সাধু ও পণ্ডিত হওয়া অত্যাাবশ্যক। তবেই সাংসারিক জীবন সুখের, শান্তির এবং মঙ্গলময় হয়। তিনি উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদেরকে বলেন তোমরাও সতর্ক হয়ে সাংসারিক জীবন-যাপন কর নচেৎ ইহ-পরকাল দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

পরিশেষে তিনি বলেন-আমার মাঝে মাঝে ধর্মদেশনা দিতেও লজ্জা হয়। কারণ তোমরা যদি আমাকে প্রশ্ন করে বনভক্তে আপনি গৃহী জীবনে কি ত্যাগ

করেছেন? তাহলে আমার বলার (তেমন) কিছু থাকবে না। আমি তো ভগবান বুদ্ধের মত রাজ্যধন, স্ত্রীপুত্র, প্রভাব প্রতিপত্তি, মান সম্মান এ সব বাহ্যিক ত্যাগ তোমাদেরকে দেখাতে পারব না। অন্যদিকে আমি যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, জীবন, অঙ্গ ত্যাগ করেছি তাও চর্মচক্ষুতে দেখানো যায় না। কাজেই তোমাদের বিশ্বাস জন্মাবে না। মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে সিদ্ধার্থরূপী বুদ্ধ নিজের পরিচয় প্রদানে বলেছিলেন—

শুন হে নরপতি!

হেরি জীবের দুর্গতি

আসিয়াছি আমি জ্ঞান অন্বেষণে।

রাজবংশে একক নন্দন,

ছিল রত্ন ধন,

আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে।

সিদ্ধার্থরূপী বুদ্ধের উত্তর শুনে রাজা বিম্বিসার বিমুগ্ধ হয়ে যান। শ্রদ্ধা আচ্ছত চিন্তে প্রীতিবাক্যে উচ্চারণ করে বলে ‘নহে তুমি সাধারণ’। প্রভু আমি আপনার চরণাশ্রিত হলাম। এভাবে বুদ্ধের ত্যাগের মহিমা দেখে লোকের বিশ্বাস জন্মাত। তাই বুদ্ধ অতি সহজে তাদেরকে বুঝাতে পারতেন। কিন্তু আমার তো সেরূপ পার্থিব ত্যাগের মহিমা দেখানো সম্ভব নয়।

তোমরা ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উন্মীলন করতে সচেষ্ট থাক। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হলে পাপের প্রতি লজ্জা এবং দুঃখের প্রতি ভয় সঞ্চার হয়। সেই লজ্জা-ভয়ের ফলে সর্বদা জ্ঞান ও পুণ্য বৃদ্ধি পেয়ে সুখ লাভ হয়ে থাকে। অন্যদিকে লজ্জা-ভয়হীনের কারণে অজ্ঞান, পাপ বৃদ্ধি হওত ইহ-পর উভয়কালে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমি তো দেখতেছি, বর্তমানে তোমরা পাপকর্ম সম্পাদনে যেমনি লজ্জাহীন তেমনি দুঃখের প্রতিও ভয়হীন। যার জন্য দুঃখ তোমাদের পিছু ছাড়ছে না। কেন এরকম হচ্ছে জ্ঞান? জ্ঞানের অভাবে। জ্ঞান থাকলে তোমাদেরকে কখনো এ’দশায় পড়তে হতো না। তোমরা জ্ঞান অর্জন করে সব সময় জ্ঞানের সহিত পরিচালিত হবে। কখনো অজ্ঞান বৃদ্ধিকারক অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। সর্ববিধ অকুশল হতে নিজেকে বিরত রেখে কুশল বা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে সচেষ্ট হও। স্মরণ রাখবে পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার লাভ হয়। পাপকর্ম সম্পাদন করলে শাস্তি ভোগ করতে হয় আর পুণ্যকর্ম সম্পাদনে পুরস্কার লাভ হয়ে থাকে। পুণ্যের নিকট পাপ পরাভূত হয়। পুণ্যকর্মের ফল কিছুতেই বৃথা যায় না। পুণ্যের গতি সর্বদা উর্ধ্বদিকে এবং পাপের গতি নিম্নদিকে। তোমাদেরকে হয়ত অনেকে প্রশ্ন করতে পারে বনভক্তে (তোমাদের) কি উপদেশ দেন? তাদেরকে বলবে বনভক্তের উপদেশগুলোর

সারমর্ম হল, অধোগতি প্রাপ্তের কারণ পাপকর্ম পরিত্যাগ করে উর্ধ্বগতি প্রাপ্তের কারণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। যে কর্ম সম্পাদনে দুঃখ পেতে হয় সেই কর্ম সম্পাদন না করে তৎপরিবর্তে যে কর্ম সম্পাদনে সুখ লাভ হয় সেই কর্মই সম্পাদন করা। বনভ্রমে উদ্দেশ্য হল মূর্খব্যক্তিকে পণ্ডিত বানানো, অসাধু লোককে সাধু বানানো। সাধু কাকে বলে? শুধুমাত্র নুন ভাতে নিরামিশ আহার করলে সাধু হওয়া যায় না। অনেকে সেইরূপ নিরামিশ আহার গ্রহণকারীকে সাধু মনে করে। কিন্তু নুনভাত আহার করেও পাপ করা যায়। কাজেই নুনভাত বা নিরামিশ ভোজনকারীকে কখনো সাধু বলা চলে না। বৌদ্ধধর্ম মতে যারা পঞ্চশীল অক্ষতভাবে পালন করে তাকেই প্রকৃত সাধু বলে। তোমরা এমন কোন কর্ম সম্পাদন করবে না যে কর্মের ফলে পরিহানি, হীনতাপ্রাপ্ত হয়ে দুঃখভোগ করতে হয়। তোমাদের জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি বর্ধিত হোক এবং তোমাদের চিন্তা অধোগামী না হয়ে উর্ধ্বগামী হোক এবং পাপের অন্ধকার হতে তোমরা পুণ্যের আলোতে উজ্জ্বলিত হও এটাই কামনা করি। অন্যদিকে আমার সান্নিধ্য লাভ করে তোমরা যদি নিম্নগতি প্রাপ্ত হও, সীমাহীন দুঃখের সম্মুখীন হও তাহলে আমারও লজ্জার বিষয় হবে বৈকি! এবং ভবিষ্যতে তোমাদের এখানে ফাং-এ না আসতেও পারি। তাই তোমরা আজ হতে এ'বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও “আমরা আর অকুশলকর্ম সম্পাদন করব না, কুশলকর্মই সম্পাদন করব। অজ্ঞানের অনুগত না হয়ে জ্ঞানের সহিত পরিচালিত হবো।” এইভাবে নিজকে সতর্ক করতে সমর্থ হলে আমি বলছি তোমাদের সুখ লাভ হবেই। বুদ্ধ বলেছেন, অজ্ঞানের অনুগত না হয়ে জ্ঞানের সেবা করা পরম ধর্ম। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রকে সেবা করা, সম্ভ্রষ্ট রাখা পরম ধর্ম। এতে লৌকিক সুখ বর্ধিত হয়ে থাকে। আবার সংসারীদেরকে মনে রাখতে হবে ব্যভিচারে রত, মদ্যপান ও জুয়া খেলায় আসক্ত পরিবারে কখনো সুখ শান্তি লাভ হয় না। পারিবারিক সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে এসব হতে বিরত থাকার কোন বিকল্প নেই। তোমরা সব সময় জ্ঞানের সহিত যাচাই-বাছাই, বাদ-বিচার করে অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর। যাতে তোমাদের ইহ-পর উভয়লোকেই সুখের ছোঁয়া লাগে; পরিশেষে নির্বাণ পরম শান্তি লাভ হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বলে কোথাও কেহ নেই

কাউখালী বিনয়াক্ষুর বন বিহারে আয়োজিত কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান ২০০০ সাল উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভক্তে দেশনা প্রদানকালে বলেন-বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরবাদ বৌদ্ধদের নিকট গ্রহণ অযোগ্য। বৌদ্ধরা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়। এ' ধর্মে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বাদ দিয়ে কর্মকেই ভাগ্য বিধাতারূপে গণ্য করা হয়। আমি চাকমা সমাজে ঈশ্বর সম্পর্কিত অনেক ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করতে গুনেছি-যা কিনা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-চাকমা কথায় “ও ঈশ্বর” “ঈশ্বর মাপ করিস” ঈশ্বরে ধর্মে ন-দেগোগ।” অর্থাৎ বিপদের সময় “ওহে ঈশ্বর” বলে বিপদ হতে ত্রাণ লাভের প্রার্থনা; কৃত পাপকর্ম থেকে আত্মতৃপ্তি তরে “ঈশ্বর আমাকে মাপ কর” বলে ক্ষমা যাচঞা, প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে যাতে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে না হয় তজ্জন্য “ঈশ্বর আমাকে এরূপ দেখাবেন না” বলে আগাম আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। এসব অজ্ঞানতা বশত মুখ্য ব্যক্তিদের ভ্রান্ত অভিমত ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বলে কোথাও কেহ নেই। এবং ঈশ্বর নামক কোন ব্যক্তিই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে না। কর্মই সত্ত্বগুণের ভাগ্য নিয়ন্তা। ভালো বা মন্দ যেরূপ কর্ম সম্পাদন করা হয় সেইরূপ কর্মেরই অধিকারী হয়ে থাকে সত্ত্বগুণ। বিশ্ববাসীর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, যশ-অযশ, উন্নতি-অবনতি সবই স্বকীয় কর্মের উপর নির্ভর করে থাকে। বর্তমান মুহূর্তে যে কর্ম করা হয় পর মুহূর্তে সে কর্ম অবশ্যজ্ঞাবী রূপে ফল প্রদান করে অর্থাৎ বর্তমানের কৃত কর্মের ফল ভবিষ্যতে ভোগ করতেই হয়। সব সত্ত্ব স্বকর্ম নিবন্ধন। সত্ত্বগুণের সুখ-দুঃখ তার নিজের কর্ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কর্মই সত্ত্বগুণকে হীন-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নীচ নানাভাবে বিভক্ত করে। সুতরাং কর্ম সম্পাদনে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। জ্ঞানীরা কর্ম সম্পাদনে সজাগ থাকে। তারা কেবলমাত্র সুনীতি ও সুকৃতিকর্মই সম্পাদন করে; কখনো দুর্নীতি, দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করে না। তাই বুদ্ধের উপদেশ হল তোমরা দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করবে না। দুষ্কৃতিকর্মের দোষ কি? দুর্লভ মানব জন্ম নষ্ট হয়ে চারি অপায়ে পতিত করায়। মানব জন্ম লাভ করেও যদি মৃত্যুর পর অপায়ে পতিত হয়ে অসহণীয় দুঃখ ভোগ করতে হয় তাহলে মানব জন্ম লাভের সার্থকতা কোথায়? কাজেই সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ইহ-পর উভয়কালের জন্য সুখের বীজ সুনিহিত করে রাখা প্রত্যেক মানবেরই কর্তব্য। কর্মফলের প্রতি যাদের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে তারা কিছুতেই দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করে না। তজ্জন্য তাদেরকে কখনো দুঃখের কবলে পড়তে হয় না, বরং তারা ইহ-পর উভয়লোকে সুখের অধিকারী হয়ে থাকে। অন্যদিকে কর্মফলের প্রতি

যাদের জ্ঞান নেই তারা দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করতঃ ইহকালে যেমন বিবিধ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় তেমনি পরকালেও তদাপেক্ষা ভীষণতর জ্বালাময়ী দুঃখের গ্রাসে পরিণত হয়। কোন শিলা পাথর নদীতে পতিত হলে যেমন গভীর হতে গভীরতর জলে ডুবে যায়, ভেসে উঠার কোন অবকাশ থাকে না; দুষ্কৃতিকর্মী পাপী ব্যক্তিও তেমনি দুঃখ সাগরের একেবারে অতল তলে গিয়ে পৌঁছে। পাপের বিপাক পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সেখান হতে উদ্ধার পাওয়া আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র।

বৌদ্ধধর্মের উপদেশ হল কারোর সঙ্গে শত্রুতা আচরণ করবে না; কারোর ক্ষতিসাধন তথা অহিত কামনা করবে না; উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ করবে। ধর্ম আচরণে কোন প্রকার ভেজাল বা কৃত্রিমতা থাকলে সুখের পরিবর্তে দুঃখের ভাগীই হতে হয়। অপরপক্ষে ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ করতে সমর্থ হলে ইহ-পর উভয়কালেই বিপুল সুখের অধিকারী হওয়া যায়। তোমরা সর্বদা একে অপরকে উপকার করতে চেষ্টাশীল হবে; পরোপকার বড়োই আনন্দদায়ক ও পুণ্যের বিষয়। যদি উপকার করার সামর্থ্য না থাকে তবে বিন্দুমাত্রও পরের ক্ষতি করবে না। পরের ক্ষতি না করে থাকতে পারলে তাও পুণ্য বলে জানবে। কিন্তু বর্তমানের নর-নারীরা বুদ্ধের সেসব উপদেশ হতে বিচ্যুত হয়েছে। আমি তো দেখতেছি, তারা পরের উপকার করা দূরে থাক উল্টো কিভাবে পরের ক্ষতিসাধন করা যায় সে চিন্তাতে ব্যস্ত রয়েছে। তাই আজকাল শুধুমাত্র পাপের জয়জয়কার দৃশ্যই পরিদৃষ্ট হয় সর্বত্র। অন্যায়, অপরাধ ও পাপমূলক কর্ম সম্পাদনে যেন পরম্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতেছে। অজ্ঞ নর-নারীরা সেই প্রতিযোগিতায় আত্মাহুতি দিচ্ছে সানন্দে। পাপের বিপাক কিরূপ দুর্বিষহ ও হৃদয় বিধারক হতে পারে তা তাদের কাছে অজ্ঞাত। তাদের যদি কর্মফলের প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণও জ্ঞান বিদ্যমান না থাকত তবে পাপের বিষময় বিপাক তাদের জ্ঞাননেত্রে অবশ্যই ধরা পড়ত। সুতরাং পাপকর্ম হতে তারা নিজকে বিরত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতো। কখনো পাপ অকুশলকর্ম সম্পাদনের দিকে পা বাড়াতো না। কিন্তু অজ্ঞানীদের নিকট তো সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ বারংবার বলেছিলেন ‘বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানের ধর্ম’। যারা জ্ঞানী ব্যক্তি কেবলমাত্র তারাই এ’ ধর্ম জানতে, বুঝতে এবং আচরণ করতে সমর্থ। অজ্ঞানী ব্যক্তির এ’ ধর্ম জানতে, বুঝতে এবং আচরণ করতে সমর্থ হবে না কিছুতেই। তারা বৌদ্ধধর্মের বহির্ভূত কর্ম প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, নেশাপানাদি পাপমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে রুচিশীল। সেই অকুশল, পাপমূলক কর্ম সম্পাদনের দরুন তারা নিজের দুঃখ নিজেই ডেকে আনে। মনে রাখবে পাপকর্ম সম্পাদন এবং অপরের অহিতকামনা, ক্ষতিসাধন করা অজ্ঞানী

ব্যক্তির ভূষণ। তারা কখনো কুশলকর্ম সম্পাদন ও পরের মঙ্গল, হিতকামনায় ব্রতী হতে পারে না। অজ্ঞানী বা মূর্খের পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধ আরো বলেছেন, কর্মেই মূর্খের লক্ষণ এবং কর্মেই পণ্ডিতের লক্ষণ। কর্মের দ্বারাই চিনতে হয় সে মূর্খ নাকি পণ্ডিত। মূর্খ ব্যক্তি দুষ্কর্মকারী, দুর্বাক্যভাষী ও দুচিন্তাকারী। তারা পরসম্পত্তি লোভী, পরের অহিত, অনিষ্টকামনাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়াণ এবং কর্ম ও কর্মফলের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে। এরূপ কর্মের দ্বারাই মূর্খ নিজেকে মূর্খ বলে পরিচয় প্রদান করে। আমি তোমাদেরকে বলতেছি, তোমরা মূর্খ হও না। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, যাবতীয় নেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-অজ্ঞানের সহচর্যে না থেকে তোমরা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্যের শরণাপন্ন হও। মিথ্যাধর্ম আচরণ না করে সর্বদা সত্যধর্ম আচরণে তৎপর থাক। তাহলে সমস্ত দুঃখের অন্ত সাধন করে পরম সুখের সন্ধান মিলবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অজ্ঞানের সংস্পর্শে দুর্বিষহ দুঃখ আর জ্ঞানের সংস্পর্শে পরম সুখ লাভ হয়ে থাকে। সাধারণ (অজ্ঞানী) নর-নারীরা মনে করে স্বামী-স্ত্রী হওত সংসারী হলে বুঝি সুখ লাভ হয়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণা। সংসারী জীবনে পাপই বৃদ্ধি পায়। সুখ অর্জিত হয় না। ভগবান বুদ্ধ সংসারী জীবনকে যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ডভোগী কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেখানে অজ্ঞ ব্যক্তির স্বীয় অজ্ঞানতা দরুন কষ্টকর ও পরাধীন জীবন-যাপন করে থাকে মাত্র। আবার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে যদি জ্ঞান ও কুশল না থাকে তবে সংসারী জীবন অসহণীয় দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ হয়ে উঠে। স্বামী-স্ত্রীতে সর্বদা বাদ-বিবাদ, ঝগড়া-কলহ, মান-অভিমান, ভুল বুঝাবুঝি লেগেই থাকে। এমন কি বিচ্ছেদও ঘটে যায়। অপরদিকে পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যায়, ভ্রাতা-ভগ্নিতে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে কথা কাটাকাটি, মনোমালিন্যসহ বিবিধ দুঃখ তো রয়েছেই। এসবের দ্বারা প্রমাণিত হয় নর-নারীরা মূর্ততা বশতঃ সংসারী হয়ে সুখের প্রত্যাশায় দুঃখেরই শিকার হয় মাত্র। স্বামী-স্ত্রী রূপ সংসারী জীবনে প্রকৃত সুখ বলে কিছুই নেই। স্বামী বা স্ত্রী কেহ সুখের অধিকারী হতে পারে না।

ভগবান বুদ্ধ বিশ্ববাসীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন-তোমাদের এত দুঃখ কেন? এসো, আমি তোমাদেরকে সুখের সন্ধান দিতেছি। দুঃখের চির অবসানের নিমিত্তে তোমরা মৎ কর্তৃক প্রদর্শিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি যেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছি, সেই অমৃতের বাণী তোমাদেরকে শুনাতে এসেছি, তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং আস্থার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চল তাহলে তোমাদেরকে আর দুঃখক্লিষ্ট

হৃদয়ে অবস্থান করতে হবে না। আমার এখানে (এ সত্যে) কোন ক্রেশ নেই, সস্তাপ নেই, উপদ্রব রহিত ও উৎপাতশূন্য। তোমরা বুদ্ধের উপদেশ মত অজ্ঞান, মিথ্যার্থ্যম্ পরিত্যাগ করে জ্ঞান ও সত্যার্থ্যম্ আচরণে তৎপর হও। তাহলে দেখবে তোমাদের দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে অমৃত সুখের সন্ধান মিলবেই। তাই আবারো বলছি অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত না থেকে জ্ঞানের আলোতে বেরিয়ে এসো। মিথ্যার্থ্যম্ বাদ দিয়ে সত্যার্থ্যম্ আচরণ কর। অজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সর্বদা জ্ঞানের সহিত পরিচালিত হও। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্ম আচরণ বা অনুশীলন করতে জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞানের পরিধি কম হলে এ' ধর্ম আচরণ করা যায় না। কিন্তু কই? প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণে সক্ষম এমন নর-নারী তো আমি এদেশে দেখতে পাচ্ছি না। আমার বহু বৎসরের অভিজ্ঞা থেকে বলছি, আমি ব্যতীত অন্য কেউ প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম বুঝতে সমর্থ হয়নি এই বাংলাদেশে। আমি দৃষ্টকণ্ঠে বলতে পারি, বাংলাদেশে আমি ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানী কেউ নেই। তবুও তোমাদেরকে অনুকম্পার্থে বলি-তোমরা কোন প্রকার চাপের মুখেও মিথ্যার্থ্যম্‌র আশ্রয় গ্রহণ করবে না। চিন্তের মধ্যে সর্বদা জ্ঞান এবং সত্যকে সযত্নে রক্ষা করে চলবে। যাবতীয় অকুশল পাপ হতে চিন্তকে মুক্ত রেখে কুশল চেতনায় জাগরিত রাখবে। ক্ষণিকের জন্য হলেও চিন্তকে পাপ চেতনার দিকে ধাবিত হতে দেবে না। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন, যদি এসবের বিপরীত মার্গে চিন্তা ধাবিত হয় তাহলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী বলে জানবে। চিন্তা একবার সেই বিপরীত মার্গের দিকে ধাবিত হলে সে মার্গ হতে ফিরায়ে আনা বড়োই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তকে সকল প্রকার পাপ কলুষ হতে মুক্ত রাখাই বৌদ্ধধর্ম। এ'ধর্মে পাপ পঙ্কে কলুষিত চিন্তের কোন স্থান নেই। তাই চিন্তা কলুষিত হলে শত সহস্রভাবে চেষ্টা করলেও এই ধর্মের মর্মোপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। মনে রাখবে কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিন্তেই বৌদ্ধধর্ম আচরিত হয়ে থাকে। তোমাদেরকেও সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী এবং কুশলধর্মে বলীয়ান হতে হবে। তবেই তোমাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম প্রকাশিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম আচরণের মাধ্যমে কি সুখ লাভ হয় তা' উপলব্ধি হবে। আর সমস্ত দুঃখের চিরাবসান হয়ে যাবে, সুখ লাভ হবেই।

তিনি বলেন-তোমরা শীল পালন কর, সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদনে তৎপর থাক। জীবনে উন্নতির জন্য শীলাচরণ আবশ্যিক। শীলাচরণই জীবন উন্নতির জন্য দুর্লভ সম্পদ। শীলাচরণ এবং কুশল সম্পাদনের দ্বারা সহসা উন্নতি সাধন ও শ্রীবৃদ্ধি অর্জিত হয়ে থাকে। শীল রক্ষা ব্যতীত ইহ-পারত্রিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অন্য কোন পথ নেই। যিনি যত বেশি নিখুঁতভাবে শীল রক্ষা করবে তিনি ততই সুখ সম্মানের অধিকারী হবে। তোমরা যদি পরিশুদ্ধভাবে শীল পালন

করতে সক্ষম হও তবে আমি বলছি তোমাদের বর্তমানের এই দুঃখ দূরাবস্থা অবশ্যই কেটে যাবে। কারণ শীল পালনের দ্বারা অর্থহানি, যশহানি, সম্মানহানি, সুখহানি কিছুই থাকতে পারে না। শীল পালন করলে গরিব থাকতে পারে না। আমি এটা জোর গলায় বলতে পারি যে, তোমরা পরিশুদ্ধভাবে তিন বৎসর যাবত শীল পালন করে দেখো তোমাদের এই অর্থনৈতিক দৈন্যতা আর থাকতে পারবে না। পূর্বজন্মের অকুশলের ফলে বর্তমানে তোমাদের এই দুঃখ। তাই বর্তমান সময়ে কষ্ট করে হলেও ধৈর্য সহকারে শীল পালনাদি কুশলকর্মের দ্বারা সে দুঃখ লাঘব করা একান্ত কর্তব্য। শীল প্রতিপালন করলে দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয় না। শীলই কুশলধর্মের আদি। আত্মহিত সাধনে শীলের তুল্য জগতে দ্বিতীয় আর কিছু নেই। অন্যদিকে শীল লঙ্ঘন করলে দিন দিন অধঃপতন ঘটতে থাকে। শীল বিহীন দুশ্চরিতের কোন প্রকার সুখ লাভ হয় না। শীল পালন করতে হলে চাই শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সম দয়া। হিংসা বা বিদ্বেষভাব থাকলে শীল পালন করা অসম্ভব। হিংসাকে মহা অনর্থকারী হিসাবে জানবে। চিন্তের মধ্যে হিংসাভাব বিরাজ করলে কিছুতেই মানসিক শান্তি লাভ হয় না। হিংসার সমান পাপ নেই। মরুভূমিতে যেমন কোন বপিত বীজ গজায় না তেমনি হিংসা-দ্বন্দ্ব অন্তরেও কোন প্রকার ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তাই তোমরা হিংসাভাব পরিত্যাগ করে সকলে মিলে-মিশে মৈত্রী সহগত চিন্তে অবস্থান কর। যদি চিন্ত থেকে হিংসা ভাবকে বিদূরিত করতে পার তাহলে দেখবে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, পূর্বের অশান্তি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সমস্ত দুঃখের চির অবসান হতে যাচ্ছে তোমাদের জীবন হতে। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তো পরস্পরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, রেষারেষিমূলক কর্মে নিয়োজিত রয়েছ। ফলে একে অপরে ভুল বুঝাবুঝি, মনোমালিন্য, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত তথা আজকের এই অশান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি-তোমরা এই হিংসা, বিদ্বেষ পরিহার করে মৈত্রীপরায়ণ হয়ে অবস্থান কর। তা না হলে তোমাদের অবনতি অধঃপতন সুনিশ্চিত বলে জানবে। তাই বলি এখনো সময় আছে, অতীতের সব বিদ্বেষ ভাব ভুলে গিয়ে তোমরা আর কেহ কারোকে হিংসা করবে না, সকলে মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বপ্রেমের সহিত উন্নতির দিকে এগিয়ে চল। সকলে মিলেমিশে ঐক্যের সহিত থাকতে পারলে কেউ তাদেরকে পরাজিত করতে পারে না। উপরন্তু তোমাদের সর্বদিকে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হবেই।

তোমাদের এখানে (কাউখালি) নাকি অনেক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের বাস রয়েছে। তারা বৌদ্ধধর্মও বিশ্বাস করতে চায় না। পরন্তু মিথ্যাধর্ম আচরণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করেছে। অন্ধ কুসংস্কারমূলক সামাজিক ও ধর্মীয়

কার্যকলাপ যেমন-তানমানা, ধর্মকাম, মাথা ধোঁয়া, গাংপূজা, শিবপূজা, মালস্মী পূজা, পশু বলি সংযুক্ত পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান তাদের কাছে প্রচলিত হয়ে আসতেছে। এসব মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কার্য ও চিন্তা ভাবনা দ্বারা তারা এখনও অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে সেই অন্ধ কুসংস্কারের যুগে। অন্ধ কুসংস্কারমূলক আচার আচরণে সুখের পরিবর্তে দুঃখই বৃদ্ধি পায় মাত্র। তারা বুঝতে পারছে না যে, সেই অন্ধ কুসংস্কার কর্মসমূহ ত্যাগ করে সম্যকদৃষ্টির আলোকে কুশলকর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ না হলে তাদেরকে অনন্তকাল ব্যাপী দুঃখ ভোগ করতেই হবে। সম্যক আলো ব্যতীত সেই দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। আর সম্যকপথে ফিরে আসা তাদের জন্য সত্যিই কঠিন কাজই বটে। তাই তোমাদেরকে বলছি, তোমরা কখনো মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করবে না। অন্ধ কুসংস্কারমূলক যে আচার-আচরণ বা রীতিনীতি তা' হতে নিজেকে মুক্ত রাখবে। কখনো পশু বলি যজ্ঞ সম্পাদন করবে না। পক্ষান্তরে দান যজ্ঞ, পঞ্চশীলের যজ্ঞ, ত্রিশরণের যজ্ঞই সম্পাদন করবে। এসব যজ্ঞ মহৎ ফল প্রদান করে থাকে। মনে রাখবে দান যজ্ঞ, পঞ্চশীল যজ্ঞ, ত্রিশরণের যজ্ঞ দ্বারা ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ অর্জিত হয়। এবং সর্বদিকে মঙ্গল, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হওত পরিশেষে নৈর্বাণিক সুখও লাভ হয়। যারা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন তারা কর্ম ও কর্মফল, পরকাল এবং চারি আর্যসত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে দান, শীল, ভাবনাদি কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকে। কিছুতেই মিথ্যাদৃষ্টিজাত অন্ধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে অকুশলকর্ম সম্পাদন করে না। আর যাদের কর্ম ও কর্মফল, পরকাল এবং চারি আর্যসত্যের প্রতি বিশ্বাস নেই তারাই মিথ্যাদৃষ্টি সম্বৃত্ত নানা কুসংস্কারে নিয়োজিত হয়ে অকুশলকর্ম সম্পাদন করে থাকে। ফলে তাদের আর দুঃখের সীমা থাকে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা বহু পর্যালোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তোমাদের এখন ধর্মের আশ্রয়ে অবস্থান করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ধর্মাচারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তোমাদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে না। তোমরা এটা বিশ্বাস কর বা নাই কর, এর ব্যতিক্রম কিন্তু কখনো হবে না। আমি তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বলছি, তোমরা পাপ অকুশল কর্মসমূহ পরিত্যাগ কর। অন্যায়, অপরাধ, ভুল গলদ কর্ম ছেড়ে দিয়ে কুশল পুণ্যমূলক কর্ম সম্পাদনে তৎপর হও। সকলে একরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও; 'আমরা আজ হতে আর কারোর প্রতি অন্যায় করব না, কারোর ক্ষতিসাধন করব না, কারোর সঙ্গে শত্রুতা আচরণ করব না। এবং কোন প্রাণী হিংসা করব না।' তাহলে দেখবে বর্তমানের এই দুঃখ দুর্দশা অবস্থা সহসা কেটে যাবে। তোমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হতে থাকবে সর্বক্ষেত্রে। তোমরা জয়যুক্ত হবে ইহ-পর উভয় কালই হয়ে উঠবে পরম সুখের, পরম আনন্দের।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা দান, শীল, ভাবনাদি কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর। মৃত্যুর পর সুগতি লাভের জন্য এই কুশলকর্মই একমাত্র সম্বল। কুশলকর্মের মাধ্যমে ইহ-পর উভয় লোকে সুখ অর্জিত হয়ে থাকে। আর কুশলকর্ম ব্যতীত সুখ লাভের আশা ভ্রমার্থক। কুশলকর্মের জোর না থাকলে কখনো সুখ লাভ হয় না। লোভ পরিত্যাগের জন্য দান, ঘ্বেষ পরিত্যাগের জন্য শীল এবং মোহ পরিত্যাগের জন্য ভাবনা করতে হয়। বলা যায়, লোভ পরিত্যাগই দান, ঘ্বেষ পরিত্যাগই শীল, মোহ পরিত্যাগই ভাবনা। চিন্তের মধ্যে লোভ বিদ্যমান থাকলে দান করা যায় না, ঘ্বেষ বিদ্যমান থাকলে শীল পালন করা যায় না, মোহ বিদ্যমান থাকলে ভাবনা করা যায় না। দানের প্রভাবে দায়কের চিন্তের সংকীর্ণতা, মাৎসর্য, লোভ, কৃপণতা ছিন্ন হয়ে যায়। মনে রাখবে দানের দ্বারা কৃপণতা ভাবকে পরিত্যাগ করতে না পারলে স্বর্গ লাভ করা অসম্ভব। কৃপণ ব্যক্তি কখনো স্বর্গে যেতে পারে না। দানের ফলে দাতাগণের জন্মে জন্মে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, প্রজ্ঞা লাভ হয়। প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে। দীন-দরিদ্র, অভাব-অনটন তথা ‘নাই’ শব্দ কখনো তাদের শ্রুতিগোচর হয় না। শীলাচরণের মাধ্যমে নিজকে পাপ হতে সুরক্ষিত করতে সমর্থ হলে চারি অপায়ে পতিত হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। শীল পালন করতে গিয়ে অল্পেতে জীবন বিসর্জন দিতে হলেও ক্ষতি নেই। শীলবানেরা মৃত্যুর পর দিব্য আনন্দময় স্বর্গে জন্মধারণ করে থাকে। শীল সমস্ত কুশলকর্মের ভিত্তি স্বরূপ। শীলের ফল অপ্রতিহত, শীল শ্রেষ্ঠ আবরণ, শীল অদ্বৃত রক্ষা কবচের ন্যায়। শীলবান ব্যক্তিকে বিপদের সময় সং দেবতাগণ রক্ষা করে থাকে। শীল প্রতিপালন করলে স্বর্গ লাভ হয়, নানা প্রকার ভোগ সম্পত্তি লাভ হয়। শীলবানের সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। তারা যে কোন সভা সমিতিতে নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কোচে গমন করে থাকে। মনে কোন প্রকার অপরাধ প্রবণতা বিদ্যমান থাকে না। শীলবান ব্যক্তি ইহলোকে যেমন সুনাম সুকীর্তির সহিত সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে তেমনি মৃত্যুর পরও সুগতি স্বর্গ লাভে পরমানন্দের অধিকারী হয়। এবং শীলবানের সহসা নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। ভাবনা হল মনের কাজ জ্ঞান উৎপাদক চিন্তা। মনচিন্ত হতে যাবতীয় অকুশল, পাপ চেতনা পরিত্যাগ করার নামই ভাবনা। ভাবনা রজ্জু দ্বারা চিন্তকে বেঁধে রেখে পাপ হতে মুক্ত হতে ভাবনা করতে হয়। এভাবে দান-শীল-ভাবনাদি কুশল অর্জনের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। তোমরা সর্বদা এবিধি উপায়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হও।

শীলবানের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ লাভ সুনিশ্চিত

কাটাছড়ি শাখা বনবিহারে দানোত্তম কঠিন চীবর দান ২০০০ সাল উপলক্ষ্যে দেশনা প্রদানকালে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা দুঃখ পেলে সুখ খোঁজ, কোথায় সুখ পাওয়া যায়। বলা চলে, দুঃখমুক্ত হলে দুঃখের পরিসমাপ্তি কামনায় কুশলকর্ম সম্পাদন করতঃ সবাই সুখ অন্বেষণ করে। কারণ প্রাণী মাত্রেই সুখ আকাজকী, সুখ প্রত্যাশী, কেহ দুঃখের মধ্যে থাকতে চায় না। তবে দুঃখের মুখোমুখি না হওয়ার জন্য পূর্ব হতে কুশলকর্ম সম্পাদনের কোন প্রকার প্রচেষ্টা কর কি? না দুঃখে পতিত হলে তখনই মাত্র? কেন দুঃখ পেতে হয় তোমরা জান কি? অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ক্রেশের কারণে দুঃখ পেতে হয়। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে অজ্ঞানতা কারণে দুঃখ পাচ্ছ, তৃষ্ণা কারণে দুঃখ পাচ্ছ, উপাদানের কারণে দুঃখ পাচ্ছ, ক্রেশ কারণে দুঃখ পাচ্ছ। সাধারণতঃ দেখা যায়, নর-নারীগণ দুঃখ পেলে একে অপরকে দোষারোপ করে থাকে। আমি অমুকের দ্বারাই দুঃখ পাচ্ছি, অমুকই আমাকে দুঃখ প্রদান করতেছে, অমুক কর্তৃক এটা করা না হলে আমাকে দুঃখ পেতে হতো না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সে সব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্বীয় চিন্তে বিদ্যমান অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ক্রেশের দ্বারাই দুঃখ ভোগ করতে হয়। চিন্ত হতে সেই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ক্রেশ নিরোধ হয়ে গেলে দুঃখেরও নিরোধ হয়। যেখানে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশের পীড়নে তোমাদেরকে পদে পদে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে, সেখানে অন্যজনকে দোষারোপ করার যৌক্তিকতা কোথায়?

বর্তমানে নর-নারী অজ্ঞানতা বশত কামাসক্ত, ধনাসক্ত, বিদ্যাসক্ত, সৌন্দর্যের আসক্ত এবং অহংকারের মাঝে সুখ খোঁজে বেড়ায়। তারা নিজের সুখ বর্ধন তরে অন্যায়, অপরাধ, অনাচার, অত্যাচার তথা যে কোন মন্দ কর্ম সম্পাদনে সমর্থক আত্মহী হয়। কিন্তু নিজে সুখ প্রত্যাশী হয়ে অপরাপর সুখকামী দিগবে দুঃখ যাতনা ও ক্ষতিসাধন করলে কিছুতেই সুখ লাভ করা সম্ভব হয় না। বরং সেই বিপথগামী হীনচেতা স্বার্থপরগণ ইহজন্মে নিদারুণ দুঃখ তপ্ত হতেই থাকে এবং মরণের পরও চারি অপায়ে পতিত হয়ে দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি তোমরা এমনভাবে অবস্থান করবে যাতে চিন্তের মধ্যে বিন্দু মাত্রও অপরের অহিত কামনা ঠাই খুঁজে না পায়। পরের অহিত কামনায় অভিভূত চিন্তে কখনো প্রকৃত সুখের সন্ধান অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। মানুষের প্রয়োজন সেই পথের সন্ধান যা তাদেরকে পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখের চরম সীমায় পৌঁছে দিতে সক্ষম। আর সেই পথটি হল সর্বদা জ্ঞানের সহিত নিজেকে পরিচালিত করা। বাক্যে, কর্মে ও মননে যিনি জ্ঞানকে সজাগরূপে রাখতে

সক্ষম হন তিনিই দুঃখ ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পরম শান্তিতে থাকেন। ইদানিং দেখা যায়, জনসমাজে অজ্ঞানতার প্রভাব অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অজ্ঞানের ভিমিরাচ্ছন্ন হয়ে সকলেই কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে বসেছে। ফলে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি-মারামারি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নোংরা আচরণ, বর্বরোচিত ব্যবহার, গোড়ামী, বিদ্বেষাত্মক মনোবৃত্তি দ্বারা মানবসমাজ যেন অসুরলোকে পরিণত হয়েছে। সর্বদিকে দুঃখের হাহাকারে ভরা করুন অবস্থাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধুমাত্র জনসমাজ কেন? আমি তো দেখতেছি, তোমাদের দাম্পত্য জীবনও দুর্বিষহ দুঃখে ভরা। পরস্পরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝি, সন্দেহ, অসহিষ্ণুতার দরুন একবিন্দুও শান্তি নেই। উপরন্তু অবাধ্য পুত্র-কন্যা, বিরূপ আত্মীয়-স্বজন, ঝগড়া ইত্যাদিতে পাড়া প্রতিবেশী সব মিলে প্রায় নারকীয় দুঃখে পরিপূর্ণ। আবার, অনেকে তো দুঃখে মূহ্যমান হয়ে পৃথকভাবে বাস করাও শুরু করেছে। অনেক স্বামী বা স্ত্রী নিজেরাই আমার নিকট এসে তাদের দাম্পত্য জীবনের সেই অসহনীয় দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই দাম্পত্য জীবন যে সীমাহীন দুঃখে ভরা এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

চিন্তের মধ্যে জ্ঞান ও কুশল বিদ্যমান থাকলে সুখ অর্জন করা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু অজ্ঞান, অকুশলের দ্বারা কখনো সুখ লাভ হয় না। তোমরা একরূপ প্রতিজ্ঞা কর যে, “আমরা সর্বদা জ্ঞানের সহিত চালিত হবো, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবো। কিছুতেই অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করব না, অজ্ঞানের সহিত চালিত হবো না, পাপজনক কোন কর্মই সম্পাদন করব না।” শীলবান, প্রজ্ঞাবানের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ লাভ সুনিশ্চিত। শীল পালন করলে ও প্রজ্ঞাবান হতে পারলে কিছুতেই দুঃখ, অশান্তি, পরিহানির নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে হয় না। শীল, প্রজ্ঞা দ্বারা যাবতীয় দুঃখ লাঘব হয়ে থাকে। অন্যদিকে শীল, প্রজ্ঞাবিহীন অবস্থায় কখনো উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। শীল, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির সর্বদা দুঃখভোগ এবং সবেগে অবনতি পরিহানির দিকে ধাবিত হয়েই থাকে। তোমরা কাটাছড়ি এলাকাবাসীরা সবাই গরিব। উপরন্তু সং উপায়ে অর্থ উপার্জনেরও কোন সুব্যবস্থা নেই তোমাদের। আগে যেই সমস্ত ধান্য জমি ছিল কাণ্ডাই বাঁধের ফলে বর্তমানে সেই জমি সবই জলমগ্ন। বাগান বাগিচা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং উর্বর পাহাড় জমিও নেই। ব্যবসা বাণিজ্য করার মত সামর্থ্যও নেই কারোর নিকট। কাজেই বাধ্য হয়েই তোমাদেরকে মাছধরা, পণ্ড-পক্ষী (শুকর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি) পালন করার পেশায় নিয়োজিত হতেই হচ্ছে। কারণ জীবিকা নির্বাহের জন্য এটা ভিন্ন কোন সহজ উপায় তো তোমাদের হাতে নেই। এবিধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি তোমাদেরকে

কিভাবে পঞ্চশীল পালন করার উপদেশ দিব? তোমরা কিভাবেই বা পঞ্চশীল ধর্ম রক্ষা করে চলবে? তাই পরিস্থিতি একেবারে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধের মতে কাঠ বিক্রি, শন বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করা কোন দোষের নয়। বোধিসত্ত্ব অবস্থানকালীন বুদ্ধও অনেকবার জীবিকার তাগিদে সেরূপ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু মৎস্য, মাংস, অস্ত্র, সুরা, বিষ বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা অতিশয় দোষাবহ। এবং কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাদেরকে মাছধরা ও পশু-পক্ষী পালন করতে বারণ করি তোমরা তা' রক্ষা করবে কি? নাকি আমাকে পাণ্টা জবাব দিয়ে বলবে—“ভস্তু তাহলে আমাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য উপায় বের করে দেন।” আমরাও তো জানি মাছধরা, পশু-পক্ষী পালন করে জীবিকা নির্বাহ করা পাপকর্ম বটে। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদেরকে বাধ্য হয়েই এ'কর্ম করতে হয়। এটা ভিন্ন কোন উপায় আমাদের নেই। অন্য কোন সং উপায় থাকলে আমরা এটা ত্যাগ করতাম। যাদের জ্ঞান শক্তি দুর্বল, সম্যক বীর্যের অভাব তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পাপকর্মে নিয়োজিত থাকতে চায়। বুদ্ধ মতে, গৃহীরা পঞ্চশীল পালন না করলে দিন দিন গরিব হতেই থাকে। পক্ষান্তরে পঞ্চশীল প্রতিপালন করতে পারলে ধনী হয়ে যায়। অজ্ঞান পাপের আশ্রয় গ্রহণ করলে কিছুতেই সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয় না। আমি বলছি, তোমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পঞ্চশীল পালন করে দেখো তাহলে তোমাদেরকে আর গরিব হয়ে থাকতে হবে না। মনে রাখবে তোমরা যত পঞ্চশীল ভঙ্গ কর ততই দিন দিন গরিব হতে থাকবে। পরিহানি ব্যতীত কিছুতেই উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হবে না। কারণ ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়। জ্ঞানের জয়, অজ্ঞানের পরাজয়। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হয়। অন্যদিকে ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে। ধর্মচারীকে কখনো দুঃখ, অশান্তির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয় না। ধর্মচারী ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরম সুখের অধিকারী হয়ে থাকে। জ্ঞান, কুশল নিয়ে থাকলে সুখ। অজ্ঞান, অকুশল নিয়ে থাকলে দুঃখ। সুতরাং প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উচিত জীবনের বিনিময়ে হলেও শীলরক্ষা করতঃ জ্ঞানকে নিয়ে থাকা। কুশল নিয়ে থাকা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চমনা হয়ে থাকা। দুঃশীল, দুঃস্রাজ্জ হয়ে শত বৎসর জীবিত থাকা অপেক্ষা শীলবান প্রজ্ঞাবানের এক মুহূর্ত জীবনও শ্রেষ্ঠ।

তিনি আরো বলেন—সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে হলে শীল পালন করা চাই। শীল পালন এবং কুশলকর্ম সম্পাদন করলে তবেই তোমাদের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে। মনে রাখবে শীল পালন ও কুশলকর্মের মাধ্যমে ধনী হওয়া যায়। কিছুতেই আর্থিক দুরাবস্থায় ভুগতে হয় না অর্থাৎ গরিব থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি, মদ, জুয়া এ সমস্ত পাপকর্ম সম্পাদন

করলে দিন দিন গরিব হতে হয় এবং সর্বদিকে অধঃপতন, পরিহানি ঘটে। তাই তোমাদেরকে বলছি, তোমরা পঞ্চশীল পালন কর। কখনো প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবন করবে না। সর্বদা কুশলকর্মে নিয়োজিত থাক। কুশলকর্ম দ্বারা তোমাদের সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং গুরুপঙ্কের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হতেই থাকবে। সহনশীলতা গুণের দ্বারা মূর্খের দুর্বাক্য, দুর্ব্যবহার সহ্য করে হলেও নিজেকে পাপকর্ম হতে সরায়ে রাখবে।

ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞান শক্তির অধিকারী। ত্রিলোকের মধ্যে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা গুণে বুদ্ধ হতে শ্রেষ্ঠ বা বুদ্ধের সমকক্ষ কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নেই। বুদ্ধের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আচরণ করে তাঁকে পরাস্ত করবে এমনও কেহ নেই। অন্যদিকে বুদ্ধ হলেন অন্যের নাথ, অগতির গতি। তিনি সকলের জন্য সুখ আনায়নকারী। ত্রিলোকের সত্ত্বদিগকে জন্ম-মৃত্যুর কান্ডার পার করিয়ে দিয়ে অমৃত নির্বাণপুরে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তাই জগতে বুদ্ধ পরম কল্যাণ মিত্র। যার সংস্পর্শ লাভ হলে সদ্ধর্মে জ্ঞানোদয় হয় জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব হয়। বুদ্ধ স্বীয় জ্ঞান শক্তির প্রভাবে অপরের হৃদয়েও জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম। ভগবান বুদ্ধের নিকট এরূপ অগাধ জ্ঞান শক্তির সমাহার ছিল। তজ্জন্য তখনকার সময়ে মার তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। বরং সর্বদা নীরব, নিস্তেজ অধোমুখ হয়ে অবস্থান করত। বুদ্ধের শক্তির কাছে মারকে অসহায় রূপে পরাজয় মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। অন্যদিকে শক্তিকে আমি সাত ভাগে ভাগ করে থাকি। যথা-রাজশক্তি, জনশক্তি, অস্ত্রশক্তি, কর্মশক্তি, মারশক্তি, জ্ঞানশক্তি ধ্যানশক্তি। যে কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শক্তি বিহীন অবস্থায় কোন কিছু করা সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধ নিজের সুবিশাল জ্ঞানশক্তি এবং ধ্যানশক্তির মাধ্যমে মারকে পরাজিত করে সদ্ধর্মের আলো দিকে দিকে প্রচার ও প্রসারিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাত প্রকার শক্তির মধ্যে জ্ঞানশক্তি, ধ্যানশক্তি ব্যতীত অপর পাঁচ প্রকার শক্তিসমূহ পাপ ও দুঃখ আনায়নকারী। বর্তমান কর্ম সম্পাদনের ফলে যে পুনর্জন্মের হেতু বা তার বিপাকের কারণ সৃষ্ট হয় তাই কর্মশক্তি। কর্মের এই মহাশক্তির প্রভাবে সত্ত্বগুণের জীবনপ্রবাহ চলছে অনাদিকাল হতে অনন্তের দিকে। সর্বসত্ত্ব কর্ম-নিবন্ধন। এক কথায় এ জগতে কর্মের প্রভাবে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কর্মের এরূপ অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তি। পাপমতি মারও প্রভূত অলৌকিক শক্তির অধিকারী। মারের সেই সকল শক্তিই মারশক্তি বলে অভিহিত। মারের শক্তি প্রভাবে সত্ত্বগণ মিথ্যা সুখের প্রলোভনে প্রলুপ্ত হয়ে সর্বদা পাপকর্মের মাধ্যমে ডুবে থাকে। এবং সেই অকুশলকর্ম হতে বেরিয়ে আসার

রাস্তা খুঁজে পায় না। পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও সংপথে চালিত হতে মারশক্তি পর্বততুল্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যা অতিক্রম করা কোনক্রমে সহজসাধ্য নয়। কুশলে প্রতিবন্ধক ও অকুশলে প্ররোচিত করতে মারের শক্তি বহুমুখী ও পরাক্রমশীল। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে দুর্দমনীয় মধ্যে মারের শক্তি অত্যন্ত অধিক। তোমাদেরকে আবারো বলছি, সাত প্রকার শক্তির মধ্যে তোমরা কেবলমাত্র জ্ঞানশক্তি ও ধ্যানশক্তির প্রত্যাশী হবে। এই দুই শক্তি ছাড়া অপর শক্তিগুলো দুঃখ, অশান্তি, অমঙ্গল ও পাপ সৃষ্টিকারী অপশক্তি মাত্র। জ্ঞানশক্তি হল “ইহা কুশল, ইহা অকুশল, ইহা সুপথ, ইহা কুপথ, ইহা গ্রহণীয়, ইহা অগ্রহণীয়, ইহা আচরণীয়, ইহা অনাচরণীয়, ইহা সুখ আনয়নকারী ধর্ম, ইহা দুঃখ আনয়নকারী ধর্ম, ইহা নির্বাণগামী ধর্ম, ইহা নরকগামী ধর্ম, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায় এবং কামাদি পাপ বিনাশ সহ আসবক্ষয় জ্ঞান সম্যকভাবে অধিগত হওয়া। ধ্যানশক্তি হল অলৌকিক শক্তি বিশেষ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ধ্যানে দক্ষতা লাভের ফলে চিত্ত ঋদ্ধি শক্তি বা অসাধারণ ঐশী শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই শক্তির প্রভাবে যোগী এক হয়েও বহু হতে সক্ষম হন, বহু হয়েও এক হতে সক্ষম হন, পক্ষীর ন্যায় আকাশমার্গে গমনাগমন করতে সক্ষম হন, জলে ডুব দেওয়ার ন্যায় পর্বতের গাত্র ভেদ করে অপর পারে অবাধে গমন করতে সক্ষম হন, ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ করে জলের উপর গমন করতে সক্ষম হন, চন্দ্র-সূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ, পরিমদন করতে সক্ষম হন, সশরীরে ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত গমন করতে সক্ষম হন। অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বনভন্তে একটা ঘটনার কথা বলতে শুরু করেন। ঠিক এভাবে-তখন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের শেষের দিকে একদিন ঢাকা থেকে দুইজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আমার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে জানার অভিপ্রায়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়। প্রথমে প্রণাম করার পর একপাশে বসে আমাকে বলল-আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবো? আমি বললাম-পারবেন। তৎপর তারা বলল-আপনার কাছে অলৌকিক শক্তি আছে কি? আমি বললাম-কেন এটা জিজ্ঞাসা করছেন। এবার তারা সুর ফিরিয়ে বলল-এমনিতেই বলছি। তাদের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম-আছে এটাও বলা যাবে না, আবার নেই এটাও বলা যাবে না। অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অন্যজনকে জানাতে ও প্রদর্শন করতে ভগবান বুদ্ধ বারণ করেছেন। কাজেই আমার নিকট অলৌকিক শক্তি আছে, আমি এটা বলতে পারব না। অন্যদিকে নাই, এটাও বলতে পারব না। তারা প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পেরে বলল হ্যাঁ, তা ঠিক আপনি ঠিক কথা বলেছেন এটা বলে তারা কিছু কথোপকথনের শেষে বিদায় নেয়। আসলে তারা যে সরকারের নির্দেশে আমার

ঋদ্ধিশক্তি আছে কিনা সেটা জানতে এসেছিল। আমি তাদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে ফেলেছি। ধর তখন যদি আমি ‘আছে’ বলতাম তাহলে তারা দেখাতে বলতো। আর নেই বলার পরও অত্যন্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তার ব্যতিক্রম ঘটলে তারা তো আমাকে মিথ্যুক বলে জানবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার পর থেকে অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী সৎপরামর্শ লাভের জন্য আমার নিকট আসতে শুরু করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-অনেকে নাকি প্রশ্ন করে বনভন্তে কেন ধর্মদেশনায় কঠোর স্বর ব্যবহার করে থাকেন? কিন্তু তোমাদেরকে মিষ্টি স্বরে বললে তো কিছুই হয় না। পালন করা তো দূরে থাক অনেক সময় শুনতেও চাও না। অন্যদিকে কঠোর স্বরে বললে কিষ্টিং পরিমাণে হলেও কাজ হয় বৈকি। কারণ বর্তমানে জ্ঞানীর সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। তাই কোমল, সরল কথা কেহ সহজে শুনতে চায় না। কাজেই তোমাদের অবস্থা বুঝে অধিকন্তু দয়া পরবশ চিন্তেই আমি তোমাদেরকে নানাভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করে থাকি। আমি এভাবে না বললে আর কেবা তোমাদেরকে বলবে শুনি? সদ্ধর্মের পথে কেবা তোমাদেরকে টেনে আনবে? বর্তমান পিতা মাতার অবাধ্য যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে বনভন্তে বলেন-বর্তমানে তোমরা যদি পিতামাতার অবাধ্য হয়ে থাক তাহলে, বিবাহ করার পর তোমাদের ছেলে মেয়েরাও তোমাদের অবাধ্য হবেই। মা-বাবার কোন কথা, অনুশাসন, আদেশ-নির্দেশ মান্য করবে না। বরং তোমাদের এই বলে ছমকি প্রদান করবে যে, “হে বুড়া-বুড়ি খবরদার চুপ করে থাক! কোন কথা বলবে না।” এমনকি তোমাদের উপর হাত তুলতে ও কুণ্ঠিত হবে না। তখন মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই সাবধান মা-বাবার অবাধ্য হয়ে খারাপকর্মে লিপ্ত হবে না। বদমেজাজী আচার-আচরণ করবে না। মা-বাবার মনে দুঃখ-কষ্ট দিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সম্মান করবে, কখনো অগ্রাহ্য করে চলবে না। তাদের প্রতি সর্বদা নম্র ব্যবহার করবে। তাহলে তোমরাও বৃদ্ধকালে অপদস্ত হবে না, সসম্মানে জীবন-যাপন করতে পারবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে মহা মুশকিলে পড়ে যাবে। সংসারী হয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে বিবিধ দুঃখ কষ্টে রাখা হলেও পাপ হয়। স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে ভালোরূপে লালন পালন ও ভরণপোষণ করা গৃহস্বামীর কর্তব্য। গৃহস্বামীকে সামর্থ্যানুসারে উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ, অলংকার প্রদান এবং দানাদি পুণ্যকর্মের জন্য উৎসবের সময় অর্থ প্রদানের ব্যাপারেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভালো মন্দ কুশলাদি প্রশ্ন করা সহ ভালো ব্যবহার করা চাই। পুত্র-কন্যার সামনে কখনো স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে নেই। মনে রাখবে, ঝগড়াতে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী পুত্র কন্যা কেহ সুখী হতে পারে না। যেই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী সর্বদা ঝগড়ায়

লিপ্ত থাকে, দুঃশীল, অধর্মপরায়ণ হয় সেই স্বামী-স্ত্রী মৃত্যুর পর উভয়ে নিরয়গামী হবে। তোমরা সেইরূপ অকুশলকর্ম হতে নিজকে বিরত রেখে পঞ্চশীলাদি পালন ও পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাক। এতে ইহজন্মে আর্থিক অনটনের মত দুঃখের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হলেও পরজন্মে বিপুল সুখের অধিকারী হবে পারবে।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা বিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীলধর্ম রক্ষা করে চল। কখনো প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি-লুটপাট, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যলাপ ও সর্ব অনর্থের কারণ মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবনাদি সহ অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। মনে রাখবে পাপকর্মের দ্বারা কিছুতেই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আনে না। বরং সবেগে পরিহানি, অধঃপতনই ঘটতে থাকে। আর শীলাদি প্রতিপালন ও কুশলকর্ম সম্পাদনের ফলে সহসা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হতে নিজকে সযত্নে রক্ষা কর। কারণ দুষ্কৃতিকর্ম ইহজন্মে যেমন বিবিধ দুঃখ কষ্টের শিকারে পরিণত করে তেমনি মৃত্যুর পরও ঘোরতর দুঃখপূর্ণ নরকে পতিত করায়। অন্যদিকে পরিশুদ্ধ চিন্তা সকল সুখের আকর। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে বনভঙ্কে বলেন তোমরা সবাই সুখ প্রত্যাশা কর কি? সবাই একসঙ্গে হ্যাঁ বলে উত্তর প্রদান করল। তাহলে তোমরা দৃঢ় চিন্তে এরূপ বলা “আজ হতে আমরা আর কোন প্রাণীকে হিংসা করবো না, কারোর প্রতি ক্ষতিসাধন করবো না, কারোর সহিত অন্যায় ব্যবহার করবো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুতাব্যবহার পোষণ করবো না। উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ করবো, ধর্ম আচরণে কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় নেব না। চিন্তকে সর্বদা পরিশুদ্ধ রাখবো” এভাবে নিজকে সাবধানতার সঙ্গে পরিচালিত করতে সমর্থ হলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, তোমাদের অবশ্যই সুখ হবে। আর কোন প্রকার দুঃখ থাকতে পারবে না। যেমন কোন লোক বিদায় কালে ‘আমি চলে যাচ্ছি’ বলে বিদায় নেয় ঠিক তেমনিভাবে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে যাবতীয় দুঃখরাশিকেও তোমাদের নিকট হতে বহু দূরে সরে যেতে হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

আজকাল প্রায় মানুষই দুষ্কৃতিকর্মে জড়িত

রাজবন বিহারে আয়োজিত প্রবারণা পূর্ণিমা ২০০০ সাল উপলক্ষ্যে সার্বজনীন দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশুভির (বনভন্তে) বলেন-ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনী জাতক পাঠ করলে দেখা যায়, বুদ্ধ কোন কোন জন্মে তির্যকযোনিতে শৃগাল, কুকুর, হাতি, ময়ূরকুলে জন্মধারণ করে বিবিধ দুঃখভোগ করেছিলেন। আর কোন কোন জন্মে রাজা, মহারাজা, ইন্দ্ররাজ্যরূপে জন্মধারণ করে প্রভূত ঐশ্বর্য সুলভ সুখের অধিকারী হয়েছিলেন। কেন সেই রকম হয়েছিলেন জান? স্বীয়কৃত সুকৃতি দুষ্কৃতিকর্ম বিপাকের হেতুতে। কোন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা আদেশ-নির্দেশের উপর নির্ভর করে নয়। আবার একান্ত স্বীয় ইচ্ছার বহির্প্রকাশের কারণেও নয়। অনেকে অজ্ঞতা হেতু বলে থাকে। ভগবান বুদ্ধ ইচ্ছা করেই বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বৌদ্ধধর্ম মতে, বর্তমানে যেইরূপ কর্ম সম্পাদন করা হয় সেটা সুকৃতি হোক বা দুষ্কৃতি হোক ভবিষ্যতে সেইরূপ কর্মের ফলই ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ যে রকম কাজ করবে সে রকম ফল ভোগ করবে। তাই বুদ্ধের উপদেশ হল তোমরা দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করবে না। তাতে (অর্থাৎ দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদনে) দোষ কি? দুষ্কৃতিকর্ম দুর্লভ মানব জন্মকে নষ্ট করে দিয়ে চারি অপায়ে পতিত করায়। জ্ঞানী ব্যক্তির দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন না করে সুকৃতিকর্মই সম্পাদন করে থাকেন। তবে আজকাল প্রায় মানুষই দুষ্কৃতিকর্মে জড়িত। অত্যাধিক লোভ-লালসা, মান-সম্মান ও অর্থবিশ্বের আকাঙ্ক্ষায় কেহ নিজকে সামাল দিতে পারছে না। অন্যায়সে একটার পর একটা দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে। বিন্দুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করছে না। তাতে সেই দুষ্কৃতিকর্ম চেতনা মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে। সুকৃতিকর্ম সম্পাদনের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রকৃত মানব জীবন আজ সত্যিই কোনঠাসা। কেন এমন হচ্ছে? অজ্ঞানতা বশত কর্মফলকে অবিশ্বাস করার দরুন। সেই অজ্ঞানের কারণে তারা কর্মফল, পরকাল ও কুশলাকুশল জানতে, বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ঘন অন্ধকার রাত্রি যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিকে ব্যর্থ করে দেয় তেমনি অজ্ঞান ইষ্টানিষ্ট বোধ ও সত্যোপলব্ধি করতে দেয় না-কিছুতেই। কাজেই কর্মফল সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই, যারা কর্মফলে অবিশ্বাসী সেইরূপ অজ্ঞ জনেরা দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু অজ্ঞজনের কৃত সেই দুষ্কৃতিকর্মের বিপাক মোটেই সুখের হয় না। নিজের কৃত দুষ্কর্মের ফলে তারা ইহকালে যেমন বিবিধ দুঃখ ভোগ করে তেমনি পরকালে নিরয়গামী হয়। আমার নিকট এসে অনেকে বলে, “ভন্তে আমরা বড়ই দুঃখের

মধ্যে আছি। এই দুঃখ থেকে কবে মুক্ত হতে পারব? কেন দুঃখ পেতে হয় জান? অকুশলকর্মের কারণে দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু তারা তো বুঝতে চাচ্ছে না যে অকুশলকর্মের প্রভাবেই তারা দুঃখ পাচ্ছে অন্যদিকে সেই অকুশলকর্মের বিপাক ভোগ করা শেষ হলে তবেই দুঃখেরও সমাপ্তি ঘটবে, অন্যথায় নয়। তাই বুদ্ধ বলেছেন অমুকের দ্বারাই আমি দুঃখ পাচ্ছি এবং অমুকের দ্বারাই আমি সুখে আছি এসব বলতে নেই। কর্মই সুখ, কর্মই দুঃখ, কর্মই বন্ধু, কর্মই শত্রু, কর্মই জীবের মুক্তি বলে পরিগণিত। নিজের কৃত দুঃকর্মই নিজেকে দুঃখ প্রদান করে আর নিজের কৃত সুকর্মই সুখ প্রদান করে থাকে।

বনভক্তে বলেন-আমি সুখ-দুঃখ উভয়ের উর্ধ্বে উঠে নির্বাণ লাভের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকি। কারণ নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই দুঃখের চির অবসান হয় না। সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করতঃ দেহধারণ করলে নিত্য একটা না একটা দুঃখ ভোগ করতেই হয়। বলা যায়, পুনর্জন্ম এবং দেহধারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ দুঃখেরও উদয় হয়। যেমন জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈর্ষিত বস্তুর অলাভ দুঃখ। অন্যদিকে এ' দেহধারণের ফলে অপরের কর্তৃক লাঞ্চিত-অপমানিত, নির্যাতন-নিপীড়ন, বন্ধন-খুনের শিকার হওয়া সহ বিভিন্ন ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। তাই দেহই সর্ববিধ দুঃখ এবং ভয়ের কারণ। দুঃখদায়ক এ' দেহধারণ না করলে দুঃখ, ভয় কোথা হতে উৎপন্ন হবে? কিন্তু জ্ঞানচক্ষুর অভাবে এ'সত্যটুকু সকলের নিকট প্রকটিত হয় না। বুদ্ধ বলেছেন জ্ঞান না থাকলে মিথ্যায় আকৃষ্ট হওত ইহ-পর উভয় লোকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। আর জ্ঞান থাকলে নিজেকে মিথ্যার উর্ধ্বে তুলে সম্যকপথে পরিচালিত করা সম্ভব। এভাবে জ্ঞান এবং সত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলে কি ইহলোক কি পরলোক উভয়লোকেই সুখ লাভ হয়ে থাকে।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দায়ক দায়িকাগণ যতই ভিক্ষু সঙ্ঘের চারি প্রত্যয়ের সুব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হবে ততই তাদের পুণ্য সঞ্চিত হয়ে থাকে। এতে দায়ক-দায়িকাদের নির্বাণ লাভের হেতুও উৎপন্ন হয়। শ্রীলংকা, বার্মা (মায়ানমার) প্রতিক্রম দেশের দায়ক দায়িকাগণ নাবি: সেই বিষয়ে অতি সচেতন। তারা মনের মধ্যে কোন প্রকার কার্পণ্যভাব না রেখে ভিক্ষুসঙ্ঘ তথা বুদ্ধ শাসনের হিতের জন্য সব ব্যবস্থা সাধনে তৎপর থাকে। কিন্তু এখানে তো সেরূপ বুদ্ধশাসন হিতৈষী দায়ক-দায়িকার অভাব রয়েছে। বর্তমানে অবশ্য আগের তুলনায় কিছুটা হলেও পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য আগের দিনে চাকমারা কিন্তু সহজে এই ত্যাগের দিকে এগিয়ে আসতে চাইত না। আমার সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছে

তারা। আমি (বনভন্তে) না হলে অন্য কারোর পক্ষে এই পরিবর্তন আনার সাধ্য ছিল না। অবশ্য একাজে আমাকেও কঠোর ত্যাগ তিতিকার পরিচয় দিতে হয়েছে। প্রথম দিকে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করত না তেমন কেউই। পরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে পরিক্ষীত সত্যরূপে প্রমাণিত হলে তবেই এই পরিবর্তন আসতে শুরু হয় দায়িকাদের হৃদয়ে। বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেকেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে ও আসতেছে। আমি কারোর কাছে যাইনি এবং কাহাকে আমন্ত্রণও করিনি। তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আমার নিকট আসে-নানা বিষয়ে পরামর্শ লাভের তাগিদে। আমি বলছি, তোমরা যদি জ্ঞান ও কুশলের সহিত অবস্থান কর তাহলে তোমাদেরকে সহজে দুঃখ, দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু অজ্ঞান, অকুশলের সাথে অবস্থান করলে পদে পদে দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কারণ অজ্ঞান অকুশলকর্মে নিয়োজিত হলে সৎদেবতাগণও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, ক্রোধ প্রকাশ করে থাকে। তোমরা সবাই বুদ্ধের উপদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর, মেনে চল; সৎদেবতাগণ অবশ্যই তোমাদেরকে রক্ষা করবে। অজ্ঞানের সহিত অবস্থান না করে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম সম্পাদন কর তাহলে সুখ লাভে সমর্থ হবেই। মনে রাখবে পাণী, অধার্মিক, অজ্ঞান, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কখনো সুখ লাভ হয় না। তারা আত্ম উন্নতি সাধনেও কিছুতেই সফল কাম হতে পারে না। বরং বিবিধ দুঃখকষ্ট ও করুণ আত্মনাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে তাদের জীবন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বুদ্ধের উক্তি দিয়ে বলেন-যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ, চিত্তসংযম ও শমথ-বিদর্শন সম্বন্ধে দক্ষ তাদের কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়। আর যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ, ইহলোক সম্বন্ধে অদক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে অদক্ষ, চিত্ত সংযম ও শমথ বিদর্শন সম্বন্ধে অদক্ষ, তাদের কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে দীর্ঘকাল ব্যাপী দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমি তথাগত মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ, চিত্তসংযম ও শমথ-বিদর্শন সম্বন্ধে দক্ষ কাজেই তথাগতের কথিত উপদেশ যারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, মেনে চলে তাদের দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হবে। তোমরা প্রশ্ন করতে পার মারভুবন কাকে বলে? কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এই ত্রিলোকের মধ্যে ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে

সত্ত্বগণকে অধীন করে রাখা হয়, যাতে তারা মাররাজ্যের বাইরে যেতে না পারে, তাকে মারভুবন বলে। অমারভুবন অর্থ স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ, মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং নির্বাণ এই নবলোকোত্তর ধর্মকে অমারভুবন বলা হয়। সেখানে মারের প্রভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মারভুবন-অমারভুবন, মৃত্যুরাজ্য-অমৃত্যুরাজ্য একার্থবোধক শব্দ। মারভুবন হল মৃত্যুরাজ্য আর অমারভুবন হল অমৃত্যুরাজ্য। মারভুবনে থাকলে বার বার মৃত্যুবরণ করতে হয় বলে তা মৃত্যুরাজ্য। অমারভুবন মৃত্যু নামক বিষয়টির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে অর্থাৎ মৃত্যু বলে কিছুই নেই, তাই অমৃত্যুরাজ্য বলে কথিত। যারা উল্লেখিত বিষয়ে অদক্ষ তারা কিছুতেই অপরজনকে সঠিক পথ নির্দেশ করে দিতে সমর্থ হয়না। এমন কি তারা নিজেরাও ভুল পথের পথিক এবং সর্বদা দুঃখ জর্জরিত হৃদয়ে অবস্থান করে। বুদ্ধের মতে মিথ্যায় আকৃষ্ট চিন্তের সহিত অবস্থান করলে কখনো সুখ লাভ হয় না। আমি তো দেখতেছি তোমাদের সবার চিন্তা মিথ্যায় পরিপূর্ণ। সেই মিথ্যার দরুন এ'দেহকে 'আমি একজন মানব', 'সে একজন পুরুষ', 'সে একজন মহিলা', 'সে একজন যুবক', 'সে একজন যুবতী' রূপে দর্শন করতেছ। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়, প্রেম, আসক্তি উৎপন্ন হয়ে বর্ণনাভীত দুঃখের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞান যোগে দর্শন করলে এইটি দেহও নহে, পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে, যুবকও নহে, যুবতীও নহে, ইহা চুল, লোম, নখ, দাঁত, চামড়া, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, যকৃত, শ্লেষ্মা, পুঁষ, ফুস্ফুস, হৃদপিণ্ড, কফ, থুথু, লাল, রক্ত, অশ্রু, সিক্তি, মল, মুত্র ইত্যাদি ঘণ্য অশুচি বস্তুর সমষ্টি মাত্র। অন্যদিকে এই দেহের উৎপত্তি সত্যিই ঘণাকর। পিতার ঘৃণিত পুঁষজাতীয় শুক্র ও মাতার শোণিত রক্তকণা মিশ্রিত হয়ে মাতার গর্ভাশয়ে এক পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। এই পিণ্ডের মধ্য দিয়েই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী এ' দেহের জন্ম। ইহা গলিত পঁচা দুর্গন্ধ খাদ্যরসের দ্বারা বর্ধিত হয়। অন্যদিকে শ্বাস বায়ু বুদ্ধের সাথে সাথে বহু আদরনীয় নন্দিত, আকাজিকত, একান্ত প্রিয় এ' দেহের পঁচন শুরু হয়। ইহাই অশুচি দেহের পরিণাম। আবার, তোমরা যে দেহকে আমার, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, আমার ভগ্নি, আমার পুত্রবধু, আমার জামাই, আমার নাতি, আমার নাতনি, আমার বন্ধু, আমার আত্মীয় স্বজন বলে দেখ, দাবি কর তাও ভ্রমাত্মক মাত্র। কারণ আজকে যাকে আমার, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী বলে দাবি করা হচ্ছে আগামীকাল তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে কি আর স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যারূপে থাকবে? সে দাবিসমূহ মিথ্যায় পরিণত হয়ে যাবে নয় কি? কাজেই দেহের ওপর "আমি" আমার দাবি করার স্বার্থকতা কোথায়? সবই পাগলের প্রলাপ সার হয়ে যায়। এইভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করতঃ তোমরা নিজের ও পরের দেহের প্রতি মমতা বোধ, প্রিয়, প্রেম

ভালোবাসা ত্যাগ করে প্রকৃত সুখ লাভ কর। তখন দেখবে বহু পাপকর্মও দুঃখ হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হবে।

গৃহী জীবন বড়োই বিপদ সঙ্কুল। কারণ গৃহী জীবন-যাপনে প্রতিটি পদে পদে অকুশলকর্মে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। এখানে সংসঙ্গী জুটো যেমন কষ্টকর তেমনি সংকর্ম সম্পাদনের সুযোগও খুব বেশি হয় না। তবুও তোমরা যথাসম্ভব শীল প্রজ্ঞার সহিত নিজেকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট থাকবে। শীল প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হলে সেই বিপদ হতে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে-অন্যথায় নয়। একবার এক দম্পতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল-ভক্ত এ জীবনের স্বামী-স্ত্রী পরজন্মেও স্বামী-স্ত্রী হতে আকাঙ্ক্ষা করলে, হওয়া সম্ভব কি? আমি বললাম হ্যাঁ, ইহজন্মের স্বামী-স্ত্রী পরজন্মেও উভয় উভয়কে পেতে আকাঙ্ক্ষা করলে তা' সম্ভব হয়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরামর্শক্রমে মিলে-মিশে শীল পালন করতে হবে, দানাদি কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুইজনকেই ধর্মপরায়ণ শীলবান, প্রজ্ঞাবান হতে হবে। এবং পরস্পরে সহ্যশীল, প্রিয়ভাষী, আস্থাবান ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখতে হবে, কায়মনোবাক্য আঘাত করা হতে বিরত থাকতে হবে। শ্রদ্ধায়, দানে, শীলে, প্রজ্ঞায়, সংযমে সমভাব সম্পন্ন দম্পতির এ জীবনের মত পরজীবনেও পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে লাভ করে পরম সুখে থাকে। মনে রাখবে শীলসম্পন্ন দম্পতির পরজন্মেও একে অপরকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করলে মৃত্যুর পর কর্মানুসারে স্বর্গে অথবা ধনী, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করতঃ আবার মিলিত হয়ে থাকে। বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে অনেক উচ্চবংশীয় মহা ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস ছিল। এবং তারা প্রায় সকলেই ছিলেন বুদ্ধের অনুগামী গৃহীশিষ্য। ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা কালে সেসব ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে দেখায়ে দিয়ে বলতেন দেখ এই ব্যক্তির অতীত জন্মে এরূপ দানশীলাদি প্রতিপালন করতঃ বর্তমানে এই মহাধনের অধিকারী হয়েছে। এভাবে ভগবান বুদ্ধ দানশীলাদি কুশলকর্মের প্রত্যক্ষ সুফল দেখায়ে অন্যদেরকেও দানশীলাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতেন। আর জনসাধারণও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে কুশলকর্ম সম্পাদন করত। অকুশল, পাপকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকত। চাকমা সমাজেও যদি সেরূপ প্রভূত সম্পতি যেমন আশি, নব্বই কোটি অর্থের ছড়াছড়ি, বহুতলা বিল্ডিং, এয়ার কন্ডিশন, মূল্যবান গাড়ী, পোষাক পরিচ্ছেদ, অলংকারাদিসহ অফুরন্ত বিত্ত-সম্পদশালী উপরত্ন ধার্মিক পরিবার থাকতো তাহলে তাদেরকে দর্শন করে অন্যজনেরাও ধর্মের প্রতি বিশ্বাসবান আস্থাশীল হতো। সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদনে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ পেত। কিন্তু বর্তমানে তো সেরূপ দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও

তোমাদেরকে সর্বদা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত অবস্থান করতে হবে। মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকলে অজ্ঞান, পাপচেতনা তোমাদেরকে গ্রাস করতে পারবে না। যারা নিম্ন আকাঙ্ক্ষার সহিত অবস্থান করে তাদের দ্বারাই পাপকর্ম সম্পাদিত হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষীগণ কিছুতেই পাপকর্ম সম্পাদন করে না। তোমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওত দান শীলাদি কুশলে নিয়োজিত থাক তাহলে মৃত্যুর পর প্রভূত অর্থ-বিস্ত ও ক্ষমতাশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তোমাদের পরিবারের সকলে বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনেরাও হবে উচ্চশিক্ষিত, সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। গাড়ী-বাড়ী, অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান, যশ খ্যাতি দ্বারা অভুলনীয় লৌকিক সুখের অধিকারী হবেই। তখন আর তোমাদেরকে কোন প্রকার অভাব-অনটন, অবহেলায় শিকার হতে হবে না-বর্তমানের মতন।

পূজ্য ভগ্নে আরো বলেন-নির্বাণ লাভের চারটি সোপানের মধ্যে স্রোতাপত্তি হল প্রথম সোপান। এ'স্রোতাপত্তি সোপানে উত্তীর্ণ হলে আর চারি অপায় দুঃখ ভোগ করতে হয় না। স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের সঙ্গে সঙ্গে চারি অপায় দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। স্রোতাপত্তি কি? সৎপুরুষের সাহচর্য, সন্ধর্ম শ্রবণ, জ্ঞান যোগে চিন্তা, সত্যধর্ম অনুশীলন এ' চারি অঙ্গ পরিপূর্ণ হলে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ হয়ে থাকে। তোমরা অসহনীয় অপায় দুঃখ হতে মুক্তি লাভের তরে স্রোতাপত্তি মার্গে উন্নীত হও। স্রোতাপত্তি লাভ করলে সর্বোচ্চ সাতবার জন্মগ্রহণ করার পর নির্বাণ প্রাপ্ত হবে। অন্যদিকে তোমরা আজকে স্রোতাপত্তি মার্গফলে উন্নীত হবার পর যদি আগামীকাল বা আগামী পরশুও মৃত্যুবরণ কর আমি সেটাকে যথার্থই মনে করব। কারণ দরিদ্রগণ স্রোতাপত্তি লাভ করে সসম্মানে বেঁচে থাকা সুকঠিন কাজ। তাই মৃত্যুর পর স্বনামধন্য ধনী-মানী, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ এবং প্রতিরূপ দেশে তাঁদের পুনঃ জন্ম হয়। বর্তমান এ' দুরাবস্থা, দুর্দিনের পীড়ণ থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ ও প্রতিরূপ দেশে অবস্থান করার সুযোগ হওয়া নিঃসন্দেহে অনেক বড়ো, উৎকৃষ্ট প্রাপ্তি নহে কি? কাজেই এইরূপ মৃত্যুবরণে কোন ক্ষতি নেই। বরং সৎভাবে অবস্থান করার, সৎসঙ্গী জুটা সুযোগ হয়ে অভাবনীয় সুখের মধ্যে জীবন অতিবাহিত হবে। তখন মনচিন্ত সর্বদা লৌকিক ও লোকোত্তর সুখের সাগরে নিমগ্ন থাকবে। কোন প্রকার দুঃখের স্পর্শে ব্যথিত হতে হবে না মনচিন্তকে। আবার, মনুষ্যকুল স্রোতাপত্তি ও দেবকুল স্রোতাপত্তি ভেদে স্রোতাপত্তি দুই ভাগে বিভক্ত। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভের পর যারা মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করতঃ মনুষ্য সুখ লাভের ইচ্ছুক তাদেরকে মনুষ্যকুল স্রোতাপত্তি এবং স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভের পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করতঃ স্বর্গসুখ লাভের ইচ্ছুক হয় তাদেরকে দেবকুল স্রোতাপত্তি বলে। যেমন ধর ছয়জন লোক স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করেছে তন্মধ্যে তিন জনের ইচ্ছা হল

তারা পরবর্তী জন্মসমূহ মনুষ্যকূলে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। মনুষ্যকূলে জন্ম নিয়ে মনুষ্য সুখ ভোগ করাকে তারা ভালো মনে করতেছে। এরা হল মনুষ্যকূল স্রোতাপত্তি। অপর তিন জনের ইচ্ছা হল তারা পরবর্তী জন্মসমূহ স্বর্গে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। দেবলোকে জন্ম নিয়ে দিব্যসুখ ভোগ করাকে তারা ভালো মনে করতেছে। এরা হল দেবকূল স্রোতাপত্তি।

জ্ঞানেকা উপাসিকা আমাকে বলেছিল, “ভগ্নে আমি জন্মে জন্মে পরমা সুন্দরী হতে চাই, এটা আমার একান্ত প্রার্থনা। জন্মে জন্মে পরমা সুন্দরী হতে পারলেই হবে, আমার আর কিছুই লাগবে না।” আমি তাকে বলেছিলাম শুধুমাত্র সুন্দরী হলে তো চলবে না। কারণ সুন্দরী হয়েও যদি তুমি গরিব, নীচকূলে জন্মগ্রহণ কর তখন কি আর সুখী হতে পারবে? পারবে না। কাজেই লৌকিক সুখ ভোগ করার উপায় ধনীও হতে হবে। জন্মে জন্মে অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হতে চাইলে তুমি প্রত্যেক প্রাণীকে সমভাবে দয়া করবে। কোন প্রাণীকে টিল-দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা আঘাত করবে না এবং কোন অবস্থাতে রাগ করবে না। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়াশীল, টিল-দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার বিরত এবং রাগহীন শান্তভাবে অবস্থান করতে পারলে জন্মে জন্মে অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া যায়। মনে রাখবে, যারা সর্বদা দয়া-মায়ারহীন অপরকে আঘাত করতঃ কষ্ট প্রদান করে আর ঔদ্ধত্য স্বভাবের বা রাগী হয় তারা জন্মে জন্মে কুৎসিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। বলা বাহুল্য যে, সৌন্দর্য প্রার্থনার মধ্যেও কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। বিশাখা কি রকম সৌন্দর্যের প্রার্থনা করত জান? আমার কেশরাশি যেন আশুষ্ক লম্বিত হয়, একখানা কেশও পক্ক যেন না হয়, যৌবনে বৃদ্ধকালে, সর্বাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণই যেন থাকে। একটি দস্তাও যেন পড়ে না যায়, সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী যেন হই, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিতে যেন কোন প্রকার শৈথিল্যতা না আসে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন বার্ষিক্যে ছবি ফুটে না উঠে। সর্বদা যৌবনের লাবণ্যময় রূপ যেন অটুট থাকে, মেরুদণ্ড যেন বক্র হয়ে না যায়। কোন কালেও অল্লভোগ সম্পদশালী এবং অল্লায়ু হয়ে জন্মাতে যেন না হয়, জন্মে জন্মে যেন মহাধনী হয়ে দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকি। শাস্ত্রে দেখা যায়, বিশাখা প্রত্যেক জন্মেই সেসব গুণের অধিকারী হওত অতুলনীয় সুন্দরীরূপে জন্মগ্রহণ করত। কথিত আছে বিশাখা জন্মে জন্মে নারীকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কখনো পুরুষ হয়ে জন্মায়নি। কারণ নারীকূলে জন্মগ্রহণ করতেই পছন্দ করত। আচ্ছা, তোমরাও কি পরজন্মে সেইরূপ ধনশালী পরিবার ও সৌন্দর্যের অধিকারী হতে চাও? তাহলে শীল পালন কর, শীলবান, প্রজ্ঞাবান হয়ে অবস্থান কর। শীল, প্রজ্ঞার দ্বারা তা’ লাভ করতে পারবে-সন্দেহ নেই। এগুলো লোকোত্তর সুখ না হলেও বর্তমানের এই দুঃখময় জীবন হতে তা অনেক

শ্রেষ্ঠ এবং উত্তমই হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা শীলবান প্রজ্ঞাবান হতে সচেষ্ট থাক। শীল, প্রজ্ঞা দ্বারা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ লাভ হয়ে থাকে। কখনো পরিহানি হয় না। আজকের এই অনুষ্ঠান হল দানযজ্ঞ, শীল যজ্ঞ, ত্রিশরণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এ দিনটিতে তোমরা অকুশলকর্ম হতে নিজকে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনের জন্য এখানে এসেছ নয় কি? লোভ পরিত্যাগই দান। তোমরা যে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতেছ এদানের ফলে তোমাদের পরজন্মে আর অল্পের অভাব থাকবে না। তোমরা মহাভোগ সম্পদশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এবং জন্মে জন্মে খাদ্য ভোজ্যের অভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে না। বর্তমানে যে সকল নারীরা ভিক্ষুসঙ্ঘকে খাদ্য ভোজ্য রন্ধন করে দিচ্ছে তাদেরকে আর পরজন্মে রন্ধনশালায় ঢুকতে হবে না। দাস-দাসীরাই রন্ধন করে খাওয়াবে। যারা ভিক্ষুসঙ্ঘের স্নান জল তুলে দিচ্ছে তাদের পরজন্মে আর ঘাটে গিয়ে গোসল করতে হবে না। চীবর দানের ফলে বস্ত্রের অভাব থাকবে না। সর্বদা মনোজ্ঞ বস্ত্রের অধিকারী হয়ে থাকবে। ঘেষ পরিত্যাগই শীল। হিংসুক ব্যক্তি শীল প্রতিপালন করতে পারে না। শীল প্রতিপালনের দ্বারা ঘেষ প্রবৃত্তিকে চিত্ত থেকে মূলোচ্ছেদ সাধন করতে হয়। শীলবান ব্যক্তি জন্মে জন্মে মহা সম্ভ্রান্তকুলে জন্ম নিয়ে বিপুল সুখের অধিকারী হয়। শীল প্রতিপালন করতে দেবতাগণও সন্তুষ্টচিত্তে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা এবং রক্ষা করে থাকে। এ জগতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই উত্তম। তারা কখনো নিজকে পাপকর্মে নিযুক্ত রাখে না। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই সর্বদিকে জয়যুক্ত হয়ে থাকে। শীল, প্রজ্ঞা দ্বারা নৈর্বাণিক সুখের অধিকারী হওয়া যায়। অতএব, সুখের লাভের জন্য তোমরা সকলেই শীলবান, প্রজ্ঞাবান হয়ে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সঙ্কর্ম লাভে সচেষ্টি থাক

অদ্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০০১ সাল, রোজ শুক্রবার রাজবন বিহারে আয়োজিত সার্বজনীন সীবলী পূজা ও অন্যান্য দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে দেশনা প্রদানকালে শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভক্তে) বলেন-বৌদ্ধধর্মের মত জ্ঞানগম্ভীর ধর্মকে বুঝতে সমর্থ সেইরূপ ভিক্ষুসম্ম ও উপাসক-উপাসিকা এই বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে কি? তা' জানা দরকার। কিন্তু বর্তমানে ভিক্ষুরা সেসব কিছু না জেনে আন্দাজে দেশনা করে থাকে। ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা প্রদান করার আগে সমবেত শ্রোতাদের নিকট অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় হয়েছে কিনা তা' জেনে নিয়ে তবেই সেই অনুসারে দেশনা করা শুরু করতেন। অন্তর্দৃষ্টিভাব সম্পন্ন শ্রোতাদেরকে ধর্মদেশনা করা হলে তারা শ্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ লাভ করে থাকে। অন্তর্দৃষ্টিভাব শব্দের অর্থ কি জ্ঞান? নিজকে বুঝার ক্ষমতা, নিজকে দর্শন। তোমাদের চিন্তের মধ্যে যদি অন্তর্দৃষ্টিভাব উৎপন্ন হয় তাহলে তোমরা নিজকে নিজে বুঝতে পারবে, নিজকে নিজে দর্শন করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হল, তোমরা নিজকে বুঝতে পেরেছ কি এবং নিজকে দর্শন অর্থাৎ আমি-আমার-আমিত্ব ধারণাসমূহ ভ্রান্তমত ছাড়া কিছুই নয়, এভাবে দর্শন করতে পেরেছ কি? নাকি নিজকে বুঝতে, দর্শন করতে চেষ্টা না করে অপরকে বুঝতে, দর্শন করতে চেষ্টায় রত রয়েছে? বুদ্ধের উপদেশ হল, অপরজনকে বুঝতে চেষ্টা না করে নিজকে নিজেই বুঝতে চেষ্টায় থাকা এবং অপরজনকে দর্শনের চেষ্টা না করে আপনাকে দর্শন করার সচেষ্টি থাকা। এইভাবে যারা নিজকে বুঝতে পেরেছে তারা বৌদ্ধধর্ম (এ' দেশনা) হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। যারা নিজকে যথাযথভাবে দর্শন করতে সক্ষম কেবলমাত্র তারাই বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হয়। ভগবান বুদ্ধ সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিভাব সম্পন্ন পুঙ্খলদিগকে উপলক্ষ্য করে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ভেদে ধর্মদেশনা করতেন আর তারাও সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতো। কারণ তারা বুঝতে সমর্থ হতো যে এই স্কন্ধের দ্বারা কতভাবেই না দুঃখ পেতে হচ্ছে। রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কোনটাই আপন নহে। রূপ মিথ্যা, বেদনা মিথ্যা, সংজ্ঞা মিথ্যা, সংস্কার মিথ্যা, বিজ্ঞান মিথ্যা। অন্যদিকে এই পঞ্চস্কন্ধকে স্কন্ধ মার বলা হয়। যারা মারের বশীভূত হয়ে পঞ্চস্কন্ধ সুখ ভোগে রত থাকে তারা বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যারা পঞ্চস্কন্ধকে সুখ ভোগ করা হতে বিরত এবং চিন্তের মধ্যে কোন প্রকার ভোগাকাজাকে স্থান দেয় না তারাই বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বৌদ্ধধর্ম ভোগ বিরোধী ধর্ম। এ'ধর্মের মতে ভোগ করা দুঃখ এবং

সুখ করাও দুঃখ। বর্তমানে সুখ করলে তৎমুহুর্তে দুঃখ পেতে হয়, আবার ভোগ করলে সর্বদা অতৃপ্তির দুঃখ লেগেই থাকে, কখনো মনের মধ্যে পরিতৃপ্তির সুখ অনুভব হয় না। আমি গৃহী অবস্থায় থাকাকালীন সময়েও অনেক বৌদ্ধধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলাম। আর তখন থেকেই বুদ্ধের সেই ত্যাগময় শিক্ষা, অনুশাসনের সহিত পরিচিত এবং তা মেনে চলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলাম। তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর হতে আমি কখনো সুখ ভোগে রত হইনি। আর সুখ ভোগ করা হতে বিরত ছিলাম বলেই আমি বৌদ্ধধর্মকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছি। বর্তমানে আমার জ্ঞাননেত্রে ধরা পড়ে কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এই ত্রিলোকের সবকিছুই মিথ্যা এবং দুঃখই সার। তজ্জন্য আমি নির্বাণ ব্যতীত কোন কিছুই বিশ্বাস করি না। কেবলমাত্র নির্বাণই সত্য, সার এবং পরম সুখ।

আমার বহু বছরের গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, ‘যারা বুদ্ধের উপদেশ বিশ্বাস করবে, মেনে চলবে তাদের সুখ লাভ অবশ্যস্বাভাবিক-কখনো কখনো সময় সাপেক্ষ হলেও। বুদ্ধের উপদেশ ব্যতীত প্রকৃত সুখ অর্জিত হয় না’। আমি নিজেই বুদ্ধের উপদেশ অনুশাসন মেনে চলে সেই সুখের অধিকারী হয়েছি। এটা কল্পনাজাত কথা নয়, স্বয়ং প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা। তিনি উপাসক-উপাসিকাদের লক্ষ্য করে বলেন কিন্তু তোমরা তো বুদ্ধের উপদেশে বিশ্বাস রাখতে পারছ না; মেনে চলতে গিয়ে বারবার পিছপা হয়ে যাচ্ছ। কাজেই দুঃখকে অতিক্রম করে তোমরা সুখের ভাগী হতে পারছ না। মনুষ্য-দেবতাগণের মধ্যে বুদ্ধের পক্ষপাতি ও মারের পক্ষপাতি রয়েছে। যারা বুদ্ধের পক্ষপাতি তারা বুদ্ধের উপদেশসমূহ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, মেনে চলে এবং সেই সবার মধ্যে সুখ খোঁজে পায়। যারা মারের পক্ষপাতি তারা মারের নির্দেশিত পথে অর্থাৎ অকুশল-অন্যায় মতো কুপথে ধাবিত হয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, মেনে চলে এবং সেই অপশক্তি মাধ্যমে আনন্দ পায়। এখন কথা হচ্ছে, যারা বুদ্ধের পক্ষপাতি আমি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হবো। তাদেরকে বুঝাতে, উপদেশ, অনুশাসন প্রদান করতে আমার এ’ ধর্মদেশনা। আর যারা মারের পক্ষপাতি তাদেরকে আমি বুঝাতে পারবো না, তারা আমার ধর্মদেশনা গুনতে চাইবে না, বিশ্বাস করবে না, মেনে চলবে না। শ্রদ্ধেয় বনভক্তে সমবেত দায়ক-দায়িকাকে প্রশ্ন করে বলেন আচ্ছা, তোমরা বুদ্ধের পক্ষপাতি হবে, নাকি মারের পক্ষপাতি হবে? যদি মারের পক্ষপাতি হও তাহলে আমি তোমাদেরকে কিছুই করতে পারবো না। কারণ মারের পক্ষপাতিরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না, শ্রবণ করবে না, মেনে চলবে না। তারা সব সময় অকুশলকর্মে নিয়োজিত থাকবে। প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি-চাঁদাবাজি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মদ্যপানাদি এবং হিংসা-হিংসী, রেষাধা, মারামারি,

কাটাকাটির মত দুষ্কৃতিকর্মে রত থাকাই তাদের কাজ। বর্তমানের অধিকাংশ মানুষই মারের পক্ষপাতি। মারকে শৃষ্টান, ইসলামধর্মের মতে শয়তান, হিন্দুধর্মের মতে শনি বা কন্দর্প বলা হয়। মনুষ্য বা সত্ত্বগণকে অনর্থ নিয়োজিত করে দুঃখ কষ্টের আবর্তে ফেলে মারে বলে বুদ্ধ কর্তৃক মার নামে অভিহিত। সত্ত্বদেরকে মেরে ফেলাটা মৃত্যু মারেরই কাজ। মনুষ্যাদিগকে অসৎকর্মে নিয়োজিত করতঃ বিপথগামী করা মারের প্রধান কাজ। তজ্জন্য তোমাদেরকে মারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। তোমরা মারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলে দাও ‘আমরা আজ হতে আর তোমার প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হবো না’। যাবতীয় অকুশলকর্ম হতে নিজকে বিরত রেখে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করো। স্মৃতির দ্বারা চিন্তকে সর্বদা অকুশল প্রবৃত্তি হতে রক্ষা কর। এভাবে কুশলে প্রতিষ্ঠিত, শীলাচারণ, সত্যদ্রষ্টা ও সংযমী হতে পারলে মার পরাভূত হয়ে যায়। স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন সতিপট্ঠান সূত্রে বর্ণিত চারি স্মৃতিপ্রস্থান শিক্ষা করা।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-সতিপট্ঠান সূত্র বইটি আমি বয়স থাকতে বহু প্রচেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। বর্তমানে বৃদ্ধবয়সে এসে তবে এই সতিপট্ঠান বইটি তোমরা আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে ছাপিয়ে দিয়েছ। এখন সতিপট্ঠান সূত্র অট্ঠকথা বইটিও ছাপিয়ে দিতে চেষ্টা কর। সূত্র পিটকে যতগুলো সূত্র রয়েছে তৎমধ্যে এই সতিপট্ঠান সূত্রটিকে আমি উত্তমই বলি। কারণ সতিপট্ঠান সূত্রটিতে আমরা গোটা ত্রিপিটকের সারাংশ লাভ করে থাকি। আবার, এই সূত্রে বৌদ্ধ ভাবনা প্রণালীসমূহ যেভাবে পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অন্য কোন সূত্রে এরূপ দৃষ্ট হয় না। শীলংকা, ব্রহ্মা (মায়ানমার), থাইল্যান্ডের ভিক্সুসংঘ, উপাসক-উপাসিকা প্রত্যেকে নাকি এই সূত্রটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পূজা করতঃ সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখে। এবং প্রতি পনের দিন পরপর পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে একজনে শুদ্ধ উচ্চারণ ও মধুর স্বরে পাঠ করতঃ অপরজনেরা সশ্রদ্ধাচিন্তে হাত জোড়ে তা শ্রবণ করে থাকে। মনে রাখবে এই সতিপট্ঠান সূত্রটি পঠন-পাঠন, দেশন-শ্রবণ, মুখস্থ, আবৃত্তি করলে নির্বাণ লাভে সক্ষম না হলেও সুগতি স্বর্গ লাভ সুনিশ্চিত হয়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে এই সূত্রটি শুদ্ধ উচ্চারণ ও মধুর স্বরে আবৃত্তি করে শুনানো হলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গ লাভে সমর্থ হবেই। সূত্রে বর্ণিত ভাবনা প্রণালীসমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করলে নির্বাণ লাভ হয়। সতিপট্ঠান সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আলোচনা এই সতিপট্ঠান সূত্র অট্ঠকথা। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, আমার সুদীর্ঘ অরণ্যবাস জীবনে আচরিত সমাধি পদ্ধতি এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে এ গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহ। তবে গভীর

অর্থপূর্ণ এই সতিপট্ঠান সূত্রটি সকলের নিকট দেশনা করতে নেই। সূত্রটির প্রতি যাদের আগ্রহ নেই, শ্রদ্ধাশূন্য এবং সূত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে যারা অক্ষম, উন্নত মানসিক ধীশক্তিহীন তাদেরকে সতিপট্ঠান সূত্র সম্পর্কিত উপদেশ প্রদান করা সমুচিত নয়। মনে রাখতে হবে, সূত্রটির প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল, আগ্রহভরে শ্রবণ করতে ইচ্ছুক এবং মর্মার্থ অনুধাবনে চেষ্টাশীল একমাত্র তাদেরকে এই সতিপট্ঠান সূত্রটি দেশনা করা উচিত। বলা বাহুল্য যারা ভাবনা অনুশীলন করা হতে বিরত তারা সতিপট্ঠান সূত্রের মর্মার্থ কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবে না। তিনি সতিপট্ঠান সূত্রে বর্ণিত দুঃখ সমুদয় সত্যে অন্তর্গত “চক্ষুং লোকে পিয়রূপং সাতরূপং এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি, এথ নিবিসমানা নিবিসতি—এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ জগতে চক্ষুর দ্বারা প্রিয়রূপ (মনোজ্ঞরূপ) ও সাতরূপ (যে রূপ দর্শনে চিত্তের মধ্যে হর্ষভাব উদয় হয়) অর্থাৎ সুখদায়ক রূপ দর্শন হয়, এতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন তৃষ্ণা সর্বদা নিবিষ্ট হয়েই থাকে। আর সেই তৃষ্ণা দ্বারা কোথাও শান্তি হয় না। গুরু হয় নানা রকমের অশান্তি, হানাহানি রেষারেষি ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে সত্ত্বগণ সেই তৃষিত বিষয় নিজের হাতের মুঠোর আনতে গিয়েই বর্ণনাভীত দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে থাকে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ। সহজে মনুষ্যকূলে জন্মলাভ করা যায় না। বহুজন্মের অতি সাধনার (পুণ্যের প্রভাবে) ফলে মনুষ্যকূলে জন্মলাভ হয়। অন্যদিকে এই মানবজন্ম থেকেই সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ বেশি লাভ হয়ে থাকে। মনুষ্যালোক প্রাণিজগতের দুঃখমুক্তির সাধনভূমি। মানবজন্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন জন্ম থেকে এই সাধনা সহজলভ্য হয়ে উঠে না। যেমন আমি, মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করেছি বলে প্রব্রজ্যা লাভ করে এ অবস্থায় উপনীত হয়েছি। মনুষ্যকূলে জন্ম লাভ না হলে কি প্রব্রজিত হওয়া সম্ভব হতো? তোমরাও মানুষ বলেই আজকের এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরেছ। মানুষ না হয়ে পশু-পক্ষী হলে কি তা সম্ভব হতো? কখনো হতো না। কাজেই তোমাদের এখন পরম কর্তব্য হল বুদ্ধের দর্শন ও সদ্ধর্ম লাভে সচেষ্ট থাকা। বুদ্ধের দর্শন লাভ করা কি রকম জান? বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যিনি দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং জ্ঞান দর্শনের ফলে চিত্ত থেকে অজ্ঞানকে বিতাড়িত করে দিয়ে সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে সক্ষম তিনি বুদ্ধের দর্শন লাভ করেছেন বলে জানবে। ধর্ম (সদ্ধর্ম) লাভ কি রকম? যিনি সদ্ধর্ম দর্শন করতে পেরেছেন, সদ্ধর্মের আশ্রয় পেয়েছেন, ফলে তিনি কখনো আর পরধর্ম শ্রবণ করেন না, পরধর্ম আচরণ করেন না, পরধর্মে নিয়োজিত হন না। তজ্জন্য তোমাদেরকে বলছি, তোমরা জ্ঞানের দর্শন করতঃ আর পরধর্ম শ্রবণ করবে না, পরধর্ম

আচরণ করবে না এবং পরধর্মের সহিত অবস্থান করবে না। পরধর্ম আচরণ করলে দুঃখ, পাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এসব আমি স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা জেনেই তোমাদেরকে বলতেছি। কোন পুস্তক পড়ে বা কারোর মুখ থেকে শ্রবণ করে নয়। বলা বাহুল্য, বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্ম লাভে সমর্থ ব্যক্তিকে পরম সৌভাগ্যবান বলে জানবে। চাকমা কথায় একটা প্রবদ আছে—“কবালত্ ঝিগে ফুল ফুত্যা।” সেধক্যা বুদ্ধের সাক্ষাৎ আ সঙ্কর্ম লাভ হলেও তোমা কবালত্ ঝিগে ফুল ফুদিব। অর্থাৎ কপালে সৌভাগ্যের তিলক অংকিত হওয়া। ঠিক তদ্রূপ তোমাদেরও যদি কখনো বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং ধর্ম লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে রকম কপালে সৌভাগ্যের তিলক অংকিত ব্যক্তি বলেই জানব। তোমাদের আর চারি অপায়ে পতন হবার কোন আশংকা থাকবে না। ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় একদিন জৈনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দর্শন করার অভিলাষ ব্যক্ত করে বুদ্ধের একদম কাছে গিয়ে বসল এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুদ্ধকে দর্শন করতে শুরু করে দিল। অনেকক্ষণ পরে বুদ্ধ বললেন কি হে ব্রাহ্মণ দেখা সমাপ্ত হয়েছে কি? নাকি এখনো কিছু বাকী রয়েছে? ব্রাহ্মণ বলল সম্পূর্ণ দেখা হয়ে গেছে, আর বাকী নেই। এবার বুদ্ধ বললেন আচ্ছা ব্রাহ্মণ, বুদ্ধকে কেমন দেখলে? ব্রাহ্মণ বুদ্ধের সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিতে লাগলে বুদ্ধ বলে উঠলেন, ব্রাহ্মণ তুমি তো বুদ্ধকে দেখ নাই। তুমি বুদ্ধের ভৌতিক দেহকে দর্শন করেছ মাত্র কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধকে দর্শন করতে পারনি। বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞান, সেই অনন্ত জ্ঞানকে দর্শন করতে অপারগ হয়ে কেবলমাত্র মিথ্যা অসার দেহকে দর্শন করলে তো বুদ্ধকে দেখা সম্ভব নয়।

বুদ্ধকে দর্শন করতে হলে জ্ঞানকে দর্শন করা চাই। তা না হলে একদম কাছে থেকে বুদ্ধকে দর্শন করা চেষ্টা করলেও বুদ্ধকে দেখা যায় না। বর্তমানে অনেকেই বলে আমার দুর্ভাগ্য; বুদ্ধকে দেখি না। যদি বুদ্ধকে দেখতে পেতাম তাহলে। কিন্তু তা' কি সঠিক? ব্রাহ্মণ তো বুদ্ধের একান্ত নিকটে গিয়েও বুদ্ধকে দর্শন করতে সমর্থ হয়নি। স্বীয় অজ্ঞানতার কারণে ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অসার, মিথ্যা দেহকেই দেখতে চেয়েছিল, প্রকৃত বুদ্ধ বা জ্ঞানকে নয়। কাজেই জ্ঞান না থাকলে বুদ্ধকে দর্শন করা সম্ভব নয়, জ্ঞান থাকলে তবেই বুদ্ধকে দর্শন করা যায়। অজ্ঞানের তমসাবৃত্ত অবস্থায় বুদ্ধকে দর্শন করার চেষ্টা কিছুতেই সফল হয় না। যেমন, অক্ষর জ্ঞানহীন কোন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কি পুস্তক পাঠ করতঃ সেই পুস্তকের সৎ পরামর্শসমূহ গ্রহণ করা সম্ভব হয়? কখনো না। ঠিক তদ্রূপ, বুদ্ধকে দর্শন করতে হলেও জ্ঞান থাকতেই হবে। চিত্তের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকলে তবেই বুদ্ধকে দর্শন করা সম্ভব। তাই তোমরা সর্বদা জ্ঞান লাভে সচেষ্ট থাক। অজ্ঞান দূরীভূত হওত জ্ঞান লাভ হলে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ মিলবে।

তখন আর কোন প্রকার অজ্ঞান জাত দুঃখ-কষ্ট, শোক-পরিতাপ থাকবে না। মনচিৎস্বর্বদা সুখের সাগরেই ভাসতে থাকবে।

তিনি বলেন-বুদ্ধের সময়কালীন কথা। একদিন জেলেদের জালে একটি বিচিত্র মাছ ধরা পড়ল। জেলেরা মাছটি চিনতে অক্ষম হয়ে রাজা প্রসেনজিতের কাছে এনে উপস্থিত করল এবং বলল, দেব! এই মাছটি তো আমরা চিনতে পারছি না। এরূপ মাছ আমরা জীবনে কখনো দেখি নাই। কাজেই মাছটি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। রাজা প্রসেনজিতও চিনতে না পেয়ে কৌতূহল বশে মাছটিকে নিয়ে জেতবনে বুদ্ধকে দেখালেন। বুদ্ধ তদর্শনে রাজাকে মৎস্যের পূর্বজন্মের কাহিনী প্রকাশ করে বললেন-এই মৎস্যটি কশ্যপ বুদ্ধের কপিল নামক মহাপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু ছিল। সে অপরজনকে ধর্ম বিনয় সম্বন্ধে দক্ষতার সহিত নানাভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করলেও নিজে কিছুই আচরণ করত না। বরং পাণ্ডিত্যের অভিমানে সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করত। অন্যদিকে ধর্মাচরণে ছিল সর্বদা অমনোযোগী। সেই সব দোষের ফলে মৃত্যুর পর অশেষ দুর্গতি ভোগ করে এখন তার এই মৎস্য জন্ম লাভ হয়েছে। বুদ্ধ কর্তৃক সেই কাহিনী বলা হলে শ্রোতাবর্গের মধ্যে অনেকে চিন্তে ধর্ম সংবেগ ও ধর্ম জ্ঞান উদয় হওত কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ স্কদাগামী মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই তোমরাও অপরকে উপদেশ দেওয়ার মনোযোগী না হয়ে আগে নিজেকেই উপদেশ প্রদান কর। অপরজনের দোষত্রুটি পর্যবেক্ষণ না করে নিজের দোষত্রুটি সংশোধনে তৎপর থাক। মনে রাখবে নিজে আগে উদ্ধার না হলে অপরকে উদ্ধার করা যায় না। নিজেকে নিজে সংশোধন, পরিশুদ্ধ, দমন আর উদ্ধার করাই হল প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের কাজ। নিজের শুদ্ধি নিজেকেই করতে হবে। অপরজন শুদ্ধ হলে তো নিজে শুদ্ধ হওয়া যায় না। নিজে নিজের চিন্তকে শুদ্ধ না করলে অন্য আরো একজন এসে তো তোমার চিন্তকে শুদ্ধ করে দিতে পারবে না। যেমন তোমার খাদ্য অপরে খেয়ে হজম করলে তো তোমার ক্ষুধা জ্বালা নিবৃত্তি হবে না বা তোমার শরীরে শক্তিবৃদ্ধি হবে না। তদ্রূপ তোমার মুক্তিও অপরে দিতে পারে না। নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে। এবং তা করা উচিত সর্বাত্মেই। নিজের মুক্তি অর্জিত হলে তবেই অপরের চিন্তা করা যথাযথ হয়। বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের আসল শিক্ষা হল লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা হতে চিন্তকে বিমুক্ত রাখা। লোভ, দ্বেষ, মোহ বিরতিই বৌদ্ধধর্ম। লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণাকে চিরতরে নিবৃত্তি সাধন করে পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করাই এ'ধর্মের মূলতত্ত্ব। চিন্তের মধ্যে, লোভ, দ্বেষ, মোহ না থাকলে মার্গফল লাভ হয়ে থাকে। আর তৃষ্ণা না থাকলে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয়। বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ

লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা বিবর্জিত ধর্ম। এখানে লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণার কোন ভেজাল নেই। কারণ দুঃখমুক্তি নির্বাণে কিছুতেই ভেজাল থাকতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে হলে প্রয়োজন অসাধারণ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে এ' ধর্ম আচরণ করা যায় না। বর্তমানে তোমাদেরকে বৌদ্ধধর্ম দেশনা করতে আমার তেমন একটা আত্মহ জ্ঞানায় না। কারণ আমি দেশনা করলেও তোমরা তা' হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হও না। তাই বলছি, তোমরা জ্ঞান অর্জন কর, অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে সচেষ্ট থাক। তাহলে বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে অজ্ঞানের সহিত পরিচালিত হলে ইহকাল-পরকাল উভয়কালে দুঃখ ভোগ করা ছাড়া কিছুই থাকবে না। মনে রাখবে সদ্ধর্মহীন, জ্ঞানহীন অবস্থায় কখনো ইহকাল-পরকাল সুখ লাভ হবে না। তোমরা সর্বদা সদ্ধর্ম আচরণ এবং জ্ঞান লাভে তৎপর থাকবে।

পরিশেষে পূজ্য ভগ্নে বলেন-অতীতের পাপ এবং বর্তমানের পাপ একত্রিত হলে কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। আর অতীতের পুণ্য এবং বর্তমানের পুণ্য একত্রিত হলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয়ে থাকে। আবার, অতীতের পাপ থাকলেও বর্তমানে যদি খুব বেশি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা হয় তাহলে পাপের ফল লঘু হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা তো এসব সুকৃতি-দুষ্কৃতিকর্মের বিপাক বিশ্বাস করতে চাও না। যার ফলে সুকৃতিকর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট না থেকে দুষ্কৃতিকর্মই সম্পাদন করে থাক। কাজেই তোমাদের অসহ্য দুঃখের শিকার হতে হয়। আর দুঃখ পেলেই তবে শোক, হাহতাশ, আত্ননাদ করতে থাক। বুদ্ধ বলেছেন এটা মূর্খ ব্যক্তির স্বভাব। মূর্খ ব্যক্তির প্রথমে খুব আনন্দের সহিত পাপকর্ম করার পর যখন সেই পাপকর্মের বিষময় বিপাক ফলতে শুরু করে তখন তাদের আর দুঃখ, শোক, আত্ননাদ করার সীমা থাকে না। এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে অনুশোচনার তীরে বিদ্ধ হতে থাকে সারাক্ষণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অজ্ঞানতার দরুন মানুষেরা এভাবে দুঃখভোগ করছে। জ্ঞান উদয় হলে বা জ্ঞানী হতে পারলে কিছুতেই সেসব দুঃখভোগ করতে হয় না। চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি বিদ্যমান থাকলে মানুষ পাপকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অজ্ঞানীদের ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সার-অসার, কুশল-অকুশল সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান থাকে না। এক কথায়, তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। আর মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্নরা সত্যের বিপরীতে মিথ্যাপথেই বিচরণ করে থাকে। তারা ইহকাল, পরকাল, কর্মফল, কুশলাকুশল কিছুই বিশ্বাস করে না। সুতরাং তারা কখনো সঠিক পথের সন্ধান পায় না। আমার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় বলছি, এখানকার লোকজন অধিকাংশই মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম, খল। এই চারি ধরণের লোকের আধিক্যতা হেতু এখানে সঠিক বৌদ্ধধর্ম আচরিত হচ্ছে না। তোমরা কিছুতেই মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম,

খেলের সংশ্রবে থাকবে না। বরং তোমরা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, নরোত্তম ও স্নেহপরায়ণ, বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান কর। তাহলে বৌদ্ধধর্ম আচরণে সফল হওত এ'ধর্ম করতেও সমর্থ হবে। এবং তোমরা ইহকাল পরকাল উভয়কালেই পরম সুখের অধিকারী হবে। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করে তোমরা লৌকিক লোকোত্তর সুখ প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টাশীল হও। তাতে বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম শিখরে (নির্বাণ) উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবেই।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞানই সকল প্রকার সুখের মূল

গুড নববর্ষ ১লা বৈশাখ ১৪০৮ বাংলা, ১৪ই এপ্রিল ২০০১ সাল, রোজ শনিবার। রাজবন বিহারে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন সম্মেলন, অষ্ট পরিস্কারদান ও পরিত্রাণ শ্রবণ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় সঙ্ঘ দেশনা প্রদানকালে বলেন—সত্যপ্রিয় নামক জনৈক এক ভিক্ষু বলেছিলেন, দায়কেরা যদি আমাকে উত্তমরূপে চারি প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করে দিতো আমি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতাম না। দায়কেরা আমাকে সে সব ব্যবস্থা করে দেয় নাই বলে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। আচ্ছা, এ কথা কি ঠিক? দায়কদের অভিমত হল সে নিজে ত্যাগের শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে নাই এবং তার যদি পুণ্য পারমী না থাকে তাহলে আমাদেরকে দোষ দিয়ে কি লাভ হবে। স্বীয় কর্মের দোষেই সে ব্যর্থ হয়েছে আর আমাদের দোষ কোথায়। সত্যিই পুণ্যশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অভাব হলে প্রব্রজিত হয়ে অবস্থান করা যায় না। মনে রাখতে হবে, বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানীদের ধর্ম। অজ্ঞানী, হীন কাপুরুষের জন্য বৌদ্ধধর্ম নয়। অজ্ঞানীরা কিছুতেই এ'ধর্মের কূল কিনারা খুঁজে পায় না। বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য দুঃখমুক্তি নির্বাণ শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাই যাদের মনচিন্তে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে তাদের জন্য বৌদ্ধধর্ম সহজসাধ্য ও সুখের। তারা অনায়াসে এ' ধর্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে তথা বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। কিন্তু যাদের চিন্তে জ্ঞান নেই তাদের জন্য বৌদ্ধধর্ম দুর্ভেদ্য ও সুকঠিন। বর্তমান অকুশল কার্যকলাপে রত দায়ক দায়িকাদের উদ্দেশ্যে বনভন্তে বলেন, তোমরা অজ্ঞান বলেই এসব পাপকর্ম সম্পাদন করতেছ। তা না হলে এত অনার্য কাজ করেও কিভাবে নিঃসঙ্কোচে জনসমাজে বিচরণ করতেছ? তোমাদেরকে দেখলেও তো আমার লজ্জা পায়। কিন্তু তোমরা অজ্ঞানী বলেই পাপের প্রতি লজ্জাহীন ও ভয়হীন হয়ে অবস্থান করতেছ। তবুও আমি বলছি, তোমরা পাপকর্ম সম্পাদন করাকে লজ্জা ও ভয়রূপে দর্শন করতে সচেষ্ট থাক এবং অতিসত্বর নিজকে অকুশলকর্ম হতে

বিরত রাখ। নচেৎ এরূপ পাপকর্মে নিয়োজিত থাকলে আগামী দশ/বার বৎসরে তোমাদেরকে আরো অনেক বেশি করুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবেই। মনে রাখবে যারা অকুশলকর্মে লজ্জা ও ভয়শীল তাদের দ্বারা আর অকুশলকর্ম সম্পাদিত হয় না। এবং তারা নিল্গামী না হয়ে দিন দিন উর্ধ্বগামীই হয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, যারা অকুশল পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল তাদের নিকট অকুশল থাকতে পারে না; তারা অরহত্ব পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কারণ অকুশল-পাপে লজ্জী এমন মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। তোমরা যত অকুশল পাপে লজ্জাশীল হবে ততই পাপকর্ম সম্পাদন করা হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। অর্থাৎ তোমাদের নিকট পাপ আসতে পারবে না। ফলে সুখ শান্তি লাভ হবে। অন্যদিকে যত অকুশল পাপে লজ্জাহীন হবে ততই তোমাদেরকে পাপ অকুশলে গ্রাস করে ফেলে অসহ্য দুঃখ প্রদান করবে। তাই বলা হয়েছে “লজ্জা-ভয় দুই এই লোকের পালক। না থাকলে এ’দুই সমান তীর্যগ।” লজ্জা-ভয় না থাকলে কেহ মনুষ্য বলে গণ্য নয়।” “লজ্জা-ভয়হীন মানুষ পশু সমতুল্য। শুকর যেমন মানুষের পরিত্যক্ত মল ভক্ষণে কোনরূপ ঘৃণাবোধ করে না, লজ্জিত হয় না, তেমনি লজ্জা ও ভয় হীন মানুষ অকুশল পাপকর্ম সম্পাদনে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করে না। এতে তাদের না থাকে লোক ভয়, না থাকে নরক ভয়। লজ্জাও ভয়শীল মানুষ কখনো পাপকাজ করতে পারে না। এ’দুই গুণ স্বভাবতই লোককে পাপ থেকে নিবৃত্ত করে। এমন মানুষ সর্বদা পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করে। পাপকর্মের প্রতি লজ্জায় এবং পাপের পরিণামের ভয়ে তারা পাপাচরণ করে না, পাপ থেকে দূরে থাকে। মনে রাখতে হবে, যেই ব্যক্তি দুঃখকে ভয় ও অকুশল পাপকে ঘৃণা করে সে নির্বাণ লাভ করতেও সক্ষম হয়। তজ্জন্য বলছি, তোমরা দুঃখের প্রতি ভয়শীল এবং পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়ে অবস্থান কর। যারা দুঃখকে ভয় করে না, এবং পাপকে ঘৃণা (লজ্জা) করে না তাদের জন্য নরকের রাস্তা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। মন্ত্রী (বর্তমানে সাবেক) কল্পরঞ্জন চাকমাকে লক্ষ্য করে বনভন্তে বলেন, কল্পরঞ্জন একদিন আমাকে বলেছিল ‘ভন্তে আমি স্বর্গে যেতে চাই।’ আমি তাকে বলেছিলাম তাহলে তুমি কারোর প্রতি রাগ করতে পারবে না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করতে পারবে না এবং কৃপণ হতে পারবে না। শুধু কল্পরঞ্জন চাকমাকে নয় তোমাদের সবাইকে বলছি, তোমরা রাগী, মিথ্যুক ও কৃপণ হবে না। যারা রাগী, মিথ্যুক ও কৃপণ তারা স্বর্গে যেতে পারে না। স্বর্গ সুখ লাভ করতে হলে তোমাদেরকে রাগ ত্যাগ করতে হবে, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করা হতে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং চিন্ত থেকে কৃপণতা ভাবকে বিদূরীত করতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন যারা ক্রোধহীন তারা স্বর্গপরায়ণ, যারা মিথ্যাবাক্য বলে না তারা স্বর্গপরায়ণ, যাদের অন্তরে কৃপণতা নেই তারা

স্বর্গপরায়ণ। তোমরা যদি স্বর্গে যেতে চাও তবে রাগ করতে পারবে না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করতে পারবে না এবং কৃপণ হতে পারবে না। ইহাই স্বর্গ সুখ লাভের রাস্তা। মনে রাখবে স্বর্গ সুখ লাভের প্রত্যাশীগণকে এই রাস্তায় এগিয়ে যেতে হবে।

পূজ্য বনভঙ্কে আরো বলেন-আমি তো দেখছি তোমরা সবাই সীমাহীন দুঃখের মধ্যে রয়েছ। সেই দুঃখ হতে কবে তোমাদের ত্রাণ লাভ হবে জান? যখন তোমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু, উদয় হবে। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু কিভাবে উদয়? সর্বদা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহের সহিত অবস্থান করলে ধর্মজ্ঞান উদয় হয়। যারা লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত ও অজ্ঞানমুক্ত তথা লোভ, হিংসা, অজ্ঞানের সহিত চালিত হয় না তাদের ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উদয় হয়ে থাকে। এভাবে ধর্মজ্ঞান ধর্মচক্ষু উদয় হলে তখন আর কোন দুঃখ থাকে না। অনাবিল নির্বাণসুখ উপলব্ধি হয়। একবার সাধন তালুকদার আমাকে প্রশ্ন করেছিল ‘ভঙ্কে আপনি তো সংসার ধর্মে আবদ্ধ হননি, আপনি কিভাবে সংসারী জীবন-যাপন করাকে দুঃখ বলে জানলেন?’ আমরা স্ত্রী, পুত্র-কন্যার সহিত সংসারী জীবন-যাপন করতেছি। সেটা যদি দুঃখময় হয় থাকে আমরা না হয় তা জানব; আপনি জানলেন কিরূপে? আমি বললাম হ্যাঁ আমি সংসারী হই নি একথা ঠিক। তবে সংসারী না হয়েও সেটা জানার উপায় রয়েছে। যেমন ধর তোমার হাতটা আগুনে পুড়ে গেছে। এবং সেই ক্ষতস্থানে সামান্য আঘাত পেলেই তুমি ছটপট কর, ব্যথার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়। তোমার সেই দুঃখময় অবস্থা দেখে অন্যজনেরা কি দুঃখ জানতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। আর তাদের স্বীয় হাত যাতে পুড়ে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। ঠিক তদ্রূপ, আমিও সেইরূপে তোমাদের সংসারী জীবনের দুঃখ-কষ্টময় ঘটনাবলী দর্শন করে সংসারী জীবনের দুঃখ অনুভব করি, দুঃখ দর্শন করি এবং দুঃখ বলে জানি। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যাতে সেই দুঃখের বিভীষিকাময় অগ্নিতে পড় হতে না হয় তজ্জন্য সদা সতর্কতার সহিত অবস্থান করে থাকি। ভিক্ষুদেরকে এইরূপে গৃহীদের দুঃখময় সংসারী জীবন-যাপন দেখে তাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অবস্থান করতে হবে।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, তোমাদের এতো দুঃখ কেন? এসো আমি তোমাদেরকে শান্তির সন্ধান দিতেছি। সেই দুঃখ কি? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈর্ষিত বস্তুর অলাভ দুঃখ। তার উপর অন্ন-বস্ত্র, অর্থ-বিভূতির অভাবজনিত দুঃখসহ স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্র-কন্যার সাথে মতবিরোধ, কথাবার্তায় অমিল; আত্মীয়-স্বজন; পাড়াপ্রতিবেশীর সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ, মনোমালিন্য ইত্যাদি হাজারো প্রকার দুঃখ রয়েছে। বুদ্ধের মত অনুসারে দেহধারণ এবং জন্মগ্রহণ করার দরুন এসব দুঃখ

ভোগ করতে হয়। দেহধারণ ও জন্মগ্রহণ করার হেতু নিরুদ্ধ হলে এইসব দুঃখেরও পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। কেন দেহধারণ ও জন্মগ্রহণ করতে হয়? অবিদ্যার কারণে। সুতরাং অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপত্তি দ্বারা দেহধারণ এবং জন্মগ্রহণ করার হেতু সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলে যাবতীয় দুঃখরাশি নিরোধ হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে অবিদ্যার কারণে তোমরা দুঃখ পাচ্ছ। দুঃখ হতে মুক্তির উপায় খুঁজে পাচ্ছ না। সেই অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ করে বিদ্যা উৎপত্তি করতে পারলে যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটবে, শান্তির সন্ধান মিলবে। বিদ্যা বা জ্ঞানের সহিত সদ্ধর্ম আচরণে সুখ লাভ হয়। কাজেই, সুখের লাভের জন্য তোমরা সদ্ধর্ম আচরণ কর। অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত না থেকে জ্ঞানের আলোয় এসো তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুখের, শান্তির সন্ধান মিলবে। জ্ঞানের সহিত চালিত হয়ে অমরভুবনে থাকলে সুখ লাভ হয়, কিন্তু অজ্ঞানের সহিত চালিত হয়ে মরভুবনে থাকলে সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকতে হয়। তাই বলছি, তোমরা অজ্ঞানের অন্ধকারজগত এই মরভুবনে না থেকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত অমরভুবনে চলে এসো। এখানে কোন প্রকার দুঃখ, অশান্তি নেই, রয়েছে অনাবিল শান্তি সুখের পূর্ণ গ্যারান্টি।

তোমরা সং উপায়ে জীবন-যাপন কর, অসং উপায়ে জীবন-যাপন করবে না। কখনো পঞ্চ নিষিদ্ধ বাণিজ্যে নিজেকে নিয়োজিত করবে না। সেই পঞ্চ নিষিদ্ধ বাণিজ্য কি? মৎস্য, মাংস, (বা প্রাণী) অস্ত্র, সুরা (মাদক দ্রব্য), বিষের ব্যবসা। এসব বাণিজ্য দ্বারা সবসময় পাপ উৎপন্ন হয় দুঃখ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধের উপদেশ মত পঞ্চ নিষিদ্ধ বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন-যাপন না করে যা অন্য প্রাণী দুঃখ বিরহিত ও অকুশল বর্জিত পবিত্র নির্দোষ সেরূপ সং উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে সচেষ্ট থাক। একদিন জ্যোতিসার আমাকে বলেছিল ‘ভক্ত আজকে আমাদের গমন পথে ভেদভেদী এলাকায় কয়েকজন মহিলাকে শন বোঝাই করে এনে বাজারে বিক্রি করতে দেখেছি’। তাদেরকে দেখে আমার ভীষণ লজ্জা লেগেছিল। আমি বললাম-কেন, বাজারে শন বিক্রি করতেছে সেখানে লজ্জা কিসের? তারা তো অন্যায় কাজ করতেছে না; চুরি-ডাকাতি, চাঁদাবাজি, চোরাচালানি কিছুই করতেছে না। কালক্রমে গরিবকুলে জন্মগ্রহণ করলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে শন বিক্রি করতে হবে, কাঠ বিক্রি করতে হবে এটা স্বাভাবিক। ভবচক্রে কখনো গরিব, কখনো মহাধনীকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয় কর্মানুসারে। শাস্ত্রে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বুদ্ধ নিজেও শন, কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। তদুপর শন, কাঠ, বাঁশ বিক্রি করলে তো পাপ হয় না। তৎদ্বারা অকুশল উৎপন্ন হয়ে নিম্নগামী হবার কোন সম্ভাবনা নেই; মরণের পর চারি অপায়ে পতিত হবার কারণও নিহিত নেই। কাজেই আমি

তাদের জীবিকাকে সম্যক জীবিকা বলব। শন, কাঠ, বাঁশ বিক্রি না করে তারা যদি নদীতে জাল ফেলে মাছ বিক্রি করত, বন্যপশু শিকার করে মাংস বিক্রি করত এবং মদ তৈরি করে বিক্রি করত তাহলে লজ্জা পাওয়ার কারণ থাকত-তোমার। যেহেতু ঐসব জীবিকাসমূহ মিথ্যা জীবিকার অন্তর্গত ও বুদ্ধ কর্তৃক গর্হিত, নিন্দিত কাজ। বলা যায়, কেহকে চুরি, ডাকাতি, মাস্তানী, সস্তাসী, চোরাচালানী সহ অস্ত্র ব্যবসা এবং মৎস্য, মাংস, মদ-গাজা-হেরোইন বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখলে তবেই আমি লজ্জা পেতাম। যেহেতু সে সব ব্যবসার মাধ্যমে বর্তমানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবন-যাপন করতে সক্ষম হলেও মৃত্যুর পরজন্মে ভয়ানক দুঃখ ভোগ করা ছাড়া অন্য গত্যন্তর থাকে না। তাদেরকে নরক, প্রেত, অসুর, তির্যককূলে জন্মগ্রহণ করতঃ অনন্তকাল ব্যাপীদুঃখ ভোগ করতেই হবে। যারা গরিবকূলে জন্মধারণ করেও উত্তমকার্য এবং সদুপায়ে জীবন-যাপন করে তাদের উর্ধ্বগতি সুনিশ্চিত। তাই তোমরা সব সময় সদুপায়ে জীবন-যাপনে তৎপর থাক। অসুদপায়ে জীবন-যাপন করা হতে নিজেকে বিরত রাখ।

তিনি বলেন-আজকাল অনেক নর-নারী আমার নিকট এসে চাকুরি লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। আমি তাদেরকে বলি-আচ্ছা, তোমাদের যদি প্রভূত সম্পত্তি, কোটি টাকা থাকত চাকুরির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে কি?। করতে না। তখন চাকুরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ত না। সেই সম্পত্তি কিভাবে উৎপন্ন হয় জান? বুদ্ধ বলেছেন, শ্রদ্ধা সর্বসম্পত্তি উদয়ের আদি ভূমি। একমাত্র শ্রদ্ধার বলেই সম্পত্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেই শ্রদ্ধা কি? কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস এবং চারি আর্যসত্যের প্রতি বিশ্বাস। কারণ যাদের কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস থাকে তারা অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে পারে না। বরঞ্চ সর্বদা শীলাচরণই করে থাকে। আর সেই শীল পালনের ফলে নতুন সম্পত্তি লাভ হয়। অন্যদিকে চারি আর্যসত্যে বিশ্বাস করা মানে বুদ্ধকে বিশ্বাস করা। বুদ্ধকে বিশ্বাস করলে পাপ করা যায় না। তোমরা যতই বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ততই সম্পত্তি লাভ হবে। আর যত বুদ্ধকে (বুদ্ধের জ্ঞানকে) অবিশ্বাস করবে ততই সম্পত্তি হ্রাস পাবে, দিন দিন গরিব হতে হবে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞা থেকে বলতে পারি, আমি বুদ্ধের প্রতি গভীর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা রেখে আর্যমার্গ অনুসরণ করেছি বলে বর্তমানে আমার এরূপ ফলাফল অর্জিত হয়েছে। বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অটুট রাখতে না পারলে এসব জ্ঞান সম্পত্তি লাভ করা সম্ভব হতো না। বুদ্ধ রতন সূত্রে বলেছেন, ইহলোকে বা পরলোকে অথবা স্বর্গলোকে যা কিছু মূল্যবান রত্ন (সম্পদ) আছে; এদের কোনটিই বুদ্ধ রত্নের সমান নহে। তাই তোমরা যদি বুদ্ধের ভাষিত উপদেশে গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে অকুশলকর্ম হতে নিজেকে বিরত

রেখে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর তাহলে বুদ্ধ রত্ন থেকে সম্পত্তি উদয় হবেই। যেই স্ত্রী বা পুরুষের চিন্তে শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে সেই দরিদ্র নহেন, তার জীবন অব্যর্থ। তারা কর্মফল, পরকালের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বদা কুশলে নিয়োজিত হওত অতিসত্বর ধন সম্পদের মালিক হতে সক্ষম হয়। তাদের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়; ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান না হয়ে সর্বদা লাভ হয়, আর বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীরা সব সময় সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এবিধি বহু উপায়ে তাদের সর্বদা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধিই লাভ হয়ে থাকে।

নির্বাণ লাভের চারটি সোপান। স্রোতাপত্তি সোপান, স্কৃদাগামী সোপান, অনাগামী সোপান এবং অরহত সোপান। তোমরা গৃহীদের মধ্যে কেহ যদি স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ কর তাহলে আর চাকুরি করতে পারবে না, চাকুরি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ চাকুরি করা এটা অধীন কাজ। স্রোতাপত্তি লাভীগণ কারোর অধীনে থাকতে পারে না। তবে স্রোতাপত্তি লাভীগণ কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে? তারা স্বাধীন কাজ চাষবাদ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নিজেদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান্য জমি ও বাগান বাগিচায় স্বয়ং নিজে অথবা চাকর-বাকর দ্বারা শস্য উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন করবে। ব্যবসা বলতে আবার ছোটখাটো ব্যবসা যা দেখতে খুব নগণ্য, যেমন মুদির দোকান, শাক-সবজির ব্যবসা ইত্যাদির ধরনের করাও চলবে না। উন্নত মানের ও প্রশংসনীয় ব্যবসা যেমন-ঘড়ি তথা ইলেকট্রনিক দ্রব্য সামগ্রীর দোকান, চশমা, পোশাক পরিচ্ছেদের দোকান, মিল, ফ্যাক্টরী খুলে পরিচালনা করা ইত্যাদি মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা চায়। বলা বাহুল্য, পঞ্চ নিষিদ্ধ বাণিজ্যে তো কল্পনাই করা যাবে না। যদি সেইরূপ ব্যবসা ও চাষাবাসের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ না থাকে তাহলে সকালে স্রোতাপত্তি লাভ করার পর বিকালেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কারণ স্রোতাপত্তি লাভীদের পক্ষে চাকুরি ও অসদ্ উপায়ে অর্জিত অর্থ তথা মিথ্যাজীবিকার মাধ্যমে জীবন-যাপন করা অসম্ভব। তাদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সদ্ভাবে অবস্থান করতে হয়। বুদ্ধের সময়ে সাতান্ন হাজার গৃহী মার্গফল লাভী ছিল। তারাও সদ্ ব্যবসা এবং চাষাবাস করে জীবিকা নির্বাহ করেছিল। শাস্ত্রে দেখা যায়, যাদের সেইরূপ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের কোন সুযোগ ছিল না তারা মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিল। তবে তাদের সেই মৃত্যুবরণ কোন পরিহানির ইঙ্গিত বহন করে না বরং তারা মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্গলোকে অথবা মহা বিভব সম্পদের অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করতঃ অনন্ত সুখের ভাগী হয়েছিল। যা বেঁচে থাকলে তাদের পক্ষে

লাভ করা সম্ভব হতো না। যারা সব সময় পঞ্চশীলধর্ম সযত্নে রক্ষা করে থাকে তাদেরকে চুল স্রোতাপত্তি বলা হয়। তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে কিংবা মনুষ্যালোকে ধনী, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করতঃ বিপুল সুখের ভাগী হয়। কোন প্রকার অধোগতি, নিলুগামী হবার সম্ভাবনা থাকে না।

পরিশেষে পূজ্য ভক্তে বলেন-অজ্ঞানী ব্যক্তির স্বভাব হল পরের ক্ষতিসাধন করা। তারা অপরকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, রুঢ়বাক্য প্রয়োগ, গায়ের জোর প্রদর্শন করা সহ বিবিধ উপায়ে দুঃখ যাতনা দিতে পারাকে মহা আনন্দের ব্যাপার ও সুখ বলে মনে করে। বর্তমানে সেরূপ খারাপ কাজের মাধ্যমে তারা বীরদর্পে চলাফেরা করতে সক্ষম হলেও মৃত্যুর পর তার বিষময় বিপাকের ফলে নরকে পতিত হয়ে অনন্ত দুঃখের ভাগী হয়। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির কারণে অনিষ্ট, অহিত কামনা করে না। বরং পরের মঙ্গল কামনা, সুখ কামনা, উপকার সাধন ও সর্বজীবের প্রতি দয়াশীল হয়ে অবস্থান করে থাকে। এতে তাদের দিবা-রাত্রি পুণ্য বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তারা ইহপরকালে সুখের ভাগী হয়। বুদ্ধের উপদেশ মত তোমরাও শত্রু-মিত্র সবাইকে সমানভাবে দয়া কর, কারোর ক্ষতিসাধন ও অমঙ্গল কামনা করবে না। উত্তমভাবেই ধর্মাচরণ কর, ধর্মচারী ব্যক্তির সুখ বৃদ্ধি পায়। ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে; ধর্মচারী ব্যক্তি কখনো চারি অপায়ে পতিত হয় না। ধর্মচারী ব্যক্তি ইহলোকে পরলোকে সুখে থাকেন।

তোমরা হীন, অনার্য কাজসমূহ হতে নিজেকে দূরে সরে রাখ। কখনো অনার্য কাজে আত্মনিয়োগ করবে না। বরং শীলপালন কর, নিজেকে পুণ্যকর্মে ব্যাপ্ত রাখ তাহলে সুখ লাভে সমর্থ হবেই। আজকে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তোমরা যে দানাদি পুণ্যকর্ম ও পরিত্রাণ শ্রবণ করলে এগুলো কি জান? কুশলকাজ বা সদ্ধর্ম। আবার এই কুশলকাজ কেন করতে হয়? উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ লাভের জন্য। তাই তোমরা সবাই বলো “এই পুণ্যকর্মের দ্বারা আমাদের সর্বদা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হোক। আমাদের কখনো অধোগতি, পরিহানি না ঘটুক।” সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, এই নতুন বৎসরে আমরা অকুশলকার্য না করে কুশলকার্যই সম্পাদন করব। সেই পুণ্যকার্য যাতে আমাদের জন্য উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সুখ বয়ে আনে। তজ্জন্য বলছি, তোমরা সর্বদা জ্ঞান এবং কুশলের সহিত অবস্থান করতে সচেষ্ট থাক। জ্ঞানের বল, কুশলের বল থাকলে সর্বদিকে জয়যুক্ত হওয়া যায়, সুখ লাভ হয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে না থেকে তোমরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে অবস্থান কর। অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম সম্পাদন কর। মিথ্যাধর্ম বাদ দিয়ে সত্যধর্মে আত্মনিয়োগ কর। তাহলে তোমাদের সুখ শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হবেই। মনে রাখতে হবে, সত্যধর্মে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হলে জন্ম-জরা-ব্যাধি-

মরণাদি দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে। মনচিন্তের মধ্যে মিথ্যাধর্ম, অজ্ঞান থাকলে দুঃখ পেতে হয়। মনচিন্ত থেকে মিথ্যাধর্ম, অজ্ঞানকে বিদূরীত করতঃ জ্ঞানের সহিত অবস্থান করাই উত্তম। তোমরা সদা সর্বদা জ্ঞানের সহিত নিজকে পরিচালিত কর। এতে তোমাদের পরম সুখ অর্জিত হবে, উন্নতি হবে, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে। জ্ঞানই সকল সুখ, শান্তি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল। সেই জ্ঞান অর্জিত হয়ে তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর হয়ে সুখ শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হোক-এই আশীর্বাদ রইল।

সাধু, সাধু, সাধু।

অপরিস্কার চিন্তা পাপেতে রমিত হয়

এক সময় দেশনালায়ে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে লোকোত্তর মহামানব শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভক্তে) মহোদয় বলেন-তোমরা পরিস্কার বা বিশুদ্ধচিন্তে অবস্থান কর; কখনো অপরিস্কার চিন্তে অবস্থান করবে না। অপরিস্কার চিন্তা পাপেতে রমিত হয়। সেই পাপময়লা চিন্তের মধ্যে জমা হয়ে গেলে দুঃখ ভোগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ময়লা সম্বন্ধে বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন, “অনাবৃত্তি মস্ত্রের ময়লা, অসংস্কার ঘরের ময়লা, আলস্য দেহের ময়লা, দুঃচরিত্র স্ত্রীলোকের ময়লা, ইহকালের পরকালের ময়লা পাপকর্ম এবং অবিদ্যাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, এই ময়লা বর্জন করে তোমরা সকলে নির্মল হও। কর্মকার যেমন রজতের ময়লা একটু একটু করে বিদূরীত করে, ঠিক মেধাবী ব্যক্তিও আপনার ময়লা ক্ষণে ক্ষণে বিদূরীত করবে। অর্থাৎ নিজ নিজ চিন্তাকে বশে আনবেন। আবার, লৌহ হতে উৎপন্ন ময়লা লৌহকে বিনষ্ট করে, তেমনি আপনার কৃত দুষ্কর্মই আপনাকে বিনষ্ট করবে।” সে সব ময়লার উৎপত্তি স্থল কোথায়? মনচিন্তের মধ্যে। তোমরা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিচ্ছেদ, অলংকার এবং প্রসাধনী সামগ্রী শরীরে মেখে দৈহিক পরিশুদ্ধতা সাধনে রত থাক। কিন্তু মনের ময়লা ধোবনের বা পরিস্কার করতে সচেষ্ট থাক কি? মনে রাখবে, বাহ্যিক দেহ যতই পরিস্কার থাকুক না কেন মন অপরিস্কার থাকলে সুখের পরিবর্তে দুঃখ ভোগই করতে হয়। দেহ পরিস্কার করে কি হবে মন পরিস্কার না হলে? চিন্তা যদি ময়লা বা কলুষিত হয় তাহলে উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান ও দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির তরে সাজ-সজ্জা করা সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। এক কথায়, মনচিন্তা পরিস্কার হলে সুখ, আর মনচিন্তা অপরিস্কার হলে দুঃখ। মন কিভাবে অপরিস্কার হয়? অবিদ্যা এবং পাপ চেতনা দ্বারাই মন অপরিস্কার হয়। পাপকর্মের ফলে চিন্তা অপরিস্কার হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, মানুষের সুখ-দুঃখ, সুগতি-দুর্গতির কর্তা সে নিজেই। নিজের কৃত কর্মই

তার জীবনের পথ নির্দিষ্ট করে দেয়। তোমরা কলুষিত, কলঙ্কিত, নাকি পরিশুদ্ধ, পবিত্র পথের পথিক হবে? চিন্তকে যদি সৎকর্মে তৎপর রাখা না যায় তবে চিন্তের শুদ্ধতা নষ্ট হয়। সেই অশুদ্ধ বা অপরিষ্কার চিন্ত অনেক দুঃখ বহন করে আনে, দুর্গতিগামী করায়। মন থেকে সেই অবিদ্যা, পাপ চেতনা বিদূরীত করতে সক্ষম হলে মন হয়ে উঠে পরিষ্কার, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ। আর পরিষ্কার তথা পরিশুদ্ধ মনই সর্ব সুখের আকর। তাই তোমাদের কর্তব্য হল মনের ময়লা ধোবনের প্রয়াসী হয়ে মনকে পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ সাধন করা। তবে চিন্তকে শুদ্ধ করা, ময়লামুক্ত রাখা একমুহূর্তের কাজ নয়; তা সময়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য। সবসময় ক্রমশঃ চিন্তকে শুদ্ধ করণের প্রচেষ্টায় থাকতে হবে—কোন প্রকার বিরতি দেওয়া চলবে না। এভাবে একদিন চিন্ত থেকে সমস্ত ময়লা বিদূরীত হয়ে গিয়ে চিন্ত হবে বিশুদ্ধ, কলুষমুক্ত। তখন আর দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

আচ্ছা, আমি যে ধর্মদেশনা দিতেছি তোমরা তা' বুঝতে সমর্থ হচ্ছে কি? যদি বুঝতে পার তবে তোমাদের পরম মঙ্গল এবং সৌভাগ্যের বিষয় বলে জানবে। আর বুঝতে না পারলে আমার তো কিছুই করার নেই। তোমরা অবিদ্যার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলে অবশ্য এ' দেশনা বুঝতে পারার কথা নয়। কারণ অবিদ্যার স্বভাব অজ্ঞানতা। সেই অবিদ্যা কি? যথাযথ ধারণার অভাবই অবিদ্যা। দুঃখ কি না জানা অবিদ্যা, দুঃখ সমুদয় কি না জানা অবিদ্যা, দুঃখ নিরোধ কি না জানা অবিদ্যা, দুঃখ নিরোধের উপায় কি না জানাই অবিদ্যা। চারি আর্যসত্য না জানা, না বুঝা অবিদ্যা। ধর্মের আশ্বাদ না পাওয়াই অবিদ্যা। স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, স্ত্রী, পুরুষ, যোনি, গতি, ভব প্রভৃতি সম্বন্ধে না জানা অবিদ্যা। এক কথায় কোন বিষয় না জানাই অবিদ্যা। অবিদ্যা ঠিক চক্ষুহানির মতন প্রকৃত সত্যোপলব্ধি করতে দেয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অন্ধকারে না থেকে তোমরা জ্ঞানের আলোয় এসে পণ্ডিত হতে সচেষ্ট থাক। পণ্ডিত কাকে বলে? খুব বেশি কথা বললে তাকে পণ্ডিত বলা যায় না। উচ্চ শিক্ষিত, বহুভাষাবিদ অধিকস্ত কথাবর্তায় অত্যন্ত সুদক্ষ হলে তাকেও পণ্ডিত বলা চলে না। অপরজনকে পরামর্শ প্রদানে তথা বিবিধ বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ, অনুজ্ঞা-উপদেশ প্রদানে খুব পটু হলেও তাকে পণ্ডিত বলা চলে না। বৌদ্ধধর্ম মতে তিনিই একমাত্র পণ্ডিত যিনি সহনশীলতা, সর্ব জীবের প্রতি দয়া, কুশলকার্যে নির্ভীক, স্ফুর্মশীল ও মৈত্রীপরায়ণ এবং নিজকে সর্বদা অক্ষুন্ন রাখার সদগুণে গুণীযান। মূর্খ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারে না। মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা কোন মঙ্গলকার্য সাধিত হবার আশাও করা যায় না। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মূর্খব্যক্তিদেরকে পণ্ডিত বানিয়ে ফেল এবং অসাধুদেরকে সাধুতে পরিণত কর। সাধু কাহাকে বলে? প্রাণী হত্যা না করলে,

চুরি-ডাকাতি-চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসী না করলে, ব্যভিচার না করলে, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য প্রয়োগ না করলে, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন এসব যাবতীয় মাদক দ্রব্য সেবন না করলে তাকে সাধু বলে। আর যারা প্রাণী হত্যা করে, চুরি-ডাকাতি-চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসী করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথাবাক্য প্রয়োগ করে, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবন করে তারা অসাধু। ‘সাধু মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়, অসাধু মানুষ মরণের পর নরকের গিয়ে করে হায় হায়’! তাই বলছি, তোমরা অসাধু হও না। আবার বর্তমানে প্রায় মানুষই অকৃতজ্ঞ, উপকারী উপকার স্বীকার করে না। বরং সুযোগ পেলে অপকার সাধনই করে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন-অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মহৎ পাপী। অকৃতজ্ঞদের কখনো সুখ লাভ হয় না।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে আরো বলেন-তোমাদেরকে মিথ্যাপথ হতে সম্যকপথে ফিরিয়ে আনাই হল আমার কাজ। তবে এই কাজ সহজ, সরল ও মস্নন নয়, খুবই কঠিন, দুজ্জয়। অন্যদিকে আমি তো দেখতেছি তোমরা কেহ সম্যকপথে চলতে আগ্রহী নয়। সবাই মিথ্যাপথে চলতে ইচ্ছুক, মিথ্যাপথেই তোমাদের রুচিবোধ হয়ে থাকে। তাই সম্যকপথ নির্দেশ করে দিলেও সহজে কেহ মিথ্যাপথ হতে সরে আসতে চাও না। আমি এতো বলে দিচ্ছি যে ‘এটা সম্যকপথ, এই পথে চালিত হও, এ’ পথে চালিত হলে অবশ্যই সুখ লাভ হবে। আর এই পথটা মিথ্যাপথ, সেই পথে চালিত হলে অনন্ত দুঃখের সামনে পড়ে যাবে।’ কিন্তু তোমরা আমার কথা কর্ণপাত করছ কি? সে রকম লক্ষণতো দৃষ্টিগোচর হয় না। তবুও আমি চেষ্টায় কোন ক্রটি করতেছি না। তোমরা যদি আমার কথা মত মিথ্যাপথ পরিহার করে সম্যকপথে চালিত হও তাহলে তোমাদের সুখ লাভ সুনিশ্চিত। আর হিংসাহিংসি, রেষারেষি, মারামারি, বৈরীভাব সবই দূরীভূত হয়ে যাবে। আবার, আমার কথা মত মিথ্যাপথ বর্জন না করলে তোমাদের যে দুঃখের সীমা থাকবে না সেটাও দেখতেছি। কাজেই এখনও সময়, সুযোগ আছে, অনতি বিলম্বে মিথ্যাপথ বর্জন করে সম্যকপথে ফিরিয়ে এসো। তা না হলে পরে অনুশোচনা, বিলাপ করতে হবে। তোমরা কেন আমার কথামত মিথ্যাপথ পরিহার করতে সমর্থ হচ্ছে না জান? মারের জন্য। মারের তোমাদেরকে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে দিচ্ছে না। মার কাজ হল সত্ত্বদিগকে অকুশল পাপকর্মে নিয়োজিত করা, সম্যক মার্গে বিপরীতে মিথ্যাপথে চালিত করা। মার হল পাপীলোকের রাজা। মানুষের পবিত্র চিত্তে বিতর্ক সৃষ্টি করে দিয়ে ভ্রান্ত মতে ফেলে দেয়া মারের কার্য। কেহ সম্যকপথে পরিচালিত হওত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে, জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হলে, দুঃখ হতে মুক্তি লাভে তৎপর হলে, নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে চাইলে মারের আর সহ্য হয় না। তখন মার তার সৈন্যসামন্ত

নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। পর্বত প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন, হুমকি এবং প্রলোভনের মাধ্যমে সেই অভিষ্ট লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করাতে চায়। তাদেরকে মার কি বলে জান? পুণ্যকর্ম, জ্ঞানলাভ, দুঃখমুক্তি, নির্বাণ এসব আমার কোন দরকার নেই। যারা সেগুলো লাভে চেষ্টাশীল বা প্রত্যাশী হবে আমি তাদেরকে ব্যর্থ করে ছাড়ব। আমি কাউকে আমার রাজ্যে অতিক্রম করে গিয়ে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করতে দেবো না। সবাইকে খেণ্ডার করে রাখব-আমার রাজ্যে। মার কি দিয়ে খেণ্ডার করে জান? তোমাদের চিন্তে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান উদয় করে দিয়ে মার খেণ্ডার করবে। মনে রাখতে হবে, তোমরা যদি রাগ কর, হিংসা কর এবং অজ্ঞানী হয়ে যাও তাহলে মার তোমাদেরকে সহজে খেণ্ডার করতে সক্ষম হবে। তজ্জন্য চিন্তের মধ্যে রাগ, হিংসা এবং অজ্ঞানকে স্থান দিবে না এবং কারোর সহিত রাগ, হিংসা, অজ্ঞানতা আচরণ করবে না। এ' কাজে সফল হলে মার তোমাদেরকে কিছুতেই খেণ্ডার করতে পারবে না। তোমরা বীর বিক্রমের সহিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহ দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করতে সমর্থ হবে।

অজ্ঞানী ব্যক্তির স্বীয় কৃত পাপকর্ম দ্বারা নিজের বিপদকে নিজেই ডেকে আনে। যারা জ্ঞানী তারা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে থাকে। ফলে তাদেরকে বিপদে পড়তে হয় না, তাদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি পায়। তোমরা প্রত্যেকে সুখ প্রত্যাশা কর নয় কি? অবশ্যই কর। কারণ প্রাণী মাঝেই সুখাকাজক্ষী, কেহ দুঃখে পতিত হতে চায় না। প্রকৃত সুখ লাভ করতে হলে তোমাদেরকে বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং ধর্ম লাভ করতে হবে। বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্মলাভ করতে না পারলে প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, সন্ত্রাসী সহ নানা অনাচার অবিচারমূলক খারাপ কাজে নিয়োজিত হয়ে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। তবে বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্মলাভ করা সহজ নহে; এটা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। সেই দুরূহ কাজে সফল হতে হলে প্রয়োজন পরম সৌভাগ্য। এবম্বিধ কাজে যারা নিজেকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম তারা পুরুষ হলে ভাগ্যবান আর মহিলা হলে ভাগ্যবতী বলে জানবে। তোমরা সকলে বলো 'আমরা এখানে (রাজবন বিহারে) বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্মলাভ করতে এসেছি। আজকে এই পুণ্যকর্মের দ্বারা আমাদের অতিসত্বর বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্মলাভ হয়ে থাকুক।' কেহ যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করে তোমরা রাজবন বিহারে কেন যাও? তাদেরকে বলে দিবে বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও ধর্ম লাভ করতে। আবার কেহ যদি বলে বনভক্তে তোমাদেরকে কি দেয়? তাহলে বলবে বনভক্তে আমাদেরকে বুদ্ধের সাক্ষাৎ, ধর্ম লাভের পথকে নির্দেশ করে দেয়। এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন উপদেশ, অনুশাসন এবং উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। সেই বুদ্ধের সাক্ষাৎ কি রকম? বুদ্ধ অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানকে

দর্শন করাই হল বুদ্ধের সাক্ষাৎ। আর সেই জ্ঞান কিরূপ? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধগামিনী পটিপদায় জ্ঞান। এই চারি আর্যসত্য জ্ঞান লাভ হলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। ধর্মলাভ কিরূপ? দুঃখসত্য, সমুদয়সত্য, নিরোধসত্য, মার্গসত্য প্রত্যক্ষ হলে বা লাভ হলে ধর্ম লাভ বলে জানবে। ভগবান বুদ্ধ চারি সত্যকে কেন্দ্র করে, ভিত্তি করে তাঁর চুরাশি হাজার ধর্মস্বক প্রচার করেছেন। চারি আর্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব, ভিত্তি। চারি আর্যসত্য ছাড়া বৌদ্ধধর্ম হতে পারে না। বৌদ্ধধর্মকে দর্শন করতে হলে চারি আর্যসত্যকে জানতে, বুঝতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে চারি আর্যসত্য জানতে, বুঝতে, দর্শন করতে চেষ্টাশীল হও। তাহলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ, ধর্মলাভ হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারবে।

পূজ্য ভগ্নে বলেন-আজকের এই দানানুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমরা কি করলে জ্ঞান? দান যজ্ঞ। বৌদ্ধধর্মে দান যজ্ঞ, শীল যজ্ঞ ও ত্রিশরণ যজ্ঞ সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় নরবলি যজ্ঞ, পশুবলি যজ্ঞের কথা বলা হয়নি। বুদ্ধ বলেছেন, তোমরা নরবলি, পশুবলি যজ্ঞ সম্পাদন করবে না। কারণ সে সব যজ্ঞের দ্বারা অকুশল পাপ সৃষ্টি হয়ে মৃত্যুর পর নরকে পতিত হতে হয়। নরবলি, পশুবলি যজ্ঞ অনার্য, হীন নিকৃষ্ট। এই যজ্ঞের দ্বারা সুখ লাভ হওয়া দূরের কথা, ইহকাল পরকাল উভয়কালে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করতে হয় মাত্র। তোমরা কখনো নরবলি, পশুবলি যজ্ঞ করবে না। দান যজ্ঞ, পঞ্চশীল যজ্ঞ, ত্রিশরণ যজ্ঞই সম্পাদন কর। এই যজ্ঞসমূহ শ্রেষ্ঠ, উত্তম, পবিত্র এবং মহৎ সুফল প্রদায়ী। তোমরা প্রসন্ন মনে দান যজ্ঞ, শীল যজ্ঞ, ত্রিশরণ যজ্ঞ সম্পাদন করে যাও। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমাদের বিপুল পুণ্য অর্জিত হবে এবং অতিসত্ত্বর উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ শান্তি লাভ সুনিশ্চিত হবে। মনে রাখবে এই দান যজ্ঞ, পঞ্চশীল যজ্ঞ, ত্রিশরণ যজ্ঞ তোমাদেরকে মহৎ ফল প্রদান করবে। আবার, দান গিয়ে আত্মপ্রশংসায় রত হবে না, অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা করবে না। আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা করে দান করলে দাতার পাপ হয়ে থাকে। আর সেই দান হীনদানের অন্তর্গত বলে জানবে। দান করার সময় কর্মফলের প্রতি জ্ঞান এবং চারি আর্যসত্যের প্রতি জ্ঞান রাখতে পারলে তা সদ্ধর্ম হয়। তোমরা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিতসুখ মঙ্গল কামনা করে এবং কর্ম ও কর্মফলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে দান করবে। আর একরূপ প্রার্থনা করবে ‘এই দানের ফলে আমাদের পরিহানি না হয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখশান্তি লাভ হোক এবং পরিশেষে চির সুখ নির্বাণ লাভে হেতু উৎপন্ন হোক।’

বুদ্ধের উপদেশ হল, তোমরা যাবতীয় অকুশল পাপকর্ম পরিত্যাগ কর। যত অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে থাকা যায় ততই সুখ লাভ হয়ে থাকে।

অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে পরকালের জন্য দুঃখ সঞ্চয় করে রাখার সামিল। অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে তোমরা কুশলকর্ম সম্পাদন কর। এতে দিন দিন পুণ্য বৃদ্ধি পেয়ে পরকালের জন্য সুখ জমা হয়ে থাকবে। বুদ্ধের বাণী হল তোমরা দুঃখ, পাপ জমা করবে না; সুখ পুণ্যই জমা করবে। সুখী হতে চাইলে অবশ্যই পুণ্য ও জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞান এবং পুণ্য না থাকলে ইচ্ছা করলেও সুখ লাভ করা যায় না। তাই তোমরা দিবা-রাত্রি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে তৎপর থাক। পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে কিছুতেই দুঃখের ভাগী হতে হবে না। পুণ্যের পরিণাম সর্বদা সুখ এবং আনন্দদায়ক। পুণ্যের নিকট পাপ এবং দুঃখ পরাভূত হয়। তোমাদের নিকট সত্যভাব এবং জ্ঞান উদয় হলে আর পাপকর্ম হতে বিরত থাকতে বলার প্রয়োজন হবে না। তোমরা আপনা আপনি পাপ ছেড়ে দেবে। যেমন-কোন শিক্ষিত ভদ্র লোককে পরিষ্কার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করার কথা বলতে হয় না। এবং তাদের পোষাকে কোন প্রকার ময়লা লাগলে তা ধুঁয়ে ফেলার জন্যও তাগিদ দিতে হয় না। তারা আপনা আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চলা ফেরা করে থাকে। অপরিষ্কার পোষাক পরিচ্ছদ তাদের জন্য বেমানান এবং অপমান কর। অপরিষ্কার পোষাক পরিধান করতে তারা লজ্জা পায়। অন্যদিকে কোন অশিক্ষিত লোককে তার ব্যবহৃত অপরিষ্কার, ময়লা যুক্ত পোষাক ধুঁয়ে ফেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক ব্যবহার করতে বললেও কিছুই হবে না। বরং হিত বিপরীত হবে, সে রেগেও যেতে পারে। হয়তঃ চোঁচিয়ে উঠে বলবে আমার ময়লা পোষাক তোমাকে কি ক্ষতি করতেছে? ঠিক তদ্রূপ বর্তমানে তোমাদেরকে অকুশল ত্যাগ করে কুশল সম্পাদন কর বললেও কিছুই হবে না। কারণ তোমাদের এখনো সত্যভাব ও সত্য জ্ঞান উদয় হয় নি। যে দিন সত্যভাব ও সত্য জ্ঞান উদয় হবে সেদিন থেকে তোমাদেরকে আর বারণ করতে হবে না। তোমাদের যদি মিথ্যাভাব দূরীভূত হয়ে সত্যভাব উদয় হয় এবং অজ্ঞান বিদূরীত হয়ে জ্ঞান উদয় হয় তাহলে তোমরা আপনা আপনিই অকুশলকর্ম ছেড়ে দেবে। কারণ সত্যভাব, সত্য জ্ঞান উদয় হলে অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে তোমরা লজ্জা পাবে। সেই লজ্জার দরুন আর অকুশলকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সবাই পণ্ডিত হয়ে যাও। পণ্ডিত ব্যক্তির যাবতীয় অকুশল পাপকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। মিথ্যাপথে চালিত না হয়ে সম্যকপথে চালিত হও। পণ্ডিত ব্যক্তির পরম সুখে, শান্তিতে এবং আনন্দের সহিত জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। আর সর্বদা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চমনা ও উচ্চতর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সচেষ্ট হন। তাদের কখনো পরিহানি হয় না, সব সময় উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধিই সাধিত হয়। মনুষ্য সুখ, দেবতা সুখ এবং নির্বাণ সুখ লাভ করা তাদের জন্য কঠিন নয়। তোমরা

কখনো মূর্খ হবে না, মূর্খ ব্যক্তির সুখ লাভ করতে পারে না। দুঃখই তাদের চিরসাথী হয়ে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম একদিকে ত্যাগের ধর্ম, অন্যদিকে দয়ার ধর্ম। সকল প্রকার অকুশল পাপ প্রবৃত্তি ত্যাগ করা এবং জগতের সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে দয়া করাই বৌদ্ধধর্ম। এ'ধর্মের মতে কারোর হিংসা করলে, ক্ষতিসাধন করলে ইহকালেও দুঃখ এবং পরকালেও দুঃখ। যারা প্রাণী হিংসা করে তাদের সুখ লাভ করা অসম্ভব। মনে রাখবে, কোন প্রাণীকে হিংসা না করলে সুখ, কারোর ক্ষতিসাধন না করলে সুখ লাভ হয়। তাই আবারো বলছি, তোমরা উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ কর; কোন প্রকার কৃত্রিম মনো ভাব নিয়ে ধর্ম আচরণ করবে না। এতে সুফলের পরিবর্তে কুফলই প্রদান করবে। ধর্ম উত্তমভাবে আচরণ করলে সৎদেবতাগণ তোমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষা করবে। ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে। ধর্মচারীর জীবন কখনো বৃথায় বা বিফলে যায় না। তোমরা সব সময় পঞ্চশীল রক্ষা করে চল। জীবনের বিনিময়ে হলেও পঞ্চশীল ভঙ্গ করবে না। পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করলে ইহকাল পরকাল উভয়কালে সুখ লাভ হয়। তোমরা দান শীলাদি কুশলকর্মে নিয়োজিত থাক এবং সর্বদা জ্ঞানের সহিত পরিচালিত হও। এতে তোমাদের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ হোক।

সাধু, সাধু, সাধু।

মনকে শুদ্ধ করতে না পারলে বাইরের আচরণে কিবা ফল হবে

এক সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভঙ্কে) মহোদয় সজ্জাদানানুষ্ঠানে সমবেত উপাসক-উপাসিকাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমরা সত্য মিথ্যা যাচাই কর। সত্য মিথ্যা যাচাই না করে কোন কিছু গ্রহণ করবে না বা কোন কাজে হাত দিবে না। এতে মারাত্মক ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। যার জন্য পরবর্তীতে অতীব দুঃখের সহিত তার মাণ্ডল গুণতে হয়। তাই সর্বদা সত্য মিথ্যা যাচাই করার উপদেশ দিয়েছেন ভগবান বুদ্ধ। ধর কোন একজন পণ্ডিত ভিক্ষু তোমাদেরকে খুব চতুরতার সহিত উপদেশ প্রদান করতেছে, সেটা সত্য নাকি মিথ্যা যাচাই করতে হবে। আন্দাজ করে গ্রহণ করা চলবে না। আমি বনভঙ্কে যা বলছি তাও সত্য কিনা যাচাই কর। যাচাই করার পর যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে গ্রহণ কর; আর যদি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বর্জন কর। এটাই হল বৌদ্ধধর্ম। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, স্বয়ং আমার ভাষিত উপদেশসমূহও তোমার আন্দাজের সহিত গ্রহণ করবে না। জ্ঞানী ব্যক্তির এসবের মধ্যে কতটুকু সত্য মিথ্যা রয়েছে তা যাচাই করেন। যাচাই করার পর সত্য হলে গ্রহণ করে আর মিথ্যা হলে বর্জন করে। আবার,

জ্ঞানী ব্যক্তির সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানে। তারা মিথ্যাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে অবস্থান করে। কিন্তু যারা অজ্ঞানী তারা সত্যকে মিথ্যা বলে এবং মিথ্যাকে সত্য বলে জানে। অর্থাৎ উল্টোপাল্টাভাবেই তারা সত্যের স্থানে মিথ্যা, মিথ্যার স্থানে সত্যকে উপস্থাপিত করে। যা বাঁশকে গাছ এবং গাছকে বাঁশ জ্ঞানে দর্শন করার সামিল হয়। আচ্ছা, কেহ যদি গাছকে বাঁশ এবং বাঁশকে গাছ বলে গৌ ধরে বসে থাকে, তাকে গাছ চিনিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে কি? কিছুতেই সম্ভব হবে না। এখানেও ঠিক সেরকম। মনে রাখবে অজ্ঞানী ব্যক্তির স্বভাব এমনই যে, তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে নেয়। তারা কখনো সত্যকে লাভ করতে পারে না, সত্য তাদের নিকট চিরকালই অপ্রকাশিত থাকে। তাই বলছি, তোমরা সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানবে। কখনো উল্টোপাল্টা করতে চেষ্টা করবে না।

মনচিন্তের মধ্যে মিথ্যাভাব উদয় হলে একস্থানে স্থিত থাকতে পারে না। সে অবস্থায় চিন্ত কখনো লংকা (শ্রীলংকা), কখনো বার্মা (মায়ানমার) কখনো থাইল্যান্ড ইত্যাদি ভাবে নানাদেশ ঘুরতে থাকে। যদিও সচরাসর বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি লংকা গেছে, থাইল্যান্ড গেছে, আমেরিকা গেছে, লণ্ডন গেছে প্রকৃতপক্ষে অমুকব্যক্তি নয়, তার চিন্তই সে সব দেশে গেছে। আর চিন্ত গেছে বলেই শরীরটাকেও সেখানে যেতে হচ্ছে। মনে রাখা উচিত, মনই সবকিছুর পূর্বগামী। মনই দেহটাকে পরিচালিত করে থাকে। চিন্ত যদি মুক্ত হতে না পারে তাহলে বর্তমানে যেমন নানা দেশ নানা জায়গা ঘুরে বেড়াবে তেমনি মৃত্যুর পরও বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করবে। এই উভয় প্রকার পরিভ্রমণ দুঃখই সার। মনচিন্ত অবিদ্যা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে না পারলে যেই জায়গায়, যেই দেশে বা যেই যোনিতে পরিভ্রমণ করুক না কেন কোথাও সুখ লাভ সম্ভব হয় না। মনচিন্ত থেকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা নিরোধ, নিবৃত্তি হয়ে গেলে তবেই সুখ লাভ হয়। তোমরা সব সময় জ্ঞানী ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কখনো অজ্ঞানীদেরকে অনুসরণ করবে না। জ্ঞানী ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ সুখ দায়ক। এতে নিজেকে অতি শীঘ্রই উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধির চরম শিখরে উপনীত করা সম্ভব হয়। জীবনের ইতিহাসে সূচিত হয় সাফল্যের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। তাই মহাজ্ঞানীদের আচরিত মার্গ, তাদের কথিত উপদেশ, অনুশাসন মেনে চলাই উত্তম। তাদের প্রদর্শিত মার্গের মাধ্যমে প্রকৃত সুখ শান্তির সন্ধান মিলে। সেই মহাজ্ঞানী কারা? যার নিকট চারি আর্যসত্য জ্ঞান উদয় হয়েছে, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান উদয় হয়েছে এবং আসবন্ধক জ্ঞান উদয় হয়েছে তারাই মহাজ্ঞানী। মহাজ্ঞানীগণ নিজেরা সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে অপর দুঃখহস্ত সত্ত্বদেরকে মুক্তির পথ দেখায়ে দিতে সক্ষম। তজ্জন্য তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সুখ লাভ হয় এবং

দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ ঘটে। ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ শারীপুত্র, মৌদাল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, আনন্দ এরা সবাই মহাজ্ঞানী। কাজেই সুখ লাভ করতে হলে তাদেরকে পরম গুরু হিসাবে বেছে নিতে হবে এবং সব সময় তাদের আচরিত মার্গ, কথিত উপদেশ, অনুশাসনকে জীবন চলার পথে আলোক বর্তিকারূপে গ্রহণ করা চাই। আমি এ' মহাজ্ঞানীদের কথিত উপদেশ ছাড়া অন্য কারোর উপদেশ গ্রহণ করিনি। আর আমার এই জ্ঞান স্তরে উপনীত হবার পিছনেও তাদের আচরিত, নির্দেশিত মার্গই কাজ করেছে। তাই বলছি, তোমরাও সেই মহাজ্ঞানীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তৎপর থাক। জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের উপদেশ লক্ষন করবে না।

বুদ্ধ বলেছেন, হীন জ্ঞানী মানুষকে (সাধারণ) দুঃখ ভোগ করতে হয়। তারা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। আবার হীনত্বেই অগ্রত্ব হয় না, অগ্রত্বে অরহত্ব লাভ হয়। অগ্র অর্থ শ্রেষ্ঠকে বুঝায়। সেই হীন কি? মানুষ অর্থাৎ আমি স্ত্রী-পুরুষ সত্ত্ব এ' ধারণা হীন, তৃষ্ণা হীন, সংস্কার হীন। সেই হীন মানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার সর্বতোভাবে ত্যাগ কর। সংস্কারের অপর নাম কর্ম। পুণ্যাভিসংস্কার (পুণ্য চেতনায় যে কর্ম সম্পাদিত হয়), অপুণ্যাভিসংস্কার (পাপ চেতনায় যে কর্ম সম্পাদিত হয়) ও অনেজ্জা সংস্কার (চার অরূপ ধ্যান স্তরের সাধনা) ভেদে সংস্কার তিন প্রকার। মোটামুটি বলতে গেলে যা কিছু চিন্তের প্রবৃত্তি সবই সংস্কার। বুদ্ধের উপদেশ মতে মানুষ, তৃষ্ণা, সংস্কার সবই হীন। এই হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার দুঃখ প্রদান করে বলে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কারণ হীনকে নিয়ে থাকলে অগ্রত্ব লাভ হয় না। বরং দুঃখ পেতে হয়, লজ্জিত হতে হয় এবং পরাজয় ঘটে। পূজ্য বনভঙ্কে সংসারী জীবন-যাপনে বিভিন্ন দুঃখের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সংসারী জীবনে সুখ বলতে কিছু নেই। আমি দেখতেছি তোমরা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মা-মেয়ে, ভ্রাতা-ভগ্নি পাড়া-প্রতিবেশীরা সর্বদা ঝগড়া কলহে লিপ্ত রয়েছ। এতে তোমাদেরকে দুঃখ পেতে হচ্ছে, লজ্জিত হতে হচ্ছে, বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তোমাদের কেন এরূপ পরিস্থিতি হচ্ছে? তোমরা হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কারে নিয়োজিত রয়েছ বলে। তাই হীনমানুষ, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার ত্যাগ কর।

তিনি আরো বলেন-মানুষ অজ্ঞানতা বশত মূর্খ হয়ে কতো অন্যায়ে, কতো অপরাধ, কতো ভুল, কতো গলদ করছে তার অন্ত নাই। তাই মূর্খ অনর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখসৃষ্টিকারী এবং বিপদ আনয়নকারী। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, জগতে যত প্রকার দুঃখ সৃষ্টি হয় ও দুঃখভোগ করতে হয় একমাত্র মূর্খতার দরুন। কাজেই তোমাদেরকে যত প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে সে সব স্বীয় মূর্খতার দরুনই হচ্ছে। পণ্ডিত হলে কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হবে না। মূর্খ

ব্যক্তির সর্বদা দুষ্কর্ম সম্পাদন করে, দুর্বাক্য ভাষণ করে এবং দুশ্চিন্তা করে থাকে। সুতরাং কোন মুহূর্তেই দুঃখ তাদের পিছু ছাড়ে না। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির সুচিন্তা করে, সুশৃঙ্খল চিন্তা করে, সুবাক্য ভাষণ করে ও সুকর্মই সম্পাদন করে থাকে। তাই সুখ তাদেরকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। এ কারণে বুদ্ধ সবাইকে অতিসত্ত্ব পণ্ডিত হয়ে যেতে বলেছেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত না হলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা এবং এ' ধর্মের মর্মোপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেই পণ্ডিত কে?

ধৈর্যশীল, দ্বেষ্টহীন ভয় হীন যেই জন,
পণ্ডিত বলিয়া তিনি অভিহিত হয়।

অন্যায় করিতে যদি কাহাকেও দেখে,
ভালো উপদেশ দিবে পণ্ডিত তাহাকে।
সুবিচারে সুবিনয়ে চালায়ে যে অন্যজন,
ধর্মস্থ মেধাবী নামে কথিত তিনি হন।

এই ব্যক্তিরাই প্রকৃত পণ্ডিত বলে অভিহিত। মনে রাখবে, পণ্ডিত হলে সুখ আর মূর্খ হলে দুঃখ। মূর্খ ব্যক্তির সুখ লাভ করতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তির সুগতি স্বর্গ লাভ করে এমনকি নির্বাণ লাভ করতেও সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে মূর্খ ব্যক্তির চারি অপায় দুর্গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তোমরা সবাই পণ্ডিত হও। দিনে দিনে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সচেষ্ট থাক।

যেই কাজ করলে দুঃখ ভোগ করতে হয় সেই কাজ না করাই উত্তম। যেই কথা বললে দুঃখ ভোগ করতে হয় সেই কথা না বলাই উত্তম। যেই চিন্তা করলে দুঃখ ভোগ করতে হয় সেই চিন্তা না করাই উত্তম। যদি কায়-বাক্য-মনে প্রাণী হিংসা করা হয় তাহলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। কারোর ক্ষতিসাধন করবে না। কারোর প্রতি অন্যায় আচরণও করবে না। পরম্পরের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করবে না। এইভাবে নিজকে চালিত করতে পারলেই ইহকালেও সুখ এবং পরকালেও সুখ অর্জিত হয়ে থাকে। যিনি কোন জীব বা প্রাণীকে হিংসা করে না তিনিই প্রকৃত বৌদ্ধ। যিনি কারোর ক্ষতিসাধন করে না তিনিই প্রকৃত বৌদ্ধ। যিনি কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ করে না তিনিই প্রকৃত বৌদ্ধ। যিনি পরম্পরের প্রতিবৈরীভাব আচরণ করে না তিনিই প্রকৃত বৌদ্ধ। অন্যথায় শুধুমাত্র মুখে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিলে বৌদ্ধ হওয়া যায় না। মুখের পরিচয় নয় কর্মের মাধ্যমেই নিজকে বৌদ্ধ বলে প্রমাণ করতে হবে। কেবলমাত্র মুখের জোরে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিলে অন্য বিজ্ঞগণ তাতে নিন্দা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। বুদ্ধ করণীয় মেন্ত সূত্রে বলেছেন, এমন কোন ক্ষুদ্র পাপও করবে না যাতে অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারে। বর্তমানে তোমাদের অবৌদ্ধ আচরিত কার্যকলাপ দেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তোমাদেরকে এবং বৌদ্ধধর্মকে

নিন্দা, অবজ্ঞা করতে সুযোগ পাচ্ছে। তোমাদের অজ্ঞানতা ও অকর্মণ্যতার জন্যই এসব হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত পবিত্র বিশুদ্ধ এবং দোষ পাপ কালিমা আরোপের উর্ধ্বে। তাই বলছি, তোমরা সাবধান হয়ে যাও, সর্বদা অপ্রমাদের সহিত উত্তমরূপে ধর্মাচরণ কর। হীনভাবে ধর্মাচরণ করবে না। উত্তমভাবে ধর্মাচরণ করলে কায় বিশুদ্ধ, বাক্য বিশুদ্ধ, মন বিশুদ্ধ হয়ে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ সহজ সরল হয়। এবং অনাবিল সুখের অধিকারী হওয়া যায়। তখন কোন পাপ কালিমায় স্পর্শ করতে পারবে না-তোমাদেরকে।

একদিন অগ্রবংশ ভক্তেকে নাকি জনৈক এক মৌলভী সাহেব বলেছিল-তোমাদের মেয়েরা বেয়াদব, বোরখা পরে না। বোরখা না পারে ঘুরে বেড়ায়। তোমরা সং শিক্ষা দিতে পার না। আমাদের মুসলিম মেয়েরা বোরখা পরে। কাজেই তারা বেয়াদব নয়। মৌলভী সাহেবের কথা মতে, মুসলিম মেয়েরা ছাড়া বাকি সবাই বেয়াদব। আচ্ছা, বল তো মৌলভীটি সত্যকথা বলেছে নাকি মিথ্যা বলেছে? এই সম্বন্ধে অনেক যুক্তি উপমা উপস্থাপন করে পূজ্য বনভক্তে বলেন, এ'কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ বোরখা না পরলে যে বেয়াদব হবে বা বেয়াদবি করবে তা ঠিক হতে পারে না, আর বোরখা পরলে যেই সবাই বেয়াদবি ত্যাগ করে তার নিশ্চয়তা কোথায়? মৌলভী সাহেব সেই নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হবে কি? কখনো দিতে পারবে না। আমি তো অনেক মুসলিম মেয়েকে বোরখা খসিয়ে পরপুরুষের দিকে উকি মারতে দেখেছি। উকি মারার সেই বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি হাত দিয়ে দেখায়ে দেন এবং বলেন এইভাবে তাঁরা বোরখা খসে লোভ চিন্তে পরপুরুষকে দর্শন করে। (সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়।) এগুলো কি বেয়াদবী নয়? কাজেই শুধুমাত্র বোরখা পরলে আদব শিক্ষা হয় না; নিজেকে পাপ হতে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না, পাপমুক্ত হওয়া যায় না। কারণ বোরখার মধ্যে সে জ্ঞান নিহিত নেই। তারা শরীরকে ঢেকে রাখলে কি হবে, মনতো খোলাই রয়েছে। মনের মধ্যে জ্ঞান না থাকলে শরীরকে একটা নয় হাজারো বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখলেও পাপ উৎপন্ন হবেই। মনের মধ্যে জ্ঞান উদয় করতঃ মনকে শুদ্ধ করতে না পারলে বাইরের আচরণে কি বা ফল হবে? তাহলে বোরখা দিয়ে শরীরকে ঢেকে রাখার স্বার্থকতা কোথায়? আর সেই বোরখা পরে বা বোরখা পরার নিয়ম প্রবর্তন করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা মূর্খতার পরিচায়ক নয় কি? বনভক্তে মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করে বলেন তোমরা কাপড়ের বোরখা পরে শরীরকে ঢেকে রাখার নিয়ম অনুসরণ নয়, জ্ঞানের বোরখা পরিধান করে চিন্তকে পাপ হতে দূরে সরিয়ে রাখ। প্রকৃতপক্ষে এটাই বেয়াদবি ত্যাগ করার উৎকৃষ্ট পন্থা। এই উপায় অবলম্বনে তোমরা বেয়াদবি ত্যাগ কর। আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কখনো

বেয়াদবি কাজ করবে না, বেয়াদবি কথা বলবে না, বেয়াদবি করলে মুক্ত হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, দেহকে ঢেকে রাখলে পাপমুক্ত হওয়া যায় না, চিন্তের মধ্যে জ্ঞান উদয় হলে তবেই পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব। এই নিয়মে পাপ উৎপন্ন হবার কোন সুযোগ নেই। বরং সকল প্রকার পাপ অকুশল হতে মুক্ত হওত নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। তাই তোমরা কাপড়ের বোরখা নয় জ্ঞানের বোরখা পরিধান কর। দেহকে ঢেকে রাখা নয় চিন্তের মধ্যে সহসা জ্ঞান উদয়ের চেষ্টায় রত থাক। এটাই প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ।

পূজ্য বনভন্তে বলেন—মনুষ্যজন্ম লাভ করার পর দুষ্কৃতিকর্মের ফলে একবার মানব জন্ম হতে চ্যুত হওত পশু-পক্ষীকূলে বা নরকে জন্ম হলে তাদের পক্ষে পুনঃ মনুষ্যত্ব লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই মানব জীবনকে ধরে রাখার এবং উর্ধ্বদিকে উন্নীত করার বাহন হল জ্ঞান আর কুশল। জ্ঞানের বল এবং কুশলের বল থাকলে মানুষের কখনো পরিহানি, অধোগতি হয় না। জ্ঞান, কুশল সর্বদা উর্ধ্বদিকে ধাবিত করায় এবং সুখ প্রদান করে। সেই জ্ঞান, কুশল কি রকম? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, চারি আর্যসত্য কুশল। বৌদ্ধ মাঝেই এই চারি আর্যসত্য জ্ঞান থাকতে হবে। চারি আর্যসত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস যার নেই সে প্রকৃত বৌদ্ধ নয়। সে অজ্ঞানতার সহিত অবস্থান করতেছে বলে জানবে। অন্যদিকে, যার নিকট জ্ঞান, সত্য বিদ্যমান রয়েছে সেই প্রকৃত সুখী। আর যার নিকট অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি বিদ্যমান থাকে সেই বড়ো দুঃখগ্রস্ত হয়ে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। মানুষ কেন দুঃখ পায়? অজ্ঞান মিথ্যার সহিত অবস্থান করলে মানুষ দুঃখ পায়। মনে রাখবে যার চিন্তা যত বেশি অজ্ঞান মিথ্যার দিকে ধাবিত হয় সে ততই দুঃখ ভোগ করে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন, তোমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত না থেকে জ্ঞানের আলোতে বেড়িয়ে এসো; মিথ্যার্থম্, পরধর্ম, পাপধর্ম আচরণ না করে সত্যধর্ম, নির্বাণধর্ম আচরণ কর। বৌদ্ধধর্মের আদর্শ হল, ত্যাগই মহিমা, ত্যাগেই সুখ, ভোগই দুঃখের মূল, ভোগই দোষপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের প্রত্যেক দেশনা ত্যাগের আদর্শে ভরপুর, এখানে কোন প্রকার ভোগের উপদেশ নেই। আগাগোড়া ভোগ ত্যাগ করার উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশই ভরা। ভোগ বিরতির দ্বারা ত্যাগের সুফল, অনিসংস প্রকাশিত হয়। সেই ত্যাগ কি? অবিদ্যা, তৃষ্ণা ত্যাগ। সত্ত্বগণ অবিদ্যা, তৃষ্ণার দ্বারা ভোগ করতঃ কষ্ট পাচ্ছে। বৌদ্ধধর্মের মতে ভোগ করলেই দুঃখ পেতে হয়; ভোগের মাধ্যমে কখনো সুখ অর্জিত হয় না। সুখ লাভের জন্য ত্যাগের কোন বিকল্প নেই। যা ত্যাগ তাই সদ্ধর্ম; ভোগ করলে তা পরধর্মের অন্তর্গত বলে জানবে। সদ্ধর্মই সুখ কিন্তু পরধর্ম সীমাহীন দুঃখ। তাই যারা জ্ঞানী ব্যক্তি একমাত্র তারাই ত্যাগময় এ'বৌদ্ধধর্ম আচরণ ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। আর পরম সুখে

জীবন-যাপন করে থাকে।

তোমরা রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে। বৌদ্ধধর্মের মতে রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা হতে যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি হয়। এ'ধর্মে রাগ, (লোভ) হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণার কোন স্থান নেই। রাগ হতে মুক্ত, হিংসা হতে মুক্ত, অজ্ঞান হতে মুক্ত, তৃষ্ণা হতে মুক্ত এটাই হলো বৌদ্ধধর্ম। রাগ থেকে মুক্ত হলে সুখ, হিংসা থেকে মুক্ত সুখ, অজ্ঞান থেকে মুক্ত হলে সুখ এবং তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হলে সুখ লাভ হয়। শুধু সেই পবিত্র বিশুদ্ধ সুখকেই তোমরা প্রত্যাশা করবে। মনে রাখা দরকার রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা যুক্ত হলেই দুঃখ। তাই যারা প্রকৃত বৌদ্ধ তারা রাগ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে থাকে। যারা রাগ ত্যাগ করে না, হিংসা ত্যাগ করে না, অজ্ঞান ত্যাগ করে না, তৃষ্ণা ত্যাগ করে না তারা বৌদ্ধ নয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা কখনো নির্দয় হবে না। প্রত্যেক প্রাণীকে সমভাবে দয়া কর। নির্দয় হলে সৎ দেবতাগণ তার প্রতি অসন্তোষ হয়, ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। তাই কোন প্রাণীকে টিল-দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করবে না। সকল প্রকার বধ, বন্ধন, প্রহার হতে নিজেকে বিরত রাখবে। প্রাণীদিগকে দুঃখ তাড়না প্রদান করলে নিজের সুখ হরণ হয়ে যায়। আর কোন প্রাণীকে দুঃখ যাতনা প্রদান না করলে এবং প্রদানের কারণ না হলে নিজের সুখ বর্ধিত, বহুলীকৃত হতে বাধ্য। বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন-

সবে তদ্বৎ দণ্ড ভয়ে, প্রাণ ভালোবাসে সবে,
নিজের উপমা করে না বধিবে না বধাবে।
ক্রোধ বাক্য বাস্তবিক বড়ো দুঃখকর,
হবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব তোমার উপর।

তোমরা শত্রু-মিত্র ভেদ জ্ঞান না করে প্রত্যেক প্রাণীকে দয়া কর। কখনো নিজের সুখ লাভের তরে অপরকে নির্যাতন, দুঃখ প্রদান করবে না। এই স্বার্থপর উপায় অবলম্বনে ইহকাল পরকাল কোনকালে সুখ শান্তি লাভ হয় না। তাতে বরং দুঃখই বেড়ে যায়; অনুশোচনা, অনুতাপের অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হয়। সুখের পরিবর্তে দুঃখই ভোগ করতে হয় মাত্র। জগতের প্রত্যেক প্রাণী সুখ চায়, সুখে আনন্দিত, দুঃখে কাতর হয়। তাই সকলকে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশী হয়ে কেহকে দুঃখ-যাতনা, নির্যাতন-নিপীড়ন করবে না। অধিকন্তু, সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করবে। “জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক দুঃখ হতে মুক্তি হোক” এই বলে প্রতিদিন সকাল, বিকাল, দুপুর দিনে তিনবার মৈত্রী ভাবনা করলে কোন শত্রুই অনিষ্টসাধন করতে পারবে না। এমন কি অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা বধ, প্রহার করতে উদ্ধত হলেও সফল হবে না। তোমরা একইভাবে সকল

প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবনাপন্ন হয়েই অবস্থান কর। কখনো হিংসা প্রবৃত্তি জাগরিত করবে না। যারা প্রাণী হিংসা করে তারা কিছুতেই আর্য হতে পারে না। আর অনার্য ব্যক্তিদের সুখ শান্তি লাভের আশা সুদূর পরাহত। তাই আবারো বলছি তোমরা সকল জীবের প্রতি অহিংসক হয়ে যাও। এতে তোমাদের সুখ শান্তি উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবেই।

সাধু, সাধু, সাধু।

স্বামী-শ্রী উভয়কে শীলবান প্রজ্ঞাবান হতে হবে

একসময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশ্রবির (বনভণ্ডে) মহোদয় বিলাইছড়ি এলাকাবাসীদের দ্বারা আয়োজিত সার্বজনীন দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-দান, শীল, ভাবনা এগুলো হল বৌদ্ধধর্ম। দান দিলে তোমরা শ্রদ্ধা সহিত দিবে, কখনো অশ্রদ্ধা অবিশ্বাসের সহিত দান দিবে না। যাদের কর্মফল, পরকাল সম্বন্ধে জ্ঞান আছে একমাত্র তাদের দ্বারাই শ্রদ্ধার সহিত দান দেওয়া সম্ভব হয়। আর যাদের কর্মফল, পরকাল সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নেই তাদের দ্বারা দানকার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। কর্মফল, পরকালকে বিশ্বাস করে দান দিলে তা' সদ্ধর্ম (আচরিত) হয়। এই সদ্ধর্ম আচরণের মাধ্যমে নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়। “এই দানের ফলে আমাদের পরিহানি না হয়ে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হওত ইহকাল-পরকালে সুখ লাভ হোক” এরূপ বলে তোমরা দান দিবে। আত্মপ্রশংসায় রত হয়ে অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা করে দান করবে না। নিজকে প্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা করে দান দিলে পাপ হয়। তোমরা দান দেওয়ার সময় “বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক; তাদের মঙ্গল হোক” এই কামনা করে কার্যাদি সম্পাদন করবে। মনে রাখবে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে দান দিলে মহৎ ফল হয়। আর আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা অবজ্ঞার সহিত দান দিলে তা' মহৎ ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়ে যায়। দান কি? লোভ পরিত্যাগই দান। যারা লোভী তারা দান দিতে পারে না। “দান দিলে আমি খাব কি” এই সংকীর্ণতা মনোভাব থেকে তারা দান দিতে সমর্থ হয় না। একদিন আমাকে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, দান দিলে আমি তো খেতে পাব না, কাজেই আমার পক্ষে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দেওয়া সম্ভব নয়। আমি বললাম তুমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিবে কি দিবে না এটা আমাদের বিষয় নয়। তবে একান্তই যদি ভিক্ষুসঙ্ঘকে কিছু দান না কর তাহলে মৃত্যুর পর হঠাৎ কোন জন্মে তুমি প্রবজ্যা গ্রহণ করলে সে সময় তোমাকেও কেহই দান দিবে না। তখন তুমি ভাবতে থাকবে সবাইকে দান করতেছে, কিন্তু আমাকে কেন দান করছে না? আর বর্তমানে তুমি যদি ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান কর কোন জন্মে তুমি প্রবজ্যা গ্রহণ করলে তোমাকেও লোকে

প্রভূত দান করবে। এটা হচ্ছে দানের ফল। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির উৎসাহের সহিত ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম বস্ত্র দান করতে প্রত্যাশী হয়ে থাকে; যাতে তারাও কোন জন্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে উত্তম দানীয় সামগ্রী লাভ করতে সক্ষম হয়। এ' কথা বলায় জনৈক ব্যক্তিটি বলে উঠল, ভগ্নে, আমার ভুল হয়েছে। ঠিক আছে আমি দান করব। শাস্ত্রে দেখা যায় বুদ্ধের সময়ে কোন কোন ভিক্ষু অরহত্ব লাভ করেও চারি প্রত্যয় অলাভী ছিলেন। তাদের অরহত্ব লাভ করার পারমী ছিল বটে কিন্তু পূর্বজন্মের দান পারমী সবল ছিল না। সেই হেতু অরহত্ব ফল লাভ করার পরও চারি প্রত্যয়ের সুবিধাদি পায়নি। বুদ্ধ বলেছেন, দানের দ্বারা বিপুল ফল লাভ হয়; দান স্বর্গ লাভের সোপান, দানে শান্তিকর সুখ আনয়ন করে। দানের মাধ্যমে পার্থিব অপার্থিব সর্ববিধ সুখ লাভ হয়। দানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ নির্বাণ সুখ প্রাপ্তি হয়। বর্তমানে অনেক ব্যক্তি আমার নিকট এসে দানে প্রত্যক্ষফল প্রাপ্তির কথা স্বীকার করতেছে। হিংসা পরিত্যাগ করাই শীল। শীল পালন করতে হলে হিংসা পরিত্যাগ করতে হয়। হিংসা বিদ্যমান থাকলে কিছুতেই শীল পালন করা যায় না। তোমরা জীবনের বিনিময়ে হলেও পঞ্চশীল ধর্ম রক্ষা কর। প্রাণী হত্যা করবে না, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজি করবে না, ব্যভিচার করবে না, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য প্রয়োগ করবে না, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবন করবে না। যদি নিছদ্মভাবে পঞ্চশীল পালন করতে পার তাহলে অনুৎপন্ন হিংসা উৎপন্ন হতে পারবে না, উৎপন্ন হিংসা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। জ্ঞানী ব্যক্তি শীল পালনের ফলে তিন প্রকার সুখ প্রার্থনা করে থাকে; তারা ইহলোকে প্রশংসা, বিত্ত (সম্পদ) এবং মৃত্যু পর সুগতি স্বর্গ লাভ প্রার্থনা করে। শীলবান ব্যক্তি দেবতা-মনুষ্য-ভূত-প্রেত সকলের প্রিয় হন। ইহলোকে শীলসম্পন্ন শীলবান ব্যক্তি অপ্রমাদ বশত প্রচুর ভোগের অধিপতি হয়। শীলবান ব্যক্তি দেহাবসানে মৃত্যু পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এই শীল স্বর্গারোহণের সোপান স্বরূপ অথবা নির্বাণ নগরে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। শীলের সমান আর কি আছে। শীলবান সুসংযত ব্যক্তি সর্বদাই তুষ্টি লাভ করে। ইহলোক শীলই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রজ্ঞাবানই উত্তম। অজ্ঞান পরিত্যাগই ভাবনা। অজ্ঞানী ব্যক্তির ভাবনা করতে পারে না। যেই মানুষ সংসারের বিষয়-বাসনায় বিমুগ্ধ, প্রমত্ত তাদের দ্বারা ভাবনা করা সুদূর পরাহত। তারা সদ্ধর্ম দর্শন করতে পারে না। সদ্ধর্মকে অদর্শন হেতু তারা দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

তিনি আরো বলেন-বুদ্ধ বলেছেন সম্পত্তি পরিহানি, যশ পরিহানি সামান্য মাত্র; প্রজ্ঞা পরিহানিই অধিক পরিহানি। কারণ কালের প্রভাবে সম্পত্তি পরিহানি, যশ পরিহানি হয়ে গেলেও তা' পুনঃ লাভ করার সম্ভাবনা থাকে বা পুনঃ লাভ করা যায়। কিন্তু প্রজ্ঞা পরিহানির ফলে একবার যদি খারাপকর্ম সম্পাদন করা হয়

তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন সুযোগ নেই। অন্যদিকে প্রজ্ঞা পরিহানি হবার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ কর্মে আসক্ত হওত একবারে নিম্নের দিকে তলিয়ে যেতে হয়। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ জ্ঞান। সেই জ্ঞান না থাকলে তোমাদেরকে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতেই হবে। কোন প্রস্তর খণ্ড জলে নিক্ষেপিত হলে তা' যেমন ক্রমান্বয়ে নিম্নের দিকে তলিয়ে যায়, উপরিভাগে ওঠার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ঠিক তেমনি প্রজ্ঞার পরিহানি হয়ে গেলে আর সম্যকপথে ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই তোমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন করা এবং যাতে জ্ঞানের পরিহানি হতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। সম্পত্তি, যশের চিন্তা করবে না। ধর, বর্তমানে তোমাদের সম্পত্তি পরিহানি হয়েছে, যশের উপর কালো প্রলেপ ঢাকা পড়েছে। কিন্তু পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী কিছু দিনের মধ্যেই পূর্ব হতে অধিক পরিমাণের সম্পত্তি লাভ হতে পারে; কোন ভালো কাজে সফলতার ফলে পূর্বের যশ হতে আরো বেশি সম্মান সুনাম লাভ হতে পারে। কাজেই সম্পত্তি, যশ পরিহানিতে কিছুই আসে যায় না। এগুলো ফিরিয়ে পাওয়া তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। মনে রাখবে তোমাদেরকে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে-সম্পত্তি, যশ লাভের জন্য নয়। জ্ঞান লাভই প্রকৃত লাভ। জ্ঞান না থাকলে যেখানে যাও না কেন বিন্দু মাত্রও সুখ লাভ করতে পারবে না। জ্ঞান বিহীনে কোথাও সুখ নেই, শান্তি নেই। যেই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যার মধ্যে জ্ঞান থাকবে না সেই পরিবারে সর্বদা অশান্তি লেগেই থাকবে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হবে, পিতা-পুত্রে ঝগড়া হবে, মা-মেয়ের মধ্যে ঝগড়া হবে, কতাবার্তায় অমিল, মনোমালিন্য ভুল বুঝাবুঝি সহ দুঃখ, কষ্টে করুণ হয়ে উঠবে সেই পরিবারের অবস্থা। ভেঙ্গে পড়বে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যার অকৃত্রিম ভালোবাসা, সুখ, শান্তির সমস্ত আয়োজন।

তোমরা কামভোগী গৃহীরা সবাই ধনী হতে চাও। ধন, জন, স্ত্রী-পুত্র কামনা করে থাক। লক্ষ কোটির ব্যাংক ব্যাল্যান্স, বহু তালা বাড়ি, মূল্যবান গাড়ি, দামী বস্ত্রালংকার, উচ্চতর ডিগ্রী এবং প্রভূত ভোগ্য সামগ্রীর অধিকারী হতে পারলে সুখ বলে মনে কর। কি তাই মনে কর না? নিশ্চয়ই মনে কর। কারণ এসব হলে তোমরা বেশি করে কাম্যসুখ ভোগ করতে পার। অনেক যুবতী মেয়ে (চাকমা, বড়ুয়া) আমার নিকট এসে বলে ভক্তে আমরা ভালো স্বামী চাই। আমি বলি কি রকম ভালো স্বামী চাও? কেহ বলে 'আমি ডাক্তার স্বামী চাই', কেহ বলে 'আমি ইঞ্জিনিয়ার স্বামী চাই', কেহ বলে 'আমি প্রফেসার স্বামী চাই'। আচ্ছা তাহলে কি শুধুমাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার স্বামীরাই ভালো; আর যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার নয় তারা খারাপ? মেয়েদের ভালো স্বামী প্রার্থনার তালিকা দেখলে তো তাই মনে হয়। (পূজ্য ভক্তে কয়েকজনের কাছে এব্যাপারে অভিমত

জানতে চান। তারাও নিজের খেয়াল খুশি মত অভিমত ব্যক্ত করে এবার ভস্তে বলেন) আসলে ভালো খারাপের বিচারে নয়, অর্থ উপার্জনের দিকটা চিন্তা করে মেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার স্বামী প্রার্থনা করে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার স্বামীরা প্রতিটি মাসে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করবে আর তারা মূল্যবান বস্ত্রালংকার মনের মত ক্রয় করে পঞ্চ কামণ্ডল সুখে বিভোর হয়ে থাকবে। বুদ্ধ বলেছেন, মেয়েদের স্বভাব এরূপই। তারা সর্বদা ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকতে পছন্দ করে, এসবের মধ্যে মেতে থাকতে পারলে খুব খুশি হয়। তাই আমি কি বলি জান? বিড়াল আর মেয়েরা স্বভাবে একই-ভোজন, আরাম (আয়াস) প্রিয়। তোমরা দেখছ কি যেই বাড়ীতে ঠিকমত খানাপিনা চলে না সেই বাড়ীতে বিড়াল থাকে না অন্যত্র চলে যায়। অন্যদিকে যেই বাড়ীতে ভালো, উত্তম খানাপিনা চলে সে বাড়ীতে আপনাপানিই বিড়াল এসে জড়ো হয়। আমি গৃহী অবস্থায় এসব খেয়াল করেছিলাম। অনেক বিবাহিত মেয়ে আমার কাছে এসে বলতেছে, ভস্তে আমি স্বামীর গৃহত্যাগ করে এসেছি। সে আমাকে ঠিকমত ভরণ পোষণ করতে পারে না। বাপের বাড়ীতে আমি ভালো আছি। এভাবে তারা দুঃখ-কষ্ট পেলে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়ীতে আসতেছে। এটা বিড়ালের স্বভাব নয় কি? (এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভার মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়।) বুদ্ধ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী হলে দু'টো ধর্ম ভোগ করতে হয়; সেগুলো হল, সুখের ধর্ম ও দুঃখের ধর্ম। সংসারী জীবনে সব সময় সুখ লাভ হবে এমন কোন কথা নেই, আবার সব সময় যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে তাও বলা যায় না। অর্থাৎ কখনো সুখ কখনো দুঃখ লাভ হতেই পারে। এটা সংসারী জীবনের ধর্ম। কাজেই স্বামী-স্ত্রীকে সুখে-দুঃখে একে অপরের বন্ধু হিসাবে থাকতে হবে। সুখ লাভ হলে স্বামীর গৃহে থাকবে, দুঃখ পেলে স্বামীর গৃহত্যাগ করবে এটা তো হতে পারে না। তাই বুদ্ধের মতে সম্পত্তি ক্ষয়ে স্ত্রী পরীক্ষা হয়। আসলে সে ভালো না মন্দ? সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যদি স্ত্রী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে না তাহলে সেই স্ত্রী প্রকৃত ভালো। আর যে স্ত্রী শুধুমাত্র সম্পত্তি লাভের সময় ভালো থাকে, অন্য সময় স্বামীর গৃহত্যাগ করে সেই স্ত্রী খারাপ। আচ্ছা ধর, আজকে কোন স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভালো নয় বিধায় স্ত্রীকে ঠিক মত ভরণ পোষণ করতে পারছে না; আর তার স্ত্রী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়ী চলে গেল। কিন্তু হঠাৎ পূর্বজন্মের পুণ্য প্রভাবে স্বামী যদি তিন বৎসর পর কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়। তখন ঐ স্ত্রী কি করবে, আবার স্বামীর গৃহে ফেরৎ যেতে ইচ্ছে করবে কি? করবে। এটাও কি বিড়ালের স্বভাব হয়ে যাচ্ছে না! বর্তমান প্রথম পছন্দের স্বামীরা হল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর। অন্যদিকে এতো অধিক সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কোথায় পাওয়া যাবে? সব মেয়েদের

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর স্বামীর প্রার্থনা অনুচিত। বুদ্ধের সময়কালীন যুবতী মেয়েরা কিন্তু এরূপ প্রার্থনা করত না। তারা কিরূপ প্রার্থনা করত জান? সংপাত্র, সুপুত্র, ধন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শীলবান প্রজ্ঞাবান। সেই সং পাত্র, সুপুত্র, ধন, শীলবান, প্রজ্ঞাবান কি রকম? ভালো স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন, অমায়ারী স্বামী; সুপুত্র হল পিতা-মাতার অনুগত, মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন সন্তান, ধন বা অর্থবিস্ত এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাকার সুবিধার্থে শীলবান, প্রজ্ঞাবান। সেই প্রার্থনা লাভ করতঃ তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্রোতাপত্তি মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইহ পারত্রিক সুখের অধিকারী হতো। বৌদ্ধধর্মের মতে এই প্রার্থনাসমূহ আর্যসম্মত এবং সুখ লাভের সহায়ক। কিন্তু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর স্বামী লাভের দ্বারা ইহ-পারত্রিক সুখ লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই। আচ্ছা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর স্বামীরা যদি মদ খেয়ে থাকে, জুয়া খেলে অর্থ অপচয় করে, ব্যভিচারে রত হয় তাহলে স্ত্রীর সুখ লাভ হবে কি? কিছুতেই হবে না। যেখানে ইহ লোকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হবে সেখানে পার লৌকিক সুখ লাভের সুযোগ কোথায়? তাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হতে শীলবান প্রজ্ঞাবান সং পাত্র অনেক উত্তম। এমন স্বামীর গৃহে (অনেক সময়) অতিরিক্ত ভোগ সুখ পাওয়া না গেলেও মানসিকভাবে সুখ পাওয়া যাবে। এবং পারত্রিক সুখ লাভের নিশ্চয়তাও থাকবে। তবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর স্বামীরা যদি মদ না খায়, জুয়া না খেলে, ব্যভিচারে রত না হয় তারাও খারাপ নয়। মোটকথা শীলবান প্রজ্ঞাবান ধার্মিক হতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শীলবান, প্রজ্ঞাবান ধার্মিক হলে তবে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। তখন সংসার দুঃখের মাঝে কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও সুখ পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শীলবান প্রজ্ঞাবান ধার্মিক হলে তাদের ঘরে খারাপ সন্তান জন্মায় না। এমন কি স্বর্গ থেকে চ্যুত হওয়া দেবপুত্র গণ তাদের বাড়ীতে জন্ম নেওয়া সম্ভাবনাও থাকে। তাই স্বামী-স্ত্রী সুখী হতে চাইলে উভয়কে শীলবান, প্রজ্ঞাবান ধার্মিক হতে হবেই। এতে ইহ-পারত্রিক সুখ লাভের সুযোগও নিহিত থাকে।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-তোমাদের মনচিন্ত মাররাজ্যের মধ্যে থাকলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা সুকঠিন হবে। মাররাজ্যে থেকে এ'ধর্ম আচরণ করতে গেল নানাবিধ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়, দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে হলে মনচিন্ত নির্বাণরাজ্যে থাকতে হয়। মনচিন্ত নির্বাণরাজ্যে থাকলে তবেই বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যায়, আচরণ করা সহজ হয়ে পড়ে। মনে রাখবে, মনচিন্ত যখন নির্বাণরাজ্যে যেতে সক্ষম হয় কেবলমাত্র তখনই সুখ। এবং সেই অবস্থায় সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত। অন্য দিকে মনচিন্ত মাররাজ্যের মধ্যে থাকলে দুঃখ পায়, মুক্ত হতে পারে না। আর সেই দুঃখের

দরুন একত্রিশ প্রকার লোকভূমিতে পরিভ্রমণ করতে থাকবে-সুখের আশায়। কিন্তু যার চিন্তা মাররাজ্য হতে মুক্ত তার সংসার পরিভ্রমণ বন্ধ হয়ে যায়। তাকে নানা যোনিতে জন্ম নিয়ে সংসারচক্রে ঘুরে দুঃখ ভোগ করতে হয় না। তখন তার চিন্তা স্বাধীন মুক্ত, নির্বাণগত। এটাই হল প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম।

তোমরা সকলে মরণানুস্মৃতি ভাবনা কর। জগতে যত প্রকার জীব আছে সবাইকে মরতে হবে। এই সংসারে মরণই ক্ষুব, জীবন (প্রাণ) অক্ষুব। এখানে কেহ চিরস্থায়ীভাবে থাকতে পারে না; আজকে না হয় কালকে সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কারোর রেহাই নেই। আমরা দু' দিনের জন্যই এ সংসারে আসি। দুই দিনের তরে আমাদের দেখাদেখি হয়। যখন কারো মৃত্যু হয়ে যায় তখন কি আর তার সঙ্গে দেখাদেখি হয়? হয় না। যেন সবাই পথের পরিচয় মাত্র। যতক্ষণ পথ চলা ততক্ষণ কথাবার্তা, দেখাদেখি। যখন পথচলা শেষ তখন সব শেষ। এভাবে তোমরা মরণানুস্মৃতি ভাবনা কর। তীক্ষ্ণ ও মৃদুভাবে মরণানুস্মৃতি ভাবনা দুই প্রকার। মৃদু মরণানুস্মৃতি ভাবনা দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, আর মনুষ্য জন্ম হলে ধনীকুল, রাজকুলে জন্ম হয়। তীক্ষ্ণ মরণানুস্মৃতি ভাবনা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে। সেই তীক্ষ্ণ মরণানুস্মৃতি ভাবনা কি রকম জ্ঞান? রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়তে এ'রূপ জ্ঞান করতে হবে 'আগামীকাল বিছানা থেকে যে উঠতে পারব তার কোন নিশ্চয়তা নেই।' আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে এ'রূপ জ্ঞান করতে হবে "আজ রাত্রিতে আবার যে এই বিছানায় ঘুমাতে পারবো তার কোন নিশ্চয়তা নেই।" এই রকম গভীর অনিত্য জ্ঞান সম্পন্ন মরণ চিন্তাই তীক্ষ্ণ মরণানুস্মৃতি ভাবনা। মরণানুস্মৃতি ভাবনা করলে কোন প্রকার কলহ, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসাহিংসি, রেষারেষি, শত্রুতা কিছুই থাকতে পারে না। পাপও অন্তর্ধান হয়ে যায়। কারণ যেখানে সকলের আশু মৃত্যু হবে সেখানে কিসের কলহ বিবাদ? কাজেই সমস্ত কলহ, বাদ-বিবাদ, শত্রুতার তখনই পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যারা মরণানুস্মৃতি ভাবনা করে না সেরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির মনে করে এ' সংসারে আমি তো আছি এবং থাকবো তাদের সেই মিথ্যাভাব হতেই সব দুঃখ, অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই তোমরা সকলে মরণানুস্মৃতি ভাবনা কর। তাহলে বর্তমান দুঃখপূর্ণ অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিদায় নিবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-মানুষ অজ্ঞানী হলে খুব ভয়ঙ্কর বলে জানবে। তারা হিংস্র বন্য পশুর চেয়েও অধিক পরিমাণে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। কারণ মানুষের যে বুদ্ধি কৌশল বিদ্যমান থাকে অজ্ঞানীরা সেই বুদ্ধি কৌশলকে মন্দ কাজে ব্যবহার করে। ফলে বন্য পশুর অপেক্ষা বহু গুণে বেশি অপরের ক্ষতি সে সাধন করতে সমর্থ হয়। যেমন একটি বাঘ যদি মানুষ মেরে খেতে চায় তাহলে বাঘকে কতোই না কষ্ট করতে হয় এবং বহু সময় সাপেক্ষে সে কাজে সফল হয়। কিন্তু

একজন অজ্ঞানী মানুষ মুহূর্তেই ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে শত শত জন মানুষের জীবন নষ্ট করে দিতে সক্ষম। তজ্জন্য অজ্ঞানীরা হিংস্র বন্য পশুর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ও বিপদজনক বলে জানবে। তাদের এমন কোন খারাপ কাজ নেই যে কাজটি তারা করতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ সেই অজ্ঞানীদেরকে অনর্থকারী, অহিতকারী ও দুঃখসৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করেছেন। আর জগতে যত প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয় একমাত্র সেই অজ্ঞানীদের জন্যেই। অজ্ঞানীরা কিছুতেই সংকর্ম সম্পাদন করতে চায় না। যত প্রকার খারাপ আছে তা অজ্ঞানীরাই সম্পাদন করে থাকে। তাই অজ্ঞানী দ্বারা কোন কাজ চলবে না। তোমরা সকলে জ্ঞানী হয়ে যাও। কখনো অজ্ঞানী হবে না। অজ্ঞানী ব্যক্তির ইহকাল-পরকাল কোন কালেই সুখ লাভ হয় না। কারণ তাদের কায় দূষিত, বাক্য দূষিত, মন দূষিত। অজ্ঞানীরা দেহান্তেই নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই আবারো সাবধান করে দিয়ে বলছি, তোমরা অজ্ঞানী হবে না, অজ্ঞানীর সঙ্গে চলাফেরা ও অজ্ঞানীর সংস্পর্শে যাবে না। নিজেদের পরিবারে, সমাজে সুখ, শান্তি মঙ্গল চাইলে তোমরা অজ্ঞানীদেরকে সর্বতোভাবে পরিহার করে চলো। জ্ঞানী ব্যক্তির সং পরামর্শ, সদুপদেশে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে চালিত কর। এতেই সুখ শান্তি লাভ হবে-অন্যথায় নয়। সবাই জ্ঞানী হতে তৎপর থাক।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমাদেরকে নিম্নগামী ও পরিহানির হাত থেকে রক্ষা করাই

আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য

এক সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশুভির (বনভক্ত) মহোদয় সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার তবলছড়ি কাটাপাহাড়স্থ বাড়ীতে আয়োজিত সম্মেলনে, অষ্ট পরিষ্কার দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-মানুষ নিজেই নিজের কুটুম্ব নয়। অপরের আত্মীয় বা কুটুম্ব হওয়া দূরে থাক। কাজেই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন আত্মীয় স্বজন সবই মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আচ্ছা, আজকে যাকে আপন স্ত্রী বা পুত্র বলে দাবি করতেছ আগামীকাল সেই স্ত্রী বা পুত্রের মৃত্যু ঘটলে তারা কি আর স্ত্রী, পুত্র রূপে থাকবে? থাকবে না। সুরেশ্বর! তুমি বর্তমানে কল্পরঞ্জনের বড়ো ভাই, একটু চিন্তা করে দেখতো তোমার মৃত্যু হয়ে গেলে আবারো কি কল্পরঞ্জনের সাথে ভাই হতে পারবে? কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন কি আবারো যে কল্পরঞ্জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, কুশল বিনিময় হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তোমাদের অনেক জ্ঞাতি যারা মারা গেছে। তাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হচ্ছে বা হবে? অথচ যখন তারা জীবিত ছিল তখন কতই না অন্তরঙ্গ ছিলে। কিন্তু এখন কেহ কারোর অবস্থা, খবর কিছুই

জান না। অন্যদিকে বর্তমানে ভাই কিন্তু উভয়ে মৃত্যুর পর যদি পারম্পরিক বিরোধপূর্ণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ কর তখন কি একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে না? ধর, মৃত্যুর পর তুমি হরিণ হয়ে জন্ম নিলে আর কল্পরঞ্জন হল একজন শিকারী, তখন তোমাকে কি কল্পরঞ্জন গুলি চালাবে না? নিশ্চয় চালাবে। সে সময় তো কেহই কাকে চিনতে পারবে না, পূর্বজন্মে আমরা দুই ভাই ছিলাম। কাজেই তোমরা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নি, বাপ-মা, আত্মীয় স্বজন মিথ্যা ধারণা করতঃ বিবিধ দুঃখ ভোগ করতেন্ন মাত্র। আমি বলি কি জান? তোমরা নির্লজ্জের কাজই করতেন্ন। সেই নির্লজ্জের কাজ কিরূপ? পুরুষেরা অপরের এক মেয়েকে বাড়ীতে এনে নিজের বউ বলে পরিচয় দিচ্ছে, আর মহিলারা পরের বাড়ীতে গিয়ে পরের ছেলেকে নিজের স্বামী বলে পরিচয় দিচ্ছে। এই উভয় কাজই কেবলমাত্র লজ্জাহীনদের পক্ষে শোভা পায়। যারা জ্ঞানী তারা এ সকল হীন, মিথ্যা, অসার কাজে লজ্জা পায়। একটু জ্ঞান দিয়ে দেখতো এই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী আসলে কি সত্য? প্রকৃতপক্ষে এসব কিছু মিথ্যা, অসার, পাগলের প্রলাপ। তোমরা দুঃখ পাওয়া জন্য, লজ্জিত হবার জন্য এবং পরাজিত হবার জন্যই মিথ্যা অসারকে নিয়ে লাফালাফি করতেন্ন। বনভন্তে ভালো মানুষ (জ্ঞানী) বলে এসব মিথ্যা অসারকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে সুখেই অবস্থান করতেন্ন। তোমরা সবাই পাগল বলেই মিথ্যা অসারকে নিয়ে পাগলামি করতেন্ন এবং তাতে মহাখুশীতেই অবস্থান করতেন্ন-কোন প্রকার লজ্জাবোধ না করে। তোমাদের সেই মিথ্যা লাফালাফি অজ্ঞানীদের নিকট শোভা পায় জ্ঞানীদের জন্য সেসব একেবারে অশোভনীয়। একদিন এক যুবতী মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ভাস্তে আপনি কেন বিয়ে করেন নি? তাকে বলেছিলাম চারটি কারণে আমি বিয়ে করিনি। যথা-(১) বিয়ে করলে অজ্ঞান বৃদ্ধি পায় (২) পাপ হয়ে যায় (৩) বিবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় (৪) সেই স্বামী-স্ত্রী এক সময় মারা যায়, মিথ্যা হয়ে যায়। এই চারটি কারণ দেখেই আমি বিয়ে করিনি। তদুপরি বুদ্ধের ভাষিত কামের আদীনব উপদ্রবসমূহ আমি গৃহী অবস্থায় জ্ঞানতঃ প্রত্যক্ষ করেছিলাম একদম কাছে থেকেই। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, পিতা-পুত্রে ঝগড়া, মা-মেয়ের ঝগড়া, ভ্রাতা-ভগ্নিতে ঝগড়া, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় ঝগড়া, ভগ্নিতে-ভগ্নিতে ঝগড়া, আত্মীয় স্বজনের মাঝে ঝগড়া, পাড়া-প্রতিবেশীতে ঝগড়া, বাদ বিবাদ মনোমালিন্য, তার উপর অর্থ বিস্তের অভাব, সম্পত্তি হ্রাসের ভয় সহ অবর্ণনীয় উপদ্রব ও উৎপাতে ভরা সংসারী জীবন। আবার স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসারী জীবন-যাপন করতে করতে হঠাৎ স্বামী মরে যায়, কখনো স্ত্রী মরে যায়। কখনো বা পুত্র মরে যায়, কন্যা মরে যায়। আর তখন পরিবারের অন্য সদস্যরা জীবিত স্বামী

অথবা স্ত্রী মাথায়, বুকে কষাঘাত করে উচ্চশব্দ মহাশব্দে ক্রন্দন করতে থাকে।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা কখনো পাপকর্ম সম্পাদন করবে না। সর্ব পাপকর্ম হতে বিরত থাকই হল বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা' যথাযথভাবে মেনে চল, আচরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমাদের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সুখ, শান্তি অর্জিত হবে। অন্যদিকে এধর্মকে বিশ্বাস না করলে, মেনে না চললে আগামীতে তোমাদের জন্য বড়ো বিপদ আসতেছে বলে জানবে। তোমরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বুদ্ধের উপদেশ মত দান শীল ভাবনা অনুশীলন কর তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো, তোমাদের কখনো পরিহানি হবে না। দান দিলে কি হয় জান? আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, প্রজ্ঞা লাভ হয়, বৃদ্ধি পায়। শীল পালনের দ্বারা সর্বদিকে উন্নতি হয়। সৎ দেবতাগণ শীলবান ব্যক্তিদের সহায় হন। ভাবনা দ্বারা অজ্ঞানতা ভাব দূরীভূত হয় নির্বাণের দিকে ধাবিত হওয়া যায়। বর্তমানে অনেকে আমার নিকট এসে বলতেছে 'ভন্তে আপনাকে দান করে আমরা (আমি) ফল পেয়েছি, অমুক বিপদ হতে উদ্ধার হয়েছি।' আচ্ছা, এগুলো কি জান? এগুলো হল সত্যের প্রভাব। (আমি) বনভন্তে বুদ্ধের ত্যাগময়, জ্ঞানময় শিক্ষা গভীরভাবে বিশ্বাস করতঃ তা' আচরণের মাধ্যমে যেই চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছে, সেই জ্ঞান সত্যের প্রভাব। বনভন্তেকে দান দিলে কিংবা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করলে ঐ সত্যের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিপদ কেটে যায়, আর সেই ভক্তবৃন্দরা বিপদ হতে উদ্ধার হয়, রক্ষা পেয়ে থাকে। আবার অনেকে উষ্টোদিকেও ফল পাচ্ছে অর্থাৎ আমাকে সে অলস, ভণ্ড, অরহত নয় ইত্যাদি ভাবে নানাভাবে অবজ্ঞা, তুচ্ছ, কটাক্ষ করার ফলে। জনৈক..চারজন ভিক্ষু এবং রাজ্যমাটির জনৈক.. পাঁচ জন নামকরা লোক এভাবে মারা গেছে। বনভন্তে নিজের মুখে আঙ্গুল দিয়ে সিংহনাদে বলে দেন-মনে রাখবে, এই মুখে আমি যা বলি তাই সত্য হবে। আমাকে অযথা গালিগালাজ করবে না। এক্ষেত্রে একটা সীমা আছে, সীমা অতিক্রম করলে বউ-এর রান্না করা ভাত খাওয়ার সুযোগটুকু পাবে না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে। এটা কোন অভিশাপ নয়, অনিষ্ট কামনাও নয়। বনভন্তে তোমাদেরকে কি কোন ক্ষতি করতেছে যে তাকে গালিগালাজ করতে হবে? কাজেই তোমাদের মত পাপী আর কে হতে পারে? সে পাপের কারণে দেবতাগণ তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েই মেরে ফেলবে। বুদ্ধের সময়কালও দেখা যায়, প্রথমদিকে অনেকে বুদ্ধকেও অযথা গালিগালাজ করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রক্তবমি হয়ে, মলদ্বার দিয়ে রক্ত গিয়ে তারা মারা গিয়েছিল। বনভন্তেকে অযথা গালিগালাজ করে, অহংকার করে তোরা দিব্যিই সুখে থাকবে এটা তো দেবতাগণ সহ্য করতে পারবে না। তাই আমি আবারো বলছি, তোমরা

আমাকে না মানলে না মানো, বিশ্বাস না করলে না করো কিন্তু অযথা গালিগালাজ, কটাক্ষ, অহংকার করবে না। তোমরা মনে কর বনভক্তের কাছে কোন আগ্নেয় অস্ত্র নেই, কাজেই তাকে গালিগালাজ করলে কি হবে? কিন্তু বুদ্ধের অস্ত্র আগ্নেয় অস্ত্র হতে বহুগুণে বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর। তাই তো বলি, বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। বাড়াবাড়ি করলে ভালো হবে না। বনভক্তে বলেন, আমাকে কটাক্ষ করে এরূপ কতো হাজার... লোক রয়েছে? বাড়াবাড়ি করলে সবাই একসাথে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা নিশ্চয় ক্ষুর দেখেছে? ক্ষুরকে ভালোভাবে ব্যবহার করলে উপকার হয়, চুল, নখ, দাড়ি কাটান যায়। কিন্তু সেই ধারালো ক্ষুর দিয়ে যদি কঠিনালী ঘষানো হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ (তার) মৃত্যু হবে নয় কি? আচ্ছা, এখানে ক্ষুরের দোষ নাকি ব্যবহারকারীর দোষ? ব্যবহারকারীর দোষ। সে ক্ষুরটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে নাই বলে ব্যবহার দোষে নিজের কণ্ঠ নিজে ছেদ করেছে। ঠিক তদ্রূপ বনভক্তেও ক্ষুর সদৃশ। আমার কথা বিশ্বাস করলে, মেনে চললে তোমরা বহু উপকৃত হতে পারবে; আর আমাকে অযথা নানা গালিগালাজ, কটাক্ষ করলে একেবারে নিরয়গামী হবে। সুতরাং তোমরা আমার উপদেশ মত পঞ্চশীল পালন কর, কারোর অহিত কামনা করবে না। কারোর ক্ষতিসাধন করবে না। উত্তমভাবে ধর্মাচরণ কর। তাহলে ইহ পারত্রিক সুখ শান্তি লাভ হবে। যা প্রার্থনা করবে তা লাভ করতে সক্ষম হবেই। আমি তোমাদেরকে একথাগুলো কেন বলছি জান? তোমাদেরকে নিম্নগামী হতে না দিতে এবং পরিহানি হতে না দিতেই আমি এগুলো বলছি। কারণ তোমরা নিম্নগামী হলে পরিহানি হলে আমিও লজ্জিত হবো। তোমাদেরকে নিম্নগামীর হাত থেকে রক্ষা করা এবং পরিহানির হাত থেকে রক্ষা করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদেরকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছি। আমি নানা জায়গায় ফাং-এ গেলে সবাইকে বলে দিই, তোমরা আমার কথামত পঞ্চশীল পালন করতঃ অকুশল কর্মসমূহ পরিত্যাগ করে দেখো আমি গ্যারান্টি দেবো তিন বৎসরে তোমাদের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবেই।

তোমরা উচ্চমনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন হয়ে চিত্তের নিমলতার সহিত উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সাধনা অনুশীলন কর। এই কাজে সফল হতে পারলে পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। কখনো নীচমনা, নিম্ন আকাঙ্ক্ষায় কলুষিত চিত্তের সহিত হীন জ্ঞান ও নিম্নস্তরের সাধনা অনুশীলন করবে না। মনে রাখবে, উচ্চমনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চিত্তের নিমলতা, উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করলে সুখ অর্জিত হয়; আধ্যাত্মিক দিকেও উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে। আর নীচমনা, নিম্ন আকাঙ্ক্ষা, চিত্ত কলুষিত, হীনজ্ঞান ও নিম্নস্তরের সাধনা অনুশীলন

করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। আধ্যাত্মিক দিকেও উন্নতি হয় না। তখন গভীর অরণ্যে থাকলেও রোদন করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে তোমাদের দুঃখ, অশান্তি বেড়েই চলবে, কখনো কমবে না, পরিসমাপ্তি হওয়া তো দূরের কথা। এক কথায়, কুশলকর্ম সম্পাদন কর। সুখ, শান্তি ও উন্নতি চাইলে কুশলকর্ম সম্পাদন কর আর দুঃখ, অশান্তি, পরিহানি চাইলে অকুশলকর্মই সম্পাদন করবে। এখন আমাকে বলতো দেখি, তোমরা কি চাও? সবাই বলে উঠেন ‘ভগ্নে আমরা সুখ, শান্তি, উন্নতিই চাই; দুঃখ অশান্তি, পরিহানি চাই না।’ তাহলে সর্বদা দিবারাত্রি কুশলকর্ম সম্পাদন কর। কুশলকর্ম সম্পাদন করলে তোমাদের সুখ, শান্তি, উন্নতি সাধিত হবেই। সৎ দেবতাগণ তোমাদের বিবিধ উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষা করে থাকবে। কুশলের পরিণাম কখনো দুঃখ হতে পারে না। তোমরা কুশলকর্মই সম্পাদন করবে, অকুশলকর্ম নয়। কারণ অকুশলকর্ম ইহকালে যেমন দুঃখ প্রদান করে তেমনি পরকালে তদপেক্ষা অধিক পরিণামে দুঃখ প্রদান করে থাকে।

তিনি বলেন-তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ যথা সম্ভব পাপকর্ম হতে নিজকে বিরত রাখবে। কারণ পাপকর্ম সম্পাদন করলে পরিহানিই হতে হয়। অন্যদিকে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন-পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার। পুণ্যের নিকট পাপ পরাজুত হয়। তোমরা সবাই যদি অবিরত পুণ্যের মধ্যে নিয়োজিত থাক তাহলে তোমাদের সুখ, শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বদিকে জয়যুক্ত হওয়া সুনিশ্চিত বলে জানবে। জ্ঞানী ব্যক্তির পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সুখ লাভী হয় আর অজ্ঞানী ব্যক্তির পাপকর্ম সম্পাদন করতঃ দুঃখের ভাগী হয়। তাই জ্ঞান থাকলে সুখ, জ্ঞান না থাকলে দুঃখ। জ্ঞান থাকলে কেন সুখ হয় জান? কারণ জ্ঞানের জানা সম্ভব হয় ‘এটা সুখজনক কাজ’ এবং ‘এটা দুঃখজনক কাজ’। আর তখন দুঃখজনক কর্ম পরিত্যাগ করে সুখজনক কাজে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখা সম্ভব হয়। সুতরাং সুখ লাভ সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। জ্ঞান থাকলে যেমন সুখ লাভ হয়, তেমনি পরের সম্পত্তি লোভ না করলে দুঃখে পতিত হতে হয় না। তা’ ও সুখ উৎপন্ন করে। মনে রাখবে তোমরা অজ্ঞানী হলে দুঃখ পাবে, পরের সম্পত্তিতে লোভ উৎপন্ন করলে দুঃখে পতিত হবে আর হিংসা করলে বিপদের সম্মুখীন হবে। যদি বলা হয় (দেখা যায়) যে, ‘অমুক ব্যক্তি খুব দুঃখের মধ্যে আছে’ তাহলে জানবে সে অজ্ঞান। আবার যদি বলা হয় যে, ‘অমুক ব্যক্তি সর্বদা দুঃখে পতিত হয়’ তাহলে জানবে সে লোভ সহগত চিন্তে অবস্থান করে দুঃখে পড়ছে এবং যদি বলা হয় যে, ‘অমুক ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হয়েছে’ তাহলে জানবে সে হিংসার কারণে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। মোটকথা, অজ্ঞান হলে দুঃখ পায়, লোভ করলে দুঃখ পতিত হতে হয়,

হিংসা করলে বিপদে পড়তে হয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অজ্ঞান না থাকলে কোন দুঃখ নেই, লোভ না থাকলে দুঃখে পতিত হবার কারণ নেই, হিংসা না থাকলে বিপদ নেই। অজ্ঞানই দুঃখ প্রদান করে, লোভই দুঃখে পতিত হবার কারণসমূহ সৃষ্টি করে, আর হিংসাই বিপদদ্রষ্টা করায়। কাজেই তোমরা লোভ, হিংসা, অজ্ঞান পরিত্যাগ কর। যদি কোন প্রাণীকে হিংসা না কর তাহলে কোনদিন বিপদদ্রষ্টা হবে না। যদি কোন বিষয়ের প্রতি লোভ না কর তাহলে কখনো দুঃখে-পতিত হবে না। আর যদি জ্ঞানী হয়ে অবস্থান কর বা অজ্ঞান না থাকে তাহলে কিছুতেই দুঃখ পাবে না। অলোভ, অদ্বेष, অমোহ হয়ে অবস্থান করতে পারলে পুণ্য এবং সুখ লাভ হয়। বৌদ্ধধর্মের মতে লোভ, দ্বেষ, অজ্ঞান, তৃষ্ণা এ' চারটি সর্বদুঃখ ও অকুশলের মূল। আমি থাকতে তোমাদেরকে আর লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা), বার্মা, (মায়ানমার) গিয়ে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে না। বনভন্তে বৌদ্ধধর্মের ইঞ্জিনিয়ার। বিদ্বিৎ তৈরি করতে যেমন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য তেমনি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতেও বনভন্তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই আমি দৃষ্টকর্ণে বলতে পারি, তোমাদেরকে আমি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত যেই উপদেশ, শিক্ষা দিচ্ছি লঙ্কা, বার্মা থেকে সুপণ্ডিত ভিক্ষু আসলেও তাদেরকে সেটা সঠিক বলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাই উত্তম। এ' ধর্মে কোন প্রকার মলিনতা, হীনতা, নীচতা শিক্ষার স্থান নেই। বৌদ্ধধর্ম সর্বদা পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব হবার শিক্ষা দেয়। জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার বার আগে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা, আচার-আচরণ তথা সার্বিক পরিস্থিতি নাকি খুবই নাজুক ছিল। বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে জাপানীরা অনার্য ছিল। কিন্তু জাপানে বৌদ্ধ প্রচার হলে তারা যখন বৌদ্ধিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তখন থেকে তারা উন্নত ধীশক্তি সম্পন্ন হওত উৎকৃষ্ট জীবন-যাপন করতে শুরু করে। আর বর্তমানে তো বুদ্ধের দেশিত সৎশিল্প শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা তারা বিশ্বের বাজার জয় করে ফেলেছে। অগ্রবংশ ভন্তেকে নাকি বার্মার অধিবাসীরা বলে ছিল, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে বার্মার অধিবাসীদের জীবন যাত্রা ছিল নর পিশাচেরই মতন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ বৌদ্ধিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বর্তমানে আর্যসম্মত জীবন লাভে সক্ষম হয়েছে। তাই তোমরাও বুদ্ধের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রকৃত বৌদ্ধিক জীবন-যাপনে রত থাক। অনার্য জীবন-যাপন পরিত্যাগ করে আর্য জীবন-যাপন কর। প্রাণী হত্যা, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজি, ব্যভিচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবন করা হতে নিজেকে বিরত রাখ। বর্তমানে অনেক ছেলে তো চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়েছে। আবার, অনেকে মদ-গাঁজা বিশেষ করে হেরোইন সেবনজনিত কুঅভ্যাসে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

হেরোইন সেবনের টাকা না পেলে চুরি, মাস্তানি সহ বাপ-মায়ের সাথে খারাপ আচার করে থাকে। এ সবই অনার্য কাজ, নিকৃষ্ট কাজ এবং বৌদ্ধধর্ম বিরোধী কাজ। এ'কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাদের অধোগতি, পরিহানি, দুঃখ অনিবার্য বলে জানবে। এই অনার্য, নিকৃষ্ট কাজের জন্য তাদেরকে ইহকালে যেমন অন্যের নিকট অপদস্ত, অপমানিত ও হয়ে প্রতিপন্ন হতে হবে, বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট এবং অনুশোচনার জ্বালায় দুর্বিষহ জীবন-যাপন করতে হবে তেমনি মৃত্যুর পরও নরক অগ্নিতে পতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাই আমি আবারো বলছি, যারা এরূপ অবৌদ্ধ আচরিত খারাপকর্মে নিয়োজিত তোমরা অতিসত্ত্বের সেই কর্মসমূহ পরিত্যাগ কর। আর শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, চালচলন, কথাবার্তা, চিন্তা চেতনায় প্রকৃত বৌদ্ধ হয়ে যাও। বুদ্ধের প্রকৃত নীতি আদর্শ দ্বারা নিজকে আদর্শ বান ও নীতিবান হিসাবে প্রতিষ্ঠা কর। কোন প্রকার অবৌদ্ধ আচরিত কার্যকলাপে নিজেকে লিপ্ত করবে না। তাহলে দেখবে তোমাদের সব দিকে আমূল উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবেই। কিন্তু তোমরা যদি বৌদ্ধিক শিক্ষা, চেতনা, আচার আচরণে পিছপা হয়ে থাক তাহলে তোমাদেরকে দিন দিন অধঃপতনের অতল সমুদ্রে তলিয়ে যেতে হবে। সেখান হতে আর কখনো উপরের দিকে উঠে আসা সম্ভব হবে না। কাজেই এখনো সময় রয়েছে আমি থাকতে তোমরা সকলে সচেতন হয়ে যাও, অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকার আর সুযোগ নেই। অতি সহসা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, প্রকৃত বৌদ্ধ শিক্ষা, আচরণ, উপদেশ মেনে চলতে তৎপর হও। বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ, অনুশাসনের বাইরে এক ইঞ্চিও পা ফেলবে না। দিবারাত্রি দান, শীল, ভাবনায় নিয়োজিত থাক। কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না; সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়েই অবস্থান করবে। সকল প্রকার অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর তাহলে তোমাদের পরম সুখ লাভ হবে। তোমরা যারা বয়জ্যেষ্ঠ আছ নিজেরা যেমন প্রকৃত বৌদ্ধিক শিক্ষায় জীবন-যাপন করবে তেমনি অন্যদেরকেও সেই পথের পথিক হতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করবে। আর তখনই তোমাদের সকলের সুখ শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন সুনিশ্চিত হবে।

পরিশেষে পরম পূজ্য ভগ্নে বলেন-তোমরা পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল পালন কর। পঞ্চশীল পালন করলে তোমাদের ইহকাল-পরকাল উভয়কালেই পরম সুখ লাভ হবে। মনে রাখবে, পঞ্চশীল লঙ্ঘনকারীর কিছুতেই সুখ অর্জিত হয় না। শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুকালেও সং জ্ঞানের সহিত নির্ভীক চিন্তে মৃত্যুবরণ করে থাকে এবং কোন প্রকার দুঃখ পায় না। তাদেরকে মূর্খা প্রাপ্ত হয়ে অতীব কষ্টের সহিত মৃত্যুবরণ করতে হয় না। কিন্তু দুঃশীল ব্যক্তি বার বার মূর্খা প্রাপ্ত হয়ে অতীব দুঃখ কষ্টের সহিত মৃত্যুবরণ করে। কার মৃত্যু কখন আসে সেটাতো আগে থেকে

জানা যায় না; কাজেই তোমরা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। অর্থাৎ অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্মে নিয়োজিত থাক। যাতে মৃত্যু এসে উপস্থিত হলেও এই বলে অনুশোচনা করতে না হয় “হায়! আমি তো কুশলকর্ম সম্পাদন করতে পারিনি বা সুযোগ পাইনি এখন আমার কি উপায় হবে?” আর যদি সম্ভব হয় মরণানুস্মৃতি ভাবনা করা খুবই উত্তম। মরণানুস্মৃতি ভাবনা না করলে মনচিন্তা অকুশলকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। মরণানুস্মৃতি ভাবনা অকুশলকর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। বাদ-বিবাদ, কলহ-ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসাহিংসি, রেষারেষিরও অবসান ঘটে যায়। কোন প্রাণীর অহিত কামনা, অনিষ্ট কামনা করবে না। প্রাণী হিংসা করা যেমন মহাপাপ তেমনি প্রাণীর প্রতি মৈত্রী কামনা, মঙ্গল কামনাও মহাপুণ্য। যারা প্রাণী হিংসা করে না তাদেরকে আর্থ বলা যায়। যারা প্রাণী হিংসা করে তারা অনার্থ বলে পরিচিত। প্রাণী হিংসা করলে শীল পালন করা যায় না। যারা শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে কোন প্রাণী হিংসা করে না তারা শীল পালনে সমর্থ হয়। যারা লোভী তারা দান করতে পারে না। লোভী ব্যক্তিদের পক্ষে দান দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। দান করতে হলে লোভ পরিত্যাগ করতে হয়। আবার লোভ চিন্তে দান করলে তা সঙ্কর্ম হয় না। দান দেওয়ার নিয়ম হলো দান দেওয়ার সময়, দান দেওয়ার পরে দানীয় বস্তু উপর সম্পূর্ণ নির্লোভ চিন্তে দান দিলে তবেই তা সঙ্কর্ম হয়। অজ্ঞান হলে ভাবনা করা যায় না। ভাবনা করতে হলে অজ্ঞান পরিত্যাগ করতে হবে। অজ্ঞান অবস্থায় ভাবনা করলে সেটা ভাবনা হবে না। বৃথা সময় ক্ষেপনও সার হবে। অন্যদিকে ভাবনা না থাকলে জ্ঞানও উদয় হয় না। তাই লোভ পরিত্যাগই দান। অলোভই দানের হেতু। হিংসা পরিত্যাগই শীল। অদ্বেষ শীল হেতু। অজ্ঞান পরিত্যাগই ভাবনা। অমোহ ভাবনা হেতু। তোমরা সকলেই দান-শীল-ভাবনায় আত্মনিয়োগ করো। এতে তোমাদের সুখ শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হবে। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরিত হবে। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে কিছুতেই দুঃখ, অশান্তি থাকতে পারে না। আর অধোগতি, পরিহানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে সুখ লাভ হবেই

অদ্য শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা ২৫৪৫ বুদ্ধাব্দ। ৬ই মে ২০০১ খৃঃ রোজ রবিবার। রাজবন বিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত দানানুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভ্রম) মহোদয় ধর্মদেশনায় বলেন-ভগবান বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ, মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ; বুদ্ধের আবির্ভাব সহজ নয়। প্রব্রজ্যা লাভ করা দুর্লভ এবং শ্রদ্ধা সম্পত্তি দুর্লভ। এই সকল সহজে লাভ করা যায় না। পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য ও বহু প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে এইগুলো আয়ত্ব বা লাভ হয়ে থাকে। যারা সেই মহামূল্যবান সম্পদ লাভে সমর্থ হন তারা অতীব ভাগ্যবান এবং বিরল লাভের অধিকারী বলে জানবে। তোমরা চতুরার্যসত্যের জ্ঞান দিয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই কর। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা' আর্যসত্যের দ্বারা দর্শন কর। চারি আর্যসত্য জ্ঞানের কষ্টি পাথরে ঘষে মেজে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতঃ মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ কর। সেই যাচাইকৃত পরীক্ষিত সত্যকে গ্রহণ করলে পরম সুখে অবস্থান করতে সমর্থ হবেই। জ্ঞানী ব্যক্তির আন্দাজ করে কোন কিছু গ্রহণ করে না। তারা যাচাই করার পর তবেই পরীক্ষিত সত্যকে এটা সত্য' বলে গ্রহণ করে থাকে। আর মিথ্যাকে সর্বদা পরিত্যাজ্য বলে জানে। অপরদিকে মূর্খরা সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারে না। তারা সত্যকে মিথ্যা বলে এবং মিথ্যাকে সত্য বলে থাকে। একরূপ উল্টোপাল্টাভাবে তারা সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে গ্রহণ করতঃ বিবিধ দুঃখের ভাগী হয়। ধর্মদেশনা শ্রবণকালে তোমাদেরকে অজ্ঞানতা ভাব বর্জন করে জ্ঞানত দেশনা শ্রবণ করতে হবে। কারণ অজ্ঞানতার সহিত দেশনা শ্রবণ করলে কোন ফল হয় না; তা' পরধর্ম শ্রবণ করার সমতুল্য। যারা জ্ঞানী তারা জ্ঞানের সহিত সদ্ধর্ম শ্রবণ করে থাকে। কিন্তু অজ্ঞানীরা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না তারা পরধর্মই শ্রবণ করে। 'সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ' এই শব্দটির অর্থ কি জান? অর্থাৎ জ্ঞান না থাকলে সদ্ধর্ম শ্রবণ করা যায় না। তোমাদের চিন্তের মধ্যে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে আমার দেশিত এ' সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে সমর্থ হবে না। কেবল পরধর্মই শুনতে থাকবে। পরধর্মে রুচিবোধ ও আনন্দ লাভ হবে। বুদ্ধ বলেছেন যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা সদ্ধর্মই শ্রবণ করবে। সদ্ধর্মচারীর ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই সুখ লাভ হয়ে থাকে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, অদূর ভবিষ্যতে সত্ত্বগণ সদ্ধর্ম ভুলে যাবে। সদ্ধর্মের অমৃতময় বাণী ও সদ্ধর্মোচরণে কেহ এগিয়ে আসবে না। পরধর্মই আচরণ করবে, অতি সহজে পরধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়বে সবাই, সকলে কেবলমাত্র পরধর্মের কথা শুনবে। বর্তমানে সে সব কথা ফলতে শুরু হয়েছে।

তাই দিন দিন বৃদ্ধি দুঃখের মাত্রা পাচ্ছে। এখন সকলেই পরধর্ম আচরণে এবং পরধর্ম শ্রবণে রত। সদ্ধর্ম আচরণকারী ও সদ্ধর্ম শ্রবণকারী খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কারণ কি জ্ঞান? সদ্ধর্ম আচরণ করলে ভোগ করা যায় না বিধায়। পক্ষান্তরে পরধর্ম তো ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতেই শিক্ষা দেয়। কাজেই যারা ভোগী তারা পরধর্ম আচরণ করে এবং পরধর্ম শ্রবণ করে। মার তাদেরকে পরধর্ম আচরণ ও শ্রবণ করতে বাধ্য করায়। তোমরা যদি প্রাণীহত্যা কর, পরের সম্পদ চুরি কর-লুটপাট কর, ব্যভিচারে রত হও, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যলাপ কর, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইনাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন কর তাহলে জানবে পরধর্ম আচরণ করতেছ। আর যদি শীল পালন করতঃ পাপকর্মে লিপ্ত না থাক তাহলে সদ্ধর্ম আচরণে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে জানবে। আমি মারিশ্যায় (ফাং-এ) থাকাকালীন একদা কয়েকজন লোক দুই যুবক যুবতীকে আমার নিকট এনে ক্ষমা প্রার্থনা করায় বলে 'ভস্টে এরা দু'জনে মিলে জঙ্গলে গিয়ে অসামাজিক কাজে (ব্যভিচারে) রত হয়েছিল।' তারা সে কাজ কেন করছে? পাপকে নিয়ে সুখভোগ করতে গিয়েই। পাপকর্মের মাধ্যমে সুখভোগ করতে চাইলে সেইভাবে পরধর্মে রত হতে হয়। মার পাপ অকুশলকর্ম সম্পাদনে বাধ্য করায়। কিন্তু পরধর্ম আচরণের ফল কিছুতেই সুখের হয় না। পরধর্ম ইহলোকে যেমন দুর্বিষহ দুঃখ দেয় তেমনি মৃত্যুর পরও পরলোকে সীমাহীন, অনন্ত দুঃখের গহবরে ফেলে দেয়। তাই বলা হয়েছে, পরধর্ম করলে দুঃখ পেতে হয়, নরকে পতিত হতে হয়, কিছুতেই দুঃখ হতে চিরমুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। তবে পরধর্ম আচরণ করা খুব সহজ। অনায়াসে এ'ধর্ম আচরণ করা যায়। কিন্তু সদ্ধর্ম আচরণ করা তত সহজ নয়, কঠিন। বিশেষ করে যারা অজ্ঞানী ভোগী, তাদের পক্ষে ভোগ ত্যাগ করে অবস্থান করা বা সদ্ধর্ম আচরণ করা বড়ো কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি কিভাবে ভোগ ত্যাগ করেছি জান? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অল্লহারের গুণ স্মরণ করে ভোগ ত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। ফলে অনেক ভোগী ভিক্ষু দেখলেও তাদের সেই খারাপ অভ্যাস আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ভোগই দুঃখ, ত্যাগই সুখ। ত্যাগের দ্বারাই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়। তবে ত্যাগ করা সহজ নয়, সহজে ত্যাগ করা যায় না। ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন কাজ। একমাত্র সদ্ধর্ম আচরণের মাধ্যমে ভোগ ত্যাগ করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। সদ্ধর্ম শ্রবণ করে সদ্ধর্ম আচরণ করলে সুখ লাভ হয়। আর পরধর্ম শ্রবণ করে পরধর্ম আচরণ করলে অসহ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। আমি তো দেখতেছি তোমরা প্রায় সকলেই পরধর্ম আচরণে রত রয়েছে। বছর দেড়েক আগের কথা, আমরা খাগড়াছড়ি হতে রাংগামাটি ফেরার পথে উপজাতীয় কিছু ছেলের দ্বারা রাস্তায় গাড়ী (ট্রাক) আটক করে চাঁদাবাজি

করতে দেখেছিলাম। পরে কতুকছড়িতে ফাং-এ গেলে লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করি যারা চাঁদাবাজির কাজ করতেছে তারা শিক্ষিত না অশিক্ষিত? উত্তরে সেখানকার লোকজন জানায়, তারা সবাই শিক্ষিত বি এ পাশ, এম এ পাশ করে চাকরী না পেয়ে এসব কাজ করতেছে। যারা একেবারে অশিক্ষিত তারা একাজ করতে ভয় পায়। এ' কথা'র প্রেক্ষিতে বনভঙ্কে বলেন বি, এ এম, এ পাশ করে চাঁদাবাজি করা এসব কি জান? পরধর্ম। এবম্বিধ পরধর্ম আচরণের জন্য তারা পরকালে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে এবং মৃত্যুর সাথে সাথে নিরয়গামী হবে। তাই বলছি, তোমরা পরধর্ম পরিত্যাগ করে সদ্ধর্ম গ্রহণ কর। সদ্ধর্ম শ্রবণ ও সদ্ধর্ম আচরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। মনে রাখবে সদ্ধর্মহারা, জ্ঞানহারা হলে তোমাদেরকে ইহকালেও দুঃখ পরকালেও দুঃখ ভোগ করতে হবে। কোন কালে সুখ লাভ হবে না। কারণ সদ্ধর্ম এবং জ্ঞান বিহীনে কিছুতেই প্রকৃত সুখ অর্জিত হয় না। তোমরা তো সকলে সুখ প্রত্যাশা করে থাকা, তাই না? সেই প্রত্যাশীত সুখ অর্জনের জন্য তোমাদেরকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, “আমরা সদ্ধর্ম আচরণ করব, সর্বদা জ্ঞানের সহিত চালিত হব।” সদ্ধর্ম আচরণ ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওত উত্তমভাবে চলাফেরা কর। সকল প্রকার অন্যায়, অপরাধ ও অপরের ক্ষতিসাধনমূলক কর্ম হতে বিরত থাক। ইহাই বৌদ্ধধর্ম, এতে পরম সুখ শাস্তি লাভ হয়। অন্যদিকে পরধর্ম আচরণকারী ও অজ্ঞানের দ্বারা চালিত ব্যক্তিগণ দেহান্তে নরকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

শ্রদ্ধেয় বনভঙ্কে বলেন-জ্ঞান উদয় হলে সত্য ও উত্তম পথে চলা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তির সবসময় সত্যপথেই চলে। যারা সত্যকে এড়িয়ে মিথ্যাপথে চালিত হয়, তারা অজ্ঞানী বলে জানবে। একদিন কিছু সংখ্যক বিদেশী (অনুসন্ধিৎসু) লোক তাদের গাইডের মাধ্যমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল “ভস্কে মহিলারা ভালো, নাকি পুরুষেরা ভালো”? তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, পুরুষেরা ভালো, নাকি মহিলারা ভালো একথা বলা ঠিক নয়। যাদের জ্ঞান থাকে তারাই ভালো আর যাদের জ্ঞান নেই তারা খারাপ। চিত্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে পুরুষেরা যেমন ভালো হতে পারে, তেমনি জ্ঞান থাকলে মহিলারাও ভালো হতে পারে। অপরদিকে জ্ঞান না থাকলে পুরুষেরা যেমন খারাপ, তেমনি মহিলারাও খারাপ। আসল কথা হল, যার জ্ঞান থাকবে সেই ভালো, যার জ্ঞান থাকবে না সে খারাপ। একতরফাভাবে সব পুরুষেরা ভালো আর সব মহিলারা খারাপ অথবা সব মহিলারা ভালো এবং সব পুরুষেরা খারাপ বলা যায় না। জ্ঞান থাকলে পুরুষ বা মহিলা যে কেহই ভালো হতে পারে। যাদের জ্ঞান থাকে তারা যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ ও অকুশলকর্ম বর্জন করে ন্যায় সত্যপথ অবলম্বন করে থাকে। কাজেই তারা ভালো। যাদের জ্ঞান থাকে না তারা ন্যায়, সত্যকে এড়িয়ে

চলে অন্যায় অপরাধ অকুশলমূলক কর্ম সম্পাদন করে; এরূপ অজ্ঞানীরা খারাপ। সমবেত উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে পূজ্যস্পাদ বনভন্তে বলেন, তোমরাও শুনে রাখ যারা জ্ঞানী তারা ভালো আর যারা অজ্ঞানী তারা খারাপ। তোমরা সকলেই জ্ঞানী হতে সচেষ্ট থাক। ধর্মদেশনা কেন শ্রবণ করা হয় জান? ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে ধর্মজ্ঞান উদয় হয়। সদ্ধর্ম আচরণ করা সহজ হয়ে যায়। ধর্মদেশনা শ্রবণের মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উদয় হলে চিরসুখ অর্জিত হয়ে থাকে। ধর্মজ্ঞানের দ্বারা নিজকে অজ্ঞান, অকুশলের কবল হতে রক্ষা করা সম্ভব। এবং যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ ও পাপকর্মের উর্ধ্বে উঠে ন্যায় ও সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। মনে রাখতে হবে যে, ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু লাভের ফলে কোন প্রকার অধপতনের আশঙ্কা থাকে না। বরং ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু লাভীদের সর্বদা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। ত্রিহেতুক (অলোভ, অদ্বेष, অমোহ) পুঙ্গালের ধর্মদেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উদয় হয়ে থাকে। আর যাবতীয় দুঃখের অবসান হয়ে যায়।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা সকলে মৈত্রীবিহারী হয়ে অবস্থান কর। কারোর সাথে অন্যায় আচরণ করবে না, কারোর ক্ষতিসাধন ও অনিষ্ট কামনা করবে না। সর্বাবস্থাতে শত্রুতা ভাব বিদূরিত করে (সকলের প্রতি) মৈত্রীভাব পোষণ করবে। মনচিন্তের মধ্যে ক্ষমা, মৈত্রী এবং দয়াভাব বজায় রাখতে সক্ষম হলে কোন দুঃখই স্পর্শ করতে পারবে না। মনে রাখবে কোন জীব হিংসা না করলে নিজের সুখ বর্ধিত হয়। এভাবে সর্বদা মৈত্রীসহগত চিন্তে অবস্থানে সক্ষম হলে তোমাদের অবশ্যই সুখ লাভ হবে; উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবেই। বৌদ্ধধর্ম অহিংসার ধর্ম। এ'ধর্মে কোন প্রাণীকে হিংসা করতে পারে না। কোন প্রাণীর প্রতি ঢিল-দণ্ড-অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করাও একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে বৌদ্ধরা সেই অহিংসার নীতি লঙ্ঘন করতেছে। বৌদ্ধদের মধ্যে চাকমা, বড়ুয়া, মারমা অনেকে খুনাখুনি, মারামারি, চাঁদাবাজি, চুরি-ডাকাতি, গাড়ী লুটপাট সহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। প্রকৃত বৌদ্ধ আচরণ হতে বিচ্যুত হয়ে তারা শুধুমাত্র মুখের জোরেই নিজকে বৌদ্ধ বলে দাবি করছে। তাদের সেই গর্হিত কার্যকলাপ দেখে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও নানা কথা বলতে সাহস পাচ্ছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সে সব গর্হিত কর্ম পরিহার করার উপদেশ দিয়ে বলেন তোমরা সেরূপ খারাপকর্ম সম্পাদন করলে আমিও লজ্জিত হচ্ছি বৈকি! অন্যদিকে আমার দেশিত সদ্ধর্ম দেশনার প্রতিও অবমূল্যায়ন করার সামিল হচ্ছে। বনভন্তে এবার সুন্দর একটা উপমার অবতারণা করে বলেন, ধর দুই কানি (ধান্য জমিন আয়তন বিশেষ) বিশিষ্ট কোন বৃহৎ পুকুরের জলে যদি মাত্র এক বালতি উত্তপ্ত গরম পানি ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে পুকুরের সব পানি কি ঐ উত্তপ্ত পানির

ন্যায় গরম হয়ে যাবে? বা সেই এক বালতি গরম পানি কি পুকুরে জমাকৃত সব ঠাণ্ডা পানিকে গরম পানিতে পরিণত করতে পারবে? কখনো পারবে না, তা' সম্ভব নয়। কারণ দুই কানি পরিমাণ বৃহৎ পুকুরের জলের তুলনায় এক বালতি পানি অতি সামান্য। কোথায় দুই কানি বিস্তৃত পুকুরের জল আর কোথায় মাত্র এক বালতি পানি। যেন হাজারে মধ্যে এককণ্ড নয়। কাজেই এক বালতি গরম পানি কিছুতেই পুকুরের সব ঠাণ্ডা পানিকে গরম করতে পারবে না। বরং সেই এক বালতি গরম পানি পুকুরের ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রূপ, আমি যে তোমাদেরকে ধর্মদেশনা করছি সেটাও দুই কানি বিশিষ্ট বড় পুকুরে এক বালতি গরম পানি ঢেলে দেওয়ার মতনই হচ্ছে। (উপমা শুনে উপস্থিত সকল শ্রোতাবৃন্দের মধ্যে বেশ উচ্চস্বরে হাসি রোল পড়ে গলে) মাত্র একঘণ্টা/আধাঘণ্টা ধর্মদেশনা শুনে বাকী সময়গুলোতে সে ধর্মের রেশটুকু কি ধরে রাখতে পার-তোমরা? কিছুতেই পার না। তোমাদের মনচিন্তে অবস্থানরত অজ্ঞানের পরিমাণ হল সেই দুই কানি বিস্তৃত পুকুরের জল সম আর আমার দেশিত ধর্মদেশনা এক বালতি গরম জল তুল্য। দুই কানি পরিমাণ পুকুরের ঠাণ্ডা পানিতে এক বালতি গরম পানি ঢেলে দিয়ে তো কোন ফল পাওয়া যাবে না। তাই আমার দেশিত ধর্মদেশনা দ্বারা তোমাদের অজ্ঞানতা বিতাড়িত হচ্ছে না। তবুও আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি-তোমাদের প্রতি করুণা পরবশ চিন্তে। ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তোমরা যদি সদ্ধর্ম আচরণে অনুপ্রাণিত হও তাহলে তোমাদেরই মঙ্গল, উন্নতি আর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সদ্ধর্ম আচরণ কর, জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। সদ্ধর্ম ও জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে ইহকাল পরকাল সুখ লাভ হয়। কিছুতেই পরিহানি হয় না। তোমরা সব সময় নিজকে অন্যায়, অধর্ম হতে বিরত রাখবে। আমি এভাবে ধর্মদেশনা করলে নাকি অনেকে বলে বনভ্রম্ভে আমাদেরকে বকা দেন। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমার চোখের সামনে তোমরা অন্যায়, অধর্মমূলক অপকর্ম সম্পাদন করতঃ বিবিধ দুঃখ ভোগ ও অপদস্ত হতে চললে তো আমি চোখ বুজে বসে থাকতে পারি না। আমি তোমাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এসব বলে থাকি। তোমাদেরকে নিষ্ণামী হতে না দেওয়া, অধর্মের নিকট পরাজিত এবং অবনতি হতে না দেওয়াই আমার লক্ষ্য। কারণ তোমরা নিষ্ণামী হলে, অধর্মের নিকট পরাজিত হলে, সর্বদা অবনতি হতে চললে বা পরিহানি হলে আমিও লজ্জিত হবো। এটা সর্বদা মনে রাখবে যে, পুণ্যের নিকট পাপ পরাভূত হয়। পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার। পাপকর্ম করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর পুণ্যকর্ম করলে পুরস্কার লাভ হয়ে থাকে। তোমরা দিবারাত্রি পুণ্যকর্মই সম্পাদন কর। যাতে তোমরা

পরাজিত না হয়ে সর্বক্ষেত্রে জয়যুক্ত হতে পার, তোমাদের সুখ-শান্তি, উল্লুতি-শ্রীবৃদ্ধি অর্জিত হয়। তাই আমি আবারো বলছি, সুখ লাভের তরে তোমরা সকলেই বিমুক্তভাবে পঞ্চাশীল রক্ষা কর। যাবতীয় অকুশল পাপকর্ম বর্জন করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। এবং মনচিন্তকে এভাবে দৃঢ় কর যে, “আজ হেতু আর আমরা পাপকর্ম সম্পাদন করব না। কারণ পাপকর্ম সম্পাদন করলে আমাদের পরিহানি হবে। আমরা কেহ আর পরিহানি হতে চাই না।” তোমরা এইভাবে নিজকে পাপ হতে মুক্ত রেখে সব সময় কুশলকর্মে তৎপর থাকতে পারলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো তোমাদের অবশ্যই সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

বিচারপতি হওয়া সহজ নয়

অদ্য ১৪ই জুন ২০০১ সাল, রোজ শনিবার। পূর্বে হতে জানানো হয়েছে যে, আজকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব বিচারপতি হাবিবুর রহমান লোকোত্তর মহামানব পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের নিকট সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসবেন। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে আটটায় বিচারপতির গাড়ী একেবারে রাজবন বিহার প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছে। সাদা রঙের পাজেরো থেকে গম্ভীরচণ্ডে সহাস্য বদনে বের হন হাক্কা পাতলা, লম্বা শরীরের অধিকারী সেই স্বনামধন্য ব্যক্তি। পরনের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল সবই সাদা রঙের। বিহার প্রাঙ্গণে পৌঁছলে অপেক্ষামান উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সদস্যবৃন্দ বিচারপতি মহোদয়কে স্বাগত জানায়। তারপর কোন দিকে না থামিয়ে সোজা বনভন্তে আবাসিক ভবনে নিয়ে গিয়ে পূজ্য ভন্তের সঙ্গে বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেবকে পরিচয় করে দেওয়া হয়। পরিচয় পর্ব পরিচালনা করেন অত্র বিহারের উপাসক-উপাসিকা পরিষদের সিনিয়র সহ সভাপতি বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা। পরিচয় পর্ব শেষে যথারীতি প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নির্ধারিত আসনে (ফ্লোরের উপর কাপড় বিছানো স্থানে) উপবেশন করলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিচারপতির সহিত কুশল বিনিময়ের একপর্যায়ে বলেন আপনার বাড়ী কোথায়? বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব বললেন-আমি ঢাকায় থাকি। বনভন্তে-সেটা তো জানি, আপনার জন্ম স্থান (আসল বাড়ী) জানতে চেয়েছিলাম। এবার বিচারপতি বললেন-ও হ্যাঁ, আমার নিজ বাড়ী রাজশাহীতে। কুশল বিনিময়ের পর পূজ্য বনভন্তে প্রধান বিচারপতিকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষ এ’ পৃথিবীতে অল্পদিনই জীবিত থাকে। তাই জ্ঞানীজনেরা সর্বদা অগ্রমাদের

(সতর্কতার) সহিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু যারা মূর্খ তারা প্রমত্ততার সহিত পাপকর্ম সম্পাদন করতঃ ইহজীবন ও পরজীবনকে দুঃখময় করে তোলে। যেমন এরশাদ সাহেব, ক্ষমতায় থাকাকালীন স্বৈচ্ছাচারিতা শাসন কায়েম করে জনগণের কাছে নিন্দিত, পরিত্যাজ্য হয়ে বর্তমানে দুঃখের মধ্যে জীবন-যাপন করিতেছে। আসল কথা হল, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হওত ক্ষমতাবান হলে মানুষ ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারোর নিকট সং উপদেশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে চায় না। কিন্তু ক্ষমতাবান হলে আরো বেশি সিদ্ধপুরুষ, সং পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের সং উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। এতে নিজের, দেশের জন্য উত্তম মঙ্গলই সাধিত হয়। বর্তমানে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য তথা বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি আমার নিকট সাক্ষাৎ ও সং পরামর্শ গ্রহণ করতে আসে। এ'গুলো হল পণ্ডিত ব্যক্তির কাজ। লক্ষণীয় বিষয় বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তবে খালেদা জিয়াও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল, আর এরশাদ সাহেবও স্বীয় শাসনের একেবারে শেষের দিকে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে তা' সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। আমি বলি কি জান, শেখ সাহেব যদি দেশ স্বাধীন করার পর আমার নিকট সাক্ষাৎ করতঃ দেশ পরিচালনার জন্য সং উপদেশ, সুপরামর্শ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করতো তাহলে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হতো। তাকেও করুণ পরিস্থিতির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা খুব বেশি পরনির্ভরশীল হয়ে দেশ পরিচালনা করে থাকে। তারা কোন্ কাজ করলে দেশের জন্য ভালো হবে আর কোন্ কাজ করলে দেশের জন্য অমঙ্গল হবে সেটা নির্ণয় করতে পারে না। তাই দেশের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে বেশি। তাদের যদি দেশের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকত তবে কি এরূপ অবস্থা চলতে পারত? কখনো না। ভালো-মন্দ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা এবং মন্দকে বাদ দিয়ে ভালোটা বেচে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান শক্তির। জ্ঞানী ব্যক্তির এটা ভালো-এটা মন্দ, এটা ন্যায়-এটা অন্যায়, এটা সত্য-এটা মিথ্যা বলে কাজের বিচার করতে সক্ষম হয়। মানুষ অজ্ঞতা বশত কতো অন্যায়, কতো অপরাধ, কতো ভুল, কতো গলদ করে তার অন্ত নেই। ফলে সেই অন্যায়, অপরাধ, ভুল কাজের জন্য তাদেরকে বারবার শাস্তি ভোগ করতে হয়।

বনভন্তে আরো বলেন-কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ মন্দ এটা জানা সাধারণ লোকের বোধগম্য বিষয় নয়। যারা অজ্ঞানী মূর্খ তারা ভালোকে মন্দ বলে, মন্দকে ভালো বলে; ন্যায়কে অন্যায় বলে, অন্যায়কে ন্যায় বলে;

নির্দোষকে দোষ বলে, দোষকে নির্দোষ বলে। বুদ্ধ বলেছেন মূর্খ ব্যক্তিদের এই ছয়টি দোষ বিদ্যমান থাকে। তারা সব সময় এইভাবে উল্টোপাল্টা কাজ করে থাকে। শ্রদ্ধেয় বনভক্তে এ' কথা বললে প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেন। আমি তো দেখতেছি বর্তমানে যারা সরকার প্রধান হচ্ছেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ। ভালো মন্দ সম্বন্ধে আমার একটা কথা শুনুন। মনে রাখতে হবে কোন কিছু বলা বা করার পূর্বে তা' এরূপে বিবেচনা করে দেখা উচিত “এই কথাটি বললে আমার নিজের সুখ হবে কি? অপরের সুখ হবে কি? নিজের-পরের উভয়ের সুখ হবে কি?” যদি সুখ হয় তাহলে সেই কথা নির্ধায়ে বলবেন; আর এই কাজটি করলে আমার নিজের সুখ হবে কি? অপরের সুখ হবে কি? নিজ-পর উভয়ের সুখ হবে কি? যদি সুখ হয় তাহলে সেই কাজ নির্ধায়ে করবেন। অন্যদিকে যে কথা বললে নিজের দুঃখ হয়, অপরের দুঃখ হয়, নিজ-পর উভয়ের দুঃখ হয় সেই কথা বলবেন না। আর যেই কাজ করলে নিজের দুঃখ হয়, অপরের দুঃখ হয়, নিজ-পর উভয়ের দুঃখ হয় সেই কাজ করবেন না। তাই বুদ্ধ বলেছেন, দেখে দেখেই বাক্ কর্ম করা, দেখে দেখেই কায় কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, এই বাক্ কর্ম বা বাক্যটি বললে আমার নিজের, অপরের, নিজ-পর উভয়ের সুখ হবে, সেরূপ সুখ দায়ক বাক্যই বলবে। সেই বাক্য বলতে কোন বাধা নেই। আবার যদি দেখা যায় যে, এই কায় কর্মটি করলে আমার নিজের, অপরের, নিজ-পর উভয়ের সুখ হবে, সেরূপ সুখদায়ক কর্ম করবেন। সেই কর্ম করতে কোন বাধা নেই। অপরদিকে যদি দেখা যায় যে, এই বাক্যটি বললে আমার নিজের দুঃখ হবে অপরের দুঃখ হবে, নিজ-পর উভয়ের দুঃখ হবে সেরূপ দুঃখ পূর্ণ বাক্য বলবেন না। সেই বাক্য সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আবার যদি দেখা যায় যে, এই কর্মটি করলে আমার নিজের দুঃখ হবে, অপরের দুঃখ হবে, নিজ-পর উভয়ের দুঃখ হবে সেরূপ দুঃখপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করবেন না। সেই দুঃখপূর্ণ কর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

মূর্খ ব্যক্তি দুষ্টিস্তাকারী, দুর্বাক্য ভাষণকারী, দুষ্কর্মকারী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অমুক ব্যক্তি মূর্খ আর সমুক ব্যক্তি পণ্ডিত তাদেরকে জানার, চিনার উপায় কি? কিভাবেই বা জানা যে এই ব্যক্তি মূর্খ আর এই ব্যক্তি পণ্ডিত? বুদ্ধ বলেছেন, কর্মই মূর্খের লক্ষণ, কর্মই পণ্ডিতের লক্ষণ। তাদের স্থায়ী আচরিত কর্মের দ্বারাই জানা যায় যে তারা মূর্খ, নাকি পণ্ডিত। মূর্খ ব্যক্তির দুষ্টিস্তা করে, দুর্বাক্য ব্যবহার করে এবং দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। এসব খারাপ কার্যের দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তি মূর্খ। পণ্ডিত ব্যক্তির সুষ্টিস্তা করে, সুবাক্য বলে এবং সুকর্ম সম্পাদন করে। এ'সব ভালো কার্যের দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তি পণ্ডিত। আপনিও সব

সময় সুচিন্তা করবেন, সুবাক্য বলবেন, সুকর্ম সম্পাদন করবেন। কখনো দুশ্চিন্তা করবেন না, দুর্বাক্য বলবেন না এবং দুকর্ম সম্পাদন করবেন না। এক কথায়, পণ্ডিত হবেন। পূজ্য বনভন্তে এরূপ বললে প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সহাস্য মুখে মাথা নেড়ে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। মনে রাখবেন, মূর্খ ব্যক্তি অনর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখসৃষ্টিকারী। জগতে যত প্রকার দুঃখ পেতে হয় একমাত্র মূর্খতার দরুন। তোমরা সকলেই পণ্ডিত হয়ে যাও। সেই পণ্ডিত কাকে বলে? যিনি সহনশীলতা, জীবনে দয়ালু, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমাশীল, মৈত্রীপরায়ণ এবং নিজেকে সর্বদা অক্ষুন্ন মনে রাখতে সক্ষম—এই সৎ গুণের অধিকারীকে পণ্ডিত বলা হয়। বহুভাষাবিদ, বক্তৃতায় পটু, শাস্ত্রে দক্ষ এসব বাহ্যিক গুণের দ্বারা প্রকৃত পণ্ডিত হওয়া যায় না। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ইহ-পর, উভয়কালেই সুখ লাভ হয়। আমার তথা আমাদের (ভিক্ষুদের) কাজ হল মূর্খ ব্যক্তিদেরকে পণ্ডিত করে ফেলা এবং অসাধু ব্যক্তিদেরকে সাধু করে ফেলা। পণ্ডিত সম্বন্ধে তো আগেই বলেছি। অসাধু কারা? যারা প্রাণী হত্যা করে, চুরি-ডাকাতি-সম্ভ্রাসী করে, পরস্পর-পরকন্যা হরণ করে, মিথ্যা-কুটু-ভেদ-বৃথা বাক্য প্রয়োগ করে, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবন করে, তারা অসাধু। আর যারা এসব খারাপ, অনার্য, নিকৃষ্ট কার্য হতে নিজেদের বিরত রাখে তারা সাধু। সাধু ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়, অসাধু ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে করে হয়। হায়! এ রূপ উপদেশ আমি একজন সেনা অফিসারকে (ব্রিগিডিয়ার) বললে তিনি আমাকে বলেছিলেন—“এইরূপ উপদেশ আমি জীবনে শুনি নাই। আমার নতুন জ্ঞানের সম্ভার হল।” বাংলাদেশের সব মানুষেরা যদি উপরোক্তভাবে পণ্ডিত, সাধু হয়ে যেত তাহলে সর্বদিকে সুখ, শান্তি বয়ে আসতো। বাংলাদেশের মানুষ মূর্খ ও অসাধু বলে এতো দুঃখ পেতে হচ্ছে। আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ (হাবিবুর রহমানের সম্মতি)। মানুষ মূর্খ অসাধু হয়ে গেলে অধঃপতনে যেতে হয়। তজ্জন্য বাংলাদেশে এতো দুর্ভোগ দুর্দশা লেগেই রয়েছে। দেশের মানুষদিগকে পরিবর্তন করা না গেলে এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্ভোগের কোন শেষ নেই। কি পরিবর্তন? খারাপ স্বভাবের পরিবর্তন অর্থাৎ কুস্বভাব বা দুষ্কৃতিকর্ম পরিত্যাগ করিয়ে দিয়ে সুকৃতি সুকর্মে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করা।

আপনি তো প্রধান বিচারপতি ছিলেন? হ্যাঁ ছিলাম। কিছুদিন আগে অন্য আরেকজন বিচারপতি আমার নিকট দেখা করতে এসেছিলেন। আপনারা বিচার করেন বলে বিচারপতি। সেই বিচার কি? ভালো-মন্দ সম্বন্ধে বিচার, দোষ-নির্দোষ সম্বন্ধে বিচার, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বিচার। বিচারপতিদেরকে সেই ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বিচার করে ভালো এবং ন্যায়ের দিকে রায়

দিতে হয়। এখন বিচারপতিরা যদি ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো, দোষকে নির্দোষ, নির্দোষকে দোষ, ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বলে বিচার করেন বা রায় দেন তাহলে সেটা সৃষ্ট বিচার হবে কি? হবে না। আবার, আসামী কি সত্যিই অপরাধী, নাকি নিরপরাধ ব্যক্তি বা কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার এ' দশা হয়েছে এসব বিচার করা সহজ কথা নয়। মিথ্যা সাক্ষীর জন্য এবং সাক্ষী প্রমাণের অভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করলে তো আইনের চোখে সঠিক হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ভুল বিচারই করা হবে। অন্যদিকে, একই যুক্তিতে দোষী ব্যক্তিকে নিরপরাধী বলে বেকসুর খালাসের রায় দিলে তাও ভুল বিচারই করা হবে। যা বর্তমানে অজস্র ভুল বিচার করা হচ্ছে দেশের অনেক স্থানে। তাই বিচারপতি হওয়া সহজ নয়। বিচারপতিদেরকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত বিচারকার্য পরিচালিত করতে হয়। তা'না হলে প্রকৃত পক্ষে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা সেই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এবং আসল সত্যের দিকে রায় প্রদান করা যায় না। আর বিচারপতিগণ যদি এভাবে ভুল বিচার করে বসেন অপরাধীরা তো পুনঃ অপরাধ জগতে ফিরে যেতে সাহস পাবে, নতুন অপরাধী সৃষ্টি হবে। ফলে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটবে বার বার। আবার, অপরদিকে বিচারপতিগণ যদি নিরপরাধী ব্যক্তিদেরকে অপরাধী বলে রায় প্রদান করতঃ শাস্তি দেন তাহলে সেই ভুল বিচারের জন্য তাদেরকে পরকালে কি জবাব দিহি করতে হবে না? বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব কোন কোন জন্মে বিচারক হয়ে একপক্ষে মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা অন্য পক্ষের সাক্ষী প্রমাণের অভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ শাস্তি করলে সেই পাপের জন্য তাঁকে নরকে পতিত হতে হয়েছিল। বর্তমানের বিচারপতিগণ কি সেইরূপ ভুলের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন? পারেন নি। কাজেই বিচারকার্যে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে বিচারপতিগণেরও বিপদ রয়েছে পরকালের জন্য। তাই বলছি, বিচারকার্য সৃষ্টভাবে সম্পাদন করতে হলে বিচারপতিগণের প্রয়োজন জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল। জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল থাকলে নিজকে অনেক ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে রাখা সম্ভব হতে পারে। মনে রাখবেন, বিচারপতিগণকে অবশ্যই জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের সহিত বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে এবং নিজদেরকে হতে হবে সৎ, নিষ্ঠাবান। সেইরূপ বিচারপতি হতে পারলে মোটামুটি সঠিক বিচার করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। ভুল বিচার করলে কিন্তু বিচারপতিকেই মৃত্যুর পর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবার বলেন-গুধু বিচারপতিদের জন্য নয় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকটও জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজ্য শাসন করতে হলে জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল থাকতে হবে। বৃটিশদের

জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল ছিল বলে তারা আড়াই শত বৎসর ব্যাপী ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। বর্তমানে এখানকার সরকার প্রধানদের জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল নেই বলে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের সহিত দেশ পরিচালনা করতে পারলে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং দেশের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। আর রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল না থাকলে দেশে দুঃখ, অশান্তি বিরাজ করে এবং দেশ অধঃপতন, পরিহানির দিকে ধাবিত হয়। বাংলাদেশের সরকার প্রধানদের জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল নেই বলে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় ও উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারতেছে না। কেবলমাত্র বাংলাদেশ নয় পাকিস্তানের অবস্থাও একই। বাংলাদেশ পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের কিছুটা উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সেই হেতু বলা যায় ভারতের সরকার প্রধানগণের কিছুটা হলেও জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল রয়েছে। বাংলাদেশের বড় দুইটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বি এন পি সর্বদা একে অপরের বিরোধীতা করেই চলেছে। অথচ দেশের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য জাতীয় সমস্যা সমাধানে এবং জাতীয় উন্নয়ন কাজে দুই দলকে এক সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাওয়া উচিত। তা না হলে দেশের সার্বিক উন্নতির গতিকে বেগবান রাখা সম্ভব নয়। আচ্ছা, আওয়ামী লীগ ও বি এন পি মধ্যে এতো বিরোধ, দ্বন্দ্ব কেন? আওয়ামী লীগ হলেও বাংলাদেশী আর বি এন পি হলেও বাংলাদেশী, কেউ তো ভারতীয় বা পাকিস্তানী নয়। কাজেই দুই দলের নেত্রী ও নেতাবৃন্দ যদি কোন বিদ্বেষ না রেখে উভয়ে সং পরামর্শ করতঃ উভয় দলের জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল এবং মেধাশক্তি দিয়ে দেশকে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে দেশের, জনগণের তথা তাদের দলের জন্যও কতোই না সুখ, মঙ্গল বয়ে আনতো। সত্য কথা বলতে কি জানেন? দুই দল দেশের বৃহত্তর উন্নতির স্বার্থে জনগণের মঙ্গলের জন্য একসাথে কাজ না করে বরং আমেরিকা, বৃটেন, ভারত, পাকিস্তানের পরামর্শ উপদেশ গ্রহণ করতঃ সেই পরামর্শ, উপদেশ অনুযায়ী দেশ পরিচালিত করতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু সেই পরামর্শ অনুসারে দেশ চললে দেশের, জনগণের এবং তাদের দলের আসলেই কি উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সুখ অর্জিত হচ্ছে? এটা এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ। ভগবান বুদ্ধের মতে পরামর্শ দুই প্রকার, যথা—(১) সুপরামর্শ ও (২) কুপরামর্শ। কেহ কেহ অন্যজনকে সুপরামর্শ প্রদান করে আর কেহ কুপরামর্শ প্রদান করে থাকে। উপদেশ দুই প্রকার; যথা—(১) হিতোপদেশ ও (২) অহিতোপদেশ। কোন কোন ব্যক্তি হিতোপদেশ প্রদান করে আর কোন কোন ব্যক্তি অহিতোপদেশই প্রদান করে থাকে। বুদ্ধি দুই প্রকার; যথা—(১) সুবুদ্ধি ও (২) কুবুদ্ধি। কোন কোন ব্যক্তি সুবুদ্ধি প্রদান করে আর কোন কোন ব্যক্তি কুবুদ্ধি প্রদান করে থাকে। যারা

ভালো মানুষ তারা অপরজনকে সুপরামর্শ, হিতোপদেশ এবং সুবুদ্ধি প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে যারা খারাপ মানুষ তারা অপরজনকে কুপরামর্শ, অহিতোপদেশ ও কুবুদ্ধিই প্রদান করে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের সরকার প্রধানরা যখন আমেরিকা, বৃটেন, ভারত, পাকিস্তানের নিকট পরামর্শ, উপদেশ চায় তখন আমেরিকা, বৃটেন, ভারত, পাকিস্তান তারা কি সুপরামর্শ প্রদান করবে, নাকি কুপরামর্শ প্রদান করে; আবার হিতোপদেশ দেয়, নাকি অহিতোপদেশ দেয় তাও ভেবে দেখা দরকার। আমি তো দেখতেছি, বাংলাদেশ অন্য দেশের উপর নির্ভর করে বা অন্য দেশের পরামর্শে চালিত হচ্ছে বলে উন্নতি অর্জন করতে পারছে না।

আপনি দেশ, কাল, পাত্র বিচার করে চলবেন। কারণ এসব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ আপনি যে দেশে অবস্থান করবেন সে দেশের সার্বিক অবস্থা, চলমান পরিস্থিতি এবং আপনার আশেপাশে লোকের স্বভাব সম্বন্ধে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। এ' সবেব ব্যতিক্রম ঘটলে বিপদের আশঙ্কাকে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তথা যে কোন মুহূর্তে বিপদ এসে আপনাকে গ্রাস করতে পারে। কোন আইনজীবী বা বিচারপতির পক্ষে এসব কথা জানা সম্ভব নয়। আমি তো বাংলাদেশের কোন একজন ব্যক্তিকেও উপযুক্ত জ্ঞানী হিসাবে দেখতে পাই না। অনেক (মুসলিম) ভদ্রলোক আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন “ভস্তু শেখ হাসিনা ভালো হবে, নাকি খালেদা জিয়া ভালো হবে? দেশ শাসনের জন্য শেখ হাসিনা উপযুক্ত নাকি খালেদা জিয়া উপযুক্ত? কাকে ভোট দিলে ভালো হয়? আমি তাদেরকে বলি, শেখ হাসিনা আর খালেদা ছাড়া কি বাংলাদেশ শাসন করার কেহ নেই? তারা বললেন-সে রকম নয় আরো অনেকজন আছেন তবে শেখ হাসিনা হল মুজিব সাহেবের মেয়ে, অন্যদিকে খালেদা জিয়া হল জিয়াউর রহমানের স্ত্রী। উপরন্তু তারা একজন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, অন্যজন বি, এন, পির সভানেত্রী। তাই তাদের দু'জন হতে একজনকে দেশ শাসন করার ক্ষমতা দিতে হয়। আমি বলি যার নিকট জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল থাকে তাকেই দেশ শাসন করতে দিলে ভালো হয়। শেখ হাসিনার যদি জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল থাকে তাহলে তাকে আর খালেদা জিয়ার যদি জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল থাকে তাকে দেওয়াই উচিত।

বর্তমানে এখানে জাতিগত বিদ্বেষ, অশান্তি বিরাজ করতেছে। কেউ কাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারছে না। এবম্বিধ পরিস্থিতিতে সত্য ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, জ্ঞান ও সত্যের দ্বারা এ' পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে হবে। প্রত্যেকে জ্ঞান ও সত্যের সহিত অবস্থান করলে অবশ্যই সুখ শান্তি অর্জিত হবে। মনে রাখবেন, সুখ শান্তি অর্জনের জন্য জ্ঞান ও সত্যের কোন

বিকল্প নেই। যাদের চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান মিথ্যা থাকে তাদেরকে দুঃখ পেতেই হয়। দুঃখ পাওয়ার কারণ হল এই অজ্ঞান ও মিথ্যা। অজ্ঞান, মিথ্যা থাকলে কিছুতেই সুখ লাভ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ, তোমরা সকলে সত্যধর্ম আচরণ কর, মিথ্যাধর্ম আচরণ করবে না; অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত না থেকে জ্ঞানের আলোতে চলে এসো, তাহলে তোমাদের শান্তি লাভ হবেই। আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সন্তোষজনক স্বরে স্বীকারোক্তি দিলেন। পরিশেষে আবাবো বলছি, আপনারা সকলে জ্ঞানী হয়ে এবং সত্য দ্রষ্টারূপে অবস্থান করুন। এইভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষ যদি জ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে শান্তি অর্জিত হবে। দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশে সুখ শান্তি ও উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হোক এবার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান উঠে দাঁড়ান এবং বলেন আমার তথা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করবেন। আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এবার আসি বলে হাত উঠিয়ে সালাম প্রদান করেন। বনভস্তেও “সাধু” ধ্বনিতে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

সাধু, সাধু, সাধু।

ধর্মজ্ঞান ধর্মচক্ষু ধর্মবোধ হলে তবেই পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব

অদ্য ৩রা আগস্ট '০১, রোজ শুক্রবার, শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সার্বজনীন দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাশ্রবির (বনভস্তে) মহোদয় বলেন—মনচিন্তের মধ্যে যদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থাকে তাহলে দুঃখ পেতে হয় এবং সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মায় না। অপরদিকে, মনচিন্তের মধ্যে যদি বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপত্তি হয় তাহলে সত্য উদয় হয়ে অনাবিল সুখ অর্জন করা সম্ভব হয়। আমি জ্ঞাননেত্রে দেখতেছি তোমরা সবাই ভীষণ দুঃখের মধ্যে অবস্থান করতেছ। কি বৃদ্ধ, কি মধ্যম বয়সী, কি যুবক, কি কিশোর, কি শিশু, কারোর সুখ নেই। প্রকৃত সুখ হতে তারা অনেক অনেক দূরে। একদিন খাগড়াছড়ি জৈনক মেয়ে আমাকে বলেছিল “ভস্টে আমার ছোট ভাই পানছড়ির অমুক মেয়েকে বিয়ে করতে না পেয়ে বিষ পান করতঃ আত্মহত্যা করে মারা গেছে। সেটা কি জ্ঞান? আমি কেন মেয়েটি লাভ করতে ব্যস্ত হচ্ছি, তাকে নিয়ে সংসারী সুখ ভোগ করতে কেন ব্যর্থ হচ্ছি; এভাবে নিজের অন্তরে দুঃখের তীব্র জ্বালা উদয় করতঃ নিজেকে খুব অপমানিত ভোগ করে সে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। এক কথায় সেই ছেলেটি, কাম দুঃখ যাতনার চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মপীড়ন করতঃ মারা গেছে। কেবল

সেই ছেলেটি নয়, বর্তমানে অনেক যুবক-যুবতী নাকি একই কারণে আত্মহত্যা করে মারা যাচ্ছে। এই বলে পূজ্য বনভঙ্কে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করাকে বেছে নেওয়ার বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তাই বুদ্ধ বলেছেন, কামসুখ, আত্মপীড়ন (নিজেকে নিজে কষ্ট দেওয়া, নিজেকে নিজে অপমানিত করা) অনার্য, হীন, পাপ, দুঃখ। তোমরা কামসুখ আত্মপীড়ন অনুশীলন করবে না। একদা আমি মাষ্টার নির্মলেন্দু চৌধুরীকে এ' কামসুখ, আত্মপীড়ন পরিত্যাগের সম্বন্ধে বলতে গেলে সে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলল “এ' কামসুখ আত্মপীড়ন ত্যাগ করার নির্দেশ বুদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণদের দিয়েছেন-আমাদের গৃহীদের জন্য তো নয়। বুদ্ধ আমাদেরকে পঞ্চশীলধর্ম রক্ষা করে সম্যক জীবিকার মাধ্যমে জীবন-যাপন করতে বলেছেন। আমরা যদি কামসুখ, আত্মপীড়ন পরিত্যাগ করি তাহলে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারে থাকতেই পারব না। কিন্তু সংসারে জীবন-যাপন করে কেউ তো সুখী হতে পারছে না। সংসারিক জীবন-যাপনের দ্বারা সুখী হতে পারলে কেনই বা এতো আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে? স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হয়ে কেন স্ত্রী আত্মহত্যা করতেছে? মা-মেয়ে ঝগড়া করে কেন মেয়ে আত্মহত্যা করছে? পরিবারে বিশৃঙ্খলার জন্য গৃহস্বামীই বা কেন আত্মহত্যা করতেছে? কাজেই কামসুখ যে অনার্য, হীন, দুঃখ এবং অনর্থ সংযুক্ত তা প্রমাণিত হচ্ছে বার বার। অন্যদিকে আত্মহত্যা করাকে ভগবান বুদ্ধ মহাপাপ বলে অভিহিত করেছেন। অজ্ঞানী ব্যক্তির আত্মহননের মাধ্যমে নিজের দুঃখকে আরো বহুগুণে বাড়ায়ে নেয় এবং সুদীর্ঘকালের জন্য দীর্ঘায়িত করে। আত্মহত্যা করার পাপে তারা মুক্ত হতে পারে না, নরক অথবা প্রেতলোকে গিয়ে অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। তোমরা কখনো আত্মহত্যা করবে না। আত্মহত্যা করার প্রবণতাও আত্মপীড়নের অন্তর্গত বলে জানবে। অত্যধিক আত্মপীড়নের ফলে মানুষ দুঃখের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করতে চাইলে কামসুখ, আত্মপীড়ন দুই পথ পরিহার করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে চালিত হতে হয়। যারা জ্ঞানী তারা কামসুখ, আত্মপীড়ন অনুশীলন করাকে অনার্য, হীন, পাপ, দুঃখ বলে জানতে পারেন এবং কামসুখ, আত্মপীড়নকে পরিত্যাগ করতঃ পরম সুখে অবস্থান করেন। কিন্তু যাদের জ্ঞান নেই অজ্ঞানী তারা কামসুখ, আত্মপীড়ন ত্যাগ করতে পারে না। আচ্ছা, তাহলে কামসুখ, আত্মপীড়ন কখন পরিত্যাগ করা সম্ভব? যখন চিন্তের মধ্যে বিদ্যা বা জ্ঞান উদয় হয়ে থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রথম দিকে চণ্ডাল কন্যাটি স্থবির আনন্দের প্রতি অনুরক্ত হওত আনন্দকে বিয়ে করতে না পেলে আহার ত্যাগ করে মরে যেতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যখন সে অরহত্ব লাভ করে তখন তাকে আনন্দের কথা বললে লজ্জায় নতশির হয়

এবং বুদ্ধকে সেই কথা না বলার জন্য অনুরোধ করে। তার কারণ কি? যেই মেয়েটি কিছুক্ষণ আগেও আনন্দকে লাভের জন্য উন্মাদিনী প্রায়, এখন কেন সে তার বিপরীতে কথা বলছে? কারণ অরহত্‌ লাভ করার ফলে তার নিকট জ্ঞান ও সত্য উদয় হয়ে অজ্ঞান মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে। সেই জ্ঞান, সত্যের দ্বারা কামসুখ চেতনার নিবৃত্তি ঘটেছে। তাই জ্ঞান ও সত্য উদয় হলে কেহ অনার্য, হীন, দুঃখপূর্ণ সংসারী হয় না। অর্থাৎ কোন মেয়েকে যেমন ছেলে বিয়ে করতে হয় না তেমনি কোন ছেলেকেও মেয়ে বিয়ে করতে হয় না। তোমাদের সেই জ্ঞান, সত্য উদয় হয়নি বলে সংসারী জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তোমাদের সংসারী জীবন-যাপনের দ্বারা কি পরিমাণ সুখ জন্মা হয়েছে তা' আমাকে বলতে পারবে কি? কখনো বলতে পারবে না। যেহেতু সংসারী জীবনে কোথাও সুখ নেই। তজ্জন্য প্রত্যেকের উচিত কামসুখ, আত্মপীড়ন ত্যাগ করে পরম সুখ নির্বাণ লাভে তৎপর থাকা।

তোমরা আজকে যে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে সেখানেও জ্ঞান থাকতে হবে, সেখানে জ্ঞান থাকলে তা' সদ্ধর্ম হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, যাদের জ্ঞান নেই তারা পাপকর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু যাদের জ্ঞান থাকে তারা পাপকর্ম সম্পাদন করে না। পুণ্য তথা কুশলকর্ম সম্পাদনে জ্ঞান থাকা চাই। এক কথায়, ধর্ম জ্ঞান ও ধর্ম চক্ষু উদয় হলে তবেই পাপ মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই তোমাদেরকে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু, ধর্মবোধ অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু, ধর্মবোধ হলে চিরসুখ লাভ হয়ে থাকে। সেই ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু, ধর্মবোধ কি রকম? কুশল অকুশলধর্মকে বুঝতে পারাই হল ধর্মজ্ঞান। অন্ধকার রাত্রিতে যেমন বিদ্যুতের আলো দেখা যায় ঠিক তেমনিভাবে হঠাৎ নির্বাণের শাস্তি জ্যোতিকে দেখতে পাওয়াই হল ধর্মচক্ষু। মার্গফল লাভ করা হল ধর্মবোধ। ধর্ম, কোন এক ব্যক্তি পথের ধারে উলঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছে। সেই দৃশ্য দর্শনে একজন হৃদয়বান, দয়ালু ভদ্রলোক একটি ধুতি ও একটি শাট এনে দিয়ে উলঙ্গ ব্যক্তিকে প্রদান করতঃ পরিয়ে দিল। এবার উলঙ্গ ব্যক্তিটি আর উলঙ্গ থাকল না। এখানেও ধুতি আর শাট হল যথাক্রমে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু এবং ধুতি, শাট পরিধান করতঃ উলঙ্গ অবস্থায় না থাকা হল ধর্মবোধ তথা মার্গফল লাভ করা। এ' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পূজ্য বনভক্তে আরো একটি শিক্ষণীয় সুন্দর ঘটনা বলা শুরু করেন। আমি আমার (গৃহী অবস্থায় নানার মুখে শুনেছি-বহু আগের কথা তখন ব্রিটিশ শাসন আমল, এখানকার সামাজিক অবস্থা একেবারে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কুকিরা (পাঞ্জোয়া) সেই সময় উলঙ্গ থাকত। তাদের শরীরের সামান্য মাত্র কাপড়ও ছিল না। তাদের সেই বন্য অভ্যাসকে দূর করে দেওয়ার তাগিদে ব্রিটিশ প্রশাসক (গভর্নর) কুকিদের জন্য দুই/তিনদিন ব্যাপী এক বিরাট

মেলায় আয়োজন করেন। রাত্রি যাপনের জন্য সুবিশাল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ঘর তৈরি করে দেওয়াসহ যাবতীয় ব্যবস্থাদি করা হয় সুচারুরূপে। দলে দলে কুকি এসে জড়ো হতে থাকে বিশাল বিশাল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ঘরে। গুরু হয় জাকজমক মেলা। কেবলমাত্র কুকিরা নয় অন্যান্য অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল সেখানে। আমাদের নানাও নাকি তার বাপের সঙ্গে সেই মেলায় গিয়েছিলেন। আর লম্বা ঘরের ভিতর উলঙ্গ কুকিদের দেখে কৌতুহল ভরে জিজ্ঞাসা করেন—বাবা এরা উলঙ্গ কেন? বাবার সহজ উত্তর—কুকিরা তো উলঙ্গ থাকে, কাজেই উলঙ্গ না থেকে কিভাবে থাকবে? যথারীতি মেলার শেষ পর্যায়ে গভর্নর মহোদয় কুকিদের তলব দিল। সরকারের চাকমা কর্মচারীগণ কুকিদেরকে গিয়ে বলল—‘বন তুমারে সাহবে ডাগের’ অর্থাৎ বন্ধু, তোমাদেরকে গভর্নর মহোদয় ডাকতেছেন। কুকিরা যখন গভর্নরের কাছে আসল গভর্নর একে একে প্রত্যেক কুকিকে একটি ধুতি একটি শার্ট উপহার দিয়ে বলল তোমরা এগুলো এক্ষুণি পরিধান কর। আর উলঙ্গ থাকবে না। উলঙ্গ থাকলে দেখতে বিশ্রী দেখায়। মানুষ হয়ে তোমরা কেন উলঙ্গ থাকবে? উলঙ্গ তো পশু-পক্ষীরূপে থাকে। কাজেই আজ হতে আর তোমরা উলঙ্গ থাকতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে উলঙ্গ কুকিরা সাদা ধুতি, সাদা শার্ট পরিধান করতঃ ভদ্র হয়ে গেল। সব উলঙ্গ কুকিরা হয়ে গেল ধপদপে সাদা আর সাদা। সেই সময় থেকেই কুকিরা কাপড় পরিধান করতে শুরু করেছিল; আর উলঙ্গ হয়ে অবস্থান করে নি। বর্তমানে তোমাদেরকেও উলঙ্গ কুকির মতই দেখতেছি, অন্যদিকে আমি হল্যাম বৃটিশ প্রশাসক। বৃটিশ প্রশাসক যেমন উলঙ্গ কুকিদের একটি ধুতি ও একটি শার্ট প্রদান করেছিল ঠিক তেমনিভাবে আমিও তোমাদেরকে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু বিতরণ করে যাচ্ছি এবং তোমাদেরকে সেগুলো গ্রহণ করে পরম সুখে সুখি হতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করছি। উলঙ্গ ব্যক্তিদের দেখতে বিশ্রী দেখায় নয় কি? উলঙ্গরূপ ধর্মজ্ঞান হীন, ধর্মচক্ষু বিহীন অবস্থায় তোমাদেরকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। কাজেই অতিসত্বর একটি ধুতি ও একটি শার্টরূপ ধর্মজ্ঞান ধর্মচক্ষু উদয় কর। আর উলঙ্গ না থেকে ধর্মবোধ বা মার্গফল লাভ করে পরম সুখে অবস্থান কর।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন—আমি তোমাদেরকে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু বিহীন অবস্থায় উলঙ্গরূপে দেখতেছি বলে কোন ফাং এ’ যাচ্ছি না বর্তমানে। একবার নির্মলেন্দু চৌধুরী আমাকে বলেছিল, ভন্তে আপনি ফাং এ’ যাচ্ছেন না বিধায় অনেকে আপনাকে অহংকারী ভাবছে। আমি বললাম, অহংকার করা নয় লোকজনকে উলঙ্গ দেখতেছি বলে তাদের ফাং—এ’ যাচ্ছি না। আচ্ছা, ধর কোন একগ্রামের অধিবাসীরা কেহ কাপড় চোপড় পরিধান করে না, সবাই উলঙ্গ থাকে। কোন ঘটনাচক্রে একদিন তোমাকে তাদের বাড়িতে ভাত খাওয়ার

নিমন্ত্রণ করলে তুমি যাবে কি? না যাব না; লজ্জা লাগবে (চৌধুরীর সহজ উত্তর)। ঠিক তদ্রূপ, বর্তমান লোকজনকে উলঙ্গরূপে দেখতেছি বলে আমার পক্ষে ফাং-এ' যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তোমাদের যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হতো তাহলে আমি অবশ্যই ফাং-এ' যেতাম। কোন প্রকার লজ্জা লাগত না আমার।

তোমরা সকলে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে পারলে তবেই বৌদ্ধধর্ম যথাযথভাবে আচরণে সক্ষম হবে। জ্ঞান বিহীন অবস্থায় অজ্ঞানের সহিত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা সম্ভব নয়। বি, এ পাশ, এম, এ পাশ, ত্রিপিটক বিশারদ, পালিশাস্ত্র বিশারদ এবং বহুভাষাবিদ এসব বাহ্যিক শিক্ষা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞান দর্শন, সত্য দর্শন করাই বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বশর্ত। অজ্ঞান চর্চা এবং অজ্ঞান দর্শন, মিথ্যা দর্শন করা হলে বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অজ্ঞান এবং মিথ্যা ধারণা দ্বারা কেবলমাত্র দুঃখ করাই সার হয়। চারি আর্যসত্যকে দর্শন ও প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি জ্ঞানকে দর্শন করা বৌদ্ধধর্ম। তোমরা চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি জ্ঞানকে দর্শন করো কখনো অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন করবে না। জ্ঞান, সত্যকে দর্শন করলে চিন্তা সম্যকপথে চালিত হয় আর সঙ্গে সঙ্গেই সুখ অর্জিত হয়। কিন্তু অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন করলে চিন্তা মিথ্যাপথে ধাবিত হয়ে সীমাহীন দুঃখে পতিত হয়। এগুলো হল প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা। এক সময় চিক্কে নামক জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল-‘ভগ্নে আপনি আগে তো স্ত্রীলোকের দিকে একদমই তাকাতেন না। কিন্তু এখন কেন তার ব্যতিক্রম ঘটছে? আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ বর্তমানে স্ত্রীলোকের দিকেও তাকাচ্ছি। তবে তোমাদের মতন করে নয়। তোমাদের তাকানো এবং আমার তাকানো মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কি রকম? শিক্ষিত লোকের বই দেখা আর অশিক্ষিত লোকের বই দেখার ন্যায়। শিক্ষিত লোকেরা বইয়ের প্রতিটি লাইন পড়ে নিয়ে তবেই পৃষ্ঠা উন্টিয়ে নেয় এবং বইয়ের মধ্যে যদি ভালো উপদেশ, সং পরামর্শমূলক কথা লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে বইটি উত্তম বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা তো পড়তে জানে না, তাই তারা বইয়ের ছবি দেখে দেখেই পৃষ্ঠা উন্টায় এবং বইয়ের মধ্যে যত বেশি রঙিন, সুন্দর ছবি থাকে ততই বইকে ভালো বলে। আর রঙিন, সুন্দর ছবি না থাকলে বইটি খারাপ বলে ফেলে দেয়-সেখানে যতই ভালো উপদেশ সং পরামর্শের কথা লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন। তোমরা অশিক্ষিত লোকের ন্যায় স্ত্রীলোকটি কত সুন্দর, ফর্সা নাকি কালো, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রকম, এসব দেখার জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে থাক। কিন্তু আমি সেরূপ নয়, আমি তাকিয়ে দেখি কার চিত্তের মধ্যে কতটুকু

জ্ঞান রয়েছে। লোকজনের নিকট কি পরিমাণ জ্ঞান আছে তা' দর্শন করতে আমার এ' তাকানো। কাজেই আমার এই জ্বীলোকের দিকে তাকিয়ে দেখাতে কোন অজ্ঞান, মিথ্যা দর্শন নেই। তাই বলছি, তোমরাও অমুক, সমুক, পুরুষ, মহিলারূপে না দেখে, সবকিছুতেই আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এ চারি ধাতুর সমষ্টি এই দেহ-এরূপ জ্ঞানের সহিত দর্শন করে অবস্থান করবে। জ্ঞানের সহিত যথাসত্যকে দর্শন করাই সুখ। অজ্ঞানের সহিত মিথ্যাকে দর্শন করলে দুঃখ। মনে রাখবে চিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে সুখ, সত্য থাকলে সুখ। যার চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, মিথ্যা বিদ্যমান থাকলে দুঃখের শেষ নেই। চিন্তের মধ্যে জ্ঞান সত্য থাকলে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যের দ্বারা সুখেই জীবন-যাপন করা যায়। চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান মিথ্যা থাকলে পাপ হয়, সেই পাপের ফলে জীবনে নেমে আসে দুঃখের ঘোর অমানিশা।

তিনি বলেন-তোমাদের যদি জ্ঞান, সত্য না থাকে তাহলে স্বামী-জ্বীতে, পিতা-পুত্রে, মাতা-কন্যায়, ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভ্রাতা-ভগ্নিতে, ভগ্নি-ভগ্নিতে, পাড়াশ্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া-কলহ, মনোমালিন্য, দ্বন্দ্ব-সংঘাতসহ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করা অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু দ্বারা নিজেকে চালিত করতে পারলে সেরূপ দুঃখ হতে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। চিন্তের মধ্যে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু থাকলে পাপ, দুঃখ এসে তোমাদেরকে গ্রাস করতে পারবে না। শাস্তিচুক্তি পক্ষ এবং বিপক্ষদের কথা উল্লেখ করে বনভক্তে বলেন অজ্ঞান মিথ্যার ফলে এই দলাদলি। তাদের যদি জ্ঞান ও সত্য উদয় হতো তাহলে সেই মিথ্যা, অজ্ঞানতামূলক কাজকে নিয়ে এতো দলাদলি লাঠালঠি করত না। কিছুদিন আগে কয়েকজন এসে আমাকে বলেছিল, সঙ্কটরূপ ও প্রসিদ্ধরূপের মধ্যে এ'যাবতকালের সংঘর্ষে নাকি প্রায় শতাধিক বি এ পাশ, এম পাশ করা যুবক মারা গেছে। আমি বলি কি? সেই যুবকরা যদি আমার কাছে প্রব্রজিত হয়ে সঙ্কর্ম প্রচারে সাহায্য করত তবে তাদেরও মঙ্গল সাধিত হতো এবং ধর্ম প্রচারের কাজও এগিয়ে যেত। বর্তমানে আমার শিক্ষিত শিষ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই অজ্ঞানতামূলক হানাহানিতে মৃত্যুবরণ করে নিরয়গামী হওত তাদের কিবা লাভ হল? অজ্ঞানীরা এভাবে মিথ্যাপথে ধাবিত হয়ে দুঃখ পায়। তাই তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি অজ্ঞান, মিথ্যা, পাপকর্ম হানাহানি, মারামারি হতে বিরত থাক। জ্ঞান, সত্য ও পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ কর। সর্বদা ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় করতে তৎপর হও। জ্ঞান, সত্যের বিপরীতে অজ্ঞান, মিথ্যায় জড়িত থাকলে তোমাদের পরিহানি সুনিশ্চিত বলে জানবে। তোমাদের যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় না হয় এবং বৌদ্ধধর্মের গৌরব না কর, অন্যায় কাজ হানাহানি, মারামারি হতে নিজেকে বিরত না রাখ তাহলে বার বৎসর পর

তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থা থেকে আরো সক্রিয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

কয়েকদিন আগে এক গৃহবধু তার যুবতী মেয়ে সহ আমার কাছে এসে বলল, পূজ্য ভগ্নে আমার মেয়েকে একটু জ্ঞান দেন। সে একজন নোয়াখালীস্থ মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। আমি বললাম, তোমার মেয়ে যদি আমার কথা অগ্রাহ্য করে তবে তাকে বুঝালে তো লাভ হবে না। গৃহ বধু বলে উঠল ভগ্নে আপনি বললে অগ্রাহ্য করবে না। শেষে আমি যুবতীর উদ্দেশ্যে বললাম, “তুমি মুসলিম ছেলেটাকে বিয়ে না করে একজন চাকমা ছেলে বিয়ে কর।” একথা আমি সরাসরি বলছি না। এভাবে বলা আমাদেরকে (ভিক্ষুদের) শোভা পায় না। তবে মুসলিম ছেলে বিয়ে করা অনেক মেয়ে আমার কাছে এসে বলেছিল ‘ভগ্নে কি পাপের ফলে আমাদের এ দুরবস্থা (মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করতে হয়েছে) হয়েছে। আমাদের হৃদয়ে তো শাস্তি লাভ হচ্ছে না। সর্বদা অনুশোচনা, অনুতাপের অনলে ছাঁই হয়ে যাচ্ছে। এভাবে তাদের অসহ্য দুঃখ দুর্দশার কথা বলেছিল। তারা না পারে মুসলিম সমাজে মিশতে, না পারে মিশতে চাকমা সমাজে। মুসলিম মেয়েরা তাদেরকে বলে “তুমি তো চাকমা”...। আর চাকমা মেয়েরা তাদেরকে বলে “তুমি তো মুসলিম”...। এভাবে পরস্পর তুচ্ছ, অবজ্ঞা করে এড়িয়ে চলতে চায়। এমন কি আপন ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবগণ ও যত দূর সম্ভব এড়িয়ে চলার নীতি অনুসরণ করে থাকে। তার উপর আরো নানা প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ভোগ করতে হয় যা কারোর নিকট প্রকাশ করাও সুযোগ নেই। এবস্থি শারীরিক, মানসিক যন্ত্রণাও দুঃখের মধ্যে থাকতে হয় তাদেরকে। সর্বদা অনুশোচনার জ্বালায় পুড়ে ছাঁই হয়ে যেতে হচ্ছে তাদেরকে। অন্যদিকে প্রকৃত সুখ বৌদ্ধধর্ম হতে বিচ্যুত হওত মিথ্যাধর্মে যেতে হয়। বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ে যে দশবিধ কর্ম সম্পাদন দ্বারাই প্রকৃত বৌদ্ধ হতে বলেছেন, সেখানে ধর্মকে (বৌদ্ধধর্মকে) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে জীবন-যাপন করতে বলা হয়েছে। যারা জ্ঞানী তারা ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান, আত্মীয়-স্বজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি জীবনের বিনিময়েও বিজ্ঞান-ভিত্তিক, প্রজ্ঞা-প্রধান বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করেন না। তাই আগাম দুঃখের কথা জেনেও সেই ভুল পথে পা বাড়ালে আমার বলার কিছু নেই। তবে ভবিষ্যতে সেই দুঃখের সম্মুখীন হলে তখন আমার এসব কথা খুব মনে পড়বে। কিন্তু তখন তো আর কিছুই করার থাকবে না। শুধুমাত্র অশ্রুসিক্ত নয়নে অনুশোচনার তীরে বার বার বিদ্ধ হতে থাকবে। তজ্জন্য ভেবে-চিন্তে এবং জ্ঞানের সহিত বিচার-বিবেচনা করে কাজ করাই উত্তম, আবেগের বসে কোন কাজ করবে না। সর্বোপরি যেই কাজ করার পরে দুঃখ পেতে হবে সেই কর্মটি না করাই বিধেয়। বনভগ্নে এবার

উপস্থিত যুবতী মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে মেয়েরা! তোমরাও এসব কথা শুনে রাখ। পরে আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না। এগুলো তো কল্পনার কথা নয়, যা বাস্তবে ঘটেছে, ঘটবে তাই বলছি। কাজেই সাবধান।

পরিশেষে বনভঙ্কে বলেন- আমি আবারো বলছি তোমরা জ্ঞান ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। অজ্ঞান মিথ্যার সহিত অবস্থান না করে সবসময় জ্ঞান, সত্যের সহিত অবস্থান কর। মনে রাখবে, সুখ লাভের জন্য জ্ঞান ও সত্য ভিন্ন কোন উপায় নেই। জ্ঞান, সত্যের দ্বারাই একমাত্র সুখ লাভ হয়। জ্ঞান, সত্যের পরিণাম সুখ। আর অজ্ঞান, মিথ্যার পরিণাম দুঃখ। এ' জগতের কোন কিছুতেই সুখ নেই, পার্থিব কোন বস্তু দ্বারা সুখ অর্জিত হতে পারে না। চারি আর্যসত্য জ্ঞান এবং নির্বাণ লাভের দ্বারাই সুখ অর্জিত হয়। তাই তোমরা সকলে একরূপ বলো “আমরা অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করব না, জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করব। আমরা মিথ্যার সহিত অবস্থান করব না, সত্যের সহিত অবস্থান করব। সেই জ্ঞান সত্যের মাধ্যমে নির্বাণের সন্ধান পেয়ে আমরা পরম সুখে থাকব।” সংসারী জীবনে যেই সুখ দৃষ্ট হয় তা' মুরুভূমিতে সৃষ্টি মরিচিকার ন্যায় মিথ্যা। সংসারী জীবনে কিছুতেই প্রকৃত সুখের ছোঁয়া লাগে না।

তোমরা অনার্য হবে না, আর্য হয়ে যাও। আর্যগণের ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ লাভ হয়ে থাকে। অনার্য হলে ইহকালও দুঃখ পরকালও দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেই আর্য কি? আর্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতা বুঝায়। যারা অকুশল বিরত হয়ে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করে তাদের জীবনকে আর্য জীবন বলে। যারা কোন প্রাণীকে হিংসা করে না তাদেরকে আর্য বলা যায়। প্রাণী হিংসাকারীদেরকে আর্য বলা যায় না। মানুষ হতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি কোন প্রাণীকে তোমরা হিংসা করবে না। জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি বৈরীভাব আচরণ করবে না। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করবে। তোমরা সর্বদা আর্যনীতি অনুসরণ করতঃ অনার্য নীতি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর। এতে তোমাদের ইহ-পরকালে সুখ অর্জন সহ উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে, কখনো পরিহানি হবে না। তোমাদের ইহ-পরকালে সুখ শান্তি লাভ হোক এবং উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়ে যাক-এ' আশীর্বাদ রইল।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা অমরভুবনে অবস্থান কর

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনালায়ে আয়োজিত সজ্ঞাদানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-কোন ভিক্ষু যদি লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করে তা' পরধর্ম। এবং সেই ভিক্ষু মারভুবনে অবস্থান করতেছে বলে জানবে। মারভুবনে অবস্থানরত ভিক্ষু কথিত ধর্মদেশনা শ্রবণ করা হলে সুখের পরিবর্তে দুঃখ ভোগই করতে হয়। আর সেই দুঃখ ভোগের ফলে দায়ক-দায়িকাদের মনে ধর্মের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস জন্মায়। অন্যদিকে কোন ভিক্ষু লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণামুক্ত হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করলে তা' সদ্ধর্ম এবং সেই ভিক্ষু অমরভুবনে অবস্থান করতেছে বলে অভিহিত হয়। মনচিন্ত অমরভুবনে বিদ্যমান থাকলে চির সুখ, শান্তির সন্ধান মিলে ও অমরত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! যে সকল ভিক্ষু শ্রমণ মারভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ, অমরভুবন সম্বন্ধে অদক্ষ; মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে অদক্ষ; ইহলোক সম্বন্ধে অদক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে অদক্ষ; চিত্ত সংযম-শমথ বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে অদক্ষ সেই সকল ভিক্ষু শ্রমণগণের কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করতে হয়। আবার যে সকল ভিক্ষু শ্রমণ মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমরভুবন সম্বন্ধে দক্ষ; মৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ; ইহলোক সম্বন্ধে দক্ষ, পরলোক সম্বন্ধে দক্ষ; চিত্ত সংযম শমথ-বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে দক্ষ তাদের কথিত উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করলে দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়। আমি তথাগত মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ আমার কথিত উপদেশ যারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে তাদের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী হিত সুখ সাধিত হবেই। বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে একরূপ দক্ষ ভিক্ষু কোথায়? আমি তো একজন ভিক্ষুও দেখছি না যে মারভুবন সম্বন্ধে। আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, শুন যে সমস্ত কর্ম দ্বারা কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এই ত্রিলোকের মধ্যে সত্ত্বগণকে অধীন করে রাখে তাই মারভুবন। নবলোকোত্তর ধর্ম, যথা-স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অহং, মার্গস্থ ফলস্থ ও নির্বাণ এ' নবলোকোত্তর ধর্মকে বলা হয় অমরভুবন। মনচিন্ত অমরভুবনে থাকলে চিরসুখ, শান্তি ও স্বাধীন বলে জানবে। মারভুবন-অমরভুবন, মৃত্যুরাজ-অমৃত্যুরাজ একার্থবোধক শব্দ। অর্থাৎ যা মারভুবন তা' মৃত্যুরাজ বা মৃত্যুরাজ্য আর যা অমরভুবন তা' অমৃত্যুরাজ্য। মারভুবনে অবস্থান করলে দুঃখ পেতে হয়, বার বার মৃত্যুবরণ করতে হয় বলে তা' মৃত্যুরাজ্য। অমরভুবনে অবস্থান করলে সুখ লাভ হয় এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করতে হয় না, অমরত্ব প্রাপ্ত হয় বলে তা'

অমৃত্যুরাজ্য। ইহলোক সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান রয়েছে বা জ্ঞানের মাধ্যমে যারা নিজেকে ইহলোকে পরিচালিত করে তাদের জন্য ইহলোক সুখের হয়। যাদের ইহলোক সম্বন্ধে জ্ঞান নেই তাদেরকে নানাবিধ দুঃখের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। পরলোক আছে, মৃত্যুর পর আবারো পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই জ্ঞানের মাধ্যমে পরলোকের জন্য যারা পুণ্য অর্জন করে রাখে তাদের জন্য পরলোক সুখের হয়। যাদের কর্মফল, পরকাল সম্বন্ধে জ্ঞান নেই তাদের জন্য পরকাল অত্যন্ত ভয়াবহ ও দুঃখের কারণ হয়। যারা সর্বদা শমধ-বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে চিত্তকে সংযম করতঃ অকুশল পাপ হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তাদের নির্বাণ লাভ সুনিশ্চিত বলে জানবে। এ 'সব বিষয়ে ভিক্ষুদেরকে দক্ষতা অর্জন বা নিপুণ হতে হবে। আর “এটা মারভুবন, এটা অমারভুবন, এটা মৃত্যুরাজ্য, এটা অমৃত্যুরাজ্য, এটা ইহলোক, এটা পরলোক” বলে বিভাগ করার মত দক্ষতা অর্জন করতঃ নিজেও অমারভুবনে অবস্থান করতে হবে এবং উপাসক-উপাসিকাদেরকেও অমারভুবনে অবস্থান করার উপদেশ দিতে হবে। তাহলে ভিক্ষুদের যেমন পরম সুখ অর্জিত হবে তেমনি তাদের উপদেশ শ্রবণ করে উপাসক-উপাসিকাদেরও সুখ অর্জিত হবে।

কিন্তু যারা মারভুবন কি? অমারভুবন কি? এসব না জেনে অবস্থান করছে আমি তাদেরকে তির্যক প্রাণীর ন্যায়ই বলি। উপমা, মনে কর কোন একটা গরুরকে যদি রাঙ্গামাটি হতে খাগড়াছড়ি বা দীঘিনালায় নিয়ে যাওয়া হয় গরুটি কি তা' জানতে পারবে? কখনো পারবে না। কেন পারবে না? কারণ তির্যক প্রাণীর পক্ষে তো রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা চেনা সম্ভব নয়। তাদেরকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে তারা সেখানে চলে যাবে মাত্র। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাবে এসব জানা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই গরু, ছাগলকে রাঙ্গামাটি হতে খাগড়াছড়ি কিংবা দীঘিনালায় নিয়ে যাওয়া হলেও গরু, ছাগলেরা তা' জানতে পারে না। খাগড়াছড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় “আমি খাগড়াছড়িতে যাচ্ছি”, খাগড়াছড়িতে পৌঁছলে “আমি খাগড়াছড়িতে অবস্থান করছি” এসব সম্বন্ধে গরু, ছাগলেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। অন্যদিকে একজন মানুষকে রাঙ্গামাটি হতে খাগড়াছড়ি কিংবা রাউজান নিয়ে যাওয়া হলে সে সবই জানবে। রাঙ্গামাটি হতে খাগড়াছড়ি কিংবা রাউজান যাওয়ার সময় সে ‘আমি খাগড়াছড়ি যাচ্ছি’ কিংবা ‘আমি রাউজান যাচ্ছি’ এবং খাগড়াছড়ি কিংবা রাউজান পৌঁছলে ‘আমি খাগড়াছড়ি/রাউজান পৌঁছেছি’ বলে সবই জানতে পারবে। ঠিক তদ্রূপ, বর্তমানের লোকজনেরাও তারা কি মারভুবনে অবস্থান করছে নাকি অমারভুবনে অবস্থান করছে এসব না জেনে গরু, ছাগলের মতন অজ্ঞভাবে অবস্থান করতেছে। কিন্তু যারা মারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ মৃত্যুরাজ্য

সম্বন্ধে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে দক্ষ তারা নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত থাকে। তাই তারা মারভুবনে অবস্থান করলে “আমি মারভুবনে অবস্থান করছি” আর অমারভুবনে অবস্থান করলে “আমি অমারভুবনে অবস্থান করছি” বলে সম্যকরূপে জানতে সক্ষম হয়। পূজ্য বনভন্তে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদেরকে উপলক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন—তোমরা মারভুবন, অমারভুবন জেনে অবস্থান করছ কি? দায়ক-দায়িকাগণ সরাসরি উত্তর প্রদান না করে চূপচাপ থাকলে বনভন্তে বলেন, আমি তো দেখছি তোমরা কিছুই না জেনে অবস্থান করছ। এবার দায়ক-দায়িকাগণ বলে উঠল—হ্যাঁ ভন্তে, আমরা মারভুবন কি এবং অমারভুবন কি এসব না জেনেই অবস্থান করছি। এবার বনভন্তে বলেন, তাই আমার উপদেশ হল তোমরা গরু ছাগলের মতন অবস্থান না করে মারভুবন, অমারভুবন সম্বন্ধে দক্ষ হয়ে মারভুবন ত্যাগ করতঃ অমারভুবনে অবস্থান কর। এটাই একমাত্র সুখ লাভের উপায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন—ভগবান বুদ্ধ নবীন ভিক্ষুদেরকে মার্গফল লাভ করলেও তা’ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করতে বারণ করেছেন। প্রবীণ হয়ে গেলে তবেই তা’ প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে আমিও প্রবীণ হয়েছি; তাই আমি আমার (মার্গফল লাভের) কথা বলতে পারব। আমি চাকমা সমাজে অনেকজনকে বলতে শুনেছি—“কি করব? কোথায় যাব? কোথায় গেলে প্রাণ বাঁচবে? কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মতে এসব চিন্তা সঠিক নয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—হে ভিক্ষুগণ! কোন পার্থিব স্থানে বেঁচে থাকো বলে আমি ধর্ম উপদেশ দিই না। আবার মৃত্যুবরণের জন্যও উৎসাহিত করি না। কারণ পার্থিব জগতে বেঁচে থাকলে বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। উপস্থিত মাথায় ব্যাভেজ্য করা একজন লোককে দেখায়ে দিয়ে বনভন্তে বলেন, দেখ সে বেঁচে রয়েছে বলে এই আঘাতটুকু পেয়েছে। যদি বেঁচে না থাকত তাহলে তাকে কি মাথায় ব্যাভেজ্য করার মত আঘাত পেতে হতো? হতো না। আবার লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদ্যমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও পুনঃ জন্মধারণ করতঃ আবারো দুঃখ ভোগ করতে হয়। কারণ জন্ম হলে মৃত্যু হয়, মৃত্যু হলে জন্ম হয়। কাজেই বেঁচে থাকা যেমন দুঃখজনক তেমনি মৃত্যুবরণ করলেও দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় না। তাই মৃত্যুবরণ করাও দুঃখজনক। কেবলমাত্র লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয়সাধন করে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হতে পারলে তবেই সুখ লাভ হয়। ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বদিগকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়ে নির্বাণ লাভ করতঃ দুঃখের চির অবসান ঘটাতেই উপদেশ দেন। তাই যারা বুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী তারা বেঁচেও থাকে না, মৃত্যুবরণও করে না। অপরদিকে অজ্ঞানী ব্যক্তির কখনো বেঁচে থাকে আবার কখনো মৃত্যুবরণ করে। এই উভয়ই পরম দুঃখদায়ক। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ হল, তোমরা জন্ম-মৃত্যুর

মূল কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত করে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওত নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

এ' সংসারে সবকিছুই অনিত্য। তোমরা অজ্ঞানতাবশত পরস্পরকে বলে থাক যে, সে আমার স্বামী, সে আমার স্ত্রী, তারা আমার পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আমার বাড়ী-জায়গা জমি ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এ'সব মিথ্যা ধারণা মাত্র। কারণ বর্তমানে যাকে আমার বলে দাবি করছ সেই যদি মারা যায় তাহলে কি তোমার থাকবে? বা তুমি মারা গেলে তখন কি আর কেহকে আমার বলে দাবি করতে পারবে? পারবে না। বলা চলে, অনিত্য এ' সংসারে প্রত্যেক সত্ত্বগণ ক্ষণিকের জন্য জন্মগ্রহণ করে এবং কর্মানুসারে আয়ু শেষে মৃত্যুবরণ করে। আবার তোমরা যে, নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করতঃ সংসারী জীবন-যাপন কর বৌদ্ধধর্মের মতে সেটাকে কি বলা হয় জ্ঞান? কারাগারে অবরুদ্ধ হয়ে বসবাস করা বলা হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগী কয়েদীর মতন সর্বদা অধীন, দুঃখপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হয়। অন্যদিকে তোমাদের ছেলে মেয়েরা যুবক বা যুবতী বলে তোমরা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও নয় কি? আসলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া নয়, সেটা কারাগারে ঢুকিয়ে দেওয়ার সামিল হয় মাত্র। তোমাদের আদরের ছেলে-মেয়েকে কারাগারে ঢুকিয়ে দিয়ে বিবিধ দুঃখ-কষ্টের ভাগী করে থাক। তোমাদের যদি জ্ঞান লাভ হয় তখনই তোমরা এসব মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করবে। অকুশল পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জাশীল ও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করবে। কিন্তু ধর্মজ্ঞান না থাকলে মিথ্যাকে গ্রহণ করতঃ নিজেকে মিথ্যার মধ্যে আঁকড়ে রাখতে তৎপর হবে। অকুশল পাপমূলক কর্ম সম্পাদনে কোন প্রকার লজ্জা ও ভয় থাকবে না। এখন তোমরা নিজেকে নিজে পরীক্ষা করে দেখ তোমাদের মধ্যে কত পরিমাণ জ্ঞান উদয় হয়েছে এবং অকুশলকর্ম সম্পাদনে লজ্জাশীল ও ভয়দর্শী হতে পেরেছ কি? এই আত্মপরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা দিনে দিনে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে অনায়াসে। যাদের সেই জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে তারা যাবতীয় অকুশলকর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়। তোমরা অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ না করে সর্বদা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর। অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করলে অসহ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয়ে চির সুখ, শান্তি লাভ হয়। তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যে সংসার করভেছ তা' অজ্ঞানীদের কাজ। জ্ঞানী জনেরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে মিথ্যা, অসার সাংসারিক ধর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখে না। তোমাদের জ্ঞানের পরিধি কম বলে তোমরা মিথ্যা, অনার্য এ' সাংসারিক জীবন-যাপন করভেছ। এতে তোমাদেরকে বর্ণনাভীত দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হচ্ছে। আমি জ্ঞাননেত্রে দর্শন করে

তোমাদের এই দুরাবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যদিও তোমরা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছ কিন্তু চিন্তের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য সুখ, শান্তি এবং পবিত্রভাব অনুভব হচ্ছে না।

পরিশেষে বনভঙ্কে বলেন-তোমরা নারী, পুরুষ একে অপরকে গ্রহণ না করে নির্বাণকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাক। স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণ লাভই আসল লাভ। নির্বাণ লাভ করতে পারলে আর কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকে না। নির্বাণ লাভ হলে অনাবিল সুখের ছোঁয়া স্পর্শ হয় এবং স্বাধীনভাবে বিচরণ করা যায়। তাই নির্বাণ লাভ হলে লোকসানের কোন আশঙ্কা থাকে না। নির্বাণ লাভের জন্য স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ী, অর্থ-বিস্ত কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। তজ্জন্য নির্বাণ লাভ হলে কোন কিছু হারাবার ভয়ও থাকে না। অন্যদিকে নির্বাণ সুখ লাভ হয় বিনামূল্যে। চারি আর্ষসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জিত হলে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয়। তোমরা সকলে নির্বাণ সুখ প্রত্যাশী হও। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারী সুখের প্রত্যাশী হবে না। প্রকৃতপক্ষে সংসার সুখের মাঝে কোন তৃপ্তি নেই, তা' সুখ ভ্রমে দুঃখই সার বলে জানবে। আমি নিজে সেই প্রকৃত সুখ নির্বাণ উপলব্ধি করে অবস্থান করতেছি। তোমাদেরকেও সেই প্রকৃত সুখের কথা, সুখের পথ দেখায়ে দিচ্ছি। আমি নিজে সুখ ভোগ করে তোমাদেরকে দুঃখের কথা, দুঃখের পথ দেখায়ে দিচ্ছি না। আমি যেরূপ সুখে আছি তোমাদেরকেও সেরূপ সুখের অধিকারী হতে উপদেশ দিচ্ছি। উপমা, আমি যে রকম মিষ্টি এবং ভালো আম খাচ্ছি, তোমাদেরকেও মিষ্টি আম, ভালো আমই খেতে বলছি। আমি মিষ্টি, ভালো আম খেয়ে তোমাদেরকে টক, পোকায় খাওয়া আম খেতে উৎসাহিত করছি না। সেই টক, পোকা খাওয়া আম কি জান? তোমরা যে সংসারী হয়ে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যায় লাভ করতেছ তা টক, পোকায় খাওয়া আম। আর নির্বাণ হল মিষ্টি আম, পোকাবিহীন ভালো আম। তোমরাও মিষ্টি আম, ভালো আম রূপ নির্বাণ খেয়ে অমৃতময় সুখের অধিকারী হও।

সাধু, সাধু, সাধু।

সমাপ্ত

আর্থশ্রাবক বনভন্তের দেশনা

সিরিজ-৩

প্রথম অধ্যায়

বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর

এক সময় পরম পূজ্য শ্রাবক বুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনায় বলেন-ভগবান বুদ্ধ গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করার পর আনন্দের আতিশর্যো উদান গাথা গেয়ে উঠেন-

না পেয়ে যথার্থ চারি সত্যের দর্শন,
দীর্ঘকাল বহু যোনি করেছি ভ্রমণ ।
এবার পেয়েছি সেই সত্যের দর্শন,
ভবনেত্রী তৃষ্ণা এবে হয়েছে নিধন ।
উৎপাটিত দুঃখ মূল, দুঃখের কারণ,
পুনর্ভব, পুনর্জন্ম নাহিরে এখন ।

অর্থাৎ চারি সত্যের সন্ধান না পেয়ে আমি বহু যোনি বা বহু জন্ম জন্মান্তর সংসার পরিভ্রমণ করেছি; কিন্তু এতোদিন তার দেখা পাইনি । এবার আমি সেই সত্য লাভ করেছি । আমাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে না । পুনর্জন্ম বা পুনঃপুন সংসার ভ্রমণের কোন হেতু (অবিদ্যা, তৃষ্ণা) আর নেই । আমার চিত্ত এখন সকল প্রকার তৃষ্ণা হতে বিমুক্ত হয়েছে । চিত্ত থেকে তৃষ্ণাসমূহ সমূলে ক্ষয়সাধন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে । তোমরাও সেই সত্য লাভের জন্য বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে সচেষ্ট থাক । বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এই বিশ্ব সংসারকে দর্শন করলে তৃষ্ণা ক্ষয় করে অমরভুবন নির্বাণ লাভ হয় । জ্ঞানচক্ষুর বিপরীত মারচক্ষু দিয়ে দর্শন করবে না; তাতে তৃষ্ণা উৎপত্তি হয়ে থাকে । আর সজে সজে পুনর্জন্মের দুঃখও সৃষ্টি হয়ে যায় । তাই মারচক্ষুতে দর্শন না করেই অবস্থান কর । মনে রাখতে হবে, বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে সক্ষম হলে মারচক্ষুও বন্ধ হয়ে যায় ।

বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
রূপরূপ দেখ ঘৃণ্য, অন্তত লক্ষণ ।

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তোমরা এরূপ উপলব্ধি কর যে, আপাতদৃষ্টিতে দেহকে যতই সুন্দর দেখাক না কেন, ইহা সমল ও পুতিগন্ধময় অশুচি উপাদানে ভরা। শীঘ্রই ইহা পচে গলে যাবে। এই দেহ পচে গিয়ে পোকা কিলবিল করে বেড়াবে এবং মাটিতে মিশে যাবে। এইভাবে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে (সর্ব বিষয়) দর্শন করতে পারলে সুখ লাভ হয়। মারচক্ষু দিয়ে কোন কিছুই দর্শন করবে না: যদি কর তাহলে দুঃখ পেতে হবে। মার চক্ষু দ্বারা দর্শন করলে সেটা মাররাজ্য বলে জানবে। কাজেই সেখানে দুঃখ ছাড়া সুখ নেই। অন্যদিকে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করলে সেটা নির্বাণ রাজ্য; নির্বাণ রাজ্যে কোন প্রকার দুঃখের আশঙ্কা নেই। তজ্জন্য ভগবান জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করতে বলেছেন। পূজ্য ভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-ভগবান বুদ্ধ আমাদেরকে কিভাবে দর্শন করতে বলেছেন? ভিক্ষুসঙ্ঘ-ভন্তে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা। বর্তমানে গোয়েন্ধাজীও জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করে থাকে। বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে তার জ্ঞানচক্ষু পরিস্ফুট হয়েছে। অতিরিক্ত মস্তিক পীড়ার জ্বালায় (যাতনায়) সে পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করতঃ লোকোত্তর মার্গে উন্নীত হয়েছে। চর্মচক্ষুতে মার থাকে বলে চর্ম চক্ষুকেও মারচক্ষু বলা হয়। মারচক্ষু দিয়ে দর্শন করলে পাপকর্মের মাধ্যমে সুখ ভোগ করতে ইচ্ছা জাগে। যারা মারচক্ষু দিয়ে দর্শন করে তারা পাপকর্ম করবে।

অতিরিক্ত দুঃখ পেলেও অর্হৎ হতে পারে। কিভাবে? দুঃখের জ্বালায় পঞ্চস্কন্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়ে বিদর্শন ভাবনা করতঃ মার্গফল লাভ করা সম্ভব হয়। তাই বলা হয়েছে, পঞ্চস্কন্ধ যে কি দুঃখ তা' জ্ঞাত না হয়ে বিদর্শন ভাবনা করতে নেই। কারণ পঞ্চস্কন্ধে সুখ আছে মনে করা হলে পঞ্চস্কন্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানো যায় না। 'আমি পঞ্চস্কন্ধে কি দুঃখ পাচ্ছি' তা জ্ঞাত হয়ে বিদর্শন ভাবনা করতে হয়। দুঃখ পেয়েও দুঃখটাকে জ্ঞাত হতে না পারা অজ্ঞানের স্বভাব। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন-দুঃখ পেয়েও দুঃখটাকে জ্ঞাত হতে না পারা কি? ভিক্ষুসঙ্ঘ-ভন্তে, অজ্ঞান। ভগবান বুদ্ধ এই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে বলেছেন। দুঃখ কি? দুঃখ সমুদয় কি? দুঃখ নিরোধ কি? দুঃখ নিরোধের উপায় কি? সে সব সম্যকভাবে জ্ঞাত হতে বলেছেন। তোমরা সকলে দুঃখ পাচ্ছ; কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ সেই দুঃখ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারছ না বিধায় দুঃখ থেকেও মুক্ত হতে পারছ না। ভগবান বুদ্ধের (প্রচারিত) ধর্মে তিনটি ধর্ম মুখস্থ রাখতে হয় এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হয়। যথা-১) জগতের সবকিছু অনিত্য ২) সর্বের সত্তা দুঃখময় ৩) সকল জিনিসই অনাত্ম-এই তিনটি ধর্ম গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। জগতের সবকিছুই অনিত্য; ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ধ্বংসের হাত হতে

কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। সবে সত্তা দুঃখময়; সকল প্রাণীই দুঃখের মধ্যে রয়েছে, শুধুমাত্র পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ নয় মানুষ (বাংলাদেশী হোক, জাপানী হোক, আমেরিকান হোক) স্বর্গের দেবতা, ব্রহ্মার পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছে। কারোর কোথাও সুখ নেই। সব কিছুই অনাত্ম; কোন কিছুকে নিজের বলে দাবি করা যায় না। নিজের দেহটা পর্যন্ত নিজের নয়, সেখানে বাহ্যিক কোন বস্তুতে আমার বলা চলে কি করে? তোমরা এই তিনটি ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে প্রচেষ্টা কর। আমার সাথে বলা “জগতের সবকিছু অনিত্য, সবে সত্তা দুঃখময়, সকল জিনিসই অনাত্ম”।

তিনি আরো বলেন-অবিদ্যা, তৃষ্ণা থাকলে মার্গ কি? ফল কি? নির্বাণ কি? জানা যাবে না। অবিদ্যা, তৃষ্ণা থাকলে এগুলো চেনাও যাবে না, বুঝাও যাবে না। বর্তমানের সাধারণ মানুষ সবাই অবিদ্যা, তৃষ্ণাচ্ছন্ন। তারা অবিদ্যা, তৃষ্ণার সহিত অবস্থান করতেছে। কাজেই তারা স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ চিনতে পারবে না। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, তোমরা সাধারণ (অজ্ঞান) হয়ে অবস্থান করো না। সাধারণ হয়ে অবস্থান করলে দুঃখ পেতে হয়; বুদ্ধের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আসে না। তোমরা সাধারণ হয়ে না থেকে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। তাতে সুখ লাভ হবে; বুদ্ধের ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস আসবে। আর তখনই স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ চেনা ও জানা সম্ভব হবে।

তোমাদের চক্ষু অবাধ্য, কর্ণ অবাধ্য, নাসিকা অবাধ্য, জিহ্বা অবাধ্য, কায় অবাধ্য, মন অবাধ্য। সেই অবাধ্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনকে বাধ্য কর। কিভাবে? ধর, কোন একটি ফলজ আমের বাগানে অনেক ফল ধরেছে। তবে বাগানের মধ্যে প্রতি রাত্রে চোর এসে ফলগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। মালিক সকালে বাগানে এসে দেখে পাকা কোন ফলই নেই। এভাবে প্রতিদিন মালিক ফললাভে বঞ্চিত হতে থাকে। এক রাত্ৰিতে সে বাগানে পাহারাদার নিযুক্ত করল; রাত্ৰিকালীন চোরটি যেই মাত্র বাগানে প্রবেশ করল অমনি পাহারাদার চোরকে ধরে ফেলে বধ করল। তারপর হতে কোনদিন চোর আসেনি। আর মালিকও ফল লাভে সক্ষম হল। ঠিক তদ্রূপ এখানে চক্ষু তৃষ্ণাও বাগানের চোর সদৃশ। অবাধ্য চক্ষুকে বাধ্য করার উপায়, নির্বাণ অস্ত্র দ্বারা চোররূপ তৃষ্ণাকে বধ করা। বাগানের ফলগুলো যেমন সেই চোর কর্তৃক আর চুরি হয়নি তেমনি তোমরাও নির্বাণের দ্বারা বধ করা তৃষ্ণার পুনরুৎপত্তি হতে আর দেখবে না। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, মন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এভাবে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

“চক্ষুং লোকে পিয়রুপং, সাতরুপং এথেসা তণ্হা পহীযমানা পহীযতি,

এখ নিরুদ্ধমানা নিরুদ্ধতি”; অর্থাৎ এ জগতে চক্ষু প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞরূপ, তাতে তৃষ্ণা ক্ষীণ হবার কারণ থাকলে ক্ষীণ এবং নিরুদ্ধ হবার কারণ থাকলে নিরুদ্ধ হয়। তোমরা সেই তৃষ্ণাকে বধ বা নিরুদ্ধ করতে পারবে কি? তাই বলি—

প্রিয় স্বাত ক্রমে তৃষ্ণা হয়ে উপজিত,
চক্ষু আদি ষড়লোকে সদা বিরাজিত।
অষ্টমার্গে পথে কর স্মৃতি বিদর্শন,
দুঃখের মূল হেতু তৃষ্ণা হইবে ছেদন।
তৃষ্ণা জয় করে যে সাধক যখন,
দুঃখের নিরোধ তার নির্বাণ দর্শন।

তৃষ্ণাকে যখন নিরোধ বা বধ করবে তখন তোমাদের সুখ লাভ হবে। আর সেই সুখ লাভের জন্য তোমাদেরকে চক্ষু থাকতে অন্ধের ন্যায় (অর্থাৎ কোন কিছু দেখলেও আমি দেখিনি), কর্ণ থাকতে বধিরের ন্যায় (কিছু শুনলেও আমি শুনি নি), জ্ঞান থাকতে বোবার ন্যায় (বলতে পারলেও নিচুপ), শক্তি থাকতে দুর্বলের ন্যায় এবং প্রাণ থাকতে মৃতের ন্যায় হয়ে অবস্থান করতে হবে। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—কিভাবে অবস্থান করবে? ভিক্ষুসঙ্ঘ—চক্ষু থাকতে অন্ধের ন্যায়, কর্ণ থাকতে বধিরের ন্যায়, জ্ঞান থাকতে বোবার ন্যায়, শক্তি থাকতে দুর্বলের ন্যায় এবং প্রাণ থাকতে মৃতের ন্যায় হয়ে। বনভন্তে—হ্যাঁ, সেভাবেই অবস্থান করবে। তাহলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হতে পারবে না এবং পূর্বে উৎপন্ন তৃষ্ণা বধ বা নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হবে।

পূজ্য বনভন্তে বলেন—ভোগ বিলাসের মাত্রা অতিরিক্ত বাড়ালে সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হতে হয়। তাই আমি তোমাদেরকে সর্বদা ভোগ ত্যাগ করার উপদেশই দিই। কারণ ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়ালে সদ্ধর্মে স্থিত থাকা যায় না; সদ্ধর্ম থেকে চ্যুতি ঘটে। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়ালে কি হয়? ভিক্ষুসঙ্ঘ এক বাক্যে বলে উঠল—ভন্তে, সদ্ধর্ম থেকে চ্যুত হতে হয়। সদ্ধর্ম অর্থ ভোগের বিরোধীতা। দায়ক-দায়িকারা ভোগ্যবস্ত্র দান দিলেও তোমরা সেগুলো ভোগ করবে না। আমি প্রব্রজিত হবার সময় থেকে আজ অবধি ভোগ করিনি; ভোগ বিরোধী হয়ে অবস্থান করছি। তাই সদ্ধর্ম থেকে চ্যুত হইনি, বরঞ্চ সদ্ধর্ম লাভে সক্ষম হয়েছি। যদি ভোগ বিলাসী হতাম তাহলে সদ্ধর্ম লাভ করতে পারতাম না। তোমরাও সদ্ধর্ম লাভ করতে চাও কি? “হ্যাঁ ভন্তে”। তাহলে তোমরা ভোগ বিলাসী না হয়ে সর্বদা ভোগ বিরোধী হয়ে অবস্থান কর।

তোমরা জঙ্গলে ভাবনা করতে গেলে মার তোমাদেরকে ভয়-ভীতি

প্রদর্শনার্থে বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখালে ভয় পাবে কি? (বনভক্তে এ প্রশ্নটি কয়েকবার করতে থাকেন) মার কিরূপে ভয়-ভীতি দেখাবে জান? প্রকাণ্ড শরীর, দুই বাহুতে দু'টো রক্তবর্ণ জ্বলজ্বলে চোখ, কর্ণ দু'টি বাহু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, হাতির দাঁতের মত দাঁতগুলো মুখ গহ্বর হতে বের হয়ে এসেছে অথবা মস্তক বিহীন, সর্ব শরীরে ঘন লোমযুক্ত, মস্ত বড়ো হা...করে দেখাবে (পূজ্য বনভক্তের সেই মুখ হা...করে দেখানোর ভঙ্গিটি দেখে ভিক্ষুসঙ্ঘের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়)। তখন কি ভয় পাবে? কয়েক জন ভিক্ষু বলল-ভক্তে, সেটা মার বলে জানতে না পারলে ভয় পাবো বৈকি! বনভক্তে বলেন, মার আরো কি করে জান? প্রথমে তোমাদের চিত্তের মধ্যে ঢুকে জেনে নেবে তোমরা কি ভয় কর, তারপর সেই অনুসারে সাপকে ভয় পেলে, মস্তবড়ো, ফণা বিস্তার করা, বিদ্যুৎছটার মতো মুখ থেকে জিহ্বা বের করে মার সর্পরূপ দেখাবে। বাঘকে ভয় পেলে, বিরাট বাঘ যেন এক্ষুণি হুঙ্কার ছেড়ে তোমাকে ধরে ফেলছে সেভাবে দেখাবে (পূজ্য ভক্তে কর্তৃক বাঘের শিকার ধরার ভঙ্গিটি দেখানো হলে ভিক্ষুসঙ্ঘের মাঝে আবারো হাসির রোল পড়ে যায়)। হাতিকে ভয় পেলে, মস্ত দাঁতাল হাতি দেখাবে। ভূত-যক্ষাদি ভয় পেলে ঐ মস্তবড়ো হা... দেখাবে। মোটকথা, তুমি যেটাকে ভয় পাও সেটিই মার তোমাকে দেখাবে। এইভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা মারের কাজ। মারের সেই ভয় প্রদর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবনা স্থান ত্যাগ করলে তো নির্বাণ লাভ করা যাবে না। যাবে কি? না ভক্তে, যাবে না। তাহলে তোমরা মারের সৃষ্ট সেই ভীতিকর পরিস্থিতিতে কখনো ভয় পাবে না। কোন সময় যদি সেই রকম পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাক তখনই জানবে 'এটা মার কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে'। আর সেইভাবে যদি একান্তই জান (বা মারকে ধরতে পার) যে এটা মারের কাজ, তখন মার সেখান হতে দূরে চলে যাবে। মার বুঝতে পারবে যে, এই ভিক্ষু আমাকে চিনতে পেরেছে; তাকে আর বোকা বানানো বা ধোঁকা দেয়া যাবে না।

তোমরা বুদ্ধের সাক্ষাৎ, সদ্ধর্ম লাভ করতে সচেষ্ট থাক। যদি বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং সদ্ধর্ম লাভ করতে পার তাহলে নিজকে পরম ভাগ্যবান বলে জানবে। যারা বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং সদ্ধর্ম লাভ হতে বঞ্চিত হয় তারা দুর্ভাগ্য। তোমরা ভাগ্যবান হবে, নাকি দুর্ভাগ্য হবে? ভিক্ষুসঙ্ঘ একবাক্যে বলে উঠলেন-ভক্তে, আমরা ভাগ্যবান হবো। তাহলে বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং সদ্ধর্ম লাভ করতে চেষ্টা কর। বুদ্ধের সাক্ষাৎ অর্থ হল বুদ্ধের জ্ঞানকে দর্শন করা। দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়কে সম্যকরূপে দেখা ও হৃদয়ঙ্গম করা। সদ্ধর্ম লাভ অর্থ হল লোভ, দ্বেষ, মোহ নামক পরধর্মকে অনুশীলন না করে অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ নামক সদ্ধর্মকে অনুশীলন করা। বুদ্ধের সাক্ষাৎ হলে সুখ, সদ্ধর্ম

লাভ হলে সুখ। আর বুদ্ধের সাক্ষাৎ না হলে দুঃখ, সদ্ধর্ম লাভ না হলে দুঃখ। এখন তোমরা যদি বুদ্ধের সাক্ষাৎ করতে না পার, সদ্ধর্ম লাভ করতে না পার, তোমরা দুঃখই পাবে এবং তোমাদেরকে বলা হবে দুর্ভাগা। আর যদি বুদ্ধের সাক্ষাৎ করতে পার, সদ্ধর্ম লাভ করতে পার, তাহলে সুখ লাভ হবে এবং তোমাদেরকে বলা হবে পরম ভাগ্যবান। আমার সাথে বলা “বুদ্ধের সাক্ষাৎ হলে সুখ, সদ্ধর্ম লাভ হলে সুখ। আর বুদ্ধের সাক্ষাৎ না হলে দুঃখ, সদ্ধর্ম লাভ না হলে দুঃখ। আমরা বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং সদ্ধর্ম লাভ করে সুখী ও পরম ভাগ্যবান হবো।”

পরিশেষে তিনি বলেন—অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান এ তিনটির কারণে নির্বাণ যেতে পারে না। অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞানতা। যে কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ জানতে না দেয়া অবিদ্যার কাজ। তৃষ্ণা অর্থ পাবার ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছা। পুনঃপুন উপভোগ করা তৃষ্ণার কাজ। উপাদান হল আসক্তি, অশেষণ, দৃঢ় গ্রহণ। তৃষ্ণার বিষয়কে অনুসন্ধান করা উপাদানের কাজ। সাপ যেমন ব্যাঙকে অনুসন্ধান করে। এই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের দ্বারা সত্ত্বগণ দুঃখ ভোগ করতেছে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের কারণে সত্ত্বগণ ক্রেশবৃত্তি করে থাকে। তখন ক্রেশ চেতনা, পাপ চেতনার উন্মেষ ঘটে। এবং দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ক্রেশ কাকে বলে? যা দ্বারা চিত্ত কলুষিত, পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত, মলিন ও নীচ হয় তাকে বলে ক্রেশ। অবিদ্যামুক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, উপাদানমুক্ত হলে ক্রেশ চেতনা, পাপ চেতনা উদয় হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তোমরা অবিদ্যামুক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, উপাদানমুক্ত হতে চেষ্টা কর। তাহলে নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে। আর যাবতীয় দুঃখের চির অবসান ঘটে যাবে, পরম সুখ নির্বাণ লাভ হবে। সেই চেষ্টায় সচেষ্ট থাক-যাতে তোমাদের নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা সর্বদা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন কর

এক সময় লোকোত্তর মহামানব পূজ্য বনভ্রম্বে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—উৎসাহ, অধ্যবসায় জীবন উন্নতির প্রধান সহায়। তোমাদের যদি উৎসাহ থাকে এবং তোমরা অধ্যবসায়ী হও তাহলে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে। যারা নিরুৎসাহ বা উৎসাহশূন্য, হীন কাপুরুষ তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। জীবনে উন্নতি করতে হলে উৎসাহের সহিত দৃঢ় প্রচেষ্টায় অগ্রসর হতেই হবে। কর্মের বলে হীনপুত্র রাজ্যমাতা হতে পারে, মূর্খপুত্র বীর্যের বলে পণ্ডিত হতে পারে, দরিদ্রও অধ্যবসায়ের গুণে মহাধনী হতে পারে। সে জন্য কোন পুরুষকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। মনে থাকবে তো? হ্যাঁ ভ্রম্বে, থাকবে। তা হলে বলো তো দেখি? ভিক্ষুসঙ্ঘ একবাক্যে বলে উঠলেন—“কর্মের বলে হীনপুত্র রাজ্যমাতা হতে পারে, মূর্খপুত্র বীর্য বলে পণ্ডিত হতে পারে, দরিদ্রও অধ্যবসায়ের গুণে মহাধনী হতে পারে। সে জন্য কোন পুরুষকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।” হ্যাঁ, আমি গরিব ব্যক্তিকে ধনী হতে দেখেছি। তাই তোমরাও দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের চেষ্টা কর। মনে রাখবে উৎসাহ, অধ্যবসায় থাকলে যে কোন কাজে সফলতা আসবেই। তোমরা নিরুৎসাহ ও অকর্মণ্যভাবে পরিত্যাগ করে আপন উন্নতির কাজে অগ্রসর হতে থাক।

তোমরা হীন কাপুরুষ হবে না, মহাপুরুষ হয়ে যাও। গৃহী অবস্থায় যেক্রপ সাধারণ মানুষ ছিলে, সেই সাধারণ মানুষটি এখন ত্যাগ কর। সাধারণ মানুষটি (আমি মানুষ এ ধারণা) না থেকে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। তোমরা সবাই সাধারণ মানুষটিকে চিত্ত থেকে বিদায় করে দিয়ে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। তাহলে সুখ লাভ হবেই। সাধারণ মানুষকে নিয়ে থাকলে অজ্ঞান উদয় হয়, ফলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। সাধারণ মানুষকে পরিত্যাগ করা হলে জ্ঞান উদয় হয়, জ্ঞান উদয় হলে তা' কুশল। সেই কুশলের দ্বারা সুখের অধিকারী হওয়া যায়। আর সাধারণ মানুষকে পরিত্যাগ করা না হলে অজ্ঞান উদয় হতে থাকে। অজ্ঞান উদয় হলে তা' অকুশল। সেই অকুশলের দ্বারা বিবিধ দুঃখ ভোগে বাধ্য হতে হয়। কারণ অকুশলের পরিণাম শুধু দুঃখ আর দুঃখ। অকুশল ইহকালে যেমন দুঃখ দেয় তেমনি পরকালেও আরো অধিক পরিমাণ দুঃখ দেয়। কুশল ইহকালে যেমন সুখ দেয় তেমনি পরকালেও আরো অধিক পরিমাণ সুখ দেয়।

যারা স্মৃতি বিহীন, স্মৃতি রক্ষায় মনোযোগী নন, অমনোযোগী; ভগবান বুদ্ধ তাদের জন্য সতিপট্টান সূত্র দেশনা করেননি। যারা স্মৃতিমান, স্মৃতি রক্ষায় মনোযোগী, তৎপর; ভগবান বুদ্ধ তাদের জন্যই সতিপট্টান সূত্রটি দেশনা

করেছেন। এ সূত্রে প্রথমে আনাপান স্মৃতি ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আনাপান স্মৃতি অর্থ আশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত ভাবনা। আনাপান স্মৃতি ভাবনা দ্বারা অনুধাবন করতে হবে—আমরা (বা আমি) আশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত জীব মাত্র। নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারলে জীবন আর নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রশ্বাস গ্রহণ করতে না পারলে মরণ। কাজেই এখানে জীব, দেহ, আমি, তুমি কিছুই নেই। শুধুমাত্র বাতাসের খেলা চলছে। এটা জানাই আনাপান স্মৃতি ভাবনার লক্ষ্য। এ ভাবনার মাধ্যমে জ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্যাদি পরিচালিত করা; কোন প্রকার অজ্ঞানতার সহিত নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস গ্রহণ না করা। তোমরা এই নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রশ্বাস গ্রহণ ক্রিয়াটি জ্ঞানের সঙ্গে এভাবেই অনুধাবন কর—“আমি এই ক্রিয়াটির মাধ্যমে জীবিত মাত্র; এটি বন্ধ হয়ে গেলে মৃত”। তাহলে এই জীবন (প্রাণ) কাকে আশ্রয় করে রয়েছে? বায়ুকে। বায়ু বা বাতাসের সাহায্যে এই দেহ বা জীবন সচল রয়েছে, বাতাস সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে গেলে দেহ অচল হয়ে পড়ে থাকবে। বাতাসের সাহায্যে দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলিত হচ্ছে। যেমন-চোখের দর্শন, কানের শ্রবণ, পান-ভোজনাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ, অন্যের সাথে বাক্যালাপসহ সকল ক্রিয়াই বাতাসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই বাতাস বন্ধ হয়ে গেলে দেহটি কাষ্ঠখণ্ডবৎ পড়ে থাকবে। তাই এইটি দেহ নহে, জীব নহে, স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, সন্ত-আত্মাও নহে; মাটি, জল, বায়ু, তাপ এই চারি ধাতুর সমষ্টি জড় পদার্থ মাত্র।

তিনি আরো বলেন—তোমরা হীনমনুষ্য, হীনতৃষ্ণা, হীনসংস্কার ত্যাগ কর; যাতে তোমাদের সুখ লাভ হয়। হীনমনুষ্য থাকলে দুঃখ পাবে, হীনতৃষ্ণা থাকলে দুঃখ পাবে, হীনসংস্কার থাকলে দুঃখ পাবে। আবার নামরূপের প্রতি আসক্ত থাকলেও তোমাদেরকে দুঃখ পেতে হবে। যারা জ্ঞানী তারা হীনমনুষ্যকে দূর করতঃ হীনমনুষ্য নেই, হীনতৃষ্ণা নেই, হীনসংস্কার নেই হয়ে অবস্থান করেন; এবং নামরূপের প্রতি অনাসক্ত হয়ে থাকেন। তোমরাও যদি সেরূপে অবস্থান করতে পার, তবে তোমাদের সুখ লাভ হবেই। শেল ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধকে বলেছিলেন—সত্য সত্যই গৌতম আপনি হীনমনুষ্য দূর করেছেন, হীনতৃষ্ণা দূর করেছেন, হীনসংস্কার দূর করেছেন। আপনার মধ্যে হীনমনুষ্য নেই, হীনতৃষ্ণা নেই, হীনসংস্কার নেই। সত্যিই আপনি জগতে মুক্তপুরুষ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। পূজ্য বনভঙ্কে, এককোণে বসে থাকা দায়ক-দায়িকাদেরকে দেখায়ে দিয়ে বলেন, ঐ দায়ক-দায়িকারা সবাই মিথ্যা; তাদেরকে মিথ্যারূপে দর্শন করবে। মানুষ, পুরুষ, মহিলা, পশু-পক্ষী সবই মিথ্যা। আমি, তুমি, সে বা তারা বলে কিছুই নেই; সবই মিথ্যা বলে জানবে। এমন কি সমগ্র পৃথিবীকে মিথ্যা বলে

জানবে। পূজ্য বনভন্তে প্রশ্ন করে বলেন—পৃথিবী কি? ভিক্ষুসঙ্ঘ-ভন্তে, পৃথিবী মিথ্যা। হ্যাঁ, সত্য ও আসল বলে পৃথিবীতে কিছুই নেই; সবই নাম-রূপ মাত্র। পৃথিবীর সবকিছুতে নামরূপ দেখবে। তাহলে মানুষ, পুরুষ, মহিলা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বলে কিছুই দেখবে না। মানুষ, পুরুষ, মহিলা, পৃথিবীর কোন বস্তুতে তখন আর আসক্তি থাকবে না। সেই নামরূপ জ্ঞানের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। এবং নামরূপের প্রতি অনাসক্তভাবে থাকতে পারবে। যারা সমস্ত নামরূপের প্রতি অনাসক্ত তাদেরকে কোন দুঃখে স্পর্শ করতে পারে না। তোমরা সেইভাবে অবস্থান করতে সচেষ্ট থাকবে। তাহলে আমার সাথে বলো “যারা সমস্ত নামরূপের প্রতি অনাসক্ত তাদেরকে কোন দুঃখে স্পর্শ করতে পারে না। আমরাও নামরূপের প্রতি অনাসক্ত হবো।”

তোমরা সর্বদা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করো। যদি চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন না কর তাহলে দুঃখ পাবে। দুঃখকে সমূলে ধ্বংস করতঃ সুখ লাভ করতে হলে এ ভাবনার বিকল্প নেই। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা বলে তোমরা নিজের দেহকে আমার নয় বলে তা ত্যাগ কর। নিজের বললে অজ্ঞান উৎপত্তি হয়। আর পরের (আপন নয়) বললে জ্ঞান। দেহকে নিজের বললে নির্বাণ সুখ লাভ হয় না। নির্বাণে আমি, আমার বলে কিছুই নেই। মনে রাখতে হবে যে, কায়াকে অপ্রিয় করতঃ শরীরের মমতা ত্যাগ করে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে হয়। পূজ্য বনভন্তে নিজের শরীরকে স্পর্শ করে বলেন, যেখানে এই দেহটি নিজের নয় সেখানে পরের অন্য কিছুর কথাই বা কি। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সবই পর বলে জানবে। এমন কি গৃহী প্রদত্ত চীবর, পিণ্ডপাত, বিহার, ঔষধপথ্য এই চারি প্রত্যয়সমূহও আমার নহে, পরের বলে জানবে। একরূপ জ্ঞানে অবস্থান করতে পারলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হতে পারে না, পুনঃজন্ম নিরোধ হয়। আর একরূপ জ্ঞানের সহিত অবস্থান না করলে তৃষ্ণা উৎপত্তি হয়, সেই তৃষ্ণার দরুন পুনঃপুন জন্মধারণ করতঃ বিবিধ দুঃখের ভাগী হতে হয়। তাই আবারো বলছি, তোমরা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা কর। এতেই তোমাদের প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলবে-অন্যথায় নয়।

তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে অবস্থান করতে হবে। আবার মারও তোমাদেরকে তার সত্য বিষয়গুলো দেখাবে। বনভন্তে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করা জনৈক ভিক্ষুর নাম উল্লেখ করতঃ বলেন, মার সেই ভিক্ষুকে তার সত্য (মহিলা) দেখিয়েছিল। আর সেই বোকা মারের কথা বিশ্বাস করাতে মারের সত্য গ্রহণ করেছে। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছেন ‘মার অধিকৃত সত্য তাও আমি জানি’।

তোমাদেরকেও মারের সত্যকে জানতে হবে। অর্থাৎ মার কর্তৃক প্রদর্শিত সত্যটি যে মিথ্যা তা' জানতে হবে। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধ যেমন আমাদের সত্য দেখায়ে দিয়েছেন, তেমনি মারও সত্য প্রদর্শন করিয়ে থাকে। তবে মারের সত্যগুলো সত্য নয় মিথ্যা। তোমরা যদি মারের সত্যকে বিশ্বাস করো তাহলে মার কামভোগী গৃহীদের সুখগুলো তোমাদের দেখাবে। কিভাবে? স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, জায়গা-জমিন, ধন-সম্পদ নিয়ে সর্বদা প্রমত্তভাবে অবস্থান করতঃ কতো আনন্দোন্মত্তাস, সুখেই না তারা রয়েছে। অথচ তোমরা প্রব্রজ্যা নিয়ে সর্বস্বান্ত অবস্থায় নীরস জীবন-যাপন করতঃ। এ সব হল মারের প্রদর্শিত সত্য। কিন্তু বুদ্ধের সত্য হল কামভোগী গৃহীরা দুর্বিষহ দুঃখে দম্ভ বিদম্ভ হচ্ছে। যারা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, ক্ষুধায়-পিপাসায় পিপাসিত; জন্ম-জরা-ব্যাদি-মরণ দুঃখের পীড়নে সর্বদা জর্জরিত, তাদের আবার সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়? তোমাদেরকে এ সত্যগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর তখন মারের প্রদর্শিত সত্যকে মিথ্যা, ভ্রান্ত বলে জেনে বুদ্ধের প্রদর্শিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে কোন অসুবিধা হবে না।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-মারের রাজ্য ও নির্বাণ রাজ্য ভেদে আমি দু'টি রাজ্য পৃথক করে থাকি। শ্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ মার্গস্থ ফলস্থ ও নির্বাণ এ' নব লোকোত্তর স্তর নির্বাণ রাজ্য। এতদ্ব্যতীত অপর সবই মাররাজ্য। মাররাজ্য অধীন, দুঃখ, মুক্ত নহে, নিরাপদ নহে, ভয়ঙ্কর। নির্বাণরাজ্য স্বাধীন, সুখ, মুক্ত, নিরাপদ ও নির্ভয়। তোমাদের মনচিন্ত যদি মাররাজ্যে অবস্থান করে তাহলে তোমরা অধীন হয়ে থাকবে, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না, নিরাপদে থাকতে পারবে না, নির্ভয়ে থাকতে পারবে না। আমার সাথে বলো—“আমরা যদি মাররাজ্যে অবস্থান করি তাহলে আমাদের চিন্ত অধীন হয়ে থাকে, দুঃখ পাই, মুক্ত হতে পারি না, নিরাপত্তাশূন্য ও ভয়ঙ্কর পরিবেশে থাকে। অন্যদিকে নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করলে চিন্ত স্বাধীন হয়ে যায়, সুখ পায়, মুক্ত হতে পারে, নিরাপত্তা ও নির্ভয় পরিবেশে থাকে”। এখন তোমরা নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করবে নাকি মাররাজ্যে অবস্থান করবে? ভিক্ষুসম্ম একসাথে উত্তর দিলেন—‘ভন্তে, আমরা নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করব’। নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করলে তোমরা স্বাধীনভাবে, সুখের সহিত নিরাপদে ও নির্ভয়ে থাকতে পারবে। এবং সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে। যদি তাই পার, তাহলে তখন একটি মুক্তির গাথা গেয়ে উঠবে। আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো। তবে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে না পারলে গেয়ে কোন লাভ নেই। সেই মুক্তির গাথাটি কি রকম জান?

কোথায় ভবে কতভাবে জনম নিয়েছি

জন্ম-মৃত্যু তাপ কত সয়েছি,
নিদারুণ দুঃখাঘাতে জর্জরিত এ প্রাণ,
মুক্তির পথ করেছি সন্ধান;
মুক্ত তবে আজি।

না'রবে রচিতে আর এই দুঃখ কারাগার।

তোমরা চারি আর্যসত্যকে সম্যকভাবে জানতে, বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট থাক। মনে রাখবে, চারি আর্যসত্য জ্ঞান ব্যতীত দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। সেই চারি আর্যসত্য জ্ঞান কি? দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ লাভের একমাত্র পথ। বুদ্ধের নির্দেশিত এ মার্গ স্বয়ং দৃষ্টব্য। অর্থাৎ নিজকেই দর্শন করতে হয়, অপর জন দেখায়ে দিলে; ইহা দেখা যায় না। নিজে কিভাবে দেখবে? রাগ, দ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, অকুশল বা পাপ হতে নিজকে বিরত রাখতে সক্ষম হলে। মনে রাখবে রাগ, দ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, অকুশল বিরত হলে এ মার্গ দৃষ্টিগোচর হয়। আমি এই চারি আর্যসত্যকে একদিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্য দিকে দূরবীন যন্ত্ররূপে জানি। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন, আমার এ উপমা ঠিক আছে কি? ভিক্ষুসঙ্ঘ—হ্যাঁ ভন্তে, ঠিক আছে। কারণ এ সত্যের সাহায্যে একদিকে বর্তমানের দুঃখসমূহ যেমন-শারীরিক, মানসিক সংস্পর্শজ দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি, শোক, মনস্তাপ, হা ছতাশ, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখসমূহ দেখা যায়। অন্যদিকে ভবিষ্যতের দুঃখসমূহ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও পুনঃ জন্ম গ্রহণজনিত অনন্ত দুঃখাদি দর্শন করা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র যেমন ছোট জিনিসকে বড় করে দেখায় ঠিক তদ্রূপ চারি আর্যসত্যও স্বল্প জ্ঞানীদের অদর্শনীয়, বর্তমান দুঃখগুলোকে পরিষ্কার করে দেখায়ে দেয়। তাই চারি আর্যসত্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র। দূরবীন যেমন বহু দূরের জিনিস একেবারে নিকটে টেনে আনায়ে দেখায় ঠিক তদ্রূপ চারি আর্যসত্যও ভবিষ্যতের অদর্শনীয় দুঃখ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণাদি দুঃখকে পরিষ্কারভাবে দেখায়ে দেয়। তাই চারি আর্যসত্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও দূরবীন যন্ত্র। তোমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও দূরবীন যন্ত্র ক্রয় করা সদৃশ চারি সত্য জ্ঞান অর্জন করতঃ যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর। কি, পারবে তো? হ্যাঁ ভন্তে, আমরা চেষ্টা করছি।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা জ্ঞান বলে উচ্চতা লাভ করতঃ সুউচ্চ হয়ে অবস্থান কর। তাহলে অজ্ঞানী ব্যক্তির তোমাদেরকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করাতে সক্ষম হবে না। কখনো জ্ঞানের দুর্বলতা হয়ে অবস্থান করবে না। জ্ঞানের দুর্বলতা হলে খারাপ লোকের সাথে মেলামেশা করতে বাধ্য হবে।

বনভঙ্কে প্রশ্ন করেন—কেন খারাপ লোকের সাথে মিশতে হয়? ভিক্ষুসঙ্ঘ—জ্ঞানের দুর্বলতা হলে। তোমরা জ্ঞানবলে বলীয়ান হতে বুদ্ধের সমীপে একরূপ প্রার্থনা কর—

দাও প্রভু জ্ঞান বল শক্তি অমরতা,
জ্ঞানের বিমল বুদ্ধি দৃষ্টি অসারতা।
চিরঞ্জয়ী দেখে যাব জ্ঞানের প্রভাব,
মানস স্বভাব ফুটে মনের আকাশ।
মায়ার মোহিনী মস্ত্রে হয়ে বিমোহিত,
সংসার সাগরে ভাসি জ্ঞান তিরোহিত।
অভিনব মুক্তির পথ সর্ব তৃষ্ণা জয়,
অহিংসা পরম ধর্ম বিশ্ব প্রেমময়।

আমার সাথে বলো ‘আমরা উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করব। কখনো হীন জ্ঞান ও নিম্ন স্তরের সাধনা করব না’। কি, পারবে তো! উচ্চতর জ্ঞান এবং উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করতে? ভঙ্কে আশীর্বাদ করুন, যেন পারি। মনে রাখবে, তোমাদের কাজ হল উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করা। যদি পার তাহলে তোমাদের সুখ হবেই। আর যদি না পার দুঃখের সীমা থাকবে না। তাই আবারো বলছি, তোমরা উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সাধনা অনুশীলন কর। যাতে তোমাদের সুখ হয়—এ আশীর্বাদ করছি।

সাধু, সাধু, সাধু।

প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তকে পরীক্ষা করে দেখ

এক সময় পূজ্য বনভঙ্কে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—চাকমা কথায়, “মিলে লৈ থেলে, মিলে ললে নির্বাণ যেই ন’ পারিবা। হদ্ হদ্ কাম্ গরিলে নির্বাণ যেই ন’ পারিবা। নির্বাণ যেইয়ে মান্চে যে হোন্ মিলে লৈ পান্তা নয়, যে হোন মিলে লৈ থে’ পান্তা নয়। হা কোন কাম্ নেই গরি থা’ পরিবো”। অর্থাৎ নির্বাণ যেতে হলে তোমাদেরকে জীলোকের সাথে কামভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। বিবিধ কর্ম হতে নিজকে মুক্ত রাখতে হবে। জীলোকের সহিত কামভোগ করলে এবং বিবিধ কর্মে নিয়োজিত থাকলে নির্বাণ লাভ করা যায় না। নির্বাণ লাভ করতে হলে জীলোকের সহিত কামভোগ করার ইচ্ছা এবং বিবিধ কর্মে নিয়োজিত থাকার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তকে পরীক্ষা করে দেখ, কাম থেকে মুক্ত হতে পেরেছে নাকি, পারনি? যদি ধরা পড়ে যে, এখনো পরিপূর্ণ মুক্ত হতে পারনি, তাহলে জানবে চিন্তটি দুঃখের মধ্যে রয়েছে। সেই রকম দুঃখযুক্ত মলিন

চিন্তকে নির্বাণের রঙে রাঙানো সম্ভব নয়। আবার চিন্তকে বিবিধ সংস্কার (কাজ হতে) থেকে মুক্ত থাকতে হবে। চিন্তা বিবিধ সংস্কারে আবদ্ধ থাকলেও দুঃখ পায়, নির্বাণ যেতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, চিন্তের মধ্যে কামভোগের ইচ্ছা এবং বিবিধ সংস্কার থাকলে নির্বাণ যেতে পারে না। নির্বাণ যেতে হলে চিন্তা হতে কামভোগের ইচ্ছা আর বিবিধ সংস্কার (কাজ করার চেতনা) পরিত্যাগ করতে হবে। পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—নির্বাণ যেতে হলে কি পরিত্যাগ করতে হবে? ভিক্ষুসঙ্ঘ একবাক্যে বলে উঠলেন, কামভোগের ইচ্ছা আর বিবিধ কাজ করার চেতনা পরিত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, নির্বাণ লাভেচ্ছুকগণকে কামভোগ এবং বিবিধ কর্ম হতে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ কামভোগ দুঃখ, বিবিধ কর্ম সম্পাদন দুঃখ। কামভোগ মুক্ত নয় (অর্থাৎ কামভোগের দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না), বিবিধ কর্ম সম্পাদন মুক্ত নয়। অন্যদিকে কামভোগ বা কামভোগের ইচ্ছা না থাকলে সুখ, বিবিধ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা না থাকলে সুখ। কামভোগের ইচ্ছা না থাকলে মুক্ত, বিবিধ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা না থাকলে মুক্ত। তোমরা আমার সাথে বলো “আমরা কামভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করব না, বিবিধ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করব না। কামভোগ মুক্ত ও বিবিধ কর্ম মুক্ত চিন্তে অবস্থান করব।” তোমাদের চিন্তে কামভোগের ইচ্ছা নেই, বিবিধ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা নেই—এটাই নির্বাণ সুখ লাভের অবস্থা।

তোমরা রমণীর প্রতি সুখ দৃষ্টিতে তাকাবে না। তাদেরকে বিয়ে করার এবং স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করার চিন্তা উৎপন্ন করবে না। তাহলে ধ্যান অনুশীলন করতে সক্ষম হবে; আর জ্ঞান উদয় হবে। সেই ধ্যানানুশীলন ও জ্ঞানের মাধ্যমে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হবে। তাই তোমাদের আসল কর্তব্য হল, ধ্যানানুশীলন ও জ্ঞান উদয় করা। তোমরা সর্বদা মনে মনে ধ্যান অনুশীলন ও জ্ঞান উদয় করবে। মনে রাখবে, ধ্যান অনুশীলন ও জ্ঞান উদয়ই সুখ। কিভাবে ধ্যান অনুশীলন করবে? লোভ চিন্তে কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। চিন্তের মধ্যে বিয়ে করার বা সংসারী হয়ে যাওয়ার কোন চিন্তা, কল্পনা, পরিকল্পনার স্থান দিবে না। এসব অকুশল চেতনা চিন্তে স্থান না দিলে ধ্যান অনুশীলন করা যায় বা ধ্যান সুখ লাভ হয়। সর্বদা মনে মনে জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে নির্বাণ সুখ হয়। তোমরা সর্বদা মনে মনে ধ্যান অনুশীলন করবে, জ্ঞান উদয় করবে, তবেই তোমাদের সুখ লাভ হবে। অন্যদিকে তোমাদের চিন্তে যদি অজ্ঞান উদয় হয় তাহলে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন আর দুঃখের সীমা থাকবে না। ধ্যান ও জ্ঞানবিহীন প্রব্রজ্যা জীবন অতীব দুঃখের হয়ে থাকে। আমি বহু ভিক্ষুকে বলতে শুনেছি “ভিক্ষু জীবন অতীব কষ্টকর।” পূজ্য বনভঙ্কে জনৈক ভিক্ষুর নাম উল্লেখ করে বলেন সে আমাকে বলেছিল—‘কষ্ট পাচ্ছি।’ তারা কেন কষ্ট পাচ্ছে জ্ঞান?

তাদের ধ্যান নেই, জ্ঞান নেই বলে। মনে রাখবে যার ধ্যান নেই, জ্ঞান নেই সে দুঃখ পাবেই। প্রব্রজ্যা হওত শুধুমাত্র চীবর পরিধান, মস্তক মুণ্ডন করলে সুখ লাভ হয় না। প্রব্রজিতদেরকে ধ্যান ও জ্ঞান লাভে লাভী হতে হবে। ধ্যানী ও জ্ঞানী হতে পারলে তবেই সুখ লাভ হয়-অন্যথায় নয়। আমার সাথে বলো “যেই ভিক্ষুর ধ্যান নেই, জ্ঞান নেই, সে ভিক্ষু দুঃখ পাবে।” বর্তমান ভিক্ষুদের নিকট ধ্যান নেই, জ্ঞান নেই বলে তারা দুঃখ পাচ্ছে। কিভাবে ধ্যান সুখ লাভ হয় জ্ঞান? রমণীদের প্রতি অনুরাগবশতঃ সুন্দর, শুচি, সুখ বলে চেয়ে না থাকলে এবং বিয়ে করার চিন্তা না করলে। অর্থাৎ অমুক রমণীটি দেখতে সুন্দরী, সুশ্রী, ভালো; তাকে বিয়ে করলে আমার সুখ লাভ হবে এরূপ মনে করতঃ বিয়ে করার চিন্তা উৎপন্ন করলে এবং সেই চিন্তে অবস্থান করলে ধ্যান সুখ লাভ হয় না। অধিকন্তু সেইরূপ চিন্তা উৎপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। নির্বাণ সুখ লাভ করতে হলে মনে মনে জ্ঞান উদয় করতে হবে বা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে হবে। মনে মনে অজ্ঞান উদয় হলে নির্বাণ সুখ লাভ হয় না। মনে মনে অজ্ঞান উদয় হলে পাপ চেতনার জন্ম হয়। সেই পাপ চেতনার দ্বারা মনের মধ্যে অশান্তি বা দুঃখভাব বিরাজ করে। কাজেই সেরূপ দুঃখপূর্ণ চিন্তে কি নির্বাণ সুখের প্রত্যাশা করা যায়? যায় না।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন—তোমরা যতো রমণীদিগকে লোভ চিন্তে না তাকাবে, তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় না করবে, ততোই তোমাদের সুখ লাভ হবে, নির্বাণ লাভের পথ সুগম হবে। অন্যদিকে তোমরা যতোই মনে মনে রমণীদিগকে লোভ চিন্তে দর্শন করবে, তাদেরকে বিয়ে করতঃ সংসারী সুখ ভোগ করার চিন্তের সহিত অবস্থান করবে ততোই তোমাদেরকে দুঃখ পেতে হবে। আর তখন কিছুতেই নির্বাণ লাভ করা হবে না। মনে রাখবে, রমণীদের প্রতি লোভ চিন্তে না তাকালে এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয় না করলে প্রব্রজিত জীবন সুখের হয়। আর রমণীদের প্রতি লোভ চিন্তে তাকালে এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয় করলে প্রব্রজিত জীবন অতিশয় দুঃখপূর্ণ হয়। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন, তোমরা নির্বাণ লাভ করতে চাও কি? হ্যাঁ ভন্তে। তাহলে কোন রমণীর প্রতি লোভ চিন্তে তাকাবে না, কোন রমণীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না বা তারা কিভাবে কামসুখ ভোগ করে সে নিয়ে কোন চিন্তা মনে স্থান দেবে না। যদি রমণীর প্রতি লোভ চিন্তে তাকানো বন্ধ করতে না পার, বিয়ে করার চিন্তা পরিত্যাগ করতে না পার, তাহলে নির্বাণ লাভ করতে চাইলেও শত ইচ্ছা থাকলে নির্বাণ লাভ হবে না। বরং কষ্টের সহিত প্রব্রজিত জীবন অতিবাহিত করতে হবে; এবং পুণ্যময় জীবনে অপুণ্য বা পাপ অর্জিত হবে। কাজেই তোমরা সবাই সাবধান হয়ে যাও। কোন রমণীর প্রতি লোভ চিন্তে চেয়ে থাকবে না, কোন

রমণীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি, এখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন কর। কিভাবে তোমাদের নির্বাণ লাভ হবে, আর কোন পথে চালিত হলে নির্বাণ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে-সবই বলে দিচ্ছি। এখন সত্যই যদি ইচ্ছুক হও, তাহলে তোমরা নির্বাণ সুখ লাভের পথে অগ্রসর হও। আমি বলে দেয়ার পরও তোমরা যদি তা পালন না কর তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না। তদুপরি তোমাদের মনে আশ্রিত কোন রমণীর প্রতি চেয়ে থাকার অনুরাগ এবং বিয়ে করার চিন্তাকে তো আমি পরিত্যাগ করিয়ে দিতে পারবো না। কারণ নিজের চিন্তা নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখতে হয়, একজনের চিন্তা অন্য জনের পক্ষে পরিশুদ্ধ করে দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি যতোই বলি না কেন যে, তোমরা রমণীর প্রতি লোভ চিন্তে তাকাবে না এবং তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না, আর তোমরা যদি তা পালন না করে রমণীদের প্রতি লোভ চিন্তে তাকিয়ে থাক ও বিয়ে করার চিন্তা উদয় কর তাহলে তোমাদের নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হবে কি? কিছুতেই হবে না। সুতরাং নির্বাণ যেতে পারা না পারাটা তোমাদের চিন্তের উপরই নির্ভর করতেছে। তোমরা নিজেরাই নিজের চিন্তাকে পরীক্ষা করে দেখ। কিভাবে করবে? আমার সাথে সাথে বলো “আমাদের মনের মধ্যে রমণীদের প্রতি অনুরাগ আছে কি নেই, এবং তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় হয় কি, হয় না? এভাবেই পরীক্ষা করব”। সে পরীক্ষা করার পর যদি জান যে, তোমাদের মনের মধ্যে রমণীদের প্রতি অনুরাগ নেই এবং তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তাও উদয় হয় না, তাহলে জানবে তোমাদের পক্ষে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। আর যদি পরীক্ষা করার পর জান যে, তোমাদের মনের মধ্যে রমণীদের প্রতি অনুরাগ আছে এবং রমণী বিয়ে করার চিন্তা উদয় হয় তাহলে জানবে তোমাদের পক্ষে নির্বাণ লাভ করা এখনো সম্ভব নয়। তজ্জন্য আবারো বলছি তোমরা কোন রমণীকে লোভ চিন্তে তাকাবে না, কোন রমণীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না। লোভ চিন্তে রমণীদের প্রতি না তাকালে সুখ আর তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় না করলে পুণ্য। অন্যদিকে রমণীদেরকে লোভ চিন্তে তাকালে দুঃখ আর বিয়ে করার চিন্তা উদয় করলে পাপ হয়। তোমাদের মনে হয়ত এরূপ প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান বুদ্ধ কেন আমাদেরকে রমণীদের দিকে লোভ চিন্তে তাকাতে এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয় করতে বারণ করেছেন? মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে নয় কি? তার উত্তরে আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা রমণীদের দিকে লোভ চিন্তে তাকালে দুঃখ পাবে এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয় করলে পাপ হবেই বলে ভগবান বুদ্ধ তোমাদেরকে সেগুলো করতে বারণ করেছেন। এবার বুঝতে পেরেছ কি? হ্যাঁ ভগ্নে। তাহলে আমার সাথে সাথে বলো “রমণীদের দিকে লোভ চিন্তে তাকালে দুঃখ এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয়

করলে পাপ হয়। আর লোভ চিন্তে না তাকালে সুখ এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয় না কনালে পুণ্য হয়। তাই আমরা রমণীদের প্রতি লোভ চিন্তে তাকাবে না, বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবো না”। এবার বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন-তোমরা রমণীদের দিকে তাকাবে কি? না ভঙ্কে। তাদেরকে বিয়ে করবার চিন্তা করবে কি? না ভঙ্কে। তাহলে তোমরা নির্বাণ যেতে পারবে। কিন্তু এসবের উটোপাল্টা করলে নির্বাণ যেতে পারবে না। ভঙ্কে; আশীর্বাদ করুন, যাতে উটোপাল্টা কিছু না করি। মনে রাখবে যতোই তোমরা রমণীদের দিকে লোভ চিন্তে না তাকাবে, বিয়ে করার চিন্তা উদয় না করবে, ততোই তোমাদের সুখ লাভ হবে। নির্বাণ লাভের পথ সুগম, সহজতর হবে। আবার, তোমাদের চিন্তে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা কোন রমণীর দিকে লোভ চিন্তে তাকাবে না, তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না। কিন্তু চিন্তে অজ্ঞানতা ভাব থাকলে রমণীর দিকে লোভ চিন্তে তাকাবে এবং বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে। তজ্জন্য দেখতে হবে যে, তোমাদের চিন্তে জ্ঞান আছে কি নেই? তোমাদের চিন্তে জ্ঞান থাকলে বা তোমরা জ্ঞানী হলে কোন রমণীর দিকে লোভ চিন্তে তাকাবে না, বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না। তোমরা জ্ঞানী হয়ে যাও। জ্ঞানী হলে নির্বাণ যেতে পারবে, অজ্ঞান হলে নির্বাণ যেতে পাবে না।

জ্ঞানৈক ভিক্ষু আমাকে বলেছিল, আমি ইহজন্মে বিয়ে করব না। কারণ বর্তমানে সবাই গরিব। গরিব বংশের কন্যা বিয়ে করে সংসারী হলে বিবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। কাজেই বর্তমান জন্মে আমি বিয়ে করব না। এখন প্রব্রজিত অবস্থায় শীল পালন করে মৃত্যুর পর রাজা হয়ে রাজকন্যা অথবা বিত্ত সম্পত্তির মালিক মহাধনী হয়ে ধনীকন্যা বিয়ে করে সাংসারিক সুখ ভোগ করব। বনভঙ্কে বলেন, তাহলে সে তো রাজা বা ধনীর ছেলে হলে বর্তমানে ভিক্ষু হতো না। আর নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যেও সে ভিক্ষু হয়নি; ভিক্ষু হয়েছে পরজন্মে রাজা বা ধনী হয়ে জন্ম গ্রহণ করতঃ রাজকন্যা বা ধনীকন্যা বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। এ’ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। বনভঙ্কে এবার সামনে উপবিষ্ট এক ভিক্ষুকে প্রশ্ন করেন-তুমিও কি সেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষু হয়েছে? ভিক্ষু বলল-না ভঙ্কে। বনভঙ্কে বললেন-আচ্ছা, তোমরা সবাই যদি দায়ক-দায়িকাদেরকে একরূপ বল যে, আমরা ইহজন্মে বিয়ে করব না। পরজন্মে রাজকুলে, ধনীকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ রাজকন্যা ধনীকন্যা বিয়ে করব; এবং সেই জন্ম আমরা প্রব্রজিত হয়েছি। তাহলে দায়ক-দায়িকাদের মনে কি উদয় হবে বলো তো? ভঙ্কে, সেটা তো মস্ত-বড়ো লজ্জার কথা হবে। দায়ক-দায়িকারা মনে করবে এরা সবাই গরিব লোকের সন্তান, গৃহীকুলে অন্ন সংস্থানের সুযোগ নেই বলে প্রব্রজিত হয়েছে। দেখ না, কতোই হীন মতলব নিয়ে তারা প্রব্রজিত

হয়েছে। ভস্তে, আমরা সে উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইনি। এবার বনভঙ্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কখনো সেই ভিক্ষুর মত হীন মতলব নিয়ে অবস্থান করবে না। তাহলে তোমাদেরকে দুঃখ পেতে হবে, নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। নির্বাণ যেতে হলে ইহকালের আশাও ত্যাগ করতে হয়, পরকালের আশাও ত্যাগ করতে হয়। তোমরা ইহকালের আশা এবং পরকালের আশা ত্যাগ করে অবস্থান কর। এতে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হবে।

শ্রদ্ধেয় ভস্তে বলেন—ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করতে পারলে তবেই সুখ লাভ হয়। আবার সকলের পক্ষে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করাও সম্ভব নয়। যারা ত্রিহেতুক পুন্দাল কেবল তারাই ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করতে সমর্থ হয়। পুন্দালের মধ্যে অহেতুক, দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুকভাবে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যাদের অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই ত্রিহেতু রয়েছে তারাই ত্রিহেতুক। যাদের অলোভ, অদ্বেষ এই দ্বিহেতু রয়েছে তারা দ্বিহেতুক। আর যাদের অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এ তিনটি হেতুর মধ্যে একটিও নেই তারা অহেতুক। ত্রিহেতুক পুন্দালের দান, শীল, ভাবনা ও ধর্মদেশনাদি শ্রবণের ফলে ইহজন্মে মার্গফল লাভ করতে পারে। দ্বিহেতুক পুন্দালের ইহজন্মে দান, শীল, ভাবনাদি করার পুণ্যফলে পরজন্মে মার্গফলাদি লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু অহেতুক পুন্দালের পাঁচটি সম্যক সমুদ্বোধন নিকট ধর্মদেশনা শ্রবণ সহ পুণ্যকর্মাদি করলে তবেই মার্গফল লাভে সক্ষম হয়। ত্রিহেতুক পুন্দালের নির্বাণ, দ্বিহেতুক ও অহেতুক পুন্দালের দান, শীল, ভাবনাদি করতঃ স্বর্গে যেতে পারে।

নির্বাণ যেতে হলে কেবলমাত্র বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করা চাই। নির্বাণ লাভেচ্ছুগণকে বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ ছাড়া অন্য কারো শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করা চলবে না। কারণ বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ ভিন্ন অন্য কারো শিক্ষা, উপদেশে নির্বাণ লাভ করা যায় না। অন্য কারো শিক্ষা, উপদেশে নির্বাণ লাভের কথা উল্লেখ নেই, নির্বাণ লাভের উপায় বর্ণনা নেই। তাই তোমরা নির্বাণ লাভেচ্ছুগণ বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করবে না। ভগবান বুদ্ধ ব্যতীকে অন্য কাউকে গুরু বলে মেনে নেবে না। মনে রাখবে, একমাত্র ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ ভিন্ন অন্য কোন গুরুর শিক্ষা, উপদেশে নির্বাণ যেতে পারে না। নির্বাণ যেতে হলে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশই একমাত্র অবলম্বন। কারোর শিক্ষা গ্রহণ না করে, কারোর উপদেশ না শুনে, শুধুমাত্র বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ এবং বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করলে নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। তাই আমার সাথে সাথে বলো “আমরা কারো শিক্ষা গ্রহণ করব না, কারো উপদেশ শুনব না, কেবল বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করব, বুদ্ধের উপদেশ শুনব। এতে আমাদের নির্বাণ লাভ হবে”। বনভঙ্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন

করেন-নির্বাণ যেতে হলে কি প্রয়োজন হচ্ছে? কেবলমাত্র বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ। তাহলে পারবে তো; বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশগুলো গ্রহণ করে অবস্থান করতে? হ্যাঁ ভগ্নে, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তোমরা সর্বদা নির্বাণমুখী চিন্তা হয়ে অবস্থান কর। নির্বাণমুখী চিন্তাকে অন্য দিকে ফেরাবে না। অন্যদিকে ফেরালে অর্থাৎ কখনো নির্বাণমুখী, কখনো স্বর্গমুখী, কখনো ব্রহ্মমুখী, কখনো বা মনুষ্য ভূমিমুখী করলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হবে না। নির্বাণ লাভ করতে হলে এক বাদে দুই নেই; একমন এক আলম্বন হয়ে থাকতে হয়। সর্বদা চিন্তের মধ্যে একাগ্রভাব বজায় রাখতে হয়। সেই একাগ্রতা কি? একটি বিষয়ে নিশ্চল অবস্থার নাম একাগ্রতা। একটা করতে করতে আরো অন্য একটা করা একাগ্রতার কাজ নয়। আর একাগ্রতা না থাকলে নির্বাণ লাভ করার আশা বৃথা। কাজেই তোমরা সর্বদা নির্বাণমুখী চিন্তা হয়ে অবস্থান কর। মার তোমাদেরকে যতই প্রলোভন দেখাক না কেন, তাতে প্রলুব্ধ হবে না; যতই বাধা-বিপত্তি অন্তরায় সৃষ্টি করে দিক না কেন, তাতে পিছপা হবে না। এতে পরম সুখ নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা প্রত্যেকে ধ্যান অনুশীলন কর এবং জ্ঞান উদয় করতে তৎপর থাক; যাতে তোমাদের নির্বাণ সুখ লাভ হয়। আর কোন রমণীর দিকে লোভ চিন্তে তাকাবে না, তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না। তাহলে আমি বলছি তোমাদের অবশ্যই নির্বাণ সুখ লাভ হবে। কখনো চিন্তের মধ্যে অজ্ঞানতা ভাব উদয় করবে না। চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান থাকলে নির্বাণ লাভ করা যায় না। অজ্ঞানী নির্বাণ লাভ করা দূরে থাক স্বর্গেও যেতে পারে না। অজ্ঞানীরা দেহান্তেই নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই তোমরা জ্ঞানীই হবে, পণ্ডিত হবে; কখনো অজ্ঞানী, মূর্খ হবে না। অজ্ঞানী, মূর্খদের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের পরম ও চরম সুখ নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। যারা জ্ঞানী, পণ্ডিত তারা নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। তোমরাও সর্বদা ধ্যানানুশীলন ও জ্ঞান উদয় করতঃ জ্ঞানী, পণ্ডিত হয়ে যাও তাহলে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে সমর্থ হবে এবং তোমাদের যাবতীয় দুঃখের চির অবসান ঘটবে। তোমরা সেই দিকেই (ধ্যানানুশীলন, জ্ঞান লাভ) অগ্রসর হতে থাক।

সাধু, সাধু, সাধু।

প্রব্রজিতদের শিক্ষা হল রমণীদেরকে বিশ্বাস না করা

এক সময় পূজ্য বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ডিক্সসজ্জাকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—একদা কিরণ মাষ্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শাস্ত্রে যে উল্লেখ আছে যমদূতেরা পাপীদেরকে ‘অমুকভাবে’ ‘সমুকভাবে’ দুঃখ-কষ্ট প্রদান করে থাকে তাহলে যমদূতদের কি পাপ হবে না? আমি তাকে বলেছিলাম, সে রকম নয়; যমদূত হল পাপীদের পাপকর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তারা তো কোন সত্ত্ব নয়। পাপীদের পূর্বজন্মের পাপকর্মের অনুসারে যমদূত উৎপন্ন হয়ে তাদেরকে বিবিধ প্রকারে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করতে থাকে। মোটকথা, পাপীদের পূর্বজন্মের কর্মই তাদেরকে সেরূপ দুঃখকষ্ট প্রদান করে। এবার প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে পূজ্য বনভন্তের সকাশে প্রশ্ন করেন—ভন্তে, হিন্দুদের কথিত পুণ্যাম নিরয় কি রকম? বনভন্তে বলেন—আগে হিন্দুধর্মীয় অনেক পুস্তক পড়েছিলাম। কিন্তু বর্তমানে বুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা জানতেছি সেগুলো সবই কাল্পনিক। তাদের সাধনাগুলোও লৌকিক সাধনা, সেগুলো দ্বারা মুক্ত হওয়া যায় না। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও জ্ঞানযোগে অবলোকন করে থাকি। সে চতুর্থ ধ্যান লাভ করতঃ লৌকিক ঋদ্ধির অধিকারী হয়েছে মাত্র; দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। আর লৌকিক ঋদ্ধি দেখায়ে সাধারণ মানুষের মাঝে নিজেকে মহাজ্ঞানী, মহাধ্যানীরূপে প্রচার করেছিল। চাকমা জন সাধারণের মুখে উচ্চারিত ধ্যানী শিবচরনকেও আমি অবলোকন করে থাকি। শিবচরনও লৌকিক ঋদ্ধি লাভ করেছে মাত্র। তজ্জন্য তার গোজেন লামায় বলেছে—“না লাগিবে অনুবস্ত্র, না লাগিবে শিলা বৃষ্টি আর”। ঋদ্ধির বলে সে স্বীয় ইচ্ছা মত খাবার হতে গুরু করে সবই নিজে বানিয়ে ব্যবহার করতে পারে। সেই লৌকিক ঋদ্ধিকে মারের ঋদ্ধিও বলা চলে। শিবচরন তার গোজেন লামায় আরো বলেছে—“যখন এখানে ধার্মিক রাজা হবে, তখন সে আবার জন সমাজে বের হবে”। সে ধনী লোক হলে সুখ হবে মনে করে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় বলে সে জঙ্গলে ধ্যান করতঃ লৌকিক ঋদ্ধি লাভ করে লোক জনের থেকে অদৃশ্যমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির পথ লাভ করতে পারেনি। লৌকিক ঋদ্ধি শেষ হয়ে গেলে সেও বিপদে পড়বে। সে আবার সাধারণ গৃহীকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ বিবিধ দুঃখ কষ্টের ভাগী হবে। চাকমারা বলে থাকে শিবচরন ফকির হয়ে গিয়েছে। তবে এরূপ ফকির হওয়াও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছা করলেও যে কেউ জন ফকির হতে পারে না। মনোপ্রদোষিকা দেবতাগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হলে তারা ধ্যানী বা ফকির হয়ে থাকে। সেরূপ মনোপ্রদোষিকা দেবতাগণ মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হলে কিছুতেই গৃহবাসে থাকে না। তারা গৃহবাস ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে সাধনা

করতঃ ধ্যানী, ফকির ইত্যাদি হয়ে লোকের অগোচরে চলে যায়।

তোমরা বিবিধ আচার্য অনুসন্ধান করবে না। বিভিন্ন আচার্য অনুসন্ধানের ফলে নানা পথ নানা মতের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধের উপদেশ হল “নানা জনের নানা রুচি পূর্ণ করা দুঃখজনক।” বিভিন্ন আচার্য অনুসন্धानে সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। নানা দেশ, নানা জনপদ পরিভ্রমণে কোন ফল নেই। একগুরুর আশ্রয়ে থেকে এক স্থানে কর্মস্থান ভাবনা করাই উত্তম। বনভঙ্কে বলেন, বিভিন্ন আচার্য অনুসন্ধান করলে তোমাদের নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যেমন ধর, তুমি একজন আচার্যের সান্নিধ্যে গেলে, সে তোমাকে উত্তর দিকে যেতে নির্দেশ দিল। অপর আচার্যের সান্নিধ্যে গেলে সে নির্দেশ দিল তুমি দক্ষিণ দিকে যাও। এরপর অন্য আরো একজন আচার্যের সান্নিধ্যে গেলে সে তোমাকে বলল পূর্বদিকে যাও। এবং অপর এক আচার্যের সান্নিধ্যে গেলে সে বলল তুমি পশ্চিম দিকে যাও। এখন বল, তোমার পক্ষে কি আর সঠিক পথ নির্ধারণ সম্ভব হবে? হবে না। তাই এক আচার্যের সান্নিধ্যে থাকবে। নানা জনের নানান রুচি পূর্ণ করা সম্বন্ধে পূজ্য ভঙ্কে বলেন-আচ্ছা, তোমরা এখানে ত্রিশ জন আছ। যদি সেই ত্রিশ জনের রুচি পূর্ণ করতে চাও কোন কাজে সফলতা আসবে কি? আসবে না। উপমা কথা-ত্রিশ জনের মধ্যে কেউ যদি বলে ‘আমি আলু খাবো’; অপর কেহ বলে ‘আমি আলু খাবো না, বেগুন খাবো’; অন্য কেহ বলে ‘আমি আলু, বেগুন কিছুই খাবো না মূলা খাবো’; আবার অন্য কেহ বলে ‘আমি আলু, বেগুন, মূলা কিছুই খাবো না কপিই খাবো’। এভাবে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা রুচি যদি পূর্ণ করতে চাও, তা তোমাদের পক্ষে সুখের হবে কি? হবে না। বরং ঝগড়া, বিবাদ লেগে যাবে আর দুঃখই সার হবে। কাজেই তোমরা নানা জনের নানা রুচি পূর্ণ করতে চাইবে না। মনে রাখবে নানা জনের নানা রুচি পূর্ণ করা দুঃখজনক। নানা দেশ, নানা জনপদ পরিভ্রমণ করলে বন্ধনে জড়িত হতে হয়; সমাধি দুর্লভ হয়ে যায়। তাই নানা দেশ, নানা জনপদ পরিভ্রমণ হতে নিজেকে সংযত রাখবে।

তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ, এখন প্রব্রজিত আচার-আচরণ এবং প্রব্রজিত শিক্ষাই গ্রহণ কর। প্রব্রজিত আচার-আচরণ কি রকম? কোন রমণীর সহিত ঠাট্টা-তামাশা, গৃহী সুলভ বাক্যালাপ না করা এবং রমণীর রূপে, রমণীর গন্ধে, রমণীর শব্দে মোহিত না হওয়া। প্রব্রজ্য শিক্ষা কি রকম? প্রব্রজিত শিক্ষা হল, রমণীদেরকে বিশ্বাস না করা। ভগবান বুদ্ধ এক সময় ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অবিশ্বাসী কে? ভিক্ষুগণ উত্তর দিয়েছিলেন নারী। ইঁ্যা, ভিক্ষুগণ। তোমরা নারীকে বিশ্বাস করবে না। নারীরাই প্রব্রজিত জীবনের প্রধান শত্রু। বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা নারী চিত্ত হয়ে অবস্থান কর কি? খবরদার, আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, কখনো নারী চিত্ত হয়ে

অবস্থান করবে না। নারী চিত্ত হয়ে অবস্থান করলে, নারীকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করলে, প্রব্রজিত জীবন বিসর্জন দিতে হবে। নারী চিত্ত হলে তোমাদের অবশ্যই মৃত্যু বলে জানবে। নারীরা হল কালজামুরা সাপ (এক প্রকার ঘোর বিষধর সর্প)। কাল জামুরা সাপকে ধরলে যেমন ধরার সঙ্গে সঙ্গে ফণা বিস্তার করে শৌ শৌ শব্দে দংশন করে; ঠিক তদ্রূপ সর্পরূপী নারীকে বিশ্বাস করলে তোমাদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। তোমরা সেই সর্পরূপী নারীকে বিশ্বাস করবে কি? কখনো করবে না। নারীরা যদি তোমাদের সাথে মিষ্টি স্বরে কথা বলে, গল্প সল্প করে, হাসে, বিবিধ কাজ করে দেয়, তদ্বারা তোমরা মুগ্ধ হবে না। বরং জানবে সেগুলো তাদের প্রলোভন মাত্র। নারীরা সেরূপ শত সহস্রভাবে প্রলোভন দেখায়ে পুরুষদেরকে মোহিত করতে পারদর্শী। অভিজ্ঞানী পুরুষেরা তাতে মুগ্ধ হয়ে বিষধর সর্পরূপী নারীদেরকে বিয়ে করে ফেলে। সাবধান, তোমরা সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হবে না। এবার পূজ্য বনভক্তে চমৎকার গাথা সুরে বলেন—

ওরে কাল সাপিনী, তোর মুখে ভরা বিষ,

কাল সাপ নিয়ে খেলছি'স্ তুমি-

চিনতে তো না'রি?

ঢালছে বিষ দেখ, কাল সাপিনী ঐ,

জ্বলকে জ্বলকে বিষের ঢেউ-

করছে রে থে থে।

সুধা বলে করছে রে পান, বিষে ভরা বাটি,

ও সুধা নয় রে, ঘোর হলাহল, ভুলে যাচ্ছে খাটি।

দেখবে তুমি একদিন এই কাজের ফলাফল।

তোমরা সর্বদা এ'কথাগুলো চিত্তের মধ্যে গেঁথে রাখবে। কখনো প্রলোভনের সম্মুখীন হলে এই সব কথা স্মরণ করতঃ চিত্তকে প্রলোভনের ফাঁদে পড়তে দেবে না। তাহলে রমণীরা কোন প্রলোভনের ফাঁদে তোমাদেরকে জর্র করতে পারবে না। এভাবে সকল প্রকার প্রলোভন ছিন্ন, পদদলিত করে তোমরা নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

তিনি আরো বলেন—নারীকে চরম বিশ্বাসঘাতক বলে বিশ্বাস করবে। তারা পরপুরুষে আসক্ত হয়ে স্বীয় স্বামীকে মেরে ফেলতেও কুষ্ঠাবোধ করে না। এই ধরনের উদাহরণ শাস্ত্রের মধ্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। আমি গৃহী অবস্থায়ও সেরূপ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এই বলে ভক্তে পুরানো দিনে ফিরে গিয়ে বলেন—আমাদের গৃহীকালীন গ্রামে জনৈকা এক নারী স্বীয় স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে পরপুরুষে আসক্ত হয়েছিল। সেই পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তার

স্বামীকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মেরে ফেলার পরামর্শ করেছিল। পরামর্শানুযায়ী এক রাত্রিতে সুযোগ বুঝে ঔষধের পরিবর্তে বিষ খাওয়ায়ে স্বামীকে মেরে ফেলে। আর সকাল হওয়ার একটু আগে হতে লোক দেখানো বিলাপের সহিত কাঁদতে থাকে এবং কলেরা রোগে তার স্বামীটি মারা গেছে এ কথা লোকদের বলে, সত্য ঘটনা লুকানোর চেষ্টায় রত থাকে। সকাল হয়ে গেলে বেশ লোকজন জড়ো হতে লাগল। ইত্যবসরে একজন ব্যক্তি লক্ষ্য করল, সে কান্না করছে অথচ চোখ থেকে কোন অশ্রু বেরুচ্ছে না। ব্যাপারটি সে একে একে সবাইকে জানালে সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে, এটা কেমন ব্যাপার। এইভাবে শেষমেশ সত্য ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। বনভক্তে আরো বলেন, আমি গৃহীকালীন দেখা একটি নাটকে এরূপ দৃশ্যের এক চমৎকার বিবেকের গীতি শুনেছি। এবার বিবেকের স্বরে পূজ্য ভক্ত বলে উঠেন—

কাঁদলে কি হবে, চোখে নাই তোর জল,
ঐ দেখ না চেয়ে দু'চোখ বেয়ে—
কেবল বের হচ্ছে অনল। ঐ

পুরুষেরাও কদাচিৎ এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়; কিন্তু নারীরা এক্ষেত্রে স্বভাবসিদ্ধ। তাই তোমাদেরকে আবারো সতর্ক করে দিচ্ছি, নারীকে বিশ্বাস করবে না। নারীর প্রলোভন সুলভ কথাবার্তা, আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে নারীকে বিয়ে করার চিন্তা করবে না। বনভক্তে ভিক্ষু সজ্জের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, নারীকে বিশ্বাস করবে কি? না ভক্তে, বিশ্বাস করবো না। নারীকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে যাবে কি? না ভক্তে, নারীকে বিয়ে করে সংসারী হবো না। এবার বনভক্তে বলেন, না হলে ভালো, নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে। তবে শুধুমাত্র মুখে বললে হবে না; কাজের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। তোমাদের মুখের কথা আমি খুব একটা বিশ্বাস করতে পারছি না। অনেকেই তো নারীকে বিশ্বাস করতঃ আমার সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। নারীর প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে বিয়ে করে সংসারী হচ্ছে। তারা আমার কথা বিশ্বাস না করে নারীর কথাই বিশ্বাস করছে। নির্বাণ সুখকে দুঃখ, সুখ নয় মনে করে নারীকে বিয়ে করে সংসারী হওয়াকে সুখ মনে করছে। তারা কেন এরূপ করছে জান? তাদের মাথায় মার চেপে বসেছে বলে। তোমাদের মাথায় মার চেপে বসলে তোমরাও সেরকম করবে। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুসজ্জ বলে উঠল, ভক্তে আশীর্বাদ করুন যাতে মার আমাদের মাথায় চেপে বসতে সমর্থ না হয়। বনভক্তে বলেন, মার মাথায় চেপে বসতে সক্ষম হলে সেরূপ উল্টোপাল্টা কাজ করে থাকে। যাদের মাথায় মার চেপে বসে তারা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সার-অসার, কিছুই বুঝতে পারে না। তাই তো বলি—

হায়রে পাপমতি মার ঘাঁড়ে চাপে যার,
বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি সেসব ছেড়ে যায় রে তার।
খাটি সোনা মাটি হয়, তার সুস্থ দৃষ্টিতে।

তোমরা মার হতে সাবধান হয়ে যাও। যদি বিয়ে করার মন থাকে, সংসারী হওয়ার মন থাকে, এবং চিন্তের মধ্যে সেইরূপ চিন্তা, কল্পনা, পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে থাকে, তাহলে মার তোমাদের মাথায় চেপে বসবে। আর তখন এ' অবস্থায় পতিত হতে হবে তোমাদেরকে। কাজেই তোমরা কখনো নারীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে নারীকে বিয়ে করার মন ও সংসারী হওয়ার মন করবে না। বিয়ে করার, সংসারী হওয়ার মন, চিন্তা, পরিকল্পনাকে নির্বাণের মন দ্বারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেল। সর্বদা নির্বাণ সুখ লাভের প্রত্যাশী হওত নির্বাণের মন হয়ে অবস্থান কর।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-এক সময় স্বামীর মৃত্যুতে শোকাহত, মূহ্যমানপ্রায় এক উপাসিকা শান্তির আশায় রাজবন বিহারে আসে। ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাকে বলতে থাকে-ভন্তে, আমি খাওয়া-দাওয়া সব পরিত্যাগ করে মরে যাবো। এত দুঃখ আর সহ্য হচ্ছে না। আমার অন্তর দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমি বাঁচতে চাই না। এই বলে ক্রন্দনের বেগ সামলাতে না পেরে মাথা নিচু করতঃ কাঁদতে থাকে। তখন আমি সেই উপাসিকাকে একটি বিবেকের সুরে উপদেশ দিয়েছিলাম-

আঁধার আলোকে গঠিত বিশ্ব,
দুঃখের পরে মাগো সুখের নিশি।
মোছ মা মোছ মা নয়নের ধারা,
ওই আসে দেখ প্রভাতের হাসি।
আবার আসিবে সে সুখ নিশাটি,
বাজায়ে মধুর বীণাটি।
ধৈর্য বাঁধনে বাঁধো মা পরাণ,
ডাকো না তাহারে সেরূপে ভাসি।

এই উপদেশটি শুনে উপাসিকা মনের মধ্যে শান্তি লাভ করে। এবং ভালোমত দুই হাত জোড় করে আরো কিছুক্ষণ ধর্মদেশনা শ্রবণ করার পর আমার জন্য স্নানের জল এনে দেয়। এভাবে কিছুদিন বিহারে এসে সুচুম্নন ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। বর্তমানে আরো একটি স্বামী হাত ধরে ঘর-সংসার করতেছে। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেন-তোমাদের নিকট কোন শোকাহত ব্যক্তি বা রমণী উপদেশ প্রার্থনা করলে তোমরাও এই বিবেকের সুরে উপদেশ দিতে পারবে। ভিক্ষুসঙ্ঘকে একথা বলার মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়ারত, পারিবারিক

অশান্তিতে উদ্ভিন্ন জৈনিক উপাসক পূজ্য বনভক্তের পদ বন্দনা করতে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বনভক্তে তাদের অশান্তি খবরাখবর নিতে গিয়ে বলেন-তোমার স্ত্রী এখনো আগের মতন ক্ষ্যাপা আছে কি? আচ্ছা, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বিবেকের স্বরে এই কথাটি বলতে পারবে কি? (উল্লেখ্য যে, এই উপাসককে নাকি তার স্ত্রী দা দিয়ে কোপ দিতে উদ্যত হয়)

ছি! ছি! ললনা, কুলের অঙ্গনা,
স্বামী বধে কেন তুমি বাসনা।
রমণীর গতি পতির চরণ,
যাচিব মরন কামনা।
আঁধার জীবনে জিনে গো আলো,
নেহারী জীবনে হৃদয়ে ভুলো;
মিলনে মধুর যোজনা।
ছি! ছি! ললনা, কুলের অঙ্গনা,
স্বামী বধে কেন তুমি বাসনা।
পরশনে যায় স্বীয় স্বীয় তাই,
চির বিকশিত বদন সদায়।
নারী জন্মে সার ভালোবাসে যায়,
বিলায়ে দিয়ে, তুমি কেন আপনা। ঐ

তুমি আজকে বাড়ী গিয়ে মধুর স্বরে তোমার স্ত্রীর সামনে এ' বিবেকটি বলবে। তোমার স্ত্রী যদি এটির মর্মার্থ বুঝতে পারে, তাহলে তোমাকে আর দা দিয়ে কোপ মারতে চাইবে না। তোমাদের বিবাদ মিটেও যেতে পারে। আবার স্ত্রীরা যদি স্বামী কর্তৃক প্রহতা হয় তাহলে তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) এরূপ বলতে হবে-

সম্মল চরণ ওহে বীরবর,
অবলার প্রাণে মেরো না।
বর বিহঙ্গীনি সফলা সখিনী,
কি দোষে বধিবে বলো না।
ব্যথা তার কাঁধে নিয়ে মাথা বোঝা নিয়ে,
ভ্রমি বনে বনে, কতো যাতনা সহে-
কেন ব্যথিত বেদনা তুমি বোঝ না।

একদা জৈনিকা উপাসিকাকে এটি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। আর তার স্বামী যখন তাকে মারতে উদ্যত হয় তখন সে মধুর স্বরে এটি বলতে থাকলে স্বামী থেমে যায়। এবং সে হতে নাকি আর কোনদিনও সেই উপাসিকাকে মার খেতে

হয়নি। এবার বনভঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বলেন, দেখতেছ তো স্বামী-স্ত্রী কতো অসহ্য দুঃখ পাচ্ছে। অথচ বিয়ে করার আগে তারা কতো সুখের আশা না করেছিল। স্বামী-স্ত্রী চিরদিন পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকার শপথ গ্রহণ করেছিল। প্রেম ভালোবাসার সহিত একসাথে চলার দৃষ্ট প্রত্যয়ী হয়েছিল। বিয়ে করার আগে কতো মধুর সুরে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু বিয়ে করার পর সেসব আর কিছুই থাকে না। এসব থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। যদি তোমরাও কোন রমণীকে বিয়ে করতঃ সংসারী হয়ে যাও তাহলে এই দশায় পড়তে হবে। তাহলে আমার সাথে বলো “আমরা কোন রমণীকে বিয়ে করে সংসারী হবো না। যদি সংসারী হই, আমাদেরকেও এই দশায় পড়তে হবে”। কাজেই তোমরা নারীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না, সংসারী হয়ে যাবার চিন্তা উদয় করবে না। এতে তোমাদের পরম সুখ নির্বাণ লাভ হবে। অন্যদিকে কোন নারীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করলে, সংসারী হয়ে যাওয়ার চিন্তা উদয় করলে দুর্বিষহ দুঃখপূর্ণ অবস্থায় পড়তে হবে। এমন কি স্ত্রীর হাতেও তোমাদের মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং নিজেকে নিজে হুঁশিয়ার করে দাও, যাতে কোন নারীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় না হয় এবং সংসারী হয়ে যাওয়ার চিন্তা উদয় না হয়। সর্বদা স্মরণ রাখবে যে, নারী জাতি বিশ্বাসঘাতক; তারা কালসাপিনী। কালসাপিনী যেমন যে কোন মুহূর্তেই ফণা বিস্তার করে শৌ শৌ শব্দে দংশন করতে পারে, ঠিক তেমনি নারী জাতিরাও যে কোন মুহূর্তে পর পুরুষে আসক্ত হয়ে স্বীয় স্বামীকে হত্যা করতে পারে। “নারী জাতি বিশ্বাসঘাতক, ভূমি চিনলে না”। আমি আবারো বলছি কোন নারীর রূপে শব্দে গন্ধে বা অঙ্গভঙ্গীমাতে আসক্ত হবে না; কোন নারীকে বিয়ে করার চিন্তা উদয় করবে না, সংসারী হয়ে যাওয়ার চিন্তা উদয় করবে না। তাহলে নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-বৌদ্ধধর্মের মতে নির্বাণই উত্তম, নির্বাণই শ্রেষ্ঠ। তোমরা সেই উত্তম, শ্রেষ্ঠকে অর্জন করতে চেষ্টা কর। নারীকে বিয়ে করা, সংসারী হয়ে যাওয়া কিছুতেই উত্তম নয়, শ্রেষ্ঠ নয়। এগুলো অতিশয় হীন কাজ। মনে রাখবে, নির্বাণই একমাত্র উত্তম, নির্বাণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। নির্বাণ ব্যতিরেকে অন্য কোন উত্তম, শ্রেষ্ঠ নেই। আমার সাথে বলো “আমরা নির্বাণ লাভ করাকেই উত্তম, শ্রেষ্ঠ মনে করি। সেই উত্তম, শ্রেষ্ঠ নির্বাণকেই আমরা প্রত্যক্ষ করব”। পূজ্য বনভঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমরা উত্তম, শ্রেষ্ঠ সুখ নির্বাণ লাভে প্রত্যাশী কি? হ্যাঁ ভঙ্গে। তোমরা উত্তম, শ্রেষ্ঠ সুখ নির্বাণ লাভের উপদেশ শ্রবণ করবে, নির্বাণ লাভের চিন্তে অবস্থান করবে। কোন রমণীর কথা শ্রবণ করবে না, রমণীর চিন্তা, সংসারী হয়ে যাওয়ার চিন্তে অবস্থান করবে না। তোমরা যদি নির্বাণের উপদেশ শ্রবণ কর, নির্বাণ লাভের চিন্তে অবস্থান কর তাহলে তোমাদের

কাছে মার পরাজিত হবে। আর যদি রমণীর কথা শ্রবণ কর, রমণীর চিন্তে, সংসারী হয়ে যাওয়ার চিন্তে, অবস্থান কর তাহলে মার তোমাদের পরাজিত করবে। তাই তোমরা কেবলমাত্র নির্বাণের উপদেশ শ্রবণ করে, নির্বাণ লাভের চিন্তে অবস্থান করবে। এর থেকে চিন্তকে একটুও নড়াচড়া করতে দিবে না। সর্বদা নির্বাণের উপদেশ শ্রবণ করলে, নির্বাণ লাভের চিন্তে অবস্থান করলে অবশ্যই ইহ জীবনে উত্তম, শ্রেষ্ঠ নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হবে। কাজেই তোমরা সকলে দৃঢ়ভাবে বীর্য উৎপাদন কর এবং কেবলমাত্র নির্বাণের উপদেশ শ্রবণ ও নির্বাণ লাভের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর। নির্বাণ আলম্বন ছাড়া চিন্তের মধ্যে কোন আলম্বনকে স্থান দিবে না। এই উপায়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ নির্বাণ সুখ লাভের অধিকারী হও।

সাধু, সাধু, সাধু।

কামিনী কাঞ্চন সদা সন্ন্যাসীর পরম বাধা

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মুখকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—যারা অলস, নিদ্রাসক্ত, হীনবীর্য তারা নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তোমরা অলস হবে না, অতিরিক্ত (চার ঘণ্টার অধিক) ঘুমাবে না এবং বীর্যবান হয়ে যাও। এতে তোমরা নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করতে পারবে। আমার সাথে বলো “অলস হলে, অতিরিক্ত ঘুমিয়ে থাকলে, হীনবীর্য হলে, নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করা যায় না”। তোমরা অলস হবে না, অতিরিক্ত ঘুমিয়ে থাকবে না এবং হীনবীর্য বা কাপুরুষ হবে না। বরঞ্চ দৃঢ় বীর্যবান বা মহাপুরুষ হয়ে যাও। তবেই নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে। নবলোকোত্তর ধর্মসমূহ আয়ত্ত্ব করতে পারলে সুখ লাভ হয়। নবলোকোত্তর ধর্মসমূহ আয়ত্ত্ব না হলে দুঃখ ভোগ করতে হবে। তোমরা সকলে নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করতে সচেষ্ট থাক। জগতে গৌতম বুদ্ধের শাসন এখনো রয়েছে, ফুরিয়ে যায়নি। কাজেই নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করার সময় এখনো আছে। দৃঢ় বীর্যের সহিত চেষ্টা করলে বর্তমানেও নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে। নবলোকোত্তর ধর্ম আয়ত্ত্ব হলে জন্ম-মৃত্যু নিরোধ হয়, তৃষ্ণা ধ্বংস, ক্ষয় সাধন হয়ে যায়; ক্রেশসমূহ চিরতরে নিবৃতি ঘটে। ক্রেশসমূহ নিবৃতি ঘটতে তোমাদেরকে দশবিধ ক্রেশের সহিত যুদ্ধ করতে হবে। কিভাবে যুদ্ধ করবে? সর্বদা “অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম”, “অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম” জপ করে করে ক্রেশের সহিত যুদ্ধ করতে হবে। এইভাবে দশবিধ ক্রেশ বা ক্রেশমারকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এ’ত্রিলক্ষণ জ্ঞানের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে। ক্রেশসমূহের তাড়নায় কেহ নির্মল সুখের অধিকারী হতে পারে না। আমার সাথে

বলো “ক্লেশ আমাদের নিত্য দুঃখদায়ক”। দশবিধ ক্লেশসমূহ তোমাদেরকে নিত্য দুঃখ প্রদান করতেছে। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমাদেরকে কে নিত্য দুঃখ প্রদান করতেছে? ভন্তে, ক্লেশই। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সাধারণ মানুষ দুঃখ পেয়ে মনে করে অমুক ব্যক্তির জন্য আমি দুঃখ পাচ্ছি; কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। অমুক ব্যক্তি নয়, দশবিধ ক্লেশ বা ক্লেশমারই সত্ত্বগণকে দুঃখ প্রদান করে থাকে। জগতে যা কিছু দুঃখ পেতে হয় তা’ একমাত্র ক্লেশ মারের জন্যই। তাই তোমরা সত্ত্বর ক্লেশের সহিত যুদ্ধ কর। যুদ্ধে ক্লেশকে পরাজিত করে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতঃ পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ কর।

কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক এ ত্রিলোকের মধ্যে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা যায় না। এ’ ত্রিলোককে বলা হয় মারভুবন। অমারভুবনের মধ্যে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে হয়। অমারভুবন কাকে বলে? স্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ মার্গস্থ, ফলস্থ এবং নির্বাণ এই নবলোকোত্তর ধর্মকে বলা হয় অমারভুবন। তোমরা অলস হবে না, অত্যধিক ঘুম যাবে না, হীনবীর্য হবে না তাহলে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হবে। যারা অলস, কর্তব্য কাজে অবহেলা করে, সর্বদা ঘুমের মধ্যে সময় কাটায়, হীনবীর্য, উৎসাহ শূন্য তাদের নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হয় না। মহাজ্ঞানী শারীপুত্র ধেরো বলেছেন-

পাপ, আলস্য, হীনবীর্য যারা পরায়ণ,
তাদের সনে আমি না দেখি কখন।

বনভন্তে এ’গাথাটি কয়েকবার গেয়ে যান। তারপর বলেন, তোমরা আমার সাথে বলো “পাপী, আলস্যপরায়ণ এবং হীনবীর্য ব্যক্তির সহিত আমাদের যেন কখনো সাক্ষাৎ না হয়”। পাপকর্মে রত, আলস্যপরায়ণ হীনবীর্য ব্যক্তিদেরকে দেখলেও দুঃখ বলে জানবে। এরূপ ব্যক্তির কখনো নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় না। তজ্জন্য আমি তোমাদেরকে কোথাও যেতে দিই না। কারণ বর্তমানে সবখানেতে পাপী, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্য ব্যক্তি রয়েছে। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-বর্তমান সবখানেতে কি ধরনের ব্যক্তি দেখা যায়? পাপ, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্য ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেন-তোমরা যখন প্রব্রজিত হয়েছ তাই এখন তোমাদের কর্তব্য হল, দুঃখপূর্ণ সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে সকল বিষয়ে অনাসক্ত থাকা। দুঃখপূর্ণ ধর্মসমূহ ত্যাগ করতঃ সকল বিষয়ে অনাসক্ত থাকাই সুখ। তোমরা যদি সেভাবে থাকতে পার তাহলে প্রব্রজিত জীবন যে কতটুকু সুখের হতে পারে তা’ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। আমার সাথে বলো “আমরা সমস্ত দুঃখ ধর্ম ত্যাগ করে সকল বিষয়ে অনাসক্ত থেকে প্রব্রজিত সুখ অনুভব করব”। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন-তোমরা সমস্ত দুঃখ ধর্ম ত্যাগ করে সকল বিষয়ে

অনাসক্ত থাকতে পারবে কি? ভস্তু, আশ্রাণ চেষ্টা করব, যদি পার তাহলে তোমাদের অবশ্যই প্রব্রজিত জীবনের প্রকৃত সুখ লাভ হবে। এবং এটা হবে তোমাদের জন্য পরম ভাগ্যের ব্যাপার। এবার পূজ্য বনভঙ্কে আবারো ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—প্রব্রজিত জীবনের সুখ কিভাবে লাভ হয়? ভস্তু, সমস্ত দুঃখ ধর্ম ত্যাগ করে অনাসক্ত হলে প্রব্রজিত জীবনের সুখ লাভ হয়। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমরা সমস্ত দুঃখ ধর্ম ত্যাগ করতঃ সকল বিষয়ে অনাসক্ত থেকে প্রব্রজিত জীবনের সুখ উপলব্ধি করতে সচেষ্ট থাক। কখনো আলস্যপরায়াণ হবে না এবং সারা রাত্রি নিদ্রায় কাটিয়ে দেবে না। আমি তো সারা রাত্রি এই চেয়ারটিতে বসেই থাকি; ঘুমাই না। তখন আমার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সব ভিক্ষুরা ঘুমাচ্ছে। এইভাবে রাত যত গভীর হতে গভীরতর হতে চলে ততই আমার নিত্য নতুন বিষয়ে জ্ঞানোদয় হয়। মনে রাখবে, রাত্রিতে চিন্তা বেশি সমাধিস্থ হয়ে থাকে বলে তখন বেশি জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে কোন বিষয়ে জ্ঞানোদয় হবার সুযোগ থাকে না। উপমা কথা, ধর দুইজন শিকারী শিকার খোঁজে তাদের দুই নির্ধারিত মাচায় গিয়ে শিকারের অপেক্ষায় রয়েছে। ইত্যবসরে একজন শিকারী ঘুমিয়ে পড়ল। আর সেই ঘুমের ঘোরে রাত্রি শেষে ভোর হল। ভোরে জেগে উঠে দেখে সব শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে; তার পক্ষে আর শিকার পাওয়া সম্ভব হল না। অন্যদিকে অপর শিকারীটি রাত্রিতে ঘুমায়নি বলে শিকার হাতে বাড়ি ফিরল। ঠিক তদ্রূপ তেমরাও যদি সারারাত নিদ্রায় কাটিয়ে দাও তাহলে কোন বিষয়ে জ্ঞানোদয় হবে না। আর যদি রাত্রিতে জেগে থেকে চিন্তকে সমাধিস্থ কর তাহলে ইচ্ছা মত জ্ঞান আহরণ করতে পারবে বা নব নব বিষয়ে জ্ঞানোদয় হবে। ঘুম হল অজ্ঞান, জাহ্নত হল জ্ঞান। ঘুমের সময় কোন জ্ঞানোদয় হবার অবকাশ নেই; বরং অজ্ঞানই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রাত্রিতে জাহ্নত থাকলে, চিন্তা সমাধিস্থ করলে একের পর এক জ্ঞানের ভাণ্ড পূর্ণ হয়ে থাকে।

তোমরা যে কোন বিষয় দেখলে দেখতে পার, শুনলে শুনতে পার, অনুমান করলে অনুমান করতে পারছ বলে জানবে; কিন্তু তাতে আসক্ত হবে না। অনাসক্তভাবে অবস্থান করবে। এবম্বিধ উপায়ে যে কোন বিষয়ে অনাসক্ত থাকতে পারলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। যেমন—কোন একজন সুন্দরী রমণীকে দেখলে তাতে অনাসক্ত থাকবে; আসক্ত হবে না। অনাসক্ত থাকলে তোমার চিন্তে সেই রমণীর কথা রেখাপাত করতে পারবে না। এবং চিন্তের মধ্যে সেই রমণী সম্পর্কিত কোনভাবেও উদয় হবে না। কোন মনোজ্ঞ শব্দ শুনলেও তাতে অনাসক্ত থাকবে। সেই মনোজ্ঞ শব্দের প্রতি আসক্ত হবে না। অনাসক্ত থাকলে সেই শব্দের কথা তোমার চিন্তে রেখাপাত করতে পারবে না। এবং চিন্তের মধ্যে

তা পুনঃপুন শুনারও চিন্তা উদয় হবে না। কোন বিষয়ে অনুমান করলেও তাতে অনাসক্ত থাকবে। সে অনুমিত বিষয়ের প্রতি আসক্ত হবে না। অনাসক্ত থাকলে চিন্তের মধ্যে সে অনুমিত বিষয়ে কোন রেখাপাত করতে পারবে না। এবং সে বিষয়ে পুনঃপুন অনুমান করার ইচ্ছাও জাগবে না। এইভাবে দর্শনে, শ্রবণে, অনুমানে অনাসক্ত থাকলে সেই দর্শন-শ্রবণ-অনুমান সম্পর্কিত কোন চিন্তা উদয় হবে না। তাতে লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপন্ন হয়ে কোন প্রকার দুঃখ পাবারও সম্ভাবনা থাকবে না। এভাবে সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকাই সুখ। আমার সাথে বলো “আমরা কোন বিষয় দেখলেও, শুনলেও, অনুমান করলেও তাতে আসক্ত হবো না”। এইভাবে দর্শনে, শ্রবণে, অনুমানে অনাসক্ত থাকলে নির্বাণ লাভ হয়। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা কোন কিছু দেখলে তাতে অনাসক্ত, কর্ণের দ্বারা কোন শব্দ শুনলে তাতে অনাসক্ত এবং মনের দ্বারা কোন বিষয় অনুমান করলে তাতে অনাসক্ত থাকাই নির্বাণ সুখ। এবার পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—বল তো কোন বিষয় দেখলে, শুনলে, অনুমান করলে তোমাদেরকে কিভাবে থাকতে হবে? ভঙ্কে, অনাসক্তভাবে। বনভঙ্কে-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। অনাসক্তভাবে থাকতে পারলে তোমরা নির্বাণ লাভ করতে পারবে। তবে যদি আসক্ত হয়ে থাক তাহলে জানবে তোমাদের আর দুঃখের সীমা থাকবে না। তাই আবারো বলছি, কোন বিষয় দেখলে দেখতে পার, শুনলে শুনতে পার, অনুমান করলে অনুমান করতে পার কিন্তু তাতে আসক্ত হবে না। সকল বিষয়ে অনাসক্তভাবে অবস্থান কর। অনাসক্তভাবে অবস্থান করলে তোমাদের চিন্তে লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপন্ন হতে পারবে না। আর যাবতীয় দুঃখের চির নিবৃত্তি ঘটবে।

পূজ্য বনভঙ্কে বলেন—‘কামিনী কাঞ্চন সদা, সন্ন্যাসীর পরম বাধা’। কামিনী কাঞ্চনের মায়া জালে আবদ্ধ না হয়ে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করা সহজ কথা নয়। স্ত্রী-পুত্র, মনি কুণ্ডলের এই বন্ধন ছিন্ন করা কঠিন। এ বন্ধন লৌহ কারাগারের অপেক্ষা শিথিল হলেও ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। তাই লৌহ কারাগারের বন্ধন প্রকৃত বন্ধন নয়, কিন্তু কামিনী কাঞ্চনের তথা স্ত্রী-পুত্রের দ্বারা যে বন্ধন রচনা হয় তাই প্রকৃত বন্ধন। সন্ন্যাস জীবন-যাপনের পথে এ বাধা অতিক্রম করা বড়োই দুর্ভেদ্য। তবে জ্ঞান থাকলে সে কঠিন কাজেও সফলকাম হওয়া যায়। জ্ঞানীরা কামিনী কাঞ্চনের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির পথ সন্ন্যাস জীবন-যাপন করতে সক্ষম। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তির কামিনী কাঞ্চনের মায়ার জালে মোহিত হয়ে থাকে। তাদের পক্ষে মুক্তির পথ সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না। তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা কামিনী কাঞ্চনের মায়া জালকে দুঃখ, মিথ্যা, পাপ এবং মুক্তি পথের বড়ো বাধা বলে জানবে। আর সেই মায়ার জালকে ছিন্ন-ভিন্ন করতঃ সন্ন্যাস জীবন-যাপন করতে পারবে। অজ্ঞানী ব্যক্তির

কামিনী কাঞ্চনের মায়াজালকে সত্য, সুখ, পুণ্য মনে করতঃ তাতে আসক্ত হয়ে যায়। তজ্জন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা সম্ভবপর হয় না। তোমরা চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসব ক্ষয় জ্ঞান অর্জন করতে সচেষ্ট থাক। তাহলে কোন কামিনী কাঞ্চনেই তোমাদেরকে মায়াজালে আবদ্ধ করতে পারবে না; তোমরা দুঃখমুক্তি পরম সুখ নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে। পূজ্য বনভঙ্তে এবার ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বলেন-তোমরা যুবতী মেয়েদেরকে থানার দারোগা বলে জানবে। থানা দারোগা হতে সাবধান। থানার দারোগা আসামী পেলে যেমন গ্রেপ্তার করে ঠিক যুবতী মেয়েরাও তোমাদেরকে বশীভূত করতে চাইবে। বৃদ্ধা নারীরা হল পেনশন পাওয়া (অবসরপ্রাপ্ত) দারোগা। তারা বর্তমানে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। তবে তারা নতুন দারোগারূপী যুবতীদের হতে অভিজ্ঞ। যুবতীরা এখনো তাদের মত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে বৃদ্ধা নারীরা তাদের সেই অভিজ্ঞতা যুবতীদেরকে শিখিয়ে দিতে পারে। আর তাহলে যুবতীরা সহজেই তাদের আসামীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে। তবে থানার দারোগা কি সবাইকে গ্রেপ্তার করে? করে না, যারা আসামী শুধুমাত্র তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। যুবতীরাও তোমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। কেবলমাত্র যেই ভিক্ষুরা তাদের সাথে হাসি, ঠাট্টা, তামাশায় রত হয়, লোভ চিন্তে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, সাধারণ যুবক-যুবতীরা যে আচার-আচরণ ও মনন করে সেইরূপ আচার-আচরণ ও মননে লিপ্ত ভিক্ষুগণকেই বেছে বেছে তারা গ্রেপ্তার করবে। বনভঙ্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বললেন, তোমরা কি ধরণের আচার-আচরণ করলে যুবতীদের আসামী হবে জান? যদি কোন যুবতীকে বল 'তোমাকে আমার ভালো লাগে, মনোপুত হয়; পেলে তোমাকে বিয়ে করব'। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি তোমাকে আসামী বলে সনাক্ত করতঃ গ্রেপ্তার করে ফেলবে। তখন কোন জামিনেও ছাড়া পাওয়া যাবে না। কাজেই তোমরা সেই অনার্য আচার-আচরণ করবে না। সর্বদা যুবতীদের হতে নিজকে পৃথক করে বহু দূরে সরিয়ে রাখতে সচেতন থাকবে। যদি যুবতীদের সাথে সাধারণ যুবক-যুবতী সুলভ আচার-আচরণ কর তাহলে যুবতীরা তোমাদেরকে আসামী বানিয়ে ফেলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতঃ প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করাবে। আমি তোমাদেরকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যুবতীদের দিকে লোভ চিন্তে তাকিয়ে থাকবে না, তাদের সাথে হাসি, ঠাট্টা, তামাশা সহ বাজে কথায় রত থাকবে না, হীন আচার-আচরণ করবে না। সর্বোপরি, থানার দারোগার মতো ভয় জ্ঞানে দর্শন করবে। বনভঙ্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-যুবতীদেরকে কি মনে করবে? ভঙ্তে, থানার দারোগা। তোমরা তাদের আসামী হবে কি? না ভঙ্তে, হবো না। বনভঙ্তে তবুও

বলেন-নাকি আসামী হতে ইচ্ছা হয়? যার যার ইচ্ছা হয় আমাকে বল। পূজ্য ভন্তে এরূপ বললে ভিক্ষুসম্মেলনের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। আসামী হবার ইচ্ছা হলে তাকে আর বেশি বুঝানো সম্ভব হবে না। মনে রাখবে, ভিক্ষুদের মধ্যে যাদের জ্ঞানশক্তির অভাব তারাই যুবতীদের সাথে অনার্য আচার-আচরণে রত হয়, যুবতীদের আসামী হবার মন নিয়ে অবস্থান করে। যারা সেইরূপ হীনমন, হীন আকাঙ্ক্ষা, হীন জ্ঞান নিয়ে অবস্থান করেছে তাদের তো বুঝিয়ে লাভ নেই। বনভন্তে বলেন, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, যারা সেই রকম হীন, অনার্য, পাপচিন্তে অবস্থান করতেছে আমি তাদেরকে আমার সান্নিধ্যে রাখব না। সুতরাং তোমরা সবাই সাবধান হয়ে যাও। আমার সান্নিধ্যে থাকলে ভালোভাবে থাকতে হবে। বুদ্ধের শাসনে হীন, অনার্য, খারাপ (বজং) ব্যক্তির স্থান হয় না। মহাসমুদ্রের একগুণ কি? হ্যাঁ, মহাসমুদ্রের মধ্যে কোন মরা, পঁচা, আবর্জনা স্থূপ থাকতে পারে না, মহাসমুদ্র সেই মরা, পঁচাকে তীরে তুলে দেয়। ঠিক তদ্রূপ বুদ্ধের শাসনেও হীন, অনার্য আচার-আচরণ সম্পন্ন দুঃশীল ভিক্ষুর স্থান নেই। বুদ্ধ শাসনের পবিত্রতা তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে রাখে। অন্যদিকে যুবতীদের মধ্যে যারা ভালো স্বভাবের তারাও ভিক্ষুদের সাথে হীন, অনার্য আচার-আচরণে রত হবে না। যারা খারাপ (বজং) স্বভাবের একমাত্র তারা হীন, অনার্য আচার-আচরণ করে থাকে।

তোমরা কামলোকের প্রতি চিন্তা রমিত করবে না, রূপলোকের প্রতি চিন্তা রমিত করবে না, অরূপলোকের প্রতি চিন্তা রমিত করবে না। কারণ কামলোকের প্রতি চিন্তা রমিত করলে দুঃখ পেতে হয়, রূপলোকের প্রতি চিন্তা রমিত করলে দুঃখ পেতে হয়, অরূপলোকের প্রতি চিন্তা রমিত করলে দুঃখ পেতে হয়। কামলোকের চিন্তে তৃষ্ণা থাকে, রূপলোকের চিন্তে তৃষ্ণা থাকে, অরূপলোকের চিন্তে তৃষ্ণা থাকে। ফলে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। তোমরা লোকোত্তর চিন্তা উদয় করতে সচেষ্ট থাক। লোকোত্তর চিন্তে তৃষ্ণা থাকতে পারে না। তাই একমাত্র লোকোত্তর চিন্তাই সুখ। কামলোকে, রূপলোকে, অরূপলোকে সন্তুগণ যথাক্রমে মনুষ্য-দেবতা-ব্রহ্মা প্রত্যেকের তৃষ্ণা বিদ্যমান রয়েছে বলে তারা দুঃখের মধ্যে অবস্থান করতেছে। যদিও বা মনুষ্যদের তুলনায় দেবতা-ব্রহ্মারা কিছুটা সুখ করে থাকে। যেমন কোন ধনী ব্যক্তি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সহ বেশ কিছু ধন জমা করল। এখন সেই সম্ভ্রম্যকৃত ধন-সম্পদ দ্বারা বিনা কায়ক্লেশে বেশ কিছু দিন কাজ না করে আরাম-আয়েশের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারে। তা নয় কি? কিন্তু সেই টাকাগুলো তো আর সর্বদা স্থিতি থাকবে না, ফুরিয়ে যাবে। যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তাকে আবারো টাকা উপার্জনের জন্যে কাজ করতে হবে। ঠিক তদ্রূপ দেব-ব্রহ্মলোকে পূর্বজন্মের সম্ভ্রম্যকৃত পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গ, ব্রহ্মলোকে

উৎপন্ন হয়ে সুখের মধ্যে অবস্থান করতেছে। তবে সেই সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয়সাধন হলে তাদেরকেও হীনকূলে জন্মগ্রহণ করতেঃ দুঃখভোগ করতে হবে। কারণ বর্তমানে তারা তো পুণ্য সঞ্চয় করতে পারছে না। এই সব কারণে নির্বাণ ব্যতীত কোথাও প্রকৃত সুখ নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই, দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। অন্যদিকে, ভগবান বুদ্ধ মনুষ্য জন্মকে দুর্লভ বলেছেন। কারণ মনুষ্য জন্ম থেকে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সহজ। দেবতা, ব্রহ্মাদের সুখের ভাগ বেশি বলে তারা দুঃখমুক্তি বুঝতে চায় না বা বুঝে না। আর চারি অপায়ে সর্বদা দুর্বিষহ দুঃখের জ্বালায় দুঃখমুক্তির কথা বুঝার সুযোগ থাকে না। কিন্তু মনুষ্যরা সুখ-দুঃখ উভয়ই অনুভব করে বলে তাদের পক্ষে দুঃখমুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। তারা সুখ-দুঃখ উভয় থেকে মুক্ত হওত নির্বাণ লাভে সক্ষম হয়। তজ্জন্য আবারো বলছি, তোমরা কামলোক, রূপলোক, অরূপলোকের চিন্তা ধারণা না করে লোকান্তর চিন্তা বা নির্বাণের চিন্তা উদয় করতে সচেষ্ট থাক। এতেই সকল প্রকার দুঃখের চির অবসান হয়ে অজর অমর নির্বাণ সুখ লাভ হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা মারের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা থাকলে মারের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না; সহজে মার পরাজিত করে ফেলে। তাহলে কিভাবে মারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে? আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা ভাব পরিত্যাগ করে। আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে মারের সঙ্গে যুদ্ধ করলে মার পরাজিত হয়। আলস্য, ঘুম থাকলে ধ্যান করা যায় না। আলস্যভাব ধ্যান করার যাবতীয় উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দেয়। আর ঘুম ধ্যান করার সময়টুকু হরণ করে নেয়। ভগবান বুদ্ধ আলস্যতা এবং ঘুমকে কারাগার বলে অভিহিত করেছেন। কারাগারে বন্দিকৃত কয়েদিগণ যেমন স্বীয় ইচ্ছানুরূপ স্বাধীনভাবে কোন কিছু করতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ আলস্য, ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণও সেই আলস্য, ঘুমের জন্য কোন কাজ সঠিকভাবে, সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে—

কারাগার তুল্য জান আলস্য, তন্দ্রায়,
ধ্যানেতে জন্মায় বাধা, কার্যে অন্তরায়।
দাসত্বের তুল্য জান চাঞ্চল্য শোধনে,
পরোধীন থাকে সদা অতি ক্ষুদ্র মনে।

তোমরা আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে মারের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা ত্যাগ না করলে মারকে পরাজিত করতে পারবে না। বরং মারই তোমাদেরকে পরাজিত করবে। বনভক্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে তখন প্রশ্ন করেন, কি করে মারকে পরাজিত করবে? ভক্তে! আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা ত্যাগ করে।

হ্যাঁ; আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা ত্যাগ করতে না পারলে মার তোমাদেরকে সহজেই পরাজিত করে ফেলবে। মার যাতে তোমাদেরকে পরাজিত করতে না পারে তজ্জন্য তোমরা আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা পরিত্যাগ কর। আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতাকে কিছুতেই চিন্তের মধ্যে স্থান দিবে না। তোমরা চিন্তের মধ্যে প্রবল বীর্য উৎপন্ন কর। এবং সেই বীর্যের দ্বারা আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা ত্যাগ করতঃ মারকে পরাজিত করতে সচেষ্ট থাক। শরীরে বা মনে কোন প্রকার আলস্যভাব উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা দূর করে দিবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেবলমাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাবে, বাকি বিশ ঘণ্টা জাহত থাকবে। চঞ্চলতা ভাবকে স্মৃতির সহিত দমন করবে। মনে রাখবে, আলস্য ত্যাগ, ঘুম ত্যাগ ও চঞ্চলতা ত্যাগ করা তোমাদের কাজ। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেন, তাহলে তোমাদের কাজ কি? ভন্তে; আলস্য ত্যাগ করা, ঘুম ত্যাগ করা ও চঞ্চলতা ত্যাগ করা আমাদের কাজ। যাঁরা অর্হৎ তাঁদের আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা বিন্দুমাত্রও থাকতে পারে না। অর্হৎগণ আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা হতে মুক্ত। বনভন্তে বলেন, তোমরা খুব বেশি কথা বলবে না; বাজে কথা, গল্প গুজব করে সময় নষ্ট করবে না। সমস্ত দিন আলাপে-সালাপে কাটিয়ে, সারা রাত্রি নিদ্রা গিয়ে, অজ্ঞানী ব্যক্তি কবে সংসার থেকে মুক্ত হবে? হতে পারবে না। তোমরা সেই অজ্ঞানী ব্যক্তির মত সমস্ত দিন আলাপে-সালাপে কাটিয়ে, সারারাত্রি নিদ্রা গিয়ে সময় ও সুযোগ নষ্ট করবে না। যদি নষ্ট কর তাহলে কখনো সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তাই আমার সাথে বলো “সমস্ত দিন আলাপে-সালাপে কাটিয়ে, সারারাত্রি নিদ্রা গিয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তি কবে সংসার দুঃখ থেকে মুক্ত হবে? হতে পারবে না”। তোমরা সেই অজ্ঞানী ব্যক্তি না হয়ে অতি সহসা আলস্য, ঘুম, চঞ্চলতা ত্যাগ করে মারকে যুদ্ধে পরাজিত করতঃ সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা সোনা হয়ে যাও লৌহ হয়ে পড়ে থাকবে না

এক সময় শ্রাবক বুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—প্রত্যেক প্রাণীর ছয়টি ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন। এই ষড় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন ইন্দ্রিয়ে থাকে অবিদ্যা, মিথ্যাদৃষ্টি আর বাকী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে থাকে তৃষ্ণা। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি থাকে? ভন্তে; অবিদ্যা, মিথ্যাদৃষ্টি। আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি থাকে? ভন্তে; তৃষ্ণা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন ও অবস্থানরত সেই তৃষ্ণাকে নির্মূল, ধ্বংস করবার জন্য শমখ

ভাবনা এবং মন ইন্দ্রিয়ের অবিদ্যা, মিথ্যাদৃষ্টিকে নির্মূল, ধ্বংস করবার জন্য বিদর্শন ভাবনা করতে হয়। পূজ্য বনভন্তে প্রশ্ন করেন—শমথ ভাবনা কেন করতে হয়? ভিক্ষুসঙ্ঘ একবাক্যে বলে উঠেন—তৃষ্ণাকে ধ্বংস করবার জন্য। বিদর্শন ভাবনা কেন করতে হয়? ভন্তে; অবিদ্যা, মিথ্যাদৃষ্টিকে ধ্বংস করবার জন্য। এইভাবে চিত্ত সংযম ও শমথ-বিদর্শন ভাবনায় দক্ষতা লাভ করতে পারলে সমস্ত সংযোজন ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা সেরূপ দক্ষতা লাভ অর্জন করতে পারবে কি? ভন্তে! আশীর্বাদ করুন। যদি তা চাও তাহলে চিত্তের মধ্যে কোন পাপ করবে না বা পাপ চেতনা উদয় করবে না। মনে মনে যদি কোন রমণীকে লোভ কর এবং তাকে বিয়ে করার চিন্তে অবস্থান কর, তবে চিত্ত অসংযম হয়ে যাবে। আর শমথ বিদর্শন ভাবনায় অদক্ষ হয়ে পড়ে থাকবে। তাই তোমরা কোন রমণীকে লোভ করবে না, তাদেরকে বিয়ে করার চিন্তে অবস্থান করবে না এবং চিত্তের মধ্যে কোন প্রকার পাপ চেতনা উদয় করবে না। তাহলে চিত্ত সংযম ও শমথ বিদর্শন ভাবনায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। আমার সাথে বলো “আমরা কোন রমণীকে লোভ করব না, তাদেরকে বিয়ে করার চিত্ত উৎপন্ন করবো না, এবং তাদের সাথে সংসারী হবার চিত্ত উৎপন্ন করবো না। এইভাবে চিত্ত সংযম ও শমথ বিদর্শন ভাবনায় দক্ষতা লাভ করতঃ সমস্ত সংযোজন ছিন্ন করব”। বনভন্তে আবার বললেন—এ’ কথা মনে থাকবে কি? নাকি ভুলে যাবে (টুক্কো উল্লেখ)? ভন্তে; অবশ্যই মনে থাকবে। ভুলে গেলে কিন্তু চিত্ত সংযম ও শমথ বিদর্শন ভাবনায় দক্ষতা লাভ করতে পারবে না। সমস্ত সংযোজন ছিন্ন করা সম্ভব হবে না। ফলে দুর্বিষহ দুঃখের ভেতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

তোমরা ভিক্ষুগণ যদি অনাগামী, অরহত হতে পারতে তাহলে সদ্ধর্মের (বুদ্ধ শাসনের) উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের তরে চারি দিকপাল মহারাজাগণ ও দেবরাজ ইন্দ্র বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকত। তখন উভয়ের সুখ লাভ হতো, উভয়ে সুখে-শান্তিতে অবস্থান করতে পারতে। কিন্তু তোমরা তো সে সব লাভ করতে পারনি, কাঁচাই (অমার্গ লাভী) রয়ে গেছ। তোমাদের চিন্তে এখনো তালিমালি (তালগোল), গণ্ডগোল, গোলযোগ, ভেজাল ভাব রয়েছে। কাজেই দেবরাজ ইন্দ্র, চারি দিকপাল মহারাজাগণ তোমাদের বিশ্বাস করছে না বিধায় কোন সাহায্য সহযোগিতা দানে আগ্রহী হচ্ছে না। তোমরা যদি অনাগামী, অরহত এবং দায়ক-দায়িকারা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী হয়ে উভয়ে মাররাজ্য ত্যাগ করে নির্বাণরাজ্যে অবস্থান করতে, শীলবান প্রজ্ঞাবান হতে পারতে, তখন উক্ত দেবভাগণ অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা করত। কারণ দেবরাজ ইন্দ্র, চারি দিকপাল মহারাজাগণ হল ভগবান বুদ্ধের উপাসক। কিন্তু তোমরা তো অনাগামী অরহত হয়ে নির্বাণ রাজ্যে অবস্থান করতে সমর্থ হওনি। তোমাদের চিন্তে এখনো

তালিমালি, গণ্ডগোল, গোলযোগ, ভেজাল রয়েছে। সেই অবস্থায় তারা তো সাহায্য করতে আগ্রহী নয়। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন-তোমাদের চিন্তে তালিমালি, গণ্ডগোল, গোলযোগ, ভেজাল থাকলে তারা সাহায্য করবে কি? না ভন্তে; করবে না। বনভন্তে বলেন, তোমরা (ভিক্ষুরা) তেজস্বী, বীর্যবান নয় বলে তারা সাহায্য করেছে না। তোমরা যদি বীর বিক্রমে মারকে পরাজিত করে অনাগামী, অরহত্ লাভ করতে তাহলে উক্ত দেবতাগণ এগিয়ে আসতো। দেবরাজ ইন্দ্র, চারি দিকপাল মহারাজাগণ এবং বুদ্ধ শাসনে বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাশীল ধনী দেবতাগণ সাহায্য করলে আর কেহ সাহায্য করার প্রয়োজন হতো না। তারা সব কিছুই করে দিতে পারবে। আমি তো জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি ধনী দেশকে ধনী বলি না। উক্ত দেবতাগণের যে ধন, সম্পদ রয়েছে সে সম্পদ দিয়ে তারা একাই জাপান বা আমেরিকার মত এক হাজার দেশ কিনতে পারবে।

তিনি আরো বলেন-অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানে অভিভূত চিন্তে অবস্থান করাকে আমি কারাগার বলি। তোমাদের চিন্তে যদি অবিদ্যা থাকে, তৃষ্ণা থাকে, উপাদান থাকে তাহলে জানবে তোমরা কারাগারে রয়েছ। চিন্তের মধ্যে অবিদ্যা থাকলে দুঃখ পেতে হয়, উপাদান থাকলে দুঃখ পেতে হয়। তাই আমার সাথে বলো “আমরা যদি অবিদ্যার সহিত থাকি দুঃখ পাবো, তৃষ্ণার সহিত থাকি দুঃখ পাবো, উপাদানের সহিত থাকি দুঃখ পাবো”। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন-তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদানের সহিত থাকবে কি? ভিক্ষুসঙ্ঘ একবাক্যে বলে উঠলেন, না ভন্তে, থাকবো না। যদি না থাক তাহলে তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান হতে খালাস পেয়েছ বলে জানবে। এতে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান কোথায় থাকে? মনচিন্তের মধ্যে। মনচিন্তের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান থাকলে দুঃখের সীমা থাকে না। তাই তোমরা স্বীয় স্বীয় মনচিন্তকে অবিদ্যামুক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, উপাদানমুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাক। সর্বদা এ কথা মনে রাখবে-

প্রতিসন্ধি ক্রমে হায় ব্রণরূপে এই কায়,

গর্ভাশয় মলকুস্ত্রে প্রথম সৃজন।

অস্ত্রে ক্রমে কীট ন্যায় নয় দশ মাস প্রায়,

কষ্টে গর্ভবাস অস্ত্রে ভূতলে পতন।

মোহ তৃষ্ণা উপাদান কর্ম আহার বর্তমান

হেতু আর নামরূপে দেহ সংগঠন।

জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক, হাছতাশে ফাঁটে বুক,

শত্রু সঙ্গে মৃত্যু অঙ্গে দুঃখ অগণন।

দন্তহীন শুভ্র কেশ দৃষ্টিহীন শক্তি শেষ,

জরা ক্রমে ব্যাধি পুনঃ জীবের মরণ ।
 জীবন প্রদীপ হায় আচমিতে নিভে যায়,
 আসন্ন যমের দূত মানে না বারণ ।
 পশ্বে জলবিন্দু প্রায়, টলমল প্রাণ হায়,
 আত্মাধীন নহে কিছু দেহটি অবধি ।

এসব পুনর্জন্ম গ্রহণের দুঃখকে বুঝে তোমরা সত্ত্ব নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্টি থাক । কারণ নির্বাণ লাভ করতে না পারলে পুনর্জন্মের দুঃখ অবধারিত । অন্যদিকে সেই পুনর্জন্ম কোন যোনিতে হবে তা'ও অনির্দিষ্ট । মনুষ্য যোনিতে, নাকি তির্যক যোনিতে কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, বাঘ, ভল্লুক, হাতি, সাপ হয়ে জন্ম ধারণ করতে হয় তার কোন হিসাব নেই । আচ্ছা, বর্তমান মনুষ্য যোনিতে জন্ম হেতু তোমরা প্রব্রজিত হয়ে উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করেছে, কিন্তু মৃত্যুর পর যদি কুকুর হয়ে জন্ম নিতে হয় তা' কি উৎকৃষ্ট হবে, না সুখের হবে? ভস্তে, তা কখনো হবে না । কিন্তু নির্বাণ লাভ না হলে কুকুর, বিড়াল, হাতি কুলে জন্ম ধারণ করা তা তো বিচিত্র কিছু নয় । সেইসব পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে মুক্ত হতে ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপদেশ দিয়েছেন । ভগবান বুদ্ধ আরো বলেছেন, যেই জন্মগ্রহণে চক্রবর্তী সুখ, দেবেন্দ্র সুখ লাভ করে পুনঃ দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে; কেবল তা' নহে তীর্যককুল, প্রেতকুল, অসুরকুল, এমনকি ঘোরতর দুঃখপূর্ণ নরকে উৎপন্ন হয়ে থাকে; সেই জন্মগ্রহণের বিপদ হতে মুক্তি লাভের জন্য নির্বাণের অনুসন্ধান করা উচিত নয় কি? এসব কথাগুলো আমি খুবই বিশ্বাস করি । তোমরা বিশ্বাস কর, নাকি কর না তা' আমি বলতে পারব না । পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে এরূপ দেশনা প্রদান করার সময় কিছু সংখ্যক দায়ক ভন্তের চরণধূলি নিতে গেলে ভন্তে বলে উঠেন, এরা স্ত্রী-পুত্রে ভীষণ দুঃখ পাচ্ছে । অন্যদিকে সেই পরধর্ম, পরকাজ করতে করতে তাদের অমূল্য মানব জীবন নষ্ট হচ্ছে মাত্র । এবার পূজ্য ভন্তে গাথা সুরে বলেন-

দারা সুত নিয়ে হাসিয়ে খেলিয়ে,
 অমূল্য জীবন গেল,
 করিবার যাহা হল নারে তাহা,
 সকলি পড়িয়া র'ল ।
 অধম তাড়ন পতিত পাবন,
 জগৎ উদ্ধারকারী,
 পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
 এসো প্রভু দয়া করি ।

দায়ক-দায়িকাগণ এরূপে কতো দুঃখই না পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই । শুধুমাত্র

এ' দুঃখসমূহ বর্তমান জন্মে পাচ্ছে তাও নয়, ভবিষ্যত জন্মেও তাদের জন্য আরো অধিকতর দুঃখ অপেক্ষা করতেছে। তোমরা প্রব্রজিতরা মহৎ সুযোগ (প্রব্রজিত জীবন) লাভ করেছ, এই সুযোগে পুনর্জন্ম নিরোধ করে নির্বাণ লাভ করতে সচেষ্ট থাক।

পূজ্য বনভঙ্কে বলেন-ভগবান বুদ্ধের সময় জনৈক ভিক্ষু নারীর রূপে উৎকর্ষিত হয়ে ভগবানের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুকে নারীরা যে অতি দুঃখীলা, পাপপরায়াণা, অরক্ষণীয়া সে সম্বন্ধে একটা জাতক শুনানোর পর চারি আর্যসত্য ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষিত ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করতে সক্ষম হন। এটা কি জ্ঞান? ভগবান বুদ্ধ লৌহকে সোনা বানিয়ে ফেলেছেন। যেই ভিক্ষু কিনা প্রব্রজ্যা ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করছিল আর সেই ভিক্ষু মুহূর্তেই অরহত্ব লাভ করল। এটা কতো বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার নহে কি? অবশ্যই আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। দেখেছ তো ভগবান বুদ্ধের কিরূপ জ্ঞান! এবার বনভঙ্কে ভিক্ষুসম্মুখে বলেন, তোমরাও সোনা হয়ে যাও; লৌহ হয়ে পড়ে থাকবে না। লৌহ হলে মরিচায় ধরবে, কিন্তু সোনা হলে মরিচা ধরবে না। লৌহ হয়ে থাকা অর্থ অজ্ঞানতা চিন্তে অবস্থান করা। আর সোনা হয়ে যাওয়া অর্থ চিন্তা থেকে অজ্ঞানতা দূর করে দেওয়া। তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে সোনা হতে চাও তাহলে 'আমি পুরুষ', 'সে মহিলা' এ ধারণা পোষণ করা বন্ধ করতে হবে, মারকে দুঃখ বলে জানতে হবে, 'আমি পুরুষ', 'সে মহিলা' এধারণা পোষণে বিতৃষ্ণ এবং মারের প্রতি বিতৃষ্ণ হলে সোনা হওয়া যায়। চাকমা কথায়—"মিলে ম'স্তে, মানুষলোই হুগাহাগি হুলে মারবোলোই দুগ্ পা'পি হুলে; মুই মানুষ মিলে মরত্, মারবো লোই ন বারিম; ইত্তিবা দিলে মার্গফল হুই পারিবা। মানুষ লোই মিলে মরত্ ন-হাগেলে, মারবো দুগ্ হোই ন-বারিলে মার্গফল হুই ন-পারিবা"। অর্থাৎ 'আমি মানুষ', 'সে মহিলা', 'সে পুরুষ' এধারণা পোষণে বিতৃষ্ণ হয়ে, মারকে নিয়ে সুখ ভোগ করাকে দুঃখরূপে জেনে, 'আমি মানুষ', 'সে মহিলা' 'সে পুরুষ' এই ধারণা না করলে আর মারকে নিয়ে সুখ ভোগ না করলে, সেগুলো ইস্তফা দিলে মার্গফল লাভ হয়। অন্যদিকে 'আমি মানুষ', 'সে মহিলা', 'সে পুরুষ' এ ধারণা পোষণে বিতৃষ্ণ না হলে, মারকে নিয়ে সুখভোগ করাকে দুঃখরূপে না জানলে মার্গফল লাভ হয় না। তোমরা যদি 'আমি মানুষ', 'সে মহিলা', 'সে পুরুষ' এ ধারণা পরিত্যাগ কর, মারকে নিয়ে সুখভোগে বিরত থাক, তাহলে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। কিন্তু 'আমি মানুষ', 'সে মহিলা', 'সে পুরুষ' এই ধারণা যদি পরিত্যাগ না কর, মারকে নিয়ে সুখভোগে রত থাক, তাহলে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। পূজ্য ভঙ্কে ভিক্ষুসম্মুখের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, তাহলে বল তো কিরূপে নির্বাণ লাভ করতে

পারবে? “আমি মানুষ”, ‘সে মহিলা’, ‘সে পুরুষ’ এ সকল ধারণা পরিত্যাগ করে এবং মারকে নিয়ে সুখভোগ না করলে”। তোমরা সেই ধারণাসমূহ পোষণ না করে, মারকে নিয়ে সুখভোগ না করে নির্বাণ লাভ করতে সচেষ্ট থাক। আমার সাথে বলো “আমি মানুষ”, ‘সে মহিলা’, ‘সে পুরুষ’ এ ধারণা পোষণ করব না, মারকে নিয়ে সুখভোগ করা পরিত্যাগ করব। এতে আমরা নির্বাণ সুখ লাভে সক্ষম হবো। আর ‘আমি মানুষ’, ‘সে মহিলা’, ‘সে পুরুষ’ এ ধারণা পোষণ করলে; মারকে নিয়ে সুখভোগ করলে নির্বাণ লাভে সক্ষম হবো না”। এভাবে তোমরা সোনা হয়ে যাও তাহলে মরিচায় ধরতে পারবে না। সোনায় মরিচা ধরে কি? না ভুলে, সোনায় মরিচা ধরে না। কিন্তু সোনা হতে না পারলে লৌহ হয়ে পড়ে থাকলে মরিচায় ধরবে। তোমরা যদি লৌহ হয়ে পড়ে থাক, তাহলে মার তোমাদের দ্বারা বিবিধ অকুশলকর্ম সম্পাদন করাবে। সেই অকুশল কর্মসমূহ হল মরিচা। যে মরিচা তোমাদেরকে নির্বাণ লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তাই আবারো বলছি, তোমরা সবাই সোনা হয়ে যাও, লৌহ হয়ে পড়ে থাকবে না। তাহলে মরিচায় ধরতে পারবে না এবং নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে।

তোমরা অবিদ্যা নিরোধ, চিন্তা নিরোধ, গতি নিরোধ কর-যাতে তোমাদের সুখ লাভ হয়। অবিদ্যা নিরোধ না হলে দুঃখ, চিন্তা নিরোধ না হলে দুঃখ, গতি নিরোধ না হলে দুঃখ। পূজ্য ভগ্নে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-কি নিরোধ হলে তোমাদের সুখ লাভ হবে? অবিদ্যা নিরোধ, চিন্তা নিরোধ, গতি নিরোধ হয়ে গেলে আমাদের সুখ লাভ হবে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। অবিদ্যা নিরোধ, চিন্তা নিরোধ, গতি নিরোধ হয়ে গেলে তোমাদেরকে আর বিভিন্ন যোনিতে ঘুরে বেড়াতে হবে না, পুনর্জন্ম বন্ধ হয়ে যাবে। মনে রাখবে, অবিদ্যা নিরোধ, চিন্তা নিরোধ, গতি নিরোধই নির্বাণ। তাই তো বলি গতি নিরোধ হলে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করতে হয় না, চিন্তা নিরোধ হলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। নিরোধ অর্থ উৎপত্তি বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই নিরোধই সুখ। নিরোধ না হলে দুঃখ। গতি নিরোধ না হলে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করে দুঃখ পেতে হয়। চিন্তা নিরোধ না হলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে দুঃখ পেতে হয়। তোমরা গতি নিরোধ করতঃ বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করা বন্ধ কর, চিন্তা নিরোধ করতঃ পুনর্জন্ম গ্রহণ করা বন্ধ কর। এতে তোমাদের পরম সুখ নির্বাণ লাভ হবে। তোমরা আমার সঙ্গে বলো “পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে জ্ঞাত হবো; অবিদ্যা তৃষ্ণা সমুদয় আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে পরিহার করবো; নির্বাণ নিরোধ আর্যসত্য উচ্চতর জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করবো; শমথ-বিদর্শন মার্গসত্য উচ্চতর জ্ঞানে গঠন করবো”। তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। বনভগ্নে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলেন, তোমাদের কাজ কি জান? দুঃখসত্য জ্ঞাত হওয়া, সমুদয় সত্য ত্যাগ করা, নিরোধ সত্য প্রত্যক্ষ করা,

মার্গসত্য গঠন করাই হল তোমাদের কাজ। মার্গ বলতে এখানে ভব নদী বা ভবস্রোত উত্তরণের জন্য সেতু বা ব্রিজ। বর্তমানে তোমরা তো ভবের ঘাটে বসে রয়েছ, মাঝখানে ভব নদী আর ঐ কূলে হল লোকোত্তর ভূমি বা নির্বাণ। সেই লোকোত্তর ভূমিতে যেতে হলে ভব নদী পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু এই নদী অত্যন্ত খরস্রোতা, সাঁতার কেটে বা উজান বেয়ে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই নদীর ওপর দিয়ে সেতু তৈরি করতঃ সেই ভব নদী অতিক্রম করে অপর কূলে তথা লোকোত্তর ভূমিতে যেতে হবে তোমাদেরকে। সেই সেতুটি হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র ভবনদী উত্তরণের নিরাপদ রাস্তা। তোমরা সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সেতু দিয়ে ভবনদী পার হয়ে নির্বাণে চলে যাও। এ' আর্য মার্গের সেতু ছাড়া ভবনদী পার হওয়া যায় না। তাই বলা হয়েছে-‘আর্য মার্গ সেতু দিয়ে ভবপঙ্ক হয়েছে যে পার’।

পরিশেষে তিনি বলেন-‘নির্বাণ পরম সুখ’। নির্বাণ ব্যতীত অপর সবকিছুই দুঃখ বলে জানবে। এই সংসারের মধ্যে কেহ সুখ পেয়েছে এবং সুখ দেখেছে বললে তা’ পাগলের প্রলাপ বলা সদৃশ। সংসারে কামরাগ আলম্বনে কেহ প্রকৃত সুখ পায় না এবং পরিতৃপ্তও হয় না। তাই বলা হয়েছে-

দুঃখী বই সুখী নয়,

খুঁজিলে জগতময়;

সুখী হায় কাহাকেও

দেখিতে না পাই।

পঞ্চক্ক উদয়-বিলয়

সুখ গড়ে নাই।

তাই তোমরা ভবের এপারে (সংসারে) পড়ে না থেকে নির্বাণে যেতে সচেষ্ট থাক। ভবের এ'পারে কোন সুখ নেই, শুধুমাত্র দুঃখের হাহাকারে ভরা। ভবের ওপারে নির্বাণে যেতে পারলে তবেই চিত্ত সুখের অবগাহনে স্নাত হয়। তখন কোন দুঃখে স্পর্শ করার অবকাশ পায় না। ওপারে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন আর্য মার্গের সেতু নির্মাণ করা। এই আর্য মার্গের সেতু নির্মাণের কাজ কিন্তু অপরের দ্বারা করানো যায় না। নিজের সেতু নিজকেই নির্মাণ করতে হয়। নিজের সেতু নিজে নির্মাণ করে ভবের ওপারে যেতে হবে। অপরজনের নির্মিত সেতু দিয়ে ভবনদী অতিক্রম করা যায় না। নিজের সেতু নিজকেই নির্মাণ করতে হয়। তোমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় সেতু নির্মাণ করতঃ ভবনদী অতিক্রম করে নদীর ওপারে নির্বাণে চলে যাও; যাতে তোমাদের যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়, পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

প্রব্রজিতদের পক্ষে কাম্য সুখের প্রত্যাশা করা মহা অন্যায়া

অদ্য ৭ই জানুয়ারি ২০০২ সাল, ২৪শে পৌষ ১৪০৮ বাংলা, রোজ সোমবার। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আমরা ভিক্ষুসঙ্ঘের পক্ষ হতে পূজ্য বনভক্তের আয়ু সংস্কার বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানায়ে আমাদের মাঝে কল্পকাল পর্যন্ত সশরীরে অবস্থান করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি। উল্লেখ্য যে, প্রতি বৎসর ৮ই জানুয়ারি বনভক্তের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা পূজ্য বনভক্তের শিষ্যমণ্ডলী রাজবন বিহারে একত্রিত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শ্রাবকবৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহ্রবির (বনভক্তে) মহোদয়কে আয়ু সংস্কার বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করে থাকি। যাতে পূজ্য বনভক্তে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবনা বলে আয়ু সংস্কার বৃদ্ধি করতঃ কল্পকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে সশরীরে অবস্থান করেন। আয়ু সংস্কার প্রার্থনা করার জন্য সেই বিশেষ প্রার্থনা করার পর পূজ্যম্পদ বনভক্তে সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে এবারে বললেন—তোমরা তো প্রব্রজিত হয়েছ, নির্বাণ লাভ করতে পারবে কি? শুধুমাত্র মাথা মুগুন করে চীবর পরিধান করতঃ শ্রামণ, ভিক্ষু হলে তো চলবে না। বর্তমানে অনেক মেয়েও তো প্রব্রজিত হতে চাচ্ছে। কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আর নির্বাণ লাভে সমর্থ হওয়া এক কথা নয়। তোমরা কেন প্রব্রজিত হয়েছ? দুঃখ হতে মুক্ত হতে এবং পরম সুখ নির্বাণ লাভ করার উদ্দেশ্যে; নয় কি? অবশ্যই তাই। প্রব্রজিত হয়েও যদি দুঃখমুক্ত হতে না পার, নির্বাণ সুখ লাভ করতে না পার তাহলে দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে। আমাকে জনৈক ভিক্ষু বলেছিল ‘আমি দুঃখ পাচ্ছি। কেবলমাত্র সে একাই নয়, আরো অনেক ভিক্ষুও দুঃখ পাচ্ছি বলেছিল। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ভিক্ষুরা যদি “আমি দুঃখ পাচ্ছি” এমন বলে আক্ষেপ করে তাহলে তদ্বারা ভগবান বুদ্ধকে বদনাম, নিন্দা করা হয়। আচ্ছা, তোমরা ভিক্ষুরা সবাই যদি গৃহীদের সামনে বলতে থাক ‘আমরা ভিক্ষু হয়ে দুঃখ পাচ্ছি’ তখন গৃহীরা কি বলবে না তোমাদেরকে কেই বা বলেছে ভিক্ষু হতে? অবশ্যই বলবে। আর কথা উঠবে, ভগবান বুদ্ধ উপসম্পাদা প্রদান করতঃ তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করাচ্ছেন। অন্যদিকে ভিক্ষুরা যখন দুঃখের মধ্যে আছে সুতরাং গৃহীরা তাহলে সুখে রয়েছে এমনই বুঝায়। কাজেই প্রব্রজিত হয়ে তোমরা যদি ‘আমি দুঃখ পাচ্ছি’ বলে আক্ষেপ কর, তাহলে ভগবান বুদ্ধের উপর দোষ এসে বর্তাবে। পূজ্য বনভক্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন, তোমরা যদি দুঃখ পাচ্ছি বলে আক্ষেপ কর তাহলে কার উপর দোষ এসে বর্তাবে? ভক্তে, ভগবান বুদ্ধের উপর দোষ এসে বর্তাবে। কেন? কারণ ভগবান বুদ্ধই তো এ’ প্রব্রজিত জীবন-যাপনের প্রবর্তক। তাই বুদ্ধ বলেছেন, ভিক্ষুগণ তোমরা এমন আচরণ

করবে যাতে “হায়! দুঃখ পাচ্ছি” এই বলে ক্রন্দন করতে না হয়। তোমাদেরকেও এ’ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে আমি দুঃখ পাচ্ছি বলে ভগবান বুদ্ধকে বদনাম, নিন্দা করার কাজে নিয়োজিত হতে হবে। আর প্রব্রজ্যা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যাবে না।

বুদ্ধ বলেছেন, তোমরা সত্ত্ব আত্মা উচ্ছেদ করে দাও। কারণ সত্ত্ব, আত্মা দুঃখ, মিথ্যা এবং মরণশীল। সত্ত্ব, আত্মা ধারণায় অজ্ঞান, মিথ্যাদৃষ্টি উদয় হয়। স্থূল শরীর অথবা সূক্ষ্ম চিত্ত কোনটিতে আত্মার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অনিত্য জীবদেহে বা চিত্তে নিত্য সত্ত্ব, আত্মার উপস্থিতি মিথ্যা, ভ্রমাত্মক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। দেহে সত্ত্ব, আত্মা ধারণা উৎপাদন করতেঃ এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত, এটি আমার আত্মা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যা অনিত্য, ধ্বংসশীল তাতে নিত্য সত্ত্ব, আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে কি? পারে না। তাই সত্ত্ব, আত্মা ধারণা মহাভ্রান্ত, মিথ্যা, নিরর্থক-আর উহা দুঃখময়। সুতরাং আত্মা বলে কোথাও কিছু নেই। এই অনাত্ম তত্ত্বের জন্য ভগবান বুদ্ধ অন্য তীর্থিয়ের নিকট অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। তারা বুদ্ধের এ’ অনাত্ম তত্ত্বকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের নিকট এই অনাত্ম তত্ত্বটি অপ্রিয় সত্য হয়ে উঠেছিল। তারা বলে উঠেছিল, জীবের অভ্যন্তরে যেই সত্ত্ব, আত্মা রয়েছে সেই সত্ত্ব, আত্মাকে শ্রমণ গৌতম কেনই বা উচ্ছেদ সাধন করতে বলেন (শিক্ষা দেন)? সত্ত্ব, আত্মা ধারণা পোষণ করেই আমরা জীবন-যাপন করতেছি। সেই সত্ত্ব, আত্মাকে উচ্ছেদ সাধন করলে আমাদের অস্তিত্ব থাকলো কোথায়? এই জন্য বুদ্ধকে অপবাদ দিয়ে তারা বলে উঠল, গৌতম উচ্ছেদবাদী। সত্ত্ব, আত্মাকে উচ্ছেদ সাধন করতে চায়। ভগবান বুদ্ধ কেন সত্ত্ব, আত্মা উচ্ছেদ সাধন করতে বলেছেন জান? কারণ সত্ত্ব, আত্মা ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। সেই মিথ্যা ধারণা হতে শুধুমাত্র দুঃখ, পাপই সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের মতে আত্মা সত্য, ধ্রুব, অজর, অমর, অপরিবর্তনশীল ইত্যাদি রূপে স্বীকৃত। ইসলাম ধর্মের মতে মানুষের মৃত্যুর পর আত্মাটি কবরস্থানে থাকে। হিন্দু, খৃষ্টান ধর্মের মতেও মানুষের মৃত্যুরপর আত্মা শাস্তরূপেই থেকে যায়। বৌদ্ধধর্মের মতে আত্মা ধারণাটি মিথ্যা, ইহা কেবল মূর্খ বিশ্বাস মাত্র। তজ্জন্য সত্ত্ব, আত্মাকে ত্যাগ করলে তবেই বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। বনভন্তে বলেন, এই সত্ত্ব, আত্মা সম্বন্ধে আমি একটি মাত্র কথা বলছি শুন্; আনাপানস্মৃতি অনুশীলন কালে এরূপ উপলব্ধি হয় যে, একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের আশ্রয়েই কায়টি জীবিত রয়েছে। এদিকে ওদিকে গমনাগমন করতেছে। গমন, স্থিত, উপবেশন, শয়ন কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে জীবন বিপন্ন হয়, কায়টি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সংকোচন

প্রসারণ সবই বন্ধ হয়ে দেহটি কাঠখণ্ডবৎ পড়ে থাকে। তাই শ্বাস-প্রশ্বাস বাহিত এ' কায়ে আসলে কোন শাশ্বত সত্ত্ব, পুন্দ্রাল, স্ত্রী, পুরুষ আত্মা বা আত্মবৎ কিছুই নেই। এভাবে সত্ত্ব, আত্মা সংজ্ঞা তিরোহিত হয়ে যায়। এটাই হল জ্ঞান। এ' জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃত সুখ লাভ হয়। তোমরাও সকলে সেইরূপ জ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে ও জ্ঞানের সহিত প্রশ্বাস গ্রহণ করবে। জ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করলে জ্ঞান উদয় হয়, অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে যায়; পরম সুখ লাভ হয়। অজ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করলে অজ্ঞান উদয় হয়, জ্ঞান উদয় হতে পারে না। তাতে দুর্বিষহ দুঃখ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই বলছি, অজ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করলে তোমাদের কপাল পুড়বে বলে জানবে। কারণ তখন দুঃখভোগ করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর থাকবে না। বর্তমানের প্রায় ভিক্ষু অজ্ঞানতার সাথে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করে বলে তারা দুঃখের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হচ্ছে না। তোমাদেরকে আবারো সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা কখনো অজ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করবে না। জ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে এবং জ্ঞানের সহিত প্রশ্বাস গ্রহণ করবে। অজ্ঞানের সহিত (অর্থাৎ জ্ঞানরহিত অবস্থায়) নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করলে সেটা গরু, ছাগলের নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রশ্বাস গ্রহণ করার মত হয়। যেহেতু তির্যক প্রাণীদের সম্যক জ্ঞান নেই বিধায় অজ্ঞানের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করে থাকে।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-তোমরা অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে সমর্থ হলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারবে। একদা জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিল-ভগবান নির্বাণ কোথায়? বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, ব্রাহ্মণ! বাতাস আছে কি? ব্রাহ্মণ-হ্যাঁ ভগবান, আছে। বুদ্ধ-তাহলে, বাতাসকে দেখায়ে দিতে পারবে কি? ব্রাহ্মণ-‘ভন্তে! বাতাস আছে বটে, কিন্তু তা’ দেখায়ে দেওয়া সম্ভব নহে’। এবার বুদ্ধ বললেন-ব্রাহ্মণ! বিদ্যমান বাতাসকে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ নির্বাণকেও ‘এটি নির্বাণ’ বলে দেখায়ে দেয়া সম্ভব নয়। বনভন্তে বললেন, নির্বাণ সম্বন্ধে তোমাদেরকেও কেহ যদি সেইরূপ প্রশ্ন করে তাহলে বাতাসের উপমা সহকারে তাদেরকে বুঝিয়ে দিবে। বাতাস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাতাসকে যেমন প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ বিদ্যমান নির্বাণের স্বরূপও প্রদর্শন করা যায় না। নির্বাণের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নির্বাণ উপলব্ধি হয়। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করে বলেন, নির্বাণের জ্ঞান কি? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে, ‘আমরা রাজবন বিহারে আছি, খাগড়াছড়িতে আছি, পানছড়িতে আছি,

ভাইবোন ছড়ায় আছি' তাহলে জানবে তোমাদের নির্বাণের জ্ঞান অর্জন হয়নি। যাদের নির্বাণের জ্ঞান অর্জিত হয় তারা 'অমুক' জায়গায়, 'সমুক' জায়গায় আছি বা থাকব এরূপ কিছুই বিশ্বাস করেন না। নির্বাণের জ্ঞানের মধ্যে সেই রকম ধারণা থাকতে পারে না। আমি 'অমুক জায়গায় আছি', 'সমুক জায়গায় আছি' বললে সেটা অজ্ঞান বলে জানবে। কি বলছি বুঝতে পারলে তো? অবশ্য, এগুলো বুঝা সহজ কথা নয়। তাই তো বলি, বৌদ্ধধর্ম বুঝা এতো সহজ নয়; অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয়। যাদের সেই জ্ঞান থাকে কেবলমাত্র তারাই এ' ধর্ম বুঝতে সক্ষম হয়। অজ্ঞানী বা স্বল্প জ্ঞানীদের পক্ষে এ' ধর্ম বুঝা সম্ভব নয়।

প্রব্রজিতদের পক্ষে কাম্য সুখের প্রত্যাশা করা মহা অন্যায়। তোমরা যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছ, কাজেই কখনো সেই হীন সাংসারিক সুখ ভোগ করার চিন্তা করবে না। তোমরা নিশ্চয় জান, ভগবান বুদ্ধ স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য-ধন, অঙ্গ-জীবন সব কিছুই পরিত্যাগ করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেছিলেন। প্রব্রজ্যা জীবনের সার্থকতা সেই নির্বাণ লাভ করতে হলে তোমাদেরকেও যাবতীয় সাংসারিক সুখভোগ পরিত্যাগ করতে হবে। বনভক্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তোমরা প্রব্রজিত হয়ে লাভবান হয়েছ বলে মনে কর; নাকি ঠকেছ বলে মনে কর'? 'ভক্তে, আমরা প্রব্রজিত হয়ে লাভবান হয়েছি' বলেই বিশ্বাস করি। ই্যা, ঠিক বলেছ। প্রব্রজিত না হয়ে তোমরা যদি সাংসারিক সুখ ভোগের প্রত্যাশী হতে তাহলে অবশ্যই ঠকে যেতে। ত্যাগময় জীবনের অধিকারী এ' প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করে স্ত্রী-পুত্র, ধন, জায়গা-জমির অধিকারী হলে একদিন সবকিছু হারিয়ে ফেলতে হতো। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত, ধন, জায়গা-জমি হাতছাড়া হয়ে সর্বশূন্য, সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু এই ত্যাগময় প্রব্রজিত জীবনে সে সবার কিছুই হারাবার আশঙ্কা নেই। অন্যদিকে সাংসারিক জীবনে কত প্রকার দুঃখই না পোহাতে হয়, তার অন্ত নেই। তাই সাংসারিক জীবন হলো-দুঃখ পাবার, ঠকবার, পরিহানির দিকে সবেগে ধাবিত হবার রাস্তা। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ সাংসারিক জীবন-যাপন পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হওত নির্বাণ লাভের জন্য উৎসাহিত করতেন। এবার বনভক্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন, বুদ্ধের সেই উপদেশ গ্রহণ করলে ঠকতে হয় কি? না ভক্তে, ঠকতে হয় না। বুদ্ধের এই উপদেশ কি রকম জান? উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং জয়যুক্ত হবার উপদেশ। তোমাদের যাতে ঠকতে না হয়, পরিহানি না হয়, দুঃখ যাতে পেতে না হয় তজ্জন্য বুদ্ধের এই উপদেশ। মনে রাখবে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সাংসারিক জীবন-যাপন করলে ঠকতে হয়, বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়, পরিহানি বা অধঃপতনের দিকে যেতে হয়। তাই আমার সঙ্গে বলো "আমরা ঠকতে হয়, দুঃখ পেতে হয়, পরিহানি হয়, এমন কোন কাজ করব না। বরং যে কাজ করলে

আপন উন্নতি, আপন শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হয়, জয়যুক্ত হওয়া যায় সেই কাজই করব”। প্রব্রজিত হয়েও তোমাদের যদি সাংসারিক সুখ ভোগ করার ইচ্ছা থাকে এবং চিন্তের মধ্যে সেইরূপ চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে তাহলে তোমাদেরকে ঠকতে হবে, দুঃখ পেতে হবে, পরিহানির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে হবে। তাই সাবধান, কখনো সাংসারিক সুখ ভোগের চিন্তা করবে না। পরিশুদ্ধভাবে প্রব্রজিত জীবন রক্ষা করতঃ নির্বাণ লাভের প্রত্যাশী হও। এরূপ প্রব্রজিত জীবনে দুঃখ পাবার, ঠকবার, পরিহানি হবার কোন অবকাশ নেই। নির্বাণ লাভের প্রত্যাশী হয়ে প্রব্রজিত জীবন-যাপন করলে সর্বদা সুখ, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হয়েই থাকে।

তিনি বলেন-প্রব্রজিতদের আসল কর্তব্য কি জান? দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া এবং নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা। প্রব্রজিতগণ দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রচেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোন কর্মে নিয়োজিত থাকতে পারে না। দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের বাইরে অন্য কিছু করলে তা’ বাজে কাজ, বাজে আচরণ। বর্তমান সময়ে প্রব্রজিতরা প্রায় সবাই বাজে আচরণে নিয়োজিত রয়েছে। বাঙ্গাল হালিয়ায় জনৈক ভিক্ষু নাকি বিহারে হাঁস, মুরগী ও শুকর পালন করতেছে। বিহারকে সে প্রায় হাঁস, মুরগীর খামারে পরিণত করে ফেলেছে। বিহারের বেড়াই বেড়াই হাঁস, মুরগীর বাসা ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। সেই বাসাগুলোতে হাঁস, মুরগী ডিম পারতেছে, বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে। আর সেই ভিক্ষু ঐ সকল ডিম, মুরগী বিক্রি করে নিজের খাওয়া-দাওয়া সহ বিহারের যাবতীয় খরচাদি মেটায়। সেই ভিক্ষুর কার্যকলাপ শুনে উপস্থিত ভিক্ষুসম্মেলনের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। আবার, মাটিরান্নার কিছু ভিক্ষু শ্রামণও নাকি নিজেরাই কাঁধে করে আদা, হলুদ, বাঁশ ইত্যাদি বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে বাজার হতে তরি-তরকারী কিনে এনে রান্না করে খায়। এটাই হলো নাকি তাদের প্রব্রজিত জীবন। আচ্ছা, আমি যদি সেই ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করি ‘তোমরা কেন হাঁস, মুরগী পালন করতেছ, কেনই বা বাজারে গিয়ে আদা, হলুদ, বাঁশ বিক্রি করতেছ? তারা আমাকে কি উত্তর দেবে? হয়ত বলে উঠবে, দায়ক-দায়িকারা আমাদেরকে দান দেয় না বিধায় এরূপ করতে হচ্ছে। অনেক ভিক্ষুই সেরূপ বলে থাকে। খাগড়াছড়িতে জনৈক ভিক্ষু বলেছিল, আপনার পূর্বজন্মের পারমী আছে বলে আপনাকে সবাই দান দেয়। সুতরাং আপনি বিনা ক্রেশে বিনয়ানুকূলে থাকতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেলায় সেইরূপ পরিবেশ নেই। বনভন্তে বলেন, দায়ক দায়িকারা দান দেয় না বলে ভিক্ষুদিগকে দুঃশীলতা আচরণ করতে হচ্ছে এ কথা কি সত্যি? ভন্তে, একথা সঠিক নয়। ভিক্ষুরা যদি শীল পালন করে তবেই তো দায়ক-দায়িকারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দান করবে। কিন্তু

ভিক্ষুরা দুঃশীলতা আচরণ করলে দায়ক-দায়িকারা কোন শ্রদ্ধায় তাদেরকে দান করবে? কাজেই দান না দেওয়ার জন্য দায়ক-দায়িকাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং দায়ক-দায়িকাদের এ দান ধর্মে বিমুখতার জন্য ভিক্ষুরাই দায়ী। তাদের দুঃশীলতার কারণে গৃহীরা দান ধর্মে শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে না। ভিক্ষুরা যদি যথাযথভাবে শীল পালন করে তাহলে অবশ্যই দায়ক-দায়িকারা দান দিয়ে থাকে। গৃহীরা দান দিচ্ছে না বলেই ভিক্ষুরা শীল পালন করতে পারছে না এ কথা বলা যায় না। আসলে ভিক্ষুদের দুঃশীলতা আচরণ দেখেই গৃহীরা তাদেরকে দান দিতে চাচ্ছে না। এবার পূজ্য বনভন্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন, তোমাদেরও দান না দিলে তোমরা সেরূপ করবে কি? না ভন্তে। সেগুলো খুবই লজ্জাজনক কাজ। আমরা মরে গেলেও সেরূপ হীন কাজ করতে পারব না। সামনের সারিতে উপবিষ্ট (ফ্লোরে) ভদন্ত বোধিপাল মহাস্থবিরের দিকে দৃষ্টি ফিরায়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বোধিপাল, তোমাকে অন্য ভিক্ষুরা কেন মহালছড়ি এলাকায় ফাং-এ যেতে বারন করেছিল জান? তুমি সেখানে ফাং-এ গেলে তাদের ভাগ কমে যায়; তোমাকে কিছু অংশ দিতে হয়। তুমি না গেলে দানীয় বস্তুর পুরোভাগই তাদের হয়ে যায়। কাজেই, তোমাকে দেখলে তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চারণ হয়। ভিক্ষুদের এসব আচরণ সত্যিই অতিশয় হীন, লজ্জাজনক ব্যাপার বটে। অন্যদিকে, তুমিও কেন নির্লজ্জের মতন সেখানে যাও? দানীয় বস্তু লাভের আশায় নাকি? সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। বোধিপাল ভন্তে বললেন, ভন্তে! দানীয় বস্তু লাভের আশায় যাই তা ঠিক নয়। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি ‘আর যাবো না’। তখন বনভন্তে বললেন, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তোমরা সব সময় লজ্জাশীল হয়ে অবস্থান করবে। পুরাকালের অরহত্তেরা বলেছিলেন ভবিষ্যতে লজ্জী ভিক্ষুরাই বুদ্ধের শাসন রক্ষা করবে। তাই তোমরা যদি পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়ে অবস্থান করতে পার তবেই নিজকে সম্যকপথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হবে। আর ভগবান বুদ্ধের শাসনকালও সুরক্ষিত হবে। কিন্তু লজ্জাশূন্য হলে নিজের যেমন সর্বনাশ ডেকে আনবে তেমনি বুদ্ধের শাসনকেও পরিহানি, ধ্বংস করবে। সুতরাং কিছুতেই লজ্জাশূন্য হবে না; সব সময় লজ্জী হয়ে অবস্থান কর। বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-পুরাকালের অরহত্তগণের মতে ভবিষ্যতে কারাই বুদ্ধের শাসন রক্ষা করবে? ভন্তে! লজ্জী ভিক্ষুরা। হ্যাঁ, লজ্জী ভিক্ষুরাই বুদ্ধের শাসন রক্ষা করবে। লজ্জী ভিক্ষুরা সর্বদা সংযমতার সহিত অবস্থান করতঃ বুদ্ধের শাসনকে সুরক্ষা করতে সমর্থ হন। লজ্জাহীন ব্যক্তির পক্ষে বিবস্ত্র হওয়া যেমন অসম্ভব কিছু নয়, তেমনি পাপের প্রতি নির্লজ্জ ভিক্ষুদের পক্ষেও দুঃশীলতা আচরণ করা কোন ব্যাপারই নয়। তাই বলছি, তোমরা লজ্জাশীল হয়ে অবস্থান

করবে। লজ্জাশীল হয়ে অবস্থান করলে বুদ্ধের শাসন সুরক্ষিত হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-বৌদ্ধধর্মকে উজ্জ্বল করতে এবং দশবল বুদ্ধের শাসনকে এতদম্বলে (তথা সারা বিশ্বে) সুপ্রতিষ্ঠিত, রক্ষা সুনিশ্চিত করতে আমার প্রয়োজন সুদক্ষ, উচ্চ শিক্ষিত (ডক্টর ডিগ্রীধারী আশি জন এবং এম, এ পাশ দুই হাজার), বহু ভাষাবিদ চুরাশি হাজার ভিক্ষুসঙ্ঘ। তারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে জনসমক্ষে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের অমিয় বাণী প্রচার করবে। সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে, সেই সকল পুস্তকাদি বিনামূল্যে বিতরণ করতঃ বৌদ্ধধর্মের মহিমা, গৌরব গাথা তারা তুলে ধরবে; এবং সর্বত্র এ ধর্মের আলে কছটা ছড়িয়ে দেবে। আমি এইভাবে বৌদ্ধধর্মকে সুউজ্জ্বল করতে চাচ্ছি। মনে রাখবে, এভাবে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সুনিশ্চিত করতে না পারলে, আগামীতে এ ধর্মকে টিকিয়ে রাখা বড়োই কঠিন হবে। তোমরা সবাই সুদক্ষ হয়ে যাও। কিভাবে সুদক্ষ হবে জান? জ্ঞানবল, শ্রদ্ধাবলে বলীয়ান হতে পারলে। শ্রদ্ধা ও জ্ঞানবলে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই তোমাদের কাজ হচ্ছে নিজের চিন্তকে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ রেখে জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করতে সচেষ্ট থাকা। জ্ঞান ও শ্রদ্ধায় বলীয়ান না হয়ে কেবল ভিক্ষুর পোষাক পরিধান করতঃ আন্দাজের সহিত সঙ্ঘের সদস্য বলে দাবি করলে চলবে না। জ্ঞান দিয়ে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ যাচাই না করে ‘এটা’ ‘সেটা’ করলে কিছুতেই দুঃখমুক্তি লাভ হয় না। মনে রাখতে হবে, দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করাই হল ভিক্ষু-শ্রমণদের প্রকৃত কাজ। তোমরা অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করে কেবলমাত্র ‘কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারব? নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারব?’ সেই প্রচেষ্টায় রত থাক। দুঃখ থেকে মুক্ত হতে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে সুখভোগ পরিত্যাগ করতে হয়। সুখভোগ পরিত্যাগ ব্যতীত দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। কারণ সুখ করাই মার, ভোগ করাই মার। সুখ করাই পাপ, ভোগ করাই পাপ। চাকমা কথায় “তুমি যদি একুপ্ল্যা গরি সুখভোগ ন’ গড়, সালেন্ মারে তোমা সমারে ন পারিবো, তোমা ইদু ন’ থেব”। অর্থাৎ তোমরা যদি সুখভোগ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পার তাহলে মার তোমাদের নিকট পরাজিত হবেই। তোমাদের কাছে থাকতে পারবে না। অন্যদিকে তোমরা সুখভোগ করলে মার তোমাদেরকে সহজে পরাজিত করবে। এবং তার ইচ্ছামত তোমাদেরকে কুপথে পরিচালিত করতঃ পাপকর্ম সম্পাদনে বাধ্য করাবে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমরা সুখভোগ না করে থাকতে পারবে কি? হ্যাঁ ভন্তে, আমাদেরকে পারতে হবে। ভিক্ষুরা কেন গৃহী হয়ে যায় জান? স্বামী-স্ত্রী হয়ে সুখভোগ করার জন্য। যেই ভিক্ষু সুখভোগ পরিত্যাগ করে সে কিছুতেই গৃহী হতে পারে না। তবে সুখভোগ পরিত্যাগ করা

সহজ কথা নয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, সুখভোগ পরিত্যাগ করা কঠিন। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি সুখভোগ পরিত্যাগ করা যাবে না? অবশ্যই যাবে। কিভাবে? বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন—স্বল্প সুখ পরিত্যাগ হেতু যদি বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা যায় তবে জ্ঞানী ব্যক্তি স্বল্প সুখ অবশ্যই ত্যাগ করবে। লৌকিক সুখগুলো হল স্বল্প সুখ আর লোকোত্তর সুখ হল বিপুল সুখ। কাজেই তোমরা সংসারে সুখভোগ করার লৌকিক সুখকে পরিত্যাগ কর। তাতে বিপুল সুখের আকর লোকোত্তর সুখ লাভে সমর্থ হবে। তোমরা সবাই চালাক (পণ্ডিত) হয়ে যাও; ভুল (মূর্খ) হয়ে থাকবে না। যারা চালাক তারাই একমাত্র নির্বাণ লাভ করতে পারে। ভুলেরা কখনো নির্বাণ যেতে পারে না। নির্বাণ যেতে হলে চালাক হতে হয়, ভুল হলে চলবে না। সেই চালাক কি? চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে চালাক, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে চালাক। চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে চালাক হতে না পারলে নির্বাণ যেতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারে জীবন-যাপন করতে হবে। সংসার জীবন যাপনকারী স্বামী-স্ত্রীদিগকে আমি ‘ভুল-ভুলি’ বলে থাকি। স্বামীরা হল ভুলা আর স্ত্রীরা হল ভুলি। ‘ভুল লয় ভুলিরে, ভুলিয়ে লয় ভুলরে’ অর্থাৎ বেকুব বেকুবীকে বিয়ে করে আর বেকুবী বিয়ে করে বেকুবকে। কাজেই তোমরা চালাক হয়ে যাও; কখনো ভুলা হবে না।

তোমরা সবাই এরূপ শপথ গ্রহণ কর ‘আমরা বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ মত চালিত হয়ে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের চেষ্টায় অটল, অবিচল থাকব’। মনে রাখবে, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা, উপদেশে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যায় না। নির্বাণ লাভের জন্য শুধুমাত্র বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশই প্রতিপালনীয়। অন্য কোন শিক্ষা, উপদেশ নয়। পূজ্য বনভক্তে প্রশ্ন করে বলেন, তোমরা কার শিক্ষা, কার উপদেশ গ্রহণ করবে? ভক্তে! আমরা বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করব। তাহলে দুঃখমুক্তি লাভে সক্ষম হবে। বুদ্ধের সেই শিক্ষা, উপদেশসমূহ ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুরক্ষিত রয়েছে; বর্তমানে একমাত্র ত্রিপিটক শাস্ত্রের মাধ্যমেই আমরা বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশসমূহ পেয়ে থাকি। তাই আমি ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে সমর্থবান শিষ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেছি। যাতে করে ত্রিপিটক শাস্ত্র সকলের নিকট বোধগম্য হয়; সবাই পড়তে পারে। সকলে ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে পারবে। কি, এটা ভালো হবে তো? হ্যাঁ ভক্তে, খুবই ভালো হবে। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের বিরাট জাগরণ সৃষ্টি হবে, বুদ্ধের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, স্থিতি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

নির্বাণই একমাত্র সুখ। নির্বাণ ব্যতীত অপর সবকিছুই দুঃখ। তোমরা

মনুষ্যধর্ম না করে নির্বাণ বা লোকোত্তরধর্ম আচরণ কর। আমার সাথে বলো “আমরা মনুষ্যধর্ম করব না, লোকোত্তরধর্মই (গ্রহণ) করব। মনুষ্যধর্ম পাপ, দুঃখ; আর লোকোত্তরধর্ম সুখ, পুণ্য”। তোমরা সবাই মনুষ্য ধর্ম পরিহার করে লোকোত্তরধর্মই আচরণ কর। মনে রাখবে, জ্ঞান, সত্য ও কুশলের সহিত অবস্থান করলে পরম সুখ (নির্বাণ) লাভ করা সম্ভব। তাই তোমরা অজ্ঞানের সহিত অবস্থান না করে, জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। মিথ্যার সহিত অবস্থান না করে, সত্যের সহিত অবস্থান কর। সবাই একসাথে বলো “আমরা অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করব না, মিথ্যার সহিত অবস্থান করব না, অকুশলের সহিত অবস্থান করব না। জ্ঞান, সত্য, কুশলের সহিত অবস্থান করব। এতে আমাদের পরম সুখ লাভ হবে”।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদের সহিত অবস্থান করাই আমার অনুশাসন। তাই তোমাদেরকে অপ্রমাদের সহিত অবস্থান করতঃ কুশলধর্ম সম্পাদন করতে হবে। আর এরূপ প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, আমরা আর অকুশলকর্ম সম্পাদন করব না, কুশলধর্মই সম্পাদন করব; অকুশলকর্ম সম্পাদন করব না, কুশলকর্মই সম্পাদন করব। ইহাতে তোমাদের ইহকালও সুখের হবে, পরকালও সুখের হবে। যারা কুশলধর্ম, কুশলকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে আর্য বলা হয়। যারা অকুশলধর্ম, অকুশলকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে অনার্য বলা হয়। তোমরা আর্য হয়ে যাও; কখনো অনার্য হবে না। পূজ্য বনভক্তে প্রশ্ন করেন—তোমরা আর্য হবে, নাকি অনার্য হবে? ভক্তে, আমরা আর্য হবো। আর্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, পবিত্র বুঝায়। যারা আর্য তারা পবিত্র, আর যারা অনার্য তারা অপবিত্র। ‘তোমাদের মনচিন্ত্ত অনার্য না হয়ে আর্য হয়ে যাক’ আমি এটাই প্রত্যাশা করি। তাই আমার সাথে বলো “আমাদের মনচিন্ত্ত আর্য হয়ে যাক; অনার্য না হোক”। এতে তোমাদের ইহ-পর উভয় লোকই পরম সুখের হবে এবং নির্বাণ লাভেও সমর্থ হবে।

সামু, সামু, সামু।

ভিক্ষুদের প্রকৃত আবাসস্থল গভীর অরণ্যের গাছতলা বাঁশতলা

এক সময় পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-নির্বাণ যেতে হলে তোমাদেরকে সর্ব বিষয়ের প্রতি অনাসক্তভাব বজায় রাখতে হবে। আমি, আমার, আমিত্ব ত্যাগ করতে হবে। আমার মা আছে, বাবা আছে, ভাই আছে, বোন আছে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে, সম্পত্তি আছে, ঘর-বাড়ি, অর্থ-বিস্ত আছে এ সব বলা যাবে না। বরং মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই, ঘর-বাড়ি নেই, জায়গা-জমি নেই, সম্পত্তি নেই, অর্থ-বিস্ত কোন কিছু নেই বলে থাকতে হবে। এটাকেই বলে নির্বাণ (বা নির্বাণের চিন্ত)। প্রশ্ন আসতে পারে, নেই বলে থাকাটা কিরূপ সুখ? এটা জ্ঞানত (নির্বাণ) সুখ। নেই বলে থাকাটাই জ্ঞান এবং এতেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। আছে বলাটা অজ্ঞান ও দুঃখ। আমি নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে থাকাকালীন বড়ো বড়ো মহাস্থবিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম-ভিক্ষুদের প্রকৃত আবাসস্থল কোথায়? তারা বলেছিলেন-গভীর অরণ্যের গাছতলায়, বাঁশতলায়। 'তাহলে ভিক্ষুরা কেন এখানে অবস্থান করতেছে' প্রশ্ন করলে তারা বলেছিলেন, দায়ক-দায়িকারা এসব দিচ্ছে এবং থাকতে বলতেছে বলেই থাকছি। কাজেই তোমাদেরকেও বলছি, বর্তমানে তোমরা বিহারে থাকলেও একথা মনে রাখবে যে, গভীর অরণ্যের গাছতলা, বাঁশতলায় হল তোমাদের প্রকৃত আবাসস্থল। কিছুতেই এসব ভুলে যাবে না। পূজ্য ভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমাদের প্রকৃত আবাসস্থল কোথায়? ভন্তে, গভীর অরণ্যের গাছতলা, বাঁশতলা। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে গভীর অরণ্যের গাছতলায়, বাঁশতলায় ঝরা পাতা বিছায়ে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা তো বিন্দিং বিহারেই অবস্থান করতেছ। আবার বিন্দিং বিহারের ভেতর থেকেও মনচিন্তকে যদি গভীর অরণ্যের গাছতলা, বাঁশতলায় রাখতে পার তাহলে অসুবিধা নেই। অন্যদিকে, গভীর অরণ্যের গাছতলা, বাঁশতলায় অবস্থান করার পরও মনচিন্ত যদি বাইরের রং তামাশায় প্রমত্ত থাকে তাহলে অরণ্যে অবস্থানের সার্থকতা অর্জিত হয় না। কারণ মনচিন্তই আসল; দেহের ভূমিকা এখানে গৌণ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, তোমরা অরণ্যের মধ্যে অবস্থান করলেও তোমাদের মনচিন্ত বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে নয় কি? অবশ্যই পারে। যেমন ধর (একজন ভিক্ষু দেখায়ে দিয়ে) তুমি অরণ্যে অবস্থান করতেছ, অথচ তোমার মনচিন্তের মধ্যে সারাক্ষণ রাজামাটির (বা অন্য স্থানের) এক যুবতীর কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। তখন কি ভাবনা হবে? নাকি বৈরাগ্য সুখ হবে? কিছুই হবে না। বরং অরণ্যে

অবস্থান জনিত দুঃখই সার হবে মাত্র। তাই শুধুমাত্র অবস্থান করলে চলবে না, অনাসক্ত চিন্তেই অবস্থান করা চাই। আমি অরণ্যে অবস্থান করার সময় সবকিছুতে অনাসক্ত চিন্তে অবিচল ছিলাম। তোমাদেরকে বলছি, তোমরাও যেখানে (বিহারে কিংবা অরণ্য কুটিরে) অবস্থান কর না কেন সর্বদা অনাসক্ত চিন্তে অবস্থান করতে সচেষ্ট থাকবে। অনাসক্ত চিন্তে অবস্থান করার মাধ্যমে সুখ লাভ হয়। সেটা বিহারে হোক বা অরণ্যে হোক। অবশ্য একথা সঠিক যে, অনাসক্তভাবে অবস্থানের জন্য বিহার অপেক্ষা অরণ্যই সহায়ক স্থান।

আমাকে অনেকেই বলে থাকে-ভন্তে, একটু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করুন। অলৌকিক কিছু না হলে অধর্মবাদীদেরকে বুঝানো সম্ভব নয়। সেভাবে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অলৌকিক শক্তি দ্বারা সেরূপ কিছু করলে সেটা কি রকম হবে জান? কোন বলবান পুরুষ দুর্বল ব্যক্তিকে স্বীয় বল প্রদর্শন করনার্থে 'তোমাকে আছাড় মারব', 'তোমাকে শাস্তি দেবো', 'তোমাকে মেরে ফেলব' ইত্যাদি বলে ভয় দেখানোর ন্যায় হবে। উপরন্তু দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বা বল প্রয়োগ করার ন্যায় হবে। ভগবান বুদ্ধ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন না করতে বলেছেন। অধর্মবাদীদের অবস্থা দেখে মহাঋদ্ধিমান মৌদালায়ন স্থবিরও নাকি ভগবান বুদ্ধকে বলতেন, ভগবান আমাকে অনুমতি দিন এ' পৃথিবীকে (তথা পৃথিবীর মনুষ্যদিগকে) মহাসমুদ্রে ডুবিয়ে রাখি। কেনই তারা এত অকুশল পাপকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। একটু বুঝতে চেষ্টা করুক। তৎশ্রবণে ভগবান বুদ্ধ মৃদু হেঁসে বলতেন, পৃথিবীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখলে কেহ জীবিত থাকবে কি? আর তুমি কাকে ধর্মদেশনা করবে? অরহতের মুখে এরূপ উক্তি মানায় না। বনভন্তে বলেন, ষড়্ভাভিজ্জা অরহতগণ স্বীয় ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীকে মহাসমুদ্রে পরিণত করতে পারেন। একটি কমলালেবু হাতে নিয়ে খেলা করা মানুষের পক্ষে যেমন অসম্ভব ব্যাপার নয় তেমনি সমস্ত পৃথিবীকে হাতে ধরে ইচ্ছামত কিছু করাও অরহতগণের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এমন কি এক নিমিষেই পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধ্বংস করতে পারেন। মনে রাখবে, ষড়্ভাভিজ্জা অরহতগণের ঋদ্ধিশক্তির নিকট সর্বশক্তিই অসহায়। কোন ষড়্ভাভিজ্জা অরহতের ঋদ্ধিশক্তি পরীক্ষার্থে যদি বর্তমান পরাশক্তিধর আমেরিকা তার বোমারু বিমান দিয়ে বোমা বর্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতেও আসে সে এসব কোন কিছুই ফেলতে পারবে না। বরং সেই বোমারু বিমানগুলোকে আকাশেই থাক বললে সেখানে অচল অবস্থায় থাকতে হবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা না করবে এক ইঞ্চিও নড়তে পারবে না। অন্যদিকে, ষড়্ভাভিজ্জা অর্হৎ স্বীয় ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলে নিমিষেই আমেরিকার মত রাষ্ট্রকে ছাঁই করে দিতে পারবে। কিন্তু অর্হৎগণ তা' করেন না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-ভগবান বুদ্ধ বলেছেন নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু, হিংস্র জন্তু যতখানি ক্ষতি (অনিষ্ট) করবে, মিথ্যাপথে আকৃষ্ট চিত্ত মানুষের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করবে। অন্যদিকে, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার করবে, সত্যপথে নিবিষ্ট চিত্ত মানুষের ততোধিক উপকার মঙ্গল করবে। তাই তোমরা বাঘ, ভল্লুক, হাতি প্রভৃতি হিংস্র জন্তু জানোয়ারকে ভয় না করে, মিথ্যায় আকৃষ্ট চিত্তকে ভয় করবে। আমি যখন জঙ্গলে ছিলাম, কই তখন তো কোন বাঘ, ভল্লুক, হাতি, হিংস্র জন্তুই আমাকে ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। সবাই আমার সাথে বলো “নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু, হিংস্র জন্তু এরা কি অনিষ্ট করবে, কি ক্ষতি করবে, মিথ্যাপথে আকৃষ্ট চিত্ত তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট, ক্ষতিসাধন করবে”। মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ তারা যে উপকার করবে, সত্যপথে নিবিষ্ট চিত্ত তদপেক্ষা উপকার করবে। তোমাদের চিত্ত যদি সত্যপথে নিবিষ্ট থাকে তাহলে তোমাদের উপকার হবে, মঙ্গল হবে। আর চিত্ত যদি মিথ্যাপথে ধাবিত হয় তাহলে অনিষ্ট ক্ষতিসাধনই হবে বলে জানবে। তাই তোমাদের কাজ হল স্বীয় চিত্তকে নিরীক্ষণ করা; চিত্ত সত্যপথে যাচ্ছে, নাকি মিথ্যাপথে যাচ্ছে? চিত্ত মিথ্যাপথে গেলে সেটাকে সত্যপথে ফিরিয়ে আন। মনে রাখবে, চিত্ত সত্যপথে গেলে পরম উপকার, মঙ্গল, সুখ; কিন্তু মিথ্যাপথে গেলে মহাক্ষতি, অনিষ্ট। চিত্ত যদি সত্যপথে চলে, তবে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারে। আর মিথ্যাপথে গেলে ঘটে তার চরম অধঃপতন। তজ্জন্য বলা হয়েছে, সত্যগামী মনের ন্যায় বন্ধু নেই, মিথ্যাগামী মনের ন্যায় শত্রু নেই। এভাবেই মনচিন্তা তোমাদের বন্ধুও হতে পারে, শত্রুও হতে পারে। চিত্ত সত্যপথে গেলে বন্ধু, মিথ্যাপথে গেলে শত্রু। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসম্মকে প্রশ্ন করে বলেন, তোমাদের চিত্ত সত্যপথে যাচ্ছে, নাকি মিথ্যাপথে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে অবগত রয়েছ কি? ভন্তে, কখনো অবগত হতে পারি, কখনো পারি না। সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত হবার জন্য তোমাদেরকে ধ্যান করতঃ জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে হবে। এক কথায় ধ্যান করতে হবে, জ্ঞান করতে হবে। জ্ঞান ও ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে চিত্তকে জানতে হয়। সারা রাত্রি না ঘুমিয়ে তোমরা জ্ঞান ও ধ্যানানুশীলন কর, তাহলে তোমাদের মনচিন্তা কি করে? কোথায় ঘুরে বেড়ায়? কি আলমনে অবস্থান করে? সবকিছুই জানতে পারবে। জ্ঞান ও ধ্যানানুশীলন ব্যতিরেকে মনচিন্তাকে জানা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষ সহজে নিজের মনচিন্তাকে জানতে পারে না। মনে রাখবে, মানুষের (সত্ত্বগণের) মনচিন্তাই প্রধান। মন হতেই সব উৎপাদিত হয়। মনের দ্বারাই শরীর (দেহ) পরিচালিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেহকে কার্য-বাক্য সম্পাদন করতে দেখা যায় বটে, কিন্তু আসলে মনই দেহকে চালিত করে কথা বলায়, কাজ করায়। যদিও বলা

হয় সে পাপকর্ম সম্পাদন করতেছে। প্রকৃতপক্ষে অমুক ব্যক্তি নয়, তার মনই পাপকর্ম সম্পাদন করতেছে। সমুক ব্যক্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেছে। প্রকৃতপক্ষে সমুক ব্যক্তি নয়, তার মনই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেছে। সবকিছুই নির্ভর করে চিত্তের উপর। পূজ্য বনভক্তে পলিখিনের একটি ব্যাগ দেখায়ে দিয়ে বলেন-দেখ, ঐ পলিখিন ব্যাগটি বাতাসে উড়তেছে; এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, বল তো দেখি, সত্যিই কি পলিখিনের ব্যাগটি নিজে নিজে উড়ে যাচ্ছে? নাকি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? বাতাসেই নিয়ে যাচ্ছে। এটাই প্রকৃত সত্য কথা। বাতাসে নিয়ে যাচ্ছে বলে ব্যাগটি যাচ্ছে; নতুবা এক স্থান হতে অন্য স্থানে উড়ে যাবার মত ব্যাগটির কোন শক্তি, সামর্থ্য নেই। এখানেও ঠিক তদ্রূপ দেহ পলিখিন ব্যাগ আর মন হল বাতাস। মনই দেহকে কর্ম-বাক্য সম্পাদনে নিয়োজিত করতেছে। মন হচ্ছে সব কিছুর উৎপত্তির উৎস। দেহ সম্পূর্ণ মনের উপর নির্ভরশীল। তোমরা সবাই স্বীয় মনচিন্তা সম্বন্ধে সম্যক অবগত থাক। তোমাদের চিন্তা সত্যপথে যাচ্ছে, নাকি মিথ্যাপথে যাচ্ছে সে বিষয়ে আত্মপরীক্ষক হয়ে অবস্থান কর। আর যদি দেখ যে, মনচিন্তা মিথ্যাপথে ধাবিত হচ্ছে, তখন সে মিথ্যাপথগামী চিন্তাকে তৎক্ষণাৎ সম্যকপথে ফিরায়ে আনবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ারী করে দিবে 'হে মন! খবরদার কখনো মিথ্যাপথে যাবে না। মনচিন্তা মুক্ত হতে না পারলে মিথ্যাপথে ধাবিত হয়ে নানা কর্ম, নানা বাক্য সম্পাদন করতঃ নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। কিসের হতে মুক্ত? আসব হতে মুক্ত। মনচিন্তা আসব থেকে মুক্ত হতে না পারলে নানা স্থানে ঘুরাঘুরি করতে থাকে। তজ্জন্য বুদ্ধ বলেছেন-

আসবের ক্ষয়কাল না হয় যতদিন,

এসব বিশ্বাস ভিক্ষু করিও না ততদিন।

আসব ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত কোন ভিক্ষু-শ্রামণই (সম্পূর্ণরূপে) বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারে না। কারণ আসব ক্ষয় না হলে চিন্তা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না, তথা দুঃখের মধ্যে থাকে। আর তখন নানা কর্ম, নানা বাক্য সম্পাদন করতঃ একত্রিশ প্রকার লোকভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক যেমন রকেটের মতন। রকেট নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায় নয় কি? হ্যাঁ, ভাস্তে বেড়ায়। তেমনিভাবে চিন্তাও যদি আসব থেকে মুক্ত হতে না পারে তাহলে কখনো দেবতা, কখনো মনুষ্য, কখনো ভূত-প্রেত-পিশাচ, কখনো বা কুকুর, গরু, ছাগল, পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ ঘুরে বেড়ায়।

তিনি আবারো বলেন-তোমরা যদি ঠিকভাবে বুঝতে পার, তাহলে এখানে (প্রব্রজিত অবস্থায়) থাকতে পারবে। সেই ঠিকভাবে বুঝতে পারাটা কি? চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বুঝতে পারলে আর কোন কিছু বুঝার

প্রয়োজন হয় না। তাই যারা চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদনীতিকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে অন্য কিছু বুঝার দরকার নেই। কারণ তারা প্রকৃত সত্যকে বুঝে ফেলেছে। তাদের নিকট কোন প্রকার মিথ্যা থাকতে পারে না। তারা সংসার দুঃখকে অতিক্রম করে নির্বাণ সুখের সাগরে পতিত হয়। তাদেরকে আমি বলি-“ঠিক বুঝেছে, ঠিক বুঝেছে আর বুঝতে হবে না”। দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য, মার্গ সত্য-এ’ চারি আর্যসত্য বুঝতে পারলে নির্বাণ লাভ হয়। আবার, কেহ যদি বলে চারি আর্য সত্যের মধ্যে কেবল দুঃখসত্য বুঝেছি, অপর তিন সত্য বুঝিনি তা’ মিথ্যাদৃষ্টি; দুঃখ সত্য-সমুদয় সত্য এ’দুই সত্য বুঝেছি, অপর দুই সত্য বুঝিনি তা’ মিথ্যাদৃষ্টি; দুঃখ সত্য-সমুদয় সত্য-নিরোধ সত্য এ’তিন সত্য বুঝেছি, অপর এক সত্য বুঝিনি তাও মিথ্যাদৃষ্টি। চারি আর্যসত্যকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে না পারলে মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয় না। বলা বাহুল্য, চারি আর্যসত্যকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে না পারা পর্যন্ত সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে না। যিনি চারি আর্যসত্যকে বুঝতে পারেন তার চিরতরে চারি অপায় বন্ধ হয়ে যায়।

ধর্ম তিন প্রকারে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। কি কি? মার্গ, ফল, নির্বাণ। যেই ধর্মে মার্গ নেই, ফল নেই, নির্বাণ নেই সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে মার্গ আছে, ফল আছে, নির্বাণ আছে। তোমরা সেই মার্গ, ফল, নির্বাণ ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। কিভাবে করবে? চারি মার্গ, চারি ফলযুক্ত আর্য পুঙ্খল হয়ে। স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অরহত, মার্গস্থ, ফলস্থ ভেদে চারি মার্গ, চারি ফলযুক্ত অষ্ট আর্য পুঙ্খল। যদি তোমরা (ভিক্ষুসঙ্ঘ) সবাই অনাগামী, অরহত এবং দায়ক-দায়িকারা স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী হতে পারতো তাহলে কারো আর অকুশল পাপ হতে পারত না। ‘আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি’ বলে অকুশল চিরতরে বিদায় নিতো। ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন তেমনই হয়েছিল। তোমরা আমার সাথে বলো “আমরা শ্রেষ্ঠধর্ম আচরণ করব, উত্তমধর্ম সম্পাদন করব। যেই ধর্মে মার্গ নেই, ফল নেই, নির্বাণ নেই সেই ধর্ম দুঃখ এবং পাপধর্ম বলেই জানবে। আমরা সে ধর্ম করব না। নব লোকোত্তরধর্মই করব”। ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মই নব লোকোত্তরধর্ম। স্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অরহত, মার্গস্থ, ফলস্থ আর নির্বাণ-এই নয়টি হলো নব লোকোত্তরধর্ম। নব লোকোত্তরধর্মই প্রকৃত সুখ। পূজ্য ভগ্নে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-ভগবান বুদ্ধ কি ধর্ম প্রচার করেছেন? নবলোকোত্তর ধর্ম। তাই বলা হয়েছে-

সম্যক সম্বুদ্ধ যিনি গুণের ভাণ্ডার,
মুক্তির সঠিক পথ করিল প্রচার।
ঠিক যে প্রণালী যথা হইল বর্ণন,

আর্যগণ যেই পথে করেছে গমন ।
 আর্যনীতি আচরণে স্থির যেবা রয়,
 ইহ-পরকাল তার তিনি শান্তি সুখ হয় ।
 স্মৃতি বিদর্শনে যিনি স্থির বীর্য হন,
 সম্ভবে সপ্তম দিনে নির্বাণ দর্শন ।

পরিশেষে তিনি বলেন—আত্ম উৎকর্ষ সাধনার চরম লক্ষ্য। আত্ম উৎকর্ষ শব্দের অর্থ আপন উন্নতি, আপন শ্রেষ্ঠত্ব, স্বকীয় উৎকৃষ্টতা। অর্থাৎ আমি কিভাবে উন্নতি করব, শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উন্নীত হবো, উৎকৃষ্ট লাভে সক্ষম হবো সেই ব্যাপারে সদা তৎপর হয়ে অবস্থান করা। তোমরাও সবাই সেই রকম উন্নতি, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকৃষ্টতা লাভের দিক নির্দেশনা মনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। তাহলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে। সর্বদা উচ্চমনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে তৎপর থাক। কখনো হীনমনা হবে না, নিম্ন আকাঙ্ক্ষা করবে না, হীন জ্ঞানের চর্চা করবে না। মনে রাখবে, উচ্চমনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে পারলে আপন উন্নতি, আপন শ্রেষ্ঠত্ব, স্বকীয় উৎকৃষ্টতা সাধনে সমর্থ হবে। আমার সাথে বলো “আমরা উচ্চমনা হবো, উচ্চাকাঙ্ক্ষা করবো, উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করবো, উচ্চতর সাধনা করবো। কখনো হীনমনা হবো না, নিম্ন আকাঙ্ক্ষা করব না, হীন জ্ঞানের চর্চা করব না, নিম্নস্তরের সাধনা করব না”। তাহলে অবশ্যই তোমাদের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

আচ্ছা, ব্যাঙ পাল্লায় তোলে মাপা যায় কি

এক সময় পূজ্য বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদেরকে আমি বুঝাতে পারছি কি? ভন্তে অবশ্যই পারছেন। কই? অনেকেই তো প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। তারা আমার কথা বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারলে কি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে চলে যেতো? অবশ্যই যেতো না। বুঝতে পারলে কেহ প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতে পারত না। আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করাটা কি রকম হচ্ছে জান? (দাঁড়ি) পাল্লায় তোলে ব্যাঙ মাপার ন্যায় হচ্ছে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘ হো হো করে হেসে উঠলেন। বনভন্তে বললেন এখন বল তো তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করাটা কি রকম হচ্ছে? ভন্তে, পাল্লায় তুলে ব্যাঙ মাপার ন্যায় হচ্ছে। হ্যাঁ, সে রকমই হচ্ছে। আচ্ছা, ব্যাঙ পাল্লায় তোলে মাপা যায় কি? ভন্তে, যায় না। একটা ব্যাঙ পাল্লায় তুলতে গেলে অন্যটা লাফ মেরে নেমে যাবে। সেটাকে ধরে এনে পাল্লায় তুলতে যেতেই অন্যটা লাফ মেরে নেমে যাবে। এভাবে একটা ব্যাঙ পাল্লায় তুলতে অন্য আরো একটা ব্যাঙ লাফ মেরে নেমে যায়। কখনো মাপা যায় না। তাহলে কি ব্যাঙ মাপার কোন উপায় নেই? উপায় একটা আছে। সে উপায় কি? চাকমা কথায়—“জাল হোল্লোত ভরেনেই মাবা পরিব”। অর্থাৎ সূতায় তৈরি ঝোলাতে ঢুকিয়ে মাপতে হবে। প্রথমে ব্যাঙগুলো কোন ঝোলাতে বা পলিখিন ব্যাগে ঢুকিয়ে নিতে হবে, তারপর সেই পুটুলী পাল্লায় তোলে মাপতে হবে। তা না হলে খোলা অবস্থায় কিছুতেই পাল্লায় তোলে ব্যাঙ মাপা সম্ভব নয়। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—ঝোলাতে বা পলিখিন ব্যাগে ঢুকিয়ে পাল্লায় তোলে মাপলে ব্যাঙগুলো লাফ মেরে নেমে যেতে পারবে কি? ভন্তে, যেতে পারবে না। কারণ ব্যাগের ভেতর হতে লাফ মেরে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। এটাই হল, পাল্লায় তোলে ব্যাঙ মাপার উপায়। আমি বর্তমানে তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি, সেটা খোলা অবস্থায় পাল্লাতে ব্যাঙ তোলে মাপার ন্যায় হচ্ছে। একদিকে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আর অন্যদিকে তোমরা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বনভন্তে প্রশ্ন করে বলেন—এটা কি খোলা অবস্থায় পাল্লাতে ব্যাঙ তোলে মাপার ন্যায় হচ্ছে না? ভন্তে, অনেক ক্ষেত্রে তা’ হচ্ছে। সে রকম হলে তো তোমাদেরকে মাপা সম্ভব হবে না। তাহলে কি তোমাদেরকেও ঝোলাতে ঢুকিয়ে মাপতে হবে? হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তোমাদের জন্য কি রকম ঝোলা দরকার জান? স্রোতাপত্তি, সক্দাগামী, অনাগামী, অরহত। এই স্রোতাপত্তি, সক্দাগামী, অনাগামী, অরহত ঝোলাগুলোতে ঢুকাতে পারলে তোমরা আর প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে চলে যেতে

পারবে না। তখন তোমাদেরকে পাল্লায় তোলে মাপতে পারব।

স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসারী জীবন-যাপন করাকে আমি কি বলি জান? চাকমা কথায়—“চেই” ভিদিরে তাঘেই মাছ ফালাই পারা”। অর্থাৎ চেই (মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ)-এর ভেতর শোল মাছের লাফালাফি করা। চেই আবদ্ধ শোল মাছ যতোই লাফালাফি করুক না কেন কিছুতেই চেই হতে বেরিয়ে আসতে পারে না। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-চেই আবদ্ধ শোল মাছ বেরিয়ে আসতে পারে কি? ভন্তে, পারে না। কারণ চেই এমন করে বানানো হয় যে, প্রথমে ভেতরে ঢুকা যায় বটে, কিন্তু ঢুকানোর পর আর বেরিয়ে আসা যায় না। বনভন্তে মহোদয় জ্যোতিসার ভিক্ষুকে দেখায়ে দিয়ে বলেন-তুমিও তো চেই-এর ভেতর ঢুকেছিলে। হ্যাঁ ভন্তে, আপনি আমাকে চেই হতে মুক্ত করেছেন। তা না হলে আমাকে এখনো চেই আবদ্ধ শোল মাছের মত লাফালাফি করতে হতো। বনভন্তে জ্যোতিসারকে বলেন তুমি আমার সাথে সাথে বলো “আগে চেই-এ ঢুকে পড়েছিলাম এবং চেই আবদ্ধ শোল মাছের মত অনেক লাফা লাফি করেছিলাম; মুক্ত হতে পারিনি। বর্তমানে বনভন্তের সাহায্যে চেই হতে বেরিয়ে এসেছি। তবে চেই হতে বেরিয়ে আসতে মাথায় এবং শরীরে অনেক ক্ষত হয়েছে। এখনো সেগুলো চিকিৎসা করতেছি”। এবার বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, সাবধান। কখনো চেই-এর ভেতরে ঢুকতে যাবে না; সর্বদা চেই হতে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে। চাকমা মেয়ে, মারমা মেয়ে, বড়ুয়া মেয়ে তথা সব মেয়েরাই হল চেই। কাজেই চেই হতে সাবধান। যাতে চেই-এর ভেতর ঢুকতে না হয় তজ্জন্য সব সময় সজাগ থাকবে। কি করলে চেই-এর ভেতর ঢুকা যায় জান? চাকমা কথায় “মিলেরে গম পেলো, কোচ্ পেলো, দোল দেলো, মনত পরিলে চেই” ভিদিরে সমিলা”। অর্থাৎ কোন মেয়েকে দেখে যদি ভালো লাগে, তাকে ভালোবাসো, সুন্দরী এবং মনোপুত হয়, তাহলে জানবে তোমরা চেই-এর ভেতর ঢুকতেছ। সেইরূপ অবস্থা হলে চেই-এ ঢুকে পড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়; অন্য গতান্তর থাকে না। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-কিরূপ আচরণ করলে চেই-এর ভেতর ঢুকতে হয়? ভিক্ষুসঙ্ঘ-কোন মেয়েকে দেখে যদি তাকে ভালো লাগে, তার সাথে ভালোবাসা ভাব জন্মায়, তাকে সুন্দরী এবং মনোপুত হলে। হ্যাঁ, এভাবেই ভিক্ষু চেই-এর ভেতর ঢুকে পড়তেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে সংসারী হতে হচ্ছে। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বলেন-তোমাদের কেহই কি চেই-এর ভেতর ঢুকতে চাও? ঢুকতে চাই না বলেই তো আপনার সান্নিধ্যে এসেছি-ভন্তে। তাহলে তোমরা চেই-এর বাইরে আছো তো? হ্যাঁ ভন্তে, আমরা চেই-এর বাইরে আছি; ভেতরে ঢুকিনি। চেই-এর বাইরে থাকলে ঠিক আছে।

চেই-এর বাইরে থাকলে নির্বাণ যেতে পারবে। তবে তোমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মার তোমাদেরকে চেই-এ আবদ্ধ করতে সচেষ্ট রয়েছে। ভুলবশতঃ একবার যদি মার কর্তৃক পেঁতে রাখা চেই-এ ঢুকে পড়, তাহলে আর কিছুতেই মুক্ত হতে পারবে না। তখন চেই আবদ্ধ শোল মাছের দশায় পড়তে হবে। চেই আবদ্ধ শোল মাছ শত সহস্র বার লাফালাফি করলেও চেই হতে বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং খবরদার। তোমরা চেই-এর ধারে কাছেও যাবে না।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে আরো বলেন-প্রব্রজিতদিগকে অবশ্যই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করতে হবে। প্রব্রজিতগণ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যতীত অন্য মার্গে চালিত হতে পারে না। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র সুমার্গ। অপর সকল কুমার্গ। তোমাদের মনচিন্তে যদি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ থাকে অর্থাৎ তোমরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে চালিত হও, তাহলে সুখ লাভ হবে, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর যদি তোমাদের মনচিন্তে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ না থাকে তাহলে দুঃখ পাবে, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল মুক্তির পথ। এই পথ অবলম্বনে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমার সাথে সাথে সবাই বলো “আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল দুঃখমুক্তির পথ। আর নির্বাণ হল মুক্ত বা মুক্তির অবস্থা।” ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত এ’ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে অনেক দেবতা, ব্রহ্মা, মানুষ দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তোমরাও বলো “আমরা বুদ্ধের সেই শিক্ষা, উপদেশ মত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করব”। বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে সবাই নির্বাণ সুখ উপভোগ করা। অজ্ঞানী ব্যক্তির কি করলে সুখ হবে তা’ বলতে পারে না। জনৈক (বড়ুয়া) ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করে বনভন্তে বলেন, সে নাকি কখনো ভিক্ষু হয়, আর কখনো প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহী হয়ে যায়। শেষমেশ তার স্বামীরী ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলে ‘তুমি এ’ সব করতেছ কি? ভিক্ষু হয়ে থাকার ইচ্ছা হলে ভিক্ষু হয়েই থাক, আর গৃহী হবার ইচ্ছা হলে গৃহী হয়েই থাক। কেন কখনো ভিক্ষু, কখনো গৃহী হয়ে ইচ্ছামত আচরণ করতেছ? এমন তো হতে পারে না’। বনভন্তে বলেন-সেই ভিক্ষুটি কেন সে রকম করতেছে জান? সে কি হলে সুখ হবে তা’ বুঝতে পারতেছে না। গৃহী অবস্থায় ভিক্ষু হওয়াকে সুখ দেখে, আর ভিক্ষু হলে গৃহী অবস্থাকে সুখ দেখে। তাই কখনো ভিক্ষু, কখনো গৃহী হয়ে যায়। মোটকথা, সে ভিক্ষু হলেও দুঃখ পায় এবং গৃহী হলেও দুঃখ পায়। কারণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে ভিক্ষু হলেও দুঃখ, গৃহী হলেও দুঃখ। সে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে বলে ভিক্ষু হয়ে গেলেও দুঃখ পাচ্ছে এবং গৃহী হয়ে গেলেও দুঃখ পাচ্ছে। আর দুঃখেই সে কখনো ভিক্ষু,

কখনো গৃহী হয়ে থাকে। নির্বাণ যেতে হলে তোমাদেরকে সুখভোগ পরিত্যাগ করতে হবে। সুখভোগ করলে নির্বাণ যেতে পারে না। সুখ করলে মার, ভোগ করলে মার, পুনর্জন্ম হলে মার, ধর্ম করলে মার, কর্ম করলে মার। তাই চিন্তের মধ্যে সুখ-ভোগ-পুনর্জন্ম-ধর্ম-কর্ম থাকলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। নির্বাণে (নির্বাণ চিন্তে) ধর্ম নেই, কর্ম নেই, পুনর্জন্ম নেই, সুখভোগ করাও নেই। আমার সাথে বলো “সুখ করলে মার, ভোগ করলে মার, পুনর্জন্ম হলে মার, ধর্ম করলে মার, কর্ম করলে মার। কাজেই আমরা সুখ করব না, ভোগ করব না, পুনর্জন্ম হবো না, ধর্ম করব না, কর্ম করব না”। আমি তোমাদেরকে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের উপায়সমূহ বলে দিলাম; এখন নির্বাণ লাভ করতে পারা না পারাটা তোমাদের ব্যাপার। আমাকে কিছ্র কেহই এভাবে বলে দিতে পারেনি।

তোমরা কামনা বাসনা জয় করতে তত্পর থাক। কামনা বাসনার অপর নাম হল তৃষ্ণা। বুদ্ধ বলেছেন, কামনা বাসনা বিজয়ী জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যধর্মের সন্ধান পেয়ে পরের বৃথা কথায় কর্ণপাত না করে আপন মনে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন। মনচিন্তের মধ্যে কামনা বাসনা বিদ্যমান থাকলে চিত্ত অধীন হয়ে থাকে। আর সেই অধীন চিত্তে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। চিত্ত কার কার অধীন হয়ে থাকে? অবিদ্যার অধীন, তৃষ্ণার অধীন, উপাদানের অধীন, ধর্মের অধীন, কর্মের অধীন হয়ে থাকে। বুদ্ধ বলেছেন, মনচিত্ত সে সবার অধীন হয়ে থাকলে দুঃখ পেতে হয়। তোমরা অবিদ্যা মুক্ত, তৃষ্ণা মুক্ত, উপাদান মুক্ত, ধর্ম মুক্ত ও কর্ম মুক্ত হয়ে অবস্থান কর। মনে রাখবে, অবিদ্যা মুক্তই সুখ, তৃষ্ণা মুক্তই সুখ, উপাদান মুক্তই সুখ, ধর্ম মুক্তই সুখ, কর্ম মুক্তই সুখ। তাই বলছি-তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ধর্ম, কর্ম মুক্ত হয়ে অবস্থান কর। এ’ সবার অধীন হয়ে থাকবে না; স্বাধীন হয়ে যাও। কি স্বাধীন? অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ধর্ম, কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়া। তাহলে যাবতীয় দুঃখের অতীত হয়ে অবস্থান করতে পারবে। এটাকেই বলে নির্বাণ।

তিনি বলেন-তোমরা নিজেকে পাপ হতে উদ্ধার কর, নিজেকে দমন কর, নিজেকে জয় কর। যদি করতে পার তাহলে অবশ্যই সুখ লাভ হবে। তোমাদের কাজ হল নিজেকে পাপ হতে উদ্ধার করা, নিজেকে দমন করা এবং নিজেকে জয় করা। কিভাবে তা’ করবে? মনচিন্তের মধ্যে পাপ চেতনার স্থান না দিয়ে বা মনে মনে পাপকে নিয়ে সুখ করার চিন্তা না করলে নিজেকে পাপ হতে উদ্ধার করা যায়। নিজেকে দমন করা অর্থ অবাধ্য ইন্দ্রিয় সকলকে বাধ্য বা দমন করা। নিজেকে জয় করা শব্দের অর্থ হল অহংভাব পোষণ করাটাকে জয় করা। এ’ জয়ের মাধ্যমে মারকেও জয় করা যায়। নিজেকে পাপ হতে উদ্ধার, দমন, জয় করতে পারলে অর্হত্ব লাভে সক্ষম হবে। তখন তোমাদের যাবতীয় করণীয়,

কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে যাবে; আর কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। সর্বদা নির্বাণ সুখে নিমগ্ন হয়ে থাকবে। নির্বাণ সুখ লাভ করলেও সেটা অপরের নিকট প্রকাশ করা বিধেয় নয়। স্বীয় শীলগুণ, ধূতান্ধগুণ, ধ্যানগুণ, মার্গগুণ, ফলগুণের কথা প্রকাশ করতে ভগবান বুদ্ধ বারণ করেছেন। কারণ অপর জনেরা জানলেও সেগুলো থাকবে, না জানলেও থাকবে। সুতরাং অপরের নিকট তা' প্রকাশ করার কোন যুক্তিকতা নেই। অন্যদিকে, যথায় তথায় আত্মপ্রশংসা করে ঘুরে বেড়ানো আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত কাজ নয়। তোমরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে যাবে না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালে একদিকে যেমন বন্ধনে জড়িত হতে হয় অন্যদিকে তেমনি মনচিন্ত হতে লজ্জাভাব উঠে যায়। বলা যায় লজ্জাশূন্য হতে হয়। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষমেশ চিন্তে একেবারে লজ্জাভাব থাকে না; অলজ্জীতে পরিণত হতে হয়। আর লজ্জাভাব শূন্য চিন্তা খারাপ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। তোমরা কুশলধর্মে বলীয়ান হও। সেই কুশল কি? সত্ত্বত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ। যথা-চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সত্ত্ব বোধিঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমরা কোন ধর্মে বলীয়ান হবে? ভন্তে, কুশলধর্মেই বলীয়ান হবো। সত্ত্বত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহের মধ্যে চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এই বিশটি ধর্ম লোকোত্তর; পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সত্ত্ব বোধিঙ্গ-এই সতেরটি ধর্ম লৌকিক। এ' সত্ত্বত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ যিনি পুজ্ঞানুপুজ্ঞরূপে বুঝতে পারেন তিনি যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন।

চাকমা কথায়-“তুমি ফা' অইদে কাম্ ন গচ্চ্য, পে অইদে কাম্ ন গচ্চ্য। এ ঠাণ্ডরুন্ ইক্কুনে দিন্ দিন্ ফা অই যাদন, পে অই যাদন। তুমিঅ তারা ধক্ক্যান গরিলে মান্‌স্যে তোমারেঅ বিশ্বেস গত্তাক নয়”। অর্থাৎ তোমরা আপন সর্বনাশ জনক, আপন সুনাম হানিকর কোন কাজ কর্ম করো না। বর্তমান ভিক্ষুরা আপন কুকর্মের দ্বারা নিজের সর্বনাশ (অধঃপতন), অসম্মান নিজেরাই ডেকে আনছে। তোমরাও যদি তাদের মত কুকর্ম সম্পাদন কর, তাহলে তোমাদের পরিণতিও একই হবে বলে জানবে। তোমাদেরকেও কেউই বিশ্বাস করবে না। আমার সাথে বলো “আমরা নিজের সর্বনাশজনক এবং সুনাম হানিকর কোন কর্ম সম্পাদন করব না”। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-সেরূপ কর্ম সম্পাদন করলে কেউই কি তোমাদের বিশ্বাস করবে? ভন্তে, কেউই বিশ্বাস করবে না। কাজেই তোমরা সবাই সাবধান হয়ে যাও। কখনো আপন সর্বনাশজনক এবং আপন সুনাম হানিকর কোন কর্মই সম্পাদন করবে না। এভাবে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করে নিজেকে খারাপ কর্ম হতে মুক্ত রাখবে।

পরিশেষে বনভন্তে বলেন-তোমরা গৃহী পরিভোগ ত্যাগ কর। গৃহীকালীন যেরূপ সুখভোগ করেছে, যেরূপ আচার-আচরণ করেছে সেগুলো পরিত্যাগ কর। সে সব সুখভোগ, আচার-আচরণ হতে নিজেকে সর্বদা মুক্ত রাখ। সেই সুখ ভোগ, আচার আচরণের কথা স্মরণও করবে না। কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক-এ' ত্রিলোকের মধ্যে সুখ ভোগ করাকে দুঃখ বলেই জানবে। এবং ত্রিলোকের প্রতি কোন প্রকার তৃষ্ণা উৎপাদন করবে না। এই ত্রিলোককে বলা হয় মারভুবন বা মাররাজ্য। তোমরা কেহ মাররাজ্যের মধ্যে অবস্থান করো না। নির্বাণ রাজ্য বা অমারভুবনে চলে যাও। আমার এসব উপদেশ তোমরা ধরবে কি? মেনে চলবে কি? যদি ধর, মেনে চল তাহলে মাররাজ্য অতিক্রম করে অমার ভুবন নির্বাণ পরম সুখের অধিকারী হতে পারবে। আর যদি না ধর, মেনে না চল তাহলে দুর্বিষহ দুঃখের মধ্যে মাররাজ্যে অবস্থান করতে হবে। কাজেই, তোমরা আমার এসব উপদেশ ধর, মেনে চল এবং পরম সুখ নির্বাণ লাভে সক্ষম হও।

সাধু, সাধু, সাধু।

অপরজনেরা মুর্থ হলেও তোমরা পণ্ডিত হবে

এক সময় শ্রাবকবুদ্ধ পৃজ্যম্পদ বনভন্তে মহোদয় নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসম্মেলনের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা কাম চিন্তা, ক্রোধ চিন্তা, হিংসা চিন্তা-এই তিন প্রকার চিন্তা করবে না; এই তিন প্রকার চিন্তা মহাপাপ। ধর্ম চিন্তা, সুচিন্তা, সুশৃঙ্খল চিন্তাই করবে। কাম চিন্তা অর্থ কামভোগের চিন্তা। ক্রোধ অর্থ রাগ, সেই রাগবশতঃ কাউকে আঘাত, প্রহার করার চিন্তাই ক্রোধ চিন্তা। হিংসা চিন্তা অর্থ কারোর অনিষ্ট, অহিত চিন্তা করা। কাম চিন্তা, ক্রোধ চিন্তা, হিংসা চিন্তা করলে বিবিধ দুঃখ পেতে হয়; অজ্ঞানতাভাব বৃদ্ধি পায়, সদ্ধর্ম হতে বিচ্যুতি ঘটে। তোমরা ধর্ম চিন্তা, সুচিন্তা, সুশৃঙ্খল চিন্তাই করবে। ধর্ম চিন্তা, সুচিন্তা, সুশৃঙ্খল চিন্তা করলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং নিজেকে সদ্ধর্মের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমার সঙ্গে বলো “আমরা ধর্ম চিন্তা, সুচিন্তা, সুশৃঙ্খল চিন্তাই করব। কখনো কাম চিন্তা, ক্রোধ চিন্তা, হিংসা চিন্তা করব না।” অপরজনেরা মুর্থ হলেও তোমরা পণ্ডিত হবে, অপরজনেরা অজ্ঞানী হলেও তোমরা জ্ঞানী হবে, অপরজনেরা অসাধু হলেও তোমরা সাধু হবে। ভগবান বুদ্ধ সল্লেক্ষ সূত্রে অপরের খারাপ কাজের স্থলে নিজেকে ভালো কাজ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সল্লেক্ষ অর্থ আত্ম শুদ্ধির সংকল্প। অপরজনে প্রাণী হত্যা করলে তৎস্থানে আমি প্রাণী হত্যা করব না, অপরজনে চুরি করলে তৎস্থানে আমি চুরি করব না। এইভাবে পাপীদের উল্টো (বা বিপরীতভাবে) চললে আপন শুদ্ধি বজায় রাখা যায়। এতে

নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে। তোমরাও সল্লেখ সূত্রের নিয়ম মেনে চল। বর্তমান (দুঃশীল) ভিক্ষুরা টাকা-পয়সা গ্রহণ, স্পর্শ করতেছে তৎস্থানে তোমরা টাকা-পয়সা গ্রহণ, স্পর্শ করবে না। তারা বিকাল ভোজন করতেছে তৎস্থানে তোমরা বিকাল ভোজন করবে না। এক কথায়, সাধারণ গৃহীরা যা করতেছে তোমরা তা' করবে না এবং দুঃশীল ভিক্ষুরা যা করতেছে তোমরা তা' করবে না। তাদের দ্বারা কৃত খারাপ কাজগুলো তোমরা লজ্জা জ্ঞানে পরিহার করেই চলবে। কি পরিহার করে চলবে তো? নাকি তাদের মত লজ্জাশূন্য হয়ে তোমরাও তাদের মত দুঃশীলতা আচরণ করবে? যদি লজ্জা না থাকে তাহলে করতে পার বৈকি। তবে সে রকম কিছু করলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপমান, অপদস্ত, অধঃপতন ঘটে, ঘটবে। মৃত্যুর পরও দুর্বিষহ দুঃখের মুখোমুখি হতে হবে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে লজ্জা থাকলে কিছুতেই দুঃশীলতা আচরণ করতে পারবে না। আমার সাথে বলো “আমরা বর্তমান (দুঃশীল) ভিক্ষুদের মত দুঃশীলতা আচরণ করব না। প্রাচীন ভিক্ষুদের মত সুশীলতা আচরণই করব।” প্রাচীন কোন ভিক্ষুদের মত আচরণ করবে? শারীপুত্র, মৌদগল্লয়ান, মহাকাশ্যপ, আনন্দ প্রমুখ মহাজ্ঞানী ভিক্ষুদের মতই সংযম ও ত্যাগময় আচার-আচরণ করবে। তাই বলা হয়েছে—

মহাজ্ঞানী আর্যগণ যে পথে করেছে গমন,

লভিয়াছে সম্যক দর্শন;

সেই পথ লক্ষ্য করে আচরিবে ধৈর্য ধরে,

সার্থক কর তবে এ' জীবন।

সেই মহাজ্ঞানী ভিক্ষুদের আদর্শ, সংযম ও ত্যাগময় আচার-আচরণ আয়ত্ত্ব করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। তাদের অনুসরণীয়, অনুকরণীয় নীতিগুলো মেনে চলে তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা নিরোধ করতে জীবন মরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। তাহলে তোমরাও হতে পারবে বরণীয়।

তোমরা অবিদ্যার দাস, তৃষ্ণার দাস হয়ে অবস্থান করবে না। অবিদ্যার দাস, তৃষ্ণার দাস হয়ে অবস্থান করলে কিছুতেই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বরং সর্বদা পাপকর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা তোমাদেরকে তাদের আজ্ঞাবহ ভূত্যের মত ইচ্ছামত পরিচালিত করবে। আমার সাথে বলো “আমরা অবিদ্যার দাস, তৃষ্ণার দাস হবো না। এতে আমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হবো।” ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—এ জগতে তৃষ্ণাকে কেহ পূরণ করতে পারে না। জগতের সমস্ত বস্তুকে ত্যাগ করে চলে যেতে হয় একদিন। এসব তত্ত্বকথা না জেনে বর্তমানের নর-নারীবৃন্দ তৃষ্ণাকে পূরণ করার কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা কখনো তৃষ্ণাকে পূরণ করতে পারবে না। পূজ্য বনভ্রম্ভে ভিক্ষুসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—তোমরা তৃষ্ণাকে ধ্বংস কর, ক্ষয় কর;

কখনো তৃষ্ণাকে পূরণ করতে যাবে না। কারণ তৃষিত বিষয়কে উপভোগের দ্বারা, তৃষ্ণাকে পূরণ করা সম্ভব নয়। তৃষ্ণার কোন পরিভৃষ্টি, পরিসমাপ্তি নেই।

শ্রদ্ধেয় ভক্তে বলেন-এ জগতে সবাই মৃত্যুর পথযাত্রী। সবাইকে একদিন মৃত্যুর মুখে পতিত হতেই হয়। জন্মিলে মরতে হয়, মরণ ছাড়া জীবনের অন্য কোন গত্যন্তর নেই। জগতে মরণই ধ্রুব, জীবন অধ্রুব। পূজ্য বনভক্তে পরলোকগত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বলেন, তারা যখন জীবিত ছিল তখন বিহারে আসত। আমার সাথে অনেক কথাবার্তা, আলাপ-সালাপ করতো। বর্তমানে জীবিত নেই বলে তারা আর বিহারে আসতে পারছে না। এখন যারা বিহারে আসতেছে তারাও একদিন মৃত্যুবরণ করবে। তখন এদের পক্ষেও আর বিহারে আসা, আলাপ-সালাপ করা, কথাবার্তা বলা সম্ভব হবে না। এবার বনভক্তে ভিক্ষুসম্মকে প্রশ্ন করে বলেন-আচ্ছা, এখন যারা বিহারে আসতেছে, তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেছে তারা মরে গেলে কি আর বিহারে এসে কথাবার্তা বলতে পারবে? ভক্তে, পারবে না। তোমরা সর্বদা এরূপেই মরণানুস্মৃতি ভাবনা চিন্তের মধ্যে জাতিত রাখ। এইভাবে মৃত্যু চিন্তা করলে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহা জন্মে এবং নির্বাণ লাভ করা যায়। আমরা দেহের সাহায্যে একে অপরকে দেখা, সাক্ষাৎ পাই। যখন দেহ থাকে না বা মৃত্যুবরণ করে তখন তার সঙ্গে আর দেখা, সাক্ষাৎ হয় না। জীবনের স্থায়িত্ব কাল মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। মৃত্যুর পর কে, কোথায় জন্মগ্রহণ করলো তার হিসাব কেহ রাখতে পারে? কেহ পারে না (পূর্বনিবাস জ্ঞানলাভী ব্যতীত)। মনে রাখবে, এ জগতে যত জীব আছে সকলেই একদিন মরবে। কী মনুষ্য, কী স্বর্গের দেবতা, কী ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা সবাই মৃত্যুর কাছে অসহায়। মনুষ্যালোকে মনুষ্যগণকে যেমন মৃত্যুবরণ করতে হয় তেমনি স্বর্গের দেবগণকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়, ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মাগণকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই মানুষ হলেও মরতে হয়, দেবতা হলেও মরতে হয়, ব্রহ্মা হলেও মরতে হয়, ভূত-প্রেত হলেও মরতে হয়, যক্ষ হলেও মরতে হয়। কেবলমাত্র নির্বাণলাভীদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয় না। নির্বাণে মৃত্যুবরণের কোন শঙ্কা নেই। যেখানে জন্ম থাকে সেখানে মৃত্যুও থাকে। নির্বাণে জন্ম নেই বলে মৃত্যুও নেই। নির্বাণই একমাত্র অমর; সেখানে জন্মগ্রহণও করতে হয় না, মৃত্যুবরণও করতে হয় না। তোমরা জন্ম-মৃত্যুকে রোধ কর। পূজ্য বনভক্তে ভিক্ষুসম্মকে প্রশ্ন করেন-তোমরা কি করবে? ভক্তে, জন্ম-মৃত্যুকে নিরোধ করবো। আমার সাথে বলো “আমরা জন্ম-মৃত্যুকে নিরোধ করব। কোন স্থানে বেঁচে থাকব না; পুনর্জন্ম গ্রহণ করব না”। জন্মগ্রহণ করাও দুঃখ, মৃত্যুবরণ করাও দুঃখ। জন্ম-মৃত্যু নিরোধই সুখ। মনুষ্যালোক, স্বর্গ, ব্রহ্মলোকে সুখভোগ করা সমূহ অনিত্য ধর্ম, দুঃখপূর্ণ ধর্ম। সেই অনিত্য ধর্ম,

দুঃখপূর্ণ ধর্ম দ্বারা মুক্তির পথ লাভ হয় না। নির্বাণ হল অনাত্ম ধর্ম। অনাত্ম ধর্ম দ্বারা মুক্তির পথ লাভ হয় বা মুক্ত হওয়া যায়। তোমরা সেই অনাত্ম ধর্ম নির্বাণই আয়ত্ত্ব কর। তাহলে যাবতীয় দুঃখের চির অবসান হয়ে যাবে। নির্বাণ পরম সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হবে।

তোমরা আর কতো দিন অবিদ্যার অন্ধকারে থাকবে? অতিসত্ত্বর অবিদ্যা অন্ধকার ধ্বংস কর; অবিদ্যাকে বিধ্বংস করে তৎস্থানে বিদ্যা উৎপন্ন কর। তোমাদের মনচিন্ত বর্তমানে অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, ফলে বিদ্যা উৎপন্ন হতে পারছে না। সেই অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত মনচিন্তকে তোমরা বিদ্যার আলোতে নিয়ে এসো। আমার সাথে বলো “আমাদের মনচিন্ত আর কতোদিন অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। আমরা এখন মনচিন্তকে বিদ্যার আলোতে নিয়ে আসতে চাই”। অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত মনচিন্ত অন্ধকারে ভরা। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ; কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা কিছুই দেখতে পায় না। ফলে দুঃখপূর্ণ অবস্থা হতে উদ্ধারের পথও খুঁজে পায় না। পূজ্য বনভক্তে প্রশ্ন করেন-ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে কিছু দেখা যায় কি? ভক্তে, দেখা যায় না। অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত চিন্তও সেরূপ কিছুই দেখতে পায় না। অন্যদিকে, বিদ্যা উৎপন্ন চিন্ত আলোতে উদ্ভাসিত। সেই আলোকময় চিন্ত ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা যথার্থরূপে দর্শন করতঃ মন্দ, মিথ্যাসমূহ বর্জন করে চলে। বিদ্যা উৎপন্ন চিন্ত সর্বদা সুখের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। তাই বলছি, তোমরা অতিসত্ত্বর অবিদ্যা অন্ধকারে নিমজ্জিত চিন্তকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে এসো এবং কখনো অবিদ্যা উৎপন্ন হতে দেবে না।

তিনি আরো বলেন-যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণের জ্ঞান উৎপন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারোর বিচিকিৎসা বা সন্দেহ দূরীভূত হবে না। নির্বাণের জ্ঞান উৎপন্ন হলে তবেই যাবতীয় সন্দেহের অবসান হয়। মনে রাখবে, তোমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তে নির্বাণের জ্ঞান উৎপন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচিকিৎসা বা সন্দেহ দূরীভূত হবে না। কিন্তু যখন নির্বাণের জ্ঞান উৎপন্ন হবে তখন আর কোন সন্দেহ থাকবে না। নির্বাণের জ্ঞান উদয় না হলে নির্বাণ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। বিচিকিৎসা বা সন্দেহ করাটা দুঃখ, পাপ। নির্বাণে দুঃখ, পাপ নেই বলে সন্দেহও নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যাবতীয় সন্দেহ এবং দুঃখ নিবৃত্তির নামই নির্বাণ। তাই নির্বাণ অতি উত্তম, অতি শ্রেষ্ঠ, অতি মনোহর, অতি সুখ। নির্বাণ অপেক্ষা উত্তম নেই, শ্রেষ্ঠ নেই, মনোহর নেই, সুখ নেই। তোমরা নির্বাণকেই উত্তম, শ্রেষ্ঠ, মনোহর, সুখ বলে জানো এবং সেই উত্তম, শ্রেষ্ঠ, মনোহর, সুখের আকর নির্বাণ লাভে সচেষ্ট থাক।

তোমরা মেয়াদ উত্তীর্ণ বা পুরানো ঔষধ সেবন করবে না। মেয়াদপূর্ণ বা

নতুন ঔষধ সেবন কর। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সেবন করলে কি রোগ আরোগ্য হয়? হয় না। রোগ আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, বরং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় মহা ক্ষতিসাধন হবার সম্ভাবনা থাকে। সেই পুরানো ঔষধ কি জান? অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশগুলো পুরানো বা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ। স্মরণাতীত কাল হতে সত্ত্বগণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশের সহিত সুখভোগ করার মাঝে প্রকৃত সুখের সন্ধান করে আসতেছে। কিন্তু কেউই প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়নি; উপরন্তু সীমাহীন দুঃখ সাগরে হাবুডুবু খেয়েই চলছে। তাই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশের সহিত সুখ ভোগ করাকে আমি পুরানো ঔষধ সেবন করা বলে থাকি। সেই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশরূপ পুরানো ঔষধ খেলে দুঃখই বৃদ্ধি পাবে, কখনো সুখ লাভ হবে না। প্রত্যেক ঔষধের মেয়াদকাল থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সেবন করলে রোগ আরোগ্য হয় না। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশের সহিত সুখভোগ করাটা ত্রিশ বৎসরের পুরানো (মেয়াদ উত্তীর্ণ) ঔষধ সেবন করার ন্যায় জানবে। সেই ঔষধ সেবন করলে রোগ আরোগ্য হবে না। বরং অন্য রোগের সৃষ্টি হবে। ভগবান বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ নৈর্বাপিক ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে দুঃখমুক্ত সত্ত্বগণকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দিয়েছেন। তাই ভগবান বুদ্ধের আবিষ্কৃত সত্ত্বত্রিশ (সাঁইত্রিশ) বোধিপক্ষীয় ধর্মোষধ হল নতুন বা মেয়াদপূর্ণ ঔষধ। চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সত্ত্ব বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এ সত্ত্বত্রিশ বোধিপক্ষীয় ধর্মগুলো হল নতুন (মেয়াদপূর্ণ) ঔষধ। এই ঔষধ সেবন করলে তোমাদের যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটবে তথা রোগ আরোগ্য হবে। এই ঔষধ সেবন করলে প্রকৃত সুখ লাভ হয়; অজর, অমর হতে পারে। তাই বলা হয়েছে-‘পান করি ধর্ম ঔষধ অজর, অমর হবে’। বনভ্রমে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমরা পুরানো ঔষধ সেবন করবে, নাকি নতুন ঔষধ সেবন করবে? ভ্রমে, আমরা পুরানো ঔষধ সেবন করব না, নতুন ঔষধই সেবন করব। হ্যাঁ, নতুন ঔষধই সেবন করো, কখনো পুরানো ঔষধ সেবন করবে না। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশমুক্ত সত্ত্বত্রিশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম বুদ্ধের আবিষ্কৃত নতুন ঔষধ সেবন করলে যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তোমরা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে অবস্থান কর। কতদিন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের মত আলো বিহীন অবস্থায় থাকবে? বর্তমানে তোমাদের চিত্ত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে; ক্রেশ মেঘ এসে চিত্তকে ঢেকে ফেলেছে। মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র যেমন কিরণ ছড়াতে ব্যর্থ হয়, ঠিক তদ্রূপ তোমাদের চিত্তও সুখ লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই বলছি, তোমরা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হয়ে অবস্থান কর। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গস্থ ফলস্থ ও নির্বাণ এই নব

লোকোত্তরধর্মের অধিকারীদিগকে ভগবান বুদ্ধ মেঘমুক্ত চন্দ্র সদৃশ বলেছেন। লোকোত্তরধর্ম হল মেঘমুক্ত চন্দ্র আর লৌকিকধর্ম হল মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র। মেঘমুক্ত চন্দ্র আলোকময়, মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র অস্পষ্ট। লোকোত্তরধর্মের অধিকারী হতে না পারলে তোমাদের চিত্তকে ক্রেশ মেঘে ঢেকে থাকবে। এখানে দশবিধ ক্রেশই চিত্তের মেঘ। সে দশবিধ ক্রেশ হল-লোভ, দ্বেষ, মোহ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, আলস্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা। যেদিন তোমাদের চিত্ত ক্রেশমুক্ত হবে সেদিন তোমরা মেঘমুক্ত পূর্ণিমা চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে অবস্থান করতে পারবে। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমরা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হলে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারবে কি? ভন্তে, চেষ্টা করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, চেষ্টা করে যাও। তোমরা লৌকিকধর্ম আচরণ না করে লোকোত্তরধর্ম আচরণ কর। লোকোত্তরধর্মের মাধ্যমে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে অবস্থান কর। আমার সাথে বলো “আমরা লৌকিকধর্ম আচরণ করব না, সেগুলো পাপ, দুঃখ, অন্ধকার। লোকোত্তরধর্মই আচরণ করব; লোকোত্তরধর্মের মাধ্যমে আমরা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হবো”।

অবিদ্যা, তৃষ্ণায়ুক্তভাবে যা কিছু দেখা যায় তা’ সবই স্বপ্ন, আর যা কিছু বলা হয় তা’ সবই প্রলাপ। এ’ দেখা, বলাতে সত্যের লেশমাত্র নেই। এতে কেবলমাত্র অজ্ঞান বৃদ্ধি পায়; দুঃখই পেতে হয়। কখনো প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। তজ্জন্য তোমাদেরকে বলছি-তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণায়ুক্তভাবে কোন কিছু দেখবে না এবং কোন কিছু বলবে না। বরং অবিদ্যা, তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে চোখবন্ধ ও নীরবভাবে অবস্থান করবে। এ’মনুষ্যগণ (তথা সত্ত্বগণ) সুখ ভোগ করার জন্য তৃষ্ণায়ুক্তভাবে অনেক কিছু দেখে এবং অনেক কিছু বলে। কিন্তু তারা বুঝে না যে, অবিদ্যা ও তৃষ্ণায়ুক্তভাবে যতো কিছু দেখা হোক না কেন, যতো কিছু বলা হোক না কেন তাতে সুখ লাভ হয় না। কেবলমাত্র দুঃখই পেতে হয়। তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণায়ুক্তভাবে কোন কিছু দেখবেও না, কোন কিছু বলবেও না। আমার সাথে বলো “আমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে পরম সুখে অবস্থান করব”। তখন কোন কিছু দেখতেও হবে না, কোন কিছু বলতেও হবে না। এটাই নির্বাণ সুখ।

পরিশেষে তিনি বলেন-অবিদ্যাকে বিদূরিত করতঃ তৎস্থানে বিদ্যা উদয় এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে জয় করে সম্যকদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা ও মারসৈন্যদিগকে পরাজিত করে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে হয়। এভাবে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে পারবে কি? হ্যাঁ ভন্তে, পারবো। এটা কিন্তু সহজ কাজ নয়। মুখের জোরে বলা গেলেও কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দেখানো সহজ হবে না। অবশ্য, আমি পেরেছি। আমার

কথা ও উপদেশগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে চললে তোমরাও পারবে। আমার সাথে বলো “আমরা অবিদ্যা বিদূরীত করে তৎস্থানে বিদ্যা উদয় করব, মিথ্যাদৃষ্টি জয় করে তৎস্থানে সম্যকদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করব, মারসৈন্যদিগকে পরাজিত করতে জীবন-মরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। এ সংগ্রামে কখনো পিছপা হবো না; হয় মারকে সসৈন্যে পরাজিত করব, না হয় নিজের জীবন বিসর্জন দিবো”। এরূপ দৃঢ় পরাক্রমের সহিত মারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারলে নির্বাণ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আমি তোমাদেরকে সেইরূপ পরাক্রমশালী হয়ে মারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উপদেশ দিচ্ছি। দেখি, তোমরা মারকে পরাজিত করতে পার কিনা। যদি পার অবশ্যই নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হবেই।

সাধু, সাধু, সাধু।

বৌদ্ধধর্মের দয়ায় কোন শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ থাকতে পারে না

এক সময় পরম পূজ্য বনভক্ত মহোদয় নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—বৌদ্ধধর্ম একদিকে ত্যাগের ধর্ম, অন্যদিকে দয়ার ধর্ম। এ’ধর্মের মতে একদিকে ত্যাগে সুখ, অন্যদিকে দয়ায় সুখ। সকল প্রকার অকুশল পরিত্যাগ এবং সকল প্রাণীকে দয়া করাই বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের দয়ায় শত্রু-মিত্র কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না। শত্রু হোক বা মিত্র হোক সবাইকে সমভাবে দয়া করতে হবে। শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ স্বীয় পুত্র রাহুলকে যেমনি দয়া করেছিলেন, তেমনি দয়া করেছিলেন মহাশত্রুতাকারী দেবদত্ত, ধনপাল হস্তী, দস্যু অঙ্গুলিমালকেও। সেই দয়া প্রদর্শনে কোন প্রকার প্রভেদ ছিল না। তাই বলা হয়েছে—

হত্যাকারী দেবদত্ত, ধনপাল, অঙ্গুলিমাল, রাহুলের প্রতি,

ইতর বিশেষ নাই, সর্বত্র সমান দয়া—

মুনিন্দ্রে এইরূপ মতি।

তোমাদেরকেও সকল প্রাণীর প্রতি সমানভাবে দয়া করতে হবে। পারবে কি? ভক্তে, পারবো। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না রেখে সবাইকে সমভাবে দয়া করা সহজ কথা নয়। এ’সম দয়া প্রদর্শন করতে তোমরা পৃথিবীর মত হয়ে অবস্থান কর। এই পৃথিবী ভালো কিংবা মন্দ, পণ্ডিত কিংবা মূর্খ কোন প্রকার প্রভেদ না করে সব ব্যক্তিকেই তার বুদ্ধি স্থান দেয়, কাউকে বিতাড়িত করে না। কখনো বলে না যে, ভালো-পণ্ডিত ব্যক্তিরাই কেবল আমার বুদ্ধি থাকতে পারবে, মন্দ-মূর্খ ব্যক্তির চলে যাও। সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ যে কোন দ্রব্য ফেলে দিলে তদ্বারা পৃথিবী যেমন আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই অনুভব করে না। ঠিক তেমনি অন্যের শত্রুতা-মিত্রতা আচরণেও তোমাদেরকে ভেদজ্ঞান না রেখে সবাইকে সমানভাবে

দয়া করতে হবে। পূজ্য বনভঙ্কে প্রশ্ন করেন—পৃথিবীর মত শত্রুতা-মিত্রতা ভেদ না রেখে সবাইকে সমভাবে দয়া করতে পারবে কি? হ্যাঁ ভঙ্কে, আমাদেরকে পারতেই হবে। প্রকৃত ভিক্ষুদের আচরণ সেরূপই হয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে সর্বাবস্থাতে সকলকে সমানভাবে দয়া প্রদর্শন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাই বলা হয়েছে—

অমুকের প্রতি, অমুকের প্রতি;
পৃথিবীর সমচিহ্ন ভিক্ষুগণ।
তব এই মতি।

মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা সহজ কথা নয়। পূর্বজন্মের নৈষ্কম্য পারমীর জোর না থাকলে এ' কাজে সফল হওয়া যায় না। অতীতের পারমী না থাকলে প্রব্রজিত জীবন-যাপনে মন রমিত হয় না। ভগবান বুদ্ধও গৃহত্যাগের আগে এরূপ চিন্তা করেছিলেন—

আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতৃ গৌতমী-
কেমনে ভুলিব তাতে,
আমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া-
পাগল হইবে সবে।

মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রব্রজিত জীবনের পথে অন্যতম বাধা। এসব বন্ধনকে ছিন্ন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন—জগতের বন্ধন দশ প্রকার। যথা—(১) মাতা (২) পিতা (৩) ভ্রাতা (৪) ভগ্নি (৫) স্ত্রী (৬) পুত্র (৭) ধন (৮) আধিপত্য (৯) লাভ-সংস্কার (১০) পঞ্চকামগুণ। বোধিসত্ত্বগণ এই দশ প্রকার বন্ধন পদদলিত করে প্রব্রজিত হন। তারা আর কখনো গৃহবাসে ফিরে যান না। যাদের এ সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়নি, তাদের পুনঃ গৃহবাসে ফিরে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। পূজ্য বনভঙ্কে জ্ঞানপাল নামক বৃদ্ধ ভিক্ষুকে প্রশ্ন করেন—তুমি এই দশ প্রকার বন্ধন ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছ কি? ভঙ্কে, সেই বন্ধনসমূহ ছিন্ন করতেই তো আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি, তোমরা অতিসত্বর এই দশ প্রকার বন্ধন ছিন্ন কর। তা না হলে পুনঃ গৃহবাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে; প্রব্রজ্যা জীবন রক্ষা করা সুকঠিন হবে। কিভাবে দশ প্রকার বন্ধন ছিন্ন করতে হয়? মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবকে সুখ নয়, দুঃখরূপে দর্শন করে। কারণ পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যায়, স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতা-ভগ্নিতে, বন্ধু-বান্ধবে এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-কলহ, মনোমালিন্য বিদ্যেব সৃষ্টি হয়। আর সে ঝগড়া কলহের জন্য তাদেরকে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই মাতা-

পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ বিশ্বাস না করে চারি আর্যসত্য জ্ঞানকে বিশ্বাস করতঃ দশ প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে ফেল। আমার সাথে বলো “মাতাকে বিশ্বাস নেই, পিতাকে বিশ্বাস নেই, ভ্রাতাকে বিশ্বাস নেই, ভগ্নিকে বিশ্বাস নেই, স্বামীকে বিশ্বাস নেই, পুত্রকে বিশ্বাস নেই, কন্যাকে বিশ্বাস নেই, বন্ধুকে বিশ্বাস নেই, আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাস নেই। আমরা কেবল চারি আর্যসত্যকে বিশ্বাস করব”। এভাবেই দশ প্রকার বন্ধন ছিন্ন করতে হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বর্তমানে আমাকে খুব বেশি ত্রিপিটক শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয় না। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখপূর্ণ ঘটনাবলী দেখলেই হয়। স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্র-কন্যায়, জ্ঞাতিবর্গে, পাড়া-প্রতিবেশীতে তারা কতো প্রকারেই না দুঃখ পাচ্ছে; কতোই-না অশান্তিতে জীবন-যাপন করতেছে। তোমরাও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সেই দুঃখপূর্ণ ঘটনাবলী দর্শন করে জ্ঞান উদয় করতে সচেষ্ট থাক। তাদের সে দুঃখপূর্ণ ঘটনাবলী দর্শন করে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহা জন্মালে; নির্বাণ যেতে সক্ষম হবে। যারা সংসারের এ’ দুঃখপূর্ণ ঘটনাবলী দেখবে, জানবে, বুঝবে তারা আর সে সব দুঃখের মধ্যে থাকবে না; নির্বাণলাভীই হবে। তাই বলা হয়েছে-

বুদ্ধের শাসনে জন্ম করিয়া গ্রহণ,
দুঃখকে করিয়া ভয় মুক্তির কারণ।

বর্তমানে গৌতম বুদ্ধের শাসন চলতেছে। তোমরা যে বুদ্ধের শাসনকালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছ, এটা তোমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে জানবে। কারণ বুদ্ধের শাসনকালের ভেতরে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথ খোলা থাকে। তবে সে পথ লাভের জন্য চাই সংসার দুঃখকে ভয় করা। সংসার দুঃখকে ভয় না করলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যায় না। আমার সাথে বলো “আমরা সংসার দুঃখকে ভয় করেই নির্বাণ লাভ করব। সংসার দুঃখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আমরা এ’ ভয়ঙ্কর দুঃখপূর্ণ স্থানে থাকব না”। মনে রাখবে, যারা সংসার দুঃখকে ভয় করে তারা নির্বাণ লাভে সক্ষম হয়; কিন্তু যারা সংসার দুঃখকে ভয় করে না তারা কিছুতেই নির্বাণ লাভ করতে পারবে না।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-প্রব্রজিতগণ নারীদেরকে যক্ষিণী, বিষফল রূপেই জানবে। পুরাকালে অনেক যক্ষিণী নর মাংস ভক্ষণের জন্য নাকি মায়াবলে পথপার্শ্বে পাছশালা সৃষ্টি করে নিজে দিব্যরূপ ধারণ করতঃ অপরূপ সুন্দরী সেজে (সেখানে) বসে থাকত। পথিকদিগকে বিবিধ উপায়ে প্রলোভন দেখিয়ে মধুর স্বরে বলতো ‘পাছ, তুমি বোধ হয় নিতান্ত ক্লান্ত হয়েছে; এস এখানে উপবেশন কর, সুশীতল জলপান কর। তারপর না হয় পুনর্বীর পথ চলবে’। যারা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে যক্ষিণীদিগের নিকট উপস্থিত হতো, অমনি যক্ষিণীরা তাদের

প্রাণ সংহার করে খেয়ে ফেলত। বিষফলগুলো দেখতে ঠিক যেন আম্রফল। গাছের কাণ্ড, শাখা, পত্র-পুষ্প সবই অবিকল আম্রবৃক্ষের অনুরূপ। ফলগুলো কেবল দেখতে নয়; বর্ণ, গন্ধ এবং আত্মদও নাকি আম্রফলের সাথে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু আম্রফল ভ্রমে মুখে দিলে উদরস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ি-ভূড়ি কর্তন করে জীবনান্ত ঘটায়। নারীগণও সেই যক্ষিণী আর বিষফলের মত। অসাবধানবশতঃ তাদের সংস্পর্শে গেলেই প্রব্রজিত জীবনের চির অবসান ঘটায় দেয়। পূজ্য বনভক্তে ভিক্ষুসজ্জকে প্রশ্ন করেন-ভগবান বুদ্ধ নারীদেরকে কি বলেছেন? ভক্তে, যক্ষিণী ও বিষফল। এবার বনভক্তে বলেন-আমি নারীদিগকে আরো বহুবিধ উপমা দিয়ে তোমাদেরকে নারী হতে দূরে সরে থাকতে বলি। নারীরা হল কালো জামুরা সাপ (কাল বিষধর সর্প), বিছুটিকা পাতা (চত্ৰাপাতা), মৃগা, শহরের গুণ্ডা, আট হাজার ভোল্ট সম্পন্ন কারেন্ট, রেডিও, ক্যামেরা, গরম চা, গরম ভাত, ভি সি আর, হাঙ্গর, কুমির ইত্যাদি। সুতরাং নারী হতে সাবধান; কিছুতেই নারীর সংস্পর্শে যাবে না। মনে রাখবে, নারীর সংস্পর্শে গেলে মহাবিপদ নেমে আসবে এবং তৎক্ষণাৎ প্রব্রজিত জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ খেকো বাঘের দিকে যাবে তবুও নারীর দিকে যাবে না। নারীরা মানুষ খেকো বাঘ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। কারণ মানুষ খেকো বাঘের মুখে মৃত্যুবরণ হলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়; কিন্তু নারীর সংস্পর্শে গিয়ে (নারী বাঘে খেলে) প্রব্রজিতগণের জীবন অবসান হলে চারি অপায়ে পতিত হতে হয়।

তোমরা অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান নেই, ক্লেশ নেই হয়ে অবস্থান কর। অবিদ্যা থাকলে দুঃখ পাবে, তৃষ্ণা থাকলে দুঃখ পাবে, উপাদান থাকলে দুঃখ পাবে, ক্লেশ থাকলে দুঃখ পাবে। কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ থাকলে তোমাদেরকে বাধ্য হয়ে অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে হবে। সাধারণ নর-নারীরা কেন অকুশলকর্মে নিয়োজিত হয় জান? তাদের নিকট অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ বিদ্যমান রয়েছে বলে বাধ্য হয়েই অকুশলকর্মে নিয়োজিত হতে হয়। আমার সাথে বলো “আমরা অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান নেই, ক্লেশ নেই হয়ে অবস্থান করব। এতে আমাদের নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হবে”। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অবিদ্যা থাকতে পারে না, তৃষ্ণা থাকতে পারে না, উপাদান থাকতে পারে না, ক্লেশ থাকতে পারে না। তাই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশের সহিত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে তা’ প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম হতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ক্লেশমুক্ত।

তিনি আরো বলেন-তোমরা সর্বদা মনের উল্লতিসাধন কর। কিভাবে করবে? মনচিন্তে বিদ্যা উৎপাদন করে। সেই বিদ্যা কি? চারি আর্যসত্য জ্ঞান (বিদ্যা), প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান (বিদ্যা), তৃষ্ণা ক্ষয় জ্ঞান (বিদ্যা)।

মনচিন্তে বিদ্যা উৎপন্ন হলে চিত্ত পরিষ্কার ও সুখের অধিকারী হয়। তখন চিত্ত কুশল সংস্কারও করে না, অকুশল সংস্কারও করে না, আনেন্দ্রিয়া সংস্কারও করে না। চিত্ত সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত হলেই সুখ। মনে রাখবে, সংস্কার মাঝেই দুঃখ; সেটা কুশল সংস্কার হোক, অকুশল সংস্কার হোক বা আনেন্দ্রিয়া সংস্কার হোক। সর্ববিধ সংস্কারই দুঃখ। সংস্কারমুক্ত চিত্তই সুখাবহ। তোমরা এভাবে চিত্তকে সংস্কারমুক্ত রেখে বিদ্যা উৎপন্ন কর। অন্য কোন কাজ না করে কেবলমাত্র বিদ্যা উৎপন্ন করতে তৎপর থাক। বিদ্যা উৎপন্ন করা ছাড়া তোমাদের অন্য কোন কর্তব্য নেই। আমার সাথে বলো “আমরা কেবলমাত্র বিদ্যাই উৎপন্ন করব। বিদ্যা উৎপন্ন করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করব না”। আমার উপদেশ মেনে চলে তোমরা যদি সবাই বিদ্যা উৎপন্ন করতে পার, তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো তোমাদের সুখ লাভ হবেই। মনে রাখবে, বিদ্যা উৎপাদন করতে না পারলে সুখ লাভের কোন উপায় নেই। তোমরা যদি সুখ লাভ করতে চাও তাহলে বিদ্যা উৎপাদন কর। চিন্তের মধ্যে বিদ্যা উৎপাদন করা না গেলে কিছুতেই সুখ লাভ হবে না। তাই আবারো বলছি, তোমরা অন্য কোন কাজ না করে চিন্তের মধ্যে কেবল বিদ্যা উৎপাদন কর।

অজ্ঞান, মিথ্যাকে সত্য বলে দর্শন করলে চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, মিথ্যা উৎপন্ন হয়। তখন অজ্ঞান, মিথ্যার সহিত অবস্থান করতে হয়। কোন পুরুষ/মহিলাকে দেখে যদি তাকে সত্য, সুখরূপে জান, দর্শন কর তাহলে জানবে তোমরা অজ্ঞান, মিথ্যাকেই সত্য বলে দর্শন করতেছ। আর তোমার চিন্তে অজ্ঞান, মিথ্যা উদয় হয়েছে। কিন্তু সেই পুরুষ/মহিলাকে দেখে যদি তাকে মিথ্যা ও দুঃখরূপে জান এবং দেখ তাহলে জানবে তুমি জ্ঞান ও সত্যকে দর্শন করতেছ; তোমার চিন্তে জ্ঞান ও সত্য উদয় হয়েছে। তাই আমার সাথে বলো “আমরা অজ্ঞানকে দর্শন করব না, মিথ্যাকে দর্শন করব না; জ্ঞানকে দর্শন করব, সত্যকে দর্শন করব”। আমি বলছি তোমরা অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন করবে না। অজ্ঞান, মিথ্যাকে দর্শন করলে তোমরা দুঃখ পাবে, মুক্ত হতে পারবে না। জ্ঞান, সত্যকেই দর্শন করবে। জ্ঞান, সত্যকে দর্শন করলে তোমাদের সুখ লাভ হবে; দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। এ’ সংসারে সুখ দেখেছি, সুখ পেয়েছি বললে নির্বাণ যেতে পারবে না। নির্বাণ যেতে হলে তোমাদেরকে সংসারের দুঃখগুলো দেখতে হবে, বুঝতে হবে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং আমি সংসারে দুঃখ দেখেছি, দুঃখ পেয়েছি বলতে হবে। সংসারের দুঃখগুলো যথার্থরূপে না জানলে, না দেখলে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহা জন্মায় না। আর সে অবস্থায় সংসারের কাম্যসুখ ও সংসার অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব হয়ে যায়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—এ’ সংসারে কেহ সুখ দেখেছি, সুখ পেয়েছি বললে সেটা পাগলের

প্রলাপ বলা সদৃশ। পাগলেরা এ' সংসারে সুখ দেখে, সুখ পায় বলে মনে করে। প্রকৃত জ্ঞানীরা কখনো সংসারে সুখ দেখে না, সুখ পায় বলে মনে করে না। অবিদ্যাচ্ছন্ন সংসারে কোথাও প্রকৃত সুখ নেই। দুঃখপূর্ণ এ' সংসারে কেহ নির্মল সুখের অধিকারী হতে পারে না। লোভ, দ্বেষ, মোহ অভিভূত চিত্তে কেহ সুখ উপলব্ধি করতে পারে? পারে না। প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে হলে তাই সংসার অতিক্রম করে নির্বাণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

পরিশেষে তিনি বলেন-ভিক্ষুদিগকে সর্বদা বুদ্ধানুশ্রুতি, মৈত্রীভাবনা, অশুভ ভাবনা, মরণানুশ্রুতি ভাবনা স্মরণ রাখতে হবে। মনচিন্তের মধ্যে এ' চারটি ভাবনার বিষয় জামত রাখলে প্রব্রজিত জীবন শ্রীবৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার পাপ চেতনা এসে চিত্তকে কলুষিত করতে পারে না, অজ্ঞানতাভাব উদয় হতে পারে না, চিত্ত সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, মনচিন্ত প্রব্রজিত জীবনে রমিত হয়, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের ইচ্ছা তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। সংসারের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি থাকে না। পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-ভিক্ষুদিগকে সর্বদা কি স্মরণ রাখতে হয়? ভন্তে! বুদ্ধানুশ্রুতি, মৈত্রীভাবনা, অশুভ ভাবনা, মরণানুশ্রুতির বিষয় স্মরণ রাখতে হয়। বনভন্তে-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। প্রকৃত ভিক্ষুদিগকে সর্বদা এ' চারটি ভাবনার বিষয় স্মরণ রাখতে হবেই। তোমরা সর্বদা এ' চারটি বিষয় স্মরণ রাখবে। তাহলে তোমাদের প্রব্রজিত জীবন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে; কখনো পরিহানি হবে না। তোমরা সেই প্রচেষ্টায় রত থাকতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও। এতে তোমাদের চিত্তে পাপ চেতনা উদয় হবে না, চিত্তকে দুঃখক্লিষ্ট হতে হবে না। এবং নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

নিজের কতটুকু জ্ঞান উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষক হয়ে অবস্থান কর

এক সময় পূজ্য বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাক তাহলে তোমাদের মনচিন্ত কি করতেছে? কোথায় যাচ্ছে? কি (আলম্বন) নিয়ে অবস্থান করে? এসব কিছুই জানতে পারবে না। অজ্ঞানীদের পক্ষে মনচিন্ত সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু জ্ঞানীরা তাদের মনচিন্ত কি করতেছে? কোথায় যাচ্ছে? কি নিয়ে অবস্থান করে? সব কিছুই জানতে পারে। তারা সর্বদা স্বীয় চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তাই স্বীয় চিত্ত সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকে। তোমরাও প্রত্যেকে নিজের চিত্ত সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর। তোমাদেরকে স্বীয় চিত্ত কি করতেছে? কোথায় যাচ্ছে? কি নিয়ে অবস্থান করে? সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতঃ চিত্তকে দেখতে হবে, জানতে হবে। এটাকে বলে জ্ঞান। এরূপে জ্ঞানের সহিত

অবস্থান করতে সক্ষম হলে সুখ লাভ হয়। যারা নিজের চিন্তা কি করতেছে? কোথায় যাচ্ছে? কি নিয়ে অবস্থান করে? এসব কিছুই জানে না, আমি তাদেরকে তির্যক প্রাণীর (গরু, ছাগল) মত হয়ে অবস্থান করতেছে বলে থাকি। এবার শ্রদ্ধেয় ভণ্ডে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-তোমাদের চিন্তা কি করে, কোথায় যায়, কি নিয়ে থাকে, সেগুলো তোমরা জান কি? ভণ্ডে, সব সময় জানা সম্ভব হয় না। জানতেই হবে; না জানলে তো তোমাদেরকেও অজ্ঞানীই বলতে হবে। জ্ঞানীরা সর্বদা স্বীয় চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। চিন্তা কি করতেছে? কোথায় যাচ্ছে? কি নিয়ে অবস্থান করে? এসব বিষয় জানাই তো জ্ঞানীদের কাজ। স্বীয় চিন্তা সম্বন্ধে জানাটা জ্ঞান, আর না জানাটা অজ্ঞান। যারা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করে তারা স্বীয় চিন্তা সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হয়। কিন্তু যারা অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করে তারা স্বীয় চিন্তা সম্বন্ধে জানতে অক্ষম। পূজ্য বনভণ্ডে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করে বলেন-এখন তোমরাই বলো, তোমরা জ্ঞানী হবে নাকি অজ্ঞানী হবে? ভণ্ডে, আমরা জ্ঞানী হবো। যারা জ্ঞানী তারা স্বীয় চিন্তা কি করে? কোথায় যায়? কি নিয়ে থাকে? সবই দেখতে পায়, জানতে পারে। কিন্তু যারা অজ্ঞানী তারা স্বীয় চিন্তা কি করে? কোথায় যায়? কি নিয়ে থাকে? কিছুই দেখতে পায় না, জানতে পারে না। তবে তাদের চিন্তা কি বসে রয়েছে? চিন্তের স্বভাব কোন না কোন একটা করেই যাওয়া। সেটা ভালোর দিক হোক আর মন্দের দিক হোক। আর অজ্ঞানীদের চিন্তা তো মন্দের দিকেই ধাবিত হয়। স্বীয় চিন্তা সম্বন্ধে জানে না বলে অজ্ঞানীরা বিবিধ পাপ করে অনন্ত দুঃখের শিকার হয়। কারণ চিন্তাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চালিত না করলে কুকর্মের দিকে ধাবিত হয়, কুকর্ম হতে ফিরায়ে আনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আবারো বলছি, তোমাদেরকে অবশ্যই স্বীয় চিন্তা সম্বন্ধে জানতে হবে। আমার সাথে বলো “আমাদের চিন্তা কি করতেছে? কোথায় যাচ্ছে? কি নিয়ে অবস্থান করে? এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, দেখতে হবে”। তোমরা যদি সেরূপ জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতে সমর্থ হও, তাহলে সুখের অধিকারী হতে পারবে। বুদ্ধ বলেছেন-হে ভিক্ষুগণ! আপনাকে আপনি পরীক্ষা করবে। অর্থাৎ নিজের চিন্তে কতটুকু জ্ঞান উদয় হয়েছে, সেটা পর্যবেক্ষণ করা। আমার চিন্তে এতটুকু জ্ঞানের উদয় হয়েছে, সে সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষক হয়ে অবস্থান করা। বনভণ্ডে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের কাজ হল নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে (নিজকে নিজে) পরীক্ষা করে দেখা। তোমাদেরকে কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কোন প্রফেসার বা প্রিন্সিপালের নিকট পরীক্ষা দিতে হবে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহ প্রকৃত জ্ঞানের পরীক্ষা নয়; অজ্ঞানের পরীক্ষা। সেরূপ পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। পূজ্য বনভণ্ডে প্রশ্ন করেন-তোমাদের পরীক্ষা কি রকম?

ভস্বে, আমার নিজের কতটুকু জ্ঞান অর্জিত হয়েছে সেটা পরীক্ষা করা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। অপরকে পরীক্ষা করা নয় নিজকে নিজে পরীক্ষা করাই জ্ঞানীদের কাজ। তোমরা সর্বদা নিজের কতটুকু জ্ঞান উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষক হয়ে অবস্থান কর। এতে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা সহজ হবে।

তোমরা কোনকিছু দেখলে শুধুমাত্র ‘দেখছি, দেখছি’ বলে স্মৃতি করবে। মানুষ দেখছি, কুকুর বিড়াল দেখছি, পুরুষ দেখছি, মহিলা দেখছি, অমুককে দেখছি, সমুককে দেখছি ইত্যাদি বলে দৃশ্যতঃ বিষয়ে চিন্তা করা যাবে না। কারণ দৃশ্যতঃ বিষয়ে ‘আমি মানুষ দেখেছি, পুরুষ দেখেছি, মহিলা দেখেছি’ বলে বিচার করলে তাতে সেই সেই বিষয়ে চিন্তা উৎপন্ন হয়। আর সে চিন্তের দ্বারা তখন কাম-ক্রোধাদি ভাবগুলোর উদয় হতে থাকে, রিপুসমূহ মনে স্থান খুঁজে পায়। এ অবস্থায় রিপুসমূহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। মনকে ধ্যান বিষয়ে ফিরায়ে আনতে দুঃখ পেতে হয়। কোন শব্দ শুনলেও শুধুমাত্র ‘শুনছি (বা শব্দ) শুনছি’ বলে স্মৃতি করবে। মানুষের শব্দ শুনছি, পশু-পক্ষীর শব্দ শুনছি, পুরুষের শব্দ শুনছি, মহিলার শব্দ শুনছি, কথাবার্তার শব্দ শুনছি, গানের শব্দ শুনছি, বাঘের শব্দ শুনছি, ভল্লকের শব্দ শুনছি, হাতির শব্দ শুনছি, অমনুষ্যের শব্দ শুনছি (ভূত-প্রেত-যক্ষ) ইত্যাদি বলে শব্দকে বিচার করা যাবে না। কারণ শব্দকে অমুকের শব্দ, সমুকের শব্দ বলে চিন্তা করলে সেই সেই বিষয়ে চিন্তা উৎপন্ন হয়। সেই চিন্তা বিবিধ প্রকারে দুঃখ সৃষ্টি করে থাকে। কোন গন্ধ নাকে এলেও শুধুমাত্র ‘গন্ধ (বা গন্ধ পাচ্ছি), গন্ধ’ বলে স্মৃতি করবে। মানুষের গন্ধ পাচ্ছি, বাঘের গন্ধ পাচ্ছি, বানরের গন্ধ পাচ্ছি, পুরুষের গন্ধ পাচ্ছি, মহিলার গন্ধ পাচ্ছি, সুগন্ধ পাচ্ছি, দুর্গন্ধ পাচ্ছি বলে গন্ধকে বিচার করতে পারবে না। কারণ ‘এটা অমুকের গন্ধ’, ‘সেটা সমুকের গন্ধ’ বলে বিচার করলে সেই সেই চিন্তা উৎপন্ন হয়। সেই চিন্তা বিবিধ দুঃখের হেতু হয়ে থাকে। কোন কিছু রসান্বাদন করলেও শুধুমাত্র ‘খাচ্ছি (বা গিলছি) খাচ্ছি’ বলে স্মৃতি করবে। কি খাচ্ছি? কিসের টুক খাচ্ছি? কিসের মিষ্টি খাচ্ছি? কিসের ঝাল খাচ্ছি? ইত্যাদি বলে খাদনীয় দ্রব্য বিচার করা যাবে না। কারণ তাতে সেই সেই বিষয়ে চিন্তা উৎপন্ন হয়ে বিবিধ দুঃখ সৃষ্টি করে থাকে। মনে কোন চিন্তা উদয় হলেও শুধুমাত্র ‘চিন্তা করছি’ বলে স্মৃতি করবে। কি বিষয় চিন্তা করছি তা’ বিচার করা যাবে না। কারণ তাতে সেই সেই বিষয়ে চিন্তা উৎপন্ন হয়ে বিবিধ দুঃখের হেতু হয়ে থাকে। এভাবে সর্বদা স্মৃতির সহিত অবস্থান করবে। যাতে কোন কাম-ক্রোধাদি ভাবগুলো উদয় হতে না পারে। রিপুসমূহ মনে স্থান খুঁজে না পায়। অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-এসব উপদেশ মনে থাকবে তো? ভস্বে, থাকবে। তাহলে সর্বদা স্মৃতির

সহিত অবস্থান কর। ইহাই জ্ঞান লাভ ও দুঃখমুক্তি নির্বাণ উপলব্ধি করার উপায়।

তিনি আরো বলেন—তোমরা কখনো মূর্খের সঙ্গে মিশতে যাবে না। মূর্খের সঙ্গে মিশলে বা বন্ধুত্ব করলে বিবিধ দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিপদ যেন নিত্য সঙ্গী হয়ে অনুসরণ করতে থাকে। মূর্খের সংসর্গে কোন উপকার, মঙ্গল সাধিত হয় না; বরং পরিহানি, অধঃপতন সুনিশ্চিত হয় মাত্র। বলা যায়, মূর্খের সংসর্গ সর্বনাশই ডেকে আনে। তাই মূর্খ থেকে সর্বদা দূরে সরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কখনো মূর্খদেরকে বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু পণ্ডিতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোন বিকল্প নেই। তাদের সহিত মিশলে কোন বিপদে পড়তে হয় না; অধঃপতন, পরিহানি হবার শঙ্কা থাকে না। বরঞ্চ তাদের সংগে আপন জীবনে প্রতিফলিত হয়ে নিজের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ বর্ধিত হয়। তাদের সান্নিধ্যে সদ্ধর্মের জ্ঞানচক্ষু উদয় হয়, সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়; দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথও সুগম হয়ে থাকে। তাদের সংসর্গই করা উচিত। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মূর্খের সংসর্গ সব সময় পরিত্যাজ্য আর পণ্ডিতের সংসর্গ সর্বপ্রকার কাম্য। তাই তো বলা হয়েছে—

করিয়া মূর্খের সনে পণ্ডিত বিহার,
জ্ঞানযোগে সর্বপাপ করি পরিহার।

দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে হলে তোমাদের প্রবল বীর্যের সহিত সাধনামার্গে অগ্রসর হতে হবে। শত বাধা, বিপত্তিতেও নিরুৎসাহ হওয়া যাবে না। এমন কি সেই লক্ষ্য অর্জনে জীবনপণ বাজি রাখতেও প্রস্তুত থাকতে হবে; কোন অবস্থাতে পিছপা হতে পারবে না। বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষুগণ কি রকম সংকল্প করে জঙ্গলে প্রবেশ করত জান? ‘আমি বীর্যরূপ কবচ দ্বারা কায়া, জীবনের মমতা ত্যাগ করে কাননে প্রবেশ করব; অরহত না হওয়া পর্যন্ত এ কানন হতে বের হবো না। ভগবান বুদ্ধও গৃহত্যাগ করার পর গয়াধামের নৈরঞ্জন নদীর তীরে এসে এরূপে সংকল্প করেছিলেন—

করিয়াছি পণ করে প্রাণপণ,
মুক্তির পথ অশেষিব,
সাধিতে নারিলে নৈরঞ্জন নদী তীরে,
এ জীবন বিসর্জিব।

তোমাদেরকেও ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ সেই ভিক্ষুগণের দৃঢ় বীর্যপূর্ণ সাধনাকে স্বীয় জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করার সময় যদি কখনো চিন্তে দুর্বলতা ভাব প্রকাশ পায় তখন ভগবান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণের সেই বীর্যদৃষ্ট সংকল্পের কথা স্মরণ করবে। তাহলে

চিন্তে পুনরায় অসাধারণ মনোবল ফিরে আসবে। সেরূপ অসাধারণ মনোবল ও অপরাজেয় বীর্য দ্বারা বীর বিক্রমের সহিত মারকে পরাজিত করা যায়। কারণ প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে তৃষ্ণাকেও হার মানতে হয়। তোমরা যদি একান্তই নির্বাণ লাভের আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে সাধনায় নেমে পড়, তাহলে তোমাদের নির্বাণ অধিগত হবেই। সেরূপ আত্মপ্রত্যয়ী সাধনা করতে পারবে কি? ‘আমি অরহত্ব লাভ না করা পর্যন্ত কোন অনু-পানীয় স্পর্শ করব না, রুম হতে বের হবো না’ এরূপ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ভাবনায় বসতে পারবে কি? প্রবল বীর্য বলে বলীয়ান হলে পারবে-অন্যথায় নয়। কিন্তু তোমাদেরকে সেরূপ বলীয়ান বলে মনে হচ্ছে না। এবার পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষুগণ কি রকম সংকল্পবদ্ধ হয়ে সাধনা করেছিল? ভঙ্কে, তাঁরা এরূপে সংকল্পবদ্ধ হতো ‘আমি বীর্যরূপ কবচ দ্বারা কায়া জীবনের মমতা ত্যাগ করে কাননে প্রবেশ করব; অর্হৎ না হওয়া পর্যন্ত এ কানন হতে বের হবো না’। হ্যাঁ, বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষুগণ সেরূপ দৃঢ় বীর্যবান ছিলেন। তোমরাও তাঁদের মত দৃঢ় বীর্যবান হতে সচেষ্ট থাক।

পূজ্য বনভঙ্কে বলেন-তোমরা নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ কর। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। একদা জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ভঙ্কে, সকলে ব্রহ্মচার্যের কথা বলে, কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মচার্য কাকে বলে? ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করাকে ব্রহ্মচার্য বলে। যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে চলে তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। তাই শুধুমাত্র কাষায়বস্ত্র পরিধান করে মাখামুগুন করতঃ ভিক্ষু-শ্রামণ হলে, অবিবাহিত থাকলে এবং অনাগারিক জীবন-যাপন করলেও তাদেরকে ব্রহ্মচারী বলা যাবে না; আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে পূজ্যানুপূজ্বরূপে মেনে চললে তবেই প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। আর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে চললে যে কোন জনকে ব্রহ্মচারী বলা যায়। বর্তমানে অনেকে নিজের নামের সাথে ব্রহ্মচারী শব্দটি যুক্ত করে থাকে। কিন্তু সেভাবে নামের সাথে ব্রহ্মচারী যুক্ত করে বা মুখের জোরে কেহ ব্রহ্মচারী হতে পারে না। ব্রহ্মচারী বলার আগে দেখতে হবে সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে কিনা। সর্বোপরি, তার কায়া-বাক্য-মনে কোন প্রকার কলুষভাব রয়েছে কিনা। তোমরা নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ কর, শিথিল ব্রহ্মচার্য আচরণ করবে না। শিথিল ব্রহ্মচার্য আচরণ করলে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ভোগ করতে হয়। আমার সাথে বলো “আমরা নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ করব, শিথিল ব্রহ্মচার্য আচরণ করব না”। পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন-শিথিল ব্রহ্মচার্য আচরণ করলে কি হয়? ভঙ্কে, সুফলের পরিবর্তে কুফলই ভোগ করতে হয়। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমরা নিম্পাপ ব্রহ্মচার্য আচরণ কর,

তাতে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করতে সমর্থ হবে। নিস্পাপ অর্থ পরিশুদ্ধ, যেখানে কোন পাপ নেই। কাম্যসুখ ও আত্মপীড়ন বর্জিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করলে ইহজন্মে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায় বা অরহত্ব লাভ হয়। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক নির্দেশিত এ' আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথ। অন্য কোন মার্গ অনুশীলনে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায় না বা অরহত্ব লাভ হয় না। অরহত্ব অর্থ যার ক্রেশ অরিসমূহ ধ্বংস হয়েছে, যিনি সকল প্রকার ক্রেশ মুক্ত হয়েছেন। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, আলস্য, চঞ্চলতা, নিলজ্জতা ও নির্ভয়তা-এ' দশ প্রকার ক্রেশমুক্ত ও সর্বভৃক্ষা জয়ী এবং ইহকালে নির্বাণসুখ প্রত্যক্ষকারী পুদালকে অরহত্ব বলা হয়। অহংগণ পঞ্চমারকে পরাভূত করে থাকেন। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে অহং চেনা সম্ভব নয়। কারণ নিজে লৌকিকের মধ্যে অবস্থান করে কিরূপেই বা লোকোত্তর পুদালকে জানবে বা চিনতে পারবে? তাই বলা হয়েছে—

প্রপঞ্চ বিহীন মুনি যেইজন স্থিতি নাহি যার সংসারে,
বন্ধন ছিড়িয়া প্রাচীর লঙ্ঘিয়া গিয়াছেন যিনি পরপারে।

এইরূপ মহা বিতৃষ্ণা মুনি জ্ঞান-ধ্যান-যোগে সম্বরণে,
দেব ব্রহ্মা তাঁরে জানিতে না পারে, জানিবে তাঁহারে কোন নরে?

সকল ভৃক্ষা ক্ষয়কারী, বিমুক্ত পুরুষ অরহতকে সাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রকৃতরূপে অরহতকে চিনতে হলে নিজকেও সেইরূপ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তোমরা সংসার অতিক্রম, কাম অতিক্রম করতে তৎপর থাক। পারবে কি? সংসার অতিক্রম, কাম অতিক্রম করতে না পারলে প্রব্রজিত জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যারা প্রব্রজিত জীবন ত্যাগ করে গৃহী হয়ে যাচ্ছে তারা সংসার অতিক্রম, কাম অতিক্রম করতে পারছে না বলে তা' করতেছে। তবে সংসারের চাকচিক্যময় বেড়াজাল অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করা সহজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন অসাধারণ জ্ঞানশক্তি, যেই জ্ঞানশক্তির নিকট সংসারের চাকচিক্যময় দৃশ্যগুলো পরাভূত হয়ে যাবে। সেরূপ জ্ঞানশক্তি অর্জনের জন্য তোমরা সংসারে দুঃখসমূহকে স্মৃতির মানসপথে জাগরুক রাখতে সচেষ্ট থাক। সংসার দুঃখের নিখুঁত চিত্রসমূহ দর্শন করতে সক্ষম হলে সেই জ্ঞানশক্তি লাভ হয়। তখন আর সংসারের চাকচিক্যময় দৃশ্যসমূহের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ থাকে না; বরঞ্চ বিতৃষ্ণা জন্মায়। পূজ্য বনভাস্ত্রে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—সেই জ্ঞানশক্তি অর্জন করতে পারবে কি? ভাস্ত্রে, আশীর্বাদ করুন—যাতে জ্ঞানশক্তি অর্জন করতে পারি। এ জন্যে তোমরা অতিসত্বর বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর। তাই বলা হয়েছে—

বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
 রূপরূপ দেখ ঘৃণ্য অশুভ লক্ষণ ।
 বেদনার অনুভূতি দুঃখ হাহাকার,
 ক্রণেতে ভোজবাজি অনিত্য অসার ।
 সংজ্ঞা চেতনা চিন্তের বিজ্ঞান,
 বিদর্শনে তৃষ্ণা দৃষ্টি হবে অস্তর্ধান ।
 অশুভ লক্ষণ সবে দেখ বারংবার,
 নিত্য নহে শুধু দুঃখ সকলি অসার ।
 স্মৃতি ধ্যানে চারি সত্য কর উদ্ধার,
 দুঃখের স্বরূপ সত্য দেখ পুনর্বার ।
 দুঃখের মূল হেতু তৃষ্ণা সমুদয়,
 হেতুর নিরোধে রুদ্ধ জ্ঞাতি ভবোদয় ।
 দৃঢ়চিন্তা বিধি মত স্মৃতি বিদর্শনে,
 তৃষ্ণা দৃষ্টি চ্যুতি হবে জ্ঞান বৃদ্ধি সনে ।
 ভাবনা প্রণালী ঠিক হইল বর্ণন,
 শাস্তির সন্ধান এই প্রজ্ঞার দর্শন ।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা সর্বদা মনের উন্নতি সাধন কর । কিভাবে করবে? জ্ঞানত বিষয় চিন্তা করে । জ্ঞানত বিষয় চিন্তা করলে মনের উন্নতি সাধন হয়ে থাকে । কখনো অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে বিষয় চিন্তা করবে না । অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে বিষয় চিন্তা করলে মন নিল্গামী হয়, পরিহানির দিকে ধাবিত হতেই থাকে । আমার সাথে বলো “আমরা সর্বদা জ্ঞানত বিষয় চিন্তা করে মনের উন্নতি সাধন করব । কখনো অজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করব না” । মনে রাখবে, মনের উন্নতি সাধন করতে পারলে সুখ, আর মন নিল্গামী হলে দুঃখই পেতে হয় । পূজ্য বনভঙ্কে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করেন—তোমরা কি করবে? ভস্তু, মনের উন্নতি সাধন করব । হ্যাঁ, ঠিক বলেছ । তোমরা সব সময় মনের উন্নতি সাধন কর । মনের উন্নতি হলে প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায় । দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে ।

সাধু, সাধু, সাধু ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তোমরা পোকায় খাওয়া টক আম খাবে না

এক সময় লোকোত্তর মহাপুরুষ পূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভঙ্কে) মহোদয় রাজবন বিহারের দেশনালায়ে আয়োজিত দানানুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন—সদ্ধর্ম দেশনা বুঝা সহজ কথা নয়, বড়োই মুশকিল। সেই সদ্ধর্ম দেশনা কিরূপ? দান কথা, শীল কথা, স্বর্গ কথা, কামের আদীনব কথা। এসবের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধ চতুরার্য সত্য ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেই চারি আর্থ সত্যের কথা শ্রবণ করলে শ্রোতাদের অকুশল দূরীভূত হয় এবং কুশলকার্য সম্পাদনে উৎসাহ জাগে। এতে ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ লাভ হয়ে থাকে। বর্তমানে দানের কথা বললে লোকজনেরা বিশ্বাস করতে চায় না। অধিকন্তু ভিক্ষুকে তাচ্ছিল্য স্বরে বলে, সে নিজে খাওয়ার জন্য একথা বলতেছে। অনেক বড়ুয়া দায়ক-দায়িকা আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে, ভণ্ডে আজকাল ভিক্ষুরা শুধু দানের কথাই বলে, এটা নিজেদের উদর পূর্তির জন্য নয় কি? তজ্জন্য আমি দানের কথা খুব একটা বলি না, শীলের কথাই বলি। কারা দানের কথা বলার উপযুক্ত জ্ঞান? ভগবান বুদ্ধ, শারীপুত্র, মহাকাশ্যপ প্রমুখ। ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র আর শারীপুত্র আশি কোটি সম্পদশালী ধনী। তাঁদের মুখেই দানের কথা শোভা পায়। তাঁরা দানের কথা বললে লোকজনেরা সেটা নিজের উদরপূর্তির কথা বলতে পারবে কি? পারবে না। অন্যদিকে নিঃসন্দেহে সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে। বুদ্ধের সময়কালীন সেকরূপও হয়েছিল। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণ নিজেরা বিপুল ভোগৈশ্বর্য ত্যাগ করে প্রব্রজিত হওত জনসাধারণের প্রতি অনুকম্পা পরায়ণ হয়ে তাদেরকে ত্যাগধর্মে প্রতিষ্ঠিত করাতে, নির্বাণ সুখ লাভের হেতু উৎপন্ন করে দিতে দানাদি কথা সম্পর্কিত সদ্ধর্ম দেশনা করেছিলেন। বর্তমানে ভিক্ষুরা সেকরূপ ভোগসম্পদ ত্যাগের গুণ প্রদর্শন করতে সক্ষম নয় বিধায় দায়ক-দায়িকাগণ তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না।

ভগবান বুদ্ধের প্রত্যেক দেশনার মর্মার্থ হল—‘ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই মহিমা; ভোগেই দুঃখের মূল, ভোগেই দোষপূর্ণ’। এটা বুদ্ধের সদ্ধর্ম দেশনার সারমর্ম। তোমাদেরকে এগুলো বুঝতে হবে। কিভাবে? সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভোগ করলে দুঃখ পেতে হয়, ভোগ করলে দোষ উৎপন্ন হয় বা হতে বাধ্য। পঞ্চাঙ্গুরে ত্যাগ করলে সুখ অর্জিত হয়, নির্দোষ জীবন লাভ হয়ে থাকে। জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে ও আনন্দ মিত্র ভণ্ডেদ্বয় আমাকে বলেছিলেন—তুমি খুব বেশি ত্যাগ করে ফেলেছ,

আমরা তোমার মতন করে ত্যাগ করতে সক্ষম হবো না। সেই ত্যাগ কি? অঙ্গ ত্যাগ, জীবন ত্যাগ, ‘আমি মানুষ’, ‘সে পুরুষ’, ‘সে মহিলা’ এ ধারণা ত্যাগ। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-“জ্ঞানী ব্যক্তি স্বল্পসুখ পরিত্যাগ হেতু যদি বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখতে পায়, তবে স্বল্পসুখ অবশ্যই ত্যাগ করবে”। আবার জ্ঞানী ব্যক্তি (অধর্মতঃ উপায়ে) নিজের জন্য অপরের জন্য ধন কামনা, পুত্র কামনা, রাষ্ট্র কামনা এমনকি আপন সমৃদ্ধিরও ইচ্ছা পোষণ করেন না। তিনিই প্রকৃত শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক। আমার হৃদয় মন্দিরে এসব উপদেশ সর্বদা বেজে চলতো, যার ফলে নিজকে ত্যাগধর্মে স্থির রাখতে সক্ষম হয়েছি। তোমাদেরকেও এসব উপদেশের মাধ্যমে নিজের জীবন গঠন করতে হবে। তিনি উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন-সেই উপদেশ কি? সবাই এক স্বরে বলে উঠল-“জ্ঞানী ব্যক্তি স্বল্পসুখ পরিত্যাগ হেতু যদি বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখতে পায়, তবে স্বল্পসুখ অবশ্যই ত্যাগ করবে”। এসবের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয়, সত্য লাভ হয়। জ্ঞান ও সত্য লাভ হলে অনাবিল সুখ। আর তার উল্টো বা বিপরীতে অজ্ঞান, মিথ্যার উদয় হয়। অজ্ঞান ও মিথ্যা উদয় হলে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করতে হয়।

বৌদ্ধধর্ম গুরুগম্ভীর ধর্ম। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা এ’ ধর্ম বুঝা সম্ভব নয়। বুদ্ধ বার বার বলেছিলেন-‘সাধারণ মানুষ এ’ ধর্ম অনুধাবন করতে পারবে না’। অর্থাৎ যারা স্বল্প জ্ঞানী বা স্বল্প জ্ঞানের পূজারী তারা কিছুতেই বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করতে সমর্থ হবে না। কেবলমাত্র অসাধারণ জ্ঞানীরাই বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম; অসাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে এ’ ধর্ম অনুধাবন করতে হয়। সেই অসাধারণ জ্ঞান কি? চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান। এ’ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, মনচিন্তা পাপপঙ্কের উর্ধ্বে উঠে। আর সেরূপ মনচিন্তা সহজে মাররাজ্য অতিক্রম করতঃ নির্বাণরাজ্যে পরম সুখে, পরম শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক-এ’ ত্রিলোকে তথা মাররাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে কষ্ট পেতে হয়, পাপ থাকে এবং দুঃখ হতে মুক্ত সম্ভব নয়। অন্যান্য ধর্মসমূহ মাররাজ্যের মধ্যে থেকে আচরণ করতে সক্ষম হলেও বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। কারণ মার বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে দেয় না। বৌদ্ধধর্মকে মার পছন্দ করে না। মার কি বলে জান? যারা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করে তাদেরকে খতম করব। বৌদ্ধধর্ম আমার কোন প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধধর্ম আচরণের মাধ্যমে কাউকে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে দেবো না।

পূজ্য বনভক্তে আরো বলেন-যারা ক্লেশমার, স্কন্ধমার, অভিসংস্কারমার, বশবর্তী দেবপুত্র মার, মৃত্যুমার-এই পঞ্চমারকে জয় এবং আত্মজয় করতে পারবে তারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী হবে। আচ্ছা, তোমাদের মত সাধারণ

গৃহীদের পক্ষে কি তা' সম্ভব হবে? উপস্থিত দায়ক-দায়িকারা একবাক্যে বলে উঠলেন-ভক্ত, আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা পারি। আত্মজয়, আত্মদমনই প্রকৃত সুখ। মনে রাখবে, যেই ব্যক্তি নিজকে দমন করতে সক্ষম, সেই সুখী। আত্মদমন, আত্মজয়ের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত রয়েছে। তোমরা সবাই আমার সাথে বলো-‘আত্মদমনই সুখ, আত্মজয়ই সুখ’। আত্মদমন করতে পারলে মারও দমন হয়ে যায়। তাই বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হচ্ছে, অপরকে দমন করো না, তা' করারও দরকার নেই। নিজকে দমন কর। নিজকে দমন করতে পারলে প্রকৃত সুখ, শান্তি লাভ হয়। কিভাবে নিজকে দমন করবে? চারি আর্য সত্যের দ্বারা। চারি আর্যসত্যের মাধ্যমে পাপ বিরতি হয়ে নিজকে দমন করা, নিজকে জয় করাই হল বৌদ্ধধর্ম। আমি আবারো বলছি, তোমাদেরকে নিজকে নিজে পাপ হতে উদ্ধার করতে হবে, নিজকে নিজে দমন করতে হবে, নিজকে নিজে জয় করতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত বৌদ্ধদের কাজ। আমি বনভক্তেও নিজেই নিজকে পাপ হতে উদ্ধার করেছি, নিজকে নিজেই দমন করেছি, নিজকে নিজেই জয় করেছি। এখন তোমরা পারবে, কি পারবে না-সেটা নিজেরাই যাঁচাই করে দেখ। আমি যেভাবে নির্বাণসুখ প্রত্যক্ষ করতঃ পরম শান্তিতে অবস্থান করছি, তোমাদেরকেও ঠিক সেইভাবে অবস্থান করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। যেমন, আমি ভালো, মিষ্টি রসালো (পাঁকা) আম খেয়ে তোমাদেরকে পোকায় খাওয়া, টক আম খেতে বলছি না। আমি ভালো, মিষ্টি আম খেয়ে তোমাদেরকে যদি পোকায় খাওয়া, টক আম খেতে বলি তোমরা আমাকে বদনামি করবে না? উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। নিশ্চয় করবে। তখন তো বলবে বনভক্তে ভালো না। উনি নিজে মিষ্টি, ভালো আমগুলো খাচ্ছেন অথচ আমাদের কিনা পোকায় খাওয়া, টক আমগুলো খেতে বলছেন। তিনি দায়ক-দায়িকাবৃন্দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন কি এমন বলবে তো? কয়েকজন উত্তর দিলেন-হ্যাঁ, বলবো ভক্ত। নির্বাণ সুখই হল ভালো, মিষ্টি আম, আর মনুষ্য সুখ, দেবতা সুখ, ব্রহ্ম সুখ এগুলো হল পোকায় খাওয়া, টক আম সদৃশ। কাজেই আমি যেমন নির্বাণ সুখে অবস্থান করছি, তোমাদেরকেও তেমনি সুখের অধিকারী হতে উৎসাহিত করছি, অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছি, পরামর্শ দিচ্ছি। নির্বাণ সুখ ব্যতীত কোথাও প্রকৃত সুখ নেই, অনবদ্য সুখ নেই। অপরাপর সুখগুলোর মধ্যে দুঃখের পরিমাণও বেশি। সেগুলো শতকরা নিরানব্বই ভাগ দুঃখেই ভরা। বাকী একভাগ মাত্র সুখ। কিন্তু নির্বাণ সুখের মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র নেই। এই নির্বাণ সুখ হল লোকোত্তর সুখ। যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ব্যাধি নেই, মরণ নেই, অগ্নিয় সংযোগ নেই, প্রিয় বিয়োগ নেই, ঈষ্পিত বস্তুর অলাভজনিত কোন দুঃখ নেই। তাই লোকোত্তর

সুখের প্রকৃত অধিকারী হয়ে যারা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ দুঃখের অতীত, তার। ততই সুখের অধিকারী। অপর দিকে মনুষ্য সুখ, দেবতা সুখ, ব্রহ্ম সুখ হল লৌকিক সুখ। এ সকল সুখের মধ্যে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অশ্রিয় সংযোগ, শ্রিয় বিয়োগ, ঈম্পিত বস্তুর অলাভ জনিত অসংখ্য দুঃখের ছড়াছড়ি। তজ্জন্য লৌকিক সুখের মাধ্যমে প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায় না।

তোমরা যদি কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক-এ সকল মার রাজ্যের মধ্যে থাক, তাহলে দুঃখ পাবে, জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়ে থাকতে হবে। আর যদি নির্বাণ রাজ্যে চলে যাও তাহলে কোন প্রকার দুঃখ পাবে না এবং স্বাধীনভাবে গমনাগমন (অবস্থান) করতে পারবে। মার কি করে জান? সত্ত্বগণকে অজ্ঞানের মায়াজালে মোহিত করায় অকুশলকর্ম সম্পাদন করাতে বাধ্য করায়। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ ও সুরাপানাদি সহ যাবতীয় অকুশলকর্ম সম্পাদনে মার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। মার তোমাদেরকে কি বলতেছে জান? এসো আমরা অকুশলকর্ম সম্পাদন করি, সর্বদা অকুশলের মধ্যে থাকি। মার অকুশলে থাকতে রুচিবোধ জন্মায়। আর বুদ্ধের আহ্বান হলো, তোমরা কুশলকর্ম সম্পাদন কর, কুশলের মধ্যেই অবস্থান কর। অকুশলকুপথ ত্যাগ করে, কুশল সুপথের পথিক হও। যাতে পরম সুখ নির্বাণ লাভে সক্ষম হতে পারো। এখন তোমরা নিজকে কোন দিকে নিয়ে যাবে চিন্তা করে দেখ। তবে মনে রাখবে, মারের কথা শুনলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গই অনুসরণ করেন। কখনো মারের প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হয়ে মারের কথা মত অকুশলকর্ম সম্পাদন করে না। বনভঙ্কে বলেন- ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গ হল সুমার্গ এবং বুদ্ধের শিক্ষা হল সুশিক্ষা। আমি তো দেখছি বর্তমানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সেগুলো প্রকৃত সুশিক্ষা নয়। ছাত্র-ছাত্রীরাও কর্ম সংস্থানের সুবিধার্থে একটা সার্টিফিকেট লাভের আশায় সে শিক্ষা গ্রহণ করতেছে। তাই আমি সে শিক্ষাকে পেটের ধাক্কায় শিক্ষা বলে উল্লেখ করি। বুদ্ধের শিক্ষাই উত্তম, এই শিক্ষার মাধ্যমে যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। নির্বাণে পরম সুখ লাভ হয়। একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষার মাধ্যমেই দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যায়। অন্য কোন শিক্ষার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা যায় না। আমি আমার শিষ্যদেরকে বুদ্ধের শিক্ষাই দিই-অন্য কোন শিক্ষা নয়। বাংলাদেশের প্রত্যেক (ইউনিভার্সিটি) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক আমার নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছে। এবং তারা সবাই স্বীকার করেছে যে তাদের কাছে অসাধারণ জ্ঞান নেই, তারা সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী মাত্র। আচ্ছা, তোমাদের কাছে তারা এ' কথা স্বীকার করবে কি? করবে না। এমন কি অন্য সব ভিক্ষুর কাছেও স্বীকার করবে না। কারণ

বর্তমানের ভিক্ষুরাও অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেনি। বনভন্তে জনৈক ভিক্ষুর নামোল্লেখ করে বলেন, সে কিনা বাঘাইছড়ি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাকে নমস্কার করে (ওখানকার লোকজন আমাকে বলেছিল)। অথচ আমি বাঘাইছড়িতে ফাং-এ গেলে সেই টি, এন, ও আমার কাছে দানীয় বস্তু সহ সশ্রদ্ধায় সাক্ষাৎ করতে আসে। আচ্ছা, সেই ভিক্ষুটি তাকে যখন নমস্কার করে তখন তার চিন্তে কি উদয় হবে বল তো? বনভন্তেও ভিক্ষু, এই ভিক্ষুটিও ভিক্ষু। কিন্তু তাদের আচরণ তো সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব কেন হচ্ছে? ভিক্ষুদের জ্ঞানের দুর্বলতার জন্যই তাদের হীন আচরণ দ্বারা বর্তমান ভিক্ষুদের হীনতাভাব প্রকাশ হচ্ছে। কারণ তারা নিম্নস্তরের সাধনা অনুশীলনে রত রয়েছে। তাদের নিকট উচ্চস্তরের সাধনা বিদ্যমান নেই; উচ্চতর জ্ঞান নেই। দায়কের প্রদত্ত দানীয় সামগ্রী সর্বস্ব হয়ে তারা অবস্থান করছে।

ধন পরিহানি, যশ পরিহানি সামান্য মাত্র; কিন্তু প্রজ্ঞা পরিহানি অধিক পরিহানি। মনে রাখবে, ধন সামান্য, যশ সামান্য এগুলোর পরিহানিতে তেমন কিছু আসে যায় না। তদুপরি এসব পুনরায় (সহজে) লাভ করা যায়। কিন্তু প্রজ্ঞার পরিহানি হলে একেবারে রসাতলে যাবে বলে জানবে। তাই আমার সাথে বলো “ধন পরিহানি, যশ পরিহানি সামান্য মাত্র। কিন্তু প্রজ্ঞার পরিহানি অধিক পরিহানি”। আমরা প্রজ্ঞার পরিহানি হতে দেবো না, আমাদের যাতে প্রজ্ঞার পরিহানি না হয়—সে ব্যাপারে সজাগ থাকব। যার কাছে প্রজ্ঞা থাকে, তার কাছে শীলও থাকে। প্রজ্ঞাবান কখনো দুঃশীল হতে পারে না। তাই যারা প্রজ্ঞাবান তারা শীলবান, যারা শীলবান তারা ধার্মিক। শীল-প্রজ্ঞার দ্বারাই দেব-মনুষ্যের মধ্যে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব। দুঃপ্রাজ্ঞ, দুঃশীল হলে সর্বদা পরাজয়ের গ্লানি বহন করে চলতে হয়। পরিহানি ছায়ার মতন অনুসরণ করে। তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না। দুঃপ্রাজ্ঞ কাকে বলে? যারা দুঃখ কি, জানে না; দুঃখ সমুদয় কি, জানে না; দুঃখ নিরোধ কি, জানে না; দুঃখ নিরোধের উপায় কি, জানে না; তারাই দুঃপ্রাজ্ঞ। প্রজ্ঞাবান কাকে বলে? যারা দুঃখ কি, জানে; দুঃখ সমুদয় কি, জানে; দুঃখ নিরোধ কি, জানে; দুঃখ নিরোধের উপায় কি জানে; তারাই প্রজ্ঞাবান। তোমরা প্রত্যেক দায়ক-দায়িকাবৃন্দ প্রজ্ঞাবান হও, কখনো দুঃপ্রাজ্ঞ হবে না। প্রজ্ঞাবান হতে পারলেই যথেষ্ট; ধন-যশের চিন্তা করতে হবে না। মনে রাখবে, ধন-যশ সামান্য, তুচ্ছ; প্রজ্ঞাই আসল সম্পদ। তোমাদের যদি প্রজ্ঞার পরিহানি ঘটে তাহলে আমিও লজ্জিত হবো। কাজেই সাবধান, প্রজ্ঞার পরিহানি হয় মত কোন কার্য করবে না। এতে তোমাদের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ হবে।

তোমরা জ্ঞান বলে উচ্চতা লাভ করবে। হীন, নীচ কাজসমূহ সম্পাদন করবে না। সেই জ্ঞান কি? চারি আর্থসত্য জ্ঞান। এ’ চারি আর্থসত্য জ্ঞানের দ্বারা

তোমাদেরকে উচ্চতা লাভ করতে হবে। চারি আর্যসত্য জ্ঞানের মাধ্যমে মনচিহ্ন পাপপঙ্ক হতে অনেক উর্ধ্বে বিচরণ করলে তখন আর অজ্ঞানমূলক নীচ (অকুশল) কর্ম সম্পাদন করা যায় না। মনে রাখবে, এবিধ উপায়ে উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করলে প্রকৃত সুখ লাভ হয়, যাবতীয় দুঃখ থেকে চির নিবৃত্তি লাভ হয়। তোমরা উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনা অনুশীলন কর। যারা উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করে তারাই সুখী, তারাই দুঃখ থেকে মুক্ত। কখনো নিঃসত্তরের সাধনা ও হীন জ্ঞানের সহিত অবস্থান করো না। যারা হীন জ্ঞান ও নিঃসত্তরের সাধনা অনুশীলন করে, তারা ইহকালেও দুঃখ ভোগ করে, পরকালেও দুঃখ ভোগ করে। তাদের জন্য ইহ-পর উভয়কালও দুর্বিষহ দুঃখপূর্ণ হয়ে থাকে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করতে সচেষ্ট থাক। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হলে আর পাপমূলক কর্মসমূহ সম্পাদন করতে পারবে না। কারণ ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হলে পাপকর্ম সম্পাদন করতে লজ্জা লাগবে। বর্তমানে তোমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু নেই বলে পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জা পাচ্ছ না। নিঃসঙ্কোচেই একের পর এক পাপকর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছ। যেদিন ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় (লাভ) হবে, সেদিন হতে যাবতীয় পাপকর্ম পরিত্যাগ করবে। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের দিকে তাকিয়ে পূজ্য বনভক্তে প্রশ্ন করেন- এখন কেন পাপকর্ম সম্পাদন করতেছ? দায়ক-দায়িকাবৃন্দ একবাক্যে উত্তর দিলেন-ভক্তে, আমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হয়নি বলে। বনভক্তে-হ্যাঁ, ঠিক। যেদিন তোমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হবে সেদিন তোমরা আপনা-আপনি সমস্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ করবে, আমাকেও আর বেশি উপদেশ দিতে হবে না। তাহলে তোমাদের কর্তব্য কি? ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করতে সচেষ্ট থাকাই তোমাদের কর্তব্য। আমার সাথে বলো “আমাদের অচিরেই ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হউক। এই ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করে আমরা যাবতীয় পাপ ত্যাগ করতঃ চিরশান্তি, চিরসুখ অর্জনে যেন সমর্থ হই; যাতে আমাদের অধোগতি না হয়, উর্ধ্বগতিই হয়; পরিহানি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধিই যেন হয়; এবং আমাদের ইহকাল-পরকালে যেন সুখ লাভ হয়।” আমি আবারো বলছি, তোমরা ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। কোন প্রকার বিলম্ব বা অবহেলা না করে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূরণে যত্নশীল হও। এতে তোমাদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হবে, পরিহানি হবে না; উর্ধ্বগতি লাভ হবে, নিঃসঙ্গামী হবে না এবং পরম সুখ শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে। তোমাদের অতিসত্ত্বর ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হোক। যাতে তোমাদের সুখ, শান্তি, মঙ্গল বয়ে আনে।

সাধু, সাধু, সাধু।

শীল পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়

এক সময় পূজ্য বনভন্তে দেশনালায়ে অনুষ্ঠিতব্য দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-ত্রিশরণ গ্রহণ দুই প্রকার। লৌকিকভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ আর লোকোত্তরভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ। লৌকিকভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ করলে সেখানে মার থাকে। ফলে পরবর্তীতে বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সজ্জের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে না এবং দুঃখ পেতে হয়। অন্যদিকে, ত্রিশরণ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্গফলে উন্নীত হলে অর্থাৎ লোকোত্তরভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ করলে মার থাকতে পারে না। ফলে বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সজ্জের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অটুট থাকে। এবং চিন্তের মধ্যে সর্বদা সুখ অনুভূত হয়। মনে রাখতে হবে, চিন্তে মার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ত্রিশরণ গ্রহণ তথা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করলে দুঃখ পেতেই হয়। কারণ বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে থাকলে মার দুঃখ পায়, মারের কাছে বৌদ্ধধর্ম অসহ্য লাগে। তাই আমি বলি, তোমরা মার রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করো না; নির্বাণ রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আচরণ কর। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তো 'এটা মার রাজ্য' আর 'এটা নির্বাণ রাজ্য' বলে বিভাগ করে জানা সম্ভব হচ্ছে না। শুধুমাত্র তোমরা কেন, বর্তমানে ভিক্ষুরাও তা' জানতে সমর্থ হচ্ছে না। তাই গৃহী, ভিক্ষু উভয়ে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ধর, একটি গরুকে দীঘিনালা থেকে রাজ্যমাটিতে আনা হল, সে গরুটি কি সেটা জানতে পারবে? পারবে না। আবার যদি রাজ্যমাটি থেকে রাউজানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন কি গরুটি জানতে পারবে যে আমি রাউজানে এসেছি? তাও পারবে না। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে পূজ্য বনভন্তে বলেন-পারবে কি? দায়ক দায়িকাবৃন্দ-ভন্তে, পারবে না। এবার বনভন্তে গম্ভীর স্বরে বলেন-আমি তো তোমাদেরকে সেরূপই দেখতেছি। তোমরা গরুটির মতন কোনটি মাররাজ্য, কোনটি নির্বাণ রাজ্য তা না জানেই অবস্থান করতেছ। তোমরা যতো বড়ো ডিম্বিধারী হও না কেন, অথবা যতো নাম করা ভদ্রলোক হও না কেন, আমার দৃষ্টিতে সবাই অজ্ঞান। অজ্ঞান বলেই অকুশলকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। অথচ কতো করেই না আমি তোমাদেরকে অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে বারণ করছি। কিন্তু কই কতো জনেই বা তা' পালন করতেছ? অজ্ঞান লোকের স্বভাবই এ'রকম। তারা প্রাণীহত্যা করলে কি পাপ হয় তা' জানতে পারে না, চুরি করলে কি পাপ হয় তা' জানতে না, ব্যভিচার করলে কি পাপ হয় তা' জানতে পারে না, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য বললে কি পাপ হয় তা' জানতে পারে না, মদ্যপানাদি নেশা সেবন করলে কি পাপ হয় তা' জানতে পারে না। ফলে তারা নিজকে পাপকার্য হতে বিরত রাখতে পারে না।

তাই তাদের পক্ষে শীল পালন সম্ভব নয়। মনে রাখবে, যারা পাপকার্য হতে বিরত, কেবলমাত্র তাদের পক্ষে শীল পালন করা সম্ভব। কাজেই শীল পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। শীল পালন করতে হলে জ্ঞানী হওয়া চাই এবং নিজেকে পাপ হতে বিরত রাখতে হবে। আবার, অজ্ঞানী ব্যক্তির পাপমূলক কর্ম সম্পাদন করলেও তা' পাপ নয় বলে মনে করে, অন্যায়মূলক কর্ম সম্পাদন করলেও তা' অন্যায় নয় বলে মনে করে। অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করলেও তা' অপরাধ নয় বলে মনে করে থাকে। এমন কি অপরজনে তা' দেখায়ে দিলেও পাপ, অন্যায়, অপরাধ হিসাবে স্বীকার করে না। ফলতঃ অজ্ঞানীর কখনো পাপ, অন্যায়, অপরাধমূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানীর পাপ, অন্যায়, অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করলে তা' পাপ, অপরাধই মনে করে। এবং কেহ সেরূপ ভুল দেখায়ে দিলেও তা' স্বীকার করে নেয়। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে দৈবাৎ কোন পাপ, অন্যায়, অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদিত হলে তা' পুনরায় সংঘটিত হয় না। তারা নিজেদেরকে পাপ, অন্যায়, অপরাধ হতে বিরত রাখতে সক্ষম হন। কারণ তারা এরূপ চিন্তা করেন যে-আমি যদি পাপ, অন্যায়, অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করি তাহলে আমাকে বিবিধ দুঃখভোগ করতে, পরে অনুতাপের অনলে দক্ষ-বিদক্ষ হতে হবে। কাজেই আমি পাপ, অন্যায়, অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করব না।

বুদ্ধ বলেছেন, সাধারণ জ্ঞানীদের পক্ষে আমার ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। আচ্ছা, এখন তোমরাও আমাকে প্রশ্ন করতে পার-'ভক্তে, আপনি বি, এ; এম, এ পাশ না করলে প্রব্রজ্যা দেন না, তারা কি অসাধারণ জ্ঞানী'? আমার উত্তর হবে-না, বি, এ; এম, এ পাশও সাধারণ জ্ঞান। তবে বর্তমানের লোকজনেরা বি, এ; এম, এ পাশ করলে তাদেরকে জ্ঞানী মনে করতেছে। তারা কিছু একটা বললে তা' বিশ্বাস করতেছে। যেমন-বেশ কিছু দিন আগে মহালছড়িতে (মিলনপুর বন বিহারে) ফাং-এ গিয়েছিলাম। সেখানে জনৈক একজন বুড়ো আমাকে বলেছিল-ভক্তে, সম্ভ্র এম, এ পাশ সে তো জ্ঞানী। আমাদের নেতা, তার কথা আমাদেরকে ধরতেই হবে। এবম্বিধ পরিস্থিতিতে এম, এ পাশ; ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করতঃ তাদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের মহিমা প্রচার করতে চাচ্ছি। তারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে জনসাধারণের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে বলবে আমি এম, এ/ডক্টরেট ডিগ্রীর মধ্যে কোন সার, সত্য না পেয়ে প্রব্রজিত হয়েছি। প্রব্রজিত হয়ে বুদ্ধের শাসনেই জীবনের প্রকৃত সার, সত্য লাভ করেছি। কাজেই তোমরাও বুদ্ধের শাসনে এসো। বুদ্ধের উপদেশ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো। কোন এম, এ পাশ; ডক্টরেট ডিগ্রীধারীর কথা শুনার, বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই।

পূজ্য বনভঙ্কে আরো বলেন-তোমরা নিজেদেরকে মুখের জোরে বৌদ্ধ বলে দাবি করলেও আমি দেখছি তোমরা প্রকৃত বৌদ্ধ নয়। তোমাদের বৌদ্ধ শব্দটা মুখেই সীমাবদ্ধ, অন্তরে নয়। তিনি দায়ক-দায়িকাদেরকে বলেন-“বলো, আমরা চামড়ার মুখেই বৌদ্ধ, মনে-প্রাণে বৌদ্ধ নয়”। দায়ক-দায়িকাবৃন্দের মুখে হাসির রোল পড়ে গেল। তিনি আবারো দায়ক-দায়িকাবৃন্দের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, তোমরা কি বৌদ্ধ? দায়ক দায়িকাবৃন্দ-‘ভঙ্কে, চামড়ার মুখে বৌদ্ধ, প্রকৃত বৌদ্ধ নয়’। প্রকৃত বৌদ্ধ কারা জান? যারা সব সময় দান-শীল-ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে তারাই প্রকৃত বৌদ্ধ। তজ্জন্য আবারো বলছি, মুখে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিলেও আমার কাছে বৌদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারবে না। যারা প্রতিনিয়ত দান-শীল-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই আমার নিকট প্রকৃত বৌদ্ধ বলে পরিচিত হবে, পরিগণিত হবে। চাকমা কথায় একটা প্রবাদ আছে-‘শীলত কোয়া কুরি পানি হানা’। ঠিক তদ্রূপ মুখে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিলে হবে না, দান-শীল-ভাবনা করার মত দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে বৌদ্ধ বলে প্রমাণ করতে হবে। কেবল চাকমা হলেই বৌদ্ধ হতে পারবে, তা কিন্তু নয়। অনুরূপভাবে কেবল বড়ুয়া হলেই বৌদ্ধ হবে বা কেবল মারমা হলেই বৌদ্ধ হবে তা সম্পূর্ণ ভুল। তাই তো বর্তমানে আমি বলি, চাকমা বৌদ্ধ নয়, মারমা বৌদ্ধ নয়, বড়ুয়া বৌদ্ধ নয়। কারণ কোন জাতি বা গোত্রের পরিচয়ে প্রকৃত বৌদ্ধ হতে পারে না। প্রকৃত বৌদ্ধদেরকে স্বীয় স্বীয় আচরিত কর্মের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা বৌদ্ধ। যেমন ধর, বর্তমানে প্রায় চাকমারা মদ পান করে (মদ খায়)। মদ খেলে কি প্রকৃত বৌদ্ধ হওয়া যায়? কখনো না। মিথ্যাভাব্য, প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাসী-মাস্তানি, ব্যভিচার করে সর্বদা পঞ্চশীল লংঘন করে যারা চলতেছে কিভাবেই তাদেরকে বৌদ্ধ বলা যাবে? বড়ুয়া, মারমাদের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এগুলো কেন করতেছে? কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস নেই বলে। যাদের কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস থাকে তাদের পক্ষে কিছুতেই অকুশল পাপজনক কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সেইরূপ কর্মফল বিশ্বাসী ও চারি আর্য সত্যে বিশ্বাসীকেই প্রকৃত বৌদ্ধ বলে। তোমরাও কর্মফলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, চারি আর্য সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং কর্মফলের প্রতি জ্ঞান, চারি আর্য সত্যের প্রতি জ্ঞান উদয় কর, তাহলে প্রকৃত বৌদ্ধ হতে পারবে।

‘আগর চাকমাউন আগাত্যা এলাক, মুইহ্বে এক্কানা এক্কানা ঠিগ গরংহ্বে’
আগেকার চাকমা সমাজে খুব বেশী মিথ্যাদৃষ্টির প্রবণতা ছিল। বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টিমূলক আচার-আচরণে ভরা ছিল চাকমা সমাজ। সব কিছুতে ঈশ্বরকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। দান-শীল-ভাবনার কথা কেহ তেমন বিশ্বাস করত না।

অনেকে ভিক্ষু শ্রামণকে বন্দনাও করত না। আবার কেহ কেহ ভিক্ষু শ্রামণকে নিজ বাড়ীর পাশে যেতে দেখলে তা অমঙ্গল বলে মনে করত। ত্রিরত্নের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না বললেই চলে। আমি গৃহী অবস্থায় দেখেছি, এক বিহারের সাইন বোর্ডে লেখা থাকত ‘এখানে আগন্তুক ভিক্ষু শ্রামণ একদিনের অপেক্ষা দুই/তিন দিন থাকতে পারবে না।’ আর যে কোন বিহারে খুব বেশি হলে একজন ভিক্ষু আর একজন শ্রামণ থাকতে পারত। নতুবা একজন ভিক্ষুই রাখত। সেই ভিক্ষুকেও ভালোভাবে ব্যবস্থাদি করে দিত না। অতীতের সেই অবস্থা এখনো থাকলে বর্তমানে রাজবন বিহারে একসাথে সত্তর/আশি জন ভিক্ষু শ্রামণ থাকতে পারতাম না। কিছুদিন আগে বার্মা (মায়ানমার) হতে একজন ভিক্ষু রাজবন বিহারে এসেছিল। সে এখানকার ভিক্ষু শ্রামণের সংখ্যা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল তোমরা এতো জন ভিক্ষু শ্রামণ কিভাবে অবস্থান করতেছ। তোমাদেরকে একসাথে এতো জন দেখে আমার তো মনে হচ্ছে এটাও বার্মা। মনে হচ্ছে একটা বৌদ্ধধর্মীয় প্রতিকল্প দেশ। শুধুমাত্র সেই ভিক্ষুটি নয় আরো অনেকেই রাজবন বিহারকে বৌদ্ধপ্রধান দেশ থাইল্যান্ড, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশের বিহারের সাথে তুলনা করে থাকে। তবে চাকমা সমাজে এই ধর্মীয় চেতনা সহজে আসে নাই। আমাকে কঠোর ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরিশ্রম ও অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে। সেই বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা আর পরিশ্রমের ফল আজকের এই ধর্মীয় জাগরণ। তবে এখনো শেষ নয়, আমার মতে এটা গুরু মাত্র। তোমরা যদি আমার কথা মত সঠিকভাবে বৌদ্ধধর্ম আচরণ কর তাহলে আরো অনেক কিছু দেখতে পাবে।

তিনি বলেন-তোমরা সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান কর। ছোট-বড়, দৃশ্য-অদৃশ্য কোন প্রাণীকে বধ, বন্ধন, প্রহার ও দুঃখ প্রদান করবে না। মোটকথা প্রাণী মাত্রেই হিংসা করতে পারবে না। বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে-“অহিংসা পরম ধর্ম”। কোন প্রাণীকে যতোই হিংসা করবে না, দুঃখ প্রদান করবে না, ততোই তোমাদের সুখ লাভ হবে। আর যতই প্রাণী হিংসা করবে, প্রাণীকে দুঃখকষ্ট দেবে ততোই নিজের দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করবে, যেই আত্মবিলাসী হয়ে অপর সুখাকাজক্ষী জীবকে দুঃখ প্রদান করে, সে কখনো সুখ লাভ করতে পারে না। আর যেই ব্যক্তি আত্মবিলাসী হয়ে অপর সুখাকাজক্ষী জীবকে দুঃখ প্রদান করে না, তার সুখ বর্ধিত হয়ে থাকে।

বর্তমানের লোকজনেরা প্রায়ই মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম আর খল স্বভাবের। এই মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম আর খলের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা সম্ভব নয়। তাই তোমরা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হও, কৃতজ্ঞ হও, নরাধম হবে না, খল হবে না। কি, মনে থাকবে তো? হ্যাঁ, থাকবে ভ্রম্ভে। তোমরা কি হবে?

সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হবো, কৃতজ্ঞ হবো, কখনো নরাধম হবো না, খল হবো না। তাহলে ঠিক আছে। বুদ্ধ কি বলেছেন জান?

ধরাতলে নরাধম, খল আছে যত,
ঠিক তারা উঁই আর ইঁদুরের মত।

তিনি দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন, বলতো বুদ্ধ কি বলেছেন? দায়ক-দায়িকারা একবাক্যে বলে উঠেন-“ধরাতলে নরাধম, খল আছে যত; ঠিক তারা উঁই আর ইঁদুরের মত”। মনে রাখবে, নরাধম ও খল ব্যক্তির উঁই আর ইঁদুরের মত ক্ষতি ছাড়া উপকার করতে পারে না। বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন-উঁই, ইঁদুরেরা গৃহস্থদের ক্ষতি ছাড়া উপকার করতে পারে কি? ভাঙে, পারে না। উঁই, ইঁদুরের কাজ কি? গৃহস্থের শস্য, ঘরের বেড়া, কাপড়চোপার কেটে দেয়া, মালামালগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়া। এ সকল ক্ষতিসাধন করাই হল উঁই, ইঁদুরের কাজ। ঠিক তদ্রূপ, তোমরাও নরাধম, খল হলে উঁই, ইঁদুরের মত হলে অপরের ক্ষতিসাধন ছাড়া উপকার করতে পারবে না। আবার, তোমরা যদি উঁই, ইঁদুরের মত হয়ে যাও, তাহলে আমিও তোমাদেরকে বুঝাতে সমর্থ হবো না। কাজেই সাবধান, কখনো নরাধম, খল স্বভাবের হবে না, মিথ্যা দৃষ্টি হবে না। তোমরা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে পণ্ডিত হয়ে যাও। তখন অনায়াসে প্রকৃত বৌদ্ধ আচরণ করতঃ পরম শান্তি, পরম সুখের অধিকারী হতে সমর্থ হবে। কারণ পণ্ডিত ব্যক্তির যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-ভিক্ষুর কাজ কি জান? মূর্খ ব্যক্তিদের পণ্ডিত বানানো, অসাধু ব্যক্তিদের সাধু বানানো। ভগবান ভিক্ষুদেরকে এই কাজটি দিয়েছেন। বুদ্ধ কর্তৃক আরোপিত এ' কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়, নিতান্তই কঠিন কাজ। কিভাবে পণ্ডিত, সাধু বানাবো? বুদ্ধের মতে পণ্ডিত হলো, যারা সহনশীলতা, জীবে দয়ালু, কুশলকার্যে নির্ভীক, ক্ষমা-মৈত্রী, নিজকে সর্বদা অক্ষুণ্ণ মনে রাখার সদগুণে গুণী তারাই পণ্ডিত। অন্যদিকে যারা পঞ্চশীল পালন করে তারাই সাধু। এইভাবে পণ্ডিত, সাধুর পরিচয় প্রদান করে এবং মূর্খ, অসাধুর দোষ বর্ণনা করতঃ মূর্খকে পণ্ডিত, অসাধুকে সাধু বানাতে হয়। আমি বলি কি জান? তোমরা এখানে যারা এসেছ সবাই পণ্ডিত আর সাধু হয়ে যাও। তাহলে অবশ্যই তোমাদের উন্নতি হবে, সুখ লাভ হবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে।

পণ্ডিত এবং সাধু ব্যক্তিদের ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ। তাদের কখনো অধোগতি হয় না। কিন্তু মূর্খ, অসাধু ব্যক্তিদের ইহকালেও দুঃখ, পরকালেও দুঃখ। তাদের কখনো উর্ধ্বগতি হয় না, সর্বদা অধোগতিই হয়ে থাকে। তোমরা অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল পালন করে সাধু হয়ে যাও। বনভক্তে

দায়ক-দায়িকাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, তোমরা তাহলে কি হবে? ভস্তে, সাধু হবো। কিভাবে? ভস্তে, পঞ্চাশীল পালন করে। হ্যাঁ, ঠিক; যারা পঞ্চাশীল পালন করে তারা সাধু; আর যারা পঞ্চাশীল পালন করে না তারা অসাধু। “সাধু মানুষ স্বর্গে যায়, অসাধু মানুষ নরকে পড়ে করে হায়! হায়!”। তাই তোমরা সাধু হয়ে যাও, অসাধু হবে না। সাধু হতে পারলে স্বর্গ লাভ হবে। আর অসাধু হলে নরকে পতিত হয়ে দুর্বিষহ দুঃখ এবং অনুতাপের অনলে কল্প-কল্পান্তর জ্বলে-পুড়ে ভয়ানক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। তোমরা দিনে দিনে পাণ্ডিত্য অর্জন কর আর সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হও। মনে রাখবে, সাধু ব্যক্তির স্বর্গে যায় এবং পণ্ডিত ব্যক্তির দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়। এভাবে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরিত হলে বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হয়ে থাকে। আমি আবাবো বলছি, তোমরা মূর্খ না হয়ে পণ্ডিত হও, অসাধু না হয়ে সাধু হও। কারণ পণ্ডিত আর সাধু ব্যক্তিদের ইহজীবন পরজীবন সুখের হয় এবং তারা যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে। তোমরাও পণ্ডিত এবং সাধু হলে তোমাদের ইহজীবন পরজীবন সুখের হবে, যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভে সমর্থ হবে-এ’ কথা বলে সমাপ্ত করলাম।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞানী ব্যক্তির কখনো অন্যায় অপরাধ ভুল গলদ করে না

অদ্য ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ সাল, রোজ শুক্রবার, রাজবন বিহারে আয়োজিত সীবলী পূজা ও বোধিবৃক্ষ পূজা উপলক্ষে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বনভন্তে বলেন-সত্য আর মিথ্যা দুটি শব্দ শুনা যায়। যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে সক্ষম। কিভাবে? স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে বিবেচনা করে যে ‘এটা সত্য’ আর ‘এটা মিথ্যা’। কিন্তু বর্তমানে আমি অনেক জনকে বলতে শুনেছি-“আজকে অমুক ভিক্ষু বা ব্যক্তি এতোরূপ পর্যন্ত বস্তুতা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বস্তুতায় তিনি কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা বলেছেন সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না”। যার কাছে সাধারণ জ্ঞান থাকবে, সেই সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারে না। যেমন-ধর, আমি বনভন্তে একটা (কথা) বলছি, অগ্রবংশ ভন্তে একটা বলছেন, উচ্ছ্রা একটা বলছে। সে সব কথায় কতটুকু সত্য রয়েছে, কতটুকু মিথ্যা রয়েছে বা কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তোমরা যাচাই করতে পারবে কি? পারবে না। কাজেই আমি বললে হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছ; অগ্রবংশ ভন্তে বললে হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছ; উচ্ছ্রা বললে হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছ। বেকুব মানুষ, যাদের জ্ঞান নেই তারাই এরূপ করে থাকে। বেকুব মানুষেরা যার কথা শুনে তার কথায় সায় দেয়। সত্য-মিথ্যা

যাচাই করতে পারে না। কি তাই না? হ্যাঁ ভ্রম, তাই। মনে রাখবে, বেকুব মানুষেরা সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারে না। তারা এখানে একজনের কথা শুনে হ্যাঁ হ্যাঁ তা' ঠিক, অন্যদিকে আরো একজনের কথা শুনে হ্যাঁ হ্যাঁ তা' ঠিক বলতেছে বলে থাকে। কে সত্য বলতেছে আর কে মিথ্যা বলতেছে তারা সে সব যাচাই করতে অপারগ। আগেও অনেকবার বলেছি লোচন দেওয়ানের পুকুর দেখানোর কথা। একদিন লোচন দেওয়ান গ্রামের বুড়ো কয়েকজনকে একত্রিত করে তার সদ্য খননকৃত পুকুরের জল দেখায়ে দিয়ে বলতে লাগল; আচ্ছা, আমি তো পুকুরের জলের উত্তর দিকটা একটু উচু আর দক্ষিণ দিকটা একটু নীচু দেখতেছি। কেমন তাই না? বুড়ো লোকেরা লোচন দেওয়ানের মত বলতে লাগল-হ্যাঁ, হ্যাঁ নানু আমরাও তাই দেখতেছি। দেওয়ান বাবু এবার ধমকের স্বরে বলল, তোমরা তো দেখছি মস্ত বেকুব। আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বলেছি; জীবনে কখনো শুনেছ, নাকি দেখেছ যে পুকুরের জল একদিকে উঁচু আর একদিকে নীচু? কোন চিন্তা-ভাবনা না করে বেকুবের মত উত্তর দিতেছ কেন? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়। কাজেই তোমরাও সেই বুড়ো লোকদের মত আন্দাজ করে হ্যাঁ বলো না। সত্য, মিথ্যা যাচাই করেই বলবে। কেহ কিছু বললে আন্দাজ করে বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করার আগে সেটা সত্য, নাকি মিথ্যা যাচাই করে দেখবে। যাচাই করার পর যদি দেখে যে সেটা সত্য, তাহলে সেটা গ্রহণ কর আর যদি দেখে এটা মিথ্যা তাহলে সেটা গ্রহণ করবে না। বুদ্ধ বলেছেন-যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা আমার উপদেশসমূহও যাচাই করে দেখে। কেবলমাত্র আমার বাণী বলে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে না। যাচাই করার পর সত্য বলে প্রমাণিত হলে তবেই গ্রহণ কর। তবে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান না থাকলে অজ্ঞ ব্যক্তির সত্যকে মিথ্যা বলতে পারে, অন্যদিকে মিথ্যাকেও সত্য বলতে পারে। সে রকম উল্টোপাল্টা করলে চলবে না। জ্ঞানের সহিত যথার্থভাবে যাচাই করতে হবে। বুদ্ধের সময়কালীন কথা; একদিন ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ! বনবৃক্ষ ছেদন কর'। ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কথার মর্মার্থ না বুঝে পার্শ্ববর্তী বনের বৃক্ষ কর্তন করার জন্য দা, কুড়াল সংগ্রহ করতে লাগলেন। ভিক্ষুদের সেই বৃক্ষ কর্তনের প্রস্তুতি দেখে বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন; ভিক্ষুগণ! কেন দা, কুড়াল সংগ্রহ করতেছ? ভিক্ষুগণ উত্তরে বললেন-ভগবান, আপনিই তো বনবৃক্ষ ছেদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবার ভগবান বললেন-তোমরা বন চিন কি? তোমাদের মনই হচ্ছে প্রকৃত বন। রাগ, ঘেঁষ, মোহ হচ্ছে বৃক্ষ। তোমাদের মনের মধ্যে রাগ, ঘেঁষ, মোহ উৎপন্ন হয়ে ঘন বৃক্ষরাজি সংকুল বনাঞ্চল হয়েছে। আমি সেই মনরূপ বনের বৃক্ষরাজিসমূহ অর্থাৎ

লোভ, দ্বেষ, মোহকে ছেদন (ধ্বংস) করতে বলেছি। এই বৃক্ষ ছেদন করতে বলি নাই। এবার ভিক্ষুগণ ভগবান বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনার মর্মার্থ বুঝতে সমর্থ হলেন। পূজ্য বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে কি বলেছিলেন? ভক্তে, ‘বনবৃক্ষ ছেদন করতে বলেছেন’। সেই বন আর বৃক্ষ কি? ‘মন হল বন, আর রাগ, দ্বেষ, মোহ হল বৃক্ষ’। হ্যাঁ, ঠিক সে রকমই তোমাদেরকেও আমার কথার মর্মার্থ বুঝতে হবে; তা না হলে ঐ ভিক্ষুদের অবস্থায় পড়তে হবে। না বুঝে, না জেনে কোন কাজ, কোন কথা বলতে যাবে না। সর্বদা সত্য-মিথ্যা যাচাই করে চলবে। আমার সাথে বলো “আমরা সত্য-মিথ্যা যাচাই করব-আন্দাজ করে কোন কিছু করব না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার পর সত্য হলে আমরা গ্রহণ করব আর মিথ্যা হলে গ্রহণ করব না”। তাহলে তোমরা সত্য লাভ করতে সক্ষম হবে।

তিনি আরো বলেন-ভগবান বুদ্ধ বলেছেন তোমরা সত্য অনুসন্ধান কর। কিভাবে সত্য লাভ হয় সর্বদা সেই গবেষণায় রত থাক। সত্যই তোমাদেরকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে দেবে। আর নির্বাণ অনুসন্ধানে তৎপর থাক। কোন মার্গ অবলম্বনে নির্বাণ সাক্ষাৎ হয় সেই মার্গের পথিক হও। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তো কেহই সেগুলো অনুসন্ধান কর না। বরং কেহ খুঁজতেছ চাকুরি, কেহ খুঁজতেছ ধন, কেহ খুঁজতেছ এয়ারকন্ডিশনের দালান কোঠা, দামী গাড়ী। আবার যুবতীরা খুঁজতেছে ভালো জামাই, যুবকেরা খুঁজতেছ ভালো বউ। অথচ এসবই দুঃখ, পাপকর্ম সম্পাদন করার সহায়ক এবং মুক্তিমার্গের বিঘ্নকারক। বলা যায়, মারের ফাঁদ মাত্র। এই সবার দ্বারা তোমাদের সর্বদা দুঃখই বাড়তেছে, নতুন নতুন পাপ সৃষ্টি হচ্ছে। একটু ভালো করে দেখ তো, যারা এসব লাভী হয়েছে তারা কেহ সুখে-শান্তিতে অবস্থান করতে সমর্থ হচ্ছে কি? কই কারোর উদাহরণ দেখায়ে দিতে পারবে কি? পারবে না। বরঞ্চ আমি এসবের কুফলের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখায়ে দিতে পারব।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের মতে, কোন যুবক যদি, কোন যুবতীকে বিয়ে, করে তাহলে সে ঠকেছে বলে জানবে। আর কোন যুবতী যদি, কোন যুবককে বিয়ে করে তাহলে সেও ঠকেছে বলে জানবে। কারণ তারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হয়ে ঘর-সংসার করতে গিয়ে কতো প্রকার দুঃখ-কষ্ট, মনোমালিন্য, অশান্তির সম্মুখীন হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর সংসার চালাতে গিয়ে কতো প্রকার অন্যায, অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে হয় তারও পরিসংখ্যান নেই। আরো রয়েছে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের সাথে মতপার্থক্য, কথা কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ সহ অবর্ণনীয় দুঃখ, অশান্তি। স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করার অর্থ হল এগুলো মাথা পেতে নেয়া। কাজেই যারা এসব

দুঃখ, অশান্তি, ঝামেলা মাথা পেতে নেয় তারা কি করে সুখী হবে? সুতরাং তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে অবশ্যই ঠকলো। অন্যদিকে এ' মার্গে কোন সত্য লাভের বা দুঃখমুক্তির লেশ মাত্র নেই। শুধুমাত্র মিথ্যা আর দুঃখকে নিয়ে লুটোপুটি খাওয়াই সার হয়। তাই আমি বলি, যেই যুবক ভুলা বা বেকুব, সে একজন যুবতীকে বিয়ে করে আর যেই যুবতী ভুলি বা বেকুব সেও একজন যুবককে বিয়ে করে। যারা চালাক তারা কিছুতেই এই কাজটি করতে পারে না। চাকমা ভাষায় “ভুল লয় তুলিরে, ভুলি লয় ভুলরে”। ভস্তু মিলেউন্’ সিন্দি রেনি চেনেই হ্লে-তুমি হ্লা ভুলি, হা মরতুন’ সিন্দি রেনি চেনেই হ্লে-তুমি হ্লাদে ভুল’। ভুল’ লইয়ে ভুলরে, ভুলি লইয়ে ভুল’রে (বেঙ্কুনে হাঃ হাঃ গরি হাঝিলাক)। এবার বনভন্তে বলেন-যুবক যুবতীরা একে অন্যকে গ্রহণ না করে, তোমরা জ্ঞানকে, সত্যকে গ্রহণ কর। তাহলে তোমাদের দুঃখ-অশান্তি পোহাতে হবে না। সেই জ্ঞান এবং সত্যই প্রকৃত সুখ, শান্তি, মঙ্গল আনয়ন করবে। তাই বলি-

সত্য মাঝে চারি সত্য, সত্য চতুষ্টয়;

মার্গ মাঝে অষ্টাঙ্গিক, মার্গ শ্রেষ্ঠ হয়।

সত্যের মধ্যে চারি আর্যসত্য প্রধান। এ' চারি আর্যসত্যই তোমাদেরকে দুঃখ হতে পরিজ্ঞান দিতে সক্ষম। আমার সাথে বলো “চারি আর্যসত্যই আমাদেরকে সুখ প্রদান করবে, নির্বাণেই আমাদেরকে সুখ প্রদান করবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল নির্বাণ গমনের একমাত্র পথ। সত্য বা চারি আর্যসত্যই ঠিক পথ, যেই পথ নির্বাণে পৌছে দিতে সক্ষম; অপর সব ভুলপথ।

মার তোমাদেরকে ভুলপথে ধাবিত করায় কিভাবে জান? তোমাদের মনচিন্তে অসৎ প্রবৃত্তি ভাব জাগিয়ে দিয়ে। মনচিন্তে অসৎ প্রবৃত্তি উদয় হলে তখন চিন্ত ভুলপথে ধাবিত হতে বাধ্য। এভাবে মার তোমাদেরকে ভুলপথে ধাবিত করায় সীমাহীন দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে দেয়। আর ভগবান বুদ্ধ তোমাদের চিন্তের মধ্যে সৎ চেতনা উদয় করায় দিয়ে মধ্যমপন্থা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে পরিচালিত করতঃ দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্ত করায়। তোমরা বর্তমানের দোকজন সবাই মারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুলপথে পরিচালিত হচ্ছে। তজ্জন্য তোমাদেরকে এতো অশান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তোমাদের জন্য আমার করুণা জাগে। কতো সাধনার ফলেই না এ' মানব জন্ম লাভ করেছে, অথচ বর্তমানের আচরিত ভুলপথ বা পাপকার্যের জন্য মৃত্যুর পর মনুষ্যত্ব হারায়ে যদি চারি অপায়ে পতিত হও; তাহলে কি ভয়ানক দুঃখই না ভোগ করতে হবে। আর কখন যে পুনঃ মানব জীবন লাভ হবে তারও ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তোমরা তো সে সব কিছুই চিন্তা করছ না? দুর্লভ এ' মানব জীবনকে সার্থক করতে হলে তোমাদের জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা ও সদাচরণ করতেই হবে। তাই আবারো বলছি,

তোমরা সত্য-মিথ্যা যাচাই কর, জ্ঞান-অজ্ঞান পরীক্ষা কর। সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান পরীক্ষা করার পর সত্য ও জ্ঞান সমন্বিত সঠিক পথে চালিত হও। মিথ্যা, অজ্ঞান সমন্বিত ভুলপথে চালিত হবে না। সর্বদা জ্ঞানের সহিত নিজকে পরিচালনা করবে। তাহলে কোন দুষ্কৃতি কর্ম সম্পাদিত হবে না। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ করে না। বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন-জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ করবে কি? না ভুলে, করবে না। বনভক্তে এবার বলেন, যারা অজ্ঞান তারাই অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ করে থাকে। তবে সেই অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদের জন্য নিজের দুঃখ নিজেরাই ডেকে নিয়ে আসে। মনে রাখবে, যারা জ্ঞানী, সতদ্রোষ্টা তারাই সুখী। যেই ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে পোষণ করা মিথ্যা অজ্ঞানতা ভাবকে বিদায় করে দিতে পারবে সে সুখী হবেই। তাই বলছি, তোমাদের মনচিন্তের মধ্যে যদি অজ্ঞান, মিথ্যা থাকে সত্বর তা' বিদায় দাও; এবং জ্ঞান, সত্যের সহিত অবস্থান কর। আর এভাবে বল “হে অজ্ঞান! তোমাকে আমরা বিদায় করে দিলাম; হে মিথ্যা! তোমাকেও আমরা বিদায় করে দিলাম”। এই রকম দৃঢ় বীর্যের সাথে তোমরা অজ্ঞানকে বিদায় করে দাও, মিথ্যাকে বিদায় করে দাও। আর জ্ঞানকে স্থান দাও, সত্যকে স্থান দাও। তাহলে পুণ্য বৃদ্ধি হওত সুখ লাভ হবে। মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ দুঃখ পায়, মিথ্যাবশতঃ দুঃখ পায়। তোমাদের মাঝে অজ্ঞতা (মূর্খতা), মিথ্যা যদি থাকে তাহলে তোমরা দুঃখ পাবে। আর যদি জ্ঞান, সত্য থাকে তাহলে তোমাদের আপনা-আপনিই সুখ উদয় হবে। তিনি প্রশ্ন করেন-কি করে সুখ উদয় হবে? ভুলে, জ্ঞান ও সত্য থাকলে আপনা আপনি সুখ উদয় হবে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছি; জ্ঞান ও সত্য থাকলে আপনা-আপনিই তোমাদের সুখ উদয় হবে। তোমরা সেই সুখ উদয় করতে পারবে তো? হ্যাঁ ভুলে, আশীর্বাদ করুন।

বর্তমানে তোমাদের মাঝে অনেক নেতার আত্মপ্রকাশ হয়েছে নহে কি? পূজ্য ভক্তে পার্বত্য অঞ্চলের দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে এ' প্রশ্টি (বেশ কয়েকবার) করেন। দায়ক দায়িকাবন্দ-হ্যাঁ ভুলে, বলে একেক জনের নাম বলতে শুরু করল। বনভক্তে বলেন, তবে আমি দেখতেছি এরা কেহ প্রকৃত নেতা নয়। প্রকৃত নেতা কারা জান? যারা নিজেরাও অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ কাজ করে না এবং অনুসারীগণকেও অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ কাজ করতে বলে না, তারাই প্রকৃত নেতা। কিন্তু তোমাদের নেতাগণ এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই তারা প্রকৃত নেতা হওয়ার অযোগ্য। কারণ স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ তারা অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ কাজ করে নিজেরাই দুঃখ পাচ্ছে, সেখানে কিভাবে তোমাদের জন্য সুখ লাভের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হবে? কখনো হবে না।

বরঞ্চ তাদেরকে নেতা বলে বিশ্বাস করে তাদের কথামত চললে তোমাদের দুঃখ বেড়ে যাবে, কোনদিন কমবে না।

পূজ্য ভগ্নে বলেন-আমি অনেক চাকমাকে বলতে শুনেছি, বৌদ্ধধর্ম কঠিন, এ ধর্ম আচরণ করা যায় না। তারা কেন সে রকম বলে জান? তাদের চিন্তে নিশ্চয় মিথ্যাভাব আছে, অজ্ঞানতা আছে, মূর্খতা আছে। কারণ চিন্তের মধ্যে মিথ্যাভাব, অজ্ঞানতা, মূর্খতা বিদ্যমান থাকলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা সুকঠিন হয়ে পড়ে বা আচরণ করা যায় না। কাজেই যাদের চিন্তে মিথ্যাভাব, অজ্ঞানতা, মূর্খতা থাকবে তাদের কাছে তো বৌদ্ধধর্ম কঠিন লাগবেই। কিন্তু যাদের চিন্তে সত্য, জ্ঞান, পাণ্ডিত্যভাব থাকবে তাদের কাছে বৌদ্ধধর্ম সহজ; তারা বৌদ্ধধর্ম যথাযথরূপে আচরণ করতে সক্ষম। মনে রাখবে, যার চিন্তের মধ্যে সত্য, জ্ঞান, পাণ্ডিত্যভাব থাকবে সেই বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে পারবে। আর যদি চিন্তের মধ্যে মিথ্যা, অজ্ঞান, মূর্খতাভাব থাকবে সে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে পারবে না। তোমাদের প্রত্যেকের মনচিন্তে যদি সত্য, জ্ঞান, পাণ্ডিত্যভাব থাকে এবং মিথ্যা, অজ্ঞান, মূর্খতাভাবকে বিদায় করে দাও তাহলে তোমাদের সুখ লাভ হবে। মিথ্যা, অজ্ঞান, মূর্খতা হতে যত দুঃখের উৎপত্তি। তাই তোমাদের প্রত্যেককেই বলছি, তোমরা সবাই জ্ঞানী হও, পণ্ডিত হও, সত্যের সহিত অবস্থান কর। এটা স্মরণ রাখতে হবে-

সত্যভাব যতদিনে না উদিকে তব মনে

ভব দুঃখ হবে না মোচন।

নাহি জীবে ভাই ভাই,

হিংসা-দ্বেষ্টা শুধু তাই।

ত্রিলক্ষণে যার নাই জ্ঞান।

তাই তোমরা সব সময় সত্যভাব উদয় ও জ্ঞান উদয় করতে তৎপর থাক। তাহলে তোমাদের সব দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ শারীপুত্র স্বকির মহোদয়েরা বলেছেন, ধর্মদেশনা প্রদান করার আগে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে হয়। সেই বিষয়গুলো কি? সত্ত্বগণের চিন্তাচারে জ্ঞান, সত্ত্বগণের তীক্ষ্ণ-মৃদু শ্রদ্ধাদি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সত্ত্বগণের অনুশাসনে জ্ঞান। অর্থাৎ দেশনা করার পূর্বে শ্রোতাদের চিন্তে কতটুকু জ্ঞান আছে সে সম্বন্ধে দেখতে হবে। তোমাদের শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ, নাকি মৃদু সে সম্বন্ধে দেখতে হবে। শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ আর মৃদু ভেদে দুই প্রকার। তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধা সুখ বা সুখ বহন করে আনে, মৃদু শ্রদ্ধা দুঃখ বা দুঃখ বহন করে আনে। তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধা হল গভীর পানি। যেমন ধর, পাঁচশত হাত গভীর পানি হলে সেখানে জাহাজ পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে কোন অসুবিধা হবে না। আর চার ইঞ্চি পরিমাণ গভীর

পানি হলে সেখানে নৌকাও চলাচল করতে পারবে না। পারবে কি? পারবে না, চড়ে আটকে যাবে। এখন তোমাদের শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ নাকি মৃদু তা' দেখতে হবে। তিনি দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের শ্রদ্ধা তো চার ইঞ্চি পরিমাণ পানি সদৃশ মৃদুর মতই দেখছি। দায়ক-দায়িকাবৃন্দ এক বাক্যে বলে উঠে-ভন্তে, পাঁচশত হাত গভীর পানি সদৃশ আমাদের শ্রদ্ধা যেন তীক্ষ্ণ হয়, আশীর্বাদ করুন। তোমাদের যদি তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধা হয় তাহলে সুখ হবে। তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধাকে চাকমা ভাষায় একরূপ বলে-“যদেপদে, যেচ্ছেত গরি শ্রদ্ধা গরানা, হাত্যা টালিমালি নয়”। আমি আবারো বলছি, ‘চাকমা ভাষায়-গরিলে এক্কে যদেপদে যেচ্ছেত গরি গরিলে ফল হব’। সে টালিমালি, হাট্ট্যামাট্টা গরি নয়। যদেপদে যেচ্ছেত হল তীক্ষ্ণ শ্রদ্ধা, হাট্ট্যামাট্টা হল মৃদু শ্রদ্ধা। অনুশাসন অর্থ এই শ্রোতাবৃন্দ কোন অনুশাসনে থাকতে চায়। বুদ্ধের অনুশাসনে থাকলে বেশি সুখ লাভ হয়। তাই যেই ব্যক্তি গভীরভাবে বুদ্ধের শাসন বিশ্বাস করে, মেনে চলে সেই ব্যক্তির সুখ হবেই। আর যারা বুদ্ধের শাসন গভীরভাবে বিশ্বাস করে না, মেনে চলে না তাদের দুঃখ অপরিহার্য। বনভন্তে দায়ক-দায়িকাবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন-তোমরা চাকমা, মারমা, বড়ুয়ারা বৌদ্ধ বলে পরিচয় প্রদান কর কি? হ্যাঁ, ভন্তে। আমি দেখতেছি তোমরা প্রকৃত বৌদ্ধ নয়। কেবলমাত্র মুখেই পরিচয় প্রদান কর। কাজে কর্মে বা জ্ঞানের দিক থেকে বৌদ্ধ নয়। বৌদ্ধধর্মকে তোমরা জ্ঞানের মাধ্যমে দর্শন করে আচরণ কর। অপরকে হাসতে দেখে, আন্দাজ করে নিজেও হাসার মতো আচরণ করো না। অনেকে একরূপে না বুঝে, না জেনে অন্যজনকে হাসতে দেখে নিজেই যদি হাসতে শুরু করে, তখন সে অন্যের হাসির খোরাকে পরিণত হয়। যথাযথভাবে জেনে, বুঝে এধর্ম আচরণ করলে অবশ্যই সুখ লাভে সমর্থ হবে। আর প্রকৃত বৌদ্ধ বলেও পরিচিত হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-অজ্ঞানের অন্ধকারে না থেকে তোমরা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর। সত্যধর্ম আচরণে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। আমার সাথে বলো “আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকব না, সত্যধর্ম জেনে সত্যধর্ম আচরণ করব। সত্যধর্মেই আমাদেরকে রক্ষা করবে”। পরকাল বিশ্বাসের সহিত দান-শীল-ভাবনাদি অনুশীলন করলে সেটা সত্যধর্ম বলে জানবে। তোমরা যদি পরকাল বিশ্বাস কর তাহলে পাপকর্ম সম্পাদন করতে পারবে না। ফলে তোমাদের ইহ-পর উভয়কালই সুখের হবে। যারা বর্তমানে নানাবিধ পাপকর্মে লিপ্ত রয়েছে তারা মৃত্যুর পর আবার মনুষ্য জনম লাভ করতে পারবে এমন আশা দুরাশা বলে জানবে। চারি অপায়ে পতিত হয়ে ভীষণ দুঃখের ভাগীই হতে হবে তাদেরকে। তাদের সেই দুরাবস্থা দেখে আমার বড়ো ককর্ণা জাগে, কিন্তু তারা তো আমার কথা কর্পপাত করে না। মূর্খ, অজ্ঞানীরা এইভাবে নিজের দুঃখ-

দুর্দশা নিজেই ডেকে আনে। যারা জ্ঞানী তারা কখনো পাপকর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে না। তজ্জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদা পুণ্য বৃদ্ধি পায়। তোমরা সবাই পণ্ডিত হও, জ্ঞানী হও। যদি জ্ঞানী, পণ্ডিত হতে পারো তাহলে তোমাদের আর কোন প্রকার বাদ-বিবাদ, মনোমালিন্য থাকবে না। তখন পরম সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। বনভক্তে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দল দুটির উদ্দেশ্যে বলেন—

ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলিয়ে গলা,
মুছে ফেল এবার মনের ময়লা;
হর্ষ তেজে দাঁড়াও তোরা,
হোক তবে সুখের স্থান।

তোমাদের মনের মধ্যে একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয়েছে। তাই পরস্পরের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না; বরং তা' বেড়েই চলে। অধিকন্তু হানাহানি-রেষারেষির মাধ্যমে নিজের অপরের তথা কারোর সুখ লাভ হয় না। এটা সুখ, উন্নতি প্রগতির পথ নয়। এটা দুঃখ-অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খল ও ধ্বংসের পথ। এই পথে শান্তি নেই, উন্নতি নেই; ধ্বংস অনিবার্য। কাজেই ধ্বংসের সেই পথ বন্ধ কর। এই পথ আশু বন্ধ না করলে তোমরা উভয়ে শেষ হয়ে যাবে। আর ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি-রেষারেষি নয়। এবার পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মনের সব ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেল। এতেই সুখ, শান্তি, উন্নতি আসবে-অন্যভাবে নয়।

নিজের মন ময়লাযুক্ত হলে নিজকে দুঃখ পেতে হয়। যদি তোমরা কখনো দুঃখে পতিত হও তাহলে জানবে মনের মধ্যে ময়লা জমা হয়েছে। তখন তোমাদের কাজ হল জ্ঞানের সাহায্যে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলে চিস্তাকে পরিষ্কার করে নেয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনের ময়লা বিধৌত হয়ে আবার সুখ হবে-দুঃখ বহু দূরে সরে যাবে। তাই আবারো বলছি—তোমরা সবাই জ্ঞান ও সত্যের পূজারী হও। সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষভাব পরিহার করে অহিংসা মেনে চল। তোমাদের মনচিন্তে যদি জ্ঞান উদয় হয়, সত্য উদয় হয় তাহলে ইহ-পর উভয় কালই তোমাদের জন্য সুখের হবে। আমার সাথে বলো “আমাদের মনচিন্তে জ্ঞান উদয় হোক, সত্য উদয় হোক। সেই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে বিদায় করে দিয়ে সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে বিদায় করে দিতে সক্ষম হই”। এতে তোমাদের ইহকালও সুখ হবে, পরকালও সুখ হবে। মনে রাখবে, সুখ লাভের জন্য জ্ঞান ও সত্যের কোন বিকল্প নেই। সত্য, জ্ঞানই সবচেয়ে বড় আশ্রয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান দূরীভূত করে এবং সত্যের প্রভাবে মিথ্যা দূরীভূত করে তোমরা ইহকাল-পরকাল সুখের

অধিকারী হতে সক্ষম হও। এটাই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ নীতি।

সাধু, সাধু, সাধু।

কুশল চিন্তা কিভাবে উদয় হয়

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিজ আবাসিক ভবনে আয়োজিত সজ্জদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও একটি পাকা রুম (মৈত্রী ভবন) দান উপলক্ষ্যে সমবেত দায়ক-দায়িকাবৃন্দের প্রতি দেশনা প্রদানকালে বলেন-শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে তা' ফলদায়ক হয়। কি বিশ্বাস করা? চারি আর্য সত্যের প্রতি বিশ্বাস করা। অন্যদিকে, মার আকৃষ্ট চিন্তে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে দুঃখ পেতে হয়। ভগবান যেমন সত্ত্বদিগকে চারি আর্যসত্য সম্বলিত সদ্ধর্মের বাণী শুনায়, তেমনি মারও সত্ত্বদিগকে ভোগ বিলাসের সুখ বর্ণনা করে পরধর্ম শুনায়। বুদ্ধকে বিশ্বাস করলে চারি আর্য সত্যের বাণী শ্রবণ করলে সদ্ধর্ম লাভ হয়; আর মারকে বিশ্বাস করতঃ ভোগ বিলাসের কথা শ্রবণ করলে পরধর্ম লাভ হয়। তাই বুদ্ধকে বিশ্বাস করার অর্থ চারি আর্যসত্য জ্ঞানকে বিশ্বাস করা বুঝায়। এটা জ্ঞান, সদ্ধর্ম এবং সুখ। কিন্তু মারকে বিশ্বাস করলে অজ্ঞান, মূর্খতা বৃদ্ধি পেয়ে মিথ্যাদৃষ্টি হয়। তোমরা আমার এসব কথা বিশ্বাস করতে পারছ বলে মনে হয় না। কারণ এগুলো জ্ঞানের বিষয়, সাধারণের নিকট বোধগম্য হবার কথা নয়। মনচিন্তের মধ্যে চারি আর্যসত্য জ্ঞান, সম্যকদৃষ্টিভাব বিদ্যমান থাকলে তবেই এসব কথা বুঝা সম্ভব। তোমাদের মনচিন্তা যখন তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হবে, তখন বুঝতে পারবে কিরূপে পুনঃজন্মের উদয় বা উৎপত্তি হয় এবং কিরূপে পুনঃজন্ম নিরোধ হয়। মার প্রভাবিত চিন্তা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে না পারলে পুনঃজন্ম হয় বা পুনঃজন্মের উদয় হয়। অনেক মুসলিম ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলে আমাদের ধর্মে পুনঃজন্ম নেই। কিন্তু তা' ঠিক নয়। অবিদ্যা অন্ধকার তাদের মনচিন্তে রয়েছে, কিভাবেই তারা পুনঃজন্ম দেখতে পাবে? বুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আমি সে সব বিষয় দিবালোকের মত পরিষ্কারভাবে দেখে থাকি। মনচিন্তের মধ্যে মার থাকলে তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে দেয় না; ফলে ভবচক্রে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করতে হয়। ধর্মদেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে যদি মনচিন্তা মারের প্রভাব মুক্ত হয় তাহলে অবিদ্যা, তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে; লোকান্তর সুখে উন্নীত হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধের দেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাবৃন্দ শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত্ব ফল লাভ করতেন। সেই সময়ের শ্রোতাবৃন্দ জ্ঞানের সহিত শ্রবণ করতেন আর ভগবান বুদ্ধ স্বীয় অসীম জ্ঞানশক্তির মাধ্যমে দেশনা করতেন। যারা অজ্ঞানের সহিত ধর্মদেশনা শ্রবণ করে, তারা বুদ্ধের বাণী না শুনে মারের কথাই শুনে মাত্র। চিন্তের মধ্যে মার

থাকলে দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আর নানা প্রকার অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে হয়। সেই অকুশলকর্মের ফলে দিন দিন অধঃপতন ঘটতে থাকে। যারা জ্ঞানের সহিত ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা বুদ্ধের বাণী শুনে, বিশ্বাস করে। তাদের সুখ, শান্তি সমৃদ্ধি লাভ হয়ে থাকে।

তোমরা তো আজকে এই দান করতেছ, দানে বহুবিধ ফল হয়। যথা-দানে ইহ পরকাল সুখ হয়, দানে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিরূপে দান করতে হয় জান? তৃষ্ণা ক্ষয় করতে, অবিদ্যা ধ্বংস করতে। তৃষ্ণাকে ক্ষয় এবং অবিদ্যা ধ্বংস করাকে কুশল বলে। যা দ্বারা তৃষ্ণা ক্ষয় হয় না, পুণ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না তা' অকুশল। অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে ইহকালে দুঃখ পায়, পরকালে ততোপেক্ষা অধিক দুঃখ পেতে হয়। অকুশলকর্ম সম্পাদনকারী এইভাবে অধঃপতনে তলিয়ে যায়। যারা তৃষ্ণাকে ক্ষয়, ধ্বংস করতে তৎপর থাকে তারা কুশলকর্মই সম্পাদন করে। কুশলকর্ম সম্পাদন করলে ইহকালে সুখ, পরকালে ততোপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখ লাভ হয়।

কুশল চিত্ত কিভাবে উৎপত্তি হয় জান কি? এক সময় এক বড়ুয়া নাকি আনন্দ মিত্র ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করেছিল-ভন্তে, আমার কেন কুশল চিত্ত একেবারে উৎপন্ন হয় না, বরং অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে। কুশল চিত্ত কি করে উৎপত্তি হয়? আনন্দ মিত্র ভন্তে উত্তরে বলেছিলেন-তোমার যখন কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় না, তুমি প্রত্যেক দিন কিছু কিছু ছাই একটি গাছের গোড়ায় ছিটে (ছিটিয়ে) দিও। এতে গাছটি অতি সহসা বেড়ে উঠবে আর তোমার চিত্তে কুশল বৃদ্ধি পাবে। বড়ুয়া বাবু মাথামুণ্ড কিছুই না বুঝে স্থান ত্যাগ করল। আনন্দ মিত্র ভন্তে যদি এরূপ বলতেন-তুমি তৃষ্ণাকে জমা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করতেছ বলে তোমার কুশল চিত্ত উৎপন্ন হচ্ছে না। সুতরাং তুমি তৃষ্ণাকে ক্ষয় কর, ধ্বংস কর তাহলে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হবে। বুদ্ধ বলেছেন, যেই চিত্ত জীবন দুঃখে দুঃখজনক, তৃষ্ণাজনক, পরিপোষক, পরিবর্ধক সেই চিত্ত অকুশল। যেই চিত্ত তৃষ্ণা ধ্বংসকারক সেই চিত্ত কুশল। তাহলে কুশল চিত্ত কিভাবে উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণাকে ক্ষয় করলে, ধ্বংস করলে কুশল চিত্ত উৎপত্তি হয়। যেই ব্যক্তি তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে, ধ্বংস করে তার কুশল চিত্ত উৎপত্তি হয়। আর যেই ব্যক্তি তৃষ্ণাকে জমা করে, বৃদ্ধি করে তার অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়। কিভাবে তৃষ্ণাকে ক্ষয়, ধ্বংস করবে? ইচ্ছা করলে তৃষ্ণাকে ক্ষয়, ধ্বংস করা যায়। আবার, কোন বিষয়ের প্রতি অলোভ হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা ক্ষয়, ধ্বংস হয়ে যায়। লোভের কারণে তৃষ্ণাকে ক্ষয়, ধ্বংস করা যায় না।

তিনি আরো বলেন-তোমরা লোভ পরিত্যাগ করে এগুলো দান করেছ। সুতরাং তোমাদের পুণ্য হয়েছে। আর যদি দানীয় বস্তুর প্রতি লোভ পরিত্যাগ না

কর তাহলে তা' দান হবে কি? হবে না। অন্যদিকে, সেই দানীয় সামগ্রীগুলো ভিক্ষুরা যদি লোভ চিন্তে গ্রহণ করে, তাদেরও পাপ হয়। তাই প্রয়োজন ভালো ভিক্ষুর। যারা নিজেরা লোভ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করবে এবং দায়ক-দায়িকাদেরকেও লোভ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করতে শিক্ষা দেবে। এতে প্রত্যেকের সুখ হয়। লোভ পরিত্যাগ সম্বন্ধে আমি একটি কাহিনী বলছি, শুন। বুদ্ধের সময়কালীন কথা; এক সময় লঙ্কাদ্বীপে (বর্তমান শ্রীলঙ্কায়) মামা-ভাগ্নে সম্পর্কিত জলচর এক নাগরাজ ও স্থলচর এক নাগরাজ একটি মণি পালঙ্কের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সংগ্রামের জন্য বহু নাগ সৈন্য হতাহত হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে ভগবান বুদ্ধ লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করেন। ভগবান বুদ্ধকে দেখে ভাগ্নে নাগরাজের টনক নড়ে। সে ভাবতে লাগল এই মণি পালঙ্কের জন্য আমরা কি পেলাম? অনর্থক সংগ্রামে বহু নাগ সৈন্য হতাহত হচ্ছে। বরং যুদ্ধ বন্ধ করে আমরা মামা-ভাগ্নে উভয়ে এই মণি পালঙ্কটি বুদ্ধকে দান করে দিই-যখন বুদ্ধকে সামনে পেয়েছি। এতে আমাদের মহাপুণ্য সঞ্চিত হবে। এই ভেবে সেই অপর নাগরাজা মামাকে তার মত প্রকাশ করল। সেই মত শুনে অপর নাগরাজাও আনন্দের সহিত তাতে সম্মতি দিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতঃ মামা-ভাগ্নে উভয়ে মিলেমিশে শ্রদ্ধার সহিত মণি পালঙ্কটি ভগবান বুদ্ধকে দান করে দিল। বুদ্ধ অনাসক্তভাবে তা' গ্রহণ করে উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা লোভ চিন্তের বশবর্তী হওত এই মণিপালঙ্কের জন্য সংগ্রামে রত হয়েছ। কাজেই আজ হতে আর কোন কিছু লোভ করবে না, নির্লোভ হয়ে অবস্থান কর। তাহলে পরম সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে ভগবান বুদ্ধ প্রথমে নিজে লোভমুক্ত হয়ে অপর সকলকেও লোভ পরিত্যাগ করিয়েছিলেন। বর্তমানে ভিক্ষুরা যেখানে নিজেরাই লোভের বশবর্তী হয়ে অবস্থান করতেছে, সেখানে অপর জনকে কিভাবে লোভ পরিত্যাগ করিয়ে দিতে পারবে! ভগবান বুদ্ধ কাকে দান দিলে বেশি ফল হয় বলেছেন জান? যার লোভ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই তাকে দান দিলে বেশি ফল হয়। আমার সাথে বলো “যার লোভ নেই তাকে দান দিলে বেশি ফল হয়, যার হিংসা নেই তাকে দান দিলে বেশি ফল হয়, যার অজ্ঞান নেই তাকে দান দিলে বেশি ফল হয়, যার তৃষ্ণা নেই তাকে দান দিলে বেশি ফল হয়। তাই যারা ভিক্ষু তাদেরকে দান গ্রহণের সময় লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণামুক্ত থাকে আর দাতাও (দায়ক-দায়িকা) লোভ বিসর্জন দিয়ে দান করে, সেই দানে হাতে হাতে ফল পাওয়া সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে লোভ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই, তৃষ্ণা নেই। মনচিন্তের মধ্যে লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা না থাকলে পরম সুখ লাভ হয়। সুতরাং তোমরা যারা গৃহী (দায়ক-দায়িকাবৃন্দের দিকে তাকিয়ে) আর তোমরা যারা ভিক্ষু (ভিক্ষুদের দিকে

তাকিয়ে) উভয়ে লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর। যদি পরিত্যাগ করতে পার তাহলে আমি বলছি তোমাদের নির্বাণ সুখ অর্জিত হবে। লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণার কারণেই তোমরা দুঃখ পাচ্ছ। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল-লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা হতে মুক্ত হওয়া। লোভে প্রেতকূলে নিয়ে যায়, হিংসায় নরকে নিয়ে যায়, অজ্ঞানে পশু-পক্ষী কূলে নিয়ে যায়। অলোভের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, অদ্বেষের (অহিংসা) দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয়, অমোহের দ্বারা মধ্যম পন্থা অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ হয় (এগুলো সংক্ষিপ্ত কথা, বিস্তারিত বললে বহু কথা)। তাই দান মাঝেই লোভ পরিত্যাগ করা উচিত। লোভ পরিত্যাগই দান। তোমাদের এই দানীয়বস্তুগুলো তো তেমন কিছু নয়। বুদ্ধের সেবক আনন্দ স্থবিরকে এমনই দান দিতো যে, দানীয়বস্তুগুলো আনন্দ স্থবিরের চারপাশে জমা হতে হতে স্থবির মহোদয়কে নাকি দেখাই যেতো না। তাঁকে কেন এতো দান দিতো জান? তিনিও পূর্বজন্মে অগাধ দান করেছিলেন বলে। তোমরা এই দানকার্য সম্পাদন করতঃ লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণামুক্ত হতে সচেষ্ট থাক। মনে রাখবে, লোভই তোমাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে, হিংসাই তোমাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে, অজ্ঞানই তোমাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে, তৃষ্ণাই তোমাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে। তোমাদিগের যদি লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পরম সুখ নির্বাণ লাভ হবে। এটাই বৌদ্ধধর্মের সুফল।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-লোভ থাকলে দান দেয়া যায় না। যার লোভ নেই সেই দান করতে পারে। হিংসা থাকলে শীল পালন করা যায় না, যার হিংসা নেই সেই শীল পালন করতে পারে। অজ্ঞান থাকলে ভাবনা করা যায় না, অজ্ঞানী ব্যক্তির কখনো ভাবনা করতে পারে না। যার অজ্ঞানতাভাব নেই সেই ভাবনা করতে পারে। তোমরা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহের সহিত অবস্থান কর। অলোভ দানের হেতু, অদ্বেষ শীলের হেতু, অমোহ ভাবনার হেতু। আমার সাথে সাথে বলো “আমরা লোভ পরিত্যাগ করে অলোভী হবো, দ্বেষ ত্যাগ করে অদ্বেষী হবো, মোহ ত্যাগ করে অমোহী হয়ে অবস্থান করব”। দানের দ্বারা লোভ ত্যাগ, শীল পালনের দ্বারা হিংসা ত্যাগ এবং ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা অজ্ঞান ত্যাগ করতে হয়। আবার, লোভ ত্যাগ করা, হিংসা ত্যাগ করা, অজ্ঞান ত্যাগ করা সহজ কথা নয়। একদিন/দুইদিনের মধ্যে ত্যাগ করা যায় না। এগুলো সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা-দীর্ঘকাল সময় সাপেক্ষ সাধনা সাপেক্ষ ব্যাপার। আজকে একটু, কালকে একটু, এভাবে ত্যাগ করতে করতে বহু প্রচেষ্টার ফলে তবেই তা’ অর্জন করা সম্ভব হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ-এই তিনটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই হল বৌদ্ধধর্ম। তাই আবারো বলছি, লোভ, দ্বেষ, মোহ থাকলে তোমাদেরকে বিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হবে। যাতে সেইরূপ দুঃখ ভোগ করতে না হয় তজ্জন্য

সজাগ থাক।

আমি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছি, শুন। ধর, কোন দায়কেরা বা তোমরা একটা নতুন বিহার নির্মাণ করেছে। যথারীতি দানোৎসর্গও করা হয়েছে। এবং সেই বিহারে অবস্থান করার জন্য একজন ভিক্ষু এসেছে। তখন তোমাদেরকে দেখতে হবে সেই ভিক্ষুটির কথা ও কাজে কোন প্রকার লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা প্রকাশিত হচ্ছে কিনা? যদি দেখা যায় যে, ভিক্ষুটির কথা ও কাজে লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা প্রকাশ পাচ্ছে, তাহলে জানবে সেই ভিক্ষুটি তোমাদেরকে তেমন কিছু উপকার করতে পারবে না। কারণ ভিক্ষুটি লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতার দরুন যেখানে নিজেই কষ্ট পাচ্ছে এবং মৃত্যুর পর চারি অপায়ে পতিত হবে; সেখানে তোমাদের সুখের হেতু আর চারি অপায় বন্ধ করার শিক্ষা কিভাবে দিতে পারবে? কখনো পারবে না। যেই ভিক্ষুর লোভ, হিংসা, অজ্ঞান নেই, সেই ভিক্ষুই তোমাদেরকে চারি অপায় বন্ধ করার প্রকৃত শিক্ষা দিতে সক্ষম। সেইরূপ ভিক্ষুর সংস্পর্শ লাভ হলে তোমাদের পরম লাভ বলে জানবে। যেই ভিক্ষুতে লোভ নেই, হিংসা নেই, অজ্ঞান নেই সেই ভিক্ষু দায়ক-দায়িকাদিগকে সৎপথে চালিত করাতে পারে, সুখের ঠিকানা নির্ণয় করায়ে দিতে সমর্থ হয়। ভিক্ষুর আসল পরিচয় হল-কতটুকু লোভ ত্যাগ, কতটুকু হিংসা ত্যাগ, কতটুকু অজ্ঞান পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে তিনি বলেন-ভিক্ষুদেরকেও লোভ, হিংসা, অজ্ঞান পরিত্যাগ করতে হবে এবং দায়ক-দায়িকাদেরকেও লোভ, হিংসা, অজ্ঞানমুক্ত থাকতে হবে তাহলে বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে। বর্তমানে ভিক্ষুরাও লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা চিন্তে বিহারে অবস্থান করতেছে আর দায়ক-দায়িকারাও লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা চিন্তে বিহারে আসতেছে। ফলে ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তেছে। এতে ভিক্ষুরা দোষারোপ করে দায়ক দায়িকাদেরকে; অন্যদিকে দায়ক দায়িকারা দোষারোপ করে ভিক্ষুদেরকে। এইভাবে উভয়ে সুখ ও পুণ্য লাভের পরিবর্তে দুঃখ পাপই অর্জিত হচ্ছে। কাজেই অন্য ধর্মাবলম্বীরা নানা কথা বলতে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। তাই তোমরা (দায়ক-দায়িকারা) এই দান করার ফলে লোভ ত্যাগ কর, আর ভিক্ষুরাও অনাসক্ত চিন্তে (লোভহীনভাবে) তা' গ্রহণ কর। তাহলে উভয়ের সুখ, পুণ্য বৃদ্ধি পাবে। আমি আবারো বলছি, তোমরা গৃহী ভিক্ষু উভয়ে লোভ ত্যাগ, হিংসা ত্যাগ, অজ্ঞান ত্যাগ করে অবস্থান কর। এবম্বিধ উপায়ে তোমাদের বিপুল কুশল পুণ্য সম্ভব হবে। যাতে তোমাদের সুখ অর্জিত হয়-এ কামনায় শেষ করলাম।

সাধু, সাধু, সাধু।

কেহ কাউকে নির্বাণ সুখ প্রদান করতে পারে না

এক সময় বনভন্তে রাজবন বিহারে আয়োজিত দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-ভগবান বুদ্ধ একবার মাত্র ধর্মদেশনা করার ফলে চুরাশি হাজার প্রাণী ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু লাভ করেছিল। এই ধর্মজ্ঞান কি? পরধর্মকে সুখ মনে না করে সদ্ধর্মকে সুখ মনে করা ধর্মজ্ঞান। তোমাদের যদি ধর্মজ্ঞান না থাকে তাহলে পরধর্মকে সুখ বলে মনে করবে। আর সদ্ধর্মকে সুখরূপে জানতে পারবে না। পরধর্মগুলো দুঃখ, পাপ এবং এ' ধর্ম আচরণে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সদ্ধর্ম আচরণে সুখ, পুণ্য এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। ধর্মচক্ষু কি? পরধর্মকে সুখরূপে না দেখে সদ্ধর্মকে সুখরূপে দেখাই হল ধর্মচক্ষু। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হলে তবেই তোমাদের জীবন সার্থক বলে জানবে। বর্তমানে তোমরা হিংসাহিংসি, রেষারেষি সহ যে সব নানা অকুশলকর্ম সম্পাদন করতেছ সেগুলো কখন বন্ধ হয়ে যাবে জান? যখন তোমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হবে। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হলে তখন আর হিংসাহিংসি, রেষারেষি, হানাহানি তথা যাবতীয় অকুশল কিছুই থাকবে না। কারণ অকুশলকর্ম তোমাদেরকে যে (প্রমত্ততার) সুখ দিচ্ছে; ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু সেই সুখের অপেক্ষা বহুতর শ্রেষ্ঠ সুখ প্রদান করবে। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু তোমাদেরকে উত্তম সুখ, শ্রেষ্ঠ সুখের সাগরে স্নাত করাবে। ভগবান বুদ্ধের এ' ধর্ম হল উত্তম ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বুদ্ধের সময়কালীন অনেক রাজা, রাজপুত্র, ধনী, ধনীপুত্র বুদ্ধের সমীপে এসে বলতেন-“আমরা ভগবানের নিকট উত্তম ধর্ম শুনতে চাই, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুনতে চাই।” যে ধর্ম শুনার পর চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয়, আর দুঃখ ভোগ করতে হয় না; সে ধর্মই উত্তম, শ্রেষ্ঠ। তোমরাও কি উত্তম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুনতে চাও? তাহলে আমার সাথে সাথে বলো, “আমরা উত্তম ধর্ম শুনতে চাই, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুনতে চাই।” উত্তম ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শ্রবণ করলে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হয়। ফলে সঙ্গেসঙ্গে চিরসুখ লাভ হওতঃ ধর্মদেশনা শুনা সার্থক হয়।

আমি যখন ধনপাতা অরণ্যে ছিলাম তখন মগবান গ্রামের জনৈক ব্যক্তি (গৃহী অবস্থায় পরিচিত) আমাকে বলেছিল, তোমাকে ফলে পরিচয় দেখাতে হবে, শুধু অরণ্যে থাকলে চলবে না। ভগবান বুদ্ধও বলেছেন-আমার ধর্ম গবেষণা কর। কিরূপ গবেষণা? অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মে কি ফলাফল রয়েছে তা' গবেষণার মাধ্যমে বের করা। নির্বাণ যে পরম সুখের অবস্থা তা' নিজেই প্রত্যক্ষ করতে হবে। তাহলে তোমাদেরকে বৌদ্ধধর্মে কি ফলাফল রয়েছে তা' গবেষণা করতে হবে। ভগবান বুদ্ধের ভাষিত 'নিব্বাণং পরমং সুখং' (বর্তমানে আমার মুখেও উচ্চারিত) সেটা কি রকম সুখ তা' গবেষণা করতে হবে। শুধুমাত্র অন্যের

অনুভূত কথা শুনে তো আর নিজের অনুভূতি হয় না। অনেক সময় সেখানে বিশ্বাসেরও ছিড় ধরতে পারে বৈকি! বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি উপমা দিচ্ছি শুন; ধর যে কোন একজন ভদ্রলোক বলতেছে আমি এই আম খেয়েছি খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি। আচ্ছা, তার কথা শুনা মাত্রই তোমরা বিশ্বাস করবে কি যে, আমটি খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি। সে সত্য কথা বলতেছে, নাকি মিথ্যা কথা বলতেছে (এবার পূজ্য বনভন্তে বেশ কয়েকবার বলতে থাকেন)? দায়ক-দায়িকারা নিজের খেয়াল, খুশিমত উত্তর দিতে গেলে বনভন্তে বলেন-এরূপ বলতে হবে নয় কি যে, আমি খায়নি, তবে অমুক কর্তৃক শুনেছি আমটি খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি। অর্থাৎ আংশিক বিশ্বাস আর আংশিক অবিশ্বাস করার পর্যায়ে পড়বে। যদি স্বয়ং নিজে খাওয়া যায় তবেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস আসবে যে, হ্যাঁ, সত্যই আমটি খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি। ভদ্রলোকটির কথা সঠিক। আবার অন্য একজন ব্যক্তি জীবনে কখনো আম খায়নি। এমন কি আম কোন বর্ণের, আম দেখতে কিরূপ তাও জানে না। একদা অপর জনের মুখে মিষ্টি আমের কথা শুনে তার আম খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জন্মাল। তার সে ইচ্ছার কথা এক অভিজ্ঞ লোকের কাছে প্রকাশ করলে সে বলল “অমুক ঝুড়িতে তো অতি মিষ্টি আম রয়েছে, সেখান হতে খাও গিয়ে।” এদিকে ঝুড়িতে আম আর মাকাল ফল একত্রেই ছিল। আম খেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি আম চিনে না-সে বাহ্যিক রক্তিম রঙে ঝলসানো মাকাল ফলটি অতি মিষ্টি আম ভেবে মুখে দিল। আর মাকাল ফলের তিক্ততায় বমি করে ফেলল। এবার অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এসে বলল, ‘কই মিষ্টি আম, আমগুলোতো সবই তিক্ত।’ অভিজ্ঞ ব্যক্তির সন্দেহ হল, সে নিশ্চয় আমগুলো চিনতে পারেনি। তাই সে ‘আমার সঙ্গে এসো তোমাকে আম খাওয়াচ্ছি’ বলে ঝুড়ি হতে একটি মিষ্টি আম তার হাতে দিয়ে দিল। এবার সে ব্যক্তি আসল আমের স্বাদ বুঝতে পারল। ঠিক তদ্রূপ, বর্তমানে তোমরাও আসল সুখ নির্বাণকে না চিনে, না জেনে সংসারী জীবনকে নির্বাণ সুখের মত মনে করতেছ। তাই বলছি, তোমরা যদি নির্বাণ সুখকে গবেষণার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে সমর্থ না হও, আমার উপলব্ধি নির্বাণ সুখকেও বিশ্বাস করবে না। তজ্জন্য অনেকে নাকি বলে ‘আমি বনভন্তেকে বিশ্বাস করি না।’ তাদের সে অবিশ্বাস করাটা কি রকম হচ্ছে জান? আম ভ্রমে মাকাল ফল খেয়ে আমের মিষ্টিকে বিশ্বাস না করার মত হচ্ছে।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-দুঃখমুক্তি নির্বাণ নিজকে নিজে অর্জন করতে হয়। কেহ কাউকে নির্বাণ লাভ করিয়ে দিতে পারে না। নির্বাণ লাভের জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজকেই তা’ লাভ করতে হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-দুঃখমুক্তির পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমি আবিষ্কার করেছি। নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম তোমাদিগকে করতে হবে, আমি কেবল উপদেষ্টা মাত্র।

অর্থাৎ নির্বাণ লাভের জন্য বুদ্ধের আবিষ্কৃত পথ ধরে নিজেকে অগ্রসর হতে হয়। বুদ্ধ নির্বাণের পথটুকু দেখিয়ে দিয়েছেন। কাজেই নিজের মুক্তি নিজেকেই করে নিতে হবে। (বনভন্তে একটি উপমা দিয়ে বলেন) বুদ্ধের উপদেশগুলো বিন্দি ধানের চাউল প্রদান করার মত। ধর, একজন দয়ালু ধনাঢ্য ব্যক্তি জনশ্রুতি পাঁচ সের করে বারজন গরিব লোককে বিন্দি চাউল প্রদান করল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বাড়িতে গিয়ে রান্না করে খেল আর কেহ কেহ বাড়িতে তা' ফেলে রাখল। এখন ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি তাদের প্রত্যেকের কাছে বিন্দি ভাতের স্বাদ জিজ্ঞাসা করে তারা উত্তর দিতে পারবে কি? সবাই পারবে না, যারা বিন্দি চাউলগুলো রান্না করে খায়নি তারা উত্তর দিতে পারবে না। তখন ধনাঢ্য ব্যক্তি অসন্তোষের সাথে বলে উঠবে—তোমাদেরকে বিন্দি চাউল দিলাম, রান্না করেও খেতে পারনি, সেটা কোন কথা! তাহলে কি আমাকে রান্নাও করে দিতে হবে? ভগবান বুদ্ধও ঠিক সেভাবে আমাদের জন্য নির্বাণ লাভের পথ আবিষ্কার দিয়েছিলেন—ধনাঢ্য ব্যক্তির মত। এখন তোমরা যদি বুদ্ধের আবিষ্কৃত মার্গ ধরে অগ্রসর হতে থাক তাহলে নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে। আর যদি সে মার্গ ধরে অগ্রসর না হও তাহলে নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে না। ভগবান বুদ্ধ তো তোমাদেরকে ধরে ধরে সেই মার্গে হাঁটাতে পারবে না। (পূজ্য বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে বলেন) তোমরা কি তাই চাও? তোমাদের ভাবভঙ্গি দেখে তো আমার তাই মনে হচ্ছে। দায়ক-দায়িকাদের মধ্যে সজোরে হাসির রোল পড়ে গেল। কিন্তু সেটা তো হবে না। বুদ্ধের উপদেশে নির্বাণ লাভ করা যায়। তবে স্বীয় দুঃখমুক্তি নির্বাণের জন্য নিজেকে প্রচেষ্টা করতে হয়। (বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন) 'তোমার অর্জিত দুঃখমুক্তি নির্বাণ তোমার', আর 'তোমার অর্জিত দুঃখমুক্তি নির্বাণ তোমার'। তোমার অর্জিত দুঃখমুক্তি নির্বাণ অন্য কাউকে ভাগ (প্রদান) দিতে পারবে না। অন্য কারোর অর্জিত দুঃখমুক্তি নির্বাণেও তুমি ভাগ বসাতে পারবে না। এক কথায়, নির্বাণ লাভের জন্য নিজেকে নিজেই উদ্যোগী হতে হবে। কেহ কাউকে নির্বাণ সুখ প্রদান করতে পারে না। নির্বাণ লাভ করা সম্পূর্ণ নিজের নিজস্ব ব্যাপার।

আমি ধনপাতায় অবস্থানকালীন জনৈক উপাসিকা আমার সমীপে গিয়ে ক্রন্দন করতঃ বলেছিল—আমরা বড়োই দুঃখের মধ্যে আছি, কখন মুক্ত হতে পারবো? তাহলে সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। তোমরাও দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চাও নয় কি? দায়ক-দায়িকাবৃন্দ—হ্যাঁ ভন্তে, চাই। তাই যদি হয়, তবে তোমাদেরকে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ মেনে চলতে হবে। বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ মেনে চললে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যায়। আমার সাথে বলো “আমরা যদি দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চাই তাহলে আমাদেরকে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ

করতে হবে”। বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন শিক্ষা, উপদেশে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভগবান বুদ্ধ আমাদের (ভিক্ষুদের) বলেছেন—হে ভিক্ষুগণ! আপনাকে আপনিই পরীক্ষা করবে। তোমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু হয়েছে? কিভাবে? যেমন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাকে একজন সুন্দরী যুবতী বিয়ে করতে চাচ্ছে। তখন তোমার মনও যদি সে যুবতীর কথায় আসক্ত হয়ে যায়, যুবতীর প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহলে জানবে তোমার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ হয়নি। আর যদি মন বিক্ষিপ্ত না হয়, যুবতীর প্রতি অনুরাগ না জন্মে তাহলে জ্ঞানের ভিত দৃঢ় হয়েছে বলে জানবে। তোমরা যদি প্রাণী হত্যা কর, চুরি-ডাকাতি কর, ব্যভিচার কর, মিথ্যাবাক্য ভাষণ কর এবং মদ-গাঁজা, আফিং, হেরোইন তথা নেশা জাতীয় দ্রব্য পান কর তাহলে তোমাদের জ্ঞান লাভ হয়নি বলে জানবে। জ্ঞান থাকলে তোমরা কোন অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। আর জ্ঞান না থাকলে অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে—এটাই তোমাদের জ্ঞান লাভ এবং অলাভের পরীক্ষা। জ্ঞান থাকলে সুখ লাভের কর্ম সম্পাদন করতঃ সুখ লাভ হয়, কিন্তু জ্ঞান না থাকলে সুখ লাভের পরিবর্তে দুঃখ লাভের কর্ম সম্পাদন করতঃ দুঃখ পেতে হয়। তাই বলা হয় জ্ঞান থাকলে সুখ, আর জ্ঞান না থাকলে দুঃখ।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমরা কখনো অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতঃ কুশলকর্মই সম্পাদন করবে। তাহলে তোমাদের সুখ লাভ হবে। সুখ লাভের প্রত্যাপ্তি অথচ অকুশলকর্ম সম্পাদনে রত এবম্বিধ উপায়ে কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। সেরূপ করলে তা কি হবে জান? লিচুর শাঁসটা বাদ দিয়ে বিচিটা খাওয়ার ন্যায় হবে। তোমরা সদ্ধর্ম সুখ কর, পরধর্ম সুখ করবে না। বর্তমানে তোমরা সদ্ধর্মের সুখ বাদ দিয়ে পরধর্ম সুখ করতে চাচ্ছে। ফলে সুখের পরিবর্তে দুঃখকে বরণ করে নিতে হচ্ছে। আমার সাথে বলো “আজ হতে আমরা আর পরধর্ম সুখ করব না; সদ্ধর্ম সুখই করব। এতে আমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হওত নির্বাণ পরম সুখ লাভ হবে”।

কাজেই তোমরা সকলে সাবধান হয়ে যাও, সর্বদা সদ্ধর্ম আচরণে তৎপর থাক। যাতে তোমাদের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

যেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রজ্জ্বলিত শীলবান তাদের সংসারে ঝগড়াঝাটি থাকে না

এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাজবন বিহারে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে দেশনা প্রদানকালে বলেন—ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন প্রায় ঘটনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভগবান দায়ক-দায়িকাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান করলে তারা কেহ স্রোতাপত্তি,

কেহ সন্ধ্যাগামী ফল লাভ করত। আর ভিক্ষুদিগকে ধর্মদেশনা করলে তারা কেহ অনাগামী, কেহ অরহত ফল লাভ করত। তাই ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষু, গৃহী উভয়ে স্থায়ী সুখের অধিকারী হতো। ফলে বুদ্ধের ধর্মদেশনা এবং ভিক্ষু অথবা গৃহীর ধর্মদেশনা শ্রবণ দু'টিই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক হয়ে যেতো। তার কারণ কি জ্ঞান? তখন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘগণের অনেকেই রাজা-রাজপুত্র, ধনী-ধনীপুত্র ছিলেন; তারা আশি কোটি, নব্বই কোটি বিত্ত বিভব ধন-সম্পদ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তখন উপাসক-উপাসিকাগণও রাজা-রাণী, ধনী-ধনীপত্নী ছিল। তারা প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক। তারা কেহ ভোগ করেনি, ত্যাগের মাধ্যমে সুখ অন্বেষণ রত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তো সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ভিক্ষু গৃহী উভয়ে ভোগের পিছনে ছুটছে। কেহ ত্যাগ করতে চাচ্ছে না। বিশেষ করে ভিক্ষুরা নির্লজ্জের মত হীন কাজের মাধ্যমে ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়িয়ে চলতেছে। তজ্জন্য ভিক্ষুরাও মার্গফল লাভ করতে পারছে না, দায়ক-দায়িকারাও মার্গফল লাভ করতে পারছে না। ভিক্ষুরা যেমন দুঃখ পাচ্ছে, দায়ক-দায়িকারাও তেমন দুঃখ পাচ্ছে। আর ভিক্ষুরা কষ্ট পেলে গৃহীদেরকে বদনামী করতেছে, গৃহীরা কষ্ট পেলে ভিক্ষুদেরকে বদনামী করতেছে। এ অবস্থা অবলোকন করলে আমার সত্যিই লজ্জা হয়। কাজেই বর্তমানে ভিক্ষু গৃহী উভয়েই অপরিষ্কার চিত্তে অবস্থান করতেছে। তাদের মনচিত্তে ময়লা আবর্জনা জমে গেছে।

ভগবান বুদ্ধ সর্বদা পরিষ্কার চিত্তে অবস্থান করতে বলেছেন। কোন ময়লাকে যেন চিত্তে স্থান দেয়া না হয়। চিত্ত ময়লা হয়ে গেলে দুঃখের উদয় হয়। বুদ্ধ ময়লা সম্বন্ধে আরো বলেছেন-অনাবৃতি মস্ত্রের ময়লা, অসংস্কার ঘরের ময়লা, দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের ময়লা, আলস্য দেহের ময়লা; ইহ-পরকালের ময়লা হল পাপকর্ম, অবিদ্যা ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ময়লা। হে ভিক্ষুগণ! এই ময়লা বর্জন করে তোমরা সকলে নির্মল হও। কর্মকার যেমন রজতের ময়লা একটু একটু করে বিদূরীত করে ঈশ্বরিক মেধাবী ব্যক্তিও আপনার ময়লা ক্ষণে ক্ষণে বিদূরীত করবে। অর্থাৎ নিজের বশে আনবেন। কি বুঝতে পেরেছ? মস্ত্র যদি পুনঃপুন আবৃতি করা না হয় তাহলে ভুলে যেতে হয়; তাই অনাবৃতি মস্ত্রের ময়লা। ঘর যদি সংস্কার করা না হয় তাহলে সেই ঘর ভেঙ্গে যায়, ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে; তাই অসংস্কার ঘরের ময়লা। স্ত্রীলোক যদি দুশ্চরিত্র হয় সমাজ তাকে খুব হয়ে প্রতিপন্ন করে, অধিকন্তু সেই পরিবারে সুখ, শান্তি, উন্নতি সবই বিনষ্ট হয়ে যায়; তাই দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের ময়লা। আলস্য শরীর বা আলসেমী ভাব দ্বারা কোন কাজে অগ্রগতি হয় না, উন্নতির সব প্রচেষ্টা সেখানে ছারখার হয়ে যায়; তাই আলস্য দেহের ময়লা। পাপকর্ম সম্পাদন করলে ইহকালেও দুঃখ ভোগ

করতে হয়, পরকালেও দুঃখ ভোগ করতে হয়, ইহ-পর উভয় কালে বিভীষিকাময় দুঃখে পদ্ধ হতে হয়, সুখের আশা বিনষ্ট হয়; তাই ইহ-পরকালের ময়লা হল পাপকর্ম। অবিদ্যাচ্ছন্নতার দ্বারা সত্ত্বগণ সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যভাবে ধরে নেয়, অধিকন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন চিন্তে কখনো দুঃখমুক্তি পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয় না; তাই অবিদ্যা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ময়লা। তোমরা এবম্বিধ ময়লা বিধৌত করে নির্মল বিশুদ্ধভাবে অবস্থান কর। মনে রাখবে, পরিষ্কার হলে সুখ, আর অপরিষ্কার হলে দুঃখ। সেই পরিষ্কার কি? মনচিন্তকে পরিষ্কার রাখা। বিভিন্ন কু-প্রবৃত্তি দ্বারা মনচিন্ত অপরিষ্কার বা ময়লা হয়ে যায়। সে ময়লাযুক্ত চিন্তাই সর্ব প্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। আর নির্মল বা পরিষ্কার চিন্ত সর্ব সুখের আকর। আচ্ছা, আমার এ কথাগুলো তোমরা বুঝতে পারছ কি? যদি বুঝতে পার ভালো লাগবে এবং সেই সাথে আমার এ কথাগুলো আচরণ করলে পরম সুখের ভাগী হবে। আর যদি বুঝতে না পার, ভালো লাগবে না এবং আচরণও করতে পারবে না। যার ফলে আগে যেই রকম দুঃখে ছিলে বর্তমানেও সেই রকম দুঃখের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হবে। কেন বুঝতে পারবে না জান? তোমাদের মনের ভিতর অবিদ্যা থাকলে। অবিদ্যার স্বভাব হল অজ্ঞানতা (না জানা)। কিরূপ? দুঃখ না বুঝা অবিদ্যা, দুঃখ সমুদয় না বুঝা অবিদ্যা, দুঃখ নিরোধ না বুঝা অবিদ্যা, দুঃখ নিরোধের উপায় না বুঝা অবিদ্যা, কোন বিষয় না বুঝা অবিদ্যা, ধর্মের আশ্বাদ না পাওয়া অবিদ্যা। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাব্য ত্যাগ করে তোমরা জ্ঞানী ও পণ্ডিত হও। পণ্ডিত কাকে বলে? বাংলা, ইংরেজীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান করতে পারলে তাকে পণ্ডিত বলা চলে না। বি এ, এম এ, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী জাতীয় উচ্চ শিক্ষিত হলে তারাও পণ্ডিত নয়। সহনশীলতা, জীবের প্রতি দয়ালু, কুশলকর্মে নির্ভীক, ক্ষমা-মৈত্রী ও নিজকে সর্বদা অক্ষুণ্ণ মনে রাখতে সক্ষম ব্যক্তির পণ্ডিত। পণ্ডিত হলে তোমাদের সুখ লাভ হবে।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-আমি সারারাত ঘুমাই না, চেয়ারেই বসে থাকি। আর তোমাদের বর্তমান কাজ-কর্ম, চাল-চলন, মনোভাব এবং ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে অবলোকন করি। আমি তো দেখছি তোমরা বর্তমানে পঞ্চাশীলাদি লঙ্ঘন সহ নানাবিধ অকুশলকর্মে নিয়োজিত রয়েছ। সর্বদা পাপজনক কর্ম সম্পাদন করলেও পুণ্যজনক কর্ম সম্পাদনে কোন আগ্রহ নেই। প্রমত্ত জীবন-যাপন করেই দুর্লভ মানব জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করতেছ। কাজেই তোমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। এমন কি এ' পাপকর্মসমূহ এক্ষুণি পরিহার করে না চললে আগামী দশ/বার বৎসরে তোমাদেরকে আরো অনেক সঙ্করণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। তিনি পাপকর্মীদেরকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, এই দ্রাস্ত পথ পরিত্যাগ কর, তা না হলে

সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করতেছে বলে জানবে।

তোমাদেরকে সবসময় জ্ঞানের মাধ্যমে চলতে হবে। জ্ঞানের মাধ্যমে চললে নিজকে পাপকর্ম হতে পৃথক রাখা যায়। তাই বলা হয়েছে-জ্ঞান থাকলে সুখ, আর জ্ঞান না থাকলে দুঃখ। তোমরা যখন স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার ধর্ম পালন করতেছ, সুতরাং উভয়কে জ্ঞানের সহিত চলতে হবে। যেই স্বামী-স্ত্রী প্রজ্ঞাবান, শীলবান তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি থাকে না। যেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দুষ্ট্রাজ্ঞ, দুঃশীল তাদের সংসারে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে। পরস্পর ভেদাভেদ, মনোমালিন্য, ভুল বুঝাবুঝি, কটুবাক্য বিনিময় সহ সর্বদা তিক্ত পরিবেশ বিরাজ করে। তাই সেই পরিবারে না থাকে শান্তি, না থাকে শৃঙ্খলা, না থাকে কোন সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার। তাদের সম্ভানেরাও অসৎ সঙ্গীর সাথে মেলামেশা করে ভ্রান্তপথে পা বাড়ায়। ফলে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বাড়ির কেহই সুখী হতে পারে না। তাদেরকে সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট, অনুতাপ-অনুশোচনা ও অন্তর্জ্বালার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। এরূপ অনেক দম্পতি আমার নিকট এসে তাদের সাংসারিক জীবনের দুর্বিষহ দুর্দশাপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করতঃ ক্রন্দন করেছে। কাজেই তোমরাও সাবধান হয়ে যাও। তিনি স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, স্বামী-স্ত্রী হওয়া মানে একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া। সুতরাং সুখ পেলে যেমন দু'জনকে সমসুখী হয়ে থাকতে হবে তেমনি দুঃখ পেলেও দু'জনকে তা' সমানভাগে ভাগ করে নিতে হবে। অন্যদিকে, স্বামী-স্ত্রী উভয়কে উভয়ের সুখ-দুঃখ বুঝতে হবে। স্বামীর সুখের দিকে স্ত্রীকে নজর রাখতে হবে, স্ত্রীর সুখের দিকেও স্বামীকে নজর রাখতে হবে। স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীকে রক্ষা করে দিতে হবে, স্ত্রীর মর্যাদাও স্বামীকে রক্ষা করে দিতে হবে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে আস্থাভান বিশ্বাসী হতে হবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীকেও আস্থাভান বিশ্বাসী হতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা পরস্পরের কাজ। স্ত্রীর অরুচিকর কর্মের প্রতি স্বামীর জ্ঞান থাকতে হবে, স্বামীর অরুচিকর কর্মের প্রতি স্ত্রীর জ্ঞান থাকতে হবে। যে কাজ বা বাক্য বললে বা করলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে, সেই কাজ বা বাক্য কখনো করতে বা বলতে নেই। সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হবে। শীলে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এরূপ প্রজ্ঞাবান, শীলবান, বিনয়ী স্বামী-স্ত্রীর ইহকালেও সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ হয়; পরকালেও উভয়ে সুগতি স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়। শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী হলে সুখ লাভ হয় না। স্বামী-স্ত্রী হয়ে উভয়ে শীলবান, প্রজ্ঞাবান হলে তবেই সাংসারিক সুখ লাভ হয়। বর্তমান যুবক-যুবতীদের অনেকের ধারণা স্বামী-স্ত্রী হলেই সাংসারিক সুখ লাভ হবে। চাকমা কথায়-“এঝ বাঘ' বাজ ন' পহ্”। আমি অনেক দেখেছি, যুবক-যুবতী অবস্থায় প্রেম করে বিবাহ করার পর

সাংসারিক জীবনে সেই প্রেম, ভালোবাসা ধুলোর মতো উড়ে যেতে। এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দু'জন দু'টি সংসারে আলাদা ঘর করতে। কাজেই জ্ঞান, পুণ্য না থাকলে সুখ লাভের আশা কিছুতেই পূরণ হয় না।

তিনি বলেন-আমি গৃহী অবস্থায় শুনেছি, একদা গরিব গৃহস্থের বাড়িতে তার শ্যালক বেড়াতে গিয়েছিল। যেই কিনা পিঁড়ে টেনে বসল এমনি সময় ভাগিনা এসে বলল 'মামা, আমাদের বাড়িতে আজ ভাত নেই'। শ্যালক অবশ্য পূর্ব হতেই জানত যে তার বোনটি বা ভগ্নিপতির এ' দরিদ্রতার অবস্থা। তাই সে বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। ভাগিনার কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নিপতির হাতে উক্ত টাকাগুলো তুলে দিয়ে তাকে বাজারে পাঠাল। এভাবে ঐ দিন গরিব গৃহস্থের ভাত খাওয়া হল। এবার বনভন্তে উপস্থিত দায়কদের প্রশ্ন করেন-আচ্ছা, ঐ দিন শ্যালক যদি বেড়াতে না যেতো তাহলে সেই গৃহস্থকে উপোস থাকতে হতো নয় কি? হ্যাঁ ভন্তে, হতো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ শ্যালকের মত তোমাকেও যদি সেই রকম অবস্থায় পড়তে হয় মনের মধ্যে কিসের উদয় হবে? ভন্তে, দুঃখ লাগবে। কেন? আমি না গেলে ছোট ভাগিনাকে উপোস থাকতে হতো, বোনটির প্রতিও দুঃখানুভব হতো, ভগ্নিপতির প্রতিও। বনভন্তে বলেন-এরূপ পরিস্থিতি হলে তোমার, তোমার ভগ্নির, ভগ্নিপতির সকলের লজ্জার বিষয় হবে নয় কি? হ্যাঁ ভন্তে, হবে। এটা কিসের জন্য? গরীবের জন্য। আরো একটি ঘটনার কথা বলি, শুন। একদা গরিব শ্বশুরের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল এক জামাই। জামাই বাবুকে শ্বশুর-শ্বশুড়ী ঢুকিয়ে বৈঠকখানায় বসতে দিল। ইত্যবসরে শ্বশুর-শ্বশুড়ী বাড়ির অন্য কোণায় গিয়ে বুদ্ধি করতে লাগল। শ্বশুড়ী বলতে শুরু করল আমাদের তো কণামাত্রও চাউল নেই, অথচ জামাই বাবু বেড়াতে আসলেন, এখন কি করা যায় বলতো। শ্বশুরেরও একই কথা, বাড়িতে কণামাত্রও চাউল নেই, অথচ জামাই বাবু বাড়িতে উপস্থিত, এ' অবস্থায় কি করতে পারি...? জামাই বাবু বৈঠকখানা থেকে সবকিছু শুনতে পেয়ে বলল-কেন বাবা, আমি তো সবকিছুই নিয়ে এসেছি; আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। মা, আপনি এ' চাউল, তরকারীগুলি নিয়ে রান্না করেন। বনভন্তে উপরোক্ত ঘটনা দু'টি অবতারণা করার পর, বলেন-এরূপ গরিব হয়ে কেন জন্মগ্রহণ করতে হয় জ্ঞান? অতীত জন্মে পাপের ফলে। অতীত জন্মের দানাদি কুশলকর্মের পুণ্যফল না থাকলে বর্তমান জন্মে গরিব কূলে জন্মগ্রহণ করে বিবিধ দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হয়। আর বর্তমান জন্মে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করতঃ পুণ্য সঞ্চয় করলে আগামী জন্মে গরিব কূলে জন্ম নিয়ে দুঃখ ভোগ করতে হবে না। এগুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে। বর্তমান জন্মে আমি অনেক জনকে বলতে শুনেছি, "আমি দান করব না, শীল পালন করব না, কোন পুণ্যকর্মও করব না"। এমন কি

অন্যজনকেও পুণ্যকর্মে বাধা দেয়। তারা মৃত্যুর পর কোথায় যাবে, আমি সে সব অবলোকন করছি। মৃত্যুর পর বহু জন্ম পর্যন্ত তারা ভাতের কণামাত্রও খেতে পাবে না। অনেক কষ্টের পর মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি করবে, অপরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে কোন মতে পেটের জ্বালা নিবারণ করবে। তারা নিজেরা দান না দিলেও কেন অপরজনকে দানাদি কুশলকর্ম করতে বাধা দেয়? এতে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। তারা বর্তমানে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির মালিক বলে, গরিব হলে কি দুঃখ পেতে হয় তা' বুঝতে চাচ্ছে না। কিন্তু মৃত্যুর সময় তো এই টাকা-পয়সা, বাড়ী-গাড়ী সঙ্গে করে নিতে পারবে না। পারবে কি? পারবে না। তাহলে সঙ্গে কি নিয়ে যাবে তারা? এদিকে পুণ্যের ঝুড়ি তো খালি তাদের। তখন মস্ত বিপদে পড়তে হবে না তাদেরকে? তাই তোমাদেরকে বলছি, তোমরা সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। যাতে পরবর্তীতে অনুতাপ করতে করতে দুঃখের অগ্নিতে দক্ষ-বিদক্ষ হতে না হয়। মানুষ সবাই সমান নয়। তারা পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করলে কি হবে, তোমরা তো অনেকেই তা' করতেছ। কাজেই তোমাদেরকে বলছি, সবাই তাদের মত হলে আমি চূপ করে থাকতাম-কিছুই বলতাম না।

এক সময় নাগরী দেবী নান্নী জনৈকা এক উপাসিকা আমাকে বলেছিল-ভন্তে, আমি মৃত্যুর পর পরজন্মে পরমা সুন্দরী হতে চাই। আমি বলেছিলাম, তাহলে তোমাকে রাগ ত্যাগ করতে হবে; সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু হতে হবে; কোন প্রাণীকে টিল, দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ-বন্ধন প্রহার করতে পারবে না; পঞ্চশীলাদি প্রতিপালন করতে হবে। এগুলো পালন করতে পারলে মৃত্যুর পরজন্মে পরমা সুন্দরী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। শুধুমাত্র প্রার্থনা করলে চলবে না, সেই প্রার্থনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে হবে। বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন-সে মৃত্যুর পরজন্মে কি হতে চায়? ভন্তে, পরমা সুন্দরী হতে চায়। বনভন্তে এবার দায়িকাদের দিকে তাকিয়ে বলেন-হে মেয়েরা, তোমরা' তা' চাও কি? যদি চাও তবে তোমরা আজ হতে আর রাগ করবে না; সকল প্রাণীর প্রতিদয়ালু হবে; কোন প্রাণীকে টিল, দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ-বন্ধন প্রহার করবে না; পঞ্চশীল পালন করবে। তাহলে তোমরা মৃত্যুর পরজন্মে অবশ্যই পরমা সুন্দরী হতে পারবে। ইহজন্মে যারা সর্বদা রাগান্বিত হয়ে অবস্থান করে তারা মৃত্যুর পরজন্মে কুৎসিত চেহারাধারী হয়। রাগী মানুষেরা কখনো মৃত্যুর পরজন্মে সুশ্রী হতে পারে না। যারা প্রাণীর প্রতি নির্দয়; টিল-দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা প্রাণীদিগকে আঘাত করে, বিবিধ প্রকারে দুঃখ যাতনা দেয় তারাও মৃত্যুর পরজন্মে বিকলাঙ্গ, বিশ্রী হয়ে জন্মধারণ করে। পঞ্চশীল লঙ্ঘনকারীরাও মৃত্যুর পরজন্মে সুস্থ, সুঠাম এবং সুন্দর শরীরের অধিকারী হতে পারে না। আর

যারা ইহজন্মে রাগ করে না, কোন প্রাণীকে দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা প্রদান করে না বরং সকল প্রাণীকে সমভাবে দয়া করে এবং পঞ্চশীল পালন করে তারা মৃত্যুর পরজন্মে সুস্থ, সুঠাম শরীর, মধুর কণ্ঠস্বর সহ সুবিন্যস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। শুধুমাত্র মেয়েদেরকে নয় তোমাদের সবাইকে বলছি-তোমরা রাগ করবে না; সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু হবে; কোন প্রাণীকে টিল, দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ-বন্ধন প্রহার করবে না এবং পঞ্চশীল পালন করবে। তাহলে মৃত্যুর পর চারি অপায়ে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকবে না; বরং সুগতি স্বর্গ লাভ হবে। আর মনুষ্যকূলে জনগ্রহণ করলে সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারবে। আবার, অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল পালন করলে, সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু হয়ে কোন প্রাণীকে টিল-দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ, বন্ধন, প্রহার না করলে এবং রাগ না করলে শ্রোতাপত্তি হওয়া যায়। তাতে পরম নির্মল সুখের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা যখন সংসারী, তোমাদেরকে সাংসারিক সুখের কথাই বলছি, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জ্ঞান, সত্যের সহিত অবস্থান করবে। যেই স্বামী-স্ত্রীর চিন্তে জ্ঞান সত্য নেই, সেই স্বামী-স্ত্রী কিছুতেই সুখী হতে পারে না। আমার সাথে বলা “আমরা জ্ঞান সত্যের সহিত অবস্থান করব। কখনো অজ্ঞান মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করব না। জ্ঞান সত্যই আমাদেরকে সুখ, শান্তি প্রদান করবে”। মনে রাখবে, অজ্ঞান মিথ্যার সহিত অবস্থান করলে সর্বদা ঝগড়া, কলহ, মতভেদ, মনোমালিন্য; ভুল বুঝাবুঝি সহ কতো প্রকার দুঃখই না লেগে থাকবে, তার অন্ত নেই। আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করাকে কি বলি জ্ঞান? চাকমা কথায় “কোনমতে, যেনসেন গরি পরাণ বাজেবাতেই” অর্থাৎ কোন মতে জীবনে বেঁচে থাকাই সার। সেখানে প্রকৃত সুখ, শান্তি বলে কিছুই নেই। সাংসারিক জীবনে তেমন কিছুই লাভ নেই; সর্বক্ষেত্রে লোকসানই দিতে হয়। তবুও যখন স্বামী-স্ত্রী হয়ে সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছ তখন জ্ঞান এবং সত্যের আশ্রয়েই থাকবে। যথা সম্ভব মনচিন্তা পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করবে, ময়লা হতে দেবে না। পাপকর্ম পরিত্যাগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে। পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে সাংসারিক সুখটুকু লাভ হবে, এবং পরকালও সুখের হবে। তোমাদের সুখ-শান্তি লাভ হোক।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞান সত্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সুখ অর্জিত হয় না

অদ্য ৩০শে অক্টোবর ২০০১ সাল, রোজ মঙ্গলবার। শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজবন বিহারে আয়োজিত সার্বজনীন দানানুষ্ঠান। মূল বিহারের দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠে অবস্থিত স্থায়ী মঞ্চের আশপাশে পুণ্যার্থীবৃন্দের উপস্থিতিতে জনসমুদ্র প্রায়। যথাসময়ে পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় প্রমুখ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসঙ্ঘ মঞ্চের আগমন করেন-পুণ্যার্থীবৃন্দের এলাকা প্রকম্পিত সশ্রদ্ধ সাধুবাদ ধ্বনির মাধ্যমে। দানোৎসর্গ পর্ব সমাপ্ত হলে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ। অর্থাৎ সহজে সদ্ধর্ম শ্রবণ করা যায় না। প্রব্রজ্যা লাভ করা দুর্লভ। সহজে প্রব্রজ্যা জীবন ধারণ করা যায় না। শ্রদ্ধা সম্পদ দুর্লভ। সত্যের প্রতি সহজে বিশ্বাসের উদয় হয় না। মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ। সহজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত মানব জীবন লাভ করা যায় না। বুদ্ধের উৎপত্তি দুর্লভ। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব সহজে হয় না। এখন কথা হচ্ছে, তোমরা বর্তমানে যে মনুষ্য জনম লাভ করেছে সেটা আগামীতেও স্থিতি রাখতে পারবে কি? বর্তমান মনুষ্য জন্মকে আগামীতেও স্থির রাখা, উর্ধ্বগতিতে নিয়ে যাওয়া; অধোগতিতে পতিত হতে না দেয়া-প্রত্যেক মানবের একান্ত কর্তব্য। তোমাদের বর্তমান এই মনুষ্য জনমকে স্থিতি করে দিতে, উর্ধ্বগতিতে নিয়ে যেতে; অধোগতিতে পতিত হতে না দিতেই আমার এ' দেশনা। আমার সাথে বলো “বর্তমান মনুষ্য জন্মকে আমরা আগামীতেও স্থির রাখব, উর্ধ্বগতিতে নিয়ে যাবো; অধোগতিতে পতিত হতে দেবো না”। তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে আমার এ' কথাগুলো বুঝতে পারবে এবং সেই অনুসারে স্বীয় জীবন চালিত করবে। আর যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে বুঝতে পারবে না এবং সেই অনুসারে চলবে না।

বৌদ্ধধর্মের মতে, পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগই সুখ। এ'পঞ্চস্কন্ধ তত্ত্ব কিন্তু সহজ সরল বিষয় নয়, অত্যন্ত ভাবগম্ভীর এক বিষয়। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধ। এ পঞ্চস্কন্ধ আমি নয়, আমার নয়, আমার আত্মা নয়। বাস্তবিক পঞ্চস্কন্ধে আমি বা আত্মাভাব করা অজ্ঞানতা ছাড়া কিছুই নয়। ধর্মদেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে গরম পানির ফোঁতা তুল্য রূপস্কন্ধকে ত্যাগ করতে পারলে সুখ হয়। তেমনিভাবে ধর্মদেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদ তুল্য বেদনাস্কন্ধকে ত্যাগ করতে পারলে সুখ হয়। দেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানো বা বিজলীর ন্যায় সংজ্ঞাস্কন্ধকে ত্যাগ করতে পারলে সুখ হয়। দেশনা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কদলীবৃক্ষবৎ সারহীন সংস্কারস্কন্ধকে ত্যাগ করতে পারলে সুখ হয়। দেশনা

শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজাল ভেলকি বা ভোজবাজির ন্যায় বিজ্ঞানস্কন্ধকে ত্যাগ করতে পারলে সুখ হয়। ‘ইন্দ্রজাল ভেলকি মত, বিজ্ঞানের কর্ম যত’। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল কাজ-কর্ম বা আবিষ্কার করতেছে; যেমন-রেডিও, টেলিভিশন, এরোপ্লেন, রকেট ইত্যাদি তা’ সবই এই বিজ্ঞানস্কন্ধ বা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান শক্তির উৎকর্ষতার সাহায্যে। আর মানুষজন তাতে হতভম্ব হয়ে বা বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজালের মোহে মোহিত হওতঃ ভোগ বিলাসে মত্ত রয়েছে। তোমরা নিশ্চয় বিশিষ্ট জাদুকর পি, সি সরকারের নাম শুনেছ। একদা সেই পি, সি সরকার জাপানের টোকিওতে ফুট দোকান হতে একটা কমলার ভেতর থেকে ফিতা বাহির করে দেখায়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানের বৈজ্ঞানিকগণও পি, সি সরকারের মত বিভিন্ন কিছু আবিষ্কার করে দেখায়ে তোমাদেরকে হতভম্ব করে ফেলেছে। কিন্তু বুদ্ধের মতে, এই সব আবিষ্কার, তত্ত্ব প্রমাণাদি দ্বারা সমস্ত দুঃখের অন্তঃসাধন করতঃ নির্বাণ লাভ করা যায় না। আর যেই কাজের মাধ্যমে দুঃখের চির অবসান হয় না তা’ সবই অন্তঃসার শূন্য কাজ। কাজেই ‘ইন্দ্রজাল ভেলকি মত, বিজ্ঞানের কর্ম যত’। জাদুকরেরা যেমন বিভিন্ন জাদু দেখায়ে চলে বৈজ্ঞানিকগণও ঠিক তেমনি বিভিন্ন কাজ-কর্ম, আবিষ্কার করে দেখায়ে তোমাদেরকে মোহিত করে রেখেছে। মনে রাখবে, বৈজ্ঞানিক এই কাজ-কর্ম আবিষ্কারের মধ্যে প্রকৃত সুখ নেই। এবং সেগুলো একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই যা অনিত্য ও দুঃখাবহ তা’ মুক্তিকামীদের পক্ষে ইন্দ্রজালের মত। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিকদের সেই কাজ বা আবিষ্কারের দ্বারা উপকারের চাইতে অপকারও কম করছে না। মানুষের লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র পৃথিবী। তাই সে অন্তঃসার শূন্য কাজের দিকে মন না দিয়ে দুঃখমুক্তি নির্বাণের দিকে মনোযোগী হওয়া জ্ঞানী ব্যক্তিদের আদি কর্তব্য। তজ্জন্য বলছি-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান-এ পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। ‘রূপ’ সেটা আপন নয়; ‘বেদনা’ সেটা আপন নয়; ‘সংজ্ঞা’ সেটা আপন নয়; ‘সংস্কার’ সেটা আপন নয়; ‘বিজ্ঞান’ সেটা আপন নয়। সেগুলো পরিত্যাগ কর। সেগুলো পরিত্যাগেই সুখ লাভ হয়। এক কথায়-পঞ্চস্কন্ধে আমি, আমার, আমিত্ব ধারণা না করাই সুখ। দায়ক-দায়িকাদের দিকে বনভন্তে লক্ষ্য করে বলেন-বর্তমানে তোমরা তো ‘আমি’, ‘আমার স্বামী’, ‘আমার স্ত্রী’, ‘আমার পুত্র’, ‘আমার কন্যা’, ‘আমার বাড়ি’, ‘আমার জায়গা-জমি’ ইত্যাদি ধারণা পোষণ করতেছ। প্রকৃতপক্ষে, সে সবই মিথ্যা ধারণা। কারণ পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে সে সব অনুধাবন করা চলে না। অনুধাবন করলে শুধু শুধু দুঃখকে ডেকে আনা সার হয়। (আমি নাটকে পড়েছি) বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ইংরেজ কর্তৃক ফাঁসির দড়িতে ঝুলবার আগ মুহূর্তে বলেছিল

“দেখলাম এই ভারতবর্ষ হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, শুধু জন্মভূমি”। অথচ প্রথমে ভারতবর্ষকে নিজের বলে দাবি করেছিল। কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্তে অনুধাবন করেছিল নিজের বলে কিছু নেই। তোমরাও আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার জায়গা-জমি, আমার বাড়ি, আমার ধন-সম্পদ, আমাদের বাংলাদেশ বা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে বলে দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি করতেছ। তাই বলছি, এসব বলা বন্ধ কর। পঞ্চকঙ্কের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করতে সচেষ্ট থাক। তাহলে কিছুটা হলেও দুঃখের পরিমাণ কমে যাবে।

তিনি আরো বলেন-তোমাদের সাংসারিক জীবনটা কি রকম জ্ঞান? বিয়ে করার আগে যুবক যুবতী অবস্থায় তোমরা ভেবে থাক যে, অমুক যুবককে বা অমুক যুবতীকে বিয়ে করতঃ সংসারী হলে সুখ হবে। কিন্তু বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রী হয়ে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। তাই নয় কি? বর্তমানে অনেক স্বামী-স্ত্রী আমার নিকট এসে প্রতিনিয়ত তাদের দাম্পত্য জীবনের অসহ্য দুঃখের কাহিনী বলতেছে। তাদের কথা শুনে বুঝতেছি, স্বামী যেমন ভীষণ দুঃখ-কষ্টের শিকার হচ্ছে, তেমনি স্ত্রীও দুঃখ-কষ্টের শিকার হচ্ছে। এভাবে পুত্রও দুঃখ পাচ্ছে, কন্যাও দুঃখ পাচ্ছে, জামাই দুঃখ পাচ্ছে, পুত্রবধূ দুঃখ পাচ্ছে, নাতি-নাতনি সবাই দুঃখ পাচ্ছে। আমি তো দেখতেছি তোমরা প্রত্যেকে এক একটি দুঃখের পুঞ্জমাত্র। আচ্ছা, এতো দুঃখ পাচ্ছে, তবু কেন সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছ? তোমাদের লজ্জা শরম নেই বলে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দায়ক-দায়িকাদের মাঝে সজোরে হাসির রোল পড়ে গেল। এবার বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে বলেন, আমার সাথে বলো “আমাদের লজ্জা শরম নেই বলে সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছি”। তোমরা স্বামী-স্ত্রী হওয়ার আগে কতো সুখের স্বপ্নই না দেখেছিলে অথচ বর্তমানে শুধু দুঃখের হাহাকারে মূহ্যমান হয়ে আছ। পূজ্য বনভন্তে যুবক-যুবতীদের দিকে দৃষ্টি ফেরায়ে বলেন-তোমরা সাংসারিক জীবনের রঙিন স্বপ্ন আঁকতেছ কি? (এবারও দায়ক-দায়িকাদের মাঝে হাসির রোল পড়ে গেল) স্বপ্ন আঁকা আর বাস্তব এক নয়। বিয়ে করে দেখো দুঃখই পাবে সার। বনভন্তে আরো বলেন, তোমরা সাংসারিক জীবনে এতো দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু কই ত্যাগ তো করতে পারছ না। কয়েকজন দায়ক সজোরে বলে উঠলেন-ভন্তে, আশীর্বাদ করুন যাতে ত্যাগ করতে পারি। পারবে না। কারণ বুদ্ধ বলেছেন, অজ্ঞানী ব্যক্তির সাংসার কারাগারে অনন্ত দুঃখ ভোগ করেও কারাগারের প্রতি বীতম্পৃহ হয় না। তোমাদের অবস্থাও তাই হয়েছে। যদি তোমাদের বুদ্ধজ্ঞান উদয় হতো তোমরা বিয়েও করতে না। বুদ্ধজ্ঞান উদয় হলে যুবকেরা যুবতীদেরকে বিয়ে করবে না; যুবতীরাও যুবকদেরকে বিয়ে করবে না। বুদ্ধজ্ঞান অধিকারী যুবকের চিন্তে এরূপ

ভাবের উদয় হয় যে, আমি এ যুবতীকে বিয়ে করে সংসারী হলে বিবিধ পাপ সৃষ্টি হবে, দুঃখ পাবো, লজ্জা পাবো এবং ঠকবো। মৃত্যুর পরও চারি অপায়ে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। আর বুদ্ধজ্ঞান অধিকারিণী যুবতীর চিন্তেও একরূপ ভাবের উদয় হবে যে, এ যুবককে বিয়ে সংসারী হলে বিবিধ পাপ সৃষ্টি হবে, দুঃখ পাবো, লজ্জা পাবো এবং ঠকবো। মৃত্যুর পরও চারি অপায়ে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু অজ্ঞানী যুবক, যুবতীদের চিন্তে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের উদয় হয়। তবে স্বামী-স্ত্রী হবার পর তারা দুঃখের কথাগুলো জানতে পারবে। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ সবাইকে পরম সুখ নির্বাণ লাভের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আমিও তোমাদেরকে সেভাবে বুঝাতে চাচ্ছি। কিন্তু তোমরা তো বুঝতেছ না। অনেক চাকমারা নাকি বলে, বনভক্তের কথামত চললে আমরা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ সবই হারাণ। হ্যাঁ, বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সুখ নির্বাণ লাভ করতে হলে সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, জায়গা-জমি বাহ্যিক সম্পদ নয় নিজের অঙ্গ জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়। আচ্ছা, যেসব চাকমারা এখন স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি ত্যাগ করতে পারছে না; কিন্তু যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে তখন তাদের সে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি কি সন্তে নিয়ে যেতে পারবে? নিশ্চয় পারবে না। তাহলে তারা যে বলতেছে বনভক্তের কথামত চললে এসব হারাণ, এটা সঠিক হলো কোথায়? এমনিতেই তো একদিন হারাতে হবে। আমি তো কোন কোন স্বামী/স্ত্রীকে বিয়ে করার মাত্র দুই/তিন দিন পরেও মারা যেতে দেখেছি। বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-আচ্ছা, তোমরা যখন পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর তখন কি কোন রেজিষ্ট্রি (গ্যারান্টি কার্ড) করা থাকে যে স্বামী এতো....বৎসর আর স্ত্রী এতো....বৎসর বাঁচবে? থাকে না। স্বামীও যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে, স্ত্রীও যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। অনুরূপভাবে পুত্র-কন্যারাও যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। ধন-সম্পদও যে কোন মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক চাকমারা বলে বৌদ্ধধর্ম খারাপ। কারণ বৌদ্ধধর্মে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করা যায় না। হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খৃষ্ট ধর্মই ভালো। এসব ধর্ম আচরণে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করা যায় অনায়াসে। (ভক্তের একথা শেষ হতে না হতেই দায়ক-দায়িকাদের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়) চাকমাদের এগুলো হল মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্তধারণা মাত্র।

যাদের জ্ঞান সত্য উদয় হয় তাদের সুখ, আর যাদের অজ্ঞান, মিথ্যা উদয় হয় তাদের দুঃখ। কারণ অজ্ঞানী মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির ভালোকে মন্দ, এবং মন্দকে ভালো বলে মনে করে সর্বদা মন্দের দিকে চালিত হয়। ফলে দুঃখের

আর সীমা থাকে না। সংসারিক জীবন-যাপনে কোথাও সুখ নেই। স্বামী-স্ত্রীতে দুঃখ, পিতা-পুত্রে দুঃখ, মাতা-কন্যায় দুঃখ, ভাইয়ে-ভাইয়ে দুঃখ, ভগ্নি-ভগ্নিতে দুঃখ, পাড়া-প্রতিবেশীতে দুঃখ। কোথাও সুখের সন্ধান মিলে না। তোমরা তো সুখ চাও নয় কি? দুঃখ কেহই চাও না। তাই তোমাদেরকে জ্ঞান, সত্য উদয় করার কাজ করতে হবে। সেই কাজ কি রকম? মনচিন্ত থেকে ক্রমান্বয়ে লোভ, হিংসা, অজ্ঞান বের করে দিতে হবে। যদি তোমরা প্রকৃত সুখ পেতে চাও তাহলে চিন্তের মধ্যে লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতাবাবকে স্থান দেবে না, জমা করবে না। সর্ব ক্ষেত্রে অলোভ, অদ্বेष, অমোহ ভাবকে জাগরুক রেখে অবস্থান করবে। ইহাতে সুখ লাভ হয়ে থাকে।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-আজকের এ দেশনা কেন দিচ্ছি জ্ঞান? তোমাদেরকে জ্ঞান উদয় ও সত্য উদয় করে দিবার তাগিদে। তোমাদের চিন্তে জ্ঞান উদয় করে দেয়া এবং সত্য উদয় করে দেয়াই আমার লক্ষ্য। কারণ তোমাদের চিন্তে জ্ঞান উদয় ও সত্য উদয় হলে তোমাদের প্রত্যেকের সুখ লাভ হবে। সত্য জ্ঞান উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সুখ অর্জিত হয় না। এ' দেশনা দ্বারা তোমাদের অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে জ্ঞানের উদয় এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়ে সত্যের উদয় করে দিতে চেষ্টা করছি। তাই আমার সাথে বলো “এ' দেশনা দ্বারা আমাদের অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে জ্ঞান উদয় হোক, মিথ্যা দূরীভূত হয়ে সত্য উদয় হোক”। মনে রাখবে, চিন্তের মধ্যে জ্ঞান উদয় হলে অজ্ঞান থাকতে পারে না; সত্য উদয় হলে মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্যদিকে, অজ্ঞান উদয় হলে জ্ঞান থাকতে পারে না; মিথ্যা উদয় হলে সত্য থাকতে পারে না। তাই তোমরা যদি জ্ঞান সত্যের সহিত অবস্থান কর তোমাদের অজ্ঞান, মিথ্যা থাকতে পারবে না। তখন সুখ তোমাদের ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করবে। বনভন্তে বর্তমানে চাঁদাবাজি, সস্তাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত যুবকদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন-এরূপ অপকর্মে নিয়োজিত থেকে তোমরা দুঃখ, বিপদকে ডেকে আনবে না। তোমাদের দ্বারা সৃষ্ট সেই দুঃখ, বিপদে গবাই ভীষণ কষ্ট পাবে। কাজেই এখনো সময় আছে, সে অপকর্ম হতে নিজেকে সৎপথে ফেরায়ে আনো। নচেৎ আগামী দশ/বার বৎসরে মহা সর্বনাশ নেমে আসবে। আমি সেই ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। তখন সেটাকে আর রোধ করা ঠা ফেরানো সুকঠিন হবে। আমার দায়িত্বটুকু আমি বলে দিচ্ছি। কাজেই সাবধান। অন্যদিকে, এই সকল অপকর্মের ফলে তোমাদেরকে দিন দিন গরিবই হতে হবে। অধঃপতন, পরিহানির পথে সবেগে ধাবিত হবে। কিছুতেই উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি আসবে না। মৃত্যুর পরেও চারি অপায়ে পতিত হয়ে দুর্বিষহ দুঃখ, যাতনা ভোগ করতে হবে। তাই আমি সবাইকে বলছি, তোমরা যে কাজের মাধ্যমে সুখ শান্তি আসে সেই কাজ কর, যে কাজের মাধ্যমে উন্নতি,

শ্রীবৃদ্ধি, উর্ধ্বগতি লাভ হয় এবং জয়যুক্ত হওয়া যায় সেই কাজ কর। তোমাদেরকে যাতে ঠকতে না হয় সেই কাজই কর। তোমরা যদি ঠকে যাও, দুঃখ-কষ্ট পাও এবং তোমাদের যদি পরিহানি, অধঃপতন হয়, আমিও লজ্জিত হবো। আমার সাথে বলো “আমরা যদি ঠকে যাই, অধঃপতনে যাই তাহলে বনভন্তেও লজ্জা পাবে”। তোমাদের ঠকতে না দেয়া বনভন্তের লক্ষ্য। মনে রাখবে, কুশল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে ঠকতে হয় না, অধঃপতনে যেতে হয় না। অকুশল পাপকর্ম সম্পাদন করলে ঠকতে হয়, অধঃপতনে যেতে হয়। আমি একথা কয়েক বৎসর আগে থেকে বলে আসতেছি, কিন্তু তোমাদের তো এখনো পরিবর্তন আসেনি। আমি আবারো বলছি, বিলম্ব করো না, পরে পস্তাতে হবে। আর সেই সময় চেয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর থাকবে না।

তোমরা সকলে জ্ঞানী, পণ্ডিত হয়ে যাও। পাপ ত্যাগ করে পুণ্য সঞ্চয় কর। পুণ্য করলে পুরস্কার পাবে, আর পাপ করলে শাস্তি পাবে। অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে অধঃপতনে যাবে, ঠকবে। জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে উর্ধ্বগতি লাভ হবে এবং সর্ব দিকে জয়যুক্ত হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন—বেশী বললে সব কথা মনে রাখা যায় না। তাই তোমাদেরকে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, তোমরা কারোর অন্যায় সাধন করবে না। ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ কর। কোন জীব হিংসা করবে না, কারোর ক্ষতি করবে না, কারোর সাথে শত্রুতা আচরণ করবে না। এটাই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনে লৌকিক সুখ লাভের উপায়। আমার সাথে বলো—“আজ হতে আমরা আর কারোর সাথে শত্রুতা আচরণ করব না, কারোর অন্যায় সাধন করব না, উত্তমভাবে ধর্মাচরণ করব, কারোর ক্ষতি করব না, কোন জীব হিংসা করব না”। কি মনে থাকবে তো? হ্যাঁ ভন্তে, থাকবে। তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুখ লাভ হবে, উন্নতি হবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে। তোমাদের ইহকালও সুখ হোক, পরকালও সুখ হোক—এ বলে শেষ করলাম।

সাধু, সাধু, সাধু।

লৌকিক সুখের মধ্যে সুখও থাকে দুঃখও থাকে

এক সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহুঁবির (বনভন্তে) দেশনালয়ে অনুষ্ঠিতব্য দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাবৃন্দের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-জগতে সুখ ও দুঃখ এই দু'টি ধর্ম বিদ্যমান। তাই মনুষ্য জীবনে সুখও লাভ হয় এবং দুঃখও পেতে হয়। প্রশ্ন আসতে পারে কেন সুখ-দুখ লাভ হয়? কর্মের তারতম্য অনুসারে। সত্ত্বগণ যে কর্ম সম্পাদন করে সেই কর্মের মাধ্যমে পাপও হয়, পুণ্যও হয়ে থাকে। পুণ্যজনক কর্মের দ্বারা সুখ লাভ হয় আর পাপজনক কর্মের দ্বারা দুঃখ পেতে হয়। বলা যায়, সত্ত্বগণের কর্ম অনুযায়ী তাদের পাপও হচ্ছে, পুণ্যও হচ্ছে; সুখও হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। কি কর্ম সম্পাদন করলে পাপ হচ্ছে, কি কর্ম সম্পাদন করলে পুণ্য হচ্ছে, কি কর্ম সম্পাদন করলে সুখ হচ্ছে, কি কর্ম সম্পাদন করলে দুঃখ হচ্ছে সেই সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান থাকতে হবে। তা না হলে পুণ্য ও সুখজনক কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে হয়ত বা পাপ ও দুঃখজনক কর্ম সম্পাদন করে ফেলবে। তখন পুণ্য, সুখ প্রত্যাশী হয়েও পাপ, দুঃখকে বরণ করে নিতে হবে। আজকের এই দানানুষ্ঠানটি পুণ্য, সুখ লাভের জন্য নয় কি? অবশ্যই তা। এভাবে দান, শীল, ভাবনাদি কুশলকর্মের দ্বারা তোমাদেরকে পুণ্য ও সুখ অর্জন করে নিতে হবে। মনে রাখবে, কুশলকর্মের ফলে অনির্বাণকাল পর্যন্ত জন্মে জন্মে রাজকূলে, ধনীকূলে জন্মগ্রহণ করতঃ বিপুল সুখের অধিকারী হওয়া যায়। মহা উপাসিকা বিশাখাও ত্রিরত্নের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার বলে স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করেছিল। বুদ্ধের শাসনে অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্না বিশাখা নয় কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীর পূর্বরাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসম্মখে দান করেন। প্রত্যহ আড়াই হাজার ভিক্ষুকে ভিক্ষান্ন দান করতেন। বিকালে বিহারে গিয়ে পঞ্চ ভৈষজ্য দান করা সহ অপরিসীম পুণ্যার্জন করতঃ মৃত্যুর পর পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হন। সেখানে সাতবার জন্মগ্রহণ করার পর নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। বিশাখার পূর্ব কাহিনীগুলো পড়লে দেখা যায়, তিনি জন্মে জন্মে ধনীকূলে, রাজকূলে উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ঘরেই জন্মগ্রহণ করতেন, তা না হলে দেবলোকে উৎপন্ন হতেন। কখনো সাধারণ, নীচ, হীনকূলে জন্মগ্রহণ করেননি। ধনীকূল, রাজকূলে জন্মগ্রহণ করে প্রভূত দানাদি কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকতেন। তাই কোন জন্মে তাকে গরিবকূলে জন্মগ্রহণ করতঃ অভাবের দুঃখ পেতে হয়নি। এটাকেই বলে লৌকিক সুখ। কাজেই তোমরাও দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করতেই থাক। সেই পুণ্যের প্রভাবে মৃত্যুর পর জন্মে জন্মে ধনীকূলে, রাজকূলে জন্মগ্রহণ অথবা স্বর্গে উৎপন্ন হওতঃ সুখের অধিকারী হতে পারবে। বর্তমানের এই গরিব, সংখ্যালঘু,

অমর্যাদাশীল কুলে জন্মগ্রহণ করার দুঃখ হতে মুক্তি (ত্যাগ) পাবে। আমি দেখছি যে, বর্তমানে তোমাদেরকে কতো প্রকার দুঃখ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনাই ভোগ করতে হচ্ছে। মৃত্যুর পর ধনীকুলে, রাজকুলে কিংবা স্বর্গে উৎপন্ন হলে আর এসব দুঃখ ভোগ করতে হবে না। বর্তমান অবস্থার চেয়ে অনেক উন্নততর, শ্রেয়তর জীবন-যাপন করতঃ লৌকিক সুখের অধিকারী হতে পারবে। বর্তমানের এই জীবন হতে সেই জীবন বহু উৎকৃষ্ট হবে নয় কি? হ্যাঁ ভক্তে, অবশ্যই হবে। তাই যদি চাও, দানাদি কুশলকর্মে নিয়োজিত থাক। অকুশলকর্ম করবে না। তাহলে অবশ্যই সেই লৌকিক সুখের অধিকারী হবে। বর্তমানে তোমাদের তো সেই লৌকিক সুখটুকুও নেই।

সুখ দুই প্রকার। যথা-লৌকিক সুখ ও লোকোত্তর সুখ। জন্মে জন্মে ধনীকুলে, রাজকুলে কিংবা স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করতঃ যে পঞ্চকামগুণ সুখ করা হয় তা' লৌকিক সুখ। লৌকিক সুখের মধ্যে সুখও থাকে, দুঃখও থাকে। লৌকিক কুশলের অবলম্বনে উৎপন্ন সুখকে সুখের বন্ধন এবং দুঃখকে দুঃখের বন্ধন হিসাবে দেখে, সেই সুখ-দুঃখ উভয় বন্ধন থেকে মুক্ত অবস্থাকে লোকোত্তর সুখ বলা হয়। যারা লৌকিক সুখকে সুখ বলে দেখে, জানে তারা লৌকিক সুখের প্রত্যাশী হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে ধনীকুলে, রাজকুলে ও স্বর্গে গিয়ে লৌকিক সুখ প্রত্যক্ষ করে থাকে। যারা লোকোত্তর সুখকে সুখ বলে দেখে, জানে তারা লোকোত্তর সুখের প্রত্যাশী হয়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। এক কথায়, যারা লৌকিক সুখ প্রত্যাশী তাদের লক্ষ্য ধনীকুল, রাজকুলে কিংবা স্বর্গলোকের ভোগসুখ আর যারা লোকোত্তর সুখ প্রত্যাশী তাদের লক্ষ্য নির্বাণ। অন্যদিকে, যারা লৌকিক সুখও দেখেনি, লোকোত্তর সুখও দেখেনি তারাই নানাবিধ পাপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। ফলে মৃত্যুর পর তারা শিয়াল, কুকুর, পশু-পক্ষী কুলে তথা চারি অপায়ে পতিত হবে। চারি অপায় হতে উদ্ধার হয়ে গরিবকুলে, চণ্ডালকুলে, মেথরকুলে ইত্যাদি নীচ, হীন বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ বিবিধ দুঃখ যাতনা ভোগ করবে। অন্ন-বস্ত্রে, টাকা-পয়সায়, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ অভাব-অনটন চিরসার্থী হয়ে থাকবে তাদের সংসারে। তারা তখন সুখে থাকবে কি? কখনো না। কিন্তু বর্তমানে এসব পরিণতির কথা ভাবছে কি? মনে হচ্ছে, ভাবছে না। না ভাবলেও এ পরিণতি ভোগ করতে হবে। তোমরা যখন মনুষ্য জন্ম লাভ করেছ এটা বড়ো ভাগ্যর ব্যাপার। কাজেই এ সুযোগকে কাজে লাগাতে তোমরা লৌকিক ও লোকোত্তর সুখ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে সচেতন থাক। নিজের জ্ঞান অনুসারে তোমরা লৌকিক সুখ এবং লোকোত্তর সুখকে দেখে, জেনে তা' লাভের চেষ্টা কর। মনে রাখবে, যেই ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সুখের মধ্যে অন্ততঃ একটি সুখও না দেখে তার জীবন দুঃখময়। সে মৃত্যুর পর চারি অপায়ে পতিত

হবেই। কারণ সে প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, সুরাপান করা সহ অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে লজ্জাশীল ও ভয়দর্শী হতে পারে না। ফলে বিবিধ অকুশল পাপকর্ম সম্পাদন করতঃ নিজকে নিজে পাপের অতল গহ্বরে নিষ্ক্ষেপ করে থাকে।

তিনি আরো বলেন-যে আত্ম বিলাসী হয়ে সুখাকাঙ্ক্ষী জীবকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করে, সে নিজের সুখকে হরণ করছে বলে জানবে। যে আত্ম বিলাসী হয়ে সুখাকাঙ্ক্ষী জীবকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করে না, তার সুখ লাভ হয়। তাই তোমাদের যদি পরকালে সুখ লাভ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কোন প্রাণীর উপর ঢিল, দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করবে না। অন্যজনকেও সেইরূপ কাজে উৎসাহ, সহযোগীতা প্রদান করবে না। কখনো বলবে না যে, তুমি অমুক ব্যক্তি প্রহার করো, অমুকের জিনিসপত্রগুলো চুরি করো, অমুকের অনিষ্ট কর। নিজে যেমন খারাপ অকুশলকর্ম করবে না, তেমনি অন্যের দ্বারাও অকুশলকর্ম করাবে না। এমন কি অকুশলকর্মে উৎসাহ, সহযোগীতা এবং অনুমোদনও করবে না। অকুশলকর্মে উৎসাহ, প্রেরণা, অনুমোদন করলেও পাপ হয়। মনে রাখবে, তোমাদের উৎসাহ, প্রেরণা পেয়ে যেই ব্যক্তি অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে তারও পাপ হবে আর পরামর্শদাতা হিসাবে তোমাদেরও পাপ হবে। ধর, তোমার কথায় এক ব্যক্তি যদি কোন একজনকে বা কোন পশু হত্যাজনিত অকুশলকর্ম সম্পাদন করে তাহলে সেই ব্যক্তির যেমন প্রাণীহত্যাজনিত পাপ হবে তেমনি তোমারও প্রাণীহত্যাজনিত পাপ হবে। উপমা কথা, যে কোন আসামী বা খুনি আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, এ খুনটা তুমি নিজের ইচ্ছায় করেছ নাকি অপরের প্ররোচনায় করেছ? সে যদি বলে আমি নিজের ইচ্ছায় করেছি, তাহলে অন্য জনের কিছু হবে না। কিন্তু যদি বলে অমুক আমাকে খুন করতে বলেছে। তখন সে ব্যক্তিরও (দোষী প্রমাণিত হলে) শাস্তি হবে নয় কি? হ্যাঁ ভগ্নে, হবে। ঠিক তদ্রূপ তোমরা যদি অন্যজনকে দিয়ে অকুশলকর্ম কর, তাহলে সেই অকুশলের বিপাক তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। কাজেই তোমরা সে সমস্ত অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। চাকমা সমাজের মধ্যে আমি অনেক হিংসুক ব্যক্তি দেখেছি। একজনের যদি টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ থাকে, অন্যজনেরা সেটা সহ্য করতে পারে না। ফলে সেই ধনী ব্যক্তিকে চোর, ডাকাত বা দুষ্ট লোক লাগিয়ে দিয়ে অনিষ্টসাধন করে। আবার অনেকে একজনের বাড়িতে সুন্দরী কন্যা থাকলে তাকেও নানাভাবে ক্ষতি করে, ঝামেলায় ফেলাতে চায়। দুষ্টলোক লাগিয়ে দিয়ে কখনো পিতা-মাতাকে, কখনো কন্যাকে উত্যক্ত করে অথবা ভীতি প্রদর্শন করতঃ মানসিক অশান্তিতে ফেলাতে চেষ্টা করে। কারোর ছেলে মেধাবী হলে আর নিজের ছেলে মেধাহীন

হলে ঐ মেধাবী ছেলেটাকে খারাপ কাজে আসক্ত করে দিতে নানা রকম কলা-কৌশল আঁটতে থাকে। বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বলেন-এরূপ খারাপ লোক চাকমা সমাজে আছে তো? হ্যাঁ ভন্তে, আছে। এগুলো মস্তবড় অন্যায় কাজ, খারাপ কাজ। এতে অনেক পাপ হয়। এটাকে বলে পরশ্রীকাতরতা। অর্থাৎ অপরের সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করা বা সহ্য করতে না পারা। এই পরশ্রীকাতরতার মহাপাপ দ্বারা ইহকাল-পরকাল উভয়কালে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তোমরা সকলে শুনতেছ তো? হ্যাঁ ভন্তে। তাই আমি বলছি, তোমরা কখনো এরূপ অন্যায় পাপজনক কাজ করবে না। যদি ইহজন্মে এই পরশ্রীকাতরতার কাজ কর, তাহলে পরজন্মে হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে বর্ণনাভীত দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য হবে।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-দণ্ডকে সকলে ভয় করে, জীবন সকলের প্রিয়; নিজেকে উপমাস্থলে উপস্থাপিত করে কাউকে হত্যা বা আঘাত করা উচিত নয়। যারা ইহকালে কোন প্রাণীকে দণ্ডের দ্বারা প্রহার, আঘাত ও হত্যা করে না, নিজের মত ভেবে সকলের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে, তাদের পরকালে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল অটুট থাকে; বিনা ক্রেশে, রোগহীনভাবে সুখে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হবে। আর যারা ইহকালে প্রাণীকে দণ্ডের দ্বারা প্রহার, আঘাত ও হত্যা করে, কোন প্রকার মৈত্রীভাব পোষণ করে না, তারা পরকালে অল্লায়ু, কুৎসিত চেহারা, সৌভাগ্যহীন, সুখহীন ও দুর্বল হয়ে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্বদা রোগ-শোকে ভূগতে ভূগতে দুর্বিষহ দুঃখে জীবন-যাপন করে। আমি গৃহী অবস্থায় দেখেছি, অনেকে (বিশেষ করে মেয়েরা) বিড়াল, কুকুর, গরু, ছাগলকে খুব বেশি পেটায়, এটা কিছ্র ঠিক নয়। কারণ বিড়াল, কুকুর হলেও এরাও তো প্রাণী, এদেরও তো প্রাণ আছে। নিজের গায়ে যদি সামান্যও আঘাত লাগে তাতে কতো দুঃখই না প্রাণে জাগে। আর নিজের গায়ে জোর আছে বলে দুর্বল বিড়াল, কুকুর, ছাগলকে (সজোরে) পেটালে তাদের বুঝি সুখ অনুভূত হবে? হবে না। বিড়াল, কুকুর, ছাগলেরাও সুখ চায়। দুঃখ কারোর কাম্য নয়। কেহই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে চায় না। বনভন্তে দায়ক দায়িকাদেরকে বলেন-বিড়াল, কুকুরকে পেটালে কি বিড়াল, কুকুর, ছাগলের সুখ অনুভব হবে কি? না ভন্তে, দুঃখই অনুভব হবে। কাজেই নিজেকে উপমাস্থলে উপস্থাপিত করে কোন প্রাণীকে প্রহার, আঘাত, হত্যা করা উচিত নয়। এতে পাপ হয়; যা পরকালের সুখকে হরণ করে দেয়। তাই যারা জ্ঞানী তারা সকল প্রাণীর প্রতি ক্ষমা-মৈত্রীভাব প্রদর্শন করতঃ কোন প্রাণীকে দণ্ড, অস্ত্র দ্বারা প্রহার, আঘাত করে দুঃখ প্রদান করবে না। এবং কোনক্রমেও হত্যার চিন্তা উৎপন্ন করবে না। আর অজ্ঞানীরা সর্বদা রাগ চিন্তে অবস্থান করতঃ প্রাণীদিগকে দণ্ড, অস্ত্র দ্বারা প্রহার, আঘাত, হত্যা করে মৃত্যুর

পব তীষণ দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার হয়। তোমরা সর্বদা মনে রাখবে, প্রত্যেক প্রাণী সুখাভিলাষী। সেই সুখাভিলাষী প্রাণীকে দণ্ড, অস্ত্র দ্বারা প্রহার, আঘাত, হত্যা করা পাপ। এবম্বিধ পাপকর্মের কিছুতেই পরকালে সুখ-শান্তি লাভ হয় না।

পরিশেষে তিনি বলেন-যেই ব্যক্তি লৌকিক সুখকে কামনা করে, সে লৌকিক কুশলকর্ম সম্পাদন করবে। অর্থাৎ দান-শীল-ভাবনায় রত থাকবে। লৌকিক কুশলের দ্বারা দেব-মনুষ্যের কাম্য সুখ উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেই ব্যক্তি লোকোত্তর সুখকে কামনা, সে লোকোত্তর কুশলকর্ম সম্পাদন করবে। লোকোত্তর কুশল কি? যে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাময় কুশলের দ্বারা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ এ সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় তা' লোকোত্তর কুশল। লোকোত্তর সুখের মধ্যে কোন দুঃখ মিশ্রিত নেই। এ সুখে কোন প্রকার পতন আশঙ্কা থাকে না। অর্থাৎ লোকোত্তর সুখ লাভ করার পর বা লোকোত্তর সুখে অবস্থান করতে করতে পুনঃ হঠাৎ দুঃখে পতিত হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু লৌকিক সুখের মধ্যে সেই আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই লোকোত্তর কুশল, লোকোত্তর সুখই উত্তম। আবার, সকলের পক্ষে লোকোত্তর সুখের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। লোকোত্তর সুখের স্তরে উন্নীত হতে না পারলেও লৌকিক সুখের সম্বল তৈরি কর। কারণ লৌকিক সুখও নেই, লোকোত্তর সুখও নেই এমন অবস্থায় পড়লে মহাদুঃখের সম্মুখীন হতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত নির্বাণ লাভ না হয়, জন্ম-মৃত্যু নিরোধ না হয়, ততদিন পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়। তোমরা দুঃখ প্রত্যাশা কর, নাকি সুখ প্রত্যাশা কর? ভস্তু, সুখ প্রত্যাশা করি। তাহলে তোমরা প্রত্যেকে কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, নির্বাণ সাক্ষাৎ করা যায় সেই চেষ্টা কর। “আমরা দুঃখহস্ত হয়েছি, দুঃখে অবতীর্ণ হয়েছি: এই দুঃখ হতে মুক্ত হবো, নির্বাণ সাক্ষাৎ করবো” এরূপ জ্ঞানযুক্ত দৃঢ় পরাক্রম থাকলে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। সেরূপ জ্ঞানযুক্ত পরাক্রম তোমাদের আছে কি? আমি তো দেখতেছি, নেই। তবু আমার সাথে বলো “জন্ম হলে দুঃখ, মৃত্যু হলে দুঃখ; চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান থাকলে দুঃখ। জন্ম-মৃত্যু নিরোধ হলে সুখ, অজ্ঞান ধ্বংস হলে সুখ। আমরা সেই দিকে অগ্রসর হবো”। তোমরা সর্বদা শীল পালন কর, পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। শীল এবং পুণ্যকর্মের দ্বারা লৌকিক লোকোত্তর সুখ লাভে সক্ষম হওয়া যায়। এই পুণ্যের ফলে ইহজন্মে নির্বাণ লাভ না হলে পরজন্মে ধনীকুলে, উচ্চবংশীয় কুলে, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ বিপুল সুখের অধিকারী হবে। সেটা লোকোত্তর সুখের মত না হলেও বর্তমান এই দুঃখাবস্থা হতে বহুগুণে সুখ হবে। যদি শীল পালনাদি পুণ্যকর্ম না কর, তাহলে জন্ম-জন্মান্তরে দীন, হীন, নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে বর্ণনাভীত দুঃখের ভাগী হতে হবে। তাই শীলাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনে রত

থাক। শীল পালন ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন বিহীনভাবে থাকবে না। শীল, পুণ্যকর্মের দ্বারা দুঃখকে জয় কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হয় সেই ভাগ্যবান

আজ ২৭শে নভেম্বর ২০০১ইং, ২৫৪৫ বুদ্ধাব্দ; রোজ বৃহস্পতিবার। রাজবন বিহারে অনুষ্ঠিতব্য অষ্টবিংশতিতম দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান। মূল বিহারের দক্ষিণদিকে খোলা মাঠে অবস্থিত স্থায়ী মঞ্চকে হরেক রকমের সাজ-সজ্জায় এবং ভগবান বুদ্ধ, পূজ্য বনভন্তের বাণী সম্বলিত ব্যানার, প্লেকার্ডে সুসজ্জিত করা হয়। সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর আগমনে বিরাট খোলা মাঠ মহাজনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। মাঠের কোথাও তিল ধারণের স্থানও খালী নেই। সামনে-পিছনে, ডানে-বামে সর্বত্রই পুণ্যার্থীর ভীড়। হাজার হাজার পুণ্যার্থীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন চাকমা রাজা বাহাদুর ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বাবু মণি স্বপন দেওয়ান, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু চিং কিউ রোয়াজা, প্রাক্তন মন্ত্রী বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা; জে, এস, এস-এর প্রতিনিধি বাবু উষাতন তালুকদার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এসব পুণ্যার্থীর গগণ প্রকম্পিত সাধুবাদ ধ্বনির মাধ্যমে বিশেষ শোভাযাত্রা সহকারে সপারিষদ ভিক্ষুসজ্জ নিয়ে অনুষ্ঠান মধ্যে আগমন করেন পূজ্যস্পদ বনভন্তে মহোদয়। যথা সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ, কঠিন চীবর দানোৎসর্গ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে সকল প্রাণীর হিতসুখ, মঙ্গলার্থে শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহুঁবির (বনভন্তে) মহোদয় ধর্মদেশনা প্রদান আরম্ভ করলেন। তিনি গম্ভীর তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন-অপরকে ধর্মদেশনা করা সহজ কথা নয়। লাভ সৎকার, খ্যাতি ও সুনাম লাভের জন্য ধর্মদেশনা করা যায় না। অপরকে নিন্দা এবং নিজকে প্রশংসা করে ধর্মদেশনা করা যায় না। তজ্জন্য অপরকে ধর্মদেশনা করা কঠিন, সুখকর নয়। চতুরার্য সত্যকে ব্যাখ্যা করাই হচ্ছে ধর্মদেশনা করা। ভগবান বুদ্ধের আবিষ্কৃত এ' সদ্ধর্মের মূলতত্ত্বই হল চতুরার্য সত্য। এই চতুরার্য সত্যকে জানতে, বুঝতে পারে মত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কি বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে? কই, আমি তো সেরূপ ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না। অন্যদিকে, আমার এ' চারি আর্যসত্য দেশনা শ্রবণ করে তোমরা যদি তা' বুঝতে না পার, তাহলে তোমাদেরও সুখ লাভ হবে না, আর আমার দেশনা প্রদান করাটুকুও সার্থক হবে না। তবুও তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করে আমার এ' দেশনা। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-হে ভিক্ষুগণ! আমার শ্রাবকগণের মধ্যে

শারীপুত্র চারি আর্যসত্যকে সরল ভাষায় বিস্তারিতভাবে দেশনা করতে সক্ষম। চারি আর্যসত্য যাবতীয় দুঃখ ধ্বংসকারক, এ' সত্য চিন্তের যাবতীয় দুঃখকে ধ্বংস করে দিয়ে সুখ আনয়ন করে; মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত করায় দেয়। তোমরা যদি চারি আর্যসত্য লাভ করতে পার, তাহলে চিন্তের মধ্যে সর্বদা সুখ বিরাজ করবে। এটা চারি আর্যসত্য লাভের প্রত্যক্ষ সুফল। এক সময় কয়েকজন উপাসক ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্য জেতবনে শারীপুত্র স্থবিরের নিকট উপস্থিত হলেন। শারীপুত্র স্থবির তাদেরকে সরল কথায় চারি আর্যসত্য ব্যাখ্যা করে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। তারা সকলে স্রোতাপত্তি ফলে উল্লীত হল। আনন্দিত হয়ে তারা চিন্তা করল শারীপুত্র স্থবিরের নিকট ধর্মদেশনা শ্রবণ করে আমরা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলাম; চল এবার ভগবান বুদ্ধের নিকট গিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করি। অনন্তর তারা ভগবান বুদ্ধের সমীপে গিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণে রত হল এবং ভগবান বুদ্ধের নিকট ধর্মদেশনা শ্রবণ করতঃ তাঁরা সকলে অর্হত্ব ফল লাভ করল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মদেশকের জ্ঞানানুসারে ধর্মদেশনা প্রদান করাও তারতম্য হয়ে থাকে। পূজ্য বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন- তারতম্য হয়ে থাকে, নয় কি? হ্যাঁ ভক্তে, হয়ে থাকে। আমি তো ভগবান বুদ্ধ কিংবা শারীপুত্র স্থবিরের মত করে দেশনা করতে পারব না। আমার জ্ঞানানুসারেই তোমাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে যাচ্ছি। তোমরা নিত্য-নৈমিত্তিক যে দুঃখসমূহ পাচ্ছ সেগুলো তোমাদিগকে দেখায়ে, বুঝায়ে দেয়াই হল আমার এ' ধর্মদেশনার মূল লক্ষ্য। যাতে তোমরা সেই দুঃখ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত হয়ে অবস্থান করতে পার। বর্তমানে তোমরা দুঃখ পাচ্ছ, অথচ সে দুঃখ সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারছ না; দুঃখকে উপলব্ধি করতে পারছ না, হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ না। সুখ ভ্রমে দুঃখের বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে চলছ মাত্র। তাই নিজকে যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারছ না। কিন্তু যারা এ' সকল দুঃখসমূহ বুঝতে পারে, দেখতে পায় তারা কিছুতেই আর নিজকে সে সব দুঃখের মধ্যে জড়ায়ে ফেলে না। উপরন্তু নিজকে যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত করতে তৎপর হওত দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত করে থাকে। চারি আর্যসত্যকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। অরহত্ব লাভ করা যায়। একদা একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেছিল-ভক্ত, অর্হৎ কাকে বলে? আমি বলেছিলাম, যার চিন্তে অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান নেই, ক্রেশ নেই; চিন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন, সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত এবং সুখেই অবস্থান (বিরাজ) করে সেরূপ চিন্তের অধিকারীকে অর্হৎ বলে। যারা অর্হৎ নয় তাদের চিন্তে অবিদ্যা রয়েছে, তৃষ্ণা রয়েছে, উপাদান রয়েছে, ক্রেশ রয়েছে। তারা সেই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশের অধীন হয়ে বিবিধ দুর্বিষহ

দুঃখ ভোগ করেই চলছে। কিছুতেই সুখের সন্ধান পাচ্ছে না। তোমরা একই কারণে দুঃখ নাশ করতে পারছ না; নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতছ। আমার সাথে বলো “অবিদ্যাই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, তৃষ্ণাই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, উপাদানেই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, ক্রেশই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে”। মনে রাখবে, চিন্তা থেকে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশ প্রহীন হয়ে গেলে তবেই সুখ শান্তি লাভ হয়।

অবিদ্যা কি? এ’ সংসারে সুখ নেই তবুও সুখের সত্ত্ব কল্পনা করা; এ’ দেহ আপন নয় তবুও আপন মনে করা-এটা হচ্ছে অবিদ্যা। সংক্ষিপ্ত কথায়, যেখানে বিদ্যা (জ্ঞান) নেই সেটা অবিদ্যা। তৃষ্ণা কি? পাবার ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছা। চাক্ষু কথায়-‘পেদুং হেদুং’। অর্থাৎ সব সময় ভোগাকাঙ্ক্ষী চিন্তে অবস্থান করা। তৃষ্ণা তিন প্রকার। যথা-কামতৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা। উপাদান কি? আসক্তি, অশেষণ, দৃঢ় গ্রহণ। উপাদান চার প্রকার। যথা-কাম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ উপাদান। কাম উপাদান কি রকম? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আপন শরীরে ধরবার প্রবৃত্তি। কামচিন্তে কোন পুরুষ যদি মহিলার হাত ধরে বা শরীর স্পর্শ করে তা’ কাম উপাদান। প্রেমিক-প্রেমিকারা যে প্রেমালিঙ্গন করে তাও কাম উপাদান। দৃষ্টি উপাদান কি রকম? মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান অর্থাৎ দান-শীল-ভাবনাদি কুশলকর্ম সম্পাদনে অবিশ্বাস করা। দান করলে দানের পুণ্যফল বা সুফল নেই; শীল পালন করলে শীল পালনের সুফল নেই; ভাবনা করলে ভাবনার সুফল নেই; পুণ্যকর্ম সম্পাদনে পুণ্য হয় না-এরূপ অবিশ্বাস বা বিপরীত বিশ্বাসকে দৃষ্টি উপাদান বলা হয়। এভাবে কর্ম-কর্মফল এবং পরকাল অস্বীকার করা হয়। তজ্জন্য দৃষ্টি উপাদান মহাপাপ। শীলব্রত উপাদান কি রকম? বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত অবৌদ্ধদের আচরিত কর্মের দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারব বলে বিশ্বাস করাকে শীলব্রত উপাদান বলে। গোব্রত, মহিস্ব্রত ইত্যাদি ব্রত, মানত, পূজাদির দ্বারা দুঃখ নাশ করতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নামই শীলব্রত উপাদান। আত্মবাদ উপাদান কি রকম? পঞ্চকঙ্কের প্রতি আমি বা আমিহু ও মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করার নাম আত্মবাদ উপাদান। ‘এ’ পঞ্চকঙ্ক আমার, এতে আমি অবস্থিত, এটি আমার’ এরূপ ভ্রান্তধারণার নিগড়ে আবদ্ধ থাকা বা আত্মবাদ করাকে আত্মবাদ উপাদান বলে। এই অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্রেশ থেকে মুক্ত থাকাই হল বৌদ্ধধর্ম। তজ্জন্য বৌদ্ধধর্ম সাধারণের বোধগম্য ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্ম জানতে, বুঝতে এবং আচরণ করতে হলে অসাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ বা সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম অনুধাবন করা যায় না।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-যাদের চিন্তে জ্ঞান থাকে তারা বৌদ্ধধর্ম

জানতে পারে, বুঝতে পারে। ফলে নিজকে অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়; কোন প্রকার পাপমূলক কর্ম সম্পাদন করে না। কিন্তু যাদের চিন্তে জ্ঞান থাকে না তারা বৌদ্ধধর্ম জানতে ও বুঝতে পারে না। তাই তারা নিজকে অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ থেকে বিরত রাখতে অক্ষম হয়। সর্বদা পাপমূলক কর্ম সম্পাদন করেই চলে। আবার অজ্ঞানী ব্যক্তির অন্যায় কর্ম সম্পাদন করলে সেটা অন্যায় বলে স্বীকার করে না, অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করলে সেটা অপরাধ বলে স্বীকার করে না। কারণ তির্যক প্রাণীর মত তাদেরও হিতাহিত জ্ঞান এবং ইষ্টানিষ্ট ভাবের অভাব থাকে। এক সময় জনৈক সেনা অফিসার আমার নিকট এসে বলল-ভক্ত, আমাকে একটু ধর্মোপদেশ দেন। আমি বললাম-‘এ’ পৃথিবীতে এমন অজ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছে, যারা স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ কতো অন্যায়, কতো অপরাধ, কতো ভুল, কতো গলদ করছে তার কোন অন্ত নেই। আর অজ্ঞানী ব্যক্তির তাদের সেই অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদগুলো জানতেও পারে না; বুঝতেও পারে না। আমার উপদেশ শুনে সেনা অফিসার বলে উঠল-‘হ্যাঁ ভক্ত, ঠিকই বলেছেন। আমরাও এখানে এসে স্বীয় অজ্ঞতার দরুন কতো অন্যায়, কতো অপরাধ, কতো ভুল, কতো গলদ করে চলছি তার কোন অন্ত নেই। একটু দোয়া করবেন যাতে অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ হতে নিজকে বিরত রাখতে সমর্থ হই’। এখন কথা হচ্ছে, তোমরা যারা এখানে (দানানুষ্ঠানে) এসেছ তারা জ্ঞানী নাকি অজ্ঞানী? তোমরা যদি জ্ঞানী হয়ে থাক তাহলে কোন দিন অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ করবে না। মনে রাখবে, অন্যায় না করলে সুখ, অপরাধ না করলে সুখ, ভুল না করলে সুখ, গলদ না করলে সুখ। আর অন্যায় করলে দুঃখ, অপরাধ করলে দুঃখ, ভুল করলে দুঃখ, গলদ করলে দুঃখ। অন্যদিকে, ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-মানুষ মাঝেই ভ্রমের অধীন। কেবলমাত্র সম্যক সমুদ্রগণ নির্ভুল। তাঁদের কোন প্রকার ভ্রম নেই; তারা সম্পূর্ণ ভ্রমের অতীত। অর্হৎগণের মাঝে মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল হতে পারে। শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ কোন কোন স্থানে অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র স্ববিরকে ভুল ধরতেন। তবে সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুলগুলো অপরাধ বলে গণ্য হয় না। তোমরা চিন্তের মধ্যে জ্ঞান, সত্য উদয় করতে চেষ্টা কর। চিন্তের মধ্যে জ্ঞান, সত্য উদয় হলে অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ থাকতে পারে না। যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হয় সেই ভাগ্যবান, সুখী বলে জানবে। অন্যদিকে, চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, মিথ্যাভাব উদয় হলে দুঃখের আর সীমা থাকে না। চাক্‌মা কথায় যাকে “কুণ্ডের মিদে ন’ হয়ে দুগ” বলা হয়। তোমাদেরকে একথা মনে রাখতে হবে যে, চিন্তের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হলে সুখ, আর অজ্ঞান, মিথ্যাভাব উদয় হলে দুঃখ। এখন তোমরাই নিজের চিন্তকে পরীক্ষা করে দেখো;

জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হচ্ছে নাকি, মিথ্যাভাব উদয় হচ্ছে? যদি জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হয় তাহলে তোমাদের জন্য সুখ বয়ে আসবে। আর যদি অজ্ঞান, মিথ্যাভাব উদয় হয় তাহলে তোমাদের জীবনে নেমে আসবে দুর্বিষহ দুঃখ।

স্বাধীন এবং অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারলে তবেই প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে। অন্যথায় প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে না। তোমরা প্রকৃত সুখ চাও কি? দায়ক-দায়িকাবৃন্দ বলে উঠল-হ্যাঁ ভগ্নে, প্রকৃত সুখ চাই। তাহলে তোমরা স্বাধীন এবং অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে সচেষ্ট থাক। কি রকম স্বাধীন? ধর, বর্তমানে তোমাদের সকল প্রকার কাম্যসুখ ভোগের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোন প্রকার অভাব-অনটন, দুঃখ নেই। সুখ শান্তির মধ্যে সংসারিক জীবন-যাপন করেই চলছ। সেটা হল সুখের বন্ধন। আর যদি এমন অবস্থা হয় যে, ঘোরতর দুঃখপূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে নানা অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করতেছ। সেটা হল দুঃখের বন্ধন। সেই রকম সুখ-দুঃখের উভয় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই স্বাধীন। কিন্তু তোমরা তো সুখের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে পারছ না; দুঃখের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে পারছ না। আবার সুখ-দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা সুখ-দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অসাধারণ জ্ঞান কি রকম? যেই জ্ঞানের দ্বারা কামলোক, রূপলোক, অরূপলোকের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি, তৃষ্ণা থাকে না; তা অসাধারণ জ্ঞান। এই অসাধারণ জ্ঞান লাভ করতে পারলে তবেই নির্বাণ পরম সুখ উপলব্ধি হয়। বৌদ্ধধর্মের মতে, নির্বাণ ব্যতীত সবই দুঃখ। বর্তমানে তোমরা যে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি নিয়ে সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছ তা সবই দুঃখ এবং মিথ্যা। নির্বাণ সুখ প্রত্যাশীদের জন্য স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ নির্বাণ সুখের নিকট স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ সবই দুঃখ। স্বামী-স্ত্রী মিথ্যা, পুত্র-কন্যা মিথ্যা, আত্মীয়-স্বজন মিথ্যা, ঘর-বাড়ি মিথ্যা, জায়গা-জমি মিথ্যা, ধন-সম্পদ সবই মিথ্যা। নির্বাণ প্রত্যাশীদেরকে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ সবই ত্যাগ করতে হবে। এমন কি অঙ্গ-জীবনও ত্যাগ করতে হবে। ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ তাঁর শ্রাবক সঙ্ঘ স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য-ধন প্রভৃৎ ভোগৈশ্বর্য ত্যাগ করে নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমি ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ তাঁর শ্রাবকগণের সেই অপরিসীম ত্যাগবলকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে জীবন অঙ্গ ত্যাগ করতে প্রত্যাশী হয়েছি। তার ফলে বর্তমানের এ' পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি। কিন্তু তোমরা তো আমার মত জীবন-অঙ্গ ত্যাগ করতে পারবে না। এ' প্রেক্ষিতে আমি

তোমাদেরকে কিভাবে নির্বাণের উপদেশ দেবো?

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-জীব মাত্রে মরণই ধ্রুব; জীবন অধ্রুব। যারা জন্মগ্রহণ করেছে বা জীবিত আছে তারা সবাই একদিন মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেহ নিষ্কৃতি পায় না। বনভন্তে সামনে উপবিষ্ট কয়েকজন দায়ক-দায়িকার দিকে আঙ্গুল দেখায়ে দিয়ে বলেন, বর্তমানে জীবিত আছ বলে তোমাদের একে অপরের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ তো! মৃত্যুবরণ করার পর কি আর কারোর সাথে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হবে কি? হবে না। কথাবার্তা, আলাপ-সালাপ করতে পারবে কি? পারবে না। কাজেই জীবন কখনো প্রকৃত সত্য নয়। জীবনকে নিয়ে মায়া-মমতা, আশা আকাঙ্ক্ষা করাটাও অনর্থক। এভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হলে বা মৃত্যু চিন্তা করলে নিজকে অনেক পাপকর্ম হতে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়। আবার, মৃত্যু চিন্তা দ্বারা যখন প্রতিভাত হয় যে, এ জীবন নশ্বর; প্রতি পলে পলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে; তখন অপরের অহিত, অমঙ্গল ও কলহ-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি সব কিছুই অবসান ঘটে। অনিত্য এ' সংসারে কেহ চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে না। এবং সবাই কিছু না কিছু দুঃখের মধ্যে রয়েছে। কাজেই পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্ষমা-মৈত্রীভাব বজায় রেখে অবস্থান করবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে; থাকাই স্বাভাবিক। সেই ভুল-ত্রুটিতে মৈত্রী গুণে ক্ষমা করা উচিত। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। ক্ষমার দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি পায়। কোন প্রকার শত্রুতা বাড়ে না; শত্রুতার অবসান হয়। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব কি জান? বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব হল-কোন জীবকে হিংসা না করা, কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ না করা, উত্তমভাবে ধর্মাচরণ করা, কারোর ক্ষতিসাধন না করা এবং কারোর প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ না করা। বৌদ্ধধর্মের এই নিয়ম মেনে চললে ইহকাল পরকালে পরম সুখ লাভ হয়। পূজ্য বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব কি? দায়ক-দায়িকাবৃন্দ একবাক্যে বলে উঠল-'কোন জীবকে হিংসা না করা, কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ না করা, উত্তমভাবে ধর্মাচরণ করা, কারোর ক্ষতিসাধন না করা এবং কারোর প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ না করা'। বনভন্তে-হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমরা সেইভাবে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে পারলে তোমাদের ইহকাল পরকাল পরম সুখের হবে। অন্যথায় দুষ্ট ভোগ করতে হবে জানবে। আজকে তোমরা কঠিন চীবর দান করেছে। এ' দানকার্য কিভাবে সম্পাদন করতে হয় জান? দান কার্য সম্পাদনে আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা করতে নেই। আত্মপ্রশংসা ও অপরকে নিন্দা করে দান করলে যথায় ফল লাভ হয় না। বিশ্বের সকল প্রাণীর হিতসুখ, মঙ্গল কামনা করে দান কার্য সম্পাদন করা উচিত। তোমরা আমার সাথে বলো

“আজকে আমরা যে কঠিন চীবর দান করলাম, এ’ দানের ফলে বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল হোক, সকল প্রাণী সুখী হোক। সবাই সুখে-শান্তিতে অবস্থান করুক”। এভাবে দান করলে দানের ফল মহৎ হয়ে থাকে। আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তোমরা দান করবার সময় কখনো আত্মপ্রশংসা ও অপরকে নিন্দা করবে না। আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা করে দান দিলে পুণ্যের পরিবর্তে পাপ হয়ে থাকে। ভগবান আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা করে দান করতে বারণ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম কখনো আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা, তুচ্ছ করতে শিক্ষা দেয় না। এধর্ম সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ও সমান সুখ প্রত্যাশী হতে শিক্ষা দেয়। যারা আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা, তুচ্ছ করে তারা মূর্থ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনো আত্মপ্রশংসায় রত হয়ে অন্যকে নিন্দা, অবজ্ঞা, তুচ্ছ করে না। তোমরা সকলের প্রতি সমান মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়ালু হয়ে কুশলকর্ম সম্পাদন কর। এতে পুণ্য বৃদ্ধি পায়, ইহ-পরকালের জন্য সুখ-শান্তি লাভ সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা এখানে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে এসেছ; পাপকর্ম সম্পাদন করতে আসনি। কারণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে সুখ লাভ হয়; দুঃখ লাঘব হয়ে যায়। পাপকর্ম সম্পাদনে দুর্বিষহ দুঃখ পেতে হয়। সকলে সুখ প্রত্যাশী, দুঃখ কারোর কাম্য নয়। অন্যদিকে, আমার উদ্দেশ্যও হল তোমাদেরকে দুঃখে পতিত হতে না দেয়া; সুখ লাভের উপায়সমূহ নির্দেশ করে দেয়া। কাজেই তোমরা আমার কথা ধর, আমার কথামত চল, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমার কথামত চললে অবশ্যই সুখের ভাগী হবে। তোমরা সর্বদা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করবে। কখনো অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। কুশল ও জ্ঞানমূলক কর্ম সম্পাদনে তৎপর থাক। চিন্তের মধ্যে সব সময় ক্ষমা, মৈত্রীভাব সজাগরূক রাখবে। ক্ষমা, মৈত্রী দ্বারা সতত পুণ্য বৃদ্ধি পায়, সুখ লাভ হয় এবং শত্রুতা শূন্য হয়ে অবস্থান করা যায়। ইহকালে পরকালে পরম সুখ-শান্তি লাভ হয়ে থাকে। এই কঠিন চীবর দানের পুণ্য প্রভাবে যাতে তোমাদের সুখ-শান্তি, মঙ্গল হোক-এ’ আশীর্বাদ করছি।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা প্রত্যেকে ভুলপথ পরিহার করে ঠিক পথে চলো

অদ্য ৩০শে ডিসেম্বর ২০০১ সাল, রোজ রবিবার। আকাশ প্রদীপ পূজা সমাপনী উপলক্ষ্যে রাজবন বিহারের দেশনালায়ে আয়োজিত দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদানকালে পরম পূজ্য বনভক্তে বলেন-তোমরা পাপধর্ম বা পরধর্ম করবে না, সদ্ধর্মই সম্পাদন কর। পঞ্চাঙ্কক্ষে তৃষ্ণা করলে তা’

পাপাত্মা মার হয়ে যায়। সেই পাপাত্মা মার পরধর্ম সম্পাদন করে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান-এ' পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত হয়ে ধর্ম কর্ম করলে তা' পাপধর্ম, দুঃখধর্ম বা পরধর্ম বলে জানবে। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনাসক্ত হওত পঞ্চস্কন্ধকে ত্যাগ করে সদ্ধর্ম বা নির্বাণধর্ম করতে হয়। সাধারণ নর-নারী পাপধর্ম বা পরধর্ম আচরণে অভ্যস্ত। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ সদ্ধর্ম বা নির্বাণধর্ম আচরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিভাবে সদ্ধর্ম আচরণ করতে হয়? পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করে। অর্থাৎ রূপ ত্যাগ, বেদনা ত্যাগ, সংজ্ঞা ত্যাগ, সংস্কার ত্যাগ, বিজ্ঞান ত্যাগ; এই পঞ্চস্কন্ধ 'আমি নয়', 'আমার নয়', 'আমার আত্মা নয়' এভাবে পঞ্চস্কন্ধকে ত্যাগ করতঃ সদ্ধর্ম আচরণ করতে হয়। সদ্ধর্ম আচরণ করলে শীল পালন করা যায়; পুণ্য বা কুশলকর্ম সম্পাদন কোন প্রকার বেগ পেতে হয় না। ফলে পরম সুখের অধিকারী হওয়া যায়। অন্যদিকে পরধর্ম আচরণ করলে শীল পালন করা যায় না; পুণ্যকর্ম সম্পাদন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিদারুণ দুঃখ ভোগ করতে হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ। পরধর্ম শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সদ্ধর্ম শুনতে পাওয়া যায় না। নর-নারীদের চিন্তে লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদ্যমান থাকে বলে তারা পরধর্মই শুনে, সদ্ধর্ম শুনে না। আবার লোভ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করতঃ সদ্ধর্ম ভাষণকারীও নেই। সদ্ধর্মই সুখ, পরধর্ম দুঃখ। যাদের নিকট সদ্ধর্ম জ্ঞান ও সদ্ধর্ম থাকে তাদের ইহকালও সুখ, পরকালও সুখ। আর সদ্ধর্মহারা, জ্ঞানহারা হলে ইহকালও দুঃখ, পরকালও দুঃখ; দুঃখ ছাড়া কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। যারা সদ্ধর্মহারা, জ্ঞানহারা হয়ে অবস্থান করে তাদেরকে ইহকালেও বিবিধ দুঃখ পেতে হয়, পরকালেও নরকে পতিত হয়ে দুর্বিষহ দুঃখভোগ ছাড়া গতান্তর থাকে না। মনে রাখবে, যারা সদ্ধর্মহারা ও জ্ঞানহারা হয়ে থাকে, তাদের ইহকালও দুঃখ; পরকালও দুঃখ। এই কারণে বর্তমান নর-নারীগণ দুঃখ পাচ্ছে। তারা সদ্ধর্মহারা, জ্ঞানহারা হয়েই অবস্থান করছে। তোমরা যদি সদ্ধর্ম লাভ করতে পার, জ্ঞান লাভ করতে পার তাহলে নিজকে (পুরুষ হলে) ভাগ্যবান আর (মহিলা হলে) ভাগ্যবতী বলে জানবে। কারণ যাদের নিকট সদ্ধর্ম, জ্ঞান থাকে তারা কখনো অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদযুক্ত কর্ম সম্পাদন করে না। তোমাদের নিকট সদ্ধর্ম ও জ্ঞান থাকলে তোমরাও অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদ তথা কোন অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। অকুশলকর্ম সম্পাদন না করলে ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ হয়ে থাকে। অন্যদিকে যাদের নিকট সদ্ধর্ম ও জ্ঞান নেই; তারা কতো অন্যায়, কতো অপরাধ, কতো ভুল, কতো গলদ করে তার কোন অন্ত নেই। তজ্জন্য তাদের ইহকালও দুঃখময়, পরকালও দুঃখময় হয়ে থাকে।

তোমরা যদি অজ্ঞান হয়ে অবস্থান কর, স্বামী-স্ত্রী হয়ে সাংসারিক সুখভোগে

রত হও তাহলে মারের বশীভূত হয়ে থাকতে হবে। তখন মার তোমাদেরকে দিয়ে ইচ্ছামত পাপকার্য সম্পাদন করাবে। সত্ত্বদিগকে দুঃখে পতিত করা, ভুলপথে, বিপরীত পথে পরিচালিত করা মারের কাজ। আমি তো দেখতেছি, তোমরা সবাই মারের প্রদর্শিত ভুলপথে চালিত হচ্ছে। সে জন্য তোমাদের দুঃখভোগ ও অধোঃপতন সুনিশ্চিত হচ্ছে। মার তোমাদের মতন সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে অকুশল ও অমঙ্গল পথে নিয়ে যায়, পুণ্য এবং মঙ্গল পথে অন্তরায় ঘটায়। এভাবে মারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সত্ত্বগণ জন্মান্তর কালব্যাপী দুঃখভোগ করে থাকে। জগতে বুদ্ধের প্রদর্শিত পথও আছে, মারের প্রদর্শিত পথও আছে। অর্থাৎ জগতের সত্ত্বগণকে ভগবান বুদ্ধ যেমন পথ দেখায়ে দেন, তেমনি মারও পথ দেখায়ে দেয়। বুদ্ধের প্রদর্শিত পথ হল সুপথ, যথার্থপথ এবং সুখ লাভের পথ। অন্যদিকে, মারের প্রদর্শিত পথ হল কুপথ, ভুলপথ, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পথ। যারা জ্ঞানী তারা বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে চালিত হয়। তারা মারের বশানুগত হয় না। আর যারা অজ্ঞানী তারা মারের প্রদর্শিত পথে চালিত হয়ে থাকে; তারা মারের প্রদর্শিত পথকে সুখ মনে করে। মার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মারের আজ্ঞাবহ হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তির কখনো মারের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে চেনবার উপায় সম্বন্ধে বলেছেন-অজ্ঞানীরা দুর্কর্মকারী, দুর্বাক্য ভাষণকারী ও দুশ্চিন্তাকারী। জগতে যত প্রকার দুঃখ পেতে হয় তা' একমাত্র মূর্খতার দরুন। মূর্খরা অনর্থকারী, অহিতকারী, দুঃখ সৃষ্টিকারী, বিপদ আনয়নকারী। তারা দেশের ও দশের জন্য অমঙ্গল, বিপদ, দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে। কোন মানুষ তার পরিচিত ব্যক্তিকে দেখলে যেমন নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে মূর্খেরাও 'হে অমঙ্গল! তুমি আমাদের নিকট এসো', হে বিপদ! তুমি আমাদের নিকট এসো', 'হে দুঃখ! তুমি আমাদের নিকট এসো' বলে অমঙ্গল, বিপদ, দুঃখসমূহকে ডেকে ডেকে নিয়ে আসে। পূজ্য বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-আচ্ছা, সেভাবে যদি অমঙ্গল, বিপদ, দুঃখকে আহ্বান করা হয়; তবে অমঙ্গল, বিপদ, দুঃখগুলো আসবে নয় কি? হ্যাঁ ভন্তে, ডাকলে তো আসতেই হবে। মূর্খ ব্যক্তির এভাবেই অনন্ত দুঃখের সম্মুখীন হয়। কারণ তারা যে পথে চলে, যেটা করে সেটা অমঙ্গল, বিপদ, দুঃখকে ডেকে নিয়ে আনারই নামান্তর। তাদের সেইপথ সঠিক পথ নয়, ভুলপথ। তারা ভুলপথেই চালিত হয়। ভুলপথে গেলে কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। বর্তমানে তোমরা সত্ত্ব লারমার গ্রুপ, প্রসিতের গ্রুপ এবং আওয়ামী লীগ, বি এন পি হয়ে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে হিংসাহিংসি, রেষা-রেষি, মারামারি, কাটাকাটি করতেছ। এসব মূর্খতার দরুনই হচ্ছে। তোমরা যদি মূর্খ না হয়ে পণ্ডিত হতে পারতে তাহলে এগুলো হতো না। আমি তো

দেখছি, তোমরা মূর্খ বলে মার তোমাদেরকে সে সব দুঃখপূর্ণ, বিপদ, অমঙ্গল আনয়নকারী কর্মে নিয়োজিত রেখেছে। জ্ঞানের অভাবে তোমরাও সে সব কাজ হতে নিজকে বিরত রাখতে পারছ না। এটা স্মরণ রাখবে যে, তোমরা যদি অজ্ঞান হও, ভুলপথে চলো তাহলে তোমাদের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। আর যদি জ্ঞানী হও, ঠিকপথে চলো তাহলে তোমাদের সুখ লাভ সুনিশ্চিত। তাই বলছি, তোমরা প্রত্যেকে পণ্ডিত হও, ভুলপথ পরিহার করে ঠিকপথে চলো। এতে তোমাদের ইহ-পর উভয়কালেই পরম সুখ লাভ হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-পুরুষ হোক বা মহিলা হোক যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা কখনো অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদপূর্ণ কাজ করতে পারে না। অন্যদিকে যারা অজ্ঞানী, মূর্খ তারা সর্বদা অন্যায়, অপরাধ, ভুল, গলদপূর্ণ কাজ করতেই থাকে। আর তজ্জন্য তাদেরকে অনন্ত দুঃখের সাগরে পতিত হতে হয়। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বলেছেন-হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মূর্খ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বানাও, অসাধু ব্যক্তিকে সাধু বানাও। কিভাবে পণ্ডিত বানাতে হয় জান? বহুশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হলে তাকে পণ্ডিত বলা যায় না এবং জনসমক্ষে বাংলা, ইংরেজী তথা বিভিন্ন ভাষায় সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতে সক্ষম হলেও তাকে পণ্ডিত বলা যায় না। তাহলে কাকে পণ্ডিত বলে? যিনি সহনশীলতা, জীবের প্রতি দয়া, কুশলকার্যে নির্ভীক, ক্ষমা-মৈত্রী, নিজেকে সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখার গুণে গুণীমান তিনিই পণ্ডিত। আমার সাথে বলো “যিনি সহনশীলতা, জীবের প্রতি দয়া, কুশলকার্যে নির্ভীক, ক্ষমা-মৈত্রী এবং নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম তিনিই পণ্ডিত”। কাকে সাধু বলে? অনেকে লবণ দিয়ে ভাত খেলে তাকে সাধু বলে থাকে; আবার অনেকে মাছ-মাংস না খেলে নিরামিষ ভোজী হলে তাকে সাধু বলে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেবলমাত্র লবণ দিয়ে ভাত খেলে বা নিরামিষ ভোজী হলে তদ্বারা কেহ সাধু হতে পারে না। লবণ দিয়ে ভাত খেলেও অথবা নিরামিষ ভোজী হলেও কেহ যদি প্রাণীহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্য বলে, মাদকদ্রব্য সেবন করে; তাহলে সে কি সাধু হতে পারবে? পারবে না। তদুপরি লবণ দিয়ে ভাত খেলে বা নিরামিষ ভোজী হলে যে প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যলাপ, মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই শুধুমাত্র লবণ দিয়ে ভাত খেলে বা নিরামিষ ভোজী হলে, তদ্বারা সে সাধু হতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রাণীহত্যা না করলে সাধু, চুরি না করলে সাধু, ব্যভিচার না করলে সাধু, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যলাপ না করলে সাধু, মাদক দ্রব্য সেবন না করলে সাধু। মোটকথা যে ব্যক্তি পঞ্চশীল পালন করে সেই প্রকৃত সাধু। অন্যদিকে, যেই ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে সে অসাধু, যে চুরি করে সে অসাধু, যে ব্যভিচার করে সে

অসাধু, যে মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ করে সে অসাধু, যে মাদক দ্রব্য সেবন করে সে অসাধু। সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্বর্গে যায় আর অসাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে-‘সাধু মানুষ স্বর্গে যায়, অসাধু মানুষ নরকে পড়ে করে হায়! হায়!’ আমি আবারো বলছি, তোমরা অসাধু হবে না সাধু হয়ে যাও। আর উত্তম হতে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ হও। আমার সাথে বলো “আমরা উত্তম হতে উত্তম, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ হবো এবং আমরা উত্তমধর্ম শ্রবণ করব, শ্রেষ্ঠধর্ম শ্রবণ করব, লোকোত্তরধর্ম শ্রবণ করব; নীচধর্ম শ্রবণ করব না, হীনধর্ম শ্রবণ করব না, পরধর্ম শ্রবণ করব না”। উত্তমধর্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম শ্রবণ করলে নির্বাণ সুখ উপলব্ধি হয়।

তোমরা আজকে যে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেছ এটা কিসের জন্য হচ্ছে? উর্ধ্বগতি লাভের জন্য; নিম্নগতি প্রাপ্তির জন্য নয়। কেহ নিম্নগতি প্রত্যাশা করে না; সবাই চায় উর্ধ্বগতি লাভ করতে। আর তজ্জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদনের আয়োজন করা হয়। পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিম্নগতি বন্ধ হয়ে যায়, অধোগতি (নরক দুঃখ) বন্ধ হয়ে যায়। মনে রাখবে, নিম্নগতি প্রাপ্তির জন্য এবং অধোগতন বন্ধের জন্য এ’পুণ্যানুষ্ঠান। আমার সাথে বলো “আজকের এই পুণ্যকর্মের দ্বারা আমাদের নিম্নগতি এবং অধোগতন বন্ধ হয়ে যাক”। পুণ্যকর্মের দ্বারা নিম্নগতি ও অধোগতন রোধ হয়; সর্বদা উর্ধ্বগতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে করতে যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী সুখ লাভ হয়। আমার ধর্মদেশনা প্রদান করার আসল উদ্দেশ্য কি জান? তোমাদেরকে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় করে দেয়ার তাগিদে। আমার প্রদত্ত এ’ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তোমাদের যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হয়, স্থায়ী সুখ অর্জিত হয় তাহলে ধর্মদেশনা করাটা শতভাগ সার্থক হবে। কিন্তু তোমরা ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় করতে পারতেছ কি? কই সেরূপ কাউকে তো দেখছি না। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু বিহীনদেরকে আমি উলঙ্গের মতন দেখি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-আচ্ছা, উলঙ্গ ব্যক্তিদের দিকে তাকানো যায় কি? ভন্তে, তাকানো যায় না। বনভন্তে-উলঙ্গদের দেখতে খুবই বিশ্রী, অভদ্র, শিষ্টাচার বর্জিত দেখায় বলে কেহ কি তাদের দিকে তাকায়? না ভন্তে, তাদের দিকে কেহ তাকায় না। এবার বনভন্তে বলে উঠেন, যারা ধর্মজ্ঞান ধর্মচক্ষু বিহীন হয়ে অবস্থান করতেছে আমি তাদেরকে উলঙ্গ ব্যক্তিদের সহিত তুলনা করে থাকি। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু বিহীন অবস্থায় তারা সে সব অকুশলকর্ম (প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি) সম্পাদন করতেছে সেগুলো উলঙ্গ হয়ে থাকার নামান্তর। আমি তো দেখতেছি,

তোমরা প্রায় সবাই উলঙ্গ হয়ে অবস্থান করতেছ। এ' অবস্থায় তো আমার পক্ষে তোমাদের দিকে তাকানোও মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থায় কি করা যায়? উপায় একটাই আছে; তা হল তোমাদেরকে পোষাক পরিধান করানোর ব্যবস্থা করা। তাই আমার দায়িত্ব হল, সেই উলঙ্গ সদৃশ তোমাদেরকে পোষাক পরিধান করায়ে দেয়া। এ' পোষাক কি? ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করতে সাহায্য করা। আমার দেশনা শ্রবণ করতঃ তোমাদের যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হয়, তাহলে পোষাক পরিধান করেছে বলে জানবে। আর আমিও তোমাদেরকে পোষাক পরিধান করাতে সমর্থ হয়েছি বলতে পারবো। বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে বলেন-এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তোমরা আসলে পোষাক পরিধান করতে ইচ্ছুক কিনা? নাকি উলঙ্গ থাকতে ভালো লাগতেছে? যদি একান্তই বল যে, উলঙ্গ আছি তো ভালোই আছি; কেন পোষাক পরিধানের ঝামেলায় যাবো? আমরা পোষাক পরিধান করব না। এরূপ বললে কিন্তু আমার পক্ষে কিছুই করার থাকবে না। না ভন্তে, আমরা পোষাক পরিধান করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে আমাদের পোষাক নেই বলে উলঙ্গ আছি। আপনি আমাদেরকে পোষাক প্রদান করুন, আমরা সেগুলো পরিধান করব। বাচ্চা ছেলেদের মত করবে না তো? বাচ্চা ছেলেদেরকে নিশ্চয় দেখেছ; তাদের যখন ইচ্ছা হয় তখন মা-বাবার কাছ হতে চেয়ে নিয়ে পোষাক পরিধান করে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তা' খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। (বনভন্তে এ' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দায়ক-দায়িকাদের মাঝে সজোরে হাসির রোল পড়ে যায়) সে রকম হলে তো হবে না। ভন্তে, আশীর্বাদ করুন-যাতে বাচ্চা ছেলেদের মতো না করি। বর্তমানে তোমরা সে রকমই করতেছ; বিহারে এসে পঞ্চশীল পালনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হও, আর বাড়িতে গিয়ে একে একে সব শীল ভঙ্গ করে ফেল। কেমন সঠিক বলছি না? হ্যাঁ ভন্তে, ঠিকই বলছেন। এসব কেন হচ্ছে জান? তোমাদের এখনো জ্ঞানের দুর্বলতা রয়েছে, শ্রদ্ধার দুর্বলতা রয়েছে বলে। উপরন্তু ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ করতে পারনি বলে। তোমরা যেদিন জ্ঞান বলে বলীয়ান, শ্রদ্ধা বলে বলীয়ান হওতঃ ধর্মজ্ঞান ধর্মচক্ষু লাভ করতে সক্ষম হবে, সেদিন আর পঞ্চশীল ভঙ্গ করবে না; উলঙ্গ হয়ে থাকবে না; পোষাক পরিধান করবে এবং সে পোষাক আজীবন পর্যন্ত শরীরের মধ্যে শোভা পাবে। এবার বনভন্তে দায়ক দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-বাচ্চা ছেলেরা মায়ের কোলে পায়খানা, প্রস্রাব করে দেয় নয় কি? দায়ক দায়িকাবৃন্দ-হ্যাঁ, ভন্তে। বনভন্তে-আচ্চা, সেই বাচ্চা ছেলে যখন বড় হয় তখন কি আর মায়ের কোলে পায়খানা, প্রস্রাব করে দেয়? না ভন্তে, দেয় না। এবার বনভন্তে বলেন, তার কারণ কি জান? বাচ্চা ছেলেরা বুঝে না বলে মায়ের কোলে পায়খানা, প্রস্রাব করে দেয়; কিন্তু বড় হলে তারা কোনটা করণীয়, কোনটা অকরণীয় এবং

ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, লজ্জা শরম সম্বন্ধে বুঝতে পারে। বর্তমানে তোমরাও সেই বাচ্চা ছেলের মত না বুঝে অকুশলকর্ম সম্পাদন করতেছ। প্রাণীহত্যা, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাসী-মাস্তানী-চাঁদাবাজি-ছিনতাই, ব্যভিচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ, মদ-গাঁজা-হেরোইন সেবন করা সহ কতো প্রকার যে অকুশল পাপমূলক কর্ম সম্পাদন করতেছ তার কোন নেই। এতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-শান্তি, শৃঙ্খলাবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সর্বদা ঝগড়া-কলহ, মারামারি-কাটাকাটি, খুনাখুনি, অপরাধ প্রবণতা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় বেড়েই চলছে। পরিণামে বর্ণনাভীত দুঃখ, অশান্তি, অরাজকতা নেমে আসতেছে। তাই আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলছি, তোমরা অতি সহসা পোষাক পরিধান করতঃ যাবতীয় অকুশলকর্ম হতে নিজকে বিরত রাখতে উদ্যোগী হও। সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষভাব মুছে ফেলে চিন্তের মধ্যে ক্ষমা-মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠা কর। সকলের প্রতি ভাই ভাই আচরণ করবে, কাউকে শত্রুর চক্ষে দেখবে না। চিন্তকে ক্ষমা-মৈত্রীতে পরিপূর্ণ রাখতে সক্ষম হলে ইহ-পরকাল সুখ লাভ হয়। চিন্ত সব সময় কুশলে দিকে ধাবিত হয়। নিজকে সম্যকপথে নিয়োজিত রাখা সম্ভব হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা আর অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না, কুশলকর্মই সম্পাদন কর। কুশলকর্ম সম্পাদনের জন্য সদা তৎপর হয়ে অবস্থান কর। মনে রাখবে, কুশলকর্ম সম্পাদনে কোন প্রকার অবহেলা, অগ্রাহ্য করবে না। তোমরা যতই কুশলকর্ম সম্পাদন করবে, তোমাদের ততই সুখ, শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হবে। আমি তো দেখতেছি, তোমরা অনেক অকুশলকর্ম অতীতেও করেছ এবং এখনো করছ। তার তুলনায় অনেক কম পরিমাণে তোমাদের দ্বারা কুশলকর্ম সম্পাদন হচ্ছে। তোমরা অনেক পাপ সঞ্চয় করে ফেলেছ; কিন্তু পুণ্য সঞ্চয়ের স্থান প্রায়ই খালী রেখেছ। কাজেই আর অবহেলা নয়; সত্বর পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হয়ে পড়। নতুবা আগামীতে অনেক অনেক বেশি দুঃখ, কষ্টের শিকার হবে।

তখন আর কিছুই করার থাকবে না; এখনো সময় আছে, দিবা-রাত্রি পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর; যাতে কোন প্রকার দুঃখ, কষ্টের শিকার হতে না হয়।

সাধু, সাধু, সাধু।

দুঃচরিত্র দুষ্টশীল খল ব্যক্তিদেরকে সত্যে বিচরণ করবে

অদ্য ৮ই জানুয়ারি ২০০২ ইং, ২৫শে পৌষ ১৪০৮ বাং, রোজ মঙ্গলবার।
 পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় বনভক্ত মহোদয়ের ৮৩তম শুভ জন্মদিন
 উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজবন বিহারে আয়োজিত পুণ্যানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সমবেত
 বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে পূজ্য বনভক্ত
 বলেন-যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকবে, সে ব্যক্তি আমার এ'দেশনা শ্রদ্ধার সহিত
 শ্রবণ করবে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে। আর যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান
 নেই, সেই ব্যক্তি এ'দেশনা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করবে না, হৃদয়ঙ্গমও করতে
 পারবে না। মহাজ্ঞানী শারীপুত্র স্থবির মহোদয়ের নিকট ছিল অসাধারণ জ্ঞান।
 যেমন-সত্ত্বগুণের চিত্তাচারে জ্ঞান; অর্থাৎ সমবেত সত্ত্বগুণের চিত্তে কিরূপ জ্ঞান
 বিদ্যমান রয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি যথাযথ জানেন। সত্ত্বগুণের অভিপ্রায়ে জ্ঞান;
 অর্থাৎ সমবেত সত্ত্বগুণের চিত্তে কি ইচ্ছা, রুচি, উদ্দেশ্য রয়েছে; সে সম্বন্ধে তিনি
 যথাযথ জানেন। সত্ত্বগুণের শ্রদ্ধাদির তীক্ষ্ণ-মৃদুতা সম্বন্ধে জ্ঞান; অর্থাৎ সমবেত
 সত্ত্বগুণের মধ্যে কার শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ, আর কার শ্রদ্ধা মৃদু সে সম্বন্ধে তিনি যথাযথ
 জানেন। সত্ত্বগুণের অনুশাসনে জ্ঞান; অর্থাৎ সমবেত সত্ত্বগুণ কিরূপ অনুশাসনে
 চলতে চায় বা চলতে সক্ষম সে সম্বন্ধে তিনি যথাযথ জানেন। সত্ত্বগুণের হীন-
 উৎকৃষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান; অর্থাৎ সমবেত সত্ত্বগুণের মধ্যে কার চিত্ত হীনতাপ্রাপ্ত এবং
 কার চিত্ত উৎকৃষ্ট স্তরে উপনীত হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি যথাযথ জানেন। সেই
 অসাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি শ্রোতাবৃন্দের বোধগম্য ধর্মদেশনা করতেন।
 ভগবান বুদ্ধও ধর্মদেশনা প্রদান করার পূর্বে শ্রোতাবৃন্দের নিকট অন্তর্দৃষ্টিভাব
 উদয় হয়েছে কিনা তা'জ্ঞাননেত্রে দর্শন করতেন। যদি দেখতেন যে,
 শ্রোতাবৃন্দের নিকট অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় হয়েছে তখন তিনি সেই অনুসারে
 ধর্মদেশনা প্রদান করতেন এবং শ্রোতাবৃন্দ সে দেশনা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম
 করতঃ মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। অন্তর্দৃষ্টিভাব শব্দের অর্থ হল নিজকে
 বুঝবার ক্ষমতা এবং নিজকে দর্শন। সাধারণতঃ দেখা যায়, নর-নারীগণ নিজের
 মনকে দেখে না এবং নিজের মনকে চেনে না; কেবলমাত্র অপরজনকে জানতে
 চায়, দেখতে (বুঝতে) চায়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিভাব অপরজনকে নয় নিজকেও নিজে
 দর্শন করাত্মে দেখে। অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় হলে নিজকে সম্যকভাবে দেখার এবং
 জানার জ্ঞান অর্জিত হয়। সেই অন্তর্দৃষ্টিভাব সম্পন্ন পুণ্ডালকে যখন ভগবান বুদ্ধ
 স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ভেদে পারমার্থিক ধর্মদেশনা প্রদান করতেন তখন সঙ্গে সঙ্গে
 তাঁরা অনাগামী, অরহত্ মার্গে উন্নীত হয়ে যেত। বর্তমানে আমার পক্ষে তো
 ভগবান বুদ্ধ এবং শারীপুত্র স্থবির মহোদয়গণের মত করে ধর্মদেশনা প্রদান করা

সম্ভব নয়। কারণ আমি তাঁদের মত মহাজ্ঞানী নই। আমার জ্ঞানশক্তি অনুসারে আমি তোমাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে থাকি। মনে রাখবে, ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তোমাদের মধ্যে যাদের চিন্তে জ্ঞান উদয় হবে তারা সুমার্গে চালিত হবে, আর যাদের চিন্তে জ্ঞান উদয় হবে না তারা কুমার্গে চালিত হবে। জ্ঞানীদের পক্ষে সুমার্গে চালিত হওয়া সম্ভব হলেও অজ্ঞানীদের পক্ষে সুমার্গে চালিত হওয়া সম্ভব নয়। তজ্জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির পরম সুখে অবস্থান করে। অন্যদিকে অজ্ঞানী ব্যক্তির দুর্বিষহ দুঃখে কালাতিপাত করতে থাকে।

বুদ্ধ বলেছেন—দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খল ব্যক্তিদেরকে সভয়ে বিচরণ করবে। দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খলেরা কাউকে গ্রাস করে ফেললে তার আর দুঃখের সীমা থাকে না। তাই কখনো তাদের সম্মুখে যাবে না; সর্বদা তাদের কাছ থেকে নিজেকে এড়িয়ে চলবে। দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খল লোকেরা সব সময় নিজেও কুপথে চালিত হয় এবং পরকেও সেই পথে চলতে উৎসাহ দেয়, চালনা করে। তাদেরকে ভালো কিছু উপদেশ দিলেও সেই উপদেশে কোন কাজ হয় না। হিতকর উপদেশ দিলে তারা কুপিত হয়; ভালো কাজ সম্পাদনে বারণ করে। এরা সর্বদোষের আকর বা ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। তাদের সাথে মেলা-মেশা, উঠা-বসা, আলাপ-আলোচনা, বন্ধুত্ব স্থাপন, সংসর্গ করলে তোমাদেরকেও দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খলে পরিণত হতে হবে এবং সর্বদা দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি, অমঙ্গল, উপদ্রব ভোগ করতে হবে। তাদের মত কুপথে চালিত হয়ে মৃত্যুর পর দুর্গতিপ্রাপ্ত হতে হবে। সুতরাং দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খল লোকদিগকে বহুদূর থেকে পরিহার করে চলবে। আমি তো দেখতেছি, বর্তমানে তোমরা দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খল লোকদিগকে অনুসরণ করতেছ, পোষণ করতেছ। তজ্জন্য এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক্রূপে চলতে থাকলে কিন্তু, তোমাদের ভবিষ্যতে মহাদুঃখ ও বিপদ অবশ্যম্ভাবী; এবং সে বিপদ আসতে খুব বেশি সময়ও লাগবে না। আগামী সাত/আট বৎসরের মধ্যে সেই দুঃখ, বিপদ তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। তাই আবারো সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা দুঃখরিত্র, দুঃশীল, খল লোকদের সংসর্গে যাবে না। তাদেরকে মহা অনিষ্টকারী হিসাবে জেনে বহুদূর হতে তাদের পরিহার করে চলবে।

তিনি আবারো বলেন—ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, যারা জ্ঞানী তারা আমার কর্তৃক প্রচারিত এ' সদ্ধর্ম গবেষণা কর। গবেষণার মাধ্যমে এ ধর্মের সার সত্যটুকু প্রত্যক্ষ কর; এবং আমার কর্তৃক ভাষিত “নিক্কাং পরমং সুখং” তাও তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি কর। আসলে এটা কি রকম সুখ; প্রকৃত সুখ কিনা? এক্রূপে জ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা, যাচাই করতে সমর্থ হলে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সার ও সত্যের সাক্ষাৎ ঘটবে। এটাই হল বৌদ্ধধর্ম। গতি দুই প্রকার। যথা—(১)

সংসার গতি ও (২) নির্বাণ গতি। যোনিশ মনস্কার ও অযোনিশ মনস্কার ভেদে মনস্কার দুই প্রকার। যোনিশ মনস্কার হল নির্বাণ গতি আর অযোনিশ মনস্কার হল সংসার গতি। জ্ঞান সম্ভ্রযুক্তভাবে যে মনোযোগ তা' যোনিশ মনস্কার এবং অজ্ঞানের সহিত যে মনোযোগ তা' অযোনিশ মনস্কার। যোনিশ মনস্কারের দ্বারা চিন্তে অজ্ঞান অনুপ্রবেশ করতে পারে না, অজ্ঞান চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে, সর্বদা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং বৃদ্ধি পেতেই থাকে। যার ফলে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গস্থ-ফলস্থ লাভ হয়। তজ্জনা যোনিশ মনস্কারকে নির্বাণ গতি বলা হয়। এই নির্বাণ গতি সুখ, নির্ভয়, নিরাপদ এবং স্বাধীন। অযোনিশ মনস্কারের দ্বারা মনচিন্তে সর্বদা অজ্ঞান অনুপ্রবেশ করতে থাকে, অজ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে চিন্তকে গ্রাস করে ফেলে। আর চিন্ত হতে জ্ঞান বিতাড়িত হয়ে যায়। এই অজ্ঞানপ্রসূত মনস্কারকে সংসার গতি বলা হয়। অযোনিশ মনস্কার বা সংসার গতি অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ, ভয়ঙ্কর, পরাধীন। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ হল, তোমরা সংসার গতি পরিহার করে নির্বাণ গতির দিকে চালিত হও। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান-এ' পঞ্চস্কন্ধকে সুখ মনে করতঃ তৃষ্ণার সহিত ধর্ম-কর্ম করলে সেটা সংসার গতির ধর্ম। এটি পাপধর্ম। এই পাপধর্ম সম্পাদন করে করে তোমরা বিবিধ দুঃখ পাচ্ছ। সুখ, স্বাধীন, নিরাপদ অবস্থায় অবস্থান করতে পারছ না। পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করতঃ তৃষ্ণা ক্ষয় সাধন করতে যে ধর্ম করা হয় তা' সেটা নির্বাণ গতির ধর্ম। এটি নির্বাণ ধর্ম। এই নির্বাণ ধর্মের দ্বারা যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়। তাই ধর্মকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-(১) পাপধর্ম ও (২) নির্বাণ ধর্ম।

সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভগবান বুদ্ধ উপককে বলেছিলেন-

আছে যত পাপধর্ম, করিয়াছি জয়;

তাই উপক তোমাকে দিতেছি জিন পরিচয়।

অর্থাৎ আমি সমস্ত আসব ক্ষয় সাধন করতঃ যাবতীয় পাপধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে ফেলেছি; মাদৃশ ব্যক্তিকে জিন বলা হয়। তাই তোমাকে আমি জিন বলে পরিচয় দিতেছি। ভগবান বুদ্ধ এইভাবে নিজে সমস্ত পাপধর্ম পরিত্যাগ করে অপরজনকেও পাপধর্ম পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। বর্তমানে আমিও তোমাদেরকে তাই বলছি, তোমরা যাবতীয় পাপধর্মসমূহ পরিত্যাগ কর। কেবলমাত্র নির্বাণ ধর্ম আচরণ কর। এবার বনভন্তে বলেন-আচ্ছা, তোমরা আমার এ' কথাগুলো বুঝতে পারছ কি? নাকি গরুকে বুঝানোর মত হচ্ছে। উপমা কথা-ধর, তুমি তোমার পালিত গরুগুলোর পিঠে হাত বুলায়ে বুলায়ে বল যে 'তোমরা অপরের ক্ষেত্র নষ্ট করবে না কেমন? কেবলমাত্র ঘাসগুলো বেছে

বেছে খাবে; কিছুতেই ধানগাছ, ফসলি চারা খাবে না।' অন্যদিকে লোকজনকেও আশ্বস্ত করতে থাক যে, আমার গরুগুলো তোমাদের ক্ষেত্র নষ্ট করে দেবে না; আমি গরুগুলোকে বুঝিয়েছি। আচ্ছা, গরুগুলো কি সত্যিই তোমার কথা বুঝতে পারবে? আর অন্যজনেরাও কি তোমার কথায় আশ্বস্ত হবে? কোনটা হবে না। গরুগুলো ছেড়ে দিলেই যেমন অপরের ক্ষেত্র নষ্ট করে ফেলবে, তেমনি অন্যজনেরাও আশ্বস্ত হবে না। বরং তুমিই হাসির পাত্র হবে। এখন তোমাদেরও যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে আমার এ'কথাগুলো গরুর পিঠে হাত বুলায়ে বুলায়ে বুঝানোর মতই হচ্ছে। (পূজ্য বনভন্তের এ' উক্তিতে হাসির রোল পড়ে যায়) বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের দিকে প্রশ্ন করেন-তাই হচ্ছে, নয় কি? দায়ক-দায়িকারা বললেন-ভন্তে, আমরা যদি একেবারেই বুঝতে অক্ষম হই, তাহলে তা' হচ্ছে বৈকি। তোমরা প্রত্যেকে জ্ঞানী হও। জ্ঞানী হতে পারলে আমার এ'দেশনা বুঝতে পারবে। কিন্তু যারা অজ্ঞানী তারা কখনো আমার এ'দেশনা বুঝতে পারবে না। এমন কি সারা জীবন শুনলেও বুঝতে পারবে না। মনে রাখবে, যারা জ্ঞানী একমাত্র তারাই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে সক্ষম। অজ্ঞানীরা কিছুতেই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারবে না। জ্ঞানী ব্যক্তির বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারে বলে তারা ইহ-পর উভয় কালে পরম সুখে অবস্থান করে। আর অজ্ঞানী ব্যক্তির বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারে না বলে ইহ-পর উভয় কালে দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হয়।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম বুঝতে সক্ষম এমন ব্যক্তি আছে কি? সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেরূপ কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখছি না। তাই মাঝে মাঝে ধর্মদেশনা প্রদান করতেও অনিচ্ছাভাব জন্মে। কারণ আমি বৌদ্ধধর্ম বুঝতে সক্ষম হয়েছি বলে সমস্ত অকুশল, অজ্ঞানমূলক কর্ম পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু তোমাদেরকে কিভাবে অকুশল, অজ্ঞানমূলক কর্ম সম্পাদনে বিরত রাখব? তোমরা তো বৌদ্ধধর্ম বুঝতে অক্ষম এবং অকুশল অজ্ঞানমূলক কর্ম পরিত্যাগ করতে পারছ না। এসব কিছু দেখার পরও যদি আমি তোমাদেরকে অজ্ঞান অকুশলমূলক কর্ম পরিত্যাগ করতে বলি, তাহলে তোমরা হয়ত বলে উঠবে- 'ভন্তে, আপনি ত্যাগ করলে করেন, আমরা ত্যাগ করব না। আপনি নির্বাণগামী হতে চান হোন, আমরা নির্বাণ যাবো না।' রাগামাটির অনেকেই নাকি বলে থাকে, বনভন্তের কথামত চললে তো আমাদেরকে সংসার ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই আমরা তাঁর কথামত চলতে পারব না। উনি যতটুকু ত্যাগধর্মের কথা বলেন আমাদের পক্ষে ততটুকু ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সত্যিই তোমাদেরকে বুঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি ত্যাগধর্মের কথা বলতেছি, অথচ তোমরা ভোগের পিছনে ঘুরতেছ। আমি বলতেছি পঞ্চশীল পালন কর, অথচ তোমরা পঞ্চশীল লঙ্ঘন করতেছ। আমি বলছি কোন প্রাণীকে টিল, দণ্ড, অস্ত্র দ্বারা বধ,

বন্ধন, প্রহার করবে না, অথচ তোমরা মারামারি কাটাকাটি সহ বিবিধ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। এবার বনভন্তে বলেন, তোমরা আমার কথামত না চললে চলতে পার, আমার কথা না শুনলেও না শুনতে পার তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই; ক্ষতি তোমাদেরই হবে। সর্বদা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এবং মৃত্যুর পর আবার যে মনুষ্য জন্ম লাভ হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। বর্তমান এ' মনুষ্য জন্ম লাভ করে তোমরা যদি নানাবিধ অকুশলকর্ম সম্পাদন কর এবং সেই অকুশলকর্ম সম্পাদনের জন্য মৃত্যুর পর তির্যককূলে জন্ম নিতে হয়, তাহলে সেটা কি সুখের হবে? কখনো হবে না। সুতরাং যাবতীয় অকুশলমূলক কর্মসমূহ পরিত্যাগ কর। সর্বদা পঞ্চশীল ধর্ম আচরণ ও কুশলকর্মে নিয়োজিত থাক। এতে ইহ-পর উভয়কালেই সুখ লাভ হবে।

তোমাদের আসল কাজ কি জান? কি ধর্ম আচরণ করলে দুঃখ পেতে না হয়, অধোগতি না হয়, নিরয়গামী হতে না হয় এবং পুনঃপুন জন্মধারণ করতে না হয়-সেই ধর্মসমূহ অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধান করার পর নিজকে সেই ধর্মে ব্যাপ্ত রাখা। চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জানলে বুঝলে দুঃখ পেতে হয় না; অধোগতি বন্ধ হয়; নিরয়গামী হতে হয় না এবং পুনঃপুন জন্মধারণ করার দুঃখটুকুও নিরুদ্ধ হয়ে যায়। স্মরণ রাখবে, অধোগতি হওয়া দুঃখজনক, নিরয়গামী হওয়া দুঃখজনক এবং পুনঃজন্ম গ্রহণ করা দুঃখজনক। সেই দুঃখাবস্থা থেকে উতরে যেতে হলে চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে দুঃখাবস্থাসমূহ অতিক্রম করা যায় না। আর বিবিধ দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হয়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-রাজা দুর্বল হলে রাজ্যে চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী, বিদ্রোহী শক্তিশালী হয়। আর রাজা শক্তিশালী হলে চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী-বিদ্রোহী দুর্বল হয়ে যায়। দুঃশীল ভিক্ষু শক্তিশালী হলে শীলবান ভিক্ষু দুর্বল হয়। আর শীলবান ভিক্ষু শক্তিশালী হলে দুঃশীল ভিক্ষু দুর্বল হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ সমাজেও দুঃশীল, অধার্মিক লোকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে সুশীল, ধার্মিক লোকেরা দুর্বল হয়। আর সুশীল, ধার্মিক লোকেরা শক্তিশালী হলে দুঃশীল, অধার্মিক লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি তো দেখতেছি, বর্তমান সময়ে দুঃশীল, অধার্মিক লোকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে আর শীলবান, ধার্মিক লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তজ্জন্য সমাজে সর্বত্রই মারামারি, কাটাকাটি, খুন, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাসী সহ নানা বিশৃঙ্খলা অরাজকতার জয় জয়কার চলছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে তো তোমরা সহসা অধোগতি, নিল্গামীর দিকে তলিয়ে যাবে; কখনো উদ্ধারগতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে না। বনভন্তের উদ্দেশ্য কি

জ্ঞান? তোমাদের সেই অধোগতি বন্ধ করে দিয়ে তোমাদেরকে উর্ধ্বগতি, সুগতির দিকে চালিত করা। মনে রাখবে, পাপকর্ম সম্পাদন করলে ঠকতে হয়; মূর্থতা আচরণ করলে অধঃপতন ঘটে। পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে ঠকতে হয় না, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধিই হয়; পণ্ডিত হয়ে অবস্থান করলে উর্ধ্বগতি লাভ সুনিশ্চিত হয়। তজ্জন্য তোমরা প্রত্যেকে অকুশল পরিত্যাগ করে কুশলধর্ম সম্পাদন কর, পণ্ডিত হয়ে অবস্থান কর। শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ধার্মিক হয়ে অবস্থান কর। তাহলে অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লাভ হবেই। আমার সাথে সাথে বলো “আমরা সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করব, পাপকর্ম সম্পাদন করব না। যাতে আমাদেরকে ঠকতে না হয়, অধঃপতনে পতিত হতে না হয়; তজ্জন্য আমরা পুণ্যকর্ম ও জ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব।”

পরিশেষে তিনি বলেন—বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে হলে তোমাদেরকে উচ্চমনা, উচ্চতর জ্ঞান এবং উচ্চতর সাধনা অনুশীলন করা চায়। নীচমনা, হীন জ্ঞান, নিম্নস্তরের সাধনা করলে মনচিন্তা দুঃখ পায়। আর সেই দুঃখময় মনচিন্তা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা সম্ভবপর নহে। তাই প্রত্যেকে উচ্চমনা, উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর সাধনা অনুশীলন কর। এতে মনচিন্তা সুখে স্নাত হয়ে থাকবে এবং বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা সহজ হবে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, পুণ্যের নিকট পাপ পরাভূত হয়। পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার। সুতরাং তোমরা কখনো পাপকর্ম সম্পাদন করবে না। কারণ পাপ করলে একদিকে যেমন পরাজিত হবে, অন্যদিকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। বরং পুণ্যকর্মই সম্পাদন কর। পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে একদিকে জয়যুক্ত হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি পুরস্কারও লাভ হয়। যাতে তোমাদের ইহ-পরকাল সুখের, শান্তির হয় তজ্জন্য সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত থাক।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞানের বল কুশলের বল থাকলে সুখ লাভ হয়

অদ্য ১লা বৈশাখ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, ১৪ই এপ্রিল ২০০২ ইং, রোজ রবিবার। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন, শুভ নববর্ষ। নববর্ষে বিশ্বের সকল প্রাণীর সুখ, শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনার কামনায় রাজবন বিহারে আয়োজিত সার্বজনীন মহামঙ্গল সূত্র শ্রবণ ও অন্যান্য দানানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যথাসময়ে সপরিষদ ভিক্ষুসঙ্ঘ নিয়ে পূজ্য বনভক্তে মঞ্চে আগমন করেন-সমবেত হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সাধুবাদ ধ্বনির মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ধর্মদেশনা প্রদানকালে পরম পূজ্য অরহত শ্রাবকবুদ্ধ বনভক্তে বলেন—তোমরা যদি মার আকৃষ্ট হয়ে অবস্থান কর তাহলে পাপকার্য সম্পাদনে

কোন প্রকার লজ্জা, ভয় অনুভব করবে না। নির্লজ্জ ও নির্ভয় চিত্তে পাপকার্য সম্পাদন করেই চলবে। অন্যদিকে মারমুক্ত হয়ে জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে পাপকার্য সম্পাদনে লজ্জা, ভয় অনুভব করবে। আর যখন তোমরা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করতঃ পাপকার্য সম্পাদন বন্ধ করবে। তখনই তোমরা প্রকৃত উপাসক-উপাসিকা বলে পরিচিত হবে। বুদ্ধ বলেছেন, যেই ব্যক্তি অকুশল পাপের প্রতি লজ্জাশীল তার নিকট পাপ থাকতে পারে না। এমন কি তার পক্ষে তৃষ্ণা ক্ষয় করাও সম্ভব। অকুশল পাপকর্মকে লজ্জা জ্ঞানে পরিহার করার মত মহাপুরুষ জগতে খুবই কম রয়েছে। তোমরা যত পাপকর্মের প্রতি লজ্জাশীল হবে ততই তোমাদের নিকট পাপ থাকতে পারবে না। আর যতই পাপকর্মের প্রতি অলজ্জী হবে ততই তোমাদের নিকট পাপ এসে জমা হতে থাকবে। যদি দেখ বা শুন যে অমুক ব্যক্তি খুব বেশি পাপকর্ম সম্পাদন করতেছে তাহলে জানবে সেই ব্যক্তি পাপকর্ম সম্পাদন করতে একটুও লজ্জা পায় না। ‘পাপকর্ম সম্পাদন করলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে, দুঃখ পেতে হবে’ এই ভেবে জ্ঞানী ব্যক্তির পাপকর্ম সম্পাদন করে না এবং পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল হয়ে অবস্থান করে। তাই বলছি, তোমরা পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জা ও ভয়শূন্য হবে না; সব সময় পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জা ও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করবে। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পার, ‘ভন্তে, আপনি কেন আমাদেরকে পাপকর্ম সম্পাদনে বারণ করতেছেন? তার উত্তরে আমি বলব-পাপকর্ম সম্পাদন করলে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে, দুঃখ পেতে হবে। অন্যদিকে পাপকর্ম পরিত্যাগ করলে তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে না; সসম্মানে থাকতে পারবে, সুখেই থাকতে পারবে। মনে রাখবে, পাপ পরিত্যাগেই সুখ, পাপ নিরোধেই সুখ, পাপ নিবৃত্তিতেই সুখ। বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে হলে কোন প্রকার পাপকর্ম সম্পাদন করতে পারবে না। সকল প্রকার পাপ বিরতিই সুখ।

তোমরা উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ কর, কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ করবে না। উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ করতঃ কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ না করলে তোমাদের সুখ লাভ হবেই। বুদ্ধ বলেছেন, ‘ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে; ধর্মচারী ব্যক্তি ইহলোকে-পরলোকে সুখে থাকেন।’ তাই আমিও বলছি, তোমরা কখনো অপরের অহিত কামনা করবে না। এমন কি অপর জনের দ্বারাও কারোর ক্ষতিসাধন করবে না। অর্থাৎ ‘তুমি অমুককে একরূপ ক্ষতি কর, একরূপ অনিষ্ট কর, তাকে প্রহার কর, মেরে ফেল’ বলেও কাউকে নির্দেশ প্রদান বা উৎসাহ যোগানো যাবে না। এবার বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন, অনেকেই একরূপে অপর জনের ক্ষতিসাধন করে, নয় কি? ই্যা ভন্তে, করে থাকে। সেভাবে অন্যজনের দ্বারা অপরের অনিষ্টসাধন করলেও মহাপাপ হয়। আমার সাথে বলা

“আমরা উত্তমভাবেই ধর্ম আচরণ করব, কারোর ক্ষতিসাধন করব না, কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ করব না এবং কারোর প্রতি শত্রুতা আচরণ করব না।” তোমরা সর্বদা পঞ্চাশীল পালন কর। পঞ্চাশীল পালন করলে ভোগ সম্পত্তি লাভ হয়, অর্জিত সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়, ধনী হতে পারে। আমি তো দেখতেছি, বর্তমানে তোমরা প্রায় সবাই গরিব। গরিব কেন হয় জান? পূর্বকৃত পাপের ফলে গরিব হয় আর পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে ধনী হয়। প্রশ্ন আসতে পারে, তোমরা এতো গরিব কেন? পূর্বজন্মে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করনি বলে গরিব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কাজেই বর্তমানে যদি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, তাহলে ভবিষ্যত জন্মে মহাধনী কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। তখন আর কোন প্রকার অভাব-অনটনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

পূজ্য বনভন্তে আরো বলেন-জ্ঞানের বল, কুশলের বল থাকলে সুখ লাভ হয়। এ দু’টি বল অর্জিত হলে কিছুতেই পরিহানি হয় না। ভগবান বুদ্ধও রাজ্য-ধন সহ প্রভূত ভোগ ঐশ্বর্য হয়ে জ্ঞানে ছেড়ে দিয়ে গৃহত্যাগ করার পর সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও কুশলই অনুসন্ধান করেছিলেন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও কুশল ব্যতীত তিনি অন্য কোন বিষয় অনুসন্ধান করেননি। অবশেষে গয়ার বোধিমূলে সেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও কুশল লাভ করেছিলেন। আর পরম সুখ নির্বাণ ধনে ধনী হওত জগতে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন তোমাদেরও প্রয়োজন জ্ঞান এবং কুশল অর্জন করা। তা না হলে কিছুতেই বর্তমান এই দুঃখাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। আমার সাথে বেলো “আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে না থেকে, জ্ঞানের আলোয় বেিরিয়ে আসবো; অকুশল পাপকার্য না করে, কুশলকার্য সম্পাদন করবো। আমরা সত্যধর্মে আত্মনিয়োগ করবো। এভাবে আমরা জয়যুক্ত হবো, সর্বদুঃখ হতে মুক্তি লাভ করবো”। সত্যধর্মে আত্মনিয়োগ করলে কি হয় জান? জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাদি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হওয়া যায়। অন্যদিকে অজ্ঞানের সহিত অবস্থান না করে জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে সুখ। মনে মনে অজ্ঞানতার বিষয় চিন্তা করলে দুঃখ পেতে হয়। তোমরা মনে মনে জ্ঞানতঃ বিষয় চিন্তা করবে, তাতে সুখ লাভ হবে। পূজ্য বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদেরকে প্রশ্ন করেন, মনে মনে কি বিষয় চিন্তা করলে সুখ লাভ হয়? ভন্তে মনে মনে জ্ঞানমূলক বিষয় চিন্তা করলে সুখ লাভ হয়। সেই জ্ঞানমূলক বিষয় কি? দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়-এ’সব বিষয়। মনে রাখবে, মনচিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে অবশ্যই সুখ লাভ হয়। আর মনচিন্তের মধ্যে অজ্ঞান থাকলে দুঃখভোগ ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে উর্ধ্বগতি লাভ হয়। কখনো পরিহানি হয় না। গৃহস্থদের সহসা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। আর্থিক দৈন্যতা দূরীভূত

হয়ে ধন-সম্পদ লাভ হওয়া সহ সকল প্রকার লৌকিক সুখ অর্জিত হয়ে থাকে। মৃত্যুর পরও উচ্চ হতে উচ্চতর, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। মনুষ্যকূলে উৎকৃষ্ট মনুষ্য সুখ, দেবকূলে উৎকৃষ্ট দিব্যসুখ লাভ হয়। তাই পুণ্যকর্ম ইহকাল-পরকাল উভয়কালেই সুখ প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে পাপকর্ম সম্পাদন করলে সর্বদা নিম্নগতি প্রাপ্ত হতে হয়। পরিহানি, অধঃপতন সুনিশ্চিত হয়ে থাকে; কিছুতেই উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হয় না। বরং ধনহানি, অর্থহানি, যশহানি, সুখহানি হয়। আর মৃত্যুর পর তির্যককুল, অসুরকুল, প্রেতকুল এবং ঘোরতর দুঃখপূর্ণ নরকে উৎপন্ন হওত বর্ণনাভীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। পূজ্য বনভন্তে বলেন, যে সমস্ত তির্যক প্রাণীরা তির্যককূলে জন্মগ্রহণ করতঃ বর্তমান দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতেছে তারাও একদিন তোমাদের মত মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করেছিল। (সেই সময়) পাপকর্ম সম্পাদন করতঃ বর্তমানে তির্যককূলে জন্মগ্রহণ করে এই দুঃখাবস্থায় পতিত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি বর্তমান এ'জন্মে পাপকর্ম সম্পাদন কর, মৃত্যুর পর তোমাদেরকেও তির্যককূলে জন্মগ্রহণ করতঃ যেমন-গরু, কুকুর, ছাগল, মহিষ, বিড়াল, বানর, কবুতর, ময়না, চড়ুই ইত্যাদি রূপে বর্ণনাভীত, অসহ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য থাকতে হবে। কাজেই, সাবধান হয়ে যাও। কখনো পাপকর্ম সম্পাদন করবে না। পাপকর্ম ইহকালে যেমন বিবিধ দুঃখ-কষ্ট দেয়, তেমনি পরকালে তদপেক্ষা আরো অধিক পরিমাণে দুঃখ-কষ্ট দেয়। তাই আবারো বলছি, তোমরা সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। এবং পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল পালনে তৎপর থাক। বুদ্ধ বলেছেন যদি ভিক্ষু গৃহী উভয়ে শীলবান হয় তাহলে ভিক্ষুরা ভিক্ষুধনে এবং গৃহীরা গৃহীধনে ধনী হয়ে থাকে। আর ভিক্ষু গৃহী উভয়ে দুঃশীল হলে ভিক্ষুরাও গরিব এবং গৃহীরাও গরিব হয়ে যায়। উভয়ের পরিহানি, অধঃপতনই ঘটতে থাকে। কিন্তু তোমরা তো বর্তমানে পঞ্চশীল পালন করতেছ না। প্রাণীহত্যা করতেছ, চুরি-ডাকাতি-সম্ভ্রাসী-ছিনতাই করতেছ, ব্যভিচারে রত রয়েছ, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ করতেছ, মদ-গাঁজা, হেরোইন সেবন করতেছ। সম্ভর গ্রন্থ, প্রসিতের গ্রন্থ হয়ে পরম্পর পরম্পরের মধ্যে হানাহানি, মারামারি, খুনাখুনি করতেছ। এই অবস্থা চলতে থাকলে তো তোমাদের অধঃপতন সুনিশ্চিত হবে। কিছুতেই উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির আশা বাতুলতা মাত্র। তোমাদেরকে এসব অকুশলকর্ম ও হিংসাহিংসি, রেষারেষিসমূহ পরিত্যাগ করতে হবে। তা নষ্ট হলে তোমরা দিন দিন রসাতলে যাবে। পূজ্য বনভন্তে সম্ভ্র লারমা ও প্রসিত বিকাশ খীসার প্রতি হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন-তোমরা থামো, থামো; বর্তমানে যেইরূপ খুনাখুনি কাজে মেতে উঠেছ, সে সব বন্ধ কর। এইসব আত্মঘাতী খুনাখুনির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগোষ্ঠির কোন প্রকার সুখ লাভ

হচ্ছে না, হবে না। বরং দুঃখ দুর্ভোগই বেড়ে চলছে; অর্থহানি, ধনহানি, জীবনহানি হয়ে যাচ্ছে। তোমরা এতদাঙ্খলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সুখ-শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। তাদের ভাগ্যাকাশ কালো মেঘে ডেকে দিও না। এখনো সময় রয়েছে; পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে মিলেমিশে অবস্থান কর। শত্রুতা মনোভাব বিদূরীত করে চিন্তের মধ্যে ক্ষমা-মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠিত কর। নতুবা এ' ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই দায়ী থাকতে হবে।

তিনি বলেন-তোমরা কোন প্রাণীকে টিল-দণ্ড, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা বধ, বন্ধন, প্রহার করবে না। যদি সেভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হও তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুখ লাভ হবে। বুদ্ধ বলেছেন, যেই ব্যক্তি আত্মবিলাসী হয়ে সুখাকাঙ্ক্ষী অপর জীবকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করে পরকালে তার সুখ হরণ হবে। অন্যদিকে, যেই ব্যক্তি আত্মবিলাসী না হয়ে সুখাকাঙ্ক্ষী অপর জীবকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করে না পরকালে সে নিশ্চয় সুখ লাভ করবে। তাই তোমরা যদি পরকালে সুখ লাভ করতে চাও, তাহলে কোন প্রাণীকে দণ্ডের দ্বারা তাড়না করবে না, দুঃখ দেবে না। বরং মানুষ হতে গুরু করে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করবে, দয়া করবে। কখনো নির্দয় হবে না। এতে তোমাদের ইহ-পর উভয় কালে সুখ লাভ হবেই।

তোমরা কাম চিন্তা, ক্রোধ চিন্তা, হিংসা চিন্তা পরিহার কর; কখনো এগুলো মনের মধ্যে স্থান দিবে না। এই তিন প্রকার চিন্তাকে ভগবান বুদ্ধ মহাপাপ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে কাম, ক্রোধ, হিংসা এ'তিন প্রকার চিন্তা না করলে মহাপুণ্য হয়। এই তিন প্রকার চিন্তা হতে নিজকে বিরত রাখতে সক্ষম হলে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়। তোমরা যদি এ'তিন প্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করে অবস্থান কর তাহলে আমি বলছি, তোমাদের পুণ্য হবে, সুখ লাভ হবে। জগতের সত্ত্বগণ এই তিন প্রকার চিন্তা দ্বারাই দুঃখভোগ করতেছে। আমার সাথে বলো “আমরা কাম চিন্তা করব না, ক্রোধ চিন্তা করব না, হিংসা চিন্তা করব না”। এই তিন প্রকার চিন্তা না করলে তোমাদের পুণ্য হবে, সুখ লাভ হবে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন, একথা মনে থাকবে তো? হ্যাঁ ভন্তে, মনে থাকবে। তাহলে বল তো দেখি। “আমরা কাম চিন্তা করব না, ক্রোধ চিন্তা করব না, হিংসা চিন্তা করব না। এতে আমাদের পুণ্য হবে, সুখ লাভ হবে।” হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। পুণ্য ও সুখ লাভের জন্য তোমাদেরকে এ তিন প্রকার চিন্তা হতে বিরত থাকতে হবে।

আমি তো দেখতেছি, বাংলাদেশের প্রায়ই মানুষই মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম ও খল। আর তাই এখানে (বাংলাদেশে) এতো দুঃখ, এতো অশান্তি,

এতো বিশৃঙ্খলা, এতো নৈরাজ্য, এতো অরাজকতা বিরাজ করছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে তোমরাও (পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠিও) মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম ও খল স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। তজ্জন্য এখানে দুঃখ, অশান্তি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অবনতির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে রাখবে, এসব মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম ও খল লোকেরা নিজের যেমন দুঃখ, দুর্দশা ডেকে আনে তেমনি পরিবারের, সমাজের এবং দেশের জন্যও দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভোগ ডেকে আনে। তারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। তারা সর্বদা দুঃখপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ, নৈরাজ্যপূর্ণ, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করতেই থাকে। কিছুতেই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুশৃঙ্খলা আনায়নকারী কর্ম সম্পাদন করে না। তাই তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা কখনো মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম ও খল লোকের সহিত উঠা-বসা, মেলা-মেশা, বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। যদি তা' কর, তাহলে তোমরাও মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম, খলে পরিণত হয়ে যাবে। সে রকম কিছু হলে তো সুখ, শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হবে না। বরং ইহকাল-পরকাল উভয়কালেই বর্ণনাভীত দুঃখ, দুর্ভোগ, অশান্তি পোহাতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম, খল লোকের কিছুতেই সুখ লাভ হয় না। তারা ইহকালে যেমন দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট, অশান্তিতে জীবন-যাপন করে, তেমনি মৃত্যুর পরজন্মেও আরো অধিকতর দুঃখপূর্ণ স্থান নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে অনন্ত দুঃখে পতিত হবে।

পরিশেষে বনভন্তে বলেন-তোমরা আজকে নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিহারে এসে পরিত্রাণ শ্রবণ সহ দানাদি পুণ্যকর্ম করছ, তদ্বারা তোমাদের মঙ্গল হোক। (পূজ্য বনভন্তের এ' কথা শেষ হলে সমবেত দায়ক-দায়িকা সকলে একবাক্যে সজোরে সাধুবাদ ধ্বনি দেয়) বিগত বৎসর সুখে-দুঃখে যেভাবে অতিক্রান্ত হোক না কেন নতুন বৎসর যাতে সুখে শান্তিতে কেটে যায় তজ্জন্য সচেতন থাক অর্থাৎ কুশলকর্ম সম্পাদন কর। আর আমার সাথে বলো “আমরা আজকে নববর্ষ উপলক্ষ্যে যে কুশলকর্ম সম্পাদন করেছি, তদ্বারা আমাদের উন্নতি হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক; সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ হোক, কিছুতেই আমাদের অধোগতি, পরিহানি না হোক। বিগত বছরের সব দুঃখ, অশান্তি ধুঁয়ে মুছে গিয়ে নববর্ষে বয়ে আসুক শান্তি, মঙ্গলের শুভ বার্তা।” তোমরা সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন কর, অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। কারণ কুশলকর্মের পরিণাম যেমন সুখের তেমনি অকুশলকর্মের পরিণাম হল দুঃখের।

তাই বলা হয়েছে-

দেখ ঐ চরাচরে
যে যেমন কর্ম করে,
তেমন সে ফল তার পায় ।

অর্থাৎ এই সংসারে যে কর্ম সম্পাদন করা হোক না কেন তার ফল পেতে হয়। ভালো কর্মে ভালো ফল, আর মন্দ কর্মে মন্দ ফল ভোগ করতে হয়-এটাই কর্মের নীতি। তজ্জন্য বলছি, তোমরা যথাসম্ভব নিজকে পাপকর্ম হতে বিরত রাখবে। এ'সংসারে তোমরা সবাই মরণ পথের যাত্রী। আজকে জীবিত আছে বটে, আগামীকালও তোমাদের মৃত্যু হতে পারে। জীবন এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস নেই। কে কখন, কোথায় মৃত্যুবরণ করে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ নববর্ষে বিহারে এসেছ বটে, কিন্তু আগামী নববর্ষে যে আরো বিহারে আসতে পারবে তার গ্যারান্টি আছে কি? গ্যারান্টি নেই। কারণ আগামী নববর্ষ আসার আগেই তোমাদের মৃত্যুও হতে পারে। তাই তোমরা কোন প্রকার পাপকর্ম সম্পাদন করবে না। মৃত্যুর নিকট শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ কোন ভেদাভেদ নেই। মৃত্যুর ডাক আসলে শিশু অবস্থায়ও মরতে হবে, কিশোর অবস্থায়ও মরতে হবে, যুবক অবস্থায়ও মরতে হবে, বৃদ্ধ অবস্থায়ও মরতে হয়। কাজেই পুণ্যকর্ম সম্পাদনে অবহেলা বা সময়ের জন্য অপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলেরই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত। তাই আবারো বলছি, তোমরা যথাসাধ্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। পাপকর্ম সম্পাদন করবে না। সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আমার সাথে বলো “আমরা এই নববর্ষে কোন প্রকার পাপকার্য সম্পাদন করব না; পুণ্যকর্মই সম্পাদন করব। যাতে আমাদের সুখ লাভ হয়, দুঃখ পেতে না হয়। আমাদের ইহকাল-পরকালে সুখ লাভ হোক; সর্বদিকে জয়যুক্ত সুনিশ্চিত হোক। আমাদের যেন কোন প্রকার অধঃপতন না ঘটে-নববর্ষে আমাদের এ'প্রার্থনাই রইল।” তোমাদের প্রত্যেকের ধর্মজ্ঞান উদয় হোক।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমাদের মনচিন্তা কি দুঃখ পাচ্ছে সেটা জ্ঞানতে সচেষ্ট থাক

অদ্য ২৫শে মে ২০০২সাল, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বাংলা, রোজ শনিবার। পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজবন বিহারে আয়োজিত পুণ্যানুষ্ঠান। বিহারের দক্ষিণ দিকে বিরাট খোলা মাঠে অবস্থিত স্থায়ী পাকা মঞ্চকে সুসজ্জিত করা হয় নানা রঙ বেরঙের বাহারী সাজ-সজ্জায়। সময় বাড়ার সাথে সাথে পুণ্যার্থীর সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে; আর বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগমে লোকারণ্য হয়ে উঠে বিরাট খোলা মাঠ। যথাসময়ে পরম পূজ্য অরহত শ্রাবক বুদ্ধ বনভন্তে মহোদয় সশিষ্যে মঞ্চে আগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর মধুর স্বরে উচ্চারিত সাধুবাদ ধ্বনিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হতে লাগল। দানোৎসর্গ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে পরম পূজ্য বনভন্তে ধর্মদেশনা প্রদান শুরু করে বলেন—এ’ ধর্মদেশনা কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করলে সেটা মিথ্যা হয়ে যায়, চিন্তে দুঃখ অনুভব হয়। অন্যদিকে ধর্মদেশনা মন দিয়ে শ্রবণ করলে সেটা সত্য হয়ে যায়, চিন্তে সুখ অনুভব হয়। ধর্মদেশনা কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা উচিত নয়; ধর্মদেশনা মন দিয়ে শ্রবণ করতে হয়। মন দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে সেটা জ্ঞান, আর কর্ণ দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে সেটা অজ্ঞান। তোমরা তো শুধুমাত্র কর্ণ দিয়েই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে থাক, মন দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ কর না। তজ্জন্ম আমি বহু বৎসর যাবত ধর্মদেশনা প্রদান করে আসলেও তোমরা কেহই সেটা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারনি। মনে রাখবে, মনোযোগ দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে তাতে জ্ঞান উদয় হয়, চিন্তে সুখ বিরাজ করে এবং ধর্মদেশনাটি চিন্তের মধ্যে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অপর দিকে কর্ণ দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে জ্ঞান উদয় হতে পারে না, অজ্ঞানই উদয় হয়; চিন্তে দুঃখ বিরাজ করে; এবং ধর্মদেশনাটি চিন্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে না। অনেকেই নাকি বলে থাকে বনভন্তে ধর্মদেশনা প্রদান করলে আমাদেরকে বকাবকি করেন, গরম কথা শুনান। তারা কেন এরূপ মনে করে জ্ঞান? তারা মনোযোগ দিয়ে (মর্মার্থ উপলব্ধি করে) ধর্মদেশনা শ্রবণ করে না, কেবল কর্ণ দিয়েই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে। তাই তাদের নিকট সে রকম মনে হয়। কারণ শুধুমাত্র কর্ণ দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে সেখানে মার থাকে। তখন মার দেশনার মর্মার্থ বুঝতে দেয় না। বরং বিপরীতভাবে বুঝিয়ে দেয়। অন্যদিকে, মনোযোগ দিয়ে ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে মার থাকতে পারে না। তখন জ্ঞান উদয় হয়, সে জ্ঞানেবু দ্বারা দেশনার মর্মার্থ বুঝা সম্ভব হয়। কাজেই বিপরীতভাবে বুঝার অবকাশ থাকে না। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মনোযোগ বিহীন অবস্থায় ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে এর মর্মার্থ বুঝা যায় না। ধর্মদেশনা শ্রবণকারী হলেও

সবাই দেশনার মর্মার্থ বুঝতে সমর্থ হয় না। ধর্মদেশনার মর্মার্থ বুঝা সহজ কথা নয়। তাই তোমরা মনোযোগের সহিত (অর্থাৎ কেবল কর্ণ দিয়ে নয়, মন দিয়েই) এই ধর্মদেশনা শ্রবণ করবে।

বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত আদর্শ হল সুখ ভোগ ত্যাগ করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তোমরা সুখ ভোগ ত্যাগ করতে পারবে কি? পারলে কতটুকু পারবে? তোমরা যে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, জায়গা-জমি নিয়ে সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছ, এগুলোও সুখ ভোগের নামান্তর। প্রকৃত সুখভোগ ত্যাগ করলে সাংসারিক জীবন-যাপন করা যাবে না। ‘আমার স্বামী’, ‘আমার স্ত্রী’, ‘আমার পুত্র’, ‘আমার কন্যা’, ‘আমার জায়গা’, ‘আমার জমি’ বলে তোমরা যে সুখ ভোগে রত রয়েছ, সেখানে অজ্ঞান, মিথ্যা ছাড়া কিছুই নেই। এবং সে সুখভোগ প্রকৃত সুখও নয়। সে সুখ ভোগের পরিণামে তোমাদেরকে দুর্বিষহ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আমি তো দেখতেছি, জ্ঞানচক্ষুর অভাবেই তোমরা সে মিথ্যা সুখভোগ রত রয়েছ; অথচ তদ্বারা তোমাদেরকে কতো দুঃখ পেতে হচ্ছে, কতো অপদস্ত হতে হচ্ছে, কতো লজ্জিত হতে হচ্ছে, কতো অনুতপ্ত হতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ‘আমার স্বামী’, ‘আমার স্ত্রী’,বলে বলে তোমরা নিজের জীবনকে নিজে বিষময় করে তুলতেছ; অসহনীয় দুঃখ বরণ করে নিতেছ। অজ্ঞানের ঘুম ঘোরে আছ বলে তোমরা প্রকৃত সত্যকে জানতে পারতেছ না। আমার সাথে বলো “আমাদের জ্ঞান নেই বলে, লজ্জা নেই বলে আমার স্বামী, আমার স্ত্রী.....মনে করতঃ সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছি। জ্ঞান থাকলে, লজ্জা থাকলে এসব পরিত্যাগ করতাম।” তোমরা মিথ্যা সুখ ভোগ ত্যাগ করতে পারছ না বলে জন্ম-জন্মান্তর ধরে দুঃখ ভোগ করতেছ। অজ্ঞানী ব্যক্তির সাংসারিক জীবনের অসংখ্য দুঃখ যাতনায় জর্জরিত হয়ে থাকলেও তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের উপায়সমূহ দেখতে পায় না। তোমাদের অবস্থাও সেইরূপই হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-তোমাদের মনচিন্তা কি দুঃখ পাচ্ছে, সেটা জানতে সচেষ্ট থাক। আমি তো দেখতেছি, তোমাদের মনচিন্তা দুঃখ পাচ্ছে। পাচ্ছে নয় কি? হ্যাঁ ভন্তে, দুঃখ পাচ্ছে। মনচিন্তা দুঃখ পেলে ডাক্তার (স্থলে) নিক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় সে দুঃখ থেকে মুক্ত হবার জন্য ছটফট করতে থাকে। কিন্তু তা’ সত্ত্বেও অজ্ঞানীরা সেই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেটা অজ্ঞানীরা জানে না। তারা মুক্ত হবার আশায় বিবিধ কর্ম সম্পাদন করতঃ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সংসারচক্রে ঘুরতে থাকে মাত্র। কখনো মনুষ্য যোনিতে, কখনো পশু যোনিতে, কখনো পক্ষী যোনিতে এভাবে অজস্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করে করে কতো প্রকার যে দুঃখ

ভোগ করতেছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। আবার সত্ত্বগুণের উৎপত্তির স্থান ভেদে যোনি চার প্রকার; যথা-(১) অণ্ডজ (২) শ্বেদজ (৩) জরায়ুজ (৪) ঔপপাতিক। পক্ষী, সর্প ইত্যাদি যারা অণ্ড (ডিম) হতে জন্মে, তারা অণ্ডজ। মানুষের ন্যায় যারা মাতার জরায়ুতে জন্মে, তারা জরায়ুজ। মশা, মক্ষিকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ শ্বেদ বা ময়লা স্থানে জন্মে বলে, তারা শ্বেদজ। এই তিনটি ব্যতীত হঠাৎ (দিব্যভাবে) জন্মগ্রহণ করে বলে দেবতাগণ ঔপপাতিক। ধর, তোমরা বর্তমানে মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করেছে, নামকরা ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম নিবে তা' জ্ঞান কি? জ্ঞান না। বর্তমানে যতো নামকরা ব্যক্তি হও না কেন অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে মৃত্যুর পর তীর্থককূলে কুকুর হয়েও জন্মগ্রহণ করতে পার। পার নয় কি? হ্যাঁ ভগ্নে, পারি। কারণ মৃত্যুর সময় বর্তমানের এই নাম-যশগুলো তো সঙ্গে যাবে না বা নিয়ে যেতে পারবে না। অন্যদিকে, তোমরা তো আর মার্গফল লাভ করনি। যদি মার্গফল লাভ করতে তাহলে নিশ্চয়তা থাকতো যে, তোমরা মৃত্যুর পর নিম্নগামী হবে না। কাজেই সাবধান, অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। বর্তমান মনুষ্য কূলে জন্মগ্রহণ করে অকুশলকর্ম সম্পাদন করার ফলে যদি মৃত্যুর পর তীর্থককূলে জন্মধারণ করতে হয় তা' অত্যন্ত লজ্জাজনক হবে। তাই তোমরা কখনো অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না। কমপক্ষে স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করতে সচেষ্ট থাক। স্রোতাপত্তি অর্থ যিনি নির্বাণ স্রোতে পতিত হয়েছেন। ন্যূনতম সাতবার জন্মগ্রহণ করার পর নির্বাণ লাভ করবেন। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করলে অধোগামী, নিম্নগামী ও চারি অপায়ে পতন হবার কোন শঙ্কা থাকে না। তারা সর্বদা উর্ধ্বগামী লাভ করে। মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করলে ধনীকূলে, রাজকূলে জন্মধারণ করতঃ উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর স্বর্গে জন্মধারণ করলেও উৎকৃষ্ট দিব্য সুখ, উৎকৃষ্ট দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন দেবতা হয়ে থাকে। মনুষ্যকুল স্রোতাপত্তি ও দেবকুল স্রোতাপত্তি ভেদে স্রোতাপত্তি দুই প্রকার। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করার পর যারা মনুষ্য লোককে ভালো, সুখ মনে করে এবং মনুষ্য লোকের সুখভোগ করতে ইচ্ছুক হয় তারা মৃত্যুর পর মনুষ্যকূলে সর্বোচ্চ সাতবার রাজকূলে, মহাধনীকূলে জন্মগ্রহণ করতঃ রাজা, মহাধনীর সুখভোগ করা শেষে নির্বাণ লাভ করে। এরা হল মনুষ্যকুল স্রোতাপত্তি। আর স্রোতাপত্তি লাভ করার পর যারা সুগতি স্বর্গলোককে ভালো, সুখ মনে করে এবং স্বর্গের দিব্যসুখ লাভ করতে ইচ্ছুক হয়, তারা মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ সাতবার স্বর্গলোকে উৎপন্ন হওতঃ দিব্যসুখ ভোগ করা শেষে নির্বাণ লাভ করে। এরা হল দেবকুল স্রোতাপত্তি। উপমা কথা-ধর, আটজন লোক স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হল। তন্মধ্যে চারিজন মনুষ্য লোককে ভালো মনে

করতঃ আবার মানুষ হয়ে জনগ্রহণ করে মনুষ্য সুখভোগ করার পর নির্বাণ লাভের ইচ্ছা পোষণ করতেছে। তারা মনুষ্যকুল স্রোতাপত্তি বলে অভিহিত হবে। বাকী চারিজন স্বর্গলোককে ভালো মনে করতঃ স্বর্গের দেবতা হয়ে দিব্য সুখভোগ করার পর নির্বাণ লাভের ইচ্ছা পোষণ করতেছে। তারা দেবকুল স্রোতাপত্তি বলে অভিহিত হবে। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করলে চারি অপায় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। স্রোতাপত্তি মার্গ লাভীদের চারি অপায়ে পতিত হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ না করা পর্যন্ত চারি অপায়ে পতিত হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। যারা অস্রোতাপত্তি অর্থাৎ মার্গফল লাভ করতে পারেনি, তারা যে কোন মুহূর্তে চারি অপায়ে পতিত হতে পারে। মনে রাখবে, স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ না করা পর্যন্ত চারি অপায়ে (তির্যক, অসুর, প্রেত, নিরয়) পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করলে তবেই চারি অপায়ে পতিত হবার সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে যারা পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করে তাদেরকে চুল স্রোতাপত্তি বলা হয়। যারা ইহজন্মে প্রাণী হত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচার করে না, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ করে না, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন তথা যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে না; তারা চুল স্রোতাপত্তি। চুল শব্দের অর্থ ছোট। এই চুল স্রোতাপত্তিরাও চারি অপায়ে পতিত হয় না। তবে শুধুমাত্র চুল স্রোতাপত্তি দ্বারা কিন্তু নির্বাণ লাভের গতি নির্ধারণ হয় না। চুল স্রোতাপত্তিরা মৃত্যুর পর চারি অপায়ে পতিত হয় না, এটুকুমাত্র। তাও আবার মৃত্যুর পরবর্তী এক জন্মের জন্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানলে, বুঝলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা বন্ধ হয়ে যায়। আর তখন চারি অপায়ে পতিত হবার, অধোগামী হবার, নিম্নগামী হবার যাবতীয় সম্ভাবনা নিরুদ্ধ হয়। বুদ্ধ বলেছেন-হে আনন্দ! এ'ধর্ম না জেনে, না বুঝে বিচলিত মনুষ্যগণ বিজড়িত তত্ত্বের মতন, জটীভূত সূত্র পিণ্ডের মতন, মুঞ্জি-তৃণ গ্রন্থির মত হয়েছে এবং অপায়, দুর্গতি, অধঃপতন ও সংসার অতিক্রম করতে পারছে না। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান দ্বারা পুনর্জন্ম নিরোধ করতঃ যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হওত নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করাই হল বৌদ্ধধর্ম।

বনভক্তে বলেন-ভগবান বুদ্ধ যখন গয়ার বোধিদ্রুমতলে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে যোগাসনে আসীন তখন বশবর্তী দেবপুত্র মার অসংখ্য সৈন্য নিয়ে বোধিদ্রুমতলে আসে। মার ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠে-'হে ভণ্ড তপস্বী! এ'আসন হতে ওঠ। এই আসনে তোমার কোন অধিকার নেই। ইহা আমারই প্রাপ্য'। যদি তুমি আসন হতে না উঠ, তাহলে আমি তোমাকে স্বহস্তে বধ করব। তোমাকে স্বহস্তে বধ করতে আমি এখানে এসেছি। তুমি আমার চরম শত্রু; আমার রাজ্য অতিক্রম করতে ইচ্ছুক হয়েছে-এ স্পর্ধা কখনো আমি সহ্য করব না। এ বলে মার সসৈন্যে

বুদ্ধকে আক্রমণ করল। কিন্তু বুদ্ধকে আসন চ্যুত ও পরাজিত কিছুই করা সম্ভব হয়নি, বরং মারকেই সসৈন্যে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়েছিল। বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে বলেন, মার কি চিন্তা করছিল জ্ঞান? এই শাক্য রাজপুত্র যদি আমার রাজ্যে অতিক্রম করতঃ জ্ঞান লাভ করতে পারে; লোকদের যদি উপদেশ দেয় (অর্থাৎ সে জ্ঞান যদি অপর জনের নিকট প্রচার করে) আর লোকজন তার কথামত সংসার ধর্ম ত্যাগ করে, তাহলে আমার রাজ্য তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা আমার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। কাজেই তাকে (সিদ্ধার্থকে) ধ্যান ভঙ্গ করে দিতে হবে। তবে মারের সব চক্রান্তই ব্যর্থ হয়ে যায়। বর্তমান সময়েও মার সেরূপ চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। তোমরা যদি অজ্ঞানের সহিত অবস্থান কর তাহলে মারের চক্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে না। মারের নির্দেশ মত অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে হবে। মার কি করে জ্ঞান? মার সত্ত্বদেরকে ভুলপথে চালিত করে; ভুলপথে চালিত করাই মারের কাজ। অন্যদিকে ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বদেরকে মারের সেই ভুলপথ হতে ফিরায়ে এনে ঠিক পথে চালিত করে থাকেন। তাই মার ভগবান বুদ্ধকে সহ্য করতে পারে না। বর্তমানে মার আমাকেও সহ্য করতে পারছে না। মার কি বলতেছে জ্ঞান? বনভক্তে যদি না থাকে তাহলে সবাইকে আমার বশানুগত রাখা যাবে। বনভক্তের জন্য অনেক জনকে ভুলপথে চালিত করতে পারছি না। আমি না থাকলে তো তোমরা সবাই মারের নির্দেশিত ভুলপথে চালিত হতে। আর নানা অকুশলকর্ম সম্পাদন করে ফেলতে। যদ্বারা তোমাদেরকে ইহকাল-পরকাল দুর্বিষহ দুঃখ যাতনা ভোগ করতে হতো। কাজেই তোমরা ভুলপথ সম্বন্ধে সতর্ক হও। কখনো মারের প্রদর্শিত সেই ভুলপথে চালিত হবে না। বুদ্ধের নির্দেশিত সঠিক পথেই চালিত হও। তাহলে ইহ পর উভয় কালে সুখের অধিকারী হতে পারবে। মনে রাখবে, ভগবান বুদ্ধ যেমন সঠিকপথে চালিত হতে উপদেশ দেয়, তেমনি মারও ভুলপথে চালিত হতে প্রলোভিত করে। সুতরাং তোমরা মারের নির্দেশিত ভুলপথে চালিত হবে না। প্রশ্ন আসতে পারে, মার কোথায় থাকে? কেহ যখন সুখভোগ করার চেতনা উৎপন্ন করে তখনই মার তার মনের মধ্যে স্থান করে নেয়। তাই বলা হয়েছে-ভোগ চেতনাই মার। মারকে বিতাড়িত করার উপায় কি? চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়সমূহ জ্ঞানলে, বুঝলে মার বিতাড়িত হয়ে যায়। তোমরা মারকে বিতাড়িত করতে পারছ না, মারের সঙ্গে পেরে উঠতে পারছ না বলে তার নির্দেশ মত অকুশলকর্ম সম্পাদন করতেছ। যেদিন মারকে বিতাড়িত করতে পারবে, মারের সঙ্গে পেরে উঠতে সক্ষম হবে, সেদিন আর অকুশলকর্ম সম্পাদন করবে না।

বর্তমানে তোমরা অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে সঙ্গী পাচ্ছ বলে অনায়াসে অকুশলকর্ম করেই যাচ্ছ। সঙ্গী না পেলে এতো সহজে এ'গুলো করতে পারতে না। অবশ্য ভগবান বুদ্ধও বলেছেন, অকুশলকর্ম সম্পাদন করা সহজ কাজ। এবং সে কাজে অনেক সঙ্গী পাওয়া যায়। অপরদিকে, কুশলকর্ম সম্পাদন করা খুবই কঠিন আর সে কাজে সঙ্গী খুব একটা জুটে না। কারণ অকুশল কর্মের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং সাময়িক ঐহিক সুখ লাভও হয়ে থাকে। কিন্তু সেই অকুশল কর্মের পরিণামে ইহলোকে তো বটেই পরলোকেও অকল্যাণের কারণ হয়, নিরয়গামী হতে হয় তাদেরকে। তাই বলছি, এখনো সময় আছে। তোমরা সেই অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে দানাদি কুশল পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ কর। দানের দ্বারা দাতার আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। তোমরা যদি দান, শীল, ভাবনাদি পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাক, তাহলে আমি বলছি তোমাদের তিন বৎসরের মধ্যে বর্তমানের এই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে।

বুদ্ধের শাসনকে এতদাঞ্চলে সুউজ্জ্বল, প্রতিষ্ঠিত এবং বহুল প্রচার ও প্রসার করতে আমার এম, এ পাশ করা; ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিষ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ বুদ্ধ শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ত্রিপিটক শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বর্তমানে আমাদের এখানে ত্রিপিটক শাস্ত্র নেই বললে চলে। উপরন্তু এখনো বাংলা ভাষায় পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র অনুবাদও হয়নি। আমি চাচ্ছি, উচ্চ শিক্ষিত (এম, পাশ; ডক্টরেট ডিগ্রীধারী) শিষ্যের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষা হতে পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিতে। সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেলে সবাই তা' পড়তে সক্ষম হবে। আর তখন সবাইকে ত্রিপিটক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বানানো যাবে। ত্রিপিটক শাস্ত্রের শিক্ষা, উপদেশ মত চলে আদর্শ বৌদ্ধ জীবন-যাপন করার মাধ্যমে এতদাঞ্চলে বুদ্ধের শাসনকে জাহ্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এতে করে এখানকার জনগোষ্ঠি লৌকিক, লোকোত্তর সুখের অধিকারী হওত পরম সুখে অবস্থান করতে সমর্থ হবে। এভাবে বুদ্ধের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা আচরণ, অনুশীলন না করলে ভবিষ্যতে এখানে বৌদ্ধধর্ম টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। এটা কোন কথার কথা নয়। তাই বলছি চাকমা, মারমা, বড়ুয়া হতে উচ্চ শিক্ষিত যুবক আমার নিকট শিষ্য হওত বুদ্ধের শাসনকে উজ্জ্বল করতে সহযোগিতা করো।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা জ্ঞান-অজ্ঞান পরীক্ষা কর, সত্য-মিথ্যা যাচাই কর। পরীক্ষা, যাচাই করার পর জ্ঞান ও সত্যকে গ্রহণ কর। জ্ঞানকে গ্রহণ করলে অজ্ঞান থাকবে না, সত্যকে গ্রহণ করলে মিথ্যা থাকবে না। মনচিন্তের

মধ্যে যদি জ্ঞান উদয় হয় তাহলে অজ্ঞান থাকতে পারবে না। যদি সত্য উদয় হয় তাহলে মিথ্যা থাকতে পারে না। অপরদিকে, যদি অজ্ঞান উদয় হয় তাহলে জ্ঞান থাকতে পারবে না। আর যদি মিথ্যা উদয় হয় তাহলে সত্য থাকতে পারবে না। জ্ঞান, সত্য উদয় হলে সুখ লাভ হয়। অজ্ঞান, মিথ্যা উদয় হলে দুঃখ পেতে হয়। বর্তমানে তোমাদের চিন্তের মধ্যে অজ্ঞান, মিথ্যাই উদয় হচ্ছে; আর তজ্জন্য তোমাদেরকে অসহ্য দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। তাই বলছি, তোমরা জ্ঞান, সত্য উদয় করতে সচেষ্ট থাক। যদি জ্ঞান, সত্য উদয় হয়, তাহলে তোমাদের জীবন সার্থক হবে। ইহকালে যেমন সুখে থাকতে পারবে, তেমনি মৃত্যুর পরও সুগতি স্বর্গ লাভ হবে।

তোমরা সর্বদা পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, কখনো পাপকর্ম সম্পাদন করতে যাবে না। ‘পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার’ এ কথাটি সবসময় স্মরণ রাখবে। তাহলে দেখবে তোমাদের মন পাপকর্ম সম্পাদনের দিকে আর অগ্রসর হবে না। আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা সকলে পাপকর্ম সম্পাদন করা হতে সাবধান থাকো। পাপ পরিত্যাগ করতঃ সবসময় কুশলকর্ম সম্পাদন কর। কুশলকর্ম সম্পাদন করলে তোমাদের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুখ, শাস্তি লাভ হবে। আমার সাথে বলো “আজকের এই পুণ্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা আমাদের অধঃপতন, অধোগতি বন্ধ হোক। উর্ধ্বগতি, সুগতি স্বর্গ লাভ হোক এবং নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক”।

সাধু, সাধু, সাধু।

যার মনচিন্তে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞানী আর যার মনচিন্তে জ্ঞান থাকে না সে অজ্ঞানী

অদ্য ২২শে জুলাই ২০০২ ইং, ৭ই শ্রাবণ ১৪০৯ বাংলা, রোজ সোমবার। পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজবন বিহারে আয়োজিত সার্বজনীন দানানুষ্ঠান। মূল বিহারের দক্ষিণ দিকে বিরাট খোলা মাঠে অবস্থিত স্থায়ী পাকা মঞ্চে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। দানোৎসর্গের যাবতীয় পর্ব সমাপ্ত হলে পূজ্য বনভন্তে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান করতে শুরু করেন। ধর্মদেশনায় তিনি বলেন-ধর্মদেশনা শ্রবণের দ্বারা যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয় তাহলে শ্রবণকারীদের অধঃপতন হয় না, অপায় দ্বার বন্ধ হয় এবং পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়ে যায়। ধর্মদেশনা শ্রবণ করে যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন না হয় তাহলে শ্রবণকারীদের অধঃপতন বন্ধ হয় না, অপায় দ্বার বন্ধ হয় না, পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয় না। আর তখন দেশনাকারীর দেশনা এবং শ্রবণকারীদের মনোযোগ কোনটাই সার্থক হয় না। এতে ধর্মদেশক এবং দেশনা শ্রবণকারী কারোর মনে সুখ উদয় হবার অবকাশ থাকে না। বরং বিরক্তিবাবই উদয় হবার সম্ভাবনা থাকে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ, প্রবজ্যা লাভ করা দুর্লভ, বুদ্ধের উৎপত্তি দুর্লভ, শ্রদ্ধা সম্পত্তি দুর্লভ, মনুষ্যত্ব লাভ করা দুর্লভ। তোমাদেরকে এ'সকল উপদেশ বুঝতে হবে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে; এবং সেই আলোকে নিজকে চালিত করার দৃঢ় প্রত্যয় জাম্বত রাখতে হবে। দেখ, বর্তমানে তোমাদের দুর্লভ মানব জীবন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে; সদ্ধর্ম শ্রবণ করারও সুযোগ পাচ্ছ, আমার সাক্ষাৎ পেয়েছ। সুতরাং তোমরা কেন এ' সৌভাগ্যটুকু সুরক্ষা করবে না? কেন আরো উচ্চাবস্থা প্রত্যাশা করবে না? অবশ্যই তা' করা উচিত। কিন্তু তোমরা তো সে সবার বিপরীত কর্মই করে চলেছ। কোথায় মনুষ্য জন্ম লাভের দুর্লভ প্রাপ্তিকে পূর্ণ করার সার্থকতা করে নিবে! তা' না করে হানাহানি, মারামারি, খুনখুনি করতেছ। চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাসী-মাস্তানী, চাঁদাবাজী-ছিনতাই; মদ-গাঁজা-হেরোইন সেবন করা সহ যাবতীয় অকর্মে কুকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। পূজ্য বনভন্তে সেই অকুশলকর্ম সম্পাদনকারীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, তোমরা এসব অকুশলকর্ম বন্ধ কর। আমি তো দেখতেছি তোমরা যে অকুশলকর্ম করতেছ তাতে মৃত্যুর পর আর মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে না। তোমাদের জন্য চারি অপায় অবধারিত হয়ে রয়েছে। অকুশলকর্মের ফল একুপই হয়। কারণ অকুশলকর্মের বিপাক কখনো চাপা থাকে না। কিছু আগে হোক বা পরে হোক তা' ফল প্রদান করবেই। অকুশলকর্ম ইহকালে যেমন বিবিধ দুঃখ-কষ্ট প্রদান করে তেমনি মৃত্যুর পরও

চারি অপায়ে পতিত করে। তাই পাপীদিগকে ইহকাল-পরকাল উভয়কালে অনুশোচনার তাপে দক্ষ-বিদক্ষ হতে হয়। আমি তোমাদেরকে কেন এসব বলছি জান? আমি বিদ্যমান থাকতে তোমরা যেন নিল্গামী না হও, পরাজিত না হও, নিরয়গামী না হও এবং বর্তমান দুঃখ হতে মুক্ত হতে পার। একবার চাকমা রাজা দেবশীষ রায়ও আমার নিকট প্রার্থনা করেছিল-‘ভন্তে, আপনার মতন মহাপুরুষ বিদ্যমান থাকতে আমাদেরকে যাতে নিল্গামী হতে না হয়, পরাজিত হতে না হয়, অপায়ে পতিত হতে না হয়, দুঃখ ভোগ করতে না হয়, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি’। আমিও তাই চাচ্ছি।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-ভগবান বুদ্ধ যখন গয়ার অপরাজেয় বোধিপালঙ্কে উপবেশনরত ছিলেন, তখন মার করুণ বাক্যে বলেছিল-‘হে গৌতম, তুমি এখানে কি করতেছ’। তোমার কি অভাব রয়েছে? রাজ্য-ধন, স্ত্রী-পুত্র, ভোগ-ঐশ্বর্য সবকিছু পরিপূর্ণ রয়েছে। এই দুষ্করচর্যায় তোমার কি লাভ? তুমি গৃহবাসে ফিরে যাও। কিন্তু মারের সেই প্রলোভন সুলভ বাক্য বুদ্ধকে এক চুলও সংকল্প চ্যুত করতে পারেনি। কারণ বুদ্ধ ভালো করে জানতেন, সেই রাজ্য-ধন, স্ত্রী-পুত্র, ভোগ-ঐশ্বর্য সবই অনিত্য, অস্থায়ী। শাস্ত্রে দেখা যায়, সিদ্ধার্থ গৃহাভিনিষ্ক্রমণের সময় রাজা শুদ্ধোধন তাকে গৃহত্যাগে বাধা দিতে চাইলে সিদ্ধার্থ বলেছিলেন-পিতঃ আমাকে এ’ জগতে স্থায়ী বলে কিছু দেখায়ে দেন। যদি পারেন তাহলে আমি গৃহত্যাগ করব না। রাজা শুদ্ধোধন দেখায়ে দিতে ব্যর্থ হন। ভগবান বুদ্ধ জগতের আসল স্বরূপ অনিত্য ধর্মকে যথার্থরূপে জেনে রাজ্য-ধন, স্ত্রী-পুত্র সব কিছু ত্যাগ করে স্থায়ী সুখের অনুসন্ধান করেন। গয়ার বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতঃ স্থায়ী সুখ নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। এবং সেই নির্বাণধর্ম প্রচার করেছেন। আর অনিত্যময় জগতের সবকিছু পরিত্যাগ করে স্থায়ী সুখ নির্বাণ লাভে সচেষ্ট থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। এবার বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাও যদি স্থায়ী সুখ লাভের প্রত্যাশা কর, তাহলে তোমাদেরকেও বৌদ্ধধর্মের এই পারমার্থিক উপদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ সংসারের সকল জীব এবং বস্তু অনিত্য; অনিত্য হেতু দুঃখময়, তা’ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হয়। বাস্তবিক, এটাই প্রকৃত সত্যকথা বা সত্য দর্শন। পূজ্য বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন, ‘বর্তমানে (এখন) তোমরা ‘আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার জায়গা-জমি’ বলতেছ। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ তো আসলেই কি সে সব প্রকৃতপক্ষে তোমাদের? এবং সে সব কি তোমাদেরই ইচ্ছাধীন থাকে? না ভন্তে, থাকে না। আজকে আমার স্বামী বলে দাবি করতেছ বটে, কিন্তু আগামীকালও তার মৃত্যু হতে পারে। ঠিক তদ্রূপ আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা বলে দাবি করা কতটুকু

সত্য? স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদেরও আগামীকালের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে; আবার, ভূমিও মৃত্যুবরণ করতে পার। পার নয় কি? হ্যাঁ, ভন্তে। তাহলে আমার বলে দাবি করার যুক্তিকতা কোথায়? সুতরাং ‘আমি’, ‘আমার’ বলা সবই মিথ্যা, অসার ছাড়া কিছুই নয়। এই সংসারের সকল জীব, বস্তু অনিত্য; অনিত্য হেতু দুঃখময়। এ’অনিত্য, দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভের উপায় দুঃখমুক্তি নির্বাণ উপলব্ধি করা। ইহাই প্রকৃত ও স্থায়ী সুখের অবস্থা। প্রকৃত ও স্থায়ী সুখ প্রত্যাশীদেরকে এভাবে সংসারের আসল স্বরূপ অনিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতঃ অনিত্য, অস্থায়ী সুখের প্রতি অনাসক্ত হয়ে নির্বাণ উপলব্ধি করার চেষ্টায় তৎপর থাকতে হবে। তোমাদের মনচিন্তে যদি জ্ঞান, বিদ্যা থাকে তাহলে বৌদ্ধধর্মের এই পারমার্থিক উপদেশগুলো বুঝতে সক্ষম হবে। এবং নির্বাণ লাভের প্রচেষ্টায় তৎপর থাকবে। আর যদি তোমাদের মনচিন্তে জ্ঞান, বিদ্যা না থাকে, তাহলে বৌদ্ধধর্মের এই পারমার্থিক উপদেশগুলো বুঝতে সক্ষম হবে না; এবং নির্বাণ লাভের প্রচেষ্টায় তৎপর না হয়ে সংসারের অনিত্য, অস্থায়ী সুখ লাভের প্রত্যাশী হবে। এবার পূজ্য বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করেন-বৌদ্ধধর্মের এই পারমার্থিক উপদেশ বা সত্যসমূহ কে বুঝতে সক্ষম হবে? পুরুষেরা নাকি মহিলারা? অনেক মহিলা তো আমার নিকট এসে বলতেছে ‘ভন্তে, আমরা মহিলারাই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারব। পুরুষেরা মদ খায়, জুয়া খেলে এবং বিহারে আসে না। কাজেই আমরা মহিলারাই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারব, পুরুষেরা পারবে না। অন্যদিকে, পুরুষেরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ ভিক্ষু-শ্রামণ হয়ে অল্প কিছু দিন অবস্থান করার পর প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে আবার সংসারী হয়ে যায়, যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে আপনি প্রব্রজ্যা প্রদান করে দেখেন আমরা কখনো প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে সংসারী হয়ে যাবো না। প্রব্রজিত অবস্থায় আমরা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করব বা প্রত্যক্ষ করতে পারব। বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদের দিকে দৃষ্টি ফেরায়ে বলেন, মহিলাদের কথা মতে তোমরা পুরুষেরা অজ্ঞানী আর মহিলারা জ্ঞানী। তারা বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারবে, তোমরা বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারবে না। বনভন্তে এবার পুরুষদের দিকে দৃষ্টি ফেরায়ে প্রশ্ন করে বলেন, এই কথাটি কি ঠিক? (ভন্তে, একাধিকবার প্রশ্নটি করতেই থাকেন, এদিকে পুরুষেরা সলজ্জভাবে মাথা নাড়াতে থাকে) তোমাদেরকে মহিলারা কি বলতেছে? হ্যাঁ ভন্তে, বর্তমান অবস্থায় মহিলাদের এ দাবি অনেক ক্ষেত্রে ঠিক, ‘তারা মহিলারা জ্ঞানী আর আমরা পুরুষেরা অজ্ঞানী। আমরা বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারছি না, তারাই বৌদ্ধধর্ম বুঝতে পারবে’-অনেকটা অস্বস্তির স্বরে উত্তর দিল দায়কবৃন্দ। বনভন্তে বললেন, মহিলাদের কথাগুলোর অর্থ অনুসারে সেরূপ হয়। তবে সেটা সঠিক নয়। (ভন্তের এ কথার সঙ্গী সঙ্গে পুরুষদের মুখে সহাস্যভাব

পরিষ্কৃত হয়) যার মনচিন্তে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞানী। আর যার মনচিন্তে জ্ঞান থাকে না সে অজ্ঞানী। পুরুষের মনচিন্তে যেমন জ্ঞান থাকতে পারে তেমনি মহিলার মনচিন্তেও জ্ঞান থাকতে পারে। আবার পুরুষের মনচিন্তেও জ্ঞান না থাকতে পারে, মহিলার মনচিন্তেও জ্ঞান না থাকতে পারে। সুতরাং যে সব পুরুষের মনচিন্তে জ্ঞান থাকবে তারা জ্ঞানী, আর যে সব পুরুষের চিন্তে জ্ঞান থাকবে না তারা অজ্ঞানী। অপরদিকে যে সব মহিলার মনচিন্তে জ্ঞান থাকবে তারা জ্ঞানী আর যে সব মহিলার মনচিন্তে জ্ঞান থাকবে না তারা অজ্ঞানী। শুধুমাত্র পুরুষ মহিলা পরিচয়ে কেহ জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হতে পারে না। বনভন্তে আবারো বলেন, বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানীর ধর্ম। যাদের জ্ঞান থাকবে তাদের পক্ষে এ'ধর্ম বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। কিন্তু যাদের জ্ঞান থাকবে না তাদের পক্ষে এ'ধর্ম বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। জ্ঞানীরা এ'ধর্ম বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় বলে তারা পরম সুখ নির্বাণ লাভের অধিকারী হন। আর অজ্ঞানীরা এ' ধর্ম বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় না বলে তাদের দুঃখ ভোগ করা ছাড়া অন্য গতাস্তর থাকে না। এখন তোমরা নিজেরাই নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ, তোমরা আসলে জ্ঞানী নাকি অজ্ঞানী। মনে রাখবে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদের ইহ-পর উভয়কালে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই তোমরা সবাই জ্ঞানী হয়ে যাও। তাহলে বৌদ্ধধর্ম বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আর ইহ-পর কোন কালেই দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

তিনি আরো বলেন-ঢাকা হতে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করেছিল; 'ভন্তে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা ভালো নাকি খালেদা জিয়া ভালো হবে'? আমি তাদেরকে বলেছিলাম-শেখ হাসিনা ভালো আর খালেদা জিয়া খারাপ এ' রকম নয়। যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকবে সে ভালো এবং যার চিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকবে না সেই খারাপ। শেখ হাসিনার চিন্তে যদি জ্ঞান থাকে শেখ হাসিনা ভালো আর যদি শেখ হাসিনার চিন্তে জ্ঞান না থাকে তাহলে শেখ হাসিনা খারাপ। অন্যদিকে, খালেদা জিয়ার চিন্তে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে খালেদা জিয়া ভালো আর যদি খালেদা জিয়ার চিন্তে জ্ঞান না থাকে তাহলে খালেদা জিয়া খারাপ। ভালো, খারাপ চিনতে হলে দেখতে হবে তাদের চিন্তে জ্ঞান আছে, কি নাই। যদি জ্ঞান থাকে ভালো, আর যদি জ্ঞান না থাকে খারাপ। শুধুমাত্র শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার বেলায় নয়। তোমাদের মধ্যেও যার চিন্তে জ্ঞান থাকবে সেই ভালো এবং যার চিন্তে জ্ঞান থাকবে না সেই খারাপ বলে পরিগণিত হবে। চেহারা দেখে 'অমুক ভালো', 'অমুক খারাপ' বলে বিচার করা যায় না বা বলা যায় না। কোন মানুষটি ভালো, আর কোন মানুষটি খারাপ, সেটা বিচার করতে হলে তাদের জ্ঞানকে বিচারের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে

হবে। জ্ঞানের মাধ্যমেই একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয়ের প্রমাণ মিলে যায়; আসলে সে ভালো নাকি খারাপ? মনে রাখবে, যে কোন ব্যক্তির চিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে সে ভালো হবেই; আর চিন্তের মধ্যে জ্ঞান না থাকলে সে খারাপ হতে বাধ্য। তাই তোমাদেরকেও আমি আন্দাজ করে ভালো, নাকি খারাপ তা বলতে পারছি না। আগে দেখতে হবে তোমাদের চিন্তে জ্ঞান আছে কি নেই। যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা ভালো আর যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে তোমরা খারাপ। পূজ্য বনভন্তে সন্ত ও প্রসিতের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে বলেন, এদের চিন্তে জ্ঞান নেই বলে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি, মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনির মত আত্মঘাতী কর্মে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের চিন্তে যদি জ্ঞান থাকত, তারা কিছুতেই এসব খারাপ, অন্যায় কাজ সম্পাদন করতে পারত না। কাজেই তারা খারাপ; তাদেরকে কোনক্রমে ভালো বলা যায় না। বনভন্তে দায়ক দায়িকাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন-তাদেরকে ভালো বলা যায় কি? না ভন্তে, তাদেরকে ভালো বলা যায় না। তারা খারাপ লোকেরই পর্যায়ভূক্ত। অন্যদিকে, যারা পঞ্চাশীলাদি লঙ্ঘন করতেছে, অকুশল পাপকর্ম সম্পাদনে রত রয়েছে তাদেরকেও অজ্ঞানী বলেই জানবে। কারণ অজ্ঞানী ব্যক্তির স্বীয় অজ্ঞানতাবশতঃ অকুশলকর্ম সম্পাদন করতে পারে; পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জা, ভয়শূন্য হয়। তারা সত্যপথ ভ্রষ্ট এবং সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে। তজ্জন্য তারাও খারাপ বলে বিবেচিত হয়। সেরূপ খারাপ বা অজ্ঞানী ব্যক্তির কিছুতেই ভালো কাজ করতে সমর্থ হয় না। তারা সব সময় ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো মনে করতঃ খারাপ পথেই চালিত হয়। সুতরাং সেই সকল খারাপ ব্যক্তি হতে বহু দূরে সরে থাকবে। তাদের সংসর্গে দুঃখ-দুর্দশা, উপদ্রবই ভোগ করতে হয়; সুখ শান্তি, উন্নতি লাভের কোন অবকাশ নেই।

তোমরা জ্ঞান ও কুশলের সহিত অবস্থান কর। জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে তোমাদের সুখ লাভ হবে এবং কুশলকর্ম সম্পাদন করলে সব সময় উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি হতেই থাকবে। তোমরা আমার কথামত চলে দেখো, তাহলে দেখবে তোমাদের কি প্রভূত উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধিই না সাধিত হচ্ছে। আমি কি বলি জ্ঞান? তোমাদের যাতে সুখ, শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়; সেরূপ কর্মই তোমরা সম্পাদন করবে মাত্র। আর যে কর্ম সম্পাদন করলে দুঃখ, অশান্তি, অবনতি, নিঃসঙ্গামী হতে হয় সেগুলো সম্পাদন করা থেকে দূরে থাক, একেবারে ভুলেই যাবে। আমার সাথে বলা “আমরা অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করব না, জ্ঞানের সহিত অবস্থান করব। অজ্ঞানকে দর্শন করব না, জ্ঞানকেই দর্শন করব। এতে আমাদের পরম সুখ লাভ হবে”। মনে রাখবে, যদি তোমরা অজ্ঞানের সহিত অবস্থান কর, অজ্ঞানকে দর্শন কর তাহলে দুঃখ পাবে। তোমরা লোভ,

হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণার সহিত কোন কার্য করবে না; কোন বাক্য বলবে না; কোন চিন্তা করবে না। কারণ লোভের সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে প্রেতকূলে পতিত হতে হয়। হিংসার সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে নরকে পতিত হতে হয়। অজ্ঞানের সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে পশু-পক্ষীকূলে পতিত হতে হয়। তৃষ্ণার সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে বিভিন্ন যোনিতে পুনর্জন্ম হতে হয়। প্রেতকূলে পতিত হওয়া দুঃখজনক, নরকে পতিত হওয়া দুঃখজনক, পশু-পক্ষীকূলে জন্মগ্রহণ করা দুঃখজনক এবং বিভিন্ন যোনিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা দুঃখজনক। এসব ঘোরতর দুঃখপূর্ণ স্থানে পতিত হয়ে যাতে দুর্বিষহ দুঃখ যাতনা ভোগ করতে না হয়; তজ্জন্য লোভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করবে না। মনে রাখবে, প্রেতকূলে পতিত না হওয়া সুখজনক, নরকে পতিত না হওয়া সুখজনক, পশু-পক্ষী কূলে জন্ম না নেওয়া সুখজনক, বিভিন্ন যোনিতে পুনর্জন্ম না হওয়া সুখজনক। এতে লৌকিক লোকান্তর সুখ অর্জিত হয়।

পরিশেষে তিনি বলেন-ভগবান বলেছেন, আমার শাসন নির্বাণমুখী। অর্থাৎ যারা একান্তভাবে ইচ্ছা করে যে, ‘আমি নির্বাণ লাভ করব’ তাদেরকে এই একটি মাত্র লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে হয়। স্বর্গ কিংবা ব্রহ্মলোককে লক্ষ্য রেখে নয়। বৌদ্ধধর্মের পরম ও চরম অবস্থা হল নির্বাণ। এখানে নির্বাণ লাভকে প্রকৃত মোক্ষ লাভের উপায় বলা হয়। তাই এ ধর্মে স্বর্গ কিংবা ব্রহ্মলোক লাভের জন্য নয়, নির্বাণ লাভের জন্য উপদেশ দেয়া হয়। সে জন্য আমিও তোমাদেরকে নির্বাণ লাভের রাস্তা দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য, মার্গসত্য দেশনা করে থাকি। আচ্ছা, তোমরা এ দেশনা বুঝতে পারছ কি? বুঝতে না পারলে তো নির্বাণ যেতে চাইবে না। উপমা কথা-ধর, রাস্তামাটি বাস স্টেশন হতে ঢাকাগামী কোন বাস যাত্রী ভর্তি অবস্থায় ছেড়ে দিল। এবং ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। একে একে ঘাগড়া, রাণীর হাট, হাট হাজারী, চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, কুমিল্লা.....অতিক্রম করে চলছে। এদিকে যাত্রীরা ঘাগড়ায় কিছু সংখ্যক, রাণীরহাটে কিছু সংখ্যক, হাট হাজারীতে কিছু সংখ্যক, চট্টগ্রামে কিছু সংখ্যক, সীতাকুণ্ডে কিছু সংখ্যক, কুমিল্লায় কিছু সংখ্যক নেমে যেতে যেতে ঢাকার নিকটবর্তী এসে দেখা গেল সব যাত্রীরা নেমে গেছে। কেহই ঢাকা পর্যন্ত আসেনি। ড্রাইভার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে গাড়ীতে আর কোন যাত্রী নেই, পুরো বাসই খালী। এবার বনভন্তে বলেন-আচ্ছা, যাত্রীরা কেন ঢাকা পৌছার আগে নেমে গেছে? তারা ঢাকা যাওয়ার জন্যেই কি গাড়ীতে উঠেনি? নাকি ঢাকা যাওয়ার মত ভীড়া নেই বলে তারা নেমে গেছে? এখানেও ঠিক তদ্রূপ, আমি হলাম সেই বাসের ড্রাইভার, তোমরা হলে যাত্রী। আমি যে, তোমাদেরকে

ধর্মদেশনা দিতেছি; এটা কি জ্ঞান? এটা হল, আমি ঢাকারূপ নির্বাণের উদ্দেশ্য করে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছি। আর তোমরা যে ধর্মদেশনা শ্রবণ বা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেছ; এটা হল, নির্বাণ যাওয়ার জন্য গাড়ীতে উঠেছ বা যাত্রী হয়েছে। তবে আমার অবস্থাও সেই ড্রাইভারের মতন হতে চলেছে। আমি তোমাদেরকে পরম সুখ নির্বাণ লাভের উপদেশ দিতেছি, নির্বাণ লাভের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিতেছি আর তোমরা কিনা শুধুমাত্র মনুষ্য সুখ, স্বর্গ সুখ লাভের প্রত্যাশী হয়ে কেবল কিছু কিছু দান দিয়েই সন্তুষ্ট থাকছ; শীল-ভাবনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। এগুলো ঢাকাগামী বাসে উঠে রাণীর হাট, হাট হাজারী, চট্টগ্রামে নেমে যাওয়ার সামিল হচ্ছে। তা নয় কি? হ্যাঁ, ভুলে তা' হচ্ছে। আমার কথা হল তোমরা যখন নির্বাণগামী গাড়ীতে উঠেছ, নির্বাণ না পৌছা পর্যন্ত নামবে না। এভাবে যদি মাঝপথে নেমে যাও তাহলে নির্বাণ পৌছা তো সম্ভব হবে না। তবে এখানেও কথা আছে, গাড়ী করে ঢাকা যেতে হলে যেমন প্রথমে ভাড়া যোগাড় করে নিতে হয়, ভাড়া ছাড়া ঢাকা যাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি নির্বাণ যেতে হলেও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান না থাকলে কেহ ইচ্ছা করলেও নির্বাণ যেতে পারবে না। তোমাদেরও নির্বাণ যাওয়ার মত জ্ঞান নেই বলে মাঝপথে নেমে যাচ্ছ। তাই তোমরা জ্ঞান অর্জন করতে সদা তৎপর থাক। জ্ঞান অর্জিত হলে তবেই নির্বাণ যেতে পারবে।

তোমরা সংসারমুখী না হয়ে নির্বাণমুখী হয়ে অবস্থান কর। সংসারমুখীকে বলা হয় সংসার গতি আর নির্বাণমুখীকে বলা হয় নির্বাণ গতি। সংসার গতি হল সুখের বিপরীত দিক; এই গতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিপদজনক। নির্বাণ গতি হল যথার্থ দিক; এই গতি নির্ভয় ও বিপদশূন্য। তাই আমি বলি কি জ্ঞান? তোমরা সবাই সংসার গতি না হয়ে নির্বাণ গতি হয়ে অবস্থান কর। তোমরা যদি অজ্ঞানের সহিত অবস্থান না করে জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর, মিথ্যাধর্ম পরিহার করে সত্যধর্ম অনুশীলন কর; তাহলে নির্বাণ গতি প্রাপ্ত হবে। আর যদি অজ্ঞানের সহিত অবস্থান কর, মিথ্যাধর্ম অনুশীলন কর; তাহলে সংসার গতি হয়ে অবস্থান করতে হবে। নির্বাণ গতি প্রাপ্ত হতে পারবে না। তাই আবারো বলছি, সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর, যাবতীয় অকুশল পাপ হতে নিজেকে বিরত রাখ। পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল হও। তাহলে তোমাদের ইহকাল পরকাল উভয়কালই পরম সুখের হবে।

সাধু, সাধু, সাধু।

শক্তি ছাড়া কোন কাজে সফলকাম হওয়া যায় না

এক সময় পরম পূজ্য অরহত শ্রাবক বুদ্ধ বনভন্তে মহোদয়ের আবাসিক ভবনের দোতলায় চাকমা রাজ পরিবার কর্তৃক বুদ্ধমূর্তি দান, সজ্ঞদান, অষ্ট পরিষ্কার দানের পুণ্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, রাজমাতা আরতি রায়, রাজকুমারী চন্দ্রা রায়, রাজকুমারী ত্রয়া রায় সহ রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তখন উপস্থিত ছিলেন। দানোৎসর্গ শেষে শ্রাবক বুদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের সকাশে চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় একটি বিশেষ প্রার্থনা (চাকমা ভাষায় রচিত) পাঠ করেন এবং রাজমাতা আরতি রায় ফুলের প্লেট দ্বারা অনুমোদন যাচঞা করেন। তারপর পূজ্য বনভন্তে ধর্মদেশনা প্রদান আরম্ভ করেন। তিনি বলেন—বৌদ্ধধর্ম হল লোভ, হিংসা, অজ্ঞান পরিত্যাগ করা। দানের দ্বারা লোভ পরিত্যাগ, শীল পালনের দ্বারা হিংসা পরিত্যাগ এবং ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা অজ্ঞান পরিত্যাগ করতে হয়। লোভ পরিত্যাগই সুখ, হিংসা পরিত্যাগই সুখ, অজ্ঞান পরিত্যাগই সুখ। মনচিন্তের মধ্যে লোভ বিদ্যমান থাকলে দুঃখ, হিংসা বিদ্যমান থাকলে দুঃখ, অজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে দুঃখ। অন্যদিকে লোভ, হিংসা, অজ্ঞানের সহিত এ' ধর্ম আচরণ করা যায় না। এবং আচরিত হলেও তা' প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম হয় না। ভগবান বুদ্ধ গৌতমীকে বলেছিলেন—হে গৌতমী! এ' ধর্ম লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত এবং অজ্ঞানমুক্ত। তোমরা লোভ, হিংসা অজ্ঞানের সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে প্রেতকূলে জন্ম নিতে হবে। হিংসার সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে নরকে পতিত হতে হবে। অজ্ঞানের সহিত কোন কার্য-বাক্য-চিন্তা করলে পশু-পক্ষী কূলে জন্ম নিতে হবে। একইভাবে তোমরা লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত, অজ্ঞানমুক্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হবে কি? আমি নিজে লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত, অজ্ঞানমুক্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হলেও তোমাদেরকে তো সে পর্যায়ে উন্নীত করাতে পারছি না। তজ্জন্য খুব বেশি ধর্মদেশনা প্রদান করতে এবং ফাং-এ যেতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি সারারাত এই চেয়ারটিতে বসেই থাকি, ঘুমাই না। তখন বসে বসে তোমাদের চিন্তাচার, কাজ-কর্ম, চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করি। আর সে সময় তোমাদের, এখানকার জনসাধারণের, বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব, সব কিছু আমার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বর্তমানে তোমরা 'আমারটা নিল, আমারটা হারলাম, আমায় মারল, আমায় বিনষ্ট করল' এই চিন্তা করে করে দুঃখ পাচ্ছে। আমি একটা কথা বলি—জুন, পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কাশী রাজার রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং

ধর্মমতে প্রজা পালন করতে থাকেন। তিনি কোন প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না, সৈন্যদলকে কারোর সহিত যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতেন। অন্য একরাজা শুনল যে, কাশীরাজা নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। কিছুতেই সে যুদ্ধ করেন না। তখন সে কাশীরাজ্যকে অধিকার করার জন্য তার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করল। রাজধানীর দ্বারদেশে এসে দূত পাঠিয়ে কাশীরাজ বোধিসত্ত্বকে সংবাদ দিল—হয় যুদ্ধ কর, না হয় রাজ্য ছেড়ে দাও। কাশীরাজ বোধিসত্ত্বের সৈন্যদল এ সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি চাইতে লাগল রাজার নিকট। অমাত্যগণও যুদ্ধ করার পরামর্শ দিল। কিন্তু রাজা যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকতেই আদেশ করল। এ দিকে শত্রুরাজা বিনা বাধায় সৈন্যবাহিনী সহ সোজা রাজসভায় এসে বোধিসত্ত্ব ও তার অমাত্যদের সবাইকে বন্দী করল। আর নির্দেশ করে, এদের পিঠমোড়া করে বেঁধে শম্মানে নিয়ে যাও। সেখানে গর্ত খুঁড়ে গলা পর্যন্ত পুঁতে ফেলে এসো। রাতে শেয়াল, কুকুর এসে এদের খেয়ে ফেলবে। ভৃত্যেরা রাজা বোধিসত্ত্ব সহ তার অমাত্যদের সেভাবেই ফেলে আসলো। ধর্মপরায়ণ, ক্ষান্তিবাদী রাজা বোধিসত্ত্ব এ দশায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও অমাত্যদিগকে বললেন—“বন্ধুগণ, হৃদয়ে মৈত্রীভাব পোষণ কর, হিংসাতাব আনয়ন করবে না”। অবশেষে সেই শম্মানে অবস্থানরত যক্ষের সাহায্যে নিজের রাজ্য ফিরে পায়। এদিকে শত্রুরাজা নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়। আর কাশীরাজের গুণকীর্তন করে করে ঘোষণা দেয়—মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ধর্মমতে প্রজাপালন করে যান। আজ হতে এ রাজ্যের বিদ্রোহীদের দমন করার ভার আমি নিলাম। অতঃপর রাজা বোধিসত্ত্বকে যথাযথ সম্মান জানায়ে নিজ রাজ্যে চলে যান। এইভাবে অশ্রমে মৈত্রীর প্রভাবে রাজা বোধিসত্ত্ব স্বীয় রাজ্য ফিরে পেয়ে ধর্মমতে রাজ্য শাসন করার পর দেহান্তে দেবলোকে গমন করেন। তোমরাও কি সেরকম অহিংসা নীতি অবলম্বন করতে পার না? বর্তমানে সম্ভ্র, প্রসিতেরা হিংসামূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে পড়েছে। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি হানাহানি, খুনাখুনি আরম্ভ করেছে। এতে কে লাভবান হচ্ছে তা’ কি চিন্তা করতে পারছে না? তদুপরি তোমাদের যে অবস্থা তাতে ধর্মনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার উপায় অবলম্বন করা ছাড়া অন্য পথ নেই। শক্তি প্রয়োগ করার মত তোমাদের কি আছে? শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে ভীমরুলের বাসায় টিল নিক্ষেপ করার মতন হবে সার। শুধু শুধু কামড় খাবে, কিছু লাভ হবে না।

শক্তি ছাড়া কোন কাজে সফলকাম হওয়া যায় না। শক্তি সকল কাজকে এগিয়ে নেয়ার বা পূর্ণতা এনে দেয়ার পূর্বশর্ত। সেই শক্তি কি রকম? শক্তিকে আমি সাত ভাগে ভাগ করে থাকি। যথা—রাজশক্তি, অস্ত্রশক্তি, জনশক্তি,

কর্মশক্তি, মারশক্তি, ধ্যানশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। তোমরা ধ্যান ও জ্ঞানশক্তি অর্জনে সচেষ্ট থাক। কেবলমাত্র এই দু'টি শক্তি পুণ্য, বাকী পাঁচটি শক্তি পাপ বলে জানবে। অন্যদিকে, এ দু'টি শক্তির কাছে অপর সব শক্তি পরাজিত হতে বাধ্য। এমনি এই দু'টি শক্তিকে আর পাঁচটি শক্তি একত্রে আক্রমণ করলেও পেরে উঠতে পারবে না। তোমরা সেই ধ্যানশক্তি এবং জ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান হলে সর্বদিকে জয়যুক্ত হতে পারবে। পুণ্যশক্তির নিকট পাপশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই পুণ্যশক্তি ইহকাল-পরকাল উভয়কালের জন্য সুখ আনায়ন করে।

বনভন্তে আরো বলেন—বৌদ্ধধর্মের মতে প্রকৃত সুখ পেতে হলে কারোর সাথে প্রিয়-প্রেম-ভালোবাসা করা যায় না। কারোর সাথে প্রিয়-প্রেম-ভালোবাসা করলে পাপ হয়, দুঃখ পেতে হয় এবং মুক্ত হওয়া যায় না। কারোর প্রতি যাদের প্রিয়-প্রেম-ভালোবাসা নেই, তারাই প্রকৃত সুখী এবং সর্ব দুঃখ থেকে বিমুক্ত হন। মনে রাখবে, প্রিয়-প্রেম-ভালোবাসা হতে যাবতীয় দুঃখ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে, প্রিয়-প্রেম-ভালোবাসা বিহীন ব্যক্তির কোন দুঃখ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হয় না। আবার প্রিয় যেমন দুঃখ তেমনি অপ্রিয়ও দুঃখ, প্রিয় যেমন পাপ তেমনি অপ্রিয়ও পাপ। যাদের নিকট প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নেই বা যারা প্রিয় অপ্রিয় থেকে মুক্ত তারা নির্বাণ লাভে সক্ষম। বনভন্তে প্রশ্ন করে বলেন—তোমাদের মধ্যে কে প্রিয় অপ্রিয় থেকে মুক্ত হতে পারবে বল? যে প্রিয় অপ্রিয় থেকে মুক্ত হতে পারবে সে নির্বাণ লাভে সমর্থ হবেই। বনভন্তে আবারো প্রশ্ন করে বলেন—পারবে কি? রাজকুমারীদ্বয় বললেন—ভন্তে, পারি মতো আশীর্বাদ করুন। এবার বনভন্তে বলেন, আমার সাথে বলো “প্রিয় যেমন পাপ, অপ্রিয়ও তেমনি পাপ। প্রিয় যেমন দুঃখ, অপ্রিয়ও তেমনি দুঃখ। যাদের প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নেই তারাই নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।” বুঝতে পেরেছ তো? ‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে রাজপরিবারের সদস্যগণ উত্তর দেয়। বনভন্তে বললেন, চেষ্টা করে দেখো; যদি প্রিয় অপ্রিয় থেকে মুক্ত হতে পার তাহলে নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে।

তোমরা কোন জীবকে হিংসা করবে না। সকল জীবের প্রতি অহিংসক হয়ে অবস্থান করলে সুখ লাভ হয়। আমার সাথে বলো “কোন জীবকে হিংসা করব না, কারোর ক্ষতিসাধন করব না, উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ করব, কারোর সাথে অন্যায় আচরণ করব না, কারোর সহিত শত্রুতাভাব পোষণ করব না।” তাহলে পরম সুখে অবস্থান করতে পারবে।

বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষুরা ছিলেন অনাগামী, অরহত আর দায়ক-দায়িকারা ছিলেন শ্রোতাপন্থি, সকৃদাগামী। ফলে উভয়ে পরম সুখের সহিত এবং নিষ্কলঙ্কভাবে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক ভিক্ষু ও গৃহী

দুঃশীলতা, দুর্নীতি, অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করতেছে। এতে করে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্মকে হয়ে, নিন্দা করতে সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে, ভিক্ষু ও গৃহীরা দুঃশীলতা আচরণ করে উভয়ে দুঃখ পাচ্ছে; অবনতি, অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে নিজকে তথা ধর্মকে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা দূরে থাক পরিহানিই করতেছে। তাই আমি কি বলি জ্ঞান? বুদ্ধের সময়কালীন ভিক্ষু ও গৃহীরা যেক্রপ আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, আদর্শ মেনে চলেছিল আমরাও যেন সেক্রপ আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি মেনে চলি। তাহলে আমরাও পরম সুখের সহিত নিষ্কলঙ্কভাবে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে সক্ষম হবো। এতে নিজের এবং ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে; কখনো পরিহানি, অবনতি হবে না। তোমরা সেই সব আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, আদর্শ অনুসরণ অনুকরণ করতে সমর্থ হবে কি? তজ্জন্য চাই জ্ঞান। তোমাদের মনচিন্তে জ্ঞান থাকলে পারবে আর জ্ঞান না থাকলে পারবে না। আমার সাথে বলো ‘আমাদের মনচিন্তে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে পারবো। আর যদি মনচিন্তে জ্ঞান না থাকে তাহলে পারবো না।’ আমি বনভন্তে পেরেছি; এবার তোমরা চেষ্টা করে দেখ। যদি পার তাহলে পরম সুখের অধিকারী হতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা যদি মনে মনে অজ্ঞানের বিষয় চিন্তা কর তাহলে মনচিন্তের মধ্যে অজ্ঞান উদয় হবে এবং সহসা পুরো মনচিন্তকে অজ্ঞানে গ্রাস করে ফেলবে। তখন মনচিন্তের মধ্যে জ্ঞান থাকতে পারবে না। সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনচিন্ত দ্বারা তোমাদেরকে সর্বদা দুঃখ যাতনা ভোগ করতে হবে। কারণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিন্ত মিথ্যা, অন্যায়, অকুশলকর্মের দিকে ধাবিত হয়। অজ্ঞান চিন্তকে এমনভাবে কলুষ চেতনায় ভরে তোলে যে, তখন সত্য, ন্যায় ও কুশলের দিকে ফিরে আসা সুকঠিন হয়ে পড়ে। তাই তোমাদেরকে মনে মনে অজ্ঞানের চিন্তা করা হতে বিরত থাকতে হবে। এবং যেগুলো মিথ্যা, অন্যায়, অসৎ, অধর্ম বিষয় সেগুলো সযত্নে পরিহার করতে হবে। মনে রাখবে, এই চিন্ত পরিশুদ্ধি কাজে নিজকে নিজেই উদ্যোগী হতে হয়। আমি তোমাদেরকে কিভাবে চিন্ত পরিশুদ্ধ করতে হয় তা’ বলে দিতে পারব মাত্র। চিন্ত পরিশুদ্ধ করার কাজটুকু তোমাদেরকেই করে যেতে হবে। এখানে অপরের হাত সামান্য মাত্র। কি পারবে বলে মনে হচ্ছে? তবে হ্যাঁ, এ কাজটি সহজ নয়; খুব কঠিন। আবার অসাধ্যও নয়-যদিও সকলে পারে না। অন্যদিকে বুদ্ধ বলেছেন, এই সংসার অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখানে অল্প সংখ্যক লোকই সত্য দর্শনে সমর্থ হয়। আর অল্প লোকই জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় স্বর্গে যেতে পারে। বনভন্তে বলেন, বর্তমানে আমি তো দেখতেছি শতকরা বড়ো জোর দুইজন কি তিনজন স্বর্গে যেতে পারতেছে; বাকীরা সবাই নিরয়গামী হচ্ছে। কাজেই তোমরা সাবধানে থাক,

যথাসম্ভব কুশলকর্মে নিয়োজিত থাকতে চেষ্টা কর।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা বেয়াদবি করবে না। বেয়াদবি কোন কাজ করবে না, বেয়াদবি কোন কথা বলবে না। বেয়াদবি কাজ করলে, বেয়াদবি কথা বললে মুক্ত হতে পারবে না, বরং নিরয়ে পতিত হবে। আমার সাথে বলা 'আমরা বেয়াদবি কোন কাজ করব না, বেয়াদবি কোন কথা বলব না। বেয়াদবি কাজ করলে, বেয়াদবি কথা বললে মুক্ত হতে পারব না'। বেয়াদবি না করা অর্থ লোভ, হিংসা, অজ্ঞান না করা। লোভ করাকে বেয়াদবি করা বুঝায়, হিংসা করাকে বেয়াদবি করা বুঝায় এবং অজ্ঞান করাকে বেয়াদবি করা বুঝায়। লোভ না করলে বেয়াদবি করা হবে না, হিংসা না করলে বেয়াদবি করা হবে না, অজ্ঞান না করলে বেয়াদবি করা হবে না। তোমরা লোভ, হিংসা, অজ্ঞান না করে বেয়াদবি কাজ করা বন্ধ কর, বেয়াদবি কথা বলা বন্ধ কর। এভাবে বেয়াদবি কাজ, বেয়াদবি কথা বন্ধ করে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট থাক। এতে নিরয়ে পতিত হবার সকল সম্ভাবনা নিরুদ্ধ হয়। তখন পরম সুখের অধিকারী হওয়া যায়। লৌকিক ও লোকান্তর সুখ বর্জিত হয়। তোমরা সেই রকম সুখ লাভের চেষ্টা কর।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা দুঃখ পেলে অপরের অনিষ্ট কামনা করবে না

এক সময় পরম পূজ্য অর্হৎ বনভক্তে মহোদয় রাজবন বিহার দেশনালায়ে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-সুখ দুই প্রকার, স্বল্প সুখ ও বিপুল সুখ। তোমরা স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করতঃ বিপুল সুখের প্রত্যাশী হয়ে অবস্থান কর। যাদের জ্ঞান থাকে বা যারা জ্ঞানী তারা স্বল্প সুখ ত্যাগ করে বিপুল সুখের প্রত্যাশী হয়। কিন্তু যারা অজ্ঞানী, মূর্খ তারা স্বল্প মাত্র সুখ ত্যাগ করতে পারে না। বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন-যদি স্বল্প মাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে সামান্য সুখ ত্যাগ করবে। মারভুবনে ধর্ম করলে যেই সুখ হয় তা' স্বল্প সুখ। তোমরা সেই স্বল্প বা সামান্য সুখ করতে গিয়ে অধিক পরিমাণ দুঃখ ভোগ করতেছ। মারভুবনে শতকরা একভাগ মাত্র সুখ বাকী নিরানব্বই ভাগ দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেই দুঃখে একে অপরের সহিত ঝগড়া-কলহ, হিংসাহিংসি, রেষারেষি, মারামারি সহ নানা অনাচার-অত্যাচারাদি, অপকর্মে নিয়োজিত রয়েছ। বিপুল সুখ কাকে বলে? অমরভুবন বা নির্বাণরাজ্যকে বলা হয় বিপুল সুখ। নির্বাণরাজ্যে গেলে বিপুল

সুখ উপলব্ধি হয়। সেই সুখের চ্যুতি বা মরণ নেই-তা' অমর। অন্যদিকে, মাররাজ্যের সামান্য সুখ করলে দুঃখ পেতে হয়, মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই আমি বলি কি জান? তোমরা মাররাজ্যের সেই সামান্য সুখ করবে না। সামান্য সুখ করলে তোমাদেরকে বর্ণনাভীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। সংসারের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের দুঃখে জর্জরিত হয়ে থাকে তোমাদের জীবন। স্বামী-স্ত্রীতে দুঃখ, পিতা-পুত্রে দুঃখ, মাতা-কন্যায় দুঃখ, ভাইয়ে-ভাইয়ে দুঃখ, বোনে বোনে দুঃখ, পাড়া-প্রতিবেশীতে দুঃখ, আত্মীয়-স্বজনে দুঃখ, বন্ধু-বন্ধুতে দুঃখ ভোগ করতে হয়। কি ঠিক বলেছি তো? হ্যাঁ, ভন্তে ঠিক। একরূপেই দুঃখ পেয়ে চলছি। তোমরা সামান্য সুখ করতে গিয়েই এই দুঃখগুলো পাচ্ছে। তোমরা হয়ত মনে করতেছ আমরা গরিব বলে এ'দুঃখগুলো পাচ্ছি, ধনী লোকেরা সুখেই রয়েছে, তাদের দুঃখ নেই। আবার, অনেকেই বলে ধনী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যেমন-জাপানীরা, আমেরিকানরা সুখেই আছে, তাদের কোন প্রকার অভাব-অনটন, অপ্রাপ্তি.....দুঃখ নেই। তারা কতোই না সুখে রয়েছে। আমাদেরকে যতো দুঃখ পেতে হচ্ছে। কিন্তু এসব কথা মোটেই ঠিক নয়। তাদেরকে হয়ত তোমাদের মতন অভাব-অনটনের দুঃখ পেতে হচ্ছে না, তাই বলে তারা কিছুতেই দুঃখের অতীত নন। তারাও দুঃখের মধ্যেই রয়েছে। দুঃখের ধরণগুলোর মাঝে ভিন্নতা রয়েছে, এটুকু মাত্র তফাৎ। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মারডুবনের মধ্যে থাকলে দুঃখ অনিবার্য। মাররাজ্যের মধ্যে অকুশলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে তোমরা যে, কলহ-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি করতেছ সেগুলো কি জান? সেগুলো পাপের সুখ। অকুশলকর্ম সম্পাদনের ফলে যে সাময়িক ও সামান্য সুখের প্রতীতি জন্মে তা' পরমুহর্তে অশেষ দুঃখে পরিণত হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তির সাময়িক সুখের লোভ সংবরণ করতে না পেরে অকুশলকর্ম সম্পাদন করতঃ নিজের জন্য অশেষ দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি ডেকে আনে মাত্র। অজ্ঞানী ব্যক্তির এটা জানে না বলে সাময়িক সুখের লোভে পাপকর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু তারা যদি জানত যে এই সাময়িক সুখের পরিণামে তাদেরকে অশেষ দুঃখ যাতনা ভোগ করতে হবে তাহলে তারা সাময়িক সুখ করা হতে বিরত থাকত।

এবার বনভন্তে বলেন-তোমাদের সামান্য সুখ ভোগ করাটা কি রকম হচ্ছে জান? উপমা কথা-ধর, ঘরের কোন এক কোণায় একটি মধুপূর্ণ বাটি রয়েছে। এদিকে একদল পিঁপড়া খাবার খোঁজে গর্ত হতে বের হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মধুর গন্ধ পেল। সেই গন্ধ ধরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে বাটির সন্নিহিতে এসে পড়ল। আর বাটিপূর্ণ মধু দেখে মধু পান করার লোভ পেয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়াগুলো মধু পান করার জন্য লাইন ধরে একের

পর এক মধুবাটিতে ঝাঁপ দিতে লাগল। যেই পিঁপড়া মধু বাটিতে ঝাঁপ দিচ্ছে অমনি আর উঠে আসতে পারছে না, সেখানে তার মৃত্যু হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, পূর্বগামী পিঁপড়াগুলোর এই করুণ পরিণতি দেখেও পশ্চাদগামী পিঁপড়াদের ভয় জন্মত হচ্ছে না, ভাবোদয় হচ্ছে না। তারাও নির্ভীক চিত্তে মধু পান করার লোভে মধু বাটিতে ঝাঁপ দিচ্ছে আর প্রাণ হারাচ্ছে। ঠিক তদ্রূপ তোমরাও পিঁপড়াদের মতন সুখ করতে গিয়ে ইহকাল-পরকালের জন্য মহাদুঃখ, মহা অশান্তিই ডেকে আনতেছ। সেই সামান্য সুখের কারণে ইহকালে যেমন অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, তেমনি মৃত্যুর পরও চারি অপায়ে পতিত হয়ে বর্ণনাভীত দুঃখ ভোগ করতে হবে। বনভন্তে বলেন-আচ্ছা, পিঁপড়াদেরকে মধু বাটিতে ঝাঁপ না দেয়ার জন্য বারণ করা যাবে কি? ভন্তে, বারণ করা যাবে না। কারণ করলেও তারা তো বুঝতে পারবে না। আমিও তোমাদেরকে সেভাবেই বারণ করতে পারছি না। বারণ করলেও তোমরা বুঝতে পার না। যার ফলে তোমাদেরকে সামান্য সুখ ভোগ করা হতে বিরত রাখতে পারছি না। আবার, তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যে সাংসারিক জীবন-যাপন করতেছ এটাও সামান্য সুখ। সেই সামান্য সুখের পিছনে কতো প্রকার দুঃখ নিহিত রয়েছে তার অন্ত নেই। যেমন-স্বামী মরতে পারে, স্ত্রী মরতে পারে, পুত্র মরতে পারে, কন্যা মরতে পারে, পুত্রবধূ মরতে পারে, জামাই মরতে পারে, নাতি মরতে পারে, নাভনি মরতে পারে। পারে নয় কি? হ্যাঁ ভন্তে, পারে। আর তখন তো দুঃখ শোকের ইয়ত্তা থাকে না। আমি সেরূপ দুঃখ শোকে মূহ্যমান হয়ে বহু বৃদ্ধ লোককেও উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বিলাপ করতঃ ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছি।

পূজ্য বনভন্তে বলেন-নিজকে নিজে উদ্ধার করতে পারলে, নিজকে নিজে দমন করতে পারলে তবেই সুখ লাভ হবে। কিভাবে নিজকে উদ্ধার করতে হয়? ‘আমি আর কখনো পাপকে নিয়ে সুখ করব না’ বলে পাপ হতে বিরত থাকলে নিজকে উদ্ধার করা সম্ভব। পাপকে নিয়ে সুখ করলে নিজকে উদ্ধার করা যায় না। অহং মনোভাব নিয়ে কোন কিছু করলে, অপরের উপর কর্তৃত্ব খাটালে নিজকে দমন করা যায় না। অন্যদিকে বুদ্ধ বলেছেন, নিজে উদ্ধার হলে অপরকেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আর নিজে উদ্ধার হতে না পারলে অপরকে উদ্ধার করা কখনো সম্ভব নয়। আমার সাথে বলো “আমরা আর পাপকে নিয়ে সুখ করব না”। তা হলে নিজকে উদ্ধার করতে পারবে। কিভাবে পাপকে নিয়ে সুখ করবে না? প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ও নেশাদি দ্রব্য সেবন তথা পঞ্চশীল ভঙ্গ না করা সহ যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, অকুশলকর্ম সম্পাদন করা হতে নিজকে বিবৃত রেখে। এবং স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, নিয়ে সাংসারিক সুখ ভোগে প্রমত্ত না হয়ে। এভাবে পাপকে নিয়ে সুখ না করলে নিজকে উদ্ধার

করতে পারবে বলে জানবে। আমি বা অহংকার করা হতে বিরত থাকলে নিজকে দমন করা যায়। মনে রাখবে, নিজকে উদ্ধার ও নিজকে দমন করাই সুখ। নিজকে উদ্ধার এবং দমন করতে না পারলে দুঃখ পেতে হয়। আমি বনভন্তে নিজকে উদ্ধার, নিজকে দমন করতে পারছি বলে, পরম সুখের অধিকারী হয়েছি; আমার আর কোন দুঃখ নেই। তোমরা নিজকে উদ্ধার, নিজকে দমন করতে পারছ না বলে অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে রয়েছ। এক মুহূর্তকালও তোমাদের সুখ লাভ হচ্ছে না।

তোমরা কেন দুঃখ পাচ্ছে জান? তোমাদের লজ্জা নেই বলেই তোমরা দুঃখ পাচ্ছে। কি রকম লজ্জা? প্রাণীহত্যা করতে লজ্জা পাচ্ছে না। চুরি-ডাকাতি, সস্তাসী-মাস্তানী, চাঁদাবাজি-ছিনতাই করতে লজ্জা পাচ্ছে না। ব্যভিচার বা পরস্পর/পরকন্যা হরণ করতে লজ্জা পাচ্ছে না। মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ করতে লজ্জা পাচ্ছে না। মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সহ যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করতে লজ্জা পাচ্ছে না। কলহ-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি করতে লজ্জা পাচ্ছে না। অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতিমূলক, অকুশলমূলক কর্ম সম্পাদন করতে লজ্জা পাচ্ছে না। আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার আত্মীয়-স্বজন বলে মিথ্যা দাবি করতে লজ্জা পাচ্ছে না। এই সকল অলজ্জী কাজগুলো করতেছ বলে তোমরা দুঃখ পাচ্ছে, অশেষ দুঃখ ডেকে আনতেছ এবং দুঃখ হতে নিজকে বিমুক্ত করতে সমর্থ হচ্ছে না। আমার সাথে বলো ‘আমাদের লজ্জা নেই বলে আমরা দুঃখ পাচ্ছি’। তোমাদের লজ্জা নেই বলে তোমরা নির্বিধায় ‘আমার স্বামী’, ‘আমার স্ত্রী’, ‘আমার পুত্র’, ‘আমার কন্যা’, ‘আমার আত্মীয়-স্বজন’, ‘আমার ধন’, ‘আমার বাড়ী’, ‘আমার জায়গা-জমি’ বলতে থাক। আর সেই জন্য তোমাদেরকে কতো প্রকার দুঃখই না সহ্য করতে হচ্ছে। যদি তোমাদের লজ্জা থাকত তাহলে ‘আমার স্বামী’, ‘আমার স্ত্রী’,বলতে না। আর দুঃখ ভোগও করতে হতো না। দুঃখ হতে অব্যাহতি পেয়ে যেতে। মানুষের যেখানে নিজের উপরই অধিকার নেই, সেখানে অপরজনকে আমার বলার অধিকার কিরূপেই থাকতে পারে? তাই স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন কোনটাই মানুষের প্রকৃত আপন হতে পারে না। তোমরা অজ্ঞান বলে সেই মিথ্যাকে সত্য মনে করে দুঃখ পাচ্ছে সার। এতে তোমাদের ইহ-পর কোন কালের জন্য সুখ, মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন-চাকমা কথায় ‘তুমি দুগ পেলো কার’ মাথাহু হে ন’ দুঅ। মান্চো দুগ পেলো এগজনর মাথাহু হে দে-দি গরন’। অর্থাৎ তোমরা দুঃখ পেলো কারোর অমঙ্গল, অনিষ্ট কামনা করবে না। অনেকে নিজের দুঃখের জন্য অপরকে দায়ী করতঃ অপরের অমঙ্গল কামনা করে থাকে। ভগবান বুদ্ধ

বলেছেন, নিজে দুঃখ পেলে অপরের অমঙ্গল কামনা করবে না। তখন এরূপ বলবে আমি দেহধারণ করেই দুঃখ পাচ্ছি, জন্মগ্রহণ করেই দুঃখ পাচ্ছি। দেহধারণ না করলে দুঃখ পেতাম না, জন্মগ্রহণ না করলে দুঃখ পেতাম না। নিজে দুঃখ পেলে অপরের অমঙ্গল কামনা করলে পাপ হয়। কাজেই নিজে দুঃখ পেলেও অপরের অমঙ্গল কামনা করবে না। আমার সাথে বলো 'আমরা নিজেরা দুঃখ পেলেও অপরের অমঙ্গল কামনা করব না। আগে অপরের অমঙ্গল কামনা করলেও এখন হতে আর করব না'। তাহলে তোমাদের পাপ হবে না এবং দুঃখও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। তোমরা সর্বদা অকুশলকর্মের প্রতি লজ্জাশীল হয়ে অবস্থান কর। যারা অকুশলকর্মের প্রতি লজ্জাশীল, তাদের দ্বারা অকুশলকর্ম সম্পাদনের কোন সুযোগই থাকে না। অকুশলকর্ম সম্পাদনে তোমরা লজ্জাশূন্য বলে একের পর এক অকুশলকর্ম সম্পাদন করেই যাচ্ছে। যদি লজ্জা শরম থাকত তাহলে এসব করতে পারতে না। চাকমা সমাজে একটা কথা চালু রয়েছে 'লাজঅ নেই, পাজঅ নেই হুলে ন পারে'। অর্থাৎ যাদের লজ্জা শরম নেই তাদের দ্বারা অকরণীয়, অকথনীয় বলে কিছুই নেই। তোমাদের অলজ্জী হওয়াটা কি রকম জান? উপমা কথা—কোন একটা স্থানে বিশজন মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় লাফালাফি করছে। তোমরা কয়েকজন কোথাও যাবার পথে হঠাৎ তাদের সাথে মুখোমুখি হয়ে গেলে; তাদেরকে সে অবস্থায় দেখে তোমাদের মনে কৌতুহল জাগল, আমরাও তাদের মতন হয়ে লাফালাফি করব—কি? অন্যদিকে তারাও তোমাদেরকে তাদের মত বিবস্ত্র হয়ে লাফালাফি করতে বার বার ডাকতেছে, উৎসাহিত করাচ্ছে। কি আর করা? শেষমেশ তোমরাও তাদের মতন হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিলে—অনায়াসে। ঠিক তদ্রূপ, আমি দেখতেছি বাংলাদেশের (প্রায়) সব মানুষই বিবস্ত্র হয়ে লাফালাফি করছে। আর তোমরাও তাদেরকে দেখে বিবস্ত্র হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছ। বাস্তবিক, সঙ্গী না পেলে একা একজনের পক্ষে খুব বেশি পাপ করা সম্ভব হয় না। বর্তমান সময়ে তোমরা পাপকর্ম সম্পাদন করতে সঙ্গী পেয়েছ বলে একের পর এক পাপকর্ম সম্পাদন করেই চলেছ। সঙ্গী না পেলে এতো পাপকর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ হতে না। আবার, এ পাপকর্ম কেন সম্পাদন করতেছ জান? তোমাদের চিন্তে জ্ঞান উদয় হচ্ছে না বলে। জ্ঞান উদয় হলে কেহ পাপকর্ম সম্পাদন করতে পারে না। বলা যায়, যে দিন তোমাদের চিন্তে জ্ঞান উদয় হবে সেদিন আর পাপকর্ম সম্পাদন করবে না। এমন কি অন্যজনকে পাপকর্ম সম্পাদনে নির্দেশ প্রদান, উৎসাহ দান এবং অনুপ্রাণিত করেও কিছুতেই পাপকর্ম সম্পাদন করাবে না। সর্বোপরি নিজেকে সব ধরনের খারাপ, মন্দ, পাপকাজ হতে বিরত রেখে ভালো, সৎ ও কুশলের মধ্যে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা আর পাপকে নিয়ে সুখ করবে না এবং চিন্তের মধ্যে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় করতে তৎপর থাকবে। আমার সাথে বলো ‘আমাদের চিন্তের মধ্যে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হোক। সেই ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু দ্বারা আমাদের অধঃপতন, চারি অপায় বন্ধ হোক; পরিশেষে পুনর্জন্ম বন্ধ হোক’। মনে রাখবে ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হলে অধঃপতন, চারি অপায় এবং পুনর্জন্ম বন্ধ হয়ে যায়, সর্বদা সুখ উপলব্ধি হয়। তোমাদের যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু অর্জিত হয় তখন সবই ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমরা যাবতীয় অকুশল, পাপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করবে। আমি আবারো বলছি, তোমরা অতি সহসা ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় করতে তৎপর হও। ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় না হলে অধঃপতনে পতিত হয়ে চারি অপায়ে পতিত হয়ে, পুনর্জন্ম হয়ে অজস্র দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা ছাড়া অন্য গত্যন্তর থাকে না। কিছুতেই প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। তাই আমার সাথে বলো ‘আমাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হোক। যাতে আমাদের অধঃপতন না হয়; অবনতি না হয়, চারি অপায়ে পতিত হতে না হয়। এবং আমাদের ইহকাল-পরকাল সুখ হোক, উন্নতি হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক; পরিশেষে পুনর্জন্ম বন্ধ হোক’।

সাধু, সাধু, সাধু।

জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকলে পঞ্চশীল পালন করা সম্ভব

এক সময় পরম পূজ্য বনভন্তে মহোদয় দেশনালায়ে আয়োজিত দানানুষ্ঠানে সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-ভগবান বুদ্ধের সময় ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট সাক্ষাৎ করতে আসলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করতেন, হে ভিক্ষুগণ! সুখে আছ তো? নিরুপদ্রবে আছ তো? খাওয়া-দাওয়া কষ্ট নেই তো? ভিক্ষান্নে কষ্ট পাচ্ছ না তো? ভিক্ষুগণ স্বীয় অবস্থানুসারে উত্তর প্রদান করতেন। ভগবান কেন সেগুলো জিজ্ঞাসা করতেন জান? ভিক্ষুগণের চারি প্রত্যয় লাভে কোন অসুবিধা হয় কিনা তা’ জেনে নিতেন। কারণ ভিক্ষুগণের চারি প্রত্যয়ের সুব্যবস্থা করে দিতে পারলে দায়কগণের পুণ্য অর্জিত হয়। আর চারি প্রত্যয়ের সুব্যবস্থা না হলে দায়কগণের পাপ হয়ে থাকে। আমি যখন ধনপাতার অরণ্যে ছিলাম, তখন ভাবতাম এবার বুঝি আমার মৃত্যু অনিবার্য। লোকে আমাকে বিশ্বাস করবে না, আমার কোন খোঁজ খবর নেবে না, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গেলেও দিবে না। অন্যদিকে, বুদ্ধের নির্দেশ হল ভিক্ষাজীবী হয়ে জীবন-যাপন করবে; টাকা-পয়সা স্পর্শ করবে না; ক্রয় করে কোন কিছু গ্রহণ, খাওয়া যাবে না; জমা রেখে কোন খাবার খাওয়া যাবে না। কিন্তু মরে যাইনি, এখনো

বৈচে রয়েছে। বর্তমানে আমি যেখানে যাই না কেন দায়ক-দায়িকারা সব জায়গাতে সুব্যবস্থা করে দেয়। কাজেই তোমাদের সবার পুণ্য অর্জিত হচ্ছে। বুদ্ধ বলেছেন, ভিক্ষুসঙ্ঘের চারি প্রত্যয়ের ব্যাপারে, দায়ক-দায়িকাগণ যতো সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারবে ততোই তাদের পুণ্য হয়ে থাকে। লংকা (শ্রীলঙ্কা), মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যান্ডের দায়ক-দায়িকারা নাকি ভিক্ষুসঙ্ঘের চারি প্রত্যয় প্রদানের ব্যাপারে খুবই সচেতন। তারা ধনী, উপরন্তু প্রতিক্রম দেশের লোকজন বলে সেভাবে পুণ্য অর্জন করে থাকে। কিন্তু এটা (বাংলাদেশ) অপ্রতিক্রম দেশ, এখানকার লোকজন গরিব তাই এখানে লংকা, বার্মার মত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে না। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করা, বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা কঠিন কাজ। চাকমা ভাষায় প্রবাদ আছে “শীলত্ পোর দি পানি হানা” অর্থাৎ পাথর খনন করতঃ কুয়া তৈরি করে পানি খাওয়া। যা খুবই দুরূহ কাজ। তোমাদের সমক্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়ে আমাকেও সেরূপ সুকঠিন প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে যেতে হয়েছে। এক কথায়, আমি (বনভন্তে) পাথর খনন করতঃ কুয়া তৈরি করে পানি খাচ্ছি। এবার বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-বনভন্তে কিভাবে পানি খাচ্ছে? ভন্তে, পাথর খনন করতঃ কুয়া তৈরি করে পানি খাচ্ছেন। আমি ছাড়া অপর কারোর পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই তো বলি আমি যদি তোমাদেরকে বুঝাতে না পারি, তাহলে আর কেউ পারবে না।

আচ্ছা, আমি যদি তোমাদেরকে পঞ্চশীল পালন করতে বলি; পালন করতে পারবে তো? নাকি তোমাদেরকে দুই মন ওজন বিশিষ্ট চাউলের বস্তা কাঁধে উঠিয়ে দেয়ার মতন হবে? সবাই তো দুই মন ওজনের বস্তা কাঁধে করে নিতে পারে না। যদিও কেহ কেহ পারে। কারা পারে? যারা শক্তিশালী এবং যাদের অভ্যাস আছে। ঠিক তদ্রূপ গৃহীদের মধ্যেও যাদের জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা আছে তারা পঞ্চশীল পালন করতে পারে। আর যাদের জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা নেই তারা শীল পালন করতে পারে না। তবে গৃহীদের পক্ষে পঞ্চশীল পালন সম্ভব বলেই বুদ্ধ গৃহীদের জন্য পঞ্চশীল প্রজ্ঞপ্তি করেছেন। অন্যদিকে ভিক্ষুদের পক্ষে দুইশত সাতাশটি শীল পালন করা সম্ভব বলে ভিক্ষুদেরকে দুইশত সাতাশটি শীল প্রজ্ঞপ্তি করেছেন। যেমন ধর, এখানে বেশ কিছু মালামাল পড়ে রয়েছে। আর সেগুলো অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন বয়সের (ছেলে, যুব, বয়স্ক) লোক আসলো। তাদের দলনেতা দেখে নিল, একজন ছেলে কত পরিমাণ মাল নিয়ে যেতে সমর্থ আর একজন যুবক এবং একজন বয়স্ক লোক কত পরিমাণ মাল নিয়ে যেতে সমর্থ হবে; সেই অনুসারে তাদের কাঁধে মাল তুলে দিচ্ছে। ভগবান বুদ্ধও ঠিক তেমনভাবে গৃহীদেরকে পঞ্চশীল, ভিক্ষুদিগকে দুইশত সাতাশটি শীল

পালন করতে প্রজ্ঞাপ্তি করেছেন। তাই তোমাদের পঞ্চশীল পালন করাটুকু অসাধ্য হতে পারে না; অবশ্যই সাধ্য। তারপরও তোমরা যদি অসাধ্য মনে কর, তাহলে সেটা হবে তোমাদের অজ্ঞানতা ও অশ্রদ্ধারই বহির্প্রকাশ মাত্র। জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা বিহীন ব্যক্তিরাই একরূপ মনে করে থাকে। জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা থাকলে পঞ্চশীল পালন করা সম্ভব। তজ্জন্ম তোমরা পঞ্চশীল পালনে মনোযোগী হও, অমনোযোগী হবে না। প্রাণীহত্যা করবে না, চুরি-ডাকাতি-সম্ভ্রাসী করবে না, ব্যভিচার করবে না, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ করবে না, মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সেবন করবে না। এইভাবে পঞ্চশীল পালন করলে তোমরা সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারবে, মৃত্যুকালেও মূর্ছাপ্রাপ্ত হবে না এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। আর পঞ্চশীল পালনের ফলে ভবিষ্যতে আর্যমিত্র বুদ্ধের সম্মুখে ধর্মদেশনা শ্রবণ করতঃ মার্গফল লাভে সক্ষম হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা দান, শীল, ভাবনায় কুশলকর্ম আত্মনিয়োগ কর। বর্তমানে তোমরা অর্থ-বিস্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্য কত রকম প্রচেষ্টাই-না রত রয়েছ নয় কি? কিন্তু বর্তমানের অর্জিত সেই অর্থ-বিস্ত, প্রভাব প্রতিপত্তি কি তোমাদের মৃত্যুর পর সঙ্গে যাবে? যাবে না। তবে আমি তোমাদেরকে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যেই পুণ্যসম্পদ অর্জন করতে বলছি, সেই সম্পদ মৃত্যুর পর পরম বন্ধুর মতো সঙ্গে সঙ্গে যাবে এবং পরকালে তোমাদেরকে বিপুল সুখ প্রদান করবে। দান, শীল, ভাবনাদি কুশলকর্ম কিভাবে করতে হবে? কর্মফল এবং পরকাল বিশ্বাস করে। অর্থাৎ আমাদের দ্বারা আচরিত এই দান, শীল, ভাবনা কুশলকর্মের ফলে আমাদের ইহকাল পরকাল সুখ লাভ হোক। এই পুণ্যসম্পদ পরকালে আমাদের ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করুক। এবং এ'পুণ্যকর্মের ফলে আমাদের যাতে কখনো পরিহানি, অবনতি, অধঃপতন না ঘটে। যাদের কর্মফল, পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান থাকে তারা দান, শীল, ভাবনাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। যাদের পরকাল, কর্মফল সম্পর্কিত জ্ঞান থাকে না তারা কুশলকর্ম করতে অক্ষম। এক কথায়, যারা জ্ঞানী তারা কুশলকর্ম সম্পাদন করতে পারে, আর যারা অজ্ঞানী তারা কুশলকর্ম সম্পাদন করতে পারে না।

বুদ্ধ বলেছেন, মানুষ মাঝেই বিপদ সঙ্কুল, সঙ্কর্ম শ্রবণ আয়াস সাধ্য। যে কোন মুহূর্তে বিপদ এসে মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর সেই বিপদ কখন, কিভাবে এসে আক্রমণ করবে তা' কেহ জানতে পারে না। কারণ বিপদ তো কাউকে তার আসার আগাম দিন ক্ষণ জানিয়ে আসে না। অতএব যে কোন মুহূর্তেই বিপদ আসতে পারে। বিপদের হাত হতে কেউ এক মুহূর্ত কালও নিরাপদ নয়। সঙ্কর্ম শ্রবণ মানুষের জীবনে এক পরম প্রাপ্তি। এই সঙ্কর্ম শ্রবণের

ফলে মানুষ নিজকে সুপথে চালিত করতে সমর্থ হয়। চিত্ত হতে পাপকালিমা ধুঁয়ে ফেলতে প্রয়াস পায়। অন্যদিকে, জগতে সদ্ধর্ম শ্রবণ বড়ই দুর্লভ। সদ্ধর্ম শ্রবণের সুযোগ ঘটা সহজ নয়। সদ্ধর্মবিদ, জ্ঞানী, পণ্ডিতজনের আবির্ভাব বিরল। তাই তোমরা অতি সতর্কতার সহিত কুশলকর্মের মাধ্যমে জীবন-যাপন কর। চিত্তের মধ্যে পাপ চেতনাকে স্থান দিবে না। সবাই পণ্ডিত হতে তৎপর থাক; কখনো মূর্খ হবে না। মূর্খ কাকে বলে? যারা দুষ্কর্মকারী, দুর্বাক্য ভাষণকারী তারাই মূর্খ। মূর্খরা পর সম্পত্তি লোভী হয়, পরের অনিষ্টকারী এবং মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হয়ে থাকে। তারা বহুবিধ পাপকর্ম সম্পাদন করতঃ নিজকে ক্ষত-বিক্ষত করে জীবন-যাপন করে। পণ্ডিত কাকে বলে? যারা সুকর্মকারী, সুবাক্য ভাষণকারী এবং সুচিন্তাকারী তারাই পণ্ডিত। আমার সাথে বলা 'যারা সুকর্মকারী, সুবাক্য ভাষণকারী এবং সুচিন্তাকারী তারাই পণ্ডিত'। আবার যিনি সহনশীলতা, জীবের প্রতি দয়া, পুণ্যকর্মে নির্ভীক, ক্ষমা-মৈত্রী, নিজকে অক্ষুণ্ণ রাখার সংগুণে গুণী তিনিই পণ্ডিত। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, ভিক্ষুগণ তোমরা মূর্খকে পণ্ডিত বানাবে, অসাধুকে সাধু বানাবে। যাতে সকলের সুখ লাভ হয়; কেহ দুঃখের মধ্যে পতিত না হয়। তাই বলছি, তোমরা মূর্খ, অসাধুমূলক কর্ম পরিত্যাগ করতঃ পণ্ডিত, সাধু হয়ে যাও। পণ্ডিত, সাধু হতে পারলে সুখ লাভ হয়। আর মূর্খ, অসাধু হয়ে পড়ে থাকলে কিছুতেই সুখ লাভ হবে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে দুর্বিষহ দুঃখ যাতনাই ভোগ করে যেতে হবে।

বনভন্তে আরো বলেন-আমাকে অনেক মারমা, বড়ুয়া ভিক্ষুরা বলেছিল এখানে (পার্বত্যঞ্চলে) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা এবং বৌদ্ধধর্মকে সুউজ্জ্বল করা সম্ভব নয়। কারণ এখানকার লোকজনেরা নিজেরাই যেমন ধর্মাচরণ করে না, তেমনি অপরকেও ধর্মাচরণ করতে বাধা দেয়। তাদের কথা অবশ্যই ভুল নয়। আগে এদের সংখ্যা খুবই বেশি ছিল। এমন কি রাজবন বিহারে আমাকে দান দিতে আসার সময়ও বাধা প্রদান করতে চেয়েছিল। সেই অকুশলকর্মের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ কয়েকজনের মৃত্যু হয়ে গেলে এখন আর বাধা দিতে সাহস পাচ্ছে না। এগুলো কি জান? এগুলো বনভন্তের অভিশাপ নয়। তারা খুব বেশি বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল, সীমা অতিক্রম করতে চেয়েছিল। ফলে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। বুদ্ধের সময়কালীনও অনেকে বুদ্ধের প্রতি খুব বেশি বিরোধীতা করতে চেয়েছিল; আর সেই অকুশলকর্মের ফলে রক্তবমি করে, মলদ্বার দিয়ে রক্ত বের হয়ে মারা গিয়েছিল। তাই বলছি, তোমরা নিজেরা পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করলে, না করতে পার, কিন্তু অপরকে বাধা দিও না বা অপরজনের পুণ্যকর্মে বাধা জন্মাইও না। এতে বেশি পাপ হয়ে থাকে। বর্তমানে আমি দেখতেছি, দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার মত শ্রদ্ধাশীল অনেক

ব্যক্তিই রয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক তাদেরকে সে কাজে নিবৃত্ত করায় বলে তারা সুষ্ঠুভাবে দানাদি পুণ্যকর্ম করতে পারছে না। লংকা, বার্মা, থাইল্যান্ডে নাকি পুণ্যকর্ম সম্পাদনে কেহ বাধা প্রদান করে না। তোমাদের চিন্তে যদি সত্য্যভাব এবং জ্ঞান উদয় হয় তাহলে কেহ আর পুণ্যকর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করবে না। এখন কেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনে বাধা দিতেছে? তোমাদের চিন্তে সত্য্যভাব ও জ্ঞান উদয় হয়নি বলে। চিন্তের মধ্যে জ্ঞান এবং সত্য্যভাব না থাকলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, চিন্ত সর্বদা দুঃখত্রস্ত ও অস্থির থাকে। আর সে অবস্থায় কিছুতেই নিজকে সুপথে স্থির রাখা যায় না। যাদের চিন্তে সেইরূপ জ্ঞান এবং সত্য্য ভাবের অভাব রয়েছে তাদেরকে তো বুঝানো সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধও সবাইকে বুঝাতে পারেননি; সবাই বুদ্ধের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। সুতরাং আমি কি করে সবাইকে বুঝাতে পারবো? পারবো না। তারপরও দেখতেছি, অনেকের চিন্তে জ্ঞান রয়েছে তারা শ্রদ্ধার সহিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করছে। ভালো মানুষও রয়েছে, খারাপ মানুষও রয়েছে। তোমরা খারাপ লোকদিগকে অনুসরণ করবে না; ভালো লোকদিগকে অনুসরণ কর। তাদের মত শ্রদ্ধার সহিত কুশলকর্মে নিয়োজিত থাক। তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুখ লাভ হবে। আর বর্তমানের এ' দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্দিন কেটে যাবে।

বনভন্তে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, এখানকার মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ধনী, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ধনী, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও ধনী; অথচ তোমরা বৌদ্ধধর্ম ধর্মাবলম্বীরা গরিব। তজ্জন্য অনেক মুসলিম, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা নাকি তোমাদেরকে কটাক্ষ করে বলে বৌদ্ধধর্ম তোমাদেরকে কিছুই দেবে না। তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে দেখবে তোমরা ধনী হয়ে যাবে। বৌদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলে গরিব হওত দুঃখ পেতেই হবে। কিন্তু না! বৌদ্ধ হলে গরিব হয়ে থাকতে হবে এটা সঠিক নয়। বৌদ্ধধর্ম আচরণ করেও ধনী হওয়া যায়, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি হয়ে থাকে। তবে তার জন্য চাই ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস; সেই বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ধর্মাচরণ। যদি ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস অটুট রেখে পরিশুদ্ধভাবে ধর্মাচরণ করা যায় তাহলে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেও লৌকিক সুখ অর্জিত হয়, ধনী-মহাধনী, হওয়া যায়; গরিব থাকতে পারে না। সর্বদা উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধিই সাধিত হয়। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তোমরা সবাই মিলে একটানা তিন বৎসর পঞ্চাশীল পালন করে দেখ, তাহলে তোমাদের বর্তমান আর্থিক দৈন্যতা ভাব কোথায় দূরে সরে যাবে তার ইয়ত্তা থাকবে না। কিন্তু তোমরা তো সেইভাবে ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারছ না। আমি তো দেখতেছি, অধিকাংশ মুসলমানেরা তাদের ধর্মকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে; যথাসম্ভব ধর্মকে মেনে চলতে চেষ্টা করে। হিন্দু,

খ্রীষ্টানেরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মকে গভীর বিশ্বাস করে...। কিন্তু তোমরা মুখে বৌদ্ধ বলে দাবি করলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস নেই। তাই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ধর্মের মাধ্যমে উন্নতির ভিত তৈরি করতে পারলেও তোমরা তা' পারতেছ না। ফলে তোমাদেরকে পিছনে পড়ে থাকতে হচ্ছে। ধর্মের মাধ্যমে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুখ শান্তির ভিত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা কোন ধর্মের দোষ নয়, তোমাদের নিজেদের দোষেই।

পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা আমার উপদেশ মত বৌদ্ধধর্ম মেনে চল। ধর্মকে মেনে না চললে তোমাদের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুখ লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমি চাচ্ছি, তোমরা বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুখ শান্তি লাভের ভিত তৈরি কর, যাতে তোমাদেরকে আর পরিহানি হতে না হয়, অধঃপতনের অতল গহ্বরে ডুবে যেতে না হয়, নিম্নগামী হতে না হয় এবং অবনতি না ঘটে। কাজেই তোমরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বাসবান হয়ে অবস্থান কর। এ যাবৎকাল তো অনেক দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভোগের শিকার হয়েছ। হয়েছ নয় কি? হ্যাঁ, ভক্তে হয়েছি। কিন্তু কোন উপায়ে সুখ, শান্তি লাভ করতে পারিনি। সুতরাং এবার ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে দেখ। যদি ধর্মকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতঃ পরিতৃপ্তভাবে ধর্মাচরণ কর তাহলে দুঃখের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবো।

সাধু, সাধু, সাধু।

তোমরা সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল হয়ে অবস্থান কর

এক সময় পরম পূজ্য অর্হৎ, শ্রাবকবুদ্ধ বনভক্তে মহোদয় দেশনালয়ে আয়োজিত পুণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সমবেত দায়ক-দায়িকাবৃন্দের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-তোমরা জয়যুক্ত হবার কাজ কর, পরাজিত হবার কাজ করবে না। কি কাজের দ্বারা জয়যুক্ত হবে? পুণ্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা জয়যুক্ত হওয়া যায় আর পাপকর্ম সম্পাদন করলে পরাজিত হতে হয়। বর্তমানে তোমরা পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে পাপকর্ম সম্পাদন করতেছ বলে দিন দিন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছ, পরাজিত হচ্ছে। গৃহীদের জন্য কুশলকর্ম হল দান, শীল, ভাবনা। দান অর্থ ত্যাগ করা; যে কোন জিনিস নিঃস্বার্থভাবে নির্লোভ চিত্তে ত্যাগ করার নাম হল দান। তবে আত্মপ্রশংসা করতঃ অপরকে নিন্দা, অবজ্ঞা, তুচ্ছ করে দান করতে নেই। দান করার সময় কোন প্রকার অহঙ্কার করা বিধেয় নয়। অহঙ্কারের সহিত দান করলে তা' হীন দান বলে অভিহিত হয়। কিভাবে দান করতে হয় জান? 'এই দানের ফলে বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক' এরূপ বলে সকল প্রাণীর প্রতি মঙ্গল, সুখ কামনা করে দান করতে হয়। শীল বলতে

সং আচরণ এবং চিন্তে সংযমতা রক্ষা ও পাপ বিরতি বুঝায়। শীল চিন্তের দোষগুলো (দুঃশীলতা আচরণ) হনন করে। শীল প্রতিপালন করলে ভোগ-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়; ইহকাল-পরকালে সুখ, শান্তি লাভ হয়। শীলবান ব্যক্তির কখনো মৃত্যুকালে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয় না, সুখেই মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর পরে অবশ্যই মনুষ্য সম্পত্তি, দিব্য সম্পত্তি লাভ হয়ে থাকে। অন্যদিকে, শীল পালনের দ্বারা নির্বাণ সুখও উপলব্ধি হয়। এগুলো শীল পালনের প্রত্যক্ষ ফল। তাই তোমরা পঞ্চশীল পালন করতে তৎপর থাক। প্রাণীহত্যা করবে না; চুরি-ডাকাতি-চাঁদাবাজি-মাস্তানী করবে না; ব্যভিচারে রত হবে না; মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যলাপ করবে না; মদ-গাঁজা-আফিং-হেরোইন সহ যাবতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি সেবন করবে না। এই পঞ্চশীল পরিশুদ্ধভাবে পালন করলে ইহকালেও সুখ লাভ হয়। শীল প্রতিপালনের মাধ্যমেই তোমাদের সুখ শান্তি লাভ হবে। সুখ শান্তি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি লাভের জন্য শীল প্রতিপালনের কোন বিকল্প নেই। ভাবনা হল জ্ঞান উৎপাদক চিন্তা। বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মঙ্গল কামনায় মৈত্রী ভাবনা। শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ না করে সকলের প্রতি ক্ষমাশীল হয়ে অবস্থান করা এগুলো হল মৈত্রী ভাবনা। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা সর্বদা পুণ্য বৃদ্ধি পায়। মৈত্রী ভাবনাকারীরা মনুষ্য-অমনুষ্য সকলের প্রিয়ভাজন হয়; দেবতাগণ তাদেরকে আপদ-বিপদ কালে রক্ষা করে থাকে। এইভাবে দান, শীল, ভাবনা অনুশীলন করতে পারলে তোমাদের কখনো পরিহানি, অবনতি ঘটবে না। বরঞ্চ সব সময় উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সুখ, শান্তিই লাভ হবে।

ভগবান বুদ্ধ মানব জীবনকে মহানগরের দীপ শিখার সহিত তুলনা করেছেন। মহানগরের বাতিগুলো যেমন রাতে প্রজ্জ্বলিত হয় আর সকাল হলেই নিভে যায় ঠিক তেমনিভাবে মানুষের আয়ুও অতি সহসা ফুরিয়ে যায়। মানুষের জীবনকাল অতি অল্প, কেহ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বেঁচে থাকে না। তৃণাশ্রে শিশির বিন্দুর মত মানুষের আয়ু ক্ষয়িষ্ণু; অল্প কিছু দিনের পরেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। তোমাদেরকে এ রূপে ভাবতে হবে, ‘আমরা প্রতি পলে পলে মৃত্যুমুখেই পতিত হচ্ছি। যতদিন জীবিত আছি ততদিন একে অপরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে বটে, কিন্তু যেদিন মৃত্যু হবে সেদিন হতে আর কেহ কারোর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ পাবো না’। এবার পূজ্য বনভক্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন, কথাটা সঠিক তো? হ্যাঁ ভগ্নে, কথাটা সঠিক। তোমরা জীবিত আছ বলে এ’ দেহের সাহায্যে একজন অপরজনকে দেখতে পাও; কিন্তু মৃত্যু হয়ে গেলে, দেহের বিলুপ্তি ঘটলে, তখন কেউ আর কারোর দেখা পায় না, পাওয়া সম্ভবও হয় না। সুতরাং পরস্পরের প্রতি কলহ-বিবাদ, অমঙ্গল, অহিত কামনা কিসের প্রয়োজন? সেই সব অকুশল উৎপাদকমূলক কর্ম সম্পাদন করে পরকালের জন্য দুঃখ, অশান্তি

ডেকে আনার কি দরকার? জ্ঞানী ব্যক্তির এইভাবে মরণ সম্বন্ধে সচেতন হওত কোন প্রকার অকুশল পাপকর্মে পা বাড়ায় না। ফলে তারা জীবনকে উন্নত হতে উন্নততর, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর দিকে চালিত করে। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তজ্জন্য তারা অকুশলকর্ম সম্পাদনে পিছপা হয় না। আর জীবনকে ঠেলে দেয় মহাদুঃখ, অশান্তি আর অন্ধকারের দিকে; যেখান হতে উঠে আসা মহাকঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে।

বনভন্তে আরো বলেন-যারা প্রকৃত জ্ঞানী তাদের ইহকালও সুখ, পরকালও সুখ। আর যারা অজ্ঞানী তাদের ইহকালও দুঃখ, পরকালও দুঃখ বলে জানবে। তোমরা অজ্ঞানী না হয়ে জ্ঞানী হও; মিথ্যাদর্ম আচরণ না করে সত্যধর্ম আচরণ কর। সত্যধর্ম আচরণ করলে যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে। তোমরা পরকাল বিশ্বাস করবে অর্থাৎ পরকাল আছে বলে বিশ্বাস করবে। পরকাল আছে এমন বিশ্বাস করলে সেটা সত্যধর্ম হয়। পরকাল বিশ্বাস না করলে সেটা মিথ্যাদর্ম হয়ে যায়। যারা পরকাল বিশ্বাস করতঃ সত্যধর্ম আচরণ করে তারা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণাদি দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-যে ধর্ম আচরণ করলে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণাদি দুঃখ পেতে হয় সে ধর্ম আচরণ করবে না। আর যে ধর্ম আচরণ করলে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ এসকল দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে ধর্মই আচরণ করবে। এবার বনভন্তে দায়ক-দায়িকাদেরকে প্রশ্ন করেন-ভগবান বুদ্ধ কি ধর্ম আচরণ করতে বলেছেন? ভন্তে, যে ধর্ম আচরণ করলে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ এসকল দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায় সে ধর্ম আচরণ করতে বলেছেন। লোকোত্তর বা নির্বাণধর্ম আচরণ করলে জন্ম দুঃখ নেই, জরা দুঃখ নেই, ব্যাধি দুঃখ নেই, মরণ দুঃখ নেই; তখন অনাবিল শান্তির অধিকারী হওয়া যায়।

আমি প্রব্রজিত জীবনের প্রথম দিকে স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করে ধর্ম প্রচার করতে ইচ্ছা পোষণ করতাম। কিন্তু শেষে বুঝেছিলাম স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী লাভ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা কঠিন হবে। বুদ্ধ বলেছেন, অর্হৎ না হওয়া পর্যন্ত কেহ প্রকৃত বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারে না। এমন কি অনাগামীও নয়। কারণ অনাগামীরা মুক্তির স্তর পান বটে, কিন্তু মুক্ত নন। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের চরম ও পরম প্রাপ্তি নির্বাণ উপলব্ধি হয় না। আর নির্বাণ উপলব্ধি না হলে বৌদ্ধধর্ম জানা, বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা অসমাপ্তই রয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মকে যথাযথভাবে জেনে, বুঝে, হৃদয়ঙ্গম করে এবং নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করে তা' প্রচার করতে হলে অর্হৎ লাভের কোন বিকল্প নেই। শাস্ত্রেও দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ তাঁর সেবক আনন্দ স্ববিরকে বার বার বলতেন 'আনন্দ অরহত্ব লাভের চেষ্টা কর'।

তোমরা সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল হয়ে অবস্থান করবে। বৌদ্ধধর্ম একদিকে ত্যাগের ধর্ম অন্যদিকে দয়ার ধর্ম; একদিকে ত্যাগে সুখ অন্যদিকে দয়াই সুখ। তোমরা যদি সমস্ত অকুশল পাপ পরিত্যাগ কর তাহলে তোমাদের সুখ লাভ হবে। আর যদি প্রত্যেক প্রাণীকে দয়া কর, হিংসা না কর তাহলেও সুখ লাভ হবে। কখনো প্রাণীর প্রতি নির্দয় হবে না। নির্দয় হলে দেবগণও অসন্তুষ্ট হয়, ক্ষোভ প্রকাশ করে। নির্দয়তা দ্বারা কখনো সুখ লাভ হয় না; কোন মনোঙ্কামও পূর্ণ হয় না। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের আগে সন্ন্যাসী অবস্থায় রাজা বিম্বিসারকে প্রাণী হত্যা করে যজ্ঞ আয়োজন না করার জন্য উপদেশ ছলে বলেছিলেন—

“করি পুত্রের কামনা,
কর জগত মাতা আরাধনা;-
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?

জগতমাতা-
পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি, নৃপ, কৃপা নাহি কর-
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দয় যে জন-
দেবগণ তাহার প্রতি।
নরপতি!

কেন প্রাণী নাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি?
রাজকার্য দুর্বল পালন-
দুর্বল এ ছাগপাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত-
নহে-উচ্ছেঃ স্বরে ডাকিত তোমায়-
প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ”।

তোমরা প্রত্যেক প্রাণীকে সমানভাবে দয়া করবে, মানুষ হতে গুরু করে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ কারোর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করবে না। দয়া ও মৈত্রীভাবই পোষণ করবে। যিনি সকলের সমান দয়াশীল হয়ে অবস্থান করেন; কোন প্রাণীকে হিংসা করেন না, আঘাত করেন না, দুঃখ দেন না, তিনি ইহাকালে পার্থিব সুখ ভোগ করেন এবং মরণান্তে দিব্য সুখের অধিকারী হন।

তিনি বলেন—যারা পুণ্য করে তারা স্বর্গে যায়, যারা পাপ করে তারা নরকে

যায় এবং যারা তৃষ্ণা ক্ষয় করে তারা পরিনির্বাণিত হয়। তোমরা তাহলে কি করবে? ভক্তে, আমরা পুণ্য করব; কখনো পাপ করবো না। মনে রাখবে, পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কার। পাপ করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়, আর পুণ্য করলে পুরস্কার লাভ হয়। তাই আমার সাথে বলো 'আমরা কখনো পাপ করব না, পুণ্যই করব। আমরা যদি পুণ্য করি তাহলে আমাদের পুরস্কার লাভ হবে। অন্যদিকে পাপ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই আগে পাপ করে থাকলেও আজ হতে আর পাপ করব না।' তোমরা সর্বদা সাবধানে থাকবে; সাবধানে মার নেই। আগে কি করেছি না করেছি তা' ভেবে হতাশ বা অনুশোচনা করার কোন দরকার নেই। তোমরা যদি সর্বদা সাবধানে থাক, তাহলে পাপকর্ম সম্পাদিত হবে না, পাপ চেতনা এসে চিন্তকে গ্রাস করতে পারবে না। বরং সব সময় পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। জ্ঞানের সহিত নিজকে সুরক্ষা করা সম্ভব হবে। পাপকার্য হতে দূরে সরে থাকতে সমর্থ হবে।

তোমরা স্বীয় স্বীয় চিন্তকে (সংভাবে) রক্ষা কর, যাতে মিথ্যায় আকৃষ্ট হতে না পারে। চিন্তকে রক্ষা করলে অকুশল হতে মুক্ত থাকা যায়, সব সময় পুণ্য অর্জিত হয়ে থাকে, চিন্তে সুখ লাভ হয় এবং নির্বাণ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যারা চিন্তকে রক্ষা করতে পারে তাদের কিছুতেই পরিহানি হয় না। কিভাবে চিন্তকে রক্ষা করবে? সর্বদা কুশল চেতনা জাগরুক রেখে। বুদ্ধের সময়কালীন কথা, কোশল জনপদে নন্দগোপাল নামক এক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে শ্রাবস্তীতে এসে অনাথপিণ্ডের সঙ্গে জেতবন বিহারে বুদ্ধের কাছে যেতেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মুহকে দুষ্ক দান করতেন। একদা নন্দগোপাল বুদ্ধকে সশিষ্যে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে এনে এক সপ্তাহ সকলকে দুষ্কে প্রস্তুত পায়সান্ন সহ দুধের তৈরি নানা রকম খাদ্যাভোজ্যের দ্বারা সেবা করলেন। সপ্তমদিনে বুদ্ধের নিকট ধর্মোপদেশ শুনে তৃপ্তি লাভ করলেন। বুদ্ধের প্রস্থানের সময় নন্দগোপালও অনেক দূর পর্যন্ত বুদ্ধের পশ্চাদানুসরণ করে এগিয়ে দিয়ে এলেন। বুদ্ধের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরবার পথে হঠাৎ তিনি এক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হলে তার মৃত্যু ঘটল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালে ভগবান বললেন, নন্দগোপালের পুণ্যকার্য বৃথা যায়নি। সে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লাভ করেছে। ব্যাধের শর তার দেহকে বিদ্ধ করেছে বটে, কিন্তু তার চিন্তকে কিছুই করতে পারেনি। তার চিন্ত কুপথে চালিত হয়নি, সুপথেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে সুগতি স্বর্গ লাভ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। তজ্জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির স্বীয় চিন্তকে রক্ষা করতে সদা তৎপর থাকেন। চিন্তের মধ্যে পাপ চেতনাকে স্থান দেন না। হঠাৎ পাপ চেতনা উদয় হলেও তৎক্ষণাৎ তা' ধ্বংস করে ফেলেন। তোমরাও চিন্তকে রক্ষা কর। চিন্তকে রক্ষা করতে সক্ষম হলে অজ্ঞান উৎপন্ন

হতে পারে না, হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, আত্মতৃপ্তি অর্জিত হয় এবং পুণ্য বৃদ্ধি পেয়ে পরম সুখের অধিকারী হওয়া যায়। তজ্জন্য জ্ঞানীরা চিন্তকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন।

পরিশেষে তিনি বলেন—পুণ্যকর্ম সম্পাদনে কোন প্রকার অবহেলা করবে না। অবহেলা কি রকম জ্ঞান? ‘এখনো সময় রয়েছে আর কিছু দিন পরেই না হয় পুণ্যকর্ম করব’ এই ভেবে ভেবে পুণ্যকার্য হতে নিজকে সরিয়ে রাখা অথবা ‘আগামীকাল করব’, ‘আগামী পরশু কর’ বলে পুণ্যকর্ম করতে বিলম্ব করাকে অবহেলা করা বুঝায়। তোমাদেরকে সেইরূপ অবহেলা না করে সহসা পুণ্যকর্ম সম্পাদনে তৎপর থাকতে হবে। পুণ্যকর্ম সম্পাদনে অবহেলা করা উচিত নয়। অবহেলার সহিত বিলম্ব করতে গিয়ে জীবনের অবসানও ঘটতে পারে। কারণ কিভাবে, কখন কার মৃত্যুর সময় আসে তার নিশ্চয়তা নেই। মৃত্যুর কোন কাল বিচার নেই—শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ যে কোন বয়সে মৃত্যু আসতে পারে বা মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুকে তো কিছুক্ষণের জন্যও ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কাজেই, যখনই মনে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই তা’ সম্পাদন করতে হবে। নতুবা পরে সম্পাদন করার সুযোগ নাও ঘটতে পারে।

তোমরা প্রত্যেকে পঞ্চশীল পালন কর। প্রাণী হত্যা করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, মিথ্যা-কটু-ভেদ-বৃথা বাক্যালাপ করবে না, মদ-গাজা-আফিং-হেরোইন সেবন করবে না এবং জুয়া খেলবে না। এইভাবে পঞ্চশীল পালন করলে তোমাদের জীবন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। পঞ্চশীল পালনে তিনটি সম্পদ লাভ হয়। যথা—(১) প্রশংসা (২) সম্পত্তি (৩) মরণের পর সুগতি স্বর্গ লাভ। পঞ্চশীল পালন করে এক মুহূর্তকাল বেঁচে থাকলেও তোমাদের জীবন সার্থক হবে। অন্যদিকে, দুঃশীলতা আচরণ করে শতবর্ষ কাল বেঁচে থাকলেও জীবন বার্থ বলে জানবে। কারণ তারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারি অপায়ে পতিত হবে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দুঃশীলতা আচরণ করে শতবছর ব্যাপী বেঁচে থাকা অপেক্ষা শীলপালন করে একদিন, একমুহূর্ত বেঁচে থাকাই শ্রেয়। তোমরা পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল পালন কর, কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না, উত্তমভাবে ধর্মাচরণ কর, তাহলে তোমাদের সুখে দিন অতিবাহিত হবে এবং সুখে শয়ন, সুখে নিদ্রা, সুখে জাগরণ সুনিশ্চিত হবে। তোমরা সর্বদা পঞ্চশীল পালন ও কুশলকর্ম সম্পাদন কর। এতে তোমাদের পার্থিব সুখ লাভ সহ নির্বাণ সুখও লাভ হবেই।

সাধু, সাধু, সাধু।

সমাপ্ত